রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

ত্রয়োদশ বর্ষ

মাঘ, ১৩৪৬—পৌষ, ১৩৪৭

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬নং টাউনসেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা

বার্ষিক ২৷৷০ ষাণ্মাসিক ১।৵০

রামধনু

(মাঘ, ১৩৪৬—পৌষ, ১৩৪৭)

সূচীপত্র

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অভিশপ্ত হীরা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়, বি.এস্-সি	৩৪৫
অমৃত-দ্বীপ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	২২১, ২৬৭, ৩৩০, ৩৭৯, ৪৩২, ৪৯১
আকাশের রং (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য	৬৩৬
আগমনী	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	৪১
আমাদের ভাগ্যবিধাতা (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি, এম্.বি	১৯১
আমাদের শরীরের মোটর গাড়ী (ঐ)	ঐ	১২৯
আমিষে-নিরামিষ (প্রবন্ধ)	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	৫২[illegible]
আলো চাল আর সিদ্ধ চাল (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	২৪০
ইউরোপে বড়দিনের স্মৃতি (ভ্রমণ)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	৬৬২
উই-ফা-এন্-নীল (সচিত্র)	শ্রীজগৎ সেন	৪০১
এক রোমাঞ্চকর য্যাড্ভেঞ্চার (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪১১
এ যুগের আকাশ-যুদ্ধ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৪৬০
কবিকিশোর (জীবন-কথা)	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্.এ	১৭, ৮৬, ১৮০, ৩২৪, ৩৮৫, ৪৪৮, ৬২৫
[illegible]যুগের দধীচি (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৩৮
কা[illegible] (কবিতা)	শ্রীতরলিকা দেবী	৬৩৯
কারমাটারে (কবিতা)	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৫[illegible]
কার্ত্তিকের পিতা (গল্প)	শ্রীমানসী বসু, এম্.এ	৬৫৬
কালো বিদ্যুৎ (রহস্য-নাটিকা)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬০১
কেসিনের কথা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৪১৭
খুকু (কবিতা)	শ্রীমতী কল্যাণী বসু	২৬৬
খেলাধূলা	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৮
খোসখবর		১[illegible], ১[illegible], [illegible]৮, ২৮৯
গাধগাছ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ	১২১

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
স্বর্গের কুকুর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ	১
চিঠিপত্র		৫৪, ১১২, ১৬৩, ১৭৪, ২৩৩, ২৮৪, ৩৯১, ৫৫৯, ৬১৪, ৬৬৯
চিত্রপরিচয়		৩৩৯
চীন জয় অসম্ভব (গল্প)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি.এ	৩১৮
চুরি করা রসিকতা (কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি.এল্	৫০২
চোর (গল্প)	শ্রীদেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮১
ছন্দের খেলা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭৬
ছিরিপদর বিপদ (কবিতা)	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৪০৮
ছুটীর ক'দিন (সচিত্র ভ্রমণ)	ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্. এস্-সি (ক্যাল), পি-এইচ ডি (ক্যাণ্টাব)	২০১, ২৭৮, ৩৫২
ছুটীর কয়েক দিন (ঐ)	ঐ	১৫২
ছোটদের চিত্রশালা		৫৫, ১৬৩, ২৭৪, ৩২৯
জলযুদ্ধে সাব্মেরিন্ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৬৪৮
জিলিপী (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু	১২২
জীবজন্তুর আয়ু (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	২৯৬
ঢোট্কা রাম টিকটিকি (গল্প)	শ্রীকুঞ্জনাথ	৪৫৪
ঠং নয় ঠক্ (ঐ)	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	২২৯
ডাকাতের পাল্লায় (ঐ)	শ্রীরাধারাণী দেবী	১৬৭
ডাকুর ছেলে (ঐ)	শ্রীকুঞ্জনাথ	১৮৫
ডাক্তারি প্রহসন (সত্য ঘটনা)	শ্রীরেণুকণা শূর	৫৫৫
তেল মাখ (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	৭৮
দৈবাৎ (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি	৩
ধাঁধার উত্তর		৬৪, ১২০, ১৭৬, ২৩৭, ২৮৯, ৩৪১, ৩৯৪, ৪৪৫, ৫১২, ৫৬[illegible], ৬[illegible], ৬৭১
ধূমকেতু (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৪৩, ১০১, ১৬৪, ২১৬, ২৫৯, ২৯২, ৩৭৪, ৩৯৭
নগদ বিদায় (কবিতা)	বন্দে আলি মিয়া	১৩৪
নতুন খেলা	শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল	৬৬৭
নদের চাঁদ কুমীর হয়ে যায় (কবিতা)	বন্দে আলি মিয়া	৫৬৫
নবীন সাহিত্যিকের গুরু (গল্প)	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী	৫০৩
ন[illegible]রি প্রতিশোধ (ঐ)	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ	৪২১
নানা প্রসঙ্গ	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	৫০০, ৫৯৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
নির্ভয় (গল্প) ...	শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল ...	৩৭২
নূতন ধাঁধা ...	৬৪, ১২০, ১৭৭, ২৩৮, ২৯০, ৩৪২, ৩৯৪, ৪৪৬, ৫১২, ৫৬৪, ৬১৬, ৬৭২	
নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ...	...	৫৭, ১৭৮, ৩৯৩, ৫১১
পতঙ্গ (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ ...	২৯১
পত্রপাঠ (কবিতা) ...	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ...	৬১২
পশুরাজের কবলে (সচিত্র) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্ ...	৬৬
পান্তদা'র উপাখ্যান (গল্প) ...	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ ...	৬৩১
পালোয়ানের কথা (সচিত্র) ...	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৭
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ...	...	৫৭, ১৭৮, ৩৯৩, ৫১১, ৬৬৮
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল ...	...	৫৬, ১৭৮, ৩৩৯, ৫১১, ৬১১
পুরুষস্ত ভাগ্যম্ (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৩৫৮
পূজার ম্যাজিক (সচিত্র) ...	শ্রীদেবকুমার ঘোষাল ...	৪৯৮
প্যারিস্ ও ভার্সাইএর কিছু (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায় ...	৬০৩
ফাল্গুনে (কবিতা) ...	শ্রীফাল্গুনী রায় ...	১০৭
বই ধার দিয়ো না (গল্প) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু, এম্.এ ...	৪৭২
বড়দের ছোট-খবর ...	শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায় ...	৬১৪
বন্ধু (গল্প) ...	শ্রীবিমল দত্ত, এম্.এ ...	২৪, ৫৯৮
বন্ধু-জীবাণু (বিজ্ঞানের কথা) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি ...	২৯
বর্ষার জল (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	ঐ ...	৪২৫
বাঙ্গালী বীর বসন্তকুমার (সচিত্র জীবনী)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম্.এ, বি.এল্ ...	২৪৮
বাগানের বাঘ (গল্প) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৩৩
বাড়ী চুরি (ঐ) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু, এম.এ ...	১১
বার্ণার্ড শ ও জগদীশচন্দ্র (সচিত্র) ...	শ্রীননীগোপাল আইচ ...	৩৬৪
বাংলার গান (কবিতা) ...	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ ...	৬৫
বিচার-সভা ...	...	৬১, ১১৬, ১৭২, ৩৩৫, ৩৯১, ৫৫৬
বিচিত্র ভারত ...	...	৪০৯, ৪৮৯, ৫৪৭, ৬০১, ৬৪০
বিনির জন্মদিনে (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	১৯৬
বিলাতী শিক্ষার প্রথম যুগে (রঙ্গচিত্র) ...	শ্রীশিবপদ ভৌমিক ...	৬০২
বিল্বপত্র (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ ...	৩৬৩
বিষ্টি থামা ভোর (কবিতা) ...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২১৫
বিস্কুটের দেশ (ঐ) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ ...	১৪৭

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
বেঙ (কবিতা) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি. এল্ ...	৩১৬
বেড়াল ছানা ও আমি (কবিতা) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি. এল্ ...	৫১৩
বেণুর জন্মদিন (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৭১
বৈজ্ঞানিক গবেষণা (ঐ) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি. এল্ ...	২১০
ব্যবসায়ে বাঙ্গালী (সচিত্র) ...	...	৫০২
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক ...	...	৫৮, ১১৫, ১৭৩, ২৩২, ২৮৫, ৩৩৬, ৫৫৭, ৬০৯, ৬৬৬
ভেড়াকান্ত (গল্প) ...	মবিনউদ্-দীন আহমদ্ ...	৫৪৪
ভ্যাবাচ্ছিলাম না তো (কবিতা) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি. এল্ ...	৪৮
মণি-মঞ্জুষা ...	...	১০৮, ১৬০, ২৮০, ৫০৭
মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	...	৬৬৮
মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	...	৫৬
মরা চিঠির অফিস (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীহেমলতা দেবী ...	১৭০
মহাযুদ্ধের আর এক দিক্ (গল্প) ...	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী ...	২৪২
মানুষখেকোর মেলায় (সচিত্র) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্ ...	৩১১
মাষ্টারী (সচিত্র) ...	ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল ...	৬১৮
মিশরে পিরামিডের যুগ (ইতিহাসের গল্প)	শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ ...	২১১
মিশরের কথা ঐ ...	ঐ ...	৯৫
মিশরে সাম্রাজ্যের যুগ ঐ ...	ঐ ...	৫১৭
মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি ...	২৪, ৯০, ১৪৫, ২০৬, ২৬৩, ৩২৬, ৩৪৮, ৪২৭, ৫৪৯, ৫৯১, ৬৪১
মেস্মেরিজ্ম্ (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি ...	৫৮৬
যার যেমন অভ্যাস (প্রবন্ধ) ...	শ্রীমিহির রায় ...	৪৯
যুদ্ধের খবর ...	...	৩৯০
রাত দুপুরে টাপুর টুপুর (কবিতা) ...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	৩৪৩
রামধনু (কবিতা) ...	কাদের নওয়াজ ...	১৭৯
রামধনু (ঐ) ...	শ্রীগিরিজাকুমার বসু ...	২৩৯
রামধনুর দু'জন তরুণ লেখক ...	...	৪৯০
রুগ্ন শিশু (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ ...	৬১৭
রুল্ অফ্ থ্রী (ঐ) ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি. এল্ ...	৬১২
রেডিও সব সময়েই রেডি (গল্প) ...	শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী ...	২৭৫
লাইব্রেরী (গল্প) ...	শ্রী— ...	১১৯

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক		পৃষ্ঠা
শক্তিপূজা (বিজ্ঞানের কথা)	...	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি, এম্. বি.	...	৩৬৬
শরৎ ও হেমন্তে বাঙ্গালীর খাদ্য (প্রবন্ধ)		অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি, এস্-সি	...	৪৮৫
শরৎ তুমি এলে (কবিতা)	...	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী	...	৫২৬
শিকার (সত্য ঘটনা)	...	শ্রীমিহির রায়	...	৪৬৮
শিশুসাহিত্য-সংবাদ	...			৫৭, ১১০, ১৬২, ২৮৩, ৪৪১, ৫০৮, ৫৬০, ৬১১, ৬৬৭
শীত ও শীতের শেষে ইয়োরোপ (সচিত্র ভ্রমণ)	...	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	...	৫৩৯
শেষ জবাব (গল্প)	...	শ্রীকরুণা মুখোপাধ্যায়	...	১৪১০
শেষ পাতা (ঐ)	...	শ্রীদীপ্তেন্দ্র সান্যাল	...	৫২
সন্দেশ	...			৬১, ১১৭, ১৭৫, ২৩৪, ২৮৭, ৩৪০, ৩৯২, ৪৪২, ৫০৯, ৫৬১, ৬১২, ৬৭০
সমস্যা ও সমাধান (রঙ্গচিত্র)	...	...	...	৬২৫
সমস্যার সমাধান (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	...	৫৮০
সমুদ্র-তল্লের রহস্য (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	...	২৫২
সংক্ষিপ্ত (গল্প)	...	কুমারী শোভনা সরকার	...	৩৮৭
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন	...	...		৪৯, ১৪১, ৪৩২
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর	...	...		১১১, ২৩১, ৪৮৮
সাপের মুখে (সচিত্র)	...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	...	১৩৮
সাব্‌মেরিন্ কমান্‌ডার (গল্প)	...	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ	...	৫৩২
হরিচরণের জন্মান্তর (ঐ)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	...	৪৭৭
হাতেম-ত্বাই (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায়, বি. এ, কবিশেখর	...	২৫৮
হিমালয় অভিযান (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীনিখিলেশ সেন	...	৫৬৮

Bhattacharyya Library
Bhowanipur
16 Townshend Rd.

তুষার্ত কাশ্মীর

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৬ { ১ম সংখ্যা

গাঁয়ের কুকুর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ভরো, ভুলো, সুখদাস, টাইগার, জো,
কত নাম—কি তাদের আদর বোঝো !
কখনো চেপেছি পিঠে, করেছি ঘোড়া,
লেজে কারো ঝুমঝুমি বেঁধেছি মোরা।
গলে লয়ে বগ্‌লস সহিত ঘুঙুর,—
সোজাসুজি পার হ'ত ভরা এ কুসুর।

শিক্ষিত করিবারে ছিল কত সখ
চেয়েছি গড়িতে 'সেন্ট বারনার্ড্ ডগ্'।

তুষার্ত কাশ্মীর

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৬ { ১ম সংখ্যা

গাঁয়ের কুকুর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ভরো, ভুলো, সুখদাস, টাইগার, জো,
কত নাম—কি তাদের আদর বোঝো !
কখনো চেপেছি পিঠে, করেছি ঘোড়া,
লেজে কারো ঝুমঝুমি বেঁধেছি মোরা।
গলে লয়ে বগ্‌লস সহিত ঘুঙুর,—
সোজাসুজি পার হ'ত ভরা এ কুমুর।

শিক্ষিত করিবারে ছিল কত সখ
চেয়েছি গড়িতে 'সেন্ট বারনার্ড্ ডগ্'।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

লণ্ঠন মুখে দিয়ে টেনেছি পথে,
শিক্ষা দেবই দেব যে কোন মতে।
হেলা করে নিজেদের শিক্ষা ও পাঠ,
তাদেরে শিখাতে সে কি চেষ্টা বিরাট!

৩

সার্কাসে কুকুরের খেলা দেখি, রাম
গ্রামের কুকুরগণে দিত না বিরাম।
সব দিকে তাহাদের হিত-পিয়াসী—
পিটায়েছি করিবারে নিরামিষাশী।
চোখে তাহাদের যাহা পেতাম আভাস,
না শিখুক, ছিল খুব শিখিবার আশ।

৪

সাথে লয়ে কুকুর, হাতে লয়ে তীর
শঙ্কা ছিলাম মোরা খেঁকশিয়ালীর।
ব্যসনে ও উৎসবে, চড়ুই-ভাতে,
সাথী তারা দিবসেতে—প্রহরী রাতে।
গ্রামেতে ঢুকেছি যবে রাতি দু'পহর
দু'মাইল্ হ'তে শোনা যেত চেনা স্বর।

৫

ছেলেরা এখন বুড়া—সে কুকুর দল
বহু দিন আগে গেছে ছেড়ে ধরাতল!
কাছে এসে লেজ নাড়া সে কি কাকুতি—
সব ছেলেদের টান তাদের প্রতি।
তাহাদিকে স্মরি' আজ চোখে আসে জল,
যা ছিল সুলভ অতি, আজি তা বিরল।

৬

তাড়াইলে সরিত না আহা যাহারা,
আজি তারা ডাকিলেও দেয় না সাড়া।
তাহাদের লাগি মন কি যে করে মোর—
সঙ্গী মোদের ছিল রোদ্ পোহান'র।
যুধিষ্ঠিরের মত ভাগ্য হ'লে—
সঙ্গে নিতাম সেই কুকুর দলে।

'দৈবাৎ'

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ)

সহরের সেরা সরকারী হাসপাতাল।

সন্ধ্যা হ'তে সামান্য দেরী আছে। রোগীদের সঙ্গে সাময়িক সাক্ষাতের জন্য মেয়ে-পুরুষের ভীড় তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাল মোটর ফটক পার হ'য়ে কম্পাউণ্ডের ভেতর প্রবেশ কর্‌ল। ডাঃ দত্তগুপ্ত জনৈক হাউস্ সার্জ্জেন্‌এর সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন, মোটরটা এসে সিঁড়ির নীচে দাঁড়াতেই তিনি ত্রস্তপদে নেমে এলেন। ঐ লাল মোটরের মালিক আর কেউ নন্, স্বয়ং সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ঘোষ—যাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত গবেষণা ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশের গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গাড়ী থেকে নেমে ডাঃ ঘোষ বল্‌লেন, "একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি ডাঃ গুপ্ত।"

ডাঃ গুপ্ত বিগলিত কণ্ঠে বল্‌লেন, "হ্যাঁ বলুন, আমার যতটা সাধ্য আমি অবশ্যই কর্‌ব।"

"আর কিছু নয়, একটা বিশেষ এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের জন্য আমার একটা "টাটকা মৃতদেহ" দরকার।"

"এই শুধু—?"

"হ্যাঁ, এবং সেটা যত শীগ্‌গির হয় ততই ভালো। আর কি জানেন ডাঃ গুপ্ত, পেট-পচা ছোট জাতের মরাটরা হ'লে চলবে না আমার। জানেন তো—"

ডাঃ গুপ্ত হেসে বল্‌লেন, "আপনি খুব ভাগ্যবান্ বল্‌তে হবে।……বোধ হয় ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই একটী সুদর্শন এবং সম্ভ্রান্ত যুবকেরই মৃত্যু আসন্ন, এখন সিংকিং ষ্টেজ্, তবে সন্ধ্যা পার হবে কিনা সন্দেহ—"

—"কিন্তু—"

"না, সে ভয় নেই। রোগীর কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায় নি। বেচারা রাস্তায় পড়ে ধুঁকছিল…"

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে তাঁরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। ডাঃ দত্তগুপ্তের ইঙ্গিতে ডাঃ ঘোষ থমকে দাঁড়ালেন—৪৬নং বিছানার পাশে।

একহারা লম্বা সুন্দর চেহারার একটী যুবক ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আসন্ন মৃত্যুর ম্লান ছায়া আত্মপ্রকাশ করেছে তার মুখে-চোখে—সর্ব্বাঙ্গে। হ্যাঁ, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের সন্তান বলে সহজেই অনুমান হয় বটে। দৈবদুর্ব্বিপাকে আজ সে সরকারী হাসপাতালে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় মুহূর্ত্ত গুণছে।

ডাঃ ঘোষের পছন্দ হ'ল।

"কিন্তু"—বাইরে বারান্দায় আসতে আসতে তিনি বল্‌লেন—"কিন্তু, আমার যে এত শীগ্‌গিরই চাই নে ডাঃ গুপ্ত। আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি একটু বাইরে বেরুচ্ছি; ফিরতে সেই কাল সন্ধ্যে। ততক্ষণ—"

"বিলক্ষণ। না হয় ততক্ষণ একটা কিছু 'ষ্টিম্যুলেণ্ট্ কর্ডিয়েল' দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। মাত্র ২৪ ঘণ্টা তো? তা সেটুকু আপনার জন্য আমি করে দিতে পারব বলে আশা রাখি।"

"অজস্র ধন্যবাদ"—বলে ডাঃ গুপ্তের কাছে বিদায় নিয়ে ডাঃ ঘোষ গিয়ে তাঁর মোটরে উঠলেন। প্রকাণ্ড লাল মোটর প্রকাণ্ড ফটক পার হয়ে ছিটকে পড়্‌ল প্রশস্ত রাজপথে।

* * * *

সন্ধ্যা ৭টা।

নার্সদের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ডেকে ওষুধের ও পথ্যের পরামর্শ দেন ডাঃ গুপ্ত। কেবল ৪৬নংএর মরণাপন্ন রোগীটির জন্য তিনি নিজেই একটা 'কর্ডিয়েল'এর ব্যবস্থা করেন। নিজ হাতে পরমযত্নে তাকে ওষুধ খাইয়ে দেন তিনি।…কত কৃতজ্ঞ থাকবেন ডাঃ ঘোষ তাঁর কাছে।……

কিন্তু আশ্চর্য্য কাজ করে সেই কর্ডিয়েল! সমানে ছ' ঘণ্টা ধ'রে সুগভীর সুষুপ্তি ভোগ করে সেই ভাগ্যবান্ রোগী।

* * * *

পর দিন সকাল বেলা দেখা যায়, তার দেহের উপর থেকে আসন্ন মৃত্যুর ম্লানিমা অপসৃত হয়েছে; নবজীবনের নূতন স্পন্দন জেগেছে তাঁর মুখে-চোখে—সর্ব্বাঙ্গে।

অধীর আগ্রহে অগ্রসর হন ডাঃ গুপ্ত ৪৬নং বেড্-এর দিকে।

আশ্চর্য্য! পরমাশ্চর্য্য! লোকটা কখন নিজেই ঘুম থেকে উঠে সোজা ব'সে আছে। খুক্ খুক্ ক'রে কাসছে বটে, কিন্তু সে ক্লান্তি আর যেন নেই! থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখেন—জ্বর নেই বল্‌লেই চলে। গায়ে হাত দিয়ে দেখেন—অবাক্ কাণ্ড! সমস্ত গ্লানি যেন ওর গা থেকে ঝ'রে পড়েছে। পাঁজরার নীচে সেই ব্যথাটা আর বোধ করে না সে! একটা আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর ভাঙ্গা বুকের ভেতর থেকে।…একটু হাসির রেশ ফুটে ওঠে ওর চোখের কোণে—তৃপ্তির, মুক্তির একটু সহজ শোভন ইঙ্গিত।

"ডাক্তার বাবু"—ডাঃ গুপ্তকে সম্বোধন করে বলে উঠে রোগী, "কী ওষুধটাই যে দিলেন কালকে! আহ্! যেন নূতন জীবন ফিরে পেয়েছি! আজ দু' বছরের ভেতর এমন আরামে এমন নিবিড় ঘুম ঘুমুইনি, সত্যি।"

"সত্যি!" ডাঃ গুপ্তের মুখ থেকে কথাটা ছিটকে বেরিয়ে আসে যেন। মুখের উপর দিয়ে তাঁর হঠাৎ কী একটা গুরু বিষণ্ণতার ছায়া খেলে যায়।

"সত্যি"। হেসে বলে রোগী, "আর একটী 'দাগ' ডাক্তার বাবু,—মনে হয়, তা হ'লেই আমি উঠে এখান থেকে দৌড়ে পালাতে পারব।" ডাঃ গুপ্তের প্রতি করুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোকটা।

"কিন্তু"—ডাঃ গুপ্ত হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন—"কিন্তু ডাঃ ঘোষ কী যে ভাববেন!……"

"য়্যাঁ, ডাঃ ঘোষ? কোন্ ডাক্তার ঘোষ? কার কথা বল্‌ছেন আপনি ডাক্তার বাবু?"

"ন্-না-নাঃ—ওই এমনি"—হাতের আঙ্গুলে থুত্‌নিটা ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বলে চলেন ডাঃ গুপ্ত। তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডলে নেমে আসে যত রাজ্যের চিন্তা আর বিমর্ষতার ভার।

"ডাক্তার বাবু!" সন্ত্রস্ত স্বরে ডাক দেয় রোগী—"আপনাকে আজ যেন বড্ড বিরক্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু কেন? আজ আমি আপনার ওষুধের গুণে নবজীবন পেলাম—অথচ আপনিই—"

"না—না"—ডাঃ গুপ্ত শুষ্ক হেসে বলেন—"এ সব কিছু না—ও এমনিই—"

কিন্তু এর পর প্রতি ঘণ্টায় একবার ক'রে ডাঃ গুপ্ত পরম ব্যস্ত হ'য়ে ৪৬ নং বেড্-এর কাছে আসেন, আর শুষ্কমুখে একই প্রশ্ন করেন—"কেমন, মশাই, কি রকম লাগছে এখন? একটু—"

"ভালো—খু-উ-ব ভালো, ডাক্তার বাবু—"

ব্যগ্র ব্যাকুলতায় বলে উঠে রোগী। কৃতজ্ঞতায় করুণাশ্রু উছ্‌লে ওঠে তার দুই চোখে।

গম্ভীর মুখে ঘুরে যান ডাঃ গুপ্ত। "যদি এমনি ভাবে চলে"—অফিসের দিকে চলতে চলতে মনে মনে বলে চলেন তিনি—"তা হ'লে ডাঃ ঘোষের জন্য 'ঠেকিয়ে রাখা'টা দায় হবে দেখছি।"

* * * *

সত্যিই দাঁড়াল তাই। সন্ধ্যার মুখে প্রশস্ত ফটক পার হয়ে সেই প্রকাণ্ড লাল গাড়ীটা এসে দাঁড়াল সিঁড়ির নীচে।

ডাঃ গুপ্ত তাঁর অফিসেই বসে ছিলেন। ডাঃ ঘোষ ঘরে ঢুকেই বল্‌লেন, "কেমন ডাঃ গুপ্ত, সব ঠিক আছে ত? আমার সেই "মরা" কই?"

ডাঃ গুপ্ত এতক্ষণ এরই জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। কোন রকমে বল্‌লেন, "নাঃ, মরা-টরা আর নেই।"

"নেই! কি রকম?"

"সে তো আপনারই ত্রুটী, ডক্টর ঘোষ।" "লোকটা তো মরতেই প্রস্তুত ছিল—ম'রে যেতও কালকে সন্ধ্যে নাগাদ্,—কিন্তু আপনারই জন্যে ওর মন গেল বদ্‌লে।"

ডাঃ ঘোষের বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়ছিল। তিনি শুধু বল্‌লেন, "তার মানে?"

"মানে, আপনাকে নেক্‌স্‌ট্ চান্স্-এর জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, ডাঃ ঘোষ। সত্যি, দেখুন, আপনার কেন যে কালই বাইরে বেরোবার প্রয়োজন হ'ল, জানি নে। অথচ যত গোল বাধল ঐতেই। আপনি বাইরে না গিয়ে কালই চাইলে আমি কি এতটা ক'রে 'কর্ডিয়েল' দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রাখতে যেতাম? আর ঐ কর্ডিয়েলই হ'ল যত মুশ্‌কিলের গোড়া। হ্যাঁ, একটা 'ডোজ' খেয়েই রোগী যে এমন রাতারাতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে তা কে জানত? ব্যস্, এখন আর মরবার নামটা নেই! ভাবুন ব্যাপারটা!—অনুযোগের সুরে শেষ করলেন ডাঃ গুপ্ত।

ডাঃ ঘোষ কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লেন, "না না, এ তো ভাল খবর। এতে মনে করার কি আছে? আহা, বেচারা—"

ডাঃ ঘোষ সত্যি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন কিনা জানা যায় নি তবে সে যাত্রা তাঁকে "নেক্সট চান্স"এর জন্যই অপেক্ষা করতে হ'ল।*

পালোয়ানের কথা

(শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

গত মাসের রামধনুতে অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তোমাদের পালোয়ান যদু সিং-এর কথা বলিয়াছিলেন। যদু সিং সামান্য পালোয়ান—কিন্তু আমি জানি, তাহারই কাহিনী তোমরা কেমন আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়াছ। বড় বড় পালোয়ানের কাহিনী শুনিলে বাস্তবিকই তাঁহাদের সম্ভ্রম না করিয়া পারা যায় না। রামমূর্ত্তি, ভীম ভবানী, গামা, গোলাম, শ্যামাকান্ত প্রভৃতি আমাদের দেশের গৌরব। ইঁহাদের অপরিসীম শক্তির কথা তোমরা কল্পনাই করিতে পারিবে না।

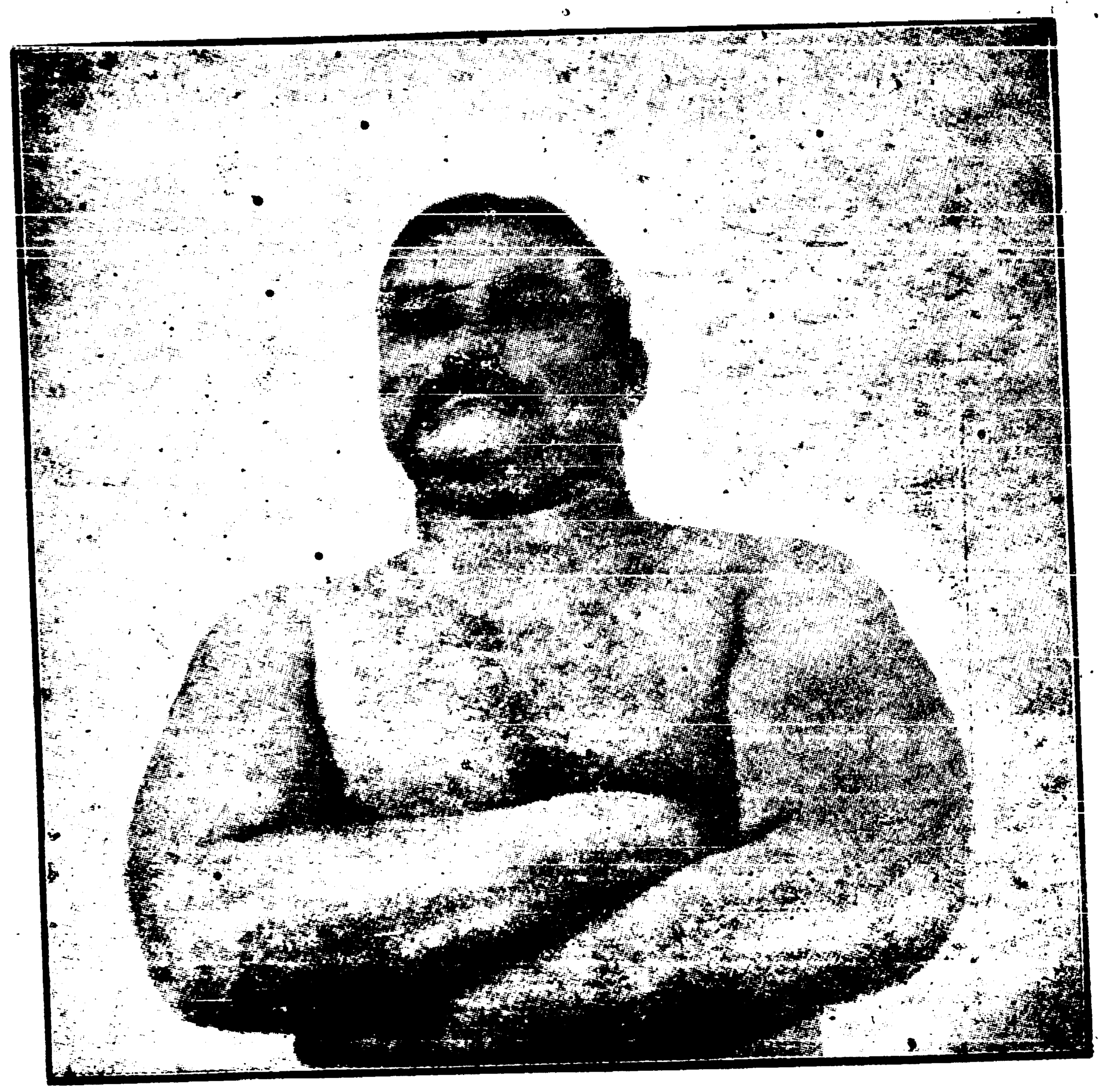

বাংলার একজন বিখ্যাত পালোয়ান—ভীম ভবানী

* বিদেশী গল্পের ছায়ায় লেখা।

আমারও এককালে কুস্তির দিকে বেশ একটু ঝোঁক ছিল। অর্থাৎ আমিও একটি ছোটখাট পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার ওস্তাদ্ (গুরু) সাহাবুদ্দীন বর্দ্ধমানের মহারাজের পালোয়ান ছিলেন। ঐ কালে রাজা-মহারাজাদিগের কুস্তির প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁহারা নিজেরা প্রত্যেকে দুই-এক জন পালোয়ান রাখিতেন; নিজেরাও কুস্তি শিখিতেন এবং নানা উপায়ে পালোয়ানদিগকে উৎসাহিত করিতেন। কলিকাতার গুহ বাবুরা জমিদারি ও পালোয়ানী দুই-ই করিতেন। ঐ বংশের গোবর বাবু একজন বিখ্যাত পালোয়ান।

সাহাবুদ্দীন শুধু যে কুস্তির কায়দাতেই পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার

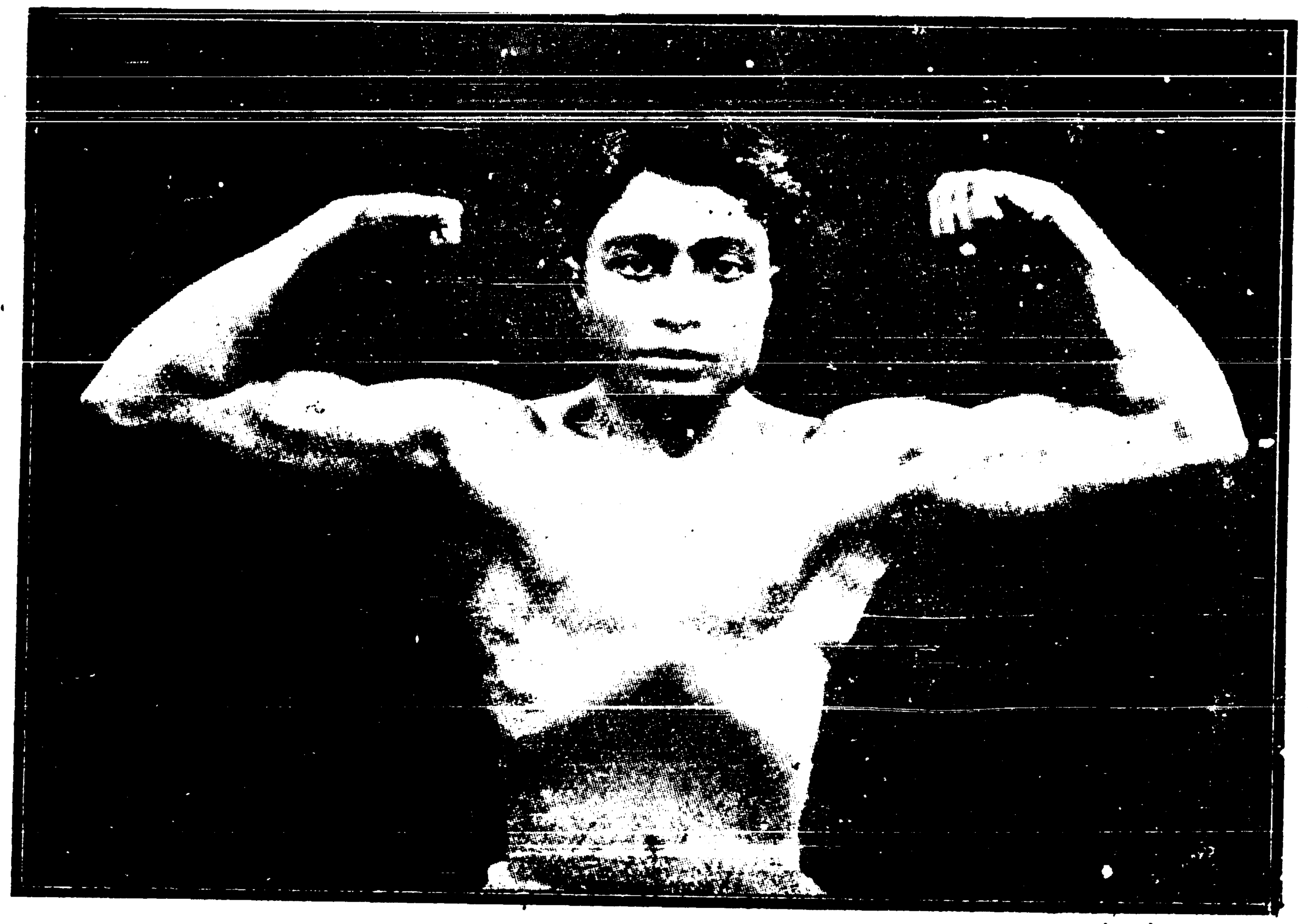

তরুণ বাংলার গৌরব—বিষ্ণু ঘোষ

শক্তিও প্রচুর ছিল। আমাদের বাঙ্গালী-মহলে তাঁর বেশ বলবান্ বলিয়া খ্যাতি ছিল। সাহাবুদ্দীনের কাছে আমরা অসহায় বালকের ন্যায়ই অসহায় হইয়া পড়িতাম--এমনই ছিল তাঁহার মাংসপেশীগুলির প্রচণ্ড শক্তি! সাহাবুদ্দীনের দমও

খুব ছিল। দম ঠিক রাখিবার জন্য তিনি একটা দীঘির চারি পাশে ৬০ বার করিয়া দৌড়িতেন। বর্দ্ধমানের দীঘির মত বড় পুষ্করিণী বাংলা দেশে বেশী নাই।

সাহাবুদ্দীন খুব ভোর রাত্র থাকিতে উঠিয়া কিছু না খাইয়াই কসরৎ আরম্ভ করিতেন। কসরৎ—ডন, বৈঠক, কুস্তি লড়া ও কুস্তি শেখান। তিনি খুব ভাল শিক্ষক ছিলেন। অন্য পালোয়ানের সহিত লড়িতে গেলে তাহারা লাগাইয়া দিত কিন্তু সাহাবুদ্দীন তাহা করিতেন না। একদিনকার ঘটনা মনে পড়িতেছে। তাঁহার সহিত লড়িবার সময় একদিন তিনি আমাকে তুলিয়া আছাড় দিলেন। ভাবিলাম খুব আঘাত লাগিবে; কিন্তু এমনি কায়দায় ফেলিলেন যে কিছু মাত্র আঘাত লাগিল না।

এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কসরতের (exercise) পর তিনি খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। তার পর সরবং খাইতেন—বাদামের সরবং। আধসেরটাক বাদাম একটা পাত্রে একটা কাঠের লাঠি দিয়া অল্প একটু জলসহযোগে ঘুটিয়া খুব মিহি করিয়া পেষাই করা হইত। উহার দুগ্ধ অংশটা ছাঁকিয়া লওয়া হইত। এই বাদামের দুধের সহিত চিনি ও জল মিশাইয়া সরবৎ তৈয়ারী হইত। আমরাও বাদামের সরবৎ খাইতাম—উপাদেয় পানীয়! সাহাবুদ্দীন বলিতেন বাদাম খাইলে হৃদয়যন্ত্র সবল হয়, দম বাড়ে।

দুপুর বেলা সাহাবুদ্দীন মাংস ও রুটী আহার করিতেন। আধ পোয়া তিন ছটাক মাংস ও খান দুই রুটী। মাংস ও রুটী দু'টিতেই প্রচুর ঘি থাকিত।

বেলা দু'টা তিনটার সময় সাহাবুদ্দীনের দেহে তৈলমর্দ্দন আরম্ভ হইত। প্রচুর তেল শরীরে লেপন করা হইত এবং দুই জন বলবান্ লোক ঘণ্টা দুই ধরিয়া মালিস করিয়া ঐ তেল তাঁহার শরীরে শুষিয়া দিত। আয়ুর্ব্বেদেও বলে তেল 'মালিসেই' বেশী বল হয়, তেল 'খাইলে' নহে।

বিকালে সাহাবুদ্দীন অল্প কসরৎ করিতেন। তার পর সূপ খাইতেন। কতকগুলি হাড় ঘণ্টা তিন চার ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সূপ প্রস্তুত হইত।

রাত্রে তিনি দিনের মতই খাইতেন। তাঁহার অল্পাহার দেখিয়া আমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ওস্তাদজী, এত কম খাও কেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "বেশী খাইলে মোটা হইয়া পড়িব।"

ঘি তিনি একটু বেশী খাইতেন—দিন দেড় পোয়া আন্দাজ; তবে বাজি লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে এক সের পর্য্যন্ত ঘি বাড়াইতেন। তাঁহার ধারণা ছিল ঘি পাকযন্ত্রের অবস্থা ভাল রাখে। দুধ বা ফল তিনি বিশেষ খাইতেন না।

এই সময়ে বর্দ্ধমানে প্রসিদ্ধ গোলাম পালোয়ান আসেন। তিনি দিন চারেক ছিলেন। আমাদের তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। অমন ভদ্র ও নম্র স্বভাব দেখি নাই। আমরা গিয়াছি দেখা করিতে। মেঝেয় একখানি পাৎলা চাদর বিছান; তদুপরি পালোয়ান বসিয়া মালা জপিতেছেন। নিকটে উৎকৃষ্ট গালিচা পাতা—অভ্যাগতদের জন্য। আমাদের অতি সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন—গালিচায় বসিতে নির্দ্দেশ করিলেন। আমরা ইতস্ততঃ করিতেছি—অত বড় লোক মাটিতে বসিয়া, আমরা গালিচায় বসি কি করিয়া? তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন, "আমি গোলাম, আমার এই-ই চাল।"

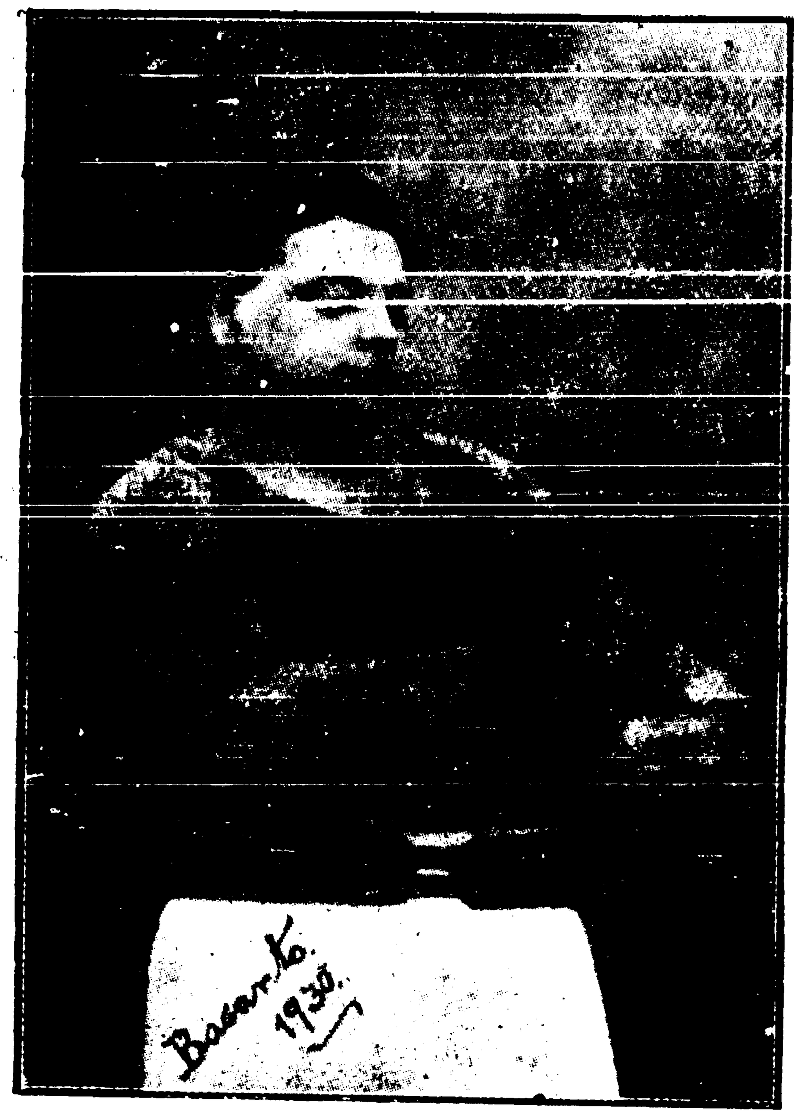

নবীন বাংলার আর একজন ব্যায়ামবীর—বসন্তকুমার

গোলামের খাওয়া-দাওয়া ছিল প্রায় সাহাবুদ্দীনেরই অনুরূপ। তবে তিনি বাদাম আরও বেশী খাইতেন। সকালে প্রায় এক সের বাদামের সরবৎ। দ্বিপ্রহরে রুটী, মাংস—প্রচুর ঘি-যুক্ত; ঘি তিনি চুমুক দিয়া খাইতেন। বিকালে সের পাঁচেক হাড়-মাংস সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত সূপ। রাত্রে রুটী, মাংস। ইনি মেওয়া অল্প খাইতেন।

বাড়ি চুরি

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

পুরোনো বালিগঞ্জ পাড়ায় পুরোনো একটা বাড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। বাবার দূরদৃষ্টি ছিলো; পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে সন্ধ্যের আগেই শেয়াল ডাকতো সেখানে জলের দরে জমি কিনে একটি বাগানবাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছিলেন। আজ সেই শেয়াল-সঙ্কুল গ্রাম কলকাতার সব চেয়ে ফ্যাশনেবল পাড়ায় রূপান্তরিত; আর বাড়িটি যদিও সেকেলে ধরণের, তবু বাগানকে টেনিস-লনে পরিণত ক'রে, আর গোটা চারেক বিলিতি বাথরুম বসিয়ে মাসে শ' চারেক টাকা ভাড়া অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছিলো।

শেষ ভাড়াটে ছিলো এক আধা-বুড়ো সায়েব। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধ'রে অসহায় ভারতবাসীর রক্ষণাবেক্ষণ করবার পর একদিন তাঁর সময় এলো তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বদেশে ফেরবার। এক মাস আগে যথারীতি নোটিশ পাওয়া গেলো।

লেগে গেলুম অন্য ভাড়াটের তল্লাসে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হ'লো, চেনাশোনা বন্ধু-মহলেও খোঁজখবর নিতে লাগলুম। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নতুন ভাড়াটে খুঁজে বের করবার গরজের আরো একটু কারণ আমার ছিলো; কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে হয়দ্রাবাদে, বছরখানেকের মধ্যে ফেরা হবে না। যাবার আগে বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করাই দরকার।

বাড়িটা অনেকেই দেখতে এলেন, কিন্তু সকলেই ফিরে গেলেন। বড্ড নাকি 'ওল্ড্-ফ্যাশণ্ড' আমার বাড়ি। আয়তন আছে বটে, আরাম নেই। নিরুপায় হ'য়ে চড়া দামের জায়গা নিয়ে বিজ্ঞাপন চালালুম, ভাড়াটে চাই-ই।

গমনোদ্যত সায়েবটির জন্য ভারি মন-খারাপ লাগলো। বাড়িটায় দশ বছর ছিলো লোকটা, আর আমিও দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিলুম; অবিলম্বে যে ভারতের প্রতি তার কর্ত্তব্য শেষ হবে সে কথা মনেই হয় নি। একদিন গেলুম সায়েবের কাছে বিদায় দিতে। আমাকে দেখে হাতে ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বসালেন; তার পর উপস্থিত গ্রীষ্মাধিক্য সম্বন্ধে দু' একটা মন্তব্য-বিনিময়ের পর কাজের কথা পাড়লুম।

—'দ্যাখো, সায়েব, তুমি তো ঠাণ্ডা দেশে পালিয়ে বাঁচবে, তার আগে তোমার মতো আর একটি ভাড়াটে যদি জুটিয়ে দিতে পারো বড় উপকার হয়।'

সায়েব বললেন, 'দেখবো আমার বন্ধুদের ব'লে। কিন্তু জানো কী, সোম, আমি সেকেলে

বুড়োমানুষ, আমার এখানে এক রকম কেটে গেছে, কিন্তু আজকালকার ছোকরাদের পছন্দ অন্য রকম। কম ভাড়ার ব্রাইট লিট্‌ল্ ফ্ল্যাটের উপরেই ওদের নজর। আমার অনেক বন্ধুই এখানে এসে বলে—হোয়াট্ এ গ্লুমি ওল্‌ড্ প্লেস্! বাড়িটা ভেঙে আবার যদি তৈরি করতে পারো—'

আমি বল্‌লুম, 'তা পারলে তো কথাই ছিলো না।'

সায়েব বল্‌লেন, 'দ্যাখো, একটা কথা। আমার ফার্নিচার সব বেচে দিচ্ছি, তুমি কিনবে? লট্-এ নিলে শস্তা পড়বে খুব।'

'আমি তো হয়দ্রাবাদ চলে যাচ্ছি সামনের মাসে।'

'সে তো আরো ভালো। ব্যাপারটা কী-রকম হবে জানো? তোমার বাড়ি যে-রকম সাজানো-গুছোনো দেখছো তাই থাকবে, রিফ্রিজিরেটার, রেডিয়ো, গ্রামোফোন, বইপত্তর সব সুদ্ধ। এ-রকম একটি ফার্নিশ্‌ড্ বাংলো পেলে অনেকেই লুফে নেবে, ভাড়াও তুমি টেন্ পর্সেন্ট বাড়িয়ে দিতে পারবে অনায়াসে। কী বলো?'

সায়েবের কথাটা নেহাৎ মন্দ লাগলো না। সত্যি, একেবারে সাজানো-গুছোনো বাড়ি পেলে এর সেকেলেত্ব সত্ত্বেও ভালো ভাড়াটে জোটা হয়তো সম্ভব। মনের ভাব চেপে গিয়ে বল্‌লুম, "কিন্তু টাকাও তো কম ফেলতে হবে না।'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ফর এ সং পেয়ে যাবে সব। আমার সব জিনিস ল্যাজারসের তৈরি, ইচ্ছে করলে তুমি খোঁজ নিতে পারো। সব মিলে পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল আমার ঘরে আছে; ক্যাশ ডাউন দশ হাজারে দিয়ে দিচ্ছি—এর চেয়ে শস্তা কী আর হ'তে পারে! ভাড়া যা বেশি পাবে তাতে এ টাকা উঠে আসতে চার বছরও তোমার লাগবে না। আর তার পরে ব'সে-ব'সে মাসে-মাসে মুনফা টানবে—কিচ্ছু ভেবো না, প্রত্যেকটি জিনিস এমনি টেঁকসই যে এক জীবন এরা স্বচ্ছন্দে টিঁকবে। রাজি?'

আমি বল্‌লুম, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'চলো, তোমাকে জিনিসগুলো একবার দেখিয়ে আনি। দেখলেই বুঝবে, এ একটা বার্গেন বটে!'

দেখলুম সব আসবাব। এন্তার জিনিস, সত্যি মূল্যবান্, একটি ধনী পরিবারের যা-কিছু দরকার হ'তে পারে, কিচ্ছু বাদ নেই। 'দু'শো গ্রামোফোনের রেকর্ড আর ১০৮৭ খানা বই ফাউ দিয়ে দিচ্ছি,' সায়েব বল্‌লেন। 'তুমি সব একসঙ্গে কিনে নিলে আমার হাঙ্গামা বেঁচে যায়, আর তোমার আয়ের পথ খোলসা হয়। এমন কি, তুমি যদি জিনিসগুলো একটা-একটা ক'রে ফের বিক্রি করো তা হ'লে ক্লীন ফিফ্‌টি পর্সেন্ট লাভ অনায়াসেই থাকবে।'

রাজি হ'য়ে গেলুম। চলে আসবার আগে সায়েব আর একবার হাত ঝাঁকুনি দিলেন, তা ছাড়া আমার হাতে শেষ মাসের ভাড়া বাবদ চেক্‌টিও তুলে দিতে ভুললেন না। দু' দিন পরে দশ হাজার টাকার (একটি পয়সাও কমানো গেলো না) একটি চেক্-এর বিনিময়ে টমাস টেলর সায়েবের যাবতীয় আসবাবপত্র হ'লো আমার। পরের দিনই 'কমপ্লীটলি ফার্নিশ্‌ড্' বাংলোর বিজ্ঞাপন বেরুলো কাগজে।

বলতে সুখী হচ্ছি, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভাড়াটে জুটলো।

প্রকাণ্ড গাড়ি হাঁকিয়ে ভদ্রলোক নিজেই আমার ঠিকানায় এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই বল্‌লেন, 'আপনার একটা বাড়ি খালি আছে মে-ফেয়ারে?'

আমি বল্‌লুম, 'আছে। আপনি…'

কিন্তু আমার কথা শেষ না হ'তেই তিনি আবার বল্‌লেন, 'বাড়িটা একবার দেখা যায়?'

'তিরিশ তারিখে খালি হবে। তখন দেখবেন।'

ভদ্রলোক একটা অধৈর্য্যসূচক শব্দ ক'রে বল্‌লেন, 'তিরিশে! আচ্ছা, তিরিশে সকালেই আমি দেখতে চাই।'

'আসবেন সকাল বেলায়।'

'বাড়ি পছন্দ হ'লে আমি এক্ষুণি নেব—বেশিদিনের জন্যেই নেব—আর-কাউকে কথা দিয়ে ফেলবেন না যেন। বুঝলেন? আমার নাম বল্লভ চৌধুরী, রূপডাঙার জমিদার।'

'সেটা কোথায়?'

'বাঃ, রূপডাঙার নাম শোনেন নি? বর্দ্ধমানের রাজার নাম শুনেছেন আশা করি? আমাদের আর ওঁদের পাশাপাশি জমিদারি।…আচ্ছা, উঠি আজকে।' প্রকাণ্ড লম্বা কোঁচা সামলে ভদ্রলোক যে কী ক'রে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন, অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে দেখলুম। প্রায় একটা সার্কাসের কসরৎ! হ্যাঁ, জমিদার বাবু বটে!

ইতিমধ্যে আরো দু'-একটা খোঁজ-খবর এলো, টেলর সায়েব বম্বে মেল্-এ চাপলেন, আর তিরিশ তারিখ সকাল ঠিক সাড়ে-আটটায় আর একখানা জমকালো গাড়ি নিয়ে বল্লভ বাবু এলেন। নিয়ে গেলুম তাঁকে বাড়ি দেখাতে, এবং বাড়িখানা তাঁর পছন্দই হ'লো। আসবাবগুলোর প্রতি ঈষৎ তাচ্ছিল্যের একটা দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, 'মন্দ নয় এক রকম, কাজ চ'লে যাবে। তা ভাড়া?'

আমি সাহস ক'রে বল্‌লুম, 'পাঁচশো, আর দু' বছরের গ্যারান্টি।'

'পাঁচশো…হুঁ…'

আমি বল্‌লুম, 'আপনি বলেছিলেন ব'লে আর কারো সঙ্গে কথাও বলি নি।'

'আচ্ছা, গ্যারান্টি দিচ্ছি দু'-বছরের, সাড়ে চারশো ক'রে দিন।'

বেশি টানতে গেলে পাছে ছিঁড়ে যায় সেই ভয়ে আর কোন কথা বললুম না। তক্ষুণি আমার বাড়িতে ফিরে এসে কাগজপত্র সই করা হ'লো। তার পর বল্লভ বাবু বললেন, 'দেখুন, একটা কথা। ভাড়া আপনাকে আমি ছ' মাসের আগাম দিয়ে দিচ্ছি। ও-সব মাসে-মাসে ভাড়া-ফাড়া দেয়ার হাঙ্গামা আমার পোষায় না—বুঝলেন না, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ টু বি বদার্ড্। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, ছ' মাস পরে আমি আবার ছ' মাসের ভাড়া পাঠিয়ে দেব।'

মনে-মনে দারুণ উল্লসিত হলুম, কিন্তু মনের ভাব বাইরে প্রকাশ না করবার চেষ্টা ক'রে বললুম, 'বেশ তো। এ-ব্যবস্থায় আমার সুবিধেই হ'লো, কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই আমি চ'লে যাচ্ছি হয়দ্রাবাদ।'

'ও, তাই নাকি? কদ্দিন থাকবেন সেখানে?'

'বছরখানেক তো বটেই।'

'তা আর কী হয়েছে—কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার বাড়ির যত্ন আমি নিজের বাড়ির মতোই নেব। এখানে আপনার গোমস্তা-টোমস্তা কেউ আছে নাকি?'

'এখনো তো কাউকে ঠিক করি নি।'

'আমি বলি কী, মশাই, মিছিমিছি একটা লোককে মাইনে দেবেন কেন? ভাড়া তো আপনি আগামই পেয়ে যাচ্ছেন,' ব'লে ভদ্রলোক পকেট থেকে চেক্-বই বার ক'রে সাতাশ শ' টাকার একটি চেক্ আমার নামে লিখে দিলেন। আমার মৃদু-উচ্চারিত ধন্যবাদ অগ্রাহ্য ক'রে বললেন, 'জুন থেকে নবেম্বর পর্য্যন্ত দেয়া হ'য়ে গেলো। ডিসেম্বরের—এই দোসরার মধ্যে পরের ছ' মাসের ভাড়া আপনার কাছে পৌঁছে যাবে—যদি না যায়, তা হ'লে দয়া ক'রে একখানা পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিলেই—বোঝেন তো, ব্যস্ত মানুষ, হয়তো মনে থাকলো না।'

ভদ্রলোকের অমায়িকতায় ও উদারতায় আমি ততক্ষণে প্রায় বিহ্বল। ভালো ক'রে কোন কথাই বলতে পারলুম না। আরো দু'-চার কথার পরে বল্লভ বাবু আমার হয়দ্রাবাদের ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বিদায় নিলেন।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। এমন চমৎকার ভাড়াটে, আর তাও ছ' মাসের আগাম ভাড়া—টাকাগুলো কলকাতা ছাড়বার মুখে খুবই কাজে লাগবে। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, প্রফুল্ল ও হালকা মন নিয়ে হয়দ্রাবাদ যাত্রা করলুম।

* * * *

নবেম্বরের পনেরো তারিখ নাগাদ, অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে, আমি বল্লভ-বাবুকে অত্যন্ত বিনীত একখানা চিঠি লিখে জানালুম যে তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো আর ছ' মাসের ভাড়া যদি এখন

পাঠিয়ে দেন তা হ'লে বিশেষ বাধিত হ'বো। ডিসেম্বরের দু'তারিখের মধ্যেই টাকাটা পাঠাতে সত্যি-সত্যি তাঁর মনে থাকবে, এ অবশ্য আমি আশাও করি নি।

একদিন দু' দিন ক'রে মাসখানেক কেটে গেলো; চিঠির কোন জবাব এলো না। ভাবলুম, ভদ্রলোক হয়তো কলকাতার বাইরে আছেন, তা ছাড়া এই সামান্য টাকার জন্যে বার-বার তাঁকে বিরক্ত করাও লজ্জার ব্যাপার। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তাঁকে জানালুম যে ছ' মাসের ভাড়া একসঙ্গে দেবার ব্যবস্থা তাঁর আর মনঃপূত না হ'লে মাসে-মাসেই যেন দেন, এবং ডিসেম্বরের ভাড়াটা সুবিধেমতো পাঠিয়ে দিলে বাধিত হ'বো।

সে-চিঠিরও কোন জবাব এলো না।

ভয় হ'লো, আমার পৌনঃপুনিক তাগিদে ভদ্রলোক বুঝি বিরক্তই হয়েছেন। এমন চমৎকার লোক, ছ' মাসের ভাড়া ফেলে রাখলেই বা কী! তবু মার্চ্চ মাসে আর একখানা চিঠি লিখে জানালুম যে এই তিন মাসের ভাড়ার সামান্য অংশও যদি তিনি এখন দয়া ক'রে পাঠান তা হ'লে আমার উপকার হয়। কিন্তু বল্লভ বাবু একেবারেই চুপ।

এর পরে আমি আর চিঠি লেখা দরকার কি সঙ্গত মনে করলুম না। ভাবলুম, একেবারে কলকাতায় গিয়েই টাকাটা নেবো।

যে-কাজ নিয়ে হয়দ্রাবাদ এসেছিলুম, এক বছরের আগে ছুটি মিললো না। আবার মে মাসের গোড়ার দিকে ফিরলুম কলকাতায়। দিন দুই বিশ্রাম, তার পর এক সকালবেলায় গেলুম মে-ফেয়ারে বল্লভ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু এ কী! এক বছর বাইরে থেকেই আমার কি কলকাতার পথ-ঘাট গুলিয়ে গেলো, নাকি আমার মাথাই খারাপ হ'লো! আমার বাড়িটাই যে খুঁজে পাচ্ছি নে! বিশ্বাস করো তোমরা, সেই চির পুরোনো রাস্তা দিয়ে যতই হাঁটি, আমার বাড়িটি আর চোখে পড়ে না। রাগ করে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলুম বড় রাস্তার মোড়ে, দেয়ালের গায়ে আমাদের রাস্তাটির নাম ঠিকই লেখা আছে, তার পর যতটা হাঁটলে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছানো যেতো, ততটা হেঁটে এসে দেখি, বাঁ দিকে যেখানে বাড়িটি থাকবার কথা, সেখানে অনেকখানি খালি জমি প'ড়ে আছে, তা ছাড়া আর এক টুকরো ই-ট পর্য্যন্ত নেই!

হাঁ হ'য়ে গেলুম। এ কি স্বপ্ন? না আরব্যোপন্যাস?

হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন ফাঁকা বোধ হ'লো, মনে হ'লো এক্ষুণি হার্ট-ফেল করবো। পাশেই একটি নতুন বাড়ি উঠেছে দেখলুম, তার একতলার ঘরে এক বুড়ো ভদ্রলোক তামাক খাচ্ছেন আর কাগজ পড়ছেন। আমি সরাসর তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লুম।

'কী চাই, মশাই, আপনার ?'

'আপনাদের এ-বাড়ি কদ্দিন হয়েছে ?'

'এই তো মাসখানেক। কেন, আপনার কোন দরকার আছে ?' ভদ্রলোক একটু সন্দিগ্ধ চোখেই আমার দিকে তাকালেন।

'আচ্ছা, আপনাদের ঠিক পাশে একখানা বাড়ি ছিলো না ?'

'ও, হ্যাঁ—দশ নম্বরের কথা বলছেন তো ?—তা সে বাড়ি তো ভাঙা হ'য়ে গেছে।'

'ভাঙা হ'য়ে গেছে ? কে ভাঙলে ?'

'কে আবার ভাঙবে ? যাঁর বাড়ি তিনিই ভেঙেছেন। আপনার এ-সব খোঁজে দরকার কী ?'

'এ-বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের খোঁজ নিতে এসেছিলুম।'

'ও, এসে বুঝি দেখেন, বাড়িই নেই ! হাঃ-হাঃ, ভারি মজা তো !'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু মজারই। তা বল্লভ বাবু এখন কোথায় থাকেন জানেন কি ?"

'কে ?'

'বল্লভ বাবুর কথা বলছি।'

'বল্লভ বাবু ব'লে তো এখানে কেউ থাকতেন না। সত্যব্রত বাবু থাকতেন। আহা—ভারি অমায়িক, চমৎকার ভদ্রলোক। আর সৌখীনও খুব। তিন পুরুষের বাড়িটা ভেঙে ফেললেন, নতুন ধরণের নতুন বাড়ি করবেন ব'লে। রাবিশগুলোই বিক্রি হ'লো পাঁচ হাজার টাকায়। আমিও কিছু কিনেছিলুম, মশাই, আমার বাড়ি তখন উঠছে। আর ফার্নিচারই বা কত ! এ-সব সেকেলে জিনিস ওঁর আর ভালো লাগে না, নিলেম ক'রে বেচে দিলেন সব। আসল দাম পঞ্চাশ হাজারের একটি পয়সাও কম হবে না, মশাই, নিলেম ক'রে টেনে-টুনে কুড়ি হাজার পেলেন। আমিও দু' একটা কিনেছিলুম—ঐ আপনি যে চেয়ারখানায় বসেছেন—'

তাকিয়ে দেখলুম, ঠিকই বটে, চেয়ারটি আমার চেনা। টেলর সায়েবের ড্রয়িংরুমে ঠিক এই চেয়ারটিতেই একাধিক বার বসেছি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আচ্ছা, ধন্যবাদ। বল্লভ বাবু—মানে সত্যব্রত বাবু এখন কি কলকাতাতেই আছেন ?'

'কী যেন, তা তো ঠিক বলতে পারবো না। বলেছিলেন তো কাশ্মীর না উটকামণ্ড কোথায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন, হয়তো গেছেন। বাড়ি ভাঙা-টাঙা হ'য়ে গেছে তো মাস চারেক হবে, এর মধ্যে তাঁকে আর দেখি নি। বড়মানুষের খেয়াল, বুঝলেন না ? সুন্দর বাড়িটি ছিলো—না-হয় একটু সেকেলেই—আরো দু' চার পুরুষ অনায়াসেই বসবাস করা যেতো। তা তিনি ধাঁ ক'রে ভেঙেই ফেললেন, সবটা ভাঙতেও পুরো একটি মাস লেগেছিলো। পাড়ার লোকেরা বলাবলি করছিলো—বাড়িটা ভাঙবার কী দরকার, ভালো না লাগে নতুন আর-একটা ক'রে নিলেই হয়, পয়সার তো আর অন্ত নেই। তা পয়সা থাকলে সবই মানায়, মশাই, সবই মানায়।'

আমি বললুম, 'যা বলেছেন।'

আর-একটি কথা বললেই এ-গল্প শেষ হয়। বাংলাদেশের ভূগোলে রূপডাঙা ব'লে কোন জায়গা আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পাই নি।

কবিকিশোর

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্.এ)

['কবিকিশোর' আমার ছোটবেলার কথা। কৈশোর শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে এ কথারও শেষ। জীবনের পথে আমরা যত আগিয়ে যাই, শৈশব এবং কৈশোর আমাদের তত মিষ্ট লাগে। একটা অস্পষ্ট স্মৃতির কুয়াশা—মাঝে মাঝে কোনো কোনোদিনের কথা এত উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে কেন মনে,—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই নি। সেই সব ছোট-বড় অনেক ঘটনা, অনেক চিত্র—বিস্মৃতির তমসাতীর থেকে এনেছি টেনে, আর তাই দিয়ে 'কবিকিশোর' রচনা করেছি। বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে আরও অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও কবিগুরুর 'জীবনস্মৃতি' আমাদের পথপ্রদর্শক। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের ছোট-বড় সকল কবির এই জাতীয় এক একখানি 'জীবনস্মৃতি' থাক্‌লে তাঁদের কাব্যসাধনার ধারাকে অনুসরণ করা যায়। বিদেশে এ ধরণের বই অজস্র। অনেক সময়ে এ বইগুলি উপন্যাসের চেয়েও বেশী আনন্দ দেয়। আমার 'কবিকিশোর' পাঠকদের সে আনন্দ দিতে পার্‌লে শ্রম সফল হ'য়েছে মনে করব—হে. চ. বা]

"নতুন মাষ্টার মশায়"

বৃষ্টি ধ'রে এসেছে। বর্ষণের জল উঠোনের মাটির পাঁচীলের গায়ের নর্দ্দামা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীর সম্মুখের ডোবায় গিয়ে পড়েছে। সমস্ত উঠোনময় দূর্ব্বাঘাস—কোথাও এতটুকু জল দাঁড়িয়ে নেই। শুধু টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় বর্ষণের জল গাছের পাতার উপর থেকে মাটিতে, টিনের চালে, গোলাবাড়ীর খড়ের চালের উপর পড়ছে। বাঁশবনে এতক্ষণ বৃষ্টিতে আর ঝড়ে যে মাতামাতি হচ্ছিল, সে সব থেমে গেছে। বর্ষণসিক্ত গাছপালা তা'দের পত্রবহুল

মাথাগুলি নত ক'রে আছে যেন—আর বৃষ্টির জল তা'দের গা বেয়ে তা'দের মাথা বেয়ে পড়্ছে ঝ'রে ঝ'রে।

এমন সময়ে আমি আর মেজদি'—আমরা ছ'জন বারান্দার নীচে অজয়ের লাল মোটা দানার বালি নিয়ে খেলা কর্‌ছিলাম। বালির দুর্গ তৈরী হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই বালি দিয়ে ঘর করা যাচ্ছে না। মেজদি' হরদম ঝাঁটার কাঠি নিয়ে আস্‌ছে,—ঝাঁটার কাঠির উপর একটা ছোট কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে পতাকা তৈরী করা হয়েছে। তার পরে বালির দুর্গের পাশ দিয়ে একটা খাল কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মেজদি' ঘটি ক'রে জল নিয়ে এসে তা'তে ঢেলে দিচ্ছে। জল ব'য়ে যা'বে নীচের দিকে—এ তথ্যটি সে বয়সে জানা ছিল; তাই বালি সরিয়ে সরিয়ে জলের পথ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওদিকে সেই খালের জলে যে এত সর্ব্বনাশ হ'বে তা' কে জান্‌ত? বালি দিয়ে কোনো রকমে যে উঁচু উঁচু দুর্গের ঘর তৈরী হ'য়েছিল—সেগুলো সব ধ্ব'সে যাচ্ছে একে একে। তাড়াতাড়ি সেইদিকে দৌড়োলাম। 'মেজদি', তুই কি কর্‌লি বল্ ত! সব ভেঙে ফেল্‌লি তুই?'—এই কথা ব'লে সেখানে গিয়ে আবার নতুন ক'রে দুর্গের ঘর তৈরী কর্‌তে লাগ্‌লাম। মেজদি' আবার ঝাঁটার কাঠি নিয়ে আসে, আবার নিশান তৈরী হয়। এমনি ভাবে ক্ষান্তবর্ষণ একটি দিনের খেলার কথা মনে পড়ে। তারপরেই ঠিক কি ঘটেছিল তা' হয়ত মনে নেই। ছবির তূলি ধ'রে মনের মধ্যে যে লোকটা এক-একটা স্ফুট অস্ফুট, স্পষ্ট-অস্পষ্ট ছবি এঁকে রেখেছে, যে ছবিগুলি প্রখর ক্লান্তির উত্তাপে অথবা স্নিগ্ধ তন্দ্রাবেশময় কোন দিনে মনের মধ্যে এসে উঁকি দেয়—হাতছানি দিয়ে সেই বাঁশবনে ঘেরা, দীঘি-ডোবা-খানাখন্দে ভরা আমার গ্রামের অতি নির্জ্জন মেঠো পথে, গরুর গাড়ী-চলা পথে ডেকে নিয়ে যায়—তাদেরকে আজ একত্র দেখ্‌তে সাধ গেল।

সেই বৃষ্টি-ধরা দিনে অথবা 'আর কোন একদিনের বিকেলে—এমন একটা ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, অথচ একটা ক্লান্ত পাণ্ডুর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, যখন মানুষগুলিকে দূরে থেকে দেখ্‌লে চেনা যায়—তেম্‌নি একদিনে একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ্ খুল্‌ছেন এক ভদ্রলোক—যাঁ'র গায়ের সার্টই তখন দেখা যাচ্ছিল। মেজদি' থাক্‌ত আমার পাশেই—সব সময়েই সে ছিল আমার খেলার সাথী।

দূর থেকে ভদ্রলোককে ক্যাম্বিসের ব্যাগ্ খুল্‌তে দেখে সে বল্‌ল, 'কে ভাই লোকটা?'

ঠাকুরমা আস্‌ছিলেন সম্মুখের পথটি দিয়ে। চেঁচিয়ে তিনি বল্‌লেন, 'এইবার ঠিক হয়েছে। জব্দ হ'বে সব। ঐ দেখ তোমাদের মাষ্টার মশায় এসেছেন। দিনরাত থাক্‌বেন এখানে—আর সব সময়েই চল্‌বে পড়াশুনো—যাও প্রণাম ক'রে এস দুই ভাইবোনে।'

'যাই'—ব'লে আমরা একটু আগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। ঠাকুরমা ভাব্‌লেন, ওরা প্রণাম কর্‌তে গেল বুঝি। এই ভেবে তিনি বাড়ী চ'লে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়েই আছি। এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমাদের ডাক্‌লেন। বল্‌লেন, 'এস, এস, এদিকে খোকাখুকী!'

আমরা সভয়ে আগিয়ে গিয়ে তাঁ'কে টিপ্ টিপ্ ক'রে ছ'টো প্রণাম কর্‌লাম। তিনি বল্‌লেন, 'ব'স, ভয় নেই। এক্ষুণি তোমাদের পড়া ধর্‌ব না। তোমরা দু' ভাইবোনে কি বই পড়্‌ছ?'

আমরা ক্ষীণস্বরে বল্‌লাম, 'দু'জনাতেই শিশুশিক্ষা পড়ি।'

'বেশ বেশ'—বল্‌তে বল্‌তে তিনি ক্যাম্বিসের ব্যাগ্ থেকে ধোয়া কাপড় গামছা বা'র কর্‌লেন। চাকর গাড়ু ক'রে জল এনে দিয়েছে—তিনি হাত-পা ধুতে ধুতে বল্‌লেন, 'আমি চা খাই, বাড়ীতে ব'লে এস আমাকে খানিকটা চা দিতে।'

চা যে কি বস্তু, তা' তখন কতকটা জানা ছিল। মাঝে মাঝে মাকে দেখেছি পিতলের সরায় ক'রে জল গরম ক'রে চা কর্‌তে। যিনি বা যাঁ'রা চা খেতেন, গেলাসে ক'রেই খেতেন। তা'র আস্বাদ যে কি রকম, তা' তখন জানা ছিল না। মাঝে মাঝে দৈবাৎ যদি কোন দিন বাড়ীতে চা হ'ত, খেতে চেয়ে বকুনিই খেতে হ'ত। নতুন মাষ্টার মশায় চা খেতে চেয়েছেন—এ সংবাদটি বাড়ীতে দেবার জন্যে দু'জনেই ছুট্‌লাম।

*

মেজদি' যে কি গায়ে দিয়ে পড়্‌তে আস্‌ত ঠিক মনে পড়ে না। কাপড়

জড়িয়ে রাখ্‌ত মাজায়। বেড়া বিনুনী ক'রে বাঁধত চুল। আর, পড়াতে সে আমার চেয়ে ঢের পিছিয়ে রইল। 'শিশুশিক্ষা'য় ছোট ছোট ছবি ছিল। সে ছবি হয়ত এখন দেখ্‌লে খারাপই লাগ্‌বে। কিন্তু তখনকার দিনের সেই ছবিগুলিতেই থাকৃত আমার মন। পড়া তৈরী কর্‌বার আগে ছবিগুলিই দেখ্‌তাম দু' চোখ ভ'রে। 'ঐ যে গৌরবর্ণ যুবাপুরুষটি মাটি কাটিয়া রাস্তা বাহির করিয়াছে—উহাকে চিনিতে পার কি?' বোধ হয় এই ধরণের কোনো গল্প 'শিশুশিক্ষা'য় আছে। ঐ লাইনটি যে কেন মনে ক'রে রেখেছি, তা'র কোনো সদুত্তর মেলে না নিজের কাছ থেকে! কত অক্ষর, কত বই, কত উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা পার হ'য়ে এলাম, কিন্তু 'শিশুশিক্ষা'র ঐ লাইনটি যে কেন আমার মনে আছে, তা' জানি না। এই রকম মনে আছে, 'কাঠুরিয়া আর জলদেবতা'র গল্প। আর একটি গল্পের ছবি মনে আছে—এক পথিক অত্যন্ত গরমে জামা ইত্যাদি সব খুলে খুলে ফেল্‌ছে—তা'র মাথার পিছনে সূর্য্যের কিরণচ্ছটা আঁকা। তখন 'শিশুশিক্ষা' শেষ ক'রে 'হিতোপদেশ' ধরেছি। মাষ্টার মশায় সব সময়েই রাখ্‌তেন আমাদের কাছে কাছে। পড়া শেষ হ'য়ে গেলে তিনি গল্প বল্‌তেন—'হিতোপদেশে'র গল্প—বেশীর ভাগ গল্প বল্‌তেন তিনি 'রামায়ণ' থেকে—মনে পড়ে।

*

দুপুরে আবার তাঁ'রই কাছে আস্‌তাম ছুটে ছুটে। দুই ভাইবোনে গরমের দিনে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে পড়্‌তাম। মাষ্টার মশায় বল্‌তেন,—'হাতের লেখা অভ্যেস কর।' শ্লেটে মোটা মোটা দাগ কেটে দু'জনে হাতের লেখা লিখতাম। হাতের লেখা কখনো বা তিনি দেখ্‌তেন, কখনো বা দেখ্‌তেন না। কিন্তু তিনি 'রামায়ণ-মহাভারত' পড়্‌তে বল্‌তেন খুব। নিজেও 'রামায়ণ-মহাভারত' থেকে গল্প ব'লে ব'লে শোনাতেন। একদিন তিনি বল্‌লেন,—'এ রামায়ণ বড় শক্ত, তোমাদের জন্যে 'টুক্‌টুকে রামায়ণ' আনতে দিয়েছি।' 'টুক্‌টুকে রামায়ণ' আবার কি? মনে হ'ল খুব ফর্সা রামায়ণ বোধ হয়। কিছুতেই মানে বুঝ্‌তে পারতাম না। শেষে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, টুক্‌টুকে রামায়ণ তা'রাই পড়ে, যা'রা শান্ত, ফর্সা আর ভালো ছেলে। যাই হোক্, এই বুঝ্‌লাম যে ওটা ছোটদের জন্য।

কিন্তু 'টুক্‌টুকে রামায়ণ' আর আসে নি। আমরা তাঁ'র কাছে রামায়ণের গল্প শুন্‌তাম আর নিজেরাই পড়্‌তাম রামায়ণ লুকিয়ে লুকিয়ে। লুকিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়ার একটা হেতু ছিল। বাড়ীতে পড়ার বই ছাড়া অন্য যা' কিছু হাতে নিতাম বা পড়্‌তাম—তা'তেই খেতে হ'ত বকুনি। সেই ভয়ে লুকিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়্‌তে হ'ত। এই সময়কার একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সিঁড়ির নীচেকার ঘরে ছিল আমাদের কয় ভাইবোনের আড্ডা। সেখানে দিদিদের অবাধ পুতুলখেলা চল্‌ত আর আমি মাঝে মাঝে 'রামায়ণ-মহাভারত' নিয়ে গিয়ে সেখানে বস্‌তাম। তখন আমাদের মাষ্টার মশায় এসেছেন কিনা ঠিক মনে নেই। হয়ত বা তাঁ'র আসার কিছু আগে বা কিছু পরে—কারণ, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁ'র নাম বা তাঁ'র মুখ ঠিক মনে পড়ে না। যাই হোক্, বোধ হয় লুকিয়ে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন-বৃত্তান্ত পড়্‌ছি। তা'র মধ্যে কপিলের শাপে সগরের ষাট হাজার ছেলে পাতালে পুড়ে মরেছে। সেই শোকে সগরের রাণীরা কাঁদছেন। একটা লাইন— কিছুতেই তা'র মানে কর্‌তে পার্‌ছি নে—'ইহা শুনি নিরবধি করেন ক্রন্দন।' নিরবধি যখন ক্রন্দন করেন, তখন এই 'নিরবধি' নিশ্চয়ই কোনো রাণীর নাম। বোধ হয় সগরের এক রাণীর নাম 'নিরবধি'। এর অর্থ কেউই আমাকে ক'রে দিতে পারেন নি। অনেক দিন পরে শৈশব পার হ'য়ে এসে অভিধান খুলে নিরবধি শব্দের অর্থ পাই। ঠাকুরমা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। ঠাকুরমা বল্‌লেন, 'নিরবধি বোধ হয় রাণীই হ'বে।' যাই হোক্, সেই 'নিরবধি' রাণী আর রামায়ণের বিস্ময়কর গল্পে আমাদের নিশ্চিন্ত দুপুরবেলা বেশ জ'মে উঠ্‌ত।

*

মাষ্টার মশায় আমাদের ওখানে অনেক দিন থাক্‌লেন। বিকেলে তিনি আমাদের নিয়ে বেড়া'তে যেতেন। আমাদের ছোট গ্রাম। সেই গ্রামের চাষাভূষো, মুসলমান, মুদী, গোয়ালা, নাপিত, কুমোর, কামার, বাগ্‌দী—সবার সঙ্গেই তাঁ'র সমান পরিচয় হ'ল। বিকেলের দিকে অশথ-তলায় মুদীখানায় ব'সে থাক্‌তেন তিনি। সকলে তাঁ'র কাছ থেকে যুদ্ধের গল্প শুন্‌তে ভালোবাস্‌ত। উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, কামান প্রভৃতি নানান্ ধরণের যুদ্ধাস্ত্রের কথা তিনি গল্প

ক'রে ক'রে তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। আর চাষাভূষোরা যুদ্ধের কথা, উড়ো-জাহাজের কথা, গোলাগুলির কথা শুনতেই চায়। তাঁদের এ বিষয়ে আগ্রহও খুব বেশী। তা'রা গভীর মনোযোগে পাঁচন মাটিতে পুঁতে, কেউ বা লাঙলের ফলা, মাথালি (টোকা) পাশে রেখে তাঁর গল্প শুনত। শেষে এমন হ'ল, তা'রা আমাদের বাড়ী আস্‌তে আরম্ভ কর্‌ল সন্ধ্যার দিকে। তখন তিনি গল্প ব'লে ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে তা'দের এক-একখানি ক'রে প্রথম ভাগ, ধারাপাত প্রভৃতি বই আনিয়ে দিলেন সহর থেকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা ছোটখাট নৈশবিদ্যালয় আমাদের বৈঠকখানা ঘরে জমে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তিনি আমাদের ছোট গ্রামখানির প্রাণস্বরূপ হ'য়ে উঠ্‌লেন।

এই ভাবে তিনি অনেক দিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আমার শিশুকালের যে দিনগুলি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—তাঁর প্রতিটি দিনের খবর সব হয়ত মনে নেই। কিন্তু সব দিনগুলিকে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর একটি অতি পবিত্র মূর্ত্তি আমার শিশুমনে গড়ে উঠেছিল। আজও দেখ্‌ছি তা' তেমনিই আছে, কোথাও তা'র কোনো বিকার ঘটে নি। এই সময়ে বোধ হয় রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু' বইখানি পড়েছিলাম। বইখানি আমার এক দাদামশায়ের। দাদামশায় তাঁর মাটির বাড়ীতে 'রোকড়-খতিয়ান' প্রভৃতি হিসাব-পত্রের খাতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সাহিত্যের বই আনিয়ে রেখেছিলেন। মাষ্টার মশায় তাঁর অবকাশ সময়ে এই দাদামশায়কে আবিষ্কার ক'রেছিলেন,—তাঁর ওখানে রাস্তার ধারে বকুলতলায় বৈঠকখানা ঘরে দু'জনকে ব'সে থাক্‌তে দেখ্‌তাম। দুই বৃদ্ধ গল্পে গল্পে মশ্‌গুল হ'য়ে থাক্‌তেন। আমরা হয়ত তাঁরি সামনের কালীতলার মাঠে বাতাবী নেবু ছিঁড়ে নিয়ে বল্ ক'রে খেল্‌তাম। দূর থেকে দেখ্‌তে পেতাম, দাদামশায়ের নল হাতবদল হচ্ছে। তাঁরই কাছে একদিন বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে 'বিষাদ-সিন্ধু' বইখানি প'ড়ে ফেলেছিলাম। ঠিক মনে পড়ে না, তবু মনে হয়, 'বিষাদ-সিন্ধু' আমার শিশুমনে গভীর শোকের একটা কালো ছায়াপাত ক'রেছিল। হাসান-হোসেনের দুঃখ, মহত্ত্ব, বীরত্বকাহিনী কিছুতেই মন থেকে আর গেল না।

'বিষাদ-সিন্ধু' আমার তখনকার মনের অবস্থার যে কি পরিবর্ত্তন এনেছিল, তা' আজ হয়ত ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না। 'বিষাদ-সিন্ধু' আমার মনে এনেছিল একটা গভীর কারুণ্য, যা'তে আমার দৃষ্টি গেল বদ্‌লে। অনেক দিন পর্য্যন্ত বইখানির কথা আমার মনে ছিল। শিশুমন ত আর সেই বই প'ড়ে আরব দেশে যেতে পারে না—যে দেশ সে দেখে নি কোনোদিন! গ্রামের মাঠে, বড় বাড়ীর পাঁচীলের পাশে ঘুরে বেড়াত মন। মনে হ'ত সম্রাট্ এজিদ বুঝি সসৈন্যে সান্যালদের বাড়ীর পাঁচীলের পাশে অপেক্ষা কর্‌ছেন, আর বাঁশবনে ঘেরা কলুগর্ত্তের কাছে হাসান-হোসেন সপরিবারে তাঁবু ফেলে আছেন! এজিদের সৈন্যরা এখুনি তীরবর্ষণে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেল্‌বে, আর কলুগর্ত্তে পিপাসার্ত্ত হাসান-পরিবারের দীর্ঘদিনের পিপাসা দূর হ'বে না। মনের মধ্যে একটা ধূ-ধূ শুষ্ক, রুক্ষ মাঠ, তৃষ্ণার কথা আর রামায়ণ-মহাভারতেরই মত তীর বর্ষণের কথা সারাক্ষণ জেগে রইত।

আমি জানি না, আমার মাষ্টার মশায় আমার মনের এ কথা জান্‌তেন কি না! জান্‌লে বোধ হয় খুবই ভালো হ'ত। আরও ঐ ধরণের বই হয়ত তিনি আমাকে পড়্‌তে দিতেন। তা'তে খুব সম্ভবতঃ আমার কল্পনাপ্রবণ শিশুচিত্ত খুসী হ'য়ে উঠ্‌ত। চমৎকার নতুন বইতে মনের আকাশের রঙ্ যায় বদ্‌লে। 'বিষাদ-সিন্ধু' আমার শিশুমনের আকাশের রঙ্ দীর্ঘকালের জন্য বদ্‌লে দিয়েছিল।

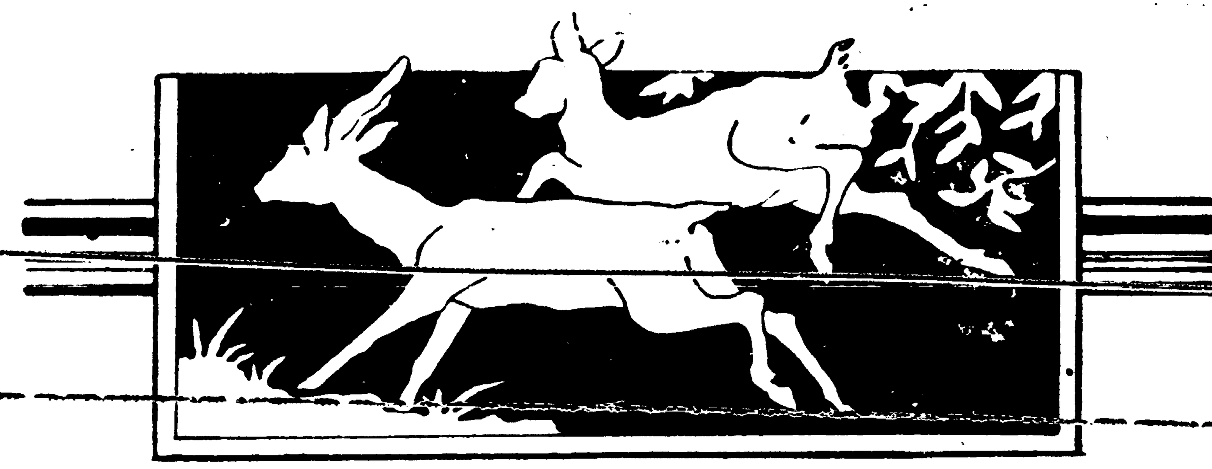

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

এক

বাপ-মায়ের এক মাত্র মেয়ে—ভাইএদের একটী মাত্র ছোট বোন যদি অভিমান করে', দুদিন ধরে' খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে' ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে থাকে তা হ'লে তার ইচ্ছার অনুকূলে মত দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তা'র ইচ্ছাটা হয়ত সত্যিই অসাধারণ, কোন বাপ-মা'ই হয়ত তা'র এ ইচ্ছায় কোন মতেই রাজি হ'তে পারেন না—কিন্তু মেয়ে যদি তা'র ইচ্ছার অনুকূলে মত না দেওয়ার দরুণ অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে মনস্থ করে' বসে থাকে তা হ'লে কি করতে পারে মানুষে?

বিজয় বাবুর ছোট ছেলে রণজিৎ—চলেছে এরোপ্লেন চালিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায়। সে তা'দের "ফ্লাইং ক্লাব"এর "এ" ক্লাশ পাইলট লাইসেন্স ত পেয়েছেই কয়েক দিনের মধ্যেই, সম্প্রতি আবার তা'র চেয়ে সম্মানকর—অর্থাৎ 'বি' ক্লাশ লাইসেন্স নিয়ে এসেছে বিলেত থেকে। চমৎকার চালায় সে এরোপ্লেন—অদ্ভুত তা'র দক্ষতা, অসীম তা'র মনের বল, আর কি অসাধারণ তা'র ক্ষমতা ঐ বিশাল বিমানচারী যন্ত্রটীকে অধীনে রাখবার! ঐ যন্ত্রটী যেন ওর হাতে একটী খেলনা মাত্র। ওদের 'ফ্লাইং ক্লাবের' ও এক মহাগৌরব। বয়স ত ওর মাত্র বাইশ বছর, এরই মধ্যে ওদের ক্লাবের সমস্ত সুদক্ষ বিমানচালকদের হার স্বীকার করতে হয়েছে ওর দক্ষতার কাছে। রণজিৎ তাই চলেছে দু'চার দিনের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায়—একটা স্পীডের রেকর্ড করবে, মনের মাঝে এই বাসনা নিয়ে। কিন্তু, তা'র এই বিমান-পথে জয়-যাত্রার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তা'রই ছোট বোন ইরা।......... কি কুক্ষণে সে ইরাকে তা'দের ফ্লাইং ক্লাবের 'মেম্বার' ক'রে দিয়েছিল! আশ্চর্য্য মেয়েটার ক্ষমতা! ও যেন এ দেশেরই মেয়ে নয়; ওর জন্মান উচিত ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী বা নিউজিল্যাণ্ড

জাতীয় কোনও একটা দেশে। বয়স বোধ হয় ওর এখনও কুড়ি পার হয়নি, কিন্তু সাঁতারে 'রাইডিং'এ, শিকারে, মোটর চালানয়—ছেলেদের মধ্যেও ওর যুড়ি মেলা ভার। এই ত সেদিন ও ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে মোটর চালাল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে। সে এক দেখবার মত ব্যাপার! নক্ষত্রবেগে ছুটেছে ইরার 'ন্যান্সিয়া' কার; আশপাশের গাছপালা, মাঠঘাট যেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চোখের সামনে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ইরার শাড়ীর প্রান্তভাগ উড়ছে—উড়ছে ইরার চুলগুলি বাতাসে; ইরার মুখে-চোখে সে কি এক উত্তেজনা! ষ্টীয়ারিং হুইলটী ধরে আছে সে কি দৃঢ়ভাবে! মোটরের স্পীড্ বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। সামনের মীটারে স্পীডের কাঁটা পঞ্চাশ মাইলের ঘর থেকে ষাট মাইলের ঘরে, ষাটের ঘর থেকে সত্তর—পঁচাত্তর; ক্রমশঃ আশি মাইলের ঘরে এসে কাঁটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। ইরার পাশে বসে তার একাধারে দাদা, সঙ্গী, গুরু—রণজিৎ। রণজিতের মুখে আনন্দের, উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তারই বোন, তারই শিষ্যা—ইরা; নিজের কৃতিত্বের চেয়ে শিষ্য বা শিষ্যার কৃতিত্বে মন আরও বেশী আনন্দে নেচে ওঠে। ইরা তার কলেজের মেয়েদের কাছে একটা মহা বিস্ময়, একটা ভীষণ আতঙ্ক। সকলেই ভাবে, এমন কোন দুঃসাহসের কাজ নেই যা করা ইরার পক্ষে অসম্ভব। ও যেন সাগর-পারের মেয়ে! এই সব কারণেই না ইরাকে রণজিৎ এরোপ্লেনের 'পাইলট-গিরি' শেখাবার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল অত! ইরার বাপ-মা এত দিন পর্য্যন্ত ইরার সাঁতারে, রাইডিংএ, ড্রাইভিংএ বা শিকারে উৎসাহ না দিলেও বাধা দেন নি। কিন্তু আকাশে ওড়া? তাঁরা প্রথমটায় মোটেই রাজি হ'ন নি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইরার জিদে এবং রণজিতের অনুরোধে তাঁরা মত দিতে বাধ্য হ'লেন তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। দু'চার দিনের মধ্যে ইরাও বেশ শিখে নিল পাইলটের কাজ। সকলকে অবাক্ ক'রে দিয়ে সে "এ" ক্লাশ লাইসেন্স পেয়ে গল। রণজিতের কি আনন্দ ইরার এই সাফল্যে! কিন্তু তখন কি রণজিৎ ভেবেছিল ইরার এই আকাশে ওড়ার আকাঙ্ক্ষা কত দূর বেড়ে যাবে! সে ভেবেছিল দু-এক ঘণ্টা উড়বে সে মাঝে মাঝে নিছক আমোদের জন্য। কিন্তু সেই ইরা যে আজ হঠাৎ ছোট্ট মেয়ের মত বায়না ধ'রে বসবে তার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার পথের সহযাত্রী হওয়ার জন্য এ কথা সে স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবতে পারে নি। ইরা কিন্তু আজ মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—সে যাবেই রণজিতের সঙ্গে ওর "লাইট-প্লেনে" চড়ে অষ্ট্রেলিয়া অভিযানে। আজ তা'র মনে হচ্ছে, সে যদি ঐ বঙ্গোপসাগর পার হ'য়ে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে না পায় তা হ'লে তার জীবনই বৃথা; তা হ'লে এ ব্যর্থ-জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তার মরণই শ্রেয়। ইরার মায়ের চোখের জল, বাপের তিরস্কার, আত্মীয়-স্বজনের উপদেশ কিছুতেই তা'কে নিরুৎসাহ করতে পারে নি। এমন কি এতদিন অন্যান্য সকলের মতের

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে তাকে সমানে উৎসাহ দিয়ে এসেছে সেই রণজিৎই তা'কে কত বুঝিয়েছে; কত তর্ক করেছে!

বোঝাতে বোঝাতে রণজিৎ একটু বিরক্ত হয়েই বল্লে সেদিন—"দেখ, ইরা! সমস্ত কিছুরই একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে যারা চল্‌তে যায় তা'দের ধ্বংস সুনিশ্চিত। হাজার হ'লেও তুই মেয়ে মানুষ—সেটা ভুলে যাচ্ছিস্ কেন? মেয়েরা কে কবে এত দূর উড়েছে, বল্ ত এরোপ্লেনে চড়ে? যা কোনও দেশে কোনও মেয়ে কখনও—"

রণজিতের কথায় বাধা দিয়ে ইরা বল্লে, 'দেখ ছোটদা, আমাকে যা'তা বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। কে না জানে, ওদের দেশে কত মেয়ে লম্বা লম্বা পাড়ি দিচ্ছে এরোপ্লেনে চড়ে! ১৯০৯ সনে—তখন তুমিও জন্মাওনি আমিও না, যখন এরোপ্লেনে চড়া ব্যাপারটা এ রকম ছেলেখেলা ছিল না, এরোপ্লেনে চড়া মানেই ছিল যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, তখনই ফ্রান্সে এক মহিলা এরোপ্লেনের বুকে চড়ে আকাশে ওড়েন। সেই থেকেই চলে আস্‌ছে আকাশের বুকে মেয়েদের এই অভিযান।"—একটু থেমেই আবার বল্লে,—"মিস কীথ মিলারের নাম শুনেছ, নিশ্চয়? ১৯২৭ সনেই, বোধ হয়, তিনি ক্যাপ্টেন্ ল্যাঙ্কাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছান; আর, এ সামান্য কলকাতা থেকে অষ্ট্রেলিয়া।"

রণজিৎ বল্‌লে—"মিস্ কীথ মীলারের নাম নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু, তাঁ'কে কি বিপদে পড়তে হয়েছিল মনে আছে ত? তাঁ'দের যন্ত্রটী দু'-দু'বার গেল বিগ্‌ড়ে; তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও তাঁ'দের কম বিপদে ফেলে নি। পাকা পাঁচটি মাস লেগেছিল তাঁদের ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাতে। কিন্তু তোমার ত পাঁচ মাস কাটালে চল্‌বে না; ওদিকে যে বি, এ, পরীক্ষা সামনে। সেদিকেও লক্ষ্য আছে যাতে 'ফার্ষ্ট ক্লাশ'টা না ফস্‌কায়—ইংরাজি অনার্সে।"

ইরা হেসে বল্লে—"মিস্ কীথ মিলারের পরেও বহু মেয়ে উড়েছে আকাশে। এই ত সেদিন, ১৯৩৪ সনে জীন ব্যাটেন্—নিউজিল্যাণ্ডের একটি মেয়ে চৌদ্দ ঘণ্টায় পৌঁছেছে ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায়। যাদেরই 'পাইলটিং' সম্বন্ধে একটু 'ইন্‌টারেষ্ট' আছে তা'রাই আজ জীন্ ব্যাটেনের নাম জানে।" তা ছাড়া মিস্ এমিলিয়া ইয়ারহার্ট—পরে যিনি হন মিসেস্ পাট্‌নাম্—১৯৩২ সনে আট্‌লাণ্টিক্ ক্রশ্ করে' পুরুষদের ত মাথা নীচু করে দিয়েছেনই—তাঁর জয়ধ্বনিতে ত সারা জগৎ ছেয়ে গেছে। তবে? অবশ্য আমি বাঙ্গালীর মেয়ে এই যা অপরাধ আমার।"—রণজিৎ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। হতভাগা মেয়েটা যে পড়াশুনাও করে দারুণ। ত্রিসংসারে এমন কোনও খবর নেই যে ও জানে না।

শেষ পর্য্যন্ত রণজিৎ বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছে।

কিন্তু এবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন রণজিতের বাবা এবং মা, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাইয়েরাও।

ইরাও জিদ ধরেছে যে হয় তাকে রণজিতের সঙ্গে এরোপ্লেনে অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে অনুমতি দেওয়া হোক নয়ত সে কিছুতেই জলস্পর্শ কর্‌বে না—মৃত্যুপণ তার। এ মেয়ে যেন একাধারে হিট্‌লার্ আর মহাত্মা গান্ধী।

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ইরারই জয় হ'ল—তা'র অনশন ব্রত বন্ধ করবার জন্য তার বাবা এবং মাকে মত দিতে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত।

ইরার সে কি দুর্দমনীয় আনন্দ! মাত্র আর পাঁচটা দিন বাদে সে উড়্‌বে আকাশের বুকে। তা'র পরমপ্রিয় ছোড়দা' চালাবে তা'র লাইট্ প্লেন্‌খানি, আর তার পাশে থাকবে ইরা স্বয়ং। সে নিজেও একটু চালাবে নিশ্চয়; ছোড়দা'কে একটু আব্দার করে ধরলেই তার ছোড়দা' রাজি হ'বে। অত আদরের ছোট বোন সে।

সেদিন সন্ধ্যায় দুই ভাইবোনে বা'র হয়েছে মোটারে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে চলেছে গাড়ী। ইরার হাতে ষ্টীয়ারিং হুইল। রণজিৎ একটা সিগার ধরিয়ে আরামে টান্‌ছে চোখ বুঁজে, এমন সময় ইরা একটু মিষ্টি হেসে বল্‌লে—"ছোড়দা', আমাকে চালাতে দেবে ত' তোমার 'প্লেন'টা?"

রণজিৎ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—"বলিস্ কি রে! তোর হাতে প্লেন ছেড়ে দেব, য়্যাঁ! আমি ত আর বেড়াতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটা স্পীডের রেকর্ড ক'রব বলে। কাজেই সমানে আমাকেই চালাতে হ'বে। তা ছাড়া এই লম্বা পাড়ি সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে—সোজা কথা? তুই কি পাগল হয়েছিস?"

ইরা বল্‌লে—"বা-রে, চালাতেই যদি না পাব তা হ'লে এত কাণ্ড করে' চলেছি কেন তোমার সঙ্গে? শুধু এরোপ্লেন চড়াই আমার উদ্দেশ্য নাকি? ছিঃ ছোড়দা'! তোমার পাইলট্ বোন্‌টীকে এ রকম করে অপমান কোরো না। পাঁচ দশ টাকা দিয়ে দমদমে মোটা, রোগা, বাচ্চা বুড়ী—বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী—যে সব মেয়েলোকেরা দশ বিশ মিনিটের জন্য এরোপ্লেনে চড়ে দু'শ' তিনশ' গজ উপরে উঠে একটু ঘুরে নেমে এসে বলে—'উঃ, আকাশে ঘুরে এলাম!'—তাদের দলে আমাকে ফেল্‌ছ না কি? হয়ত মিস্ কীথ মিলার বা মিস্ জীন ব্যাটেন্ না হ'তে পারি—কিন্তু তা ব'লে একেবারে খেঁদি-পেঁচিও নই।"

রণজিৎ একটু হেসে বল্‌লে—"আচ্ছা, আচ্ছা, আগে 'বি' ক্লাশ লাইসেন্স নিয়ে আয় বিলেত থেকে, তার পর দেব তোর হাতে আমার 'প্লেন' ছেড়ে।"

ইরা শুনল না কিছুতেই। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হোলো, দম্‌দম্ থেকে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত চালাবে ইরা আর সিঙ্গাপুর থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে রণজিৎ। ফিরবার পথে রণজিৎ একবার চেষ্টা করবে রেকর্ড করবার।

ইরার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব-মহলে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। ইরার বন্ধুরা ইরার 'অনারে' এক টী-পার্টিরই আয়োজন করে ফেল্‌লে।

পাঁচটা দিন কেটে গেল কোথা দিয়ে। যাওয়ার দিন এবং ক্ষণ এগিয়ে এল।

'এরোড্রোমে' সেদিন লোকে লোকারণ্য। 'ফ্লাইং ক্লাবের' মেম্বারেরা রণজিতের গলায় আর ইরার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। ইরার বন্ধুরাও দিল ইরার গলায় মালা পরিয়ে। পাইলট-বেশী ইরাকে মালা-গলায় কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল তখন তা' বলা যায় না। রণজিৎ তা'র বাপ-মাকে প্রণাম করে' ইরার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তার ক্লাবের মেম্বারদের দিকে এগিয়ে গেল। ইরা তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে তার মা আর বাবার দিকে এগিয়ে এল। বিজয় বাবু কন্যাকে রুদ্ধ কণ্ঠে করলেন আশীর্বাদ, আর ইরার মা ইরাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ দুটী তাঁর জলে ভেসে উঠ্‌ল। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বল্লেন—"এসো মা, তোমার সাধ পূর্ণ করে' শীগ্রি ফিরে এস তোমার মায়ের বুকে।"

ইরা হেসে বল্লে—"ক'টা দিন পরেই ত ফির্‌ছি মা। তারপর রোজ রাতে তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ছোট শান্ত মেয়ের মত অষ্ট্রেলিয়ার গল্প কর্‌ব।"

সকলের আনন্দ ও উৎসাহধ্বনির মধ্যে রণজিৎ আর ইরা ধীরে ধীরে আকাশের বুকে উঠে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওদের হাল্কা প্লেনখানি ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ক্রমশঃ মেঘের আড়ালে কোথায় লুকিয়ে গেল। সকলের চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের আভাস। ইরার মায়ের মনটা কেবল কি যেন একটা আশঙ্কায় ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। চোখ বুঁজে তিনি শুধু নিজের মনেই বল্লেন—"নারায়ণ, ভালয় ভালয় ফিরে আসে যেন আমার ইরা আর রণু—"

* * *

কয়দিন গেছে কেটে। ইরার মায়ের মনের সেদিনের সেই অজানা আশঙ্কা আজ রূপ নিয়েছে। বিজয় বাবুর বাড়ীতে আজ এক বিষাদের ঘন ছায়া ছেয়ে আছে চারিধারে। সকলেই যেন মুষড়ে পড়েছে কি একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায়। ইরার মা ত আজ ক'দিন জলস্পর্শই করেন নি—কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ দুটী ফুলে উঠেছে। ক'দিন হয়ে গেল রণজিৎ আর ইরা গেছে। রেঙ্গুন এবং সিঙ্গাপুর থেকে পর পর দু'খানি টেলিগ্রাম করেছে রণজিৎ এই বলে যে তারা পৌছেছে এবং দু'জনেই ভাল আছে। সিঙ্গাপুর থেকে যে শেষ টেলিগ্রাম করেছে তা'তে লিখেছে—"অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছেই তোমাদের 'তার' করব, আর তার পরেই লিখ্‌ব এক বিরাট্ চিঠি—আমি আর ইরা। আমরা এখনি আবার ছাড়ছি সিঙ্গাপুর।"—ব্যস্, সেই শেষ খবর। তারপর

আজ প্রায় পনেরো দিন কেটে গেল—না এসেছে টেলিগ্রাম, না এসেছে চিঠি, কোন খবরই আর নেই ওদের দু'জনার। *

(ক্রমশঃ)

বন্ধু জীবাণু

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি)

রামধনুতে জীবাণুর কথা অনেক বার বাহির হইয়াছে। উহাতে, যে সব জীবাণু আমাদের শত্রু সাধারণতঃ তাহাদের কথাই, বলা হইয়াছে। কিন্তু জীবাণুদের মধ্যে আমাদের বন্ধুও আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আজ তাদের কথাই কিছু বলিব।

ইষ্ট (Yeast) নামে এক রকম অতি ক্ষুদ্র এককোষ (Unicellular) উদ্ভিদ্ বহু কাল হইতে আমাদের নানা কাজ করিতেছে। খাবার তৈরীই এই জীবাণুর প্রধান কাজ। ইহারা দেখিতে খুব ছোট ছোট বুদ্‌বুদের মত—অবশ্য সে বুদ্‌বুদ্ অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয়। একটি বুদ্‌বুদ্ হইতে আর একটি ছোট বুদ্‌বুদ্ বাহির হয়; আবার সেটি পৃথক্ হইয়া আর একটি নূতন ইষ্ট সেল বা উদ্ভিদ্ প্রস্তুত করে। ইষ্টগুলি আকারে আমাদের ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি হইতে কিছু বড়; কিন্তু উহারা পরস্পর সম্পর্কিত উদ্ভিদ্।

খেজুর রস, তালের রস বা নারিকেলের রস খাইতে বেশ সুমিষ্ট। কিন্তু ঐ সকল রস যদি ২।৩ দিন রাখা যায় তবে উহা গাঁজিয়া উঠে; উহার উপর ফেনা জমে ও উহাতে মদো গন্ধ বাহির হয়। এই রস গাঁজিয়া উঠাকে ইংরাজীতে 'ফারমেণ্টেশন (Fermentation) বলে। বায়ুমণ্ডলে ইষ্টের বীজ ধূলার সহিত ছড়ান থাকে; সেই বীজ রসের উপর পড়িয়া সেখানে নূতন ইষ্ট প্রস্তুত করে। এক ফোঁটা

* এই উপন্যাসটার মাল-মসলা প্রায় সবই আমার নিজস্ব, কেবল এর শেষের দিকের অংশটুকুর জন্য আমি সামান্য ঋণ গ্রহণ করব ছোট্ট একটা বিদেশী গল্পের আইডিয়ার কাছে—কারণ সে গল্পটা আমার নিজের বড় ভাল লেগেছিল। সেইটার 'মসলা' নয়, কেবল 'মাল'টুকু মিশিয়ে দেব আমার এই উপন্যাসের মাল এবং মসলার সঙ্গে—এই রকম ইচ্ছা আছে।—লেখক।

তাড়ি লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে উহাতে অসংখ্য ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ দেখা যাইবে। খেজুর রস হইতে তাড়ি করিতে হইলে উহার সহিত কিছু পুরানো তাড়ি মিশাইলে খুব তাড়াতাড়ি ফারমেণ্টেশন্ হয়; ইহার কারণ, তাড়িতে প্রচুর পরিমাণে ইষ্ট সেল থাকে।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, মদ ত একটা সর্ব্বনেশে জিনিস। দেশ হইতে মদ তাড়াইবার জন্য কত চেষ্টাই না হইতেছে! অতএব এমন সর্ব্বনেশে জিনিস যে তৈয়ারী করে সে আবার কেমন বন্ধু! সত্যি, মদ সর্ব্বনেশে জিনিস। তবে মদ খাইয়া লোকে যে শুধু মাতাল হয় তাই নয়, মদে আবার অনেক সময় উপকারও করিয়া থাকে। লোহা দিয়া নরহত্যা করা যায় বলিয়া লোহার উপকারের কথা ভুলিলে চলিবে না।

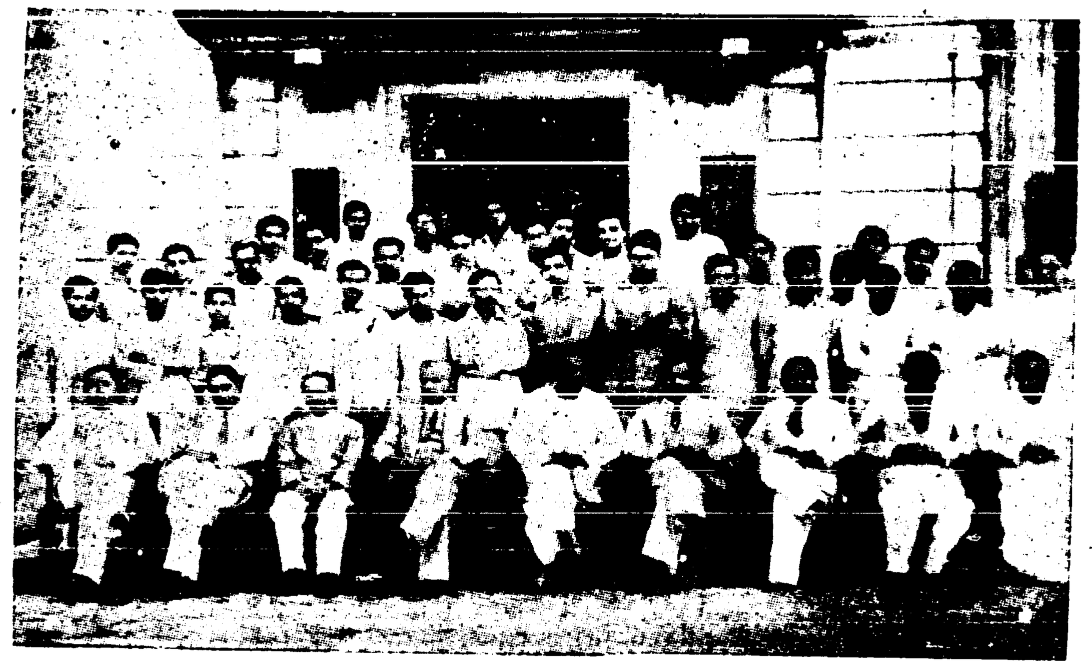

প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সম্মুখের সারির ঠিক মাঝখানে—বাঁ দিক্ হইতে ৫ম ব্যক্তি।
(দীর্ঘ ৩০ বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর সম্প্রতি ইনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তাঁকে যে বিদায়-অভিনন্দন দিয়াছিলেন সেই সময়ে গৃহীত ফটো।)

ওষুধ তৈরীর কাজে মদের অত্যন্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া অনেক রাসায়নিক দ্রব্যও মদের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। মাতগুড় হইতে অনেক মদ হয়। উহার সহিত কুচুসিন নামক রবার চোয়াইয়া প্রাপ্ত এক প্রকার দুর্গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া মিথিলেটেড্ স্পিরিট হ'য়। দুর্গন্ধ দেওয়া হয়—যাহাতে লোকে উহা খাইতে না পারে। মিথিলেটেড্ স্পিরিট জ্বালানি কাজে এবং বার্নিশ প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ইষ্ট আর একটা ব্যাপারে খুব প্রয়োজনীয়। পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার কাজে

সে প্রধান সাহায্যকারী। খানিকটা ময়দা একটু বেশী জল দিয়া ও উহাতে কিছু তাড়ি সংযোগ করিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া রান্নাঘরের একটা গরম কোণে রাখিয়া দিলে (আমাদের দেশে গ্রীষ্মের দিনে যে কোনও স্থানে চলিবে) ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই ময়দাটা মাতিয়া উঠে। উহা ফাঁপিয়া উঠে, মাখা ময়দা খাইয়া ইষ্ট জীবাণুগুলি সংখ্যায় বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ময়দার মধ্যে কার্ব্বন ডাই-অক্‌সাইড্ গ্যাস নির্ম্মাণ করিতে থাকে। সেই গ্যাস জমিয়াই ময়দার তালটা ফাঁপিয়া উঠে। তার পর ময়দাকে আর একবার ঠাসিয়া টুকরা টুকরা করিয়া রুটী করা হয়। উহাকে সেঁকিয়া লইলেই পাঁউরুটী হইল। পাঁউরুটী সেঁকিবার উনানকে তুন্দুল বলে। পেশোয়ার অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু সাধারণ উনানের উপর উল্টান তাওয়া দিয়া মোটা মোটা রুটী সেঁকিয়া লয়।

বর্ত্তমান যুগে ইষ্টের আর একটা প্রধান কাজ ভিটামিন 'বি' নামক ওষুধ প্রস্তুত করিতে সাহায্য করা। ইষ্টের একটা অংশ বাহির করিয়া এই ওষুধ প্রস্তুত হয়। উহা নানা নামে বিক্রীত হয়। বেরীবেরী রোগে ও অন্য কয়েক রকম দুর্ব্বলতায় উহা মহৌষধ।

তোমরা সম্ভবতঃ শির্কা বা ভিনিগারের নাম শুনিয়াছ। কেউ কেউ ভিনিগারে প্রস্তুত জ্যাম বা আচার বা স্যালাড্ খাইয়া থাকিবে। আমাদের দেশে উহার প্রয়োগ বেশী নাই, কিন্তু ইউরোপে খুব। এই শির্কা প্রস্তুত হয় এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে। ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে আঙ্গুর রস হইতে মদ প্রস্তুত হয়, কিন্তু কখন কখন দেখা যায় মদ টকিয়া গিয়াছে। এই টকিয়া যাওয়া মদকেই ভিনিগার বলে। এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া (য়্যাসেটিক্ য়্যাসিড ব্যাসিলাস্) ঐ ঘটনার কারণ। একটা হাঁড়িতে ভাত ও জল দু'-এক দিন রাখিলেই দেখা যায় হাঁড়ির জলের বেশ টক আস্বাদ হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলে য়্যাসিটিক য়্যাসিড ব্যাসিলাসের বীজ থাকে, ঐ বীজ হাঁড়ির ভাত ও জলে পড়িয়া ব্যাক্‌টিরিয়ার সংখ্যা বাড়িয়া উঠে এবং আমানি তৈয়ারী হয়।

আর এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যাহারা দুধ হইতে দই প্রস্তুত করে।

ইহাদের নাম ল্যাক্‌টিক য়্যাসিড ব্যাসিলাস্। ইহাদের সাহায্যে দুধের চিনির অংশ উক্ত য়্যাসিডে পরিণত হয়।

ল্যাক্‌টিক্ য়্যাসিড ব্যাসিলাসের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ পোল ব্যাক্‌টিরিয়া-বিদ্যাবিদ্ (Bacteriologist) মেচ্‌নিকফের (Metchnikof) দীর্ঘজীবন সম্বন্ধীয় অনুমানের (Theory) উল্লেখ না করিয়া পারা গেল না। মেচ্‌নিকফ্ বলিতেন, আমাদের পাকযন্ত্রের অন্ত্র অংশ একটি ড্রেন্‌পাইপ বিশেষ। যেমন ড্রেনের জলে নানা রকম পচনক্রিয়া চলিতে থাকে এবং উহার মধ্যে নানা জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া পাওয়া যায় তেমনই আমাদের অন্ত্রের মধ্যেও নানা জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া যেন মৌরসী পাট্টা লইয়া বসবাস করিতেছে, বংশ-বৃদ্ধি করিতেছে ও মরিতেছে। আমাদের মলের খানিকটা অংশ এই

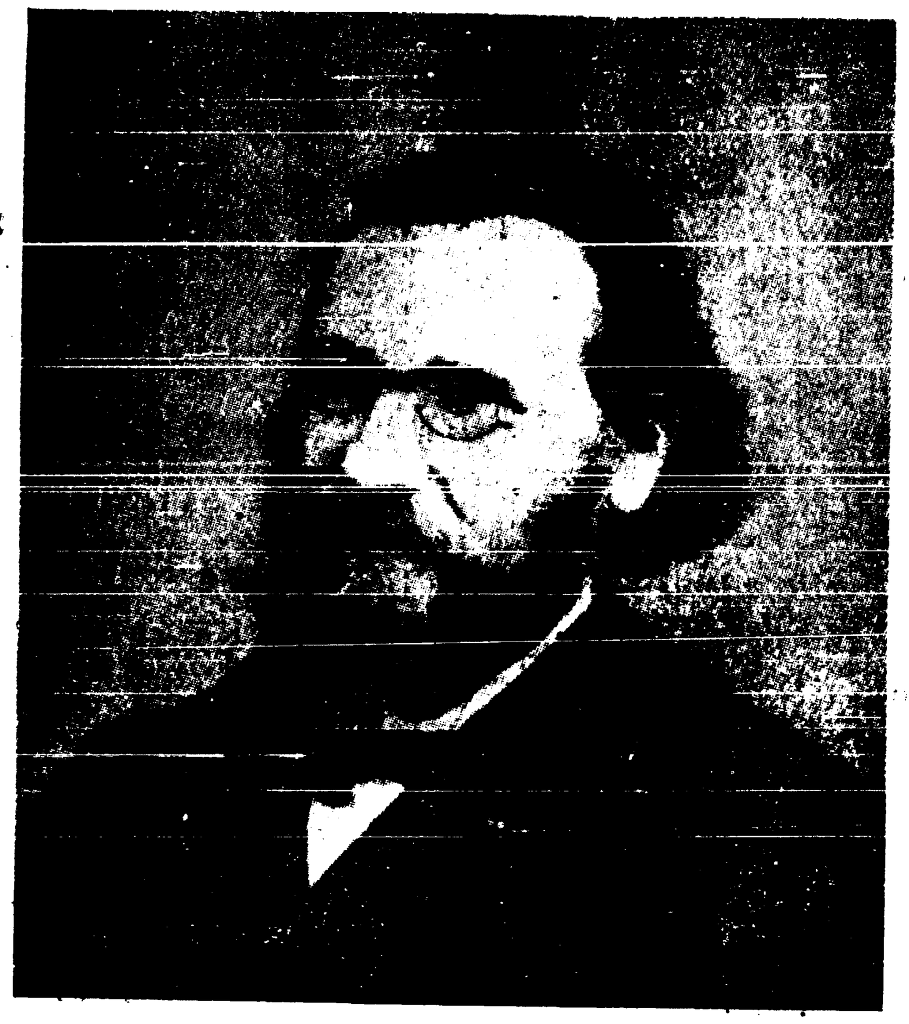

বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিদ্ মেচ্‌নিকফ্

ব্যাক্‌টিরিয়া ছাড়া আর কিছু নহে। মেচ্‌নিকফের ধারণা—কোন কোন জাতীয় অন্ত্র-ব্যাক্‌টিরিয়া আমাদের বন্ধুর কাজ করে এবং কোন কোনটা শত্রুর কাজ করে। মিত্র ব্যাক্‌টিরিয়া অন্ত্রে বেশী মাত্রায় জন্মিলে সেখানে শত্রু ব্যাক্‌টিরিয়াকে আর জন্মিতে দেয় না বা বৃদ্ধি পাইতে দেয় না। ল্যাক্‌টিক্ য়্যাসিড ব্যাক্‌টিরিয়া একটি প্রধান মিত্র-ব্যাক্‌টিরিয়া। দইয়ে ঐ ব্যাক্‌টিরিয়া থাকে, কাজেই প্রত্যহ অথবা মাঝে মাঝে দই খাইলে অন্ত্রে ল্যাক্‌টিক য়্যাসিড ব্যাক্‌টিরিয়া বাড়ে এবং উহা দীর্ঘজীবন লাভে সাহায্য করে।

পচন-ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি আমাদের শত্রু ও বন্ধু দুই-এর কাজই করে। ঘরের

ভিতরে বা কাছে পচন আরম্ভ হইলে অনিষ্টকর। কিন্তু জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ দূরে পচিলে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হইতে পারে এবং উহা প্রাণীদের জীবনধারণ কার্য্যে সহায়তা করে। এ সম্বন্ধে একটা ছোট আখ্যায়িকা বলিব। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যখন ইংরাজেরা ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তখন ফ্রান্সের উপর ইংরাজদের যুদ্ধজাহাজগুলি ব্লকেড (blocade) স্থাপন করে অর্থাৎ ফ্রান্সের সহিত বহির্জগতের বাণিজ্য বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। ফরাসীরা মহা গোলে পড়িল, কারণ বাঙ্গালা দেশ হইতে ফ্রান্সে সোরা যাওয়া বন্ধ হইল, আর এই সোরাই ছিল তখনকার যুদ্ধের প্রধান উপকরণ, বারুদ প্রস্তুত কার্য্যে উহার প্রয়োজন হইত। সোরা বন্ধ হওয়ায় ফরাসীদের বড় অসুবিধা হইল। কিন্তু বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন ফরাসী রাসায়নিকেরা। জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ যখন পচে তখন তাহার ভিতরকার নাইট্রোজেন অংশ জমির সহিত মিশিয়া সোরায় পরিণত হয়। তাঁহারা সারের গাদা তৈয়ারী করিয়া উহা হইতে সোরা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এখন জানা গিয়াছে, জমির মধ্যস্থ ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি কৃষিকার্য্যেরও বিশেষ সহায়ক। কিন্তু আজ পুঁথি বাড়িয়া গিয়াছে। সে কথা আর একদিন বলিব।

বাগানের বাঘ

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

মুকু, নমু, দীপু, মঞ্জু আর প্যাচা বাবুর সঙ্গে তোমাদের এখনো পরিচয় হয় নি বোধ হয়?

এরা হচ্ছে ভাই-বোন। দীপু আর প্যাচা হচ্ছে ভাই, মুকু, নমু আর মঞ্জু হচ্ছে বোন।

সব-চেয়ে ছোট হ'চ্ছে প্যাচা আর মঞ্জু, কিন্তু সব-চেয়ে ডানপিটে হ'চ্ছে তারা দু'জনেই। দুষ্টুমি-বুদ্ধিতে দাদা-দিদিরা তাদের কাছে থই পায় না।

তাদের জ্বালায় দাদু-বেচারার ঘুমিয়েও শান্তি নেই। মঞ্জু চুপিচুপি গিয়ে ঘুমন্ত দাদুর নাকের ভিতরে করবে নস্যির ডিবে খালি, আর কাঁচি নিয়ে প্যাচা দেবে দাদুর গোঁফ জোড়া কচ্

ক'রে ছোটে। দাদুকে শাস্তি দেবার এমনি নিত্য-নূতন ফন্দী আবিষ্কার করতে তাদের যুড়ি নেই।

মুকু, নমু আর দীপু অতটা দুষ্টুমি করে না বটে, কিন্তু দাদু যখন ভয়ানক হাঁচতে হাঁচতে জেগে উঠে ঠোঁটে হাত দিয়ে সখের গোঁফ জোড়া আর খুঁজে পান না, তখন তাদের একটুও দয়া হয় না, উল্‌টে তারা খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসেই খুন হয়। দাদু যদি রেগে ওঠেন তবে তারাও আরো জোরে হেসে ওঠে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

রাগ করলেও যে-সব নাতি-নাৎনীর হাসির ধূম বাড়ে, তাদের নিয়ে কী আর করা যায় বল? দাদু তখন নাচার হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "আচ্ছা দাদা, আচ্ছা দিদি, তোমরা কি আমাকে একটু ঘুমোতেও দেবে না?"

নমু ঘাড় নেড়ে বলে, "না, আমাদের সামনে ঘুম-টুম চলবে না।"

মুকু গম্ভীর মুখে বলে, "দাদু হ'লে ঘুমোতে নেই।"

দাদু বলেন, "তা হ'লে আমায় কি করতে হবে শুনি?"

দীপু বলে, "খালি গল্প বল্‌তে হবে।"

—"অর্থাৎ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে হবে? বেশ! এখন হুকুম কর, কি গল্প শুনতে চাও?"

দীপুর বড় সখ, বাঘ শিকার করবে। সেইজন্যে সে একটা 'এয়ার-গান'ও কিনেছে। দুই চোখ পাকিয়ে বল্‌লে, "বাঘের গল্প।"

দাদু কোন রকমে গোঁফের শোক সামলে বাঘের গল্প সুরু করলেন।

নস্যির ডিবে আর কাঁচি নিয়ে মঞ্জু আর প্যাঁচা চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঘরের বাইরে পালিয়ে

গিয়েছিল। কিন্তু গোঁফ-ছাঁটা দাদু হাঁচি থামিয়ে গল্প সুরু করেছেন শুনেই তাদের সমস্ত চক্ষুলজ্জা একেবারে ছুটে গেল। গুটি গুটি ঘরে ঢুকে দাদুর পিছনে এসে ভিজে বেড়ালের মত শান্ত ভাবে গল্প শুনতে বস্‌ল।

দাদু সেই পুরানো বই "কঙ্কাবতী"র গল্প বল্‌তে লাগলেন। বনের ভিতরে এক রকম শিকড় পাওয়া যায়, যার গুণে মানুষ নাকি বাঘের রূপধারণ করতে পারে। বলা বাহুল্য, গল্পটা জ'মে উঠল রীতিমত।

গল্প শেষ হ'লে পর দীপু বল্‌লে, "আচ্ছা দাদু, বাঘরা তো ঝোপে-জঙ্গলে থাকে?"

—"তা নয় তো কি?"

প্যাঁচা বল্‌লে, "আমাদের খিড়্‌কির বাগানে তো অনেক ঝোপঝাপ আছে! সেখানে দিনের বেলায় রোজ আমরা খেলা করি, কিন্তু বাঘ-টাঘ তো দেখি নি, দাদু!"

প্যাঁচাই যে তাঁর গোঁফজোড়াকে বলি দিয়েছে, দাদু এটা বুঝতে পেরেছিলেন, কাজেই তাকে ভয় দেখাবার জন্যে তিনি বল্‌লেন, "দিনে ওখানে বাঘ থাকে না বটে, কিন্তু রোজ রাতে আসে। এবার দুষ্টুমি করলেই তোমাদের ধ'রে নিয়ে যাবে।"

প্যাঁচা হচ্ছে বিষম ছেলে, ভয় পাবার পাত্রই নয়। বল্‌লে, "ইস্‌, গুল্‌তি ছুঁড়ে বাঘের মাথা ফাটিয়ে দেব!"

দাদু ভয়ে ভয়ে বল্‌লেন, "গুল্‌তি ছুঁড়ে বাঘের মাথা ফাটাতে চাও ফাটিও, কিন্তু দেখো ভাই, ও-জিনিষটি নিয়ে বুড়ো-দাদুর টাকের দিকে যেন টিপ কোরো না।"

সেইদিনই সন্ধ্যার আগে দাদা-দিদিদের পরামর্শ-সভার এক গোপনীয় অধিবেশন হ'ল। সভাপতিরূপে দীপুবাবু এই ছোট্ট বক্তৃতাটি দিলেন:

"দাদুর মুখে শোনা গেল, যেখানে জঙ্গল, ঝোপঝাপ থাকে সেইখানেই রাতের বেলায় বাঘেরা বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়ীর পিছনের বাগানে ফুলগাছের চেয়ে ঝোপঝাপই বেশী। দিনের বেলায় আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখেছি, তার ভিতরে গিরগিটি থাকে, বেজী থাকে, হেলে সাপ থাকে, ডাঁশ-মশা থাকে, সুতরাং রাত্তিরে সেখানে বাঘেরাই বা আসবে না কেন? আমার 'এয়ার-গান' আছে, আর প্যাঁচার আছে গুল্‌তি। আজ আমরা বাঘ-শিকার করব।"

একখানা গিনি-চকোলেট চুষতে চুষতে মুকু বল্‌লে, "কিন্তু দাদুর গল্পে শুনলি তো, সে বাঘ মানুষ-বাঘও হ'তে পারে!"

দীপু বল্‌লে, "তুমি আর হাসিও না দিদি! মানুষ কখনো বাঘ হ'তে পারে? ও-সব হ'চ্ছে গল্পের কথা।"

নমু বল্‌লে, "কিন্তু রাত্তিরে যে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি?"

—"আজ আর কেউ ঘুমবো না। বাবা-মা ঘুমোলেই আমরা পা টিপে টিপে ঘর থেকে পালিয়ে আসব।"

—"কিন্তু দীপু, রাত্তিরে বাগানে বাঘ ছাড়া আরো কেউ কেউ তো বেড়াতে আসতে পারে?"

—"আবার কে আসবে?"

—"ভূত আর পেত্নী? আমাদের দেখতে পেলে তারা কি বল্‌বে?"

এইখানেই দীপু মস্ত ধাঁধায় প'ড়ে গেল। সে বাঘ শিকার করতে পারে, কিন্তু ভূত-পেত্নীর সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়। বাপরে, তাদের পায়ের গোড়ালি নাকি সামনের দিকে! যদি "কঙ্কাবতী"র ঘ্যাঁঘো, নাকেশ্বরী প্রভৃতির উদয় হয়, তবে তাদের সামলানো তো বড় চারটি-খানিক কথা নয়! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দীপু মাথা চুলকোতে লাগল।

প্যাঁচা বল্‌লে, "ভাবচিস্ কেন দাদা, বাগানে না গিয়েও তো বাঘ শিকার করা যায়!"

—"কেমন ক'রে?"

—"বাগানের ওপরেই তো আমাদের দোতালার হল্‌-ঘর। জানলাগুলো একটুখানি ফাঁক ক'রে ভেজিয়ে রেখে আমরা লুকিয়ে বাগানের দিকে নজর রাখব। ভূতপেত্নীরা আমাদের দেখতেও পাবে না, কিন্তু বাঘ দেখলেই আমরা বন্দুক আর গুলতি ছুঁড়তে পারব।"

প্যাঁচা বয়সে ছোট হ'লে কি হয়, তার পদ্ধতিটিই যে উদ্যানবাসী প্রেতাত্মাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করবার পক্ষে সব-চেয়ে নিরাপদ, সভ্যদের মধ্যে এ-সম্বন্ধে মতভেদ হ'ল না।

কিন্তু মঞ্জু প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "বা, রে, আমার বন্দুকও নেই গুল্‌তিও নেই, আমি কি নিয়ে বাঘ শিকার করব?"

দুই দিদিই এক সঙ্গে মাথা নেড়ে ব'লে উঠল, "মেয়েরা বাঘ শিকার করে না, মেয়েরা খালি দেখে।"

কিন্তু এই কচি বয়সেই মঞ্জুর মনের মধ্যে নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেও প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "ও-সব হবে-টবে না, বাঘ-শিকার আমি করবই!"

বুদ্ধিমান্ প্যাঁচাই আবার মঞ্জুকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বল্‌লে, "হ্যাঁরে মঞ্জু, তুইও শিকার করবি বৈকি! কিন্তু সবাই এক রকম অস্তর নিলে চলবে কেন? তুই কতগুলো বড় বড় ইট-পাথর নিয়ে আয়, বাঘ দেখলেই দমাদ্দম্ ছুঁড়ে মারবি।"

রাত এগারোটার পর প্যাঁচা লেপের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখলে, মা আর বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। প্যাঁচা নিজের মনেই বল্‌লে, "বাবার সঙ্গে মা রোজ ঝগড়া করেন, তাঁর নাক নাকি ডাকে না। হুঁ, এই তো আমি নিজের কাণে শুনছি, মা'র নাক দস্তুরমত ডাকে! রোসো, কাল বাড়ীশুদ্ধু সবাইকে ব'লে দিচ্ছি।"

তার পর প্যাঁচা চিম্‌টি কেটে আর সব ভাই-বোনকে জাগিয়ে দিলে। সকলে একে একে হল্‌-ঘরে গিয়ে জুটল।

হল্‌-ঘরের একটা জানলায় গুল্‌তি নিয়ে প্যাঁচা, আর-একটা জানলায় বন্দুক নিয়ে দীপু, আর-একটা জান্‌লায় মঞ্জু গিয়ে দাঁড়াল—তার সামনে রাশীকৃত ইট-পাথর, এমন-কি দুটো ভাঙা বোতল পর্য্যন্ত। মুকু আর নমু দু'জনে এক সঙ্গে আর-একটা জান্‌লায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, তারা নিরস্ত্র—কারণ শিকার করবার নয়, কেবল শিকার দেখবারই সখ তাদের আছে।

ভেজানো জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, বাগানে আব্‌ছা চাঁদের আলো এসে চারিদিক্ ক'রে তুলেছে ছায়ামায়াময়। কোথাও জনপ্রাণী নেই—শব্দের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেবল গাছে গাছে বাতাসের কান্না আর ঝোপেঝাপে ঝিঁঝিঁদের একঘেয়ে ডাক। বাঘের দেখা বা সাড়া নেই।

কিন্তু তাদের মনের ভিতরে তখন বাসা বেঁধেছে শিকারীর ধৈর্য্য, কাজেই অন্ধকার ঘরে সবাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

হল্‌-ঘরের বড় ঘড়ীতে যখন বারোটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত বেজে গেল এবং বাঘের আশায় তারা যখন দিয়েছে জলাঞ্জলি এবং নমু ও মুকু যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চোখ মুদে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, তখন প্যাঁচার মনে হ'ল, ছায়ার মতন কি-একটা বড় মূর্ত্তি সাঁৎ ক'রে এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপে গিয়ে ঢুকল। দীপুও দেখেছিল, মঞ্জুও দেখেছিল।

ঝোপ থেকে মূর্ত্তিটা আবার যেই আত্মপ্রকাশ করলে, অমনি দীপু ছুঁড়লে হাওয়ার বন্দুক, প্যাঁচা ছুঁড়লে গুল্‌তি এবং মঞ্জু ছুঁড়লে ভাঙা বোতল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্ত্তনাদ—"বাপ রে, মা রে, ম'রে গেছি রে!"

এ যে মানুষের গলা! "ওগো মাগো, ভূত গো!" ব'লে চেঁচিয়েই নমুদিদি দিলে তীরবেগে সে ঘর থেকে চম্পট! দীপুদাদার শিকারের সখ উপে গেল, ঠক্-ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে তৎক্ষণাৎ সে বন্দুক ত্যাগ করলে। মুকুদিদির তো লেগে গেল দাঁতকপাটি! ভূতের জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু প্যাঁচা ভয় কাকে বলে জানে না, মঞ্জুও তাই। প্যাঁচা বল্‌লে, "মঞ্জু, ছোঁড়্ ইট,—আমি ছুঁড়ি গুল্‌তি। ওটা মানুষ-বাঘ, ওটাকে মেরে ওর কাছ থেকে শেকড় কেড়ে নিতে হবে!" ঝোপের উপরে ফটাফট্ গুল্‌তির গুলি আর ইট বৃষ্টি হ'তে লাগল। কিন্তু বাঘের আর সাড়াই নেই।

নমু যখন নিজেদের ঘরে ঢুকে বিছানার উপরে ঝাঁপ খেয়েছে, তখন গোলমালে তার মা-বাবার ঘুম গেছে ভেঙে। বাবা বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে নমু, কি হয়েছে ?"

—"না বাবা, বাগানে একটা ভয়ানক ভূত এসেছে"—ব'লেই সে সোজা লেপের ভিতরে ঢুকে গেল, কারণ সে জানত লেপের ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে আর ভূতের ভয় থাকে না। নমুর বাবা লাঠি নিয়ে তখনি বাগানে ছুটলেন।

বাগানের ঝোপের ভিতরে পাওয়া গেল একটা হতভাগ্য চোরের অচেতন দেহ। তার রগে লেগেছিল গুল্‌তির গুলি। তার দেহও ইট আর ভাঙা বোতলের চোটে রক্তাক্ত। কি অশুভক্ষণেই সে আজ এ-বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকেছিল! তার অবস্থা দেখে তাকে থানায় না পাঠিয়ে হাসপাতালেই পাঠানো হ'ল।

কিন্তু দাদুর অবিচারটা দেখ! কোথায় এই-সব বীর-নারী ও বীর-পুরুষকে অভিনন্দন দেবেন, না তিনি কিনা ফস্ ক'রে ব'লে বসলেন, "আজকেই ও-সর্ব্বনেশেদের এয়ারগান্ আর গুল্‌তি কেড়ে নিয়ে নিরস্ত্র করা হোক্। আমার গোঁফ ওরা কেটে নিয়েছে, এইবারে ওদের নজর পড়বে আমার টাকের ওপরে।"

দাদুর সন্দেহ সত্য কিনা জানি না, কিন্তু মুকু, নমু, দীপু, প্যাচা আর মঞ্জুকে তোমরা চিনে রাখো, কারণ ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে তোমাদের আবার দেখা হ'লেও হ'তে পারে।

কলিযুগের দধীচি

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

পুরাণে দধীচি মুনির গল্প তোমরা সবাই শুনেছ। দেবতাদের উপকার করবার জন্য তিনি নিজের দেহ থেকে হাড় খুলে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে তৈরী হ'ল ইন্দ্রের বজ্র, আর সেই বজ্র দিয়েই বৃত্রাসুরকে জব্দ ক'রে দেবতারা রেহাই পেলেন। পরের উপকারের জন্য দধীচির সেই অদ্ভুত আত্মত্যাগ মহাভারতের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছে।

কিন্তু দধীচি শুধু সেই পৌরাণিক যুগেই জন্মগ্রহণ করেন নি, যুগে যুগে পৃথিবীর নানা দেশে এই রকম দধীচির আবির্ভাব হয়েছে। জগতের কল্যাণের জন্য—পরের উপকারের জন্য এই সব মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা অদ্ভুত অদ্ভুত আত্মত্যাগ

করে গেছেন। কয়েক বছর আগে এই ধরণের কয়েকজন লোকের কথা তোমাদের বলেছিলাম, আজ আর একজনের কথা বল্‌ব।

আমাদের দেশের কথা নয়, তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায়—মেক্সিকো উপসাগরের কাছাকাছি একটি বন্দরে। নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌এর নাম তোমরা শুনেছ কি ? না হয় ম্যাপে দেখে নাও। এখান থেকে পৃথিবীর নানা জায়গায় তূলার চালান হয় ব'লে জায়গাটার কিছু নাম-ডাক আছে।

এই নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌এ জন্ এম্‌স্ নামে একজন ছুতোর মিস্ত্রীর বাস। এম্‌স্‌এর বয়স হয়েছে প্রায় সত্তর বছর। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তার জীবনীশক্তি একটুও কমে নি, মনে তার সিংহের মত তেজ, কিন্তু স্বভাবটা ফুলের মত কোমল। ছেলে-মহলে এম্‌স্‌এর ভারী খাতির। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সবাই তাকে "দাদু" বলে ডাকে, সেও তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

সেই সহরেই সেবিনা নামে একটি ছেলে থাকত। তার বয়স আঠারো বছরের বেশী নয়। সেবিনা গরীবের ছেলে; বাপ ছিল তার কৃষক। কাজেই অল্প বয়স থেকেই তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হ'ত।

একদিন কিন্তু এক ভীষণ কাণ্ড ঘট্‌ল। কাজ করতে করতে অসাবধানতায় খানিকটা চূণের গুঁড়ো এসে পড়ল সেবিনার মুখে, আর পড়বি তো পড় একেবারে তার চোখের মধ্যে। শরীরের মধ্যে চোখই বোধ হয় সব চেয়ে অনুভূতিপ্রবণ অংশ—ইংরাজীতে যাকে বলে "সেন্‌সিটিভ্"। সামান্য একটু ধোঁয়া লাগলেই চোখের অবস্থা কি হয় তা তোমরা দেখেছ, কাজেই চূণের মত ক্ষয়কারক জিনিষ চোখে পড়লে যে খুবই ভয়ের কথা তা তো বুঝতেই পার। সেবিনার ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। চূণ পড়ার ফলে তার চোখের কোমল পর্দ্দার খানিকটা অংশ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে। সেবিনা অন্ধ হয়ে গেল।

মাত্র আঠারো বছর বয়স, সামনে সমস্ত জীবন পড়ে রয়েছে। জীবনের কত সাধ, কত আশা, কিন্তু অন্ধের কাছে জীবনের কী-ই বা মূল্য! বেচারা সেবিনার জন্য কার না দুঃখ হয় ?

সেবিনা অবশ্য ডাক্তারদের শরণ নিল। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, আজকাল

আমেরিকায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হয়েছে, আমেরিকার ডাক্তারেরা অনেক কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসায় আশ্চর্য্য রকম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কাজেই তাঁরা সহজে হাল ছাড়বার লোক নন। কিন্তু, চোখের মধ্যে ক্ষত—ব্যাপারটা তো সহজ নয়! সেবিনাকে প্রায় সকলেই জবাব দিলেন। শুধু—তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন, একটা উপায় হয়তো আছে, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

সে উপায়টা কি তা বল্লে তোমরাও বুঝবে তা নিতান্তই অসম্ভব। অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক সময় চামড়া যোড়া-তালি দেবার ব্যবস্থা আছে। হয়তো কারও শরীরের ঘা শুকাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে কোন সুস্থ ব্যক্তির শরীর থেকে খানিকটা তাজা চামড়া কেটে নিয়ে রুগ্ন ব্যক্তির ঘায়ের উপর ঠিকমত বসিয়ে দিতে পারলে সে ঘা সেরে যায়। এমনি ভাবে তাজা মাংস তালি দেবার ব্যবস্থাও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে হয়েছে। ডাক্তারী ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় "গ্রাফ্‌টিং"। (সুস্থ লোকের দেহ থেকে রুগ্ন লোকের শরীরে রক্ত পরিচালন তো হামেশাই করা হয়)। ডাক্তারটি বল্লেন, এই গ্রাফ্‌টিং প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয়তো সেবিনার চোখ ভাল করা যেতে পারে।

কিন্তু সাধারণ গ্রাফ্‌টিং আর এই গ্রাফ্‌টিংএ আকাশ-পাতাল তফাৎ। গায়ের ওপর থেকে এক পল্লা চামড়া কেটে নিলে কষ্ট খুবই হয় স্বীকার করছি, কিন্তু কালে সে ঘা শুকিয়ে যায়। কিন্তু কোন সুস্থ লোকের চোখ থেকে পর্দ্দার খানিকটা অংশ কেটে নেওয়া মানে সে লোকটিকে অন্ধ করে দেওয়া। পরের চোখ ভাল করবার জন্য নিজের একটা চোখ নষ্ট করে ফেলতে পারে এমন মানুষ কি আর সত্যি আছে? কাজেই বল্‌ছিলাম এ এক অসম্ভব আশা।

তবু ডাক্তারেরা একটু-আধটু খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। কিন্তু কেউ রাজী হ'ল না; সেবিনা হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন কথাটা বুড়ো জন্ এম্‌স্‌এর কানে এল।

তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে? সব শুনে এম্‌স্ এগিয়ে এল। সে কি বল্লে জান? বল্লে, "আমি আমার জীবনের দীর্ঘ সত্তর বছর কাটিয়ে এসেছি, আর ক'টা দিনই বা বাঁচব? বাকী দিন ক'টার জন্য একটা চোখই আমার যথেষ্ট। আমার

একটা চোখ নিয়ে যদি এই ছোট ছেলেটি দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পায় তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা কি হ'তে পারে!"

তার পর? তার পর এম্‌স্ স্বেচ্ছায় ডাক্তারদের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। ডাক্তারেরা সামান্য একজন ছুতোর মিস্ত্রীর মধ্যে এত বড় একটা হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁরা সেবিনা আর এম্‌স্ দু'জনকেই ডেকে নিলেন।

যথা সময়ে দু'জনেরই চোখে অস্ত্রোপচার করা হ'ল। ডাক্তারী-শাস্ত্রেও এ ধরণের পরীক্ষা কোন দিন হয় নি। যদি কৃতকার্য্য না হন! তাঁদের মনের ভাবটা বোধ হয় আন্দাজ করতে পারছ।

দীর্ঘ এক মাস পরে দু'জনেরই ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হল। সেবিনা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, এম্‌স্ একটা চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মুখে তার তৃপ্তির হাসি।

ইতিহাসের পাতায় হয়তো জন্ এম্‌স্‌এর নাম কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামান্য একজন ছুতোর সে—কোন বড় রাজাও নয়, রাষ্ট্রনায়কও নয় বা বড় সেনাপতিও নয়; কাজেই ইতিহাসকারদের কাছে তার নামের হয়তো কোনই মূল্য নেই। কিন্তু তোমরা ব'লো, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অপরূপ দানের কথা তোমরা কখনও শুনেছ? মানবতার ইতিহাসে এই নগণ্য ছুতোর মিস্ত্রীর নাম দধীচির নামের পাশেই লেখা থাকবে।

আগমনী

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

"রামধনু'র পাঠক-পাঠিকারা ভাব্‌ছেন, নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ। নয়তো মাঘ মাসে "আগমনী" কি রকম ব্যাপার?

কিন্তু আমি শারদীয়া আগমনী বা দুর্গোৎসবের কথা লিখ্‌তে বসি নি। 'আগমনী' একটি মেয়ের নাম এবং তাকে সে নাম ঠিকই দেওয়া হ'য়েছে। সে

দুর্গাই বটে, সে বাড়ীতে এলে চারদিকে আনন্দের উৎসবই হয়; তার অমায়িক ও সুন্দর মুখখানি দেখ্‌লে ভালো না বেসে থাকা যায় না।

তোমাদের সবার মতো সেও গল্প শুন্‌তে খুব ভালোবাসে কিন্তু রাজকন্যার গল্প নয়। আমি যখন বলি, "ধরো, তোমার বাবা প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন তোমার বর হবে সব সেরা, এই রকম রাজাও কঠিন পণ ক'রেছেন যে রাজকন্যার বর হবে—" সে বাধা দিয়ে বলে, 'দাদু, এমন কবিবর থাক্‌তে অন্য বরের কথা আমি শুন্‌তে চাই না। আপনি একটা বায়োস্কোপের গল্প বলুন।" বায়োস্কোপ্ দেখ্‌তে সে বড্ড ভালোবাসে।

আমি তখন বানিয়ে বানিয়ে বলি, "ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে তিরিশ হাজার আট শ' ছাপ্পান্ন বছর আগে একটি দেশ ছিল তার নাম 'প্রসূনপুর'। একদিন দেখা গেল সেখানকার রাজবাড়ির দিকে দেশশুদ্ধ লোক চ'লেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, প্রাসাদে বায়োস্কোপ হবে।

ছবি সুরু হোলো। ছবির নাম হোলো "অচলা লক্ষ্মী"। তার বিষয়টি হোলো এই: একদিন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়ে নারদ নারায়ণকে জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন, 'কোন্ উপায়ে মেয়েরা চিরদিন সুখ-সৌভাগ্য ভোগ ক'র্‌তে পারে আর কি ক'র্‌লে লক্ষ্মী তাদের কাছে অচলা হ'য়ে থাকেন?' নারায়ণ স্বয়ং লক্ষ্মীকে নারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ ক'র্‌লে, তিনি ব'ল্‌লেন :—

'যে ব্রত ক'র্‌লে আমি লোকের ঘরে অচলা হ'য়ে থাকি, তার নিয়ম হ'চ্ছে এই, যে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে তা আরম্ভ ক'র্‌তে হয়, আর ছ' বছর পালন ক'র্‌তে হয়। প্রত্যেক মাসের ঐ তিথিতে আমাদের পূজো ক'র্‌তে হয় ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, পান আর নৈবেদ্য দিয়ে। যে ব্রত ক'রবে। প্রথম বছরে ব্রতর দিনে সে নুন খাবে না। পরের দু' বছর সে হবিষ্য ক'র্‌বে, তার পরের বছর দুটিতে সে একটি ক'রে ফল খাবে, আর শেষের বছর সে নিজে উপোস্ ক'র্‌বে কিন্তু আর সবাইকে খাওয়াবে। এই ব্রতের ফলে আমি অচলা হ'য়ে ব্রতচারীর ঘরে থাকি, মেয়েরা সুন্দর, সরল, স্বাস্থ্যবতী ও সুখী হয় আর আগমনীর বিয়ে হয়। ছবি দেখে নাত্‌নীর দল ছবির পর্দ্দা ছুঁয়ে দিব্যি ক'র্‌লে তারা ঐ ব্রত

ক'র্‌বেই। এই ছবি তৈরী ক'রেছিলেন "ত্রিদিব চিত্রসঙ্ঘ", এর ডাইরেক্টার নারদ, নায়িকা ও নায়ক লক্ষ্মীনারায়ণ।"

সব শুনে আগমনী ব'ল্লে, "নিশ্চয়ই আপনার বানানো গল্প।" তাকে ব'ল্‌লুম, "হ্যাঁ, কিন্তু গল্প আমার নিজের তৈরী নয়—আমাদের 'ষট্‌পঞ্চমী' ব্রতের কথা, আমার দ্বারা সামান্য একটু বদল করা।"

ধূমকেতু

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি)

[এই ছোট উপন্যাসখানি অল্প কয়েক সংখ্যার মধ্যেই শেষ হইবে। আগামী বৈশাখ হইতে আর একটি বড় ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখা ধারাবাহিক উপন্যাস রামধনুতে বাহির হইবে। —রাঃ সঃ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দু'টা বাজিয়া গেল। নিশুতি রাত, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই, সমস্ত পৃথিবী অঘোরে ঘুমাইতেছে।

শুধু ডক্টর রুদ্রের চোখে ঘুম নাই। আজ যেন তাঁকে বড় বেশী উত্তেজিত দেখাইতেছে। একবার করিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড বইএর পাতা উল্টাইতেছেন,—কাগজ টানিয়া হিজিবিজি কি অঙ্ক কষিতেছেন, তার পর অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া তাঁর বিরাট্ টেলিস্কোপের নীচে চোখ পাতিয়া অভিনিবেশ সহকারে কি দেখিতেছেন!

ঘড়িতে তিনটা বাজিল। অগ্রহায়ণ মাস পড়িয়াছে। আকাশ সচরাচর এতটা পরিষ্কার থাকে না, কিন্তু আজ যেন ডক্টর রুদ্রকে পাগল করিবার জন্যই সে তার সমস্ত আবরণ ফেলিয়া দিয়াছে। চাঁদ হাসিতেছে, ছায়াপথ হাসিতেছে, লক্ষ লক্ষ তারারা দল বাঁধিয়া মিটি মিটি হাসিতেছে।—আকাশের সমস্ত রহস্য যেন আজ তারা ডক্টর রুদ্রের কাছে ফাঁস করিয়া দিতে চায়।

ডক্টর রুদ্র কে সে কথা তোমাদের নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হইবে না। আমি রাঙ্গাপাহাড়

অবজারভেটারীর ডিরেক্টর—পৃথিবীবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ডক্টর রুদ্রের কথাই বলিতেছি। গত ১৯৭২ সনে 'আরিয়াভাট্' বা 'আর্য্যভট্ট' নামক নতুন গ্রহ আবিষ্কারের পর হইতেই দুনিয়ার পণ্ডিতমহলে তাঁর নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার পরের বছরই তিনি নোবেল প্রাইজ্ পান।

ডক্টর রুদ্রের বয়স হইয়াছে, কিন্তু তাঁর অসাধারণ কর্ম্মশক্তি এক তিলও কমে নাই। এখনও তিনি যুবকের মত উদ্যম লইয়া সমানে তাঁর গবেষণায় মাতিয়া আছেন। নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে তাঁর নূতন নতুন আবিষ্কারে জগৎ আজ স্তম্ভিত।

কিন্তু গত কয়েক দিন ধরিয়া ডক্টর রুদ্রকে যেন কেমন একটু উন্মনা দেখাইতেছে।

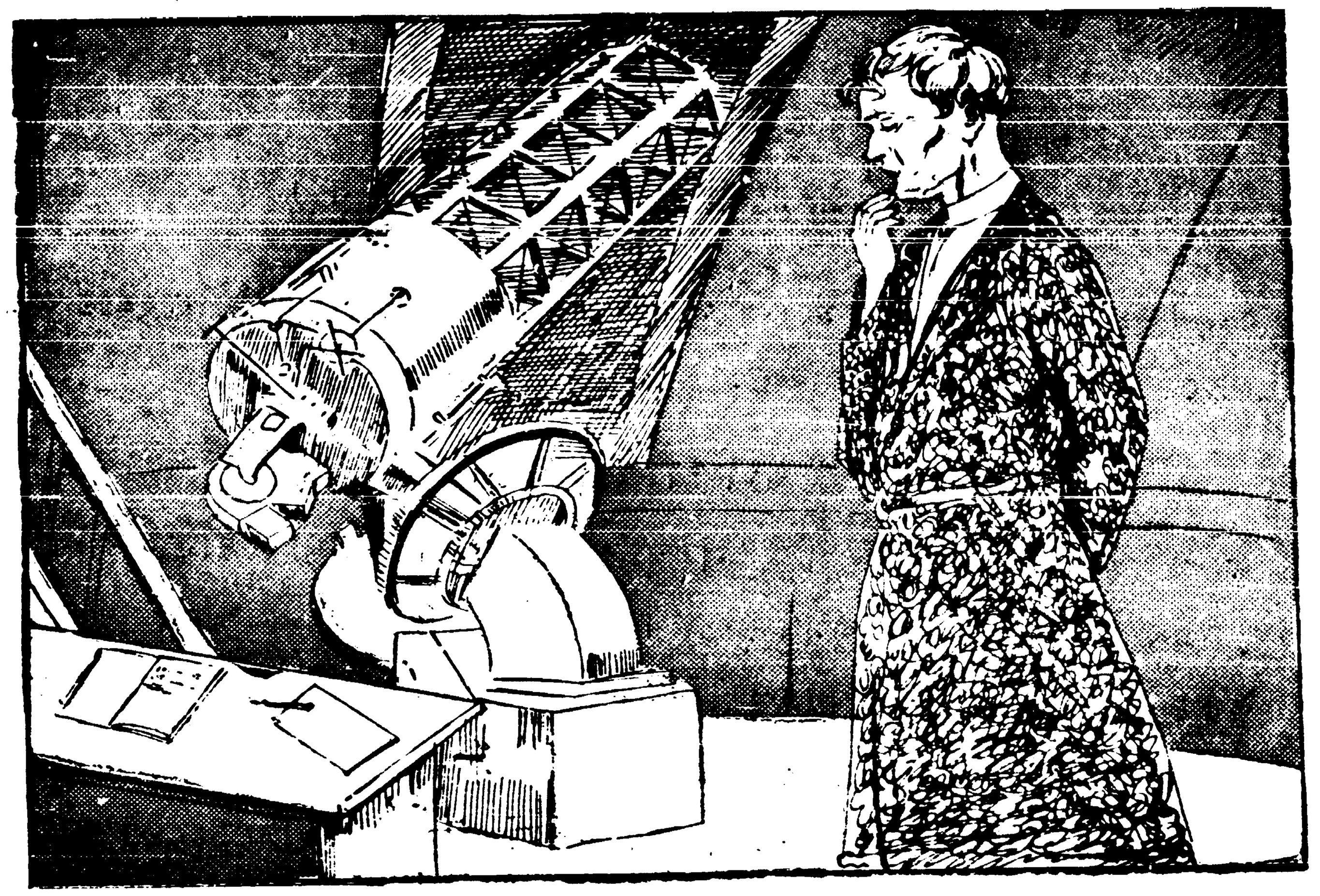

ডক্টর রুদ্রকে···উন্মনা দেখাইতেছে!

কয়েকদিন ধরিয়া তিনি প্রায় সমস্ত সময়ই অবজারভেটারীর মধ্যে কাটাইতেছেন। তাঁর খাস বেয়ারা বংশীলাল বলিতেছে, "চার-পাঁন রোজসে ডক্টর সাহেব না নিজে ঘুমিয়েছেন, না দিয়েছেন হামাকে ঘুমাতে। কেবল কাজ—কাজ—কাজ,—কী রে বাবা! মারিয়ে ফেলবে নাকি!"

কিন্তু বংশীলালের কঠোর সমালোচনাও ডক্টর রুদ্রকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ তাঁর কাজ আরও বাড়িয়াছে, ফলে বংশীলালও রেহাই পায় নাই। তবে সাহেব নাকি তাকে বড় 'পসিন' করেন, টাকাটা সিকিটা যখন তখন বখসিস্ করেন তাই বংশীলাল

বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে নাই, শুধু দেশওয়ালী ভাইদের কাছে হৃদয়-ব্যথা নিবেদন করিয়াই আপাততঃ সে ক্ষান্ত আছে। তবে একটা জিনিষ সে বরাবরই লক্ষ্য করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ডক্টর রুদ্র যখনই একটা বড় আবিষ্কার করিতেন তখনই তাঁকে অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখাইত। এমন কি, বংশী কত বার দেখিয়াছে, এক-একটা নতুন. নতুন তথ্য বাহির হইয়াছে আর ডক্টর সাহেব ছোট ছেলের মত আহ্লাদে হাততালি দিয়া উঠিয়াছেন। বংশীলালও সে আনন্দের অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হয় নাই। সিকি রূপে, আধুলি রূপে, টাকা রূপে—এমন কি কয়েকবার নোট রূপেও সে আনন্দের ভাগ তার করায়ত্ত হইয়াছে। কিন্তু এবার ডক্টর সাহেবের মুখে হাসি নাই। নতুন নতুন তথ্য এবারেও বাহির হইতেছে সে বিষয়ে বংশী নিঃসন্দেহ, কিন্তু তবু ডক্টর সাহেব সর্ব্বদাই কেমন বিষণ্ণ! এ তো ভাল কথা নয়!

খবরের কাগজওয়ালারা অবশ্য চুপ্‌চাপ্ নাই। সম্ভব অসম্ভব, সত্যি মিথ্যা, আজব গুজব সব কিছুই তারা নির্ব্বিবাদে কাগজে ছাপাইয়া যাইতেছে আর পৃথিবী শুদ্ধ লোক প্রত্যহ অজগরের মত সে সব কাল্পনিক খবর গিলিতেছে। গত ১৯৩৯-১৯৪০ সনের মহাযুদ্ধের পর কিছু কালের জন্য কাগজওয়ালাদের দিন ফিরিয়াছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটিয়া গেল! ১৯৪৯এ আমেরিকার সঙ্গে জাপানের বিরোধ বাধিল; ১৯৫২ সনে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল জার্ম্মেনীকে। এদিকে স্বাধীন ফিলিপাইন রাষ্ট্র আর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শ্যাম তো প্রশান্ত মহাসাগরে এক তুমুল ব্যাপার বাধাইয়া তুলিল—সেটা বোধ হয় ১৯৫৮ সন। ওদিকে ট্রান্স-ইয়োরোপীয়ান্ রেল-কোম্পানীর দখল লইয়া নানা দেশের মধ্যে ছোটখাট বিরোধ তো কিছুদিন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া পড়িল। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'গ্রীণ্ ইউথ্' দলের সামাজিক বিদ্রোহ, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপের ইহুদী-বিদ্রোহ, ১৯৬৪ সনে চীনে টুং চুং বিপ্লব—কত আর নাম করিব! কিছুদিন খবরের কাগজওয়ালারা কি টাকাটাই না লুটিয়াছে! তার পর ১৯৭০ সনে জাপানী দার্শনিক পরোটা, ফরাসী রাষ্ট্রনেতা মসিয় বুঁদে, হল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মান্‌হীর ভ্যান্ ফ্লাই আর বহুভাষাবিদ্ বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক চারুচন্দ্রের আপ্রাণ চেষ্টায় দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-বৈঠক শেষ হইবার পর খবর-কাগজওয়ালাদের অন্ন কমিয়াছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে আর কোথাও কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই, তেমন "রগ্‌রগে" খবরও তাই জুটিতেছে না। এখন, ধরিতে গেলে শুধু বৈজ্ঞানিকদের কল্যাণেই কাগজগুলি কোন রকমে টিকিয়া আছে। গত কয়েক বছর যাবত এমন কয়েকটা বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে যার সবগুলিকেই যুগান্তকারী বলা যাইতে পারে—এবং যার সাহায্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাগজকে গরম রাখা যায়। ডক্টর রুদ্রের গতিবিধির দিকেও তাই কগজওয়ালারা হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের 'উনপঞ্চাশীয়া' কাগজ হইতে কয়েক দিনের খবর তুলিয়া দিতেছি :—

আবার অভাবনীয় আবিষ্কার

ডক্টর রুদ্রের অসাধ্য সাধন

সত্যই কি আবার সম্ভব হইবে ? সহরে প্রবল জনশ্রুতি।

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৫

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ডক্টর রুদ্র আজ কয়েকদিন যাবত রাঙ্গাপাহাড় অবজারভেটারীতে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ আছেন। এবার তিনি গ্রহলোকের কোন্ নূতন বার্ত্তা আনিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাঁহার খাস সহকারী বংশীলালজি আমাদের প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে সাহেবকে কয়েকদিন হইল অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইতেছে। বংশীলাল ইহাও বলিয়াছেন যে গতকল্য রাত্রে ডক্টর সাহেবের মোটেই নিদ্রা হয় নাই।

* * *

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৫

গত কল্য ডক্টর রুদ্রকে একটু প্রফুল্ল দেখা গিয়াছে। তিনি প্রায় ৫।৬ বার নস্য লইয়াছেন ও বংশীলাল বাবুকে পান খাইবার জন্য একটি রৌপ্যখণ্ড দিয়াছেন। উক্ত রৌপ্যখণ্ডের আয়তন বা ওজন এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

* * *

৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৫

...ডক্টর রুদ্র গত রাত্রে আবার কেমন অন্যমনস্ক ভাবে দিন কাটাইয়াছেন। বংশীলালজিকে 'দি ইণ্টারন্যাশনাল ভিড়ি য্যাণ্ড্ বীট্‌ল্ সাপ্লাই করপোরেশন্ লিঃ' হইতে এক বাক্স নাম্বার ওয়ান্ 'সুইট্ বীট্‌ল্' আনিতে দিয়া চেঞ্জ লইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জগড়্‌নাথ মহাপাত্র ইহাও বলিতেছেন যে ডক্টর রুদ্র প্রত্যেক বিখ্যাত আবিষ্কারের আগে এইরূপ একবাক্স নাম্বার ওয়ান্ সুইট্ বীট্‌ল্ কিনিয়া থাকেন—(বিজ্ঞাপন)]

* * *

৯ই জানুয়ারী, ১৯৭৫

...খুব সম্ভবতঃ ডক্টর রুদ্র আগামী কল্য সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিবেন...।

* * *

কয়েক দিন পরের কথা। দিন ৩।৪ হইল ডক্টর রুদ্রের বিবৃতি কাগজে বাহির হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী শুদ্ধ পণ্ডিত-মহলে এক প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ডক্টর রুদ্র এই বিবৃতিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তা যেমন অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য। সাধারণ কোন

বৈজ্ঞানিক এ কথা লিখিলে লোকে হয়তো তাঁকে রাঁচীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইত কিন্তু ডক্টর রুদ্রের মত লোকের কথা তো আর সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না! তবুও অনেক পণ্ডিত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হালুয়াচাই তো স্পষ্টই জানাইয়াছেন—ডক্টর রুদ্রের এবার অবসর নেওয়া উচিত। নহিলে তিনি শুধু এরূপ নতুন নতুন অজগুবি কথাই শোনাইতে থাকিবেন। গত বৎসরও মঙ্গল গ্রহের প্রাণী সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন কিন্তু তার কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া গিয়াছিল ?

কথাটা তবে খুলিয়াই বলা যাক্। ডক্টর রুদ্রের মতে কয়েক বছরের মধ্যেই একটা অতিকায় ধূমকেতু পৃথিবীর চলার পথে আসিয়া পড়িবে। ধূমকেতুরাও গ্রহের মত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু:তাদের ঘুরিবার নিয়ম এক একটার এক এক রকম। এই ধূমকেতুটি প্রতি ২০ হাজার বছর পর পর একবার করিয়া আসিয়া দেখা দেয়। আজ হইতে ঠিক চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পৃথিবীর সঙ্গে এই ধূমকেতুটির সংঘর্ষ হইবে। সাধারণ ধূমকেতুগুলির শরীর অত্যন্ত হাল্কা গ্যাসে তৈরী, তাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগিলে পৃথিবীর কিছুই ক্ষতি হয় না, উল্টা তাদেরই অনেকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। কিন্তু এই অতিকায় ধূমকেতুটির সঙ্গে ঐ সব ধূমকেতুর তুলনা হয় না। এটি আকারেও যেমন সাধারণ ধূমকেতুগুলির চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়, এর শরীরও তেমনি অতিরিক্ত রকম ঘন। সাধারণ এক একটা ধূমকেতু যে বেগে ছোটে এটি তার চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ জোরে ছুটিয়া আসিতেছে, কাজেই পৃথিবীর সঙ্গে এর সঙ্ঘর্ষ হইলে উহা একেবারে হেলা-ফেলার ব্যাপার হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক কিছুই হইতে পারে। পৃথিবী ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতে পারে, আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে, ধূমকেতুর টানে পথ হারাইরা এদিক্ ওদিকে চলিয়া যাইতে পারে এবং যদিবা ও সবের কোনটা না হয় তবে অন্ততঃ পক্ষে ধাক্কা খাইয়া পৃথিবী একটু কাৎ হইয়া যাইবে তা নিঃসন্দেহ, এবং তার মানেই প্রলয়। সেই মহাপ্রলয়ের দিন চার বছর পরেই আসিবে।

ইহার পর ডক্টর রুদ্র প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টকে বিষয়টি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছেন—এবং সময় থাকিতে থাকিতে কিছু করা সম্ভব কিনা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিবৃতির বাকী অংশটা ডক্টর রুদ্রের ভবিষ্যদ্বাণীর স্বপক্ষে নানা রকম যুক্তি;—সেগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের গণিতশাস্ত্রের ব্যাপার, সাধারণ লোকের তা'তে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই।

(ক্রমশঃ)

ভ্যাঙাচ্ছিলাম না ত’

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

(১)

ভ্যাঙাচ্ছিলাম না ত’ !
নাকের ডগায় তিনটে মশা
বসেছিল, তাই এ দশা,
মুখখানা তাই ভেঙ্‌চে গেছে—
মানছি আমি তা’ ত’ ।
দোহাই গুরু, ইচ্ছে করে
ভ্যাঙাচ্ছিলাম না ত’ ।

(২)

এবার ক্ষমা কর ।
নাকে হঠাৎ নস্যি ঢুকে
দস্যি হাঁচি আস্‌ল মুখে—
সেই হাঁচিটি চাপতে গিয়ে
বিপদ্ হ’ল বড় ।
মুখখানা তাই কুঁচ্‌কে গেছে
এবার ক্ষমা কর ।

(৩)

ভ্যাঙাইনি ক’ গুরু !
কানের ভেতর ঢুক্‌ল মাছি
মুখখানি তাই সিঁট্‌কে আছি,
তা’তেই আমার এমন দশা—
কুঁচ্‌কে গেছে ভুরু
ভ্যাঙাইনি ক’ গুরু, আমি
ভ্যাঙাইনি ক’ গুরু ।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে ।]

১ । নিম্নলিখিতদের সম্বন্ধে কি জান ?—
মোহেনজোদড়ো, ব্রাহ্মী, মাওরী, হানিম্যান্, লুভর্ ।

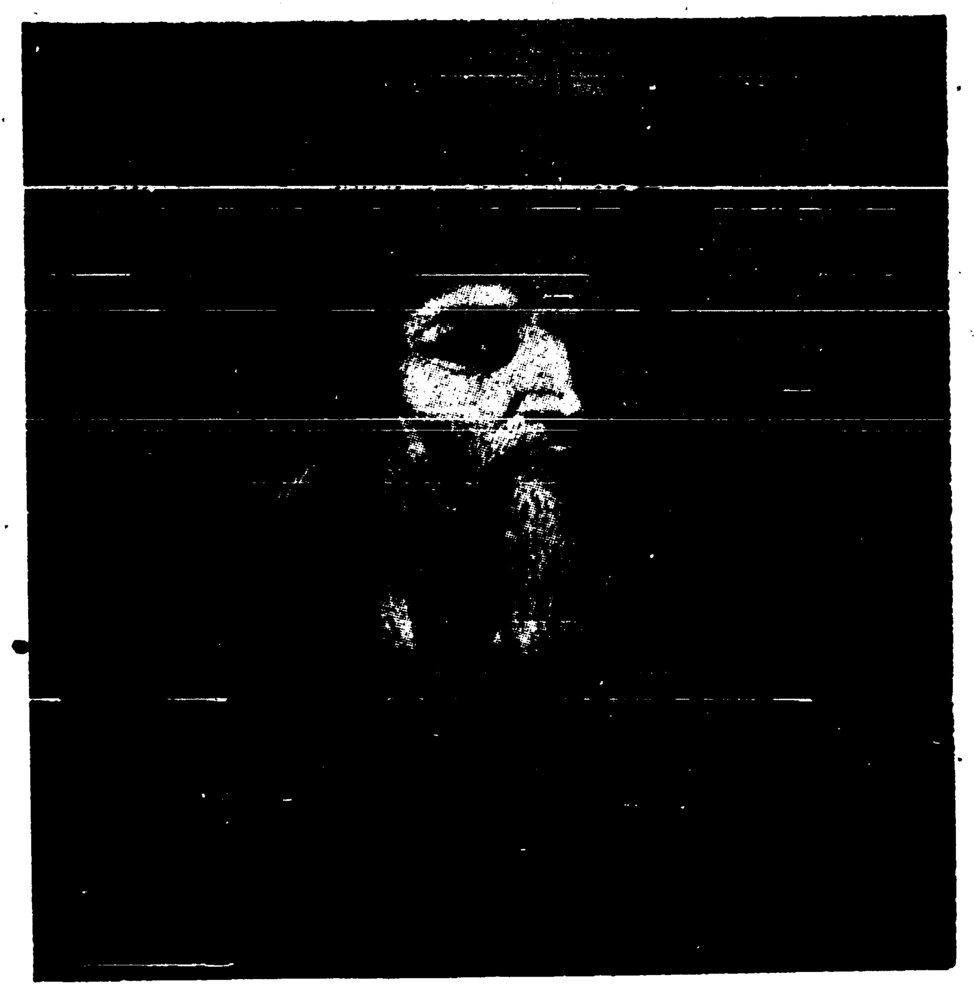

২ । বাংলার বিখ্যাত কবিদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্মিনী, মাইকেলের মেঘদূত-বধ, নবীনচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও পলাশীর যুদ্ধ, তুলসীদাসের রামায়ণ ও জলধর সেনের হিমালয় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ । কথাগুলির মধ্যে কি কোনও ভুল আছে ?

৩ । শব্দের উৎপত্তি হয় কি করিয়া ?

৪ । পাশের ছবিটি দেখিয়া বল ওটি কার ছবি ।

যার যেমন অভ্যাস

[প্রবন্ধ]

(শ্রীমিহির রায়)

আমাদের পাড়ার লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে তোমাদের আলাপ নেই নিশ্চয়ই ? ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার আলাপ করে দেখো । তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, “আচ্ছা, অমুক বইটা পাওয়া যাবে কি ?” তৎক্ষণাৎ জবাব পাবে, “বুঝলেন কিনা,

ও বইটা—বুঝলেন কিনা, ও বইটা এই কালই বেরিয়ে গেছে—বুঝলেন কিনা।” তুমি বুঝলেও তাঁর প্রশ্নের বিরতি হবে না, কারণ ওটা তাঁর অভ্যাস—যাকে বলে মুদ্রাদোষ। এই অদ্ভুত “অভ্যাস” ছাড়া বড় কষ্টকর, একবার হয়ে পড়লে সহজে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

এই লাইব্রেরিয়ান্ ভদ্রলোকের মত কথার মুদ্রাদোষ আমাদের অনেকেরই আছে। যেমন কথার ফাঁকে ফাঁকে ক্রমাগত ‘বুঝেছ’ (কেউ কেউ আবার বলেন ‘বুঁয়েছ’), ‘য়্যাঁ’, ‘নাকি’, ‘মানে’, ‘আই মিন্’, ‘ওয়েল্’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা। কেউ কেউ আবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম মুখচোখেরও বিকৃতি করেন—কেউ কথায় কথায় ভুরু কোঁচকান, কেউ বা দু’ আঙ্গুলে চশমা ধরে তাকে পুনঃ পুনঃ নাকের যথাস্থানে বসাতে চেষ্টা করেন। কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ কলেজে কিছু দিন আগে একজন সাহেব প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি এক-একটা কথার পর অদ্ভুত রকম মুখভঙ্গী করতেন। অমন পণ্ডিত লোক, কিন্তু তাঁর ঐ হাস্যকর মুখভঙ্গী দেখে আড়ালে প্রত্যেকেই মুখ টিপে হাসত।

কাপড়ের খুঁট চিবোনো মেয়েদের মধ্যে একটা খুবই সাধারণ মুদ্রাদোষ বলা যেতে পারে। তেমনিধারা ছেলেদেরও কলম বা পেন্সিল মুখে পোরা। অনেক কলেজের মেয়েকে দেখেছি, নিত্য-নতুন ফ্যাশনে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন, কিন্তু এই কাপড় চিবোনো অভ্যাস তাঁদের যায় নি।

কিন্তু এ সব তো ছোটখাট মুদ্রাদোষ. কোন কোন লোকের এমন কতকগুলি অভ্যাস আছে যা শুনলে দস্তুরমত অবাক্ হ’তে হয়। কিছু দিন আগে একবার ট্রামে যাচ্ছি, পথে এক ভদ্রলোক উঠলেন, এবং যথা সময়ে কণ্ডাক্টারের কাছ থেকে টিকেটও কিনলেন। তার পরই এক অদ্ভুত কাণ্ড! ভদ্রলোক টিকেটটা মোলায়েম ভাবে মুখে পূরে দিলেন এবং নির্ব্বিকার চিত্তে পান চিবোবার মত ক’রে সেটা চিবুতে লাগলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হ’ল জিনিষটা যেন অত্যন্ত সরস। তার পরেই এল চেকার, কিন্তু ভদ্রলোকের টিকেট তখন মুখগহ্বরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পর আবার তাঁকে একটা টিকেট কিনতে হ’ল। ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম—এ রকম নাকি তাঁর প্রায়ই হয় এবং ফলে অনেক

সময়েই একাধিক টিকেট কিনতে হয়। কিছু দিন আগে কাগজে এই রকম এক মেমসাহেবের কথা পড়েছিলাম। তাঁর অভ্যাস ছিল খবরের কাগজ খাওয়া। তাঁর স্বামীকে নাকি প্রত্যহ দু’খানি করে কাগজ কিনতে হ’ত,—একটি পড়বার জন্য, একটি স্ত্রীর জলযোগের জন্য। অদ্ভুত অভ্যাস সন্দেহ নেই।

আর এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছি। এমনি তিনি দিব্যি থাকেন, কিন্তু সামনে একখানা আয়না পড়লে আর রক্ষা নেই। তা সে মিটিংএই হোক্ আর যে জায়গায়ই হোক্। আয়না দেখলেই তিনি তার সামনে জাঁকিয়ে বসবেন, তার পর একটি একটি ক’রে নিজের পাকা বা আধপাকা বা কাঁচা গোঁফ ছিঁড়তে আরম্ভ করবেন। শুধু ছেঁড়া নয়, গোঁফ ছিঁড়ে সেগুলো খানিকক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে তবে তিনি তাদের অব্যাহতি দেবেন। এর কোন কারণ আছে কিনা তা তিনিই জানেন, তবে মনে হয়, তিনি যে তাঁর বিশাল গোঁফ যোড়া রেখেছেন সে শুধু এই বিলাসটুকুর জন্যই।

আর এক ভদ্রলোককে জানি, তাঁরও অনেকটা এই রকম অভ্যাস আছে; তবে গোঁফ নয়, তিনি ভালবাসেন চুল ছিঁড়তে। অন্যমনস্ক থাকলেই তিনি মাথার চুল ছিঁড়বেন, চুলের গোড়ায় যে সাদা পদার্থটি থাকে তা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করবেন, তার পর সেটি চুষতে সুরু করে দেবেন। তাঁর একটি ভাই-ঝি আছেন তাঁরও ঠিক এই অভ্যাস। অথচ মেয়েটি খুব কেতাদুরস্ত, আজ বাদে কাল কলেজে উঠবেন। কিন্তু অভ্যাস!

রাগের সময় নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এক সাহেবের গল্প শুনেছি, তিনি রাগের সময় শুধু পেন্সিল চিবুতেন। যখনই তাঁর রাগ হ’ত কর্ম্মচারীরা তাঁর হাতে একটির পর একটি পেন্সিল গুঁজে দিত। দশ-বারোটা পেন্সিল দাঁতে ধ্বংস না ক’রে তাঁর রাগ পড়্‌ত না। রাগের সময় হাতের কাছে পেন্সিল না পেলে তিনি প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়ে তুলতেন।

আর একজন আমেরিকান্ সাহেবের কথা শুনেছি। তিনি রাগের সময় হাতের কাছে যা পেতেন—টেবিল, চেয়ার, আলমারী, দরজা—সবের ওপর কিল-ঘুঁষি চালাতেন আর বলতেন, ‘তোমায় যদি এ ভাবে পিটতে পারতাম!’

বেচারার এই অদ্ভুত অভ্যাসের জন্য বিরক্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী শেষে আনেন বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা।

আর একটি ভদ্রলোকের কথা বলে আজ শেষ করব। আমারই পরিচিত এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক হয়তো একলা ঘরে বসে বই পড়ছেন, কিন্তু হঠাৎ দেখলে তোমার মনে হবে তিনি যুদ্ধ করছেন। সে কি আস্ফালন!—হাত নাড়া, মুখ নাড়া, দাঁত খিঁচোনো বা সময় বিশেষে অট্টহাসি বা শরীর দোলানো! ভদ্রলোকের দৈনিক ব্যায়ামের কাজ বোধ হয় বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়।

কিন্তু আগেই বলেছি এ সব অভ্যাস, এদের ছাড়ান বড় কষ্টকর—প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। ছাড়তে পারে তারাই যাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল; কিন্তু তা আর ক' জনের আছে?

শেষ পাতা

(শ্রীদীপ্তেন্দ্র সান্যাল)

গ্রামের লোকের কোলাহল যেখানে আর শোনা যায় না, সেই শেষ প্রান্তে, পায়ে-চলা পথের শেষে, একটা ছোট্ট বাড়ীতে থাকৃত এক শিল্পী।

বাড়ীর উপরটায় থাকৃত শিল্পী আর তার ছোট্ট আট ন'বছরের একটি বোন। নীচে থাকৃত এক বুড়ো; নানান্ রকম কাগজের ফুল-পাতা সে অবিকল গাছের ফুল-পাতার মত তৈরী করতে পারত। আর তাই বিক্রী করেই চল্‌ত তার দিন।

ছোট্ট মেয়েটীর আর কেউ ছিল না ওই এক দাদা ছাড়া। তার যত আবদার ছিল ঐ দাদার কাছে। আর একজন যে তাকে বড় ভালবাসত সে ঐ নীচ-তলার বুড়ো। নানা রকমের ফুল-পাতা তৈরী করে সে ছোট মেয়েটীকে উপহার দিত।

শিল্পী গরীব হ'লেও সব দুঃখ ভুলেছিল ছোট বোনটিকে পেয়ে। বুড়োকেও তার লেগেছিল ভাল। দিন তাদের বেশ কেটে যাচ্ছিল। শিল্পী বেচত তার ছবি, বুড়ো বেচত তার ফুল, ছোট মেয়েটী খেলত আপন মনে।

বেশ দিন যাচ্ছিল, হঠাৎ তাদের জীবনে এল ঝড়।

ছোট মেয়েটি পড়েছে অসুখে। গরীব শিল্পী ছবি বেচে যা পায় ত দিয়ে দেখায় ডাক্তার। ডাক্তার বলে, রোগীর মনের স্বাস্থ্য যদি রাখ্‌তে পার অক্ষুণ্ণ তবেই ওর বাইরের স্বাস্থ্য আস্‌বে ফিরে।

মেয়েটি কিন্তু কেমন মন-মরা হয়ে থাকে। হঠাৎ সে একদিন তার দাদাকে বলে, সে আর বাঁচবে না। কাল ভোর রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে যে পথের শেষে, যে শেষ গাছটার ফাঁক দিয়ে ভোর বেলায় সূর্য্যকে উঠতে দেখা যায়, সেই গাছের শেষ পাতাটি যেদিন ঝরে যাবে সেদিন সেও যাবে ঝরে। শিল্পী তাকে বুঝায় ও সব ভুল। সত্যি আর ও রকমটা হ্‌তে পারে না। কিন্তু মেয়েটির বিষণ্ণতা কমে না।

গাছের পাতা রোজ ঝরে যায়। শিল্পীর প্রাণ ওঠে কেঁপে। মেয়েটি পড়ে মুষড়ে। আর মাত্র শেষ তিনটি পাতা। আজ রাতে বোধ হয় তাও ঝরে যাবে। শিল্পী বুড়োকে জানায় সব কথা,—ব্যথায় যেন ভেঙ্গে পড়ে সে। বুড়ো কিছু বলে না। তার মুখে দেখা যায় শুধু চিন্তার রেখা।

রাত হ'ল। আজ বুড়োর নীচের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। আজ তার পরীক্ষা হবে কত নিখুঁত অনুকরণ সে করতে পারে গাছের ফুল-পাতার। তার মনে পড়ে, এ গ্রামে এ কাজে তারই সব চেয়ে নাম। গভীর যত্নে অবশেষে তৈরী হ'ল তিনটি গাছের পাতা।

নিঝুম রাত। বুড়ো বেরুল ঘর ছেড়ে। নিখুঁত হয়েছে তার অনুকরণ। আশা অশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে।

বাইরে শীতের হাওয়া,—বরফে পথঘাট ঢেকে গেছে। বুড়ো চলেছে হাতে আলো নিয়ে। প্রতি পদে পা যাচ্ছে আটকে, বুড়োর শরীর থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু তবু সে চলেছে। অবশেষে গ্রামপ্রান্তের শেষ গাছটির তলায় এসে বুড়ো দাঁড়াল। সে গাছের শেষ পাতা ক'টি ততক্ষণে ঝরে গেছে। বুড়ো সেই শূন্য ডালে লাগিয়ে দিল তার নিজের তৈরী কাগজের পাতা ক'টি।

বুড়ো যখন ফির্‌ল গ্রামের পথে আকাশের অগুণ্‌তি তারা তখনও সমানে জেগে। বরফের পথে শীতের অসহ্য ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে বুড়ো নিজের ঘরে ফিরে এল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই শিল্পী দেখতে পেল, কই শেষ পাতা ক'টি তো ঝরে নি! আনন্দে উন্মাদ হয়ে সে জাগিয়ে তুল্‌লে বোনকে। ছোট মেয়েটির চোখে ফিরে এল হারানো দীপ্তি, মনে এল জোর। সে বল্লে, "দাদা, আমি তবে বোধ হয় এবার বাঁচব।" সত্যি, তার পর থেকে মেয়েটি সেরে উঠতে লাগল। কিন্তু অত ঠাণ্ডা বুড়োর সহ্য হ'ল না। সে পড়ল নিউমোনিয়ায়।

সেদিনও ভোরে সূর্য্য উঠেছে সেই গাছের ফাঁক দিয়ে। ছোট মেয়েটি জড়িয়ে ধরেছে তার

দাদার গলা। আজ সে সম্পূর্ণ সুস্থ। ভাইবোন দু'জনেরই মন খুসিতে ভরা। কিন্তু তারা জানে না—ঠিক তাদেরই বাড়ীর নীচের তলায় বুড়োর চোখ তখন এসেছে বুঁজে, প্রাণশক্তি আসছে নিঃশেষ হয়ে। বুড়ো একবার শেষ চেষ্টা করে বাইরের দিকে তাকাল। তার ঘোলা চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ল গ্রামপ্রান্তের সেই গাছটি, আর তারই ডালে তার নিজের হাতে তৈরী পাতার উপর ছড়িয়ে-পড়া নতুন সূর্য্যের আলো। *

চিঠিপত্র

এ মাসে রামধনু তেরো বছরে পড়ল। রামধনুর এই জন্মতিথিতে তার বন্ধুবান্ধব পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রামধনুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকাও আমাদের চিঠি দিয়েছেন। শ্রীনির্ম্মলেন্দু বসু, শ্রীসুশোভন রায়, শ্রীপ্রমীলা নন্দী, শ্রীজগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কুমারী নন্দিতা গাঙ্গুলী, কুমারী রাবেয়া খাতুন, শ্রীঅবিনাশ দত্ত, শ্রীলক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি, শ্রীশকুন্তলা ত্রিবেদী, শ্রীদীপক রায় ও শ্রীমণ্টু সেন প্রভৃতির চিঠি উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ রামধনুর উন্নতিকল্পে কয়েকটা নতুন নতুন প্রস্তাবও করেছেন। আমরা সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, এবং সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করছি।

শ্রীরেখা রায় রামধনুতে মাঝে মাঝে বাংলার বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকদের জীবন-কথা প্রকাশ করতে এবং সম্ভব হ'লে তাঁদের পুরোনো লেখার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করতে অনুরোধ করেছেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করব।

এ মাসের রামধনুতে দু'টি নতুন উপন্যাস সুরু হয়েছে। "ধূমকেতু" শীর্ষক উপন্যাসটা কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হবে। বৈশাখ থেকে আরও একখানি বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা বড ধারাবাহিক উপন্যাস আরম্ভ করা হবে। আগামী সংখ্যায় "মণিমঞ্জুষা" এবং আরও কয়েকটি বিভাগ দেবার চেষ্টা করা হবে।

এ মাসের 'রামধনু' কেমন লাগ্‌ল জানিও। —রাঃ সঃ

---

* ইংরেজী গল্পের অনুসরণে।

অশোক-স্তম্ভ, দিল্লী।

আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

কারমাটারে

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

এখন এখানে এল সোনালী সকাল,
তালে তালে শালবনে নাচে সাঁওতাল ;
উতলা বাতাসে শত মহুয়া মাতাল,
একা একা ভাবি বসে আকাশ-পাতাল।

রাঙা পথ ধরে শুধু যাব একেলা,
ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে আমি দেখব মেলা ;
নতুনের সাথে হবে নতুন খেলা,
ঘরেতে ফিরব ফের সন্ধ্যাবেলা।

তোমরা ওখানে দেখ ছোট্ট গলি ;
ধান-বনে আনমনে আমি যে চলি।
শিশিরে দেখছি মাঠ উঠেছে ঝলি',
তার 'পরে কাঁচা রোদ পড়ে উছলি'।

খুসী হ'লে চলে আসি ঝর্‌ণা-ধারে,
চুপ্‌চাপ্ পাতা ঝরে পলাশ-ঝাড়ে।
এ মন পড়ার কোন ধার না ধারে ;
এখানে ভালই আজি কারমাটারে।

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

শ্রীযুক্ত জয়ন্ত বসু, বি.এস্-সি প্রদত্ত এ বছরকার উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলেন—

শ্রীদুর্গারাণী সেন, ৬৪এ, হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ। এঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল "শিশুসাহিত্যে মনোরঞ্জন"।

শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্তের (সাতক্ষীরা) প্রবন্ধটিও বেশ সুন্দর হয়েছে।

এঁরা ছাড়া শ্রীমণিমালা মুখোপাধ্যায়, শ্রীশীতলকুমার ভাদুড়ী, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র রায়, কুমারী অঞ্জলি চৌধুরী, শ্রীকল্যাণী ঘোষ, শ্রীশোভনলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীলক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি—এঁদের লেখাও বেশ ভাল হয়েছে। কুমারী অঞ্জলি চৌধুরীর হাতের লেখা দেখে আমরা খুব খুসী হয়েছি।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

একটি ছেলে (বা মেয়ে) এ মাসের রামধনু পায় নি। তার মুখের চেহারা এঁকে পাঠাও কিংবা তার অবস্থা বর্ণনা ক'রে একটা হাসির কবিতা লিখে পাঠাও। ছবি ও কবিতা দু'টির জন্য দু'টি পৃথক্ পুরস্কার দেওয়া হবে।

ছবি বা কবিতা ১লা ফাল্গুনের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছান চাই। প্রত্যেকটির সঙ্গে গ্রাহক বা গ্রাহিকার নাম ও গ্রাঃ নং দিতে হবে। বলা বাহুল্য কেবল গ্রাহক-গ্রাহিকারাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। যাঁরা পুরস্কার পাবেন তাঁদের আপত্তি না থাকলে তাঁদের ছবিও রামধনুতে বার করা হবে। রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

(শ্রীগৌরী দেবী)

বলিত হাস্‌বনা—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম ।৵০

এখানি রবীন্দ্র বাবুর নতুন বই। এর ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র বাবু আরও কতকগুলি মজার মজার হাসির গল্প বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পাতে পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্র বাবুর হাসির ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাঁর 'হাল্কা-হাসির খাতা', 'নতুন কিছু' প্রভৃতি অন্যান্য বইএর মত এ বইখানি নিয়েও ছেলে-মহলে কম কাড়াকাড়ি পড়বে না।

লাস্‌ট্ ডেজ অফ্ পম্‌পেই—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক—অনুবাদ সাহিত্য মন্দির, ১২।১, চৈতন সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲

লর্ড্ লিটনের "The Last days of Pompeii" একখানি বিশ্ববিখ্যাত বই। খগেন বাবু তারই মূল গল্পাংশ নিয়ে ছেলেদের উপযোগী ক'রে এ বইখানি লিখেছেন। লেখকের ভাষা এবং গল্প বলার ভঙ্গীটি সুন্দর। তোমাদের সকলকে বইখানা পড়ে দেখতে বলি

জীবজন্তুর ঘরকন্না—শ্রীবিমল ঘোষ। প্রকাশক বুক কোম্পানী লিমিটেড্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲

জীবজন্তুর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নিয়ে গল্পের মত ক'রে সরস ভাষায় এই সুন্দর বইখানি লেখা হয়েছে। এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে প্রচুর, ছবিও আছে অসংখ্য। সব দিক্ দিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার এমন সুন্দর বই আমাদের চোখে বেশী পড়ে নি।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

মজার খেলা

(আতাউর রহমান)

আজ তোমাদের চুপি চুপি একটি মজার খেলা শিখিয়ে দেব। বন্ধুমহলে এই খেলা দেখিয়ে বেশ নাম করে নিতে পারবে।

প্রথমে ১৬টা কাঠি যোগাড় করবে, এবং কাঠিগুলির গায়ে ১ থেকে ১৬ পর্য্যন্ত ক্রমিক নম্বর দিয়ে কাঠিগুলি পরপৃষ্ঠার ১নং অনুযায়ী পাশাপাশি দু' সারিতে সাজাবে। তার পর তোমার বন্ধুকে বলবে মনে মনে একটা বিশেষ নম্বরের কাঠি ভাবতে। তার পর জিজ্ঞাসা করবে, কাঠিটা ডাইনে না বাঁয়ে কোন্ সারিতে। ধর, বন্ধু বল্‌ল, ডান সারিতে। তুমি তখন নীচে থেকে উভয় সারির ২টি কাঠি তুলে অন্য জায়গায় সাজাবে। লক্ষ্য রাখবে, যে সারিতে অভীষ্ট কাঠিটা আছে প্রতি বারেই সেই সারির কাঠি উপরে বসবে। ৪ বারে এই রকমে নতুন সারিতে ৮টি কাঠি বসবে। তার পর নতুন সারির ডান দিকে ঠিক ঐ ভাবে বাকী কাঠিগুলি দিয়ে আর একটা সারি গঠিত হবে। **ডান দিকে**—কারণ অভীষ্ট কাঠি ডান পাশে ছিল।

এই ভাবে নতুন ক'রে সাজান হ'লে বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করবে, এবার কোন্ সারিতে তার মনে-করা কাঠিটা আছে। ধর, উত্তর হ'ল বাঁ সারিতে। পূর্ব্বের মত নীচে থেকে উভয় সারির ২টি করে কাঠি নিয়ে ৪ বারে আর একটা নতুন সারি সাজাবে, তার পর বাকী কাঠি দিয়ে ঐ সারির **বাঁ দিকে** (যেহেতু বাঁ সারিতে অভীষ্ট কাঠি রয়েছে) আর এক সারি হবে; এবং এবারে প্রতি বারে বাঁ দিক্‌কার সারির কাঠিগুলি উপরে বসবে। (কারণ বাঁ দিক্‌কার সারিতে অভীষ্ট কাঠি আছে)। এই ভাবে আরও দু'বার ঠিক আগের নিয়মে ১৬টা কাঠি সাজাবে। ৪র্থ বার সাজান শেষ হ'লেও ফের প্রশ্ন করবে এবার কোন্ দিকে অভীষ্ট কাঠি আছে। যদি উত্তর হয় বাঁ দিকে তবে বাঁ দিক্‌কার সারির উপর দিক্ থেকে গুণে ৩য় কাঠিটা বার করে দেবে। ডান দিক্ বল্লে, ডান দিকের তৃতীয় কাঠি দেবে। বন্ধু অবাক্ হয়ে ভাববে 'তাই ত!'

একই লোককে বার বার খেলা দেখিও না, কারণ তা হ'লে ধরা পড়ে যেতে পার। ইচ্ছা করলে কাঠি সাজাবার সঙ্গে সঙ্গে আবোল-তাবোল বোলচালও দেওয়া যেতে পারে।

বুঝবার সুবিধার জন্য একটা নমুনা দেওয়া গেল। এখানে ১৪নং কাঠিটা মনে করা হয়েছিল।

১	৯	১৬	১২	৭	৫	১০	৯
২	১০	৮	৪	৩	১	১২	১১
৩	১১	১৫	১১	১৫	১৩	১৪	১৩
৪	১২	৭	৩	১১	৯	১৬	১৫
৫	১৩	১৪	১০	৮	৬	২	১
৬	১৪	৬	২	৪	২	৪	৩
৭	১৫	১৩	৯	১৬	১৪	৬	৫
৮	১৬	৫	১	১২	১০	৮	৭
১নং		২নং		৩নং		৪নং	

নূতন বছর

(শ্রীসুজাতা গুপ্ত)

(১)

আকাশ বাতাস ছেয়ে নামে
আজকে খুসীর বান,
পাল তুলে দে মন-তরীতে—
উছ্‌লে ওঠে প্রাণ।
হলুদে গাঁদার বনে বনে
প্রজাপতি মাতন আনে,
ধানের ক্ষেতে শুনি বাজে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ গান।
সরষে-বনে ফিঙে নাচে;
কে ধরেরে তান!

(২)

দিকে দিকে সোনালী রং
কে ছড়ালো আজ?
ঘরে ঘরে ঝল্‌মলালো
নূতন রঙীন সাজ।
নূতন চালের নূতন পিঠে
সুরভী তার মিঠে মিঠে—
মনের মাঝে গড়ে ওঠে
নূতনেরই তাজ;
পুরানো আজ গা ঢাকলো যে
কুয়াসারই মাঝ।

(৩)

ঘরের কোণে থাকিস্ নে আজ
আয় রে বাহিরে!
সুমুখ পানে এগিয়ে যাবো—
ভাবনা নাহি রে।
বাজা বাঁশী, মাদল বাজা,
আজকে মোরা সুরের রাজা,
নূতন স্রোতে ভাসিয়ে ভেলা
আমরা বাহি রে;
পলাশ-বনে রং ধরেছে
দেখ্ না চাহি রে।

(৪)

নূতন বছর এগিয়ে এলো
আল্‌তো চরণে,
ঝিলিক্ ওঠায় সবুজ সাড়ী
তাহার পরনে।
সানাই বাজে—আগমনী
ঝিনিক্-ঝিনি নূপুরধ্বনি—
নূতন আশায় মন ভরে যায়
তারই স্মরণে।
'রামের ধনু'! বাজাও বেণু
বরষ-বরণে।

ভ্রম সংশোধন ঃ—এ মাসের বিজ্ঞাপনের ৫ম পৃষ্ঠায় শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের 'হাল্কা-হাসির খাতা' ও 'বলি ত হাসব না' "বার হচ্ছে পূজোর আগেই" স্থানে "বার হয়েছে পূজোর আগেই" হবে।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়; মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

প্রশ্ন

১। ইউ-বোট্ (U-Boat) জিনিষটা কি?
—শ্রীজগৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২। অল্প দিনে হিন্দী শিখিবার জন্য কোন বই আছে কি? আধুনিক হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিতে হইলে কোথায় জানা যাইতে পারে?
—শ্রীসবিতা মিত্র

৩। কেক্, স্যাণ্ডউইচ্, প্যাটিস্ প্রভৃতি বিলাতী খাবার তৈরী করবার প্রণালী কোথায় পাইব? এ সম্বন্ধে কোন বই আছে কি?
—শ্রীদেবা রায়
ও
শ্রীরণজিৎ রায়

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার গৌরব। তাঁর বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলায়। সম্প্রতি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া মেদিনীপুরবাসীরা মেদিনীপুরে "বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন হইল এই স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন।

* * *

সম্প্রতি মান্দ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের নানা জায়গা হইতে বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা একত্র হইয়া তাঁদের নতুন নতুন গবেষণা লইয়া আলোচনা করেন। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ডক্টর বীরবল সাহানী।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতায় খুব সমারোহের সহিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর। ভারতের নানা জায়গা হইতে বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা

এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল তা'তে একটা নতুন জিনিষ দেখা গিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবিকারা ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাযাত্রার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* * *

ইয়োরোপের যুদ্ধ সমানে চলিয়াছে। এদিকে রাশিয়ার সহিত ফিন্‌ল্যাণ্ডের লড়াই ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। তবে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শীতে যুদ্ধ করা দায় হইতেছে এই যা! ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ হোর বেলিশা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁর জায়গায় নতুন যুদ্ধমন্ত্রী হইয়াছেন মিঃ অলিভার ষ্ট্যান্‌লী। যুদ্ধের দৌলতে জিনিষপত্রের দাম তেমনি চড়াই রহিয়াছে।

* * *

যুদ্ধের জন্য ইংল্যাণ্ড নানা ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধের সময় সেখানে যা'তে খাবার তরী-তরকারীর অভাব না ঘটে সেজন্য ৪৫ লক্ষ বিঘা জমিতে নূতন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস সুরু করা হইয়াছে। এই সব জমির জন্য সত্তর হাজার কলের লাঙল তৈরী করান হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণের জন্যও কম তোড়জোড় চলিতেছে না। মাটীর নীচে প্রায় আড়াই লক্ষ ঘর ইতিমধ্যেই তৈরী হইয়া গিয়াছে।

* * *

বিলাতের পার্লেমেণ্টের সভ্য স্যর্ ষ্ট্যাফোর্ড্ ক্রিপ্‌স্ সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছিলেন—এদেশ সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ ধারণা লইবার জন্য। বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় তিনি ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতায়ও তিনি আসিয়াছিলেন।

* * *

যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের সরকারী রসায়নবিদ্, বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এস্. এন্ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি. উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র একজন এই সম্মানকর উপাধি পাইয়াছিলেন।

* * *

এ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অতিরিক্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়াছে তা'তে প্রায় সাড়ে একুশ হাজার ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশী।

* * *

আধুনিক চীনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অধ্যাপক পি-ওনকে কবি রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের চৈনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে ইনি শিক্ষা দিবেন।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য বাংলা দেশের চটকলগুলির কাজও বেশ বাড়িয়াছে। কারণ পাট একমাত্র বাংলা দেশেই জন্মায়। এবারকার যুদ্ধের জন্য এ পর্য্যন্ত বাংলা হইতে রাশি রাশি চটের থলি সরবরাহ করা হইয়াছে।

* * *

প্রসিদ্ধ ছায়াচিত্র-অভিনেতা ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌সের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান। দৌড়-ঝাঁপ, লাফালাফি প্রভৃতি তেজস্বিতাপূর্ণ অভিনয়ে তাঁর যুড়ি ছিল না। 'মার্ক্ অব্ জোরো', 'থিফ্ অব্ বাগ্‌দাদ', 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স্' প্রভৃতি চিত্রে তাঁর অভিনয় যে দেখিয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। কয়েক বছর আগে ইনি একবার কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আউটরাম ঘাটে নামিয়া হোটেলে যাইবার সময় পথে তাঁকে দেখিবার জন্য ভীষণ ভীড় হয়, এবং ভীড়ের মধ্যে একটি ছোট মেয়ে তাঁর মোটরের ধাক্কায় আহত হয়। ডগ্‌লাস্ তৎক্ষণাৎ নিজে হাতে মেয়েটিকে তুলিয়া লইয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসেন, তার পর হোটেলে যান। সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ায় ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

* * *

ক্যানাডায় গৃহপালিত কুকুর, গরু, ভেড়া প্রভৃতি অনেক সময়েই মোটর-দুর্ঘটনায় মারা পড়ে! তাই কিছুদিন হইল সেখানে একটা অদ্ভুত নিয়ম জারি করা হইয়াছে। সাইকেলের পিছনে যেমন লাল আলো থাকে এই সব গৃহ-পালিত জানোয়ারের লেজেও সেই রকম লাল আলো বাঁধিয়া রাখিতে হইবে—যাহাতে রাত্রে মোটর-চালকেরা সাবধান হইতে পারেন। অবশ্য যে সব জানোয়ার পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে তাদেরই জন্য এই ব্যবস্থা।

* * *

গত বছর ডেনমার্কে ১৬৩টি যমজ ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছে; কলম্বিয়া দেশ আবার ডেনমার্কের উপরও টেক্কা দিয়াছে; সেখানে গত বছর জন্মিয়াছে ২৫০টি যমজ।

* * *

প্রাচীন মিসর দেশে সর্দ্দীর ওষুধ হিসাবে নস্য ব্যবহার করা হইত। তাদের নিকট হইতে শিখিয়া একজন ফরাসী ভদ্রলোক ইয়োরোপে জিনিষটার চলন করেন। প্রথমটা ওষুধ হিসাবেই ইহা ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা নেশার জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়।

...ওন সহরের একজন ডাকটিকেট ব্যবসায়ী পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন। যেখানে যাইতেন সেখানেই তিনি নানা রকম টিকেট কিনিয়া দেশে চিঠি পাঠাইতেন। দেশে ফিরিয়া দেখেন তাঁর নামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টিকেট-লাগান প্রায় সওয়া লক্ষ টিকেট আসিয়া জমিয়াছে। ভদ্রলোক বিদেশ হইতে তাঁর নিজের ঠিকানাতেই সব চিঠি পাঠাইতেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১৯টি ম্যাচ্

উত্তরদাতাদের নাম

বিচ্ছু ও খুকু (কলিকাতা); কালিদাস পাল (বালুভরা); প্রদীপ্ত ও প্রদ্যোত বাগছী ([illegible]); স্বর্ণা মিত্র (নিউ দিল্লী); সতীশচন্দ্র ঘোষ (বরিশাল); রেবা রায় ও শিপ্রা সেন (এলাহাবাদ); নন্দিতা গাঙ্গুলী (কলিকাতা), জাহানারা বেগম (কলিকাতা); হিমাংশু ও তপন (ঢাকা); সতী, সাবিত্রী ও খুল্লনা দেবী (লক্ষ্ণৌ); নিমাই, গণেশ, সন্তু ও বেঙ্কু (ঢাকা); টুটু ও ফুটু (দিল্লী); শান্তা ভৌমিক ও মণীন্দ্র ভৌমিক (কানপুর); শকুন্তলা দেবী (আমেদাবাদ); শিশির দাশগুপ্ত (কলিকাতা); দেবব্রত রায় ও খোকন (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

(১) কোন্ রাজার গায়ে লাল ফুল হয়?

(২) কোন্ রাজার মধ্যে চাঁদ লুকিয়ে আছে?

(৩) কোন্ রাজাকে সকলে বাবা বল্‌ত?

(৪) কোন্ রাজা একটি কাণ পেলে দারুণ ভাবে ঘুমাবেন?

(৫) কোন্ রাজা আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি করেন (নিজে এবং শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী মারফৎ)?

[সবগুলি ধাঁধার উত্তর পাঠাতে হবে।]

পার্থসারথি

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে। [শিল্পী—আল। বন্দ্য

C. H. ARAN & CO., CAL.

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

[illegible]শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৬ { ২য় সংখ্যা

বাংলার গান

(৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্)

বাংলা মুলুক, তোমায় আমি বড়ই ভালবাসি:
বড়ই ভালবাসি তোমার মিষ্টি মধুর হাসি।
তোমার মাঠের ফণিমনসা, ঘেঁটু, কচুর পাতা,
তারাও আমার চিত্তে জাগায় অতীত সুখের গাথা।
কী যেন এক নিবিড় স্নেহে সবাই আমায় টানে
যখন আমি নিমেষ তরেও তাকাই তাদের পানে।
মিথ্যা নয় এ অনুভূতি, সত্যি সবার বাড়া,
ঠাট্টা করে করুক আমায় হৃদয়বিহীন যারা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

[illegible]শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৬ | ২য় সংখ্যা

বাংলার গান

(৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ. বি.এল্)

বাংলা মুলুক, তোমায় আমি বড়ই ভালবাসি:
বড়ই ভালবাসি তোমার মিষ্টি মধুর হাসি।
তোমার মাঠের ফণিমনসা, ঘেঁটু, কচুর পাতা,
তারাও আমার চিত্তে জাগায় অতীত সুখের গাথা।
কী যেন এক নিবিড় স্নেহে সবাই আমায় টানে
যখন আমি নিমেষ তরেও তাকাই তাদের পানে।
মিথ্যা নয় এ অনুভূতি, সত্যি সবার বাড়া,
ঠাট্টা করে করুক আমায় হৃদয়বিহীন যারা।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

দূর করে দাও আজকে তোমার ধার-করা সব শোভা,
দেখাও তোমার প্রভুর দেওয়া স্বরূপ মনোলোভা।
তোমার গলায় স্বর্ণ নিগড় মানায় না তো ভালো,
শেফালিকার মালায় তুমি ভুবন কর আলো।
ইচ্ছা করে কুটীর বাঁধি' তোমার শ্যামল বুকে
সারা জীবন চিন্তা ছাড়ি কাটাই আমি সুখে।

ভোরের বেলা সোনার রবি ঢালবে চোখে সোনা,
সোনার চোখে দেখ্‌ব আমি বিশ্ব সোনায় বোনা।
চাই না আমি পর্ব্বতের ও গর্ব্ব-ভরা রূপ,
চাই না আমি সাগর-জলে দেখ্‌তে ঢেউএর স্তূপ।
ওদের আলো ঝলক্‌-হানা বিলাসীদের গেহ,
তোমার মাঝে পাই যে আমি পল্লীবধূর স্নেহ।

বাংলা মুলুক, তোমায় আমি বড়ই ভালবাসি,
সদাই মনে পড়ে তোমার ভুবনমোহন হাসি।

পশুরাজের কবলে

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি.এল্)

আমার এক ভবঘুরে খুড়োমশায়ের কাছে এই কাহিনী শোনা। তিনি চিরকেলে ডান্‌পিটে লোক। ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেন নি, কিন্তু ছবি আঁকবার একটু-আধটু হাত ছিল'। তারই জোরে কলকাতায় জরীপ আপিসে একটী কাজ পান। কিন্তু কাজে এমনই নাম হয় যে দশ-বারো বছরেও তাঁর মাইনে মাসিক ৩২৲ টাকার বেশী হ'ল না। তখন একদিন তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হ'য়ে গেলেন,

সে হ'ল ১৯১৩ সনের কথা। বহুকাল আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি'। আমরাও ছেলেবেলা থেকেই শুনে আস্‌ছি যে এ রকম একজন খুড়োমশায় আ[illegible] ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন।

সেটা ছিল ১৯২১ কি ১৯২২ সন। একদিন বৈঠকখানায় ব'সে আছি, এমন সময় একজন শীর্ণ চেহারার আধবুড়ো ভদ্রলোক এসে তাঁর পরিচয় দিয়ে বল্‌লেন যে তিনিই সেই আমাদের হারানো খুড়োমশায়। এই তাঁকে প্রথম দেখলুম। তাঁর কাছে শুনলুম যে তিনি এই ক'বৎসর আফ্রিকায়, সিংহলে আর অষ্ট্রেলিয়ায় কাটিয়ে এসেছেন। প্রথমে[illegible] তাঁর কথা বিশ্বাস হয় নি' পরে কাগজপত্র দেখে বিশ্বাস হ'ল। তখন আর আমাদের পায় কে! ফাঁক পেলেই খালি তাঁর কাছে ব'সে ব'সে নানান্ দেশের আজব গল্প যত সব শুনতুম। তারই একটা তোমাদের এখানে বল্‌ব'।

আফ্রিকার জঙ্গলের একটি দৃশ্য
কাফ্রীরা হাতীর দাঁত মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

খুড়োমশায় কলকাতা থেকে পালিয়ে আফ্রিকায় যা'ন প্রথম। কি ক'রে গিয়েছিলেন, সেও মস্ত এক ইতিহাস, কিন্তু সে কথা এখন থাক্। তিনি আফ্রিকার যে অংশে গিয়েছিলেন তার নাম ছিল জার্ম্মান ঈষ্ট্ আফ্রিকা। এখন তোমরা ম্যাপে আর সে নামটা খুঁজে পাবে না, কেননা গত মহাযুদ্ধের পর সেটা ইংরাজদের শাসনাধীনে আসে, এবং তার নাম বদ্‌লে যায়। এখন সে দেশটাকে বলে টাঙ্গানাইকা টেরিটরী। খুড়োমশায় সেখানেও জরীপ আপিসে একটী ছোট কাজ পেয়ে যা'ন। অনেক সময় জরীপের কাজে বনেজঙ্গলে ঘুরতে হ'ত। তা'তে নানা বিপদ্। একবার তো নরখাদকদের সঙ্গেই দেখা হ'য়ে গিয়েছিল। 'দু'মাস

তিনমাস ধ'রে হয়ত জঙ্গলে ঘুরেছেন, সেপাই পাহারা, রসদ, জল সব সঙ্গে সঙ্গে চলে'। সে এক জীবন। এঁদের বড় আপিস্ ছিল রাজধানীতে, ডার-এস্-সালাম সহরে। এইখানে থাকতে একবার খুড়োমশায়ের একটা সিংহ-শিকার দেখ্‌তে যাবার সুযোগ হ'য়ে গিয়েছিল'।

সেবার অনাবৃষ্টির জন্য বড় জলকষ্ট হ'য়েছিল। মানুষ তবু নানা ফন্দি-ফিকির ক'রে একটু-আধটু জল পেতে পারে, কিন্তু বনের যত খাল, নদী শুকিয়ে গেলে বনের পশু। কি করবে? তারা তো আর মাটি খুঁড়ে জল বের করতে পারে না, জল ধ'রে রাখবার জালাও তাদের থাকে না যে জল জমিয়ে রাখ্‌বে। অথচ জল পাওয়াই চাই। কাজেই তারা এদিক্ ওদিক্ জলের খোঁজে ছুটোছুটী সুরু ক'রে দিল'। তাদেরই মধ্যে এক যোড়া সিংহ তা'দের গুটিকয়েক বাচ্চা নিয়ে জল খুঁজতে খুঁজতে এসে প'ড়েছিল জঙ্গলের ধারে, ডোডোমা ব'লে একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে। সেখানে ষ্টেশনের কাছেই একটা পুকুরে জল রাখা হ'ত এঞ্জিনের জল দেবার জন্য। তোমরাও অনেক ষ্টেশনেই নিশ্চয় এ রকম রেলের পুকুর দেখেছ'। ঐ জল পাম্প ক'রে তুলে রাখা হয় অনেক উঁচুতে একটা লোহার ট্যাঙ্কে। এঞ্জিন এসে ষ্টেশনে দাঁড়ালে ঐ ট্যাঙ্ক থেকে নল বেয়ে জল এসে এঞ্জিনের ভেতরে পড়ে। ডোডোমাতেও ঠিক সেই রকম একটা ট্যাঙ্ক ছিল'। সিংহরা অবশ্য ট্যাঙ্কের জল খেতে পারত' না, তারা সন্ধ্যা হ'লেই কিংবা তা'র একটু আগে ঐ নীচের পুকুরে জল খেতে আস্‌ত'।

এতে হ'ল এক দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি। ডোডোমা ছোট জায়গা, সেখানকার লোক তো সিংহের ভয়ে আর বিকেলের পরে ঘর থেকে বেরোয়ই না। ষ্টেশনের লোকজন তো আরও ভয় পেয়ে গেল'। তা'দের উঠোনেই তো রোজ সিংহের জল খাওয়া, কবে না এক-আধটা মানুষকেও জলযোগ ক'রে ফেলে! অবশ্য, সিংহ তখন পর্য্যন্ত জল ছেড়ে আর কোনও জিনিষের দিকে নজর দেয় নি', কিন্তু দিতে কতক্ষণ? লোকে তো ভয়ে মরে।

এই খবর এল ডার-এস্-সালামে। খুড়োমশায়দের বড় সাহেব একজন সখের শিকারী, তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিক করলেন যে তিনি ঐ সিংহ মেরে ডোডোমার

আতঙ্ক দূর করবেন। এমন সময় খুড়োমশায় আপিসে এসে দেখেন যে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেছে। কেবল সিংহের গল্পই চলছে, আপিসের কাজ গেছে চুলোয়। মুখে মুখেই কত সিংহ বধ হ'য়ে গেল। এদিকে সব শুনে খুড়োমশায় গিয়ে সাহেবকে ধরলেন, তাঁকে সঙ্গে নিতে হবে। অবশ্য, শিকারী হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে। অনুমতি পাওয়া গেল।

ডোডোমা পৌঁছতে বিকেল হ'ল। আগে থেকেই খবর দেওয়া হ'য়েছিল, তাই ষ্টেশনে সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য সব বন্দোবস্ত করা ছিল'। সাহেব ঘুরে ঘুরে সব দেখে শুনে ঠিক করলেন যে উঁচুতে সেই যে প্রকাণ্ড লোহার ট্যাঙ্কটা আছে, তার পেছন থেকেই সিংহ মারবার সুবিধে হ'বে। মাটি থেকে ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত মই লাগানো আছে, তাই বেয়ে সাহেব উঠে গেলেন, সঙ্গে গেল একজন কাফ্রি তল্পীদার ছোকরা। দু'জনে উঠে গিয়ে ট্যাঙ্কের আড়ালে এমনভাবে বসলেন যা'তে পুকুরটা সেখান থেকে বেশ দেখা যায়। খুড়োমশায় ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে ঢুকে বেশ ক'রে দরজা জানালা এঁটে সিংহ শিকার দেখতে বসলেন। কাচের জানালার ভেতর দিয়ে পুকুরটা দেখা যেতে লাগ্‌ল, যদিও সেখান থেকে পুকুরটা বেশ খানিকটা দূরে।

পশুরাজ

ক্রমে বেলা পড়ে এল'। দূরে জঙ্গল আরম্ভ হ'য়েছে, সেই দিকে চেয়ে সকলে অপেক্ষা করছে, কখন পশুরাজের জল পিপাসা পাবে! কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পরই ষ্টেশনের ঘর থেকে দেখা গেল যে সিংহ তার সিংহী আর ছানাপোনা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোল'। স্পষ্ট বোঝা

যায় না, কিন্তু মনে হ'ল যে সিংহটা সকলের আগে দেখতে দেখতে আসছে, বাচ্চাগুলো তার পর। দলটা ক্রমে এসে পুকুরের কাছে দাঁড়াল'। জলে মুখ দেবার আগে সিংহটা একবার চারদিকে দেখে নিল', তার পর একে একে সকলেই জলে মুখ নামাল'। অমনি ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে সাহেব করলেন এক গুলি। হয়ত' উত্তেজনায় হাত কেঁপে গিয়ে থাকবে, গুলি গিয়ে সিংহের গায়ে হয়ত' লেগেছিল' কিন্তু সিংহ তেমন জখম হ'ল না।

তা'র ফল হ'ল অতি ভীষণ। সিংহ তো রাগে কেশর ফুলিয়ে এক ডাক ছাড়ল'। সে এমনই ভয়ানক আওয়াজ যে অত দূরের যে ষ্টেশন-ঘর, তার শার্সী-খড়খড়ি পর্য্যন্ত সেই গর্জ্জনে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠ্‌ল'। সাহেবের সঙ্গের সেই কাফ্রি ছোকরাটা হয়ত ঘাবড়ে গিয়েই হঠাৎ ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই হ'ল তার কাল। সিংহ ঘাড় তুলেই যাই না সেই কাফ্রের মাথার লাল টুপীটা দেখেছে অমনি দৌড়ে এসে মেরেছে এক লাফ! সেই দারুণ লাফের এক লাফেই সে সেই বিশ হাত উঁচুতে ট্যাঙ্কের ছাদে গিয়ে পড়ল, তার পর চক্ষের নিমেষে ছোকরাটাকে কামড়ে ধরে' আর এক লাফে গিয়ে পড়ল নিজের দলের মধ্যে।

আফ্রিকার গহন অরণ্যের আর একটি দৃশ্য

তার পর দলবল নিয়ে মাঠটুকু পার হ'য়ে বনে ঢুকে পড়ল'। দেখতে দেখতে বায়স্কোপের ছবির মত এই কাণ্ড হ'য়ে গেল। খুড়োমশায়রা তো ষ্টেশন-ঘরের মধ্যে থেকেও হতভম্ব।

খানিকটা বাদেই তো তাঁরা প্রকৃতিস্থ হ'লেন, কিন্তু সাহেব আর নামেন না। এদিকে সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, তাঁর খোঁজ নিতেই বা কে যাবে? কিন্তু না গেলেও নয়।

কাজেই এঁরা কয়েক জনে সাহসে ভর ক'রে সেই মই বেয়ে ওপরে উঠে দেখেন যে সাহেব অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছেন, যদিও সিংহের কোনও চড়-চাপড়ের চিহ্ন তাঁর গায়ে ছিল না। বন্দুকটা হয়ত' সিংহের ডাক শুনেই নীচে প'ড়ে গিয়েছিল', সেটা কুড়িয়ে নেওয়া হ'ল। সাহেবকে নিয়ে এসে কতকক্ষণ সেবাশুশ্রূষা করবার পর তাঁর জ্ঞান হ'ল। সে রাতটা ওখানে থেকে পর দিন মাথা হেঁটে ক'রে সকলে ডার-এস-সালাম ফিরে এলেন।

তোমরা শুনে সুখী হ'বে যে সিংহ আর ডোডোমায় আসে নি'। হয়তো কাফ্রিটাকে ফলার ক'রেই সিংহমশাই পরিতৃপ্ত হ'য়েছিলেন। কিংবা হয়তো পশুরাজ এ কথাটা বিবেচনা ক'রে থাকবেন যে একবার ফস্‌কেছে বলেই আর একবারও গুলি ফস্‌কে যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। মানুষ খাওয়াটা বেশ পছন্দসই ব্যাপার বটে, কিন্তু গুলি খাওয়া বড় বিশ্রী, তাই আর এদিকে সিংহরা আসে নি'।

বেণুর জন্মদিন

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বিতিকিশ্রী এক বাজখাঁই—উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদের সঙ্গে বেড়ালের আর্ত্তনাদ মেশালে যা হয়—শার্সীর ফাঁক দিয়ে ভেসে এল।

শার্সীর ফাঁক? হ্যাঁ। কী বদখেয়ালে মনে নেই, শ্রীমতী বেণুর বিগত জন্মদিনে, একটা গুল্‌তি উপহার দিয়েছিলাম ওকে। সেদিনই আমার পড়ার ঘরের শার্সীতে এই ফাঁকটার উদ্ভব হয়েছে। তার পর থেকেই, পথ চল্‌তি যা কিছু আওয়াজ—কী মোটরের, কী ভিখিরির, আর কী ফেরিওলার—সবই ঐ 'অনর্গলতা'র ভেতর দিয়ে অবলীলাক্রমে ভেসে আসে।

বেণু? বেণু আমাদের প্রতিবেশী জোয়ারদার মশায়ের দুহিতা, এবং পাড়ার আমরা সবাই হচ্ছি ওঁর দুহিত। এক ফোঁটা একটু মেয়ে, কিন্তু এই বয়সেই দোহনের এত কৌশল ওর জানা যে কী বল্‌ব!

শার্সীর ফাঁকির মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে তাকাই। সঙ্গে সঙ্গেই জানালা—বা জানালার ধ্বংসাবশেষ, যাই বলো—উন্মুক্ত ক'রে ফেল্‌তে হয়। উক্ত গুল্‌তি হস্তে, শ্রীমতী বেণুই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। তিনিই তারস্বর ছেড়েছেন—

"কাকাবাবু—কাকাবাবু! আমি তোমাকে ডাকৃচি—"

বেণুর পড়শীরা—আমরা সবাই ওর বেসরকারী কাকা। বিনা বেতনে, এমন কি অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পিতৃব্যপদে অভিষিক্ত।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি নীচে নেমে পড়ি।

এবং অভ্রভেদী বেণু, তার ওপরে ওর হাতে স্বয়ং গুল্‌তি—এর পর নিজের ভেদাভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হতে কতক্ষণ? আমার নিজের মধ্যেই ছ্যাঁদা হয়ে যেতে পারে।

এক ছুটে বেণুর পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

"তোমাকে নেমন্তন্ন করৃতে এলাম", বেণু বলে: "আমার বার্থ্‌-ডে পার্টিতে এসো। শুকুরবার দিন। তোমাকে আস্‌তেই হবে, তুমিই আমার সব চেয়ে ভালো কাকাবাবু কি না! এসো কিন্তু?"

আমি ইতস্ততঃ করি: "শুকুরবার? কিন্তু—সেদিন যে আমার—সেদিন? কিন্তু—" কিন্তু—কিন্তু করতে থাকি।

"একেবারে বড় বড় লোকের পার্টি—তোমার কোন ভয় নেই কাকাবাবু!" বেণু আমাকে উৎসাহ দেয়: "ছোট্ট ছেলেপিলেরা একদম্ নেই। কাউকে তাদের ডাকৃছিই নে—ভারী গোলমেলে তারা। বড্ড চ্যাঁচায়।"

য়্যাঁ? আমি বেণুর দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাই। আমার ধারণা ছিল, কেবলমাত্র গলার জোরেই ও টিকে রয়েছে; এবং আমরা সবাই কানের দুর্ব্বলতার জন্যই কাহিল হচ্ছি।

"এবার থেকে আমি ঠাণ্ডা আর লক্ষ্মী মেয়ে হব।" কোমলকণ্ঠে বেণু বলে। "আর চ্যাঁচাব না। গোলমাল করা ভালো নয়। তা হলে তুমি আসৃছ তো কাকাবাবু? অবিনাশ কাকাও আস্‌বেন—সুরমা কাকীও।"

এটা সুসংবাদ বটে। অবিনাশ-পরিবারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতাই রয়েছে। সুতরাং, নিশ্চয়ই যে যাবো, বেণুকে নিঃসংশয়ে জানিয়ে দিতে কোন বাধা হয় না।

সন্ধ্যেবেলায় অবিনাশের সঙ্গে দেখা হ'লে কথায় কথায় বেণুর জন্মতিথির কথাটা উঠ্‌ল।

"ও, হ্যাঁ—" বল্‌লে অবিনাশ: "ভারী চমৎকার মেয়ে বেণু। আমরা না গেলে ও খুব দুঃখিত হবে, দুঃখিত করতে ওকে চাই নে, কিন্তু উপায় নেই—" দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর সমাধা হয়: "যাওয়া হয়ে উঠ্‌বে না আমাদের।"

"কেন বল ত?" আমি একটু বিস্ময়ান্বিতই। "ও তো বলেছে ও চ্যাঁচাবে না। নতুন জন্মদিনের আশঙ্কায় ওই রকম কি একটা সঙ্কল্পও করেছে নাকি?"

"না, সেজন্যে না—" ভালো ক'রে আশেপাশে তাকিয়ে নিয়ে গলাটা পর্দ্দা দু'য়েক নামিয়ে আনে অবিনাশ।

"মুখুজ্যে!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে ও। চোখ এবং হাত কপালে তুলে বলে।

আমি ঠিক প্রণিধান করতে পারি না।

"একটু আগেই জেনেছি।" অবিনাশ জানায়: "মুখুজ্যেদেরও বেণু নেমন্তন্ন করেছে। আর মুখুজ্যেরা যেখানে যাচ্ছে—"

সে জায়গা কেন যে ওর গন্তব্য নয়, অষ্টাদশপর্ব্বে বিস্তৃত, বিরাট্ এক সামাজিক দুর্ঘটনার বিবৃতি দ্বারা আমার কাছে বিশদ করতে আরম্ভ করে।

বাড়ী ফিরে বীণাকে সব বলি।

"সুরমারা যাচ্ছে না?" বীণা বলে: "না যাক্, আমাদের কিছু যায় আসে না; আমরাও যাচ্ছি নে, দাদা।"

"কেন? আমাদের আবার কী হ'ল?"

"প্রতিমা!" বীণা মুখচোখ ব্যাঁকায়: "প্রতিমারাও যাচ্ছে যে! বেণু নিজেই আমায় বলেছে।"

আমার দম আটৃকে আসে। আমিও মাথা নাড়ি। বাস্তবিক, প্রতিমারা যে পার্টিতে যাচ্ছে সেখানে পা বাড়ানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রতিমার জন্যে ততটা নয়, বল্‌তে গেলে, প্রতিবাবার জন্যেই বিশেষ ক'রে আরো। ওর বরকে দেখ্‌লে এমন এক বর্ব্বরতা আমার মধ্যে চেগে ওঠে যে ইচ্ছে ক'রে যে এক চড়ে ওকে সোজা ক'রে আনি।

সত্যি বল্‌তে কি, বিনি এবং আমি, বেশ একটু উদার-প্রকৃতিরই, কিন্তু তা হ'লেও—তবুও—তথাপিও—প্রতিমা আর তার 'বরকে মুখোমুখি বর্‌দাস্ত করা আমাদের সহনশীলার প্রতি একটু বেশী অত্যাচারই যেন।

পর দিন সকালে বেণুর সঙ্গে ভেট্ হতেই, দুঃসংবাদটা আমি আস্তে আস্তে ব্যক্ত করি। বেচারীর বড় বড় কালো চোখ জলে ভরো ভরো হয়ে ওঠে।

"আমি এত দুঃখিত যে—" স্খলিতকণ্ঠে আমি বলি: "তোমার পার্টিতে যেতে না পারায় এত আমার মন খারাপ কি বল্‌ব!—" ভগ্নস্বরে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি: "যাক্, কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মী মেয়েটি! যেমন আমরা যাচ্ছি নে, তেম্‌নি তার বদলে, তোমাকে ডবল ক'রে জন্মদিনের উপহার পাঠাব। সেটা কেমন?"

বলায় সঙ্গে সঙ্গেই, বেণুর মুখ থেকে মেঘলা দিন কেটে যায়—জল-জলে চোখ আবার অল্‌জলে হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তেই একখানা হাসিখুসির বলাট্‌!

ওর পিতৃব্য-প্রীতির অসারতা দেখে প্রাণে ব্যথা পাই।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা, পোষ্টাপিসে যাবার পথে, মুখুজ্যের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ।

"এই যে, চক্রবর্ত্তী! এক পাড়ার, অথচ পাত্তাই পাওয়া যায় না। থাকো কোথায়? বেণুর পার্টিতে অবশ্যি দেখা হ'ত তোমার সঙ্গে—বিনি ত' আস্‌ত নিশ্চয়? অনেকদিন ওকে দেখি নি, কিন্তু—" মুখুজ্যে ধীরে ধীরে বিস্তারিত করে: "কিন্তু বেণুর পার্টিতে আমাদের যাওয়া হ'ত না। খুব খারাপ, বলাই বাহুল্য। আমিই হচ্ছি বেণুর সব-চেয়ে-ভালো কাকা, অথচ আমার যাবার উপায় নেই—" মুখুজ্যে ক্রমশঃ বিদীর্ণ হয়: "কি ক'রে যাবো। ওই অবিনাশ হতভাগাটা—! সেও যাচ্ছে কিনা! সপরিবারেই যাচ্ছে। দু'চোখে ওদের আমি দেখ্‌তে পারি না। সত্যি!"

"এক চোখে দেখ্‌লে হয়ত দেখা যায়—" মুখুজ্যের কথায় আমি সায় দিই: "—টেনে-টুনে কোন রকমে?"

"যাক্, কী আর কর্‌ব!—" মুখুজ্যে বলে: "বেণু যাতে মন খারাপ না করে সেইজন্যে বাড়্‌তি উপহার দিতে হবে আবার। গেলাম না, তার ক্ষতিপূরণ। কী বলো? তা ছাড়া, শুন্‌লাম—শুন্‌লাম ঘোষালরাও নাকি যাচ্ছে না—"

"কেন, হঠাৎ পায়ে বাত হ'ল নাকি?"

"না, তা নয়। পাছে তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয় সেই ভয়েই—" মুখুজ্যে ঘোষণা করে।

আমি ভাবি দাঁড়িয়ে। আমার খট্‌কা লাগে। সমস্তটাই আমার কেমন-কেমন ঠেকে যেন। দূরে, চায়ের দোকানে, জোয়ারদার মশাই প্রবেশ কর্‌ছেন, আমার চোখ পড়ে! আমি মুখুজ্যেকে ইসারা করি।

পরের মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁর টেবিলে গিয়ে বসি; চায়ের হুকুম্ দেওয়া হয়; কথায়-কথায় কথা ওঠে:

"তা হ'লে বেণুর জন্মদিনে এবার একটা জম্‌কালো পার্টি দিচ্ছেন বুঝি?" আমিই উল্লেখ করি।

"পার্টি?—" জোয়ারদার মশাই চায়ের শেষ চুমুকটি উদরে প্রেরণ ক'রে আকাশে ভুরু তোলেন: "না তো! পার্টি কিসের? অত টাকা পাব কোথায়? সেদিন বেণুর মাকে এই সোনা-মাগ্যির বাজারে নতুন ডিজাইনের নেক্‌লেস্ গড়িয়ে দিতেই ফতুর হয়ে গেছি ভায়া! কুকুরের বগ্‌লস্‌টা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়েছে। আবার পার্টি!—"

"এই সব আজ্‌গুবি খবর রটে যে কি ক'রে—" এই ব'লে ক্ষিপ্রপদে, বিক্ষিপ্তমনে জোয়ারদার মশাই তৎক্ষণাৎ দোকান পরিত্যাগ করেন। আক্রমণশীল উদরনৈতিক লোকদের ভয়াবহ পাল্লা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চান বোধ হয়।

"—কে যে এ সব রটায়! ছি ছি!—" বল্‌তে বল্‌তে, নিজের জোয়ারের তোড়ে নিজেই তিনি ভেসে যান।

এবং, তাঁর অন্তর্দ্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, অবিনাশ আর ঘোষাল এসে হাজির হয়।

অবিনাশ মুখুজ্যের দর্শন-মাত্রই বদন বিকৃত করে; আর আমি, ঘোষালের দিকে বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টি-প্রয়োগ করি। যেমন সচরাচর ক'রে থাকি ওকে দেখ্‌লেই। যথার্থ, ওই বর্ব্বরটাকে প্রতিমার বর ব'লে ভাব্‌তেই পারি নে আমি।

বর্ব্বরটাও ভ্রূভঙ্গী করে—আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে ওর কার্পণ্য নেই এবং মুখুজ্যেও অবিনাশকে কিছু কসুর করে না।

কিন্তু যাই বলো, ছোট্ট একটুখানি জায়গার মধ্যে কতক্ষণ আর ওই ক'রে পেরে ওঠা যায়? মুখ-চোখ-ভুরু ব্যথা করা কেবল! আর সত্যি বল্‌তে, চায়ের আড্ডা জায়গাটাই খারাপ। সেখানে পাশাপাশি বসে বেশিক্ষণ রাগ-দ্বেষ পোষণ করাই শক্ত। জোরালো হতে না হতেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়ে—খুব সুকঠিন হৃদয়ও, চায়ের পাকচক্রে, বিগলিত হয়ে আসে—তারপর, বিগলিত অবস্থায়, আপনা থেকেই জমে গিয়ে গদ্‌গদ হয়ে উঠ্‌তে কতক্ষণ?

আমাদের মধ্যেও ভাব মনে উঠ্‌তে দেরি হয় না।

"বেশ এখন বোঝা যাচ্ছে," মুখুজ্যে বলে: "যাদের ভেতরে বেজায় আড়াআড়ি বেণু ইচ্ছে করেই, বেছে বেছে তাদেরই কেবল নেমন্তন্ন করেছে। ভালোই জানে যে কেউ তারা আস্‌বে না শেষটায়। পার্টি-টার্টি কিচ্ছু না, শুধু বেশী করে উপহার আদায়ের ফন্দি! উঃ মেয়েটি কী পলিটিশিয়ান্, বাপ্‌স!"

"মেয়ে-চাণক্য একখানা।" আমি বলি শুধু।

"আশ্চর্য্য, এইটুকু একটা মেয়ের মধ্যে এতখানি ব্যবসা-বুদ্ধি। ভাব্‌তে মনে ভারি আঘাত লাগে। অবশ্যি উপহার আমরা দেব, দেবই, কিন্তু এমন কিছু দিতে হবে যাতে ওর আত্মার উন্নতি হয়। তা' ওর পছন্দ হোক্ চাই নাই হোক্।" ঘোষাল বলে।

কালই বেস্পতিবার—অতএব, আর কালবিলম্ব না ক'রে এক জোট্ হয়ে আমরা বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়ি। আত্মার উন্নতি এবং বালিকার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, দূরদৃষ্টি-সহকারে উপহার-দ্রব্য সব কেনা হয়। মুখুজ্যে কেনেন একটা বুননের বাক্স আর একখানা হিতোপদেশ; ঘোষাল একজোড়া চীনে মাটির পুতুল আর একটা গোলোকধাম; অবিনাশ একটা বইয়ের

বাস্কেট্—কালক্রমে কখনো বেণু যদি স্কুলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পায় তখন ওর কাজে লাগ্‌বে—আর, সেইসঙ্গে একখানা আদর্শ নীতিগল্পগুচ্ছ—চতুর্থ সংস্করণ।

আর আমি? মণ্টুর মাষ্টার? কল্‌কাতার হালচাল? বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্থপ্রাপ্তি? উঁহু, নিজের বই-টই একেবারেই নয়, এমন কি, প্রেমেনের বইও না—

একখানা কঠোপনিষৎ কেবল।

আত্মার চরম উন্নতি যদি হয় তো ওতেই হবে।

পরশু শুক্রবার দিন যথাসময়ে জোয়ারদার-মহাশয়ের গৃহে এগুলি রপ্তানি করবার সুব্যবস্থা করে তবে সবাই চায়ের দোকানে ফিরতে পারি।

উপহারের তালিকার আলোচনা ক'রে আমরা আনন্দে উল্লসিত হচ্ছি—চায়ের পাত্ররাও উচ্ছ্বসিত—এমন সময়ে জোয়ারদার মশাই প্রবেশ করেন আবার।

"এই যে! ভালো, তোমরা সকলেই রয়েছ—" অমায়িক ভাবে তিনি অভিব্যক্ত করেন: "বাড়ী ফিরে গিন্নীর সঙ্গে কথা কইলাম। বাস্তবিক, বেণুর জন্মদিনটা অম্‌নি অম্‌নি যেতে দেওয়া ভালো দেখায় না। ভোজটোজ গোছের—পার্টিটার্টি যাই বলো—একটা কিছু হওয়া উচিত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের সব নেমন্তন্ন কর্‌ছি—সকাল বেলায় তারা আস্‌বে; তোমরা সন্ধ্যের দিকে এসো—কেমন?"

বলা বাহুল্য, উচ্চনিনাদেই আমরা নেমন্তন্ন গ্রহণ কর্‌লাম।

উপহার-তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে, এই ভোজের ব্যাপারটা বেণুর কেমন লাগ্‌বে, এইটাই কেবল ভাব্‌ছিলাম। জিঘাংসার পরিতৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটু মজার আমেজ্ পাচ্ছিলাম যেন।

কিন্তু, শুক্রবার সন্ধ্যের দিকে, স-পরিবার আমার তিনবন্ধু এবং বিনি-সমভিব্যাহারে স্বয়ং আমি যখন জোয়ারদার মশায়ের বাড়ী গিয়ে চড়াও হলাম, তখন উৎসব-আমোদের টুঁ শব্দটিও, ভেতরের থেকে, আমাদের কানে এসে পৌঁছল না।

চার ধার চুপ্‌চাপ্—নিঃসাড়, নিঝ্‌ঝুম্ একদম্। য়্যাঁ? ভোজের ব্যাপারটা ভোজবাজির ব্যাপার হ'ল নাকি?

কড়া নাড়্‌তেই দরজা খুলে গেল। বিজ্ঞাপনের চিন্তিত মা'-র প্রতিচ্ছবির মত জোয়ারদার-গিন্নী, খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকেই, নিঃশব্দে যেন বেরিয়ে এলেন।

"ভেতরে এসো।" ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বল্লেন: "হায়, বেচারী বেণু!…ওর বরাত!"

"কেন, কী হ'ল বেণুর?" আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। যা ডান্‌পিটে মেয়ে!—

"হাম হয়েছে। তবু এসো তোমরা। বড়দের তো হাম হয় না; ছোঁয়াচ্ লাগার

ভয় নেই তোমাদের। তা ছাড়া, বেণু তোমাদের সব্বাইকেই দেখ্‌তে চেয়েছে। তোমরা যে সব উপহার পাঠিয়েছ, ওর ভারী আনন্দ!—"

বিবেক আমাদের দংশন করতে থাকে, বিছের মত বিছুটি লাগায়। আমরা বেণুর মার অনুসরণ করি। বেণুর শোবার ঘরে ঢুকি। ছোট্ট বেণু, বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসেছে, সারা মুখে লাল লাল গুটির দাগ। বিছানার চার পাশে আমাদের উপহারগুলো সুবিস্তৃত ক'রে বিছানো।

বেণু দু'একটা কথা বলে কোন রকমে। আমরা সকলেই ওর ভালো-কাকাবাবু, আর, উপহারগুলোও ওর খুব ভালো লেগেছে, যদিও ও যা আশা করেছিল এগুলো তার কাছাকাছি যায় না, তবু, ভালো হয়ে বইগুলো সে পড়বে। বিশেষ ক'রে হিতোপদেশটা ত বটেই। আর ঐ 'সমস্কৃত' বইটাকেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখবে। ভালো হয়ে এবার সে খুব ভালো মেয়ে হবে কিনা!

এই ব'লে সে ভীতনেত্রে বুননের বাক্স আর বইগুলোর দিকে একবার তাকায়।

আমরা কিন্তু তাকাতে পারি না। হিতোপদেশই কি, আর কঠোপনিষদ্‌ই কি, সব্বাই যেন আমাদের দিকে ফিরে ভেংচি কাটতে থাকে। বিবেকের দংশন আরো মর্ম্মন্তুদ হয়।

অগত্যা, এ ক্ষেত্রে যা করবার, তাই আমরা করি। পকেটের মধ্যে হাত পুরে দিই; গিন্নীরাও নিজেদের লেডিজ্ ব্যাগ্ হাতড়ান—পাঁচ টাকা দশ টাকা যার কাছে যা ছিল ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে ফেলি।

বিনি তো তার কড়ে আঙুলের আংটিটাই দিয়ে বসে। আর কোন আঙুলে না লাগায় বেণুর বুড়ো আঙুলেই ওটা পরিয়ে দেওয়া হয়। তার পর বিনাবাক্যব্যয়ে আমরা বিদায় নিই।

বেণু হাসিমুখে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখে। দেখে কি দেখায় কে জানে!

পরদিন সকালে চায়ের দোকানে জোয়ারদারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আমার প্রশ্নাঘাত: "বেণু? বেণু কেমন? কেমন আছে বেণু?"

"ও, চমৎকার! বড় রাস্তায় ছুটোছুটি কর্‌ছে বোধ হয়। কিংবা তোমাদের টাকায় ট্রাইসিকেল কিন্‌বে বল্‌ছিল, কারো সঙ্গে তাই কিন্‌তে গেছে হয়ত।"

"য়্যাঁ?…অসম্ভব!"

"না—না।" জোয়ারদারমশাই জবাব দেন: "হামই নয় আসলে। আমার গিন্নী ওর জন্যে একটা রঙের বাক্স এনে রেখেছিলেন—জন্মদিনে উপহার দেবেন বলেই এনেছিলেন। তাই দিয়েই, বুঝ্‌লে কিনা, ও এই হাম বানিয়ে বসেছে! তোমরা কাল চলে যাবার পর ডাক্তার এলেন, কেবল সাবান আর জলের সাহায্যেই তিনি ব্যারাম সারাতে পারলেন! কী সাংঘাতিক

দুষ্টু মেয়ে, ভাবো দিখি! পাড়ার ছেলেপিলেদের নেমন্তন্ন করেও হামের ছোঁয়াচের ভয়ে সরিয়ে দিতে হ'ল; ভোজটোজ বাদ গেল সব, ভাবো দিখি একবার কাণ্ডখানা!"

আমি কী একটা জবাব দিতে গেলাম, কিন্তু বেণুর ট্রাইসিকেলের প্রবল ঘণ্টা-ধ্বনিতে সেটা তলিয়ে গেল।

এবং কেবল ট্রাইসিকেলই নয়, ঐ সঙ্গে বেণু কিনেছে দেখলাম—একটা কান-ফাটানো বিউগিল্, একটা এয়ার্‌গান্ (বোধ হয় গুল্‌তির প্রমোশনে), একটা টিনের বাঁশী—এবং এক জোড়া করতাল!

এই গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গেই—তার সবগুলোই আমি শুন্‌তে পাচ্ছি এখন।

তেল মাখ

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্‌-সি)

পালোয়ানদের তেল মাখার কথা বোধ হয় সকলেই কিছু কিছু জান, ইতিপূর্ব্বে রামধনুতেও পড়িয়াছ। সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। কথাটা আবার শীতকালে বিশেষ সময়োপযোগী। তেল মাখা (যাহাকে সাধু ভাষায় বলা হয় তৈল মর্দ্দন এবং আর একটু সংস্কৃতগন্ধী ভাষায় বলা হয় "তৈলাভ্যঙ্গ") যে শুধু আমাদের ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে। প্রাচীন গ্রীক্ ব্যায়ামীদের মধ্যেও ব্যাপারটি চলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীক্ ব্যায়ামীদের সুগঠিত, সুশ্রী মাংসপেশীযুক্ত পাথরের মূর্ত্তি দেখিয়া এখনও লোকে প্রশংসা না করিয়া পারে না।

চরকের নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? চরক একজন অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাগ্রন্থ-লেখক। তিনি বলেন, "শরীরে তেল মালিশ করিলে শরীর দৃঢ় হয় এবং গায়ের চামড়া সুন্দর হয়। পায়ে তেল মালিশ করিলে পায়ের সুকুমারত্ব, স্থিরতা ও শক্তি বাড়ে, চোখের দৃষ্টি ভাল হয়, পায়ের শুষ্কতা ও অসাড়ভাব দূর হয়।"

চক্রদত্ত নামে প্রাচীন বাংলার আর একজন চিকিৎসক বলিতেন, "অভ্যঙ্গ নিত্য অভ্যাস করিবে। উহা জরা, শ্রম ও বায়ুরোগ নাশ করে। উহা দ্বারা দৃষ্টি ভাল

হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয়, শরীরের পুষ্টি লাভ হয়, সুনিদ্রা হয় এবং ত্বকের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য লাভ হয়।" মাথা, কান ও পায়ে তিনি বিশেষ করিয়া তেল মাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাঙ্গালীদের মধ্যে 'তৈলমর্দ্দন' জিনিষটি বহু কাল হইতেই চলিত আছে। একটা প্রবাদ আছে, তেল বল দেয় "মর্দ্দনে নতু ভক্ষণে"—তেল খাইলে শক্তি বাড়ে না, শক্তি বাড়ে তেল মাখিলে।

তেল মাখা!—তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, জিনিষটা তো অতি সাধারণ, ইহাতে আর হাঙ্গামা কি? কিন্তু এই অতি সাধারণ ব্যাপারটারও প্রয়োগ-প্রণালীর মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এ জিনিষটি আমি কিছুকাল হইল আমার উড়িয়া চাকর ভীমের নিকট হইতে শিখিয়াছিলাম। একবার অসুখ হইয়া আমি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। ভীম বলিল, "বাবু, আপনাকে ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া দিই। আমার বাবার কাছে তেল মাখাইতে শিখিয়াছিলাম, তিনি ১০৫ বছর বাঁচিয়াছিলেন।" উড়িয়ার বয়স সম্বন্ধে জ্ঞানের সঠিকত্বে বিশেষ আস্থা ছিল না। কিন্তু দুই তিন দিন পরে লোকটার আগ্রহ দেখিয়া আমি তাহার হাতে তেল মাখিতে রাজী হইলাম। সে একটা বাটি করিয়া এক বাটি সরিষার তেল আনিল, মাত্রা দেখিয়াই আমি অবাক্। সে মাখাইতে আরম্ভ করিল, প্রায় আধ ঘণ্টা পৌণে এক ঘণ্টা সময় ধরিয়া প্রায় এক ছটাক তেল সে আমার শরীরে মালিশ করিয়া বসাইয়া দিল। তার পর আমি সাবান মাখিয়া স্নান করিলাম। সেদিন আমি যেমন ঘুমাইয়াছিলাম তেমনটা বহুদিন ঘুমাই নাই। দিন তিনেকের মধ্যে আমি শরীরে বেশ বল পাইলাম। ক্ষুধাবৃদ্ধি হইল, হজম বেশ ভাল হইতে লাগিল, এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিল। তেল মালিশের এই অদ্ভুত উপকার দেখিয়া আমি আয়ুর্ব্বেদের বাক্যের যাথার্থ্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

ভারত-গৌরব আশুতোষের তেল মাখার বিবরণ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তিনি বিরাট্ কর্ম্মী ছিলেন। ঘুমাইবার সময়টুকু বাদে বোধ হয় প্রতি মুহূর্ত্তই তিনি কোন না কোন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। এরূপ অবস্থায় দিনে

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তেল মাখা যায় কি করিয়া ? আশুতোষ এক চৌকীতে বসিয়া সমবেত লোকেদের সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, সেই সময়ে ভৃত্য তাঁহাকে তেল মাখাইত। বড় বড় ইংরাজ রাজপুরুষ অনেক সময়ে তাঁহার কাছে কাজের পরামর্শ করিতে আসিতেন ; তিনি খালি গায়ে তেল মাখিতে মাখিতেই তাঁহাদের সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলিতেন।

এইবার শরীরবিধানতত্ত্বের (Physiology) দিক্ দিয়া তেল মাখার উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। সরিষার তেলের কিছু পরিমাণ বীজাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে, এবং জিনিষটার উগ্রত্বের জন্য তেল মালিশের সময়ে চামড়ায় রক্তের গতি বাড়ে, উহাতে চামড়ার পুষ্টি ভাল হয়। তা ছাড়া শুধু ডলাই মলাইয়ের ফলেও শরীরের সেই সেই অঙ্গে রক্ত চলাচলের সুবিধা হয়, এজন্য ঐ সব অঙ্গের পুষ্টি হয়। গলায় তেল মাখিলে থাইরইড (Thyroid) যন্ত্র মর্দ্দিত ও পুষ্ট হয়। পেটে তেল মালিশ করিলে যকৃৎ, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতি পেটের ভিতরকার যন্ত্রাবলীর রক্ত-সঞ্চালনে সুবিধা হয়। ফলে ঐ সকল যন্ত্র ভাল মত কাজ করিতে পারে। কান, হাত, পা সবই তেল মর্দ্দনের ফলে সুপুষ্ট হইয়া উঠে। শরীরে তেল মাখিয়া তাহার উপর রোদ লাগাইলে শরীরের মধ্যে ভিটামিন 'ডি' নির্ম্মিত হয়। এই ভিটামিন শরীরের হাড়গুলির পুষ্টি-বিধান করে।

ভারত-গৌরব আশুতোষ

তৈল মর্দ্দনের একটা অসুবিধা যে উহাতে কাপড়-চোপড় বড় ময়লা হইয়া যায়। তা স্বাস্থ্যের যেখানে অতটা উন্নতি হয় সেখানে সে অসুবিধা কতকটা সহ্য করিতে হইবে বৈকি ! তবে তেল মাখিবার একটা আলাদা কাপড় রাখা যাইতে পারে। গামছাকে মাঝে মাঝে সাবান দিয়া সাফ করিতে হইবে। আর তেল

মাখিবার পর সাবান মাখিয়া স্নান করা যাইতে পারে। অনেককে ইহা করিতে দেখিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদের মতে তেল মাখিয়া স্নান করিবার পূর্ব্বে গাত্রে 'উদ্বর্ত্তন' করিতে হয় অর্থাৎ খইল গুঁড়া, বেশন, ডাল বাটা বা আমলকী বাটা ও যবপিষ্ট (এইগুলিকে উদ্বর্ত্তন দ্রব্য বলে) গায়ে মাখাইয়া বেশ করিয়া ডলিয়া কতকটা তুলিয়া ফেলিতে হয় ও পরে স্নান করিতে হয়। খইল বা বেশন মাখিলে প্রায় সাবানের মত শীঘ্রই তেল উঠিয়া যায়। উহাদের মধ্যেও খানিকটা ক্ষারত্ব আছে। বেশন প্রভৃতির ক্ষারত্ব সাবানের মত উগ্র নয় বলিয়া ওগুলি চামড়ার বেশী অনিষ্ট করে না। কিন্তু যে সব সাবানে ক্ষারের ভাগ বেশী সেগুলি ব্যবহার করিলে চামড়ার উন্নতি হওয়া দূরে থাক্ অনেক সময়ে অপকারই হয়।

চোর

(শ্রীদেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

রোজ ঠিক ভোর পাঁচটার সময় কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম যায় ভেঙ্গে। রাস্তার দিকের ঘরটা আমার বলে ঝি এলে আমাকেই উঠতে হয় দরজা খুলে দিতে। ভোর বেলাতেই মুখ-হাত ধোয়ার কাজ সেরে না নিলে বেলাতে মুস্কিল হয় বড়, কেননা রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কলতলায় রথের মেলার মত ভীড় লেগে যায়। দশ ঘর ভাড়াটের ঐ একই কলতলা। বারো টাকা ঘর ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল মাথা গোঁজবার জায়গা পাওয়াই বা যায় কোথায় ? কিন্তু বাইরে থেকে আমাদের বাড়ী দেখলে মনে হ'বে মস্ত বড় বাড়ী ত' ! কিন্তু ঘর ঘর ভাড়াটে সব।

ভোর বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেড়িয়ে আসি একেবারে হরিশ পার্ক পর্য্যন্ত, কোন কোন দিন বা পার্কে বসি খানিকক্ষণ, সেই রোদ উঠলে যখন 'জার্ম্মানওয়ালা দো-আনার' গাড়ী যায়, তখন উঠে আসি।

পার্ক থেকে কিছু দূরে চায়ের দোকান আছে একটা। সেখানে এক পয়সা কাপ্ চা পাওয়া যায় কিনতে। দোকান ছোট হ'লে কি হয়, নাম তার প্রকাণ্ড—"কাফে দ্য ক্যালকাটা"। আমায় এক পয়সার আন্দাজে একটু বেশীই দেয় নিকুঞ্জ। ওর দোকানের প্রথম খদ্দের আমি, তাই

খাতির করে ও আমায়। শুধু তাই নয়, এই ত আর মাসে সাত আনা পয়সা বাকি পড়েছিল, তাও ও কিছু বলে নি আমায়। কিছু বল্লে বলত, "আপনাকে সন্দ করব কি মশাই? ভদ্দর নোক ছোট নোক আমি দেখলেই চিনতে পারি।" ওর দিকে মনোযোগ দিই নে বেশী। ওর দোকানে কাগজওয়ালা যতক্ষণ না "আনন্দ বাজার" দিয়ে যায় ততক্ষণ চুপ করে বসে দেখি লোকের পথ চলা। সকালবেলা নিকুঞ্জর দোকানের সামনের বড় বাড়ীটার ছাদে কাকেরা মিটিং বসায় রোজ, আর ডাষ্ট্‌বিনের ধারে কতকগুলো কুকুর জটলা করে রাত্তিরের ফেলে-দেওয়া বাসি ভাতের ভাগ নিয়ে।

আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে কলতলাটা চোখে পড়ে সবার আগে। উঠোনে কাপড় গামছা নিয়ে সব দাঁড়িয়ে, একজনের হ'লেই আর একজন। সবারই তাড়া, তাই সে এক হুড়োহুড়ি কাণ্ড! আমার অত সকালে স্নান করবার দরকার নেই। আগে যখন ছেলে পড়াতে যেতাম তখন মাঝে মাঝে স্নান করতাম। এখন সে বালাই নেই।

নীচের তলায় আর দু'ঘর ভাড়াটে আছে, আমি ছাড়া। আমার ঠিক সামনের ঘরখানায় থাকেন বিপিন বাবু। ক'মাস থেকে কি যে অসুখ করেছে তাঁর, কিছুতেই আর সারছে না। ক'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাঁর। এমন ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ায় তা'রা যে দেখলে মায়া হয়। একটা ঘুড়ি কেটে আসছে দেখলে আর রক্ষে নেই, ছুটবে তারা যতক্ষণ না মাটিতে পড়ছে সেটা। আবার কোনদিন বা ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে চেপে কত দূর থেকে বেড়িয়ে আসে। মা বেচারী ত' নিজের কাজেই ব্যস্ত, কেই বা দেখে তাদের?

আর একজন, নতুন এসেছে সে ক'দিন হ'ল। নাম তার যদুপতি। আলাপ করতে গিয়েছিলাম একদিন। অনেক কথা হ'ল। চলে আসবার মুখে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করেন আপনি?"

"বঙ্গ-বান্ধব প্রেসে ত' কাজ এখন করছি মশায়! কিন্তু এ কাজ কি আর ভাল লাগে? পাল বাবুদের প্রেসের কাজটি গিয়ে আর মনের সুখ নেই। "রক্তগঙ্গার ঢেউ", "ভীষণতম প্রতিহিংসা", "রেলে খুন"—এ সবই যে আমার নিজের হাতে কম্পোজ করা মশাই!" এই বলে আলাপ জমিয়ে তোলবার আশায় বিড়ি এগিয়ে দেয় একটা। এত বড় মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটা কেন যে আসে না বলতে পারি নে, আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে আসি। ওপরতলার গোকুল বাবু আমার এ আলাপের কথা শুনে বলেন, "হ্যাঁ, কাজ করে না কচু! খেয়ালী সিনেমার সামনে চার আনার টিকিট ছ' আনায় বিক্রী করতে দেখেছি আমি।" হ'বেও বা! সেই রকম চোয়াড়ে চেহারা বটে। মনটা ভেতর থেকে কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে; ভাবি, এ ধরণের লোক কেন এল আমাদের মধ্যে!

একতলা থেকে দোতলার বারান্দায় উঠে এলে তোমার মনে হ'বে রাম-রাবণের যুদ্ধ বেধেছে বুঝি! এমনি চীৎকার। ব্যাপার আর কিছু নয়, পাশা খেলা হ'চ্ছে। আপিস যাবার সময় না হওয়া পর্য্যন্ত এমনি কান-ফাটান চীৎকার চলবে, তার পর আবার সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ।

এদের থেকে কিছু দূরে চৌকি পেতে ক'জনে মিলে সকাল বেলায় পড়ে খবরের কাগজ। পড়াটা প্রথমে মনে মনেই হয় বটে, কিন্তু পড়া শেষ হ'বার পরই বিপদ্। প্রথম আলোচনা হয় খুব নীচু গলায়, ক্রমে স্বর উঠতে থাকে একটু একটু করে একেবারে সপ্তমে। যুদ্ধ কদ্দিন চলবে, জার্ম্মানীর জেতার আশা কতটুকু এ সব নিয়ে তুমুল তর্ক হয়। গান্ধী আর সুভাষ বোসের কথা নিয়ে একদিন হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

পশ্চিম দিকের ঘরখানায় থাকে প্রফেসার কোকিলকণ্ঠ। সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, সে খালি তার গান নিয়েই ব্যস্ত। দোতলার বারান্দায় দু'দলের ছাদ-ফাটান চীৎকারেও তার ব্যাঘাত হয় না এতটুকু। এত একান্ত সাধনার ফলেই না সে অমন উপাধি পেয়েছে!

তার উল্টোদিকের ঘরে থাকে আমাদের 'নকুল'। ওর ঘরে গেলে তুমি দেখতে পাবে ও একখানা 'রেস-গাইড্' সামনে নিয়ে নানা রকম অঙ্ক কষছে।—ঘোড়দৌড়ই ওকে খেলে। আমি ঘরে গেলেই বলে, "আসুন! আসুন! আপনাদের মত পুণ্যাত্মা লোকদের দেখলেও পুণ্য হয়"। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলে, "একটা উপকার করবেন দাদা?"

"কি? বল"।

"এই কিছু না। চোখ বুঁজে এই ক'টা নামের ওপর আঙ্গুল দিন দিকি। যেটির ওপর পড়বে তার ওপরই খেলব এবার।"

"তাও কি হয় ভাই? হেরে গেলে মনে মনে গালাগাল দাও যদি?" মনে মনে ভাবি, ঘোড়দৌড়ের অপকারিতা সম্বন্ধে ওকে একটা বক্তৃতা দেওয়া যাক্। সর্ব্বস্বান্ত হবার অমন সহজ পথ নাকি আর নেই। কিন্তু থাক্ গে।

তার পাশের ঘরে থাকেন আমাদের সকলের সরকারি পিসিমা। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন পৃথিবীতে কেউ নেই তাঁর। শুনি অনেক টাকা আছে বুড়ীর। নকুলের মতে তা নাকি লাখ খানেক হ'বে। কে জানে! সকাল থেকে তাঁর একমাত্র কাজ জল ঘাঁটা। একমাত্র ছেলে মরে গিয়ে 'শুচিবাই' ঢুকেছে মাথায়। একখানা গামছা আছে পরনে। ঘরে ঢুকতে দেন না কাউকে, কি জানি কি অদৃশ্য অশুদ্ধ জিনিষ মাড়িয়ে এসে থাকে যদি? কাজেই বাইরে থেকেই আলাপ করি। বলি, "ও পিসিমা! আবার মাজা বাসনগুলো ধুচ্চেন কেন?"

"আর ব'লো নি বাছা! পদীর অক্কেলখানা দেখ একবার—বাসুনগুলো ধুয়ে কোথায় ঘরে রাখবি তা না—"

সবাই হাসে তাঁর কাণ্ড দেখে। নকুল খালি বলে আমার কানে কানে, "জানেন দাদা! বুড়ীর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। ওদিকে তো টাকায় ছাতা ধরে গেল, তবু যদি কাউকে একটা পয়সা দেবে! গেল শনিবারে বল্লাম, পিসি, দাও দশটা টাকা, একবার 'লাকি এষ্টারের' ওপর খেলে দি, দশ টাকায় দু'শ' টাকা পাবে—তা বুড়ী যেন আমায় তেড়ে মারতে এল।"

* * * *

নীচের সেই পাল বাবুদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীটি ইতিমধ্যে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছে সকলের সঙ্গে। পিসির সঙ্গেই তার ভাবটা কিছু বেশী দেখতে পাই।

এমনি করেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছিল, হয়ত চিরদিন এমনি করেই কেটে যেত, কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমাদের এই বৈচিত্র্যহীন জীবনকে বেশ একটু নাড়া দিয়ে গেল।

রোজকার মত সকাল বেলা বেড়িয়ে ফিরে দেখলাম কলতলা খালি একেবারে, ওপর থেকে পাশা খেলা বা কাগজের খবর নিয়ে আলোচনার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।—তাই ত, ব্যাপার কি!

ওপরে উঠে এসে দেখলাম পিসির ঘরের সামনে ভীড় জমেছে খুব; পিসি কাঁদছে বিনিয়ে বিনিয়ে। কি হ'ল ওর? আর একদিন দেখেছিলাম পিসিকে কাঁদতে। দুপুর বেলায় ইস্কুল থেকে এসে পিসির ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, ছেলের বইগুলি কোলে ক'রে বসে আছে পিসি, আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে গড়িয়ে। কিন্তু সে দৃশ্য ত' আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি! কিন্তু আজ দেখছি ব্যাপার অন্য রকম। প্রফেসারকে জিজ্ঞেস্ করে জানলাম যে যদুকে বিশ্বাস ক'রে পিসি ব্যাঙ্কে রাখতে পাঠিয়েছিল দু'শ' টাকা, কিন্তু যদুর দেখা আর পাওয়া যাচ্ছে না, ঘরে তার মস্ত তালা মারা। তাই ত! চোর বলে মনে ত' হয় নি তাকে কোন দিন! বাইরে থেকে লোকের প্রকৃতি বোঝা ভার এই কথাই ভাবি আমি।

নকুল আমায় দেখতে পায় নি এতক্ষণ, এবার দেখে ছুটে এল। বল্লে, "দেখুন দাদা! বাড়ীওয়ালার কাণ্ডখানা দেখুন একবার। বলি টাকার লোভে চোর, ডাকাত, খুনে যা'কে পাবি তা'কেই এনে ঢোকাবি? গলায় ছুরি দিয়ে যেত যদি?"

বেশীক্ষণ তামাসা দেখবার সময় নেই কারুর, সকলেরই কাজ আছে। তাই ক্রমে ক্রমে ভীড় পাত্‌লা হয়ে যায়। আমিও চলে আসি; পাঁচ মিনিট দেরী হ'লে চাকরি থাকবে না।

ইস্কুল থেকে ফেরবার মুখে মনে পড়ল কাপড় নেই। তাই ঠিক করলাম বড়বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসব।

হ্যারিসন রোড়ের মোড়ের কাছাকাছি এসে কি মনে হ'ল, পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম সেকেণ্ড ক্লাশে যদু বসে একমনে বিড়ি টানছে, কোলের ওপর পুঁটুলী রয়েছে একটা। তাড়াতাড়ি বেল্ দিয়ে নেমে ডাকলাম, 'যদু!' ভাবলাম হয়ত হাতে-নাতে ধরা পড়ার জন্ম নামবে না কিংবা হয়ত পালাবে। কিন্তু কিছুই করল না সে। একটু কুণ্ঠিত হয়ে নেমে এল। বল্লে, "আমায় ডাকছেন?" বল্লাম, "হ্যাঁ, পিসির টাকাগুলো চুরি করে কোথায় পালাচ্ছ?"

"দশটি টাকা ত' আমার ট্যাঁকে এসেছে মশাই! এতে কি কেউ চোর হয়?"

"সে কি! বাকি টাকা কি করলে?"

"তবে খুলেই বলি, আপনি কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, আপনাকে বলতে আপত্তি কি? কাল দুপুরে টাকা জমা দিতে যাবার সময় বিপিন বাবুর ঘরে উঁকি মেরে দেখি, বিপিন বাবুর বউ বসে বসে কাঁদছেন। তাঁর হাতে কাচের চুড়ি দেখেই বুঝেছিলাম অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে। বাইরে তাঁর বড় ছেলেটা বসেছিল; তাকে জিজ্ঞেস্ করে জানলাম, দু'দিন ধরে ডাক্তার আসছে না, ওষুধপত্তর বন্ধ।—ভাবলাম, লোকটা বিনি চিকিচ্ছেয় মারা যাবে? ডাক্তারের দোকান আমি চিনতাম, কতবার ওদের ওষুধ এনে দিইছি। ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার দেনা মিটিয়ে দিলাম। দশটি টাকা রেখে বাকি টাকাও দিয়ে এলাম তার হাতে।"

তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লাম, "কোথায় চলেছ?"

"এর পর আর কলকাতায় থাকি কি করে বলুন? ঐ দশটা টাকায় যত দূর যাওয়া যায় যাব, তারপর একটা কাজ যোগাড় করে নেব অখন। আচ্ছা, অতগুলো টাকা পেয়ে ডাক্তার এবার ভালভাবেই চিকিৎসা করবে বিপিন বাবুর, কি বলেন মশাই? আহা, লোকটা বেঁচে উঠুক, নইলে ছেলেপেলেগুলো পথে দাঁড়াবে।" ওর কথার উত্তর দেওয়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে নমস্কার করে ও চলে যায়। মোড়ের কাছে গিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়, তার পর আস্তে আস্তে ভীড়ের মধ্যে যায় মিশিয়ে। ও যেদিকে গেল সেদিকে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ,—কাপড় কেনবার কথা ভুলে যাই। খালি হাতেই বাড়ী ফিরে আসি।

ওপরে আজ আর পাশার আসর বসে নি, সবাই যদুর কথা নিয়ে ব্যস্ত। নকুলের গলা উঠেছে সবার উপরে। পিসিকে শুনিয়ে বলছে, যদুকে একবার দেখলে কেমন করে তার মুণ্ডু ছিঁড়বে। পিসি খুসী হ'লে হয়ত এ শনিবারে ওর "লাকি এষ্টারের" ওপর টাকা দিতে আপত্তি করবে না।

রোজকার মত আর ওদের আলোচনায় যোগ দিতে পারি নে। চাদরখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ি আস্তে আস্তে।

কবিকিশোর

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্‌.এ)

"প্রথম কবিতা, প্রথম গান শোনা"

গেল বারে মনের রঙ্‌ বদলানোর কথার উল্লেখ করেছিলাম। মনের রঙ্‌ বদ্‌লানোর কথায় আরও কোনো কোনো প্রসঙ্গ মনে পড়্‌ছে। মনের দিকে সাধারণতঃ আমরা লক্ষ্য করি না। যেমন যেমন হচ্ছে, ঘট্‌ছে—মনের ক্রিয়াও তদনুরূপ হচ্ছে, এটা আমরা জানি। কিন্তু আমি বল্‌ছি রঙ্‌ বদ্‌লানোর কথা। প্রকৃতিতে যেমন সারাক্ষণই হয়—বৃষ্টি হ'তে হ'তে উঠ্‌ল রোদ, তার পর আবার হ'তে লাগ্‌ল বৃষ্টি, এমনি ব্যাপার; ঋতু পরিবর্ত্তনে যেমন হয়,—অকস্মাৎ ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠ্‌ল ঋতুলক্ষ্মীর আভরণ—পর্ণে বর্ণে গন্ধে রূপে রসে যা'র প্রকাশটা অত্যন্ত স্পষ্ট! তেমনি কিছু একটা হয় মনোজগতে—বিশেষতঃ শিশুমনে, যখন সামান্য একটা ঝিঙে ফুল কোনো বর্ষণশেষ বিকেলে কি অদ্ভুত রূপ নিয়ে দেখা দেয়! মনে হয়, ওকে যেন এই প্রথম দেখ্‌লাম। তেমনি বিশ্বসংসারের যা' কিছু বস্তু, সবই নূতন হ'য়ে উঠ্‌ল একদিন, অর্থাৎ সব কিছুকে নূতন চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। এ রকম আমার আর একবার হ'য়েছিল—'লয়লা-মজ্‌নু' প'ড়ে। 'লয়লা-মজ্‌নু'র দুঃখ, তা'দের বিয়োগান্ত কাহিনী চোখে জল নিয়ে আসে। কিন্তু আমার সমস্ত কিশোর-জীবনের কতকগুলি দিন বইখানি একেবারে নিঃশেষে অধিকার ক'রে ব'সেছিল। বোধ হয় যে কোনো গভীর দুঃখের কথা মানুষের মনকে দূর বচনাতীতে নিয়ে যায়। বাইরের প্রকৃতিতে, বৃষ্টি হয় না—অথচ একটা থম্‌থমে মেঘের ভাব চাপানো সমস্ত দিনটার মাথায়—এ যেন অনেকটা ঐ রকম। যাক্‌, এ 'লয়লা-মজ্‌নু' প্রসঙ্গ আর একদিন বলা যা'বে। এখন নতুন মাষ্টার মশায়ের কথা বলি।

*

আবার এক বর্ষার দিনে মাষ্টার মশায় তাঁ'র দেশে গেলেন। যা'বার সময় বল্‌লেন, 'শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ব। তোমরা পড়াশুনা কর। এসে দেখ্‌ব, শুন্‌ব সব।'

তার পরে কয়েক দিন কেটে গেল—বোধ হয় কয়েক সপ্তাহই হ'বে। খেলা কর্‌ছি আমরা কয়েকজনে মিলে। কি খেলা মনে নেই—ছোট বয়সের খেলা, যা'র শেষ নেই, যা'র বৈচিত্র্যও অনন্ত। এমন সময় কে একজন এসে বল্‌ল, 'মাষ্টার মশায় মারা গেছেন, জান!'—

বল্‌লাম, 'ইয়ারকি হচ্ছে?'

সে বল্‌ল, 'না, চিঠি এসেছে যে! দেখ নি সে চিঠি?'

চিঠি এসেছে, তা'তে কি আছে, মাষ্টার মশায় এই বাড়ী গেলেন, এরি মধ্যে তিনি মারা গেলেন! আর তিনি ফিরে আস্‌বেন না, আর তাঁকে দেখ্‌তে পা'ব না—এই চিন্তাতে চোখে জল এল। মেজদি' খুবই কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমার মনে লাগ্‌ল খুব। বোধ হয় চেঁচিয়ে কাঁদি নি। সেই স্নেহময়, শান্ত, দরদী মানুষটির একটি ছবি মনের মধ্যে চিরকালের জন্য র'য়ে গেল। গ্রামের মুষাভূষোরাও তাঁ'কে ভুল্‌তে পারে নি অনেক দিন।

ছোট বয়সে মনে যে সব আঘাত পেয়েছি, তা'র মধ্যে মাষ্টার মশায়ের মৃত্যু ছাড়াও আরও দুই-একটি তুচ্ছ ঘটনা মনে আছে। নিষ্ঠুর ব্যাধের তীরে আহত হ'ল ক্রৌঞ্চী, আর বিরহী ক্রৌঞ্চের আর্ত্ত রোদনধ্বনিতে ব্যথিত হ'য়ে মহর্ষি তাঁ'র কাব্যের প্রথম শ্লোক রচনা করলেন। আর আমি রচনা কর্‌লাম আমার প্রথম শ্লোক—যেদিন আমাকে না ব'লে বাড়ীর সকলে মিলে গেলেন "রামসীতা" দেখ্‌তে মেটিরি—আমাদের গ্রাম থেকে দু' তিন ক্রোশের পথ। ভোরে উঠ্‌তে হ'বে—এম্‌নি একটা কথা ছিল। কিন্তু আমি যখন উঠ্‌লাম, তখন অনেক বেলা হ'য়েছে। মেজদি' পর্য্যন্ত আমাকে ফাঁকি দিয়ে 'রামসীতা' দেখ্‌তে গিয়েছে। বাড়ীতে শুধু আছেন মা—তিনি বল্‌লেন, 'ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর ডাকা হয় নি।' ক্ষুণ্ণমনে সকলের উপর বিরক্ত হ'য়ে ছাদে চ'লে গেলাম। ছাদটি ছিল আমার একান্ত নির্জ্জন জীবনের সঙ্গী। আশেপাশে নারিকেলের শাখা, দক্ষিণে বাঁশবনের সর্‌-সর্‌ মর্‌-মর্‌ আন্দোলন, আর পূর্ব্বে যত দূর দৃষ্টি চলে নানা তরুরাজির জটলা,—নত হ'য়ে, উন্নত হ'য়ে তা'রা দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। গত সন্ধ্যায় শুয়ে শুয়ে 'রামসীতা'র বর্ণনা শুনেছি। রাম রাজা হ'য়েছেন, তাঁ'রই মূর্ত্তি। তাঁ'র বেশভূষার সবিস্তার

বর্ণনা শুনে মনের মধ্যে মেটিরি গ্রামের একটি চিত্র তৈরী ক'রে নিলাম। কিন্তু এত কাণ্ডের পর এই বিফলতা! ছাদের কোণে গিয়ে মনের আক্রোশে যা' রচনা করলাম, তা'র প্রথম দু' লাইন এখনো বেশ মনে আছে। পৃথিবীর কাউকে আর বিশ্বাস হয় নি। রামায়ণে-পড়া যে রাম—যাঁ'র কথা সব সময়েই শুনি শৈশব-জীবন ভ'রে, যাঁ'র উন্নত রাজমূর্ত্তি দেখাই হ'ল না আমার—সেই রামচন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে আমার প্রথম কাব্য বোধ হয় পয়ারেই আরম্ভ হ'ল :

শোন শোন রামচন্দ্র, শোন বিবরণ।
আমাকে না ল'য়ে করে মেটিরি গমন॥

রামচন্দ্র বোধ হয় আমার সে অনুনয় শুনেছিলেন, কারণ, তার পর থেকে বাড়ীর স্বল্পপরিসরের মধ্যে আমার কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়্‌ল। তা'তে (অর্থাৎ সেই প্রথম কবিতাতে) যাঁ'রা যাঁ'রা মেটিরি গিয়েছিলেন তাঁদের সর্ব্বপ্রকার সমালোচনা ছিল। কে বেশী মোটা, কে দেখ্‌তে কুশ্রী, কে কথা দিয়ে কথা রাখ্‌তে পারে না—এ সকলেরই নির্ম্মম সমালোচনা ছিল। যত দূর স্মরণ হয়—এই আমার প্রথম কবিতা।

*

ভোরবেলার এই ডাক আমার স্মৃতিকে মথিত করে। মনে হয় সে সব দিন আর ফিরে আস্‌বে না। ভোরবেলায় ঝ'রে পড়ে শিউলীফুল; সঙ্গীরা সব ডাক্‌তে আসে। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মেয়েদের হ'লেও আমি তা'তে যোগ দিতাম। ঠিক মনে পড়ে না—কিন্তু ঠিক না মনে পড়াটাই মজার। কোট গায়ে দিয়ে শিউলীফুল কুড়োতে যেতাম এটুকু অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে। গাছটা নাড়্‌লেই ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌ত শিউলীফুল—আর আমরা কুড়োতাম। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে মধুর স্নিগ্ধ স্পর্শ থাক্‌ত, তা যেন এখনো অনুভবের বাইরে যায় নি। তার পরে, ভোরবেলায় কোথাও যাওয়া হ'ত। মাঝে মাঝে সব মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যেতেন। দু' ক্রোশ পথ ভেঙে, কখনো গরুর গাড়ীতে কখনো পায়ে হেঁটে, কত বাঁধ ভেঙে, কত জমি, আলপথ পার হ'য়ে, কত বিল ডাইনে বাঁয়ে ফেলে আমার সেই ভাগীরথী—ক্ষীণকায়া, দু' ধারে বাব্‌লার বন—কালো পালের মত সব

ভেসে যায় মেঘ! এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত বার গিয়েছি গঙ্গায়! ভোরবেলাকার ডাক মনে প'ড়লে আমার সেই শৈশবস্মৃতি আর স্বপ্নময় জগতের কথাই মনে পড়ে। আর মনে পড়ে টহলের সুর। বৈরাগীরা খুব ভোরে খঞ্জনী বাজিয়ে গ্রামের পথে পথে টহল দিয়ে যেত। আমাদের হয়ত তখন ঘুমই ভাঙ্‌ত না ভালো ক'রে। অল্প একটু আলো—অন্ধকার বেশী। ছোট ছোট কয়েকটি পাখী কিচ্ কিচ্ কিচির মিচির করে। আধ ঘুমঘোরে বৈরাগীর খঞ্জনীর শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র গানের সুর কানে এল। ভোরের পাড়াগাঁয়ের আকাশে সেই সুর কেঁপে কেঁপে ফির্‌ছে। গাছের যে সব পাতা রাত্রির অন্ধকারে শিশিরে শিশিরে স্তব্ধ হ'য়ে ছিল, তা'রা যেন সেই সুরে জেগে উঠে ধীরে ধীরে কাঁপ্‌তে লেগেছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোতে ছোট ছোট পাখীদের পাখার পালকে পালকে যেন কেঁপে কেঁপে ফির্‌ছে সেই সুর। পানাপুকুরে, ডোবায়, বিলে. যে সব রক্তকমল উপরে শিশির আর নীচে জল নিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে আছে, তা'দের আফোটা পাপ্‌ড়ির ভিতরে যেন সেই সুর প্রবেশ ক'রে তাদের জাগরণ নিয়ে আসে। বৈরাগী জাগরণী গান গেয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর মনে পড়ে, তা'দেরই গলায় শোনা আগমনী গানের সুর—'গিরি গৌরী আমার এসেছিল', উমার বিরহ-গাথা, উমার আগমনের সুর। এ সুর বাজ্‌তে থাক্‌ত কানে আশ্বিনের আবির্ভাবে। শরতের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সুর আস্‌ত মনে। বোধ হয় ঋতুলক্ষ্মীর চরণমঞ্জীর ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাঁধা। আগমনী গান সম্ভবতঃ তা'দেরই মধ্যে একটি।

সুরের প্রসঙ্গে, গানের প্রসঙ্গে আর একদিনের স্মৃতি এল মনে। খেলা ক'রে ফির্‌ছি। বাড়ী ঢুকতেই শুন্‌লাম কোথায় কে যেন বড় মিষ্ট, বড় করুণ সুরে গান গাইছে। এমন অদ্ভুত লাগ্‌ল সেই সুর আমার! তার পর, বাড়ী ঢুকে দেখ্‌লাম, একটি কালোমত লোক—রোগা, সে-ই কীর্ত্তন গাইছে। বাকি সব লোক মাদুর, সতরঞ্চি, কম্বল পেতে ব'সে মুগ্ধ হ'য়ে সেই গান শুন্‌ছে। পূজার দালানে গান হচ্ছে। নানা রকম জলখাবারের আয়োজন, ঘন ঘন তামাক চলেছে। রোগা লোকটি নানা রকম ভঙ্গী ক'রে হাত নেড়ে নেড়ে—কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা চ'লে গেছেন, সেই কাহিনী গান গেয়ে গেয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তখন বিকেলের পাণ্ডুর

রোদ এসে পড়েছে দালানে। আমার মনে হ'ল, এই সুর যেন কোথায় শুনেছি, কিন্তু কোথায় যে শুনেছি তা' আর কিছুতেই মনে এল না। অথচ সুন্দর লাগ্‌ল সেই সুর। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ব'সে সেই সুর—সেই কীর্ত্তনগান শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

দুই

রণজিৎদের ফ্লাইং-ক্লাবের মেম্বর—রণজিতের পরম প্রিয় বন্ধু, অজয় এসে বল্‌লে সেদিন রণজিতের মাকে—"কাকীমা, আপনি অত কাতর হ'বেন না ভেবে ভেবে; আমি যাচ্ছি আজই এরোপ্লেনে চ'ড়ে, ওদের খোঁজ নিয়ে ফির্‌ছি দু' এক দিনের মধ্যেই—দেখুন না, সঙ্গে করেই নিয়ে আস্‌ব ওদের।"

রণজিতের মা চোখের জল মুছে বল্‌লেন, "বাবা, আমার ত' সর্ব্বনাশ হয়েছেই; তুমি পরের বাছা; তুমি কেন আবার ঐ সর্ব্বনেশে যন্তরে চেপে তোমার প্রাণটাও খোয়াবে?"

অজয় হেসে বল্‌লে, "কাকীমা! ভয় নেই, আমি মর্‌লে আমার জন্য কাঁদ্‌বার কেউ নেই। ত্রিসংসারে আমার এক বুড়ী পিসীমা আছেন অবশিষ্ট—সে বুড়ীই বা আর ক'দিন! চল্‌লাম, তা হ'লে—" বলে রণজিতের মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে অজয় বিদায় নিল।

অজয় সেইদিনই রওনা হ'ল সিঙ্গাপুর অভিমুখে।

দিনের পর দিন যায়—সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে যে কবে ফিরে আসে অজয়। এক একটী মুহূর্ত্ত যেন প্রত্যেকের কাছেই এক একটী যুগ ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল। সন্দেহ-দোলায় দুল্‌তে লাগ্‌ল সকলের মন—আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব চল্‌তে লাগ্‌ল সকলেরই বুকের মাঝে। কি

সংবাদ নিয়ে ফিরবে অজয় কে জানে? ওদের যদি সঙ্গে করেই ফিরে আসে, সত্যিই!—কিংবা? সে কথা ভাব্‌তেও যে সকলের বুকের মধ্যেটা কি রকম মুচড়ে ওঠে।

কিছুদিন পরে ফির্‌ল অজয় শেষ পর্য্যন্ত—কিন্তু, কোনও বিশেষ খবরই আন্‌তে পারে নি সে রণজিৎদের।

রণজিতের মা অশ্রুসজলকণ্ঠে শুধু একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কোন খবরই পেলে না ওদের, বাবা?"

অজয় বল্‌লে, সিঙ্গাপুরে গিয়ে সে শুধু এইটুকু খবর পেয়েছে যে তা'রা সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছিল ঠিকই কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে তা'রা চলে গেছে 'প্লেন্' উড়িয়ে—বেশ সুস্থ শরীরেই। অজয় তার পর ওদের খোঁজে সিঙ্গাপুর থেকে গেছে অষ্ট্রেলিয়ায়। সেখানে পৌঁছে, সেখানকার এরোড্রোমে, হোটেলে, হাসপাতালে—সর্ব্বত্র খোঁজ করে দেখেছে, কোথাও তা'দের দেখা মেলে নি। তাদের ত দেখা মেলেই নি, তা'দের প্লেন্‌খানিরও না।

অজয় ভেবেছিল যে যদি ওরা কোনও ক্রমে পৌঁছে থাকে ওখানে, তা হ'লে ওদের খুঁজে না পা'ক, ওদের 'লাইট্ প্লেন্' খানিকে খুঁজে বা'র করা শক্ত হ'বে না। এও ভেবেছিল সে যে হয়ত নামবার সময় ধাক্কা লেগে এরোপ্লেন্‌টী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে; কারণ, এ বিপদ্ এবং দুর্ভাগ্য বহু পাইলটের অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু, ওর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যদি প্লেন্‌খানি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েও থাকে তা হ'লেও সেই এরোপ্লেন্‌টীর ভাঙ্গা অংশগুলির অন্ততঃ পক্ষে দু' একটাও নিশ্চয় ওর চোখে পড়্‌বে।...কিন্তু কিছুই সে দেখ্‌তে পেল না, কোনও খোঁজই সে পেল না তা'র প্রিয়তম বন্ধুর আর তার ছোট বোন্‌টীর।

অজয়ের নিজের দুঃখ যাই হোক, বুকটা তা'র ব্যথায় রণিয়ে উঠল যখন তাকে এসে রণজিৎদের প্রিয় ও অতি আপনার জনদের খবর দিতে হ'ল যে রণজিৎ আর ইরা এরোপ্লেনে চড়ে সিঙ্গাপুর থেকে বেরিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে, কিন্তু, অষ্ট্রেলিয়ায় তা'রা পৌঁছায় নি।

মুষড়ে পড়্‌ল সবাই; একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন রণজিতের মা। সকলেরই চোখ ফেটে জল এল যখন তিনি বহুক্ষণ গুম্‌রে থেকে থেকে হঠাৎ বুকফাটা আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন—"মাগো, কথা রাখতে পার্‌লি নে! বলে গেলি যে ক'দিনের মধ্যেই ফিরে এসে তোর মায়ের বুকের মধ্যে শুয়ে ছোট্ট মেয়ের মত গল্প কর্‌বি অষ্ট্রেলিয়ার?—"কই ফিরে এলি নে ত মা?" অজয় ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না যে কি হ'ল রণজিৎদের। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই কোনও দুর্ভাগ্য ঘটেছে ওদের অদৃষ্টে। হয়ত ওদের সলিল-সমাধি হয়েছে, নয়ত কোনও স্থলভূমিতে ওদের মৃতদেহ পড়ে আছে, শেয়াল-কুকুরে সে মৃতদেহগুলিকে খাচ্ছে

টেনে টেনে, কিংবা, হয়ত এমন কোনও জায়গায় গিয়ে পড়েছে ওরা যেখান থেকে উদ্ধারের কোন আশাই আর ওরা দেখ্‌তে পাচ্ছে না।

অজয়ের আপনার বল্‌তে এ সংসারে বিশেষ কেউই ছিল না। তাই সে বাইরের দু' একজনকে তা'র জীবনে অতি আপন ক'রে কাছে টেনে নিয়েছিল—নিজে থেকেই। রণজিৎ আবার সেই দু' একজনের মধ্যেই বিশেষ একজন; সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সে ভালবাস্‌ত তা'র এই বন্ধুটীকে। তাই তাকে হারিয়ে অজয়ের কাছে সমস্ত সংসারই আজ একেবারে শূন্য মনে হ'তে লাগল।

অজয়ের অর্থের অভাব ছিল না। বিপুল সম্পত্তি তা'র বাবা রেখে গেছেন তা'র জন্য। সে ঠিক কর্‌লে যে একটা জাহাজ সে ভাড়া কর্‌বে—দিনের পর দিন সে খুঁজ্‌বে তা'র প্রিয়তম বন্ধুকে আর বন্ধুর পরম আদরের ছোট বোন্‌টীকে। যত দিন তা'র হাতে এক কপর্দ্দকও থাকবে, যত দিন সে সত্যিই একেবারে নিরাশ না হ'য়ে পড়বে তত দিন সে ঘুরবে প্রতি সাগর মহাসাগরের বুকে বুকে—খুঁজ্‌বে প্রতি কূল উপকূল।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বা'র হয়ে পড়ল সে আর কয়েকটী অনুচর সঙ্গে নিয়ে। ভাস্‌ল অসীম সমুদ্রের বুকে অনির্দ্দিষ্টভাবে,—তা'র পরমপ্রিয় বন্ধুর খোঁজে।

* * * *

এক বৎসর পরের কথা।

রণজিৎদের বাড়ীতে বস্‌বার ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় অনেকেই উপস্থিত।

সবাই নীরব—নতুন কি একটা দারুণ দুঃসংবাদে সকলেই যেন বাক্যহারা। অনেকক্ষণ পরে সে নীরবতা ভঙ্গ কর্‌লে রণজিতের ছোট কাকার মেয়ে মীরা। মীরা বল্‌লে অতি আস্তে—"আচ্ছা, যে জাহাজটী ডুবেছে জলের মধ্যেকার পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সেটা যে অজুদা'রই জাহাজ তা তোমরা সঠিক ব'লে ধরে নিচ্ছ কেন? এও ত হ'তে পারে যে সে জাহাজটী কোনও মালবাহী জাহাজ বা প্যাসেঞ্জার জাহাজ?"

রণজিতের বাবা বিজয় বাবু বল্‌লেন—"না মা, তা' হ'তে পারে না। কোনও কোম্পানীর কোনও মালবাহী জাহাজ বা প্যাসেঞ্জার জাহাজ যায় নি ডুবে। তা হ'লে আজ এই কয় দিনের মধ্যে তা'রা কি সে খবর পেত না? তা ছাড়া সব চেয়ে বেশী প্রমাণ হচ্ছে আজকের কাগজের বিবরণ। দেখ্‌ছিস না কাগজে লিখ্‌ছে—জাহাজখানি যে কা'র তা আজ পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। যেখানে জাহাজ ডুবেছে সেখানে কোন জাহাজেরই যাওয়ার উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না—কারণ, একেবারে সমস্ত 'রুট্'এর বাইরে এ জায়গা—কি উদ্দেশ্যেই বা এ জাহাজখানি এখানে এসেছিল বোঝা দুষ্কর—"

রণজিতের মেজদা' বল্‌লেন, "বোঝা ওদের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু আমরা বেশ বুঝ্‌ছি যে কি উদ্দেশ্যে ও জাহাজ ওখানে গিয়েছিল।" একটু থেমে আবার বল্‌লেন,—"অজয়ের প্রাণটাও শেষ পর্য্যন্ত এমনি করে গেল! এই বয়স—অত বড় লোকের ছেলে—জীবনের কিছুই উপভোগ কর্‌তে পেল না।"

রণজিতের বড় পিসীমার মেয়ে ললিতা বল্‌লেন,—"অজয়ের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে এমন লোক হয়ত বেশী নেই সংসারে, কিন্তু, হৃদয়ের সম্পর্ক আছে অজয়ের সঙ্গে—অজয়কে প্রাণমন দিয়ে স্নেহ করে, ভালবাসে এমন লোকের ত' অভাব নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সে সব লোকের একটীরও মুখ সে দেখ্‌তে পেল না—এ কি কম দুঃখের কথা?"

রণজিতের মা আজকাল বেশী কথা বলতেন না কারো সঙ্গেই। আজ এ ঘরে যদিও তিনি বসে ছিলেন কিন্তু একটী কথাও এতক্ষণ তিনি বলেন নি। চোখ দিয়ে তাঁর শুধু মাঝে মাঝে দু' এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল। অজয় তাঁর কাছে নিজের সন্তানের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। রণজিৎ আর ইরার শোক যেন আজ তাঁর অন্তরে আবার নতুন করে জেগে উঠেছে।

তিনি শুধু বল্‌লেন এতক্ষণ পরে—"আমারই জন্য অজয় তা'র অমূল্য প্রাণটা বিসর্জ্জন দিল। আমারই কাতরতা দেখে—" তিনি আর বল্‌তে পার্‌লেন না, কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে এল কান্নায়।

রণজিতের বাবা বল্‌লেন, "সে শুধু তোমারই দুঃখে কাতর হয়ে ভেসেছিল অসীম পাথারে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে—এ কথা ভেব না। তার নিজের দুঃখটা আমাদের কারো চেয়ে, এমন কি বোধ হয় তোমার চেয়েও কম ছিল না। ও যে কত বড় চাপা ছেলে সে তোমরা কেউ জান না। বাল্যে ও হারিয়েছিল ওর মাকে; তাই সতীশ, আমার পরম বন্ধু সতীশ—অজুর বাবা অজুকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রে তুলেছিল। অজু যে তা'র বাবাকে কতখানি ভালবাসত সে তোমরা কল্পনাও কর্‌তে পার না। সেই বাবা যখন ওর মারা গেল—হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে—দু'টী দিনের মধ্যে, তখনও ওর চোখে এক ফোঁটা জল কেউ দেখ্‌তে পাই নি। অথচ যেদিন ও ফিরে এল অষ্ট্রেলিয়া থেকে রণু আর ইরার কোনও খবর না পেয়ে সেদিন ওর সে সর্ব্বহারা মূর্ত্তি দেখে—আমি বাবা, আমি আমার ছেলেমেয়ের শোক ওর ও শোকের কাছে কিছুই নয় ভাবলাম। কোনও দিন যা' দেখি নি সেইদিন তাই দেখলাম—ওর চোখের কোণে দু' ফোঁটা অশ্রু টল টল কর্‌ছে!"

মীরা যেন নিজের মনেই বল্‌লে,—"বন্ধুর ভালবাসা এত গভীর, এত নিঃস্বার্থ হয় তা আগে জানতাম না!"

ললিতা বল্‌লেন—"অজয়ের পিসীমা—এই এক বৎসর ত' এক রকম না খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে শয্যাশায়ী হয়েছেন—এইবার এ খবর পেলে নিশ্চয়ই তিনি মারা যাবেন।"

রণজিতের মেজদা' বল্লেন—"তাঁর আর এখন বেঁচে থেকে লাভ কি? অজয়ই যখন আর রইল না এ সংসারে—"

ঘরের কোণে টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠ্ল।

মীরা অতি অন্যমনস্কভাবে উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। কানের কাছে সেটা ধরে বল্লে—"হ্যালো?"

মীরা হঠাৎ ভীষণ চম্‌কে উঠ্ল—সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস কর্‌তে পারল না। সে কম্পিত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"হ্যালো—কে আপনি?"

উত্তর শুনে এবার মীরা চীৎকার করে উঠ্ল—"অজয়দা'—অজুদা' ফোন কর্‌ছে—সে বেঁচে আছে! তোমাকে ডাক্‌ছে, জ্যাঠামণি!" সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্ল ভীষণ।

মীরা হঠাৎ ভীষণ চম্‌কে উঠ্ল।

বিজয় বাবু মীরার হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা নিজে নিয়ে নিলেন। বল্লেন—"কে, অজয়?" গলার স্বর তখন তাঁর কাঁপ্‌ছে উত্তেজনায়।

অজয় বেঁচে আছে—হয়ত রণু, ইরাও বেঁচে আছে, হয়ত ও তাদের সঙ্গে করে এনেছে, অন্ততঃ পক্ষে খবরও এনেছে।

উত্তর এল—"হ্যাঁ, আমি অজয়।" বড়ই ক্লান্ত যেন অজয়ের স্বর। যেন আর কে কথা কইছে—ওর স্বর যেন চেনাই যায় না!

বিজয় বাবু আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার জাহাজ তা হ'লে ডোবে নি?"

অজয় বল্‌লে, "না, সে আমার জাহাজ নয়।"

বিজয় বাবু কোনও রকমে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রণুর আর ইরার খবর পেয়েছ কিছু?"

অজয় বল্‌লে—"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

বিজয় বাবুর শরীর তখন থর থর করে কাঁপ্‌ছে; জিজ্ঞাসা কর্‌লেন অতি ক্ষীণস্বরে—"বেঁচে আছে ত' ওরা?"

অজয় অতি ম্লান সুরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, বেঁচে আছে, কিন্তু—"

বিজয় বাবু ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কিন্তু কি?"

অজয় বল্‌লে—"আমি যাচ্ছি আপনাদের ওখানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। গিয়ে সব বল্‌ব।"

এক অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠ্ল সকলের মন। সারা ঘরটায় যেন এক অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল কোথা থেকে।

(ক্রমশঃ)

মিশরের কথা

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ)

মানুষ কি করে আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করল এবং কি করে সভ্যতার প্রথম স্তর অতিক্রম করল তার কথা তোমাদের এর আগে একদিন বলেছি।* আজ তোমাদের পৃথিবীর প্রথম সভ্য দেশ মিশরের কথা বলব।

মিশর নীল নদের দেশ। মধ্য আফ্রিকার পর্ব্বত, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও বিরাট্ হ্রদের এলাকা থেকে বার হয়ে নীল নদ পূর্ব্ব আফ্রিকার বুক চিরে ভূমধ্যসাগরে

* সভ্যতার গোড়াপত্তন—রামধনু, কার্ত্তিক, ১৩৪৩

গিয়ে মিশেছে। নীল নদের দু'পাশের ভূমি উর্ব্বরতায় অতুলনীয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা এই যে যে অঞ্চল নদীসম্পদে সমৃদ্ধ সেখানে সভ্যতার ইতিহাস অতি-পুরাতন। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয়েছে কোনও একটি নদীকে কেন্দ্র করে। মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় যে ৫০০০ বৎসর আগেকার ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার কথা তোমরা বোধ হয় জান। এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল সিন্ধু নদের তীরে—সেইজন্য এই সভ্যতা "সিন্ধু-সভ্যতা" নামে পরিচিত। বর্ত্তমান কালের ইতিহাসেও এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রধান প্রধান নগরগুলিকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে ওঠে; আবার প্রত্যেক প্রধান নগরই প্রায় কোনও না কোনও নদীর ধারে গড়ে উঠেছে। এই রকম নীল নদের তীরের সহরগুলিকে কেন্দ্র করে মিশরের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আজ অবশ্য সে সব নগরের অস্তিত্বও খুঁজে পাবে না—কেবল মাত্র ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে।

মিশরের এই প্রাচীন সভ্যতাকে নীল নদের দান বলতে পার। অন্যান্য দেশের লোক বন্যাকে দেবতার অভিশাপ বলে ভয় করে কিন্তু মিশরে নীল নদের বন্যাকে লোকেরা ভগবানের দান বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে মিশরের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি এই বন্যারই ফল। এইজন্য অতি প্রাচীন কাল হ'তে নীল নদকে মিশরবাসীরা দেবতার আসন দিয়ে এসেছে। প্রতি বৎসর একবার করে নীল নদে প্রবল বন্যা হয়। এই বন্যা নদীর দু'পাশের বহু দূর অবধি জমি ডুবিয়ে দেয়। যখন বন্যার জল চলে যায় তখন দেখা যায় যে নদীর দু'পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত একস্তর পলিমাটি জমে আছে। এই পলিমাটির উর্ব্বরতার তুলনা নেই। মিশরের এই উর্ব্বর ভূমিভাগের পরিমাণ ১০,০০০ বর্গ মাইল। এই ১০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণ জায়গায় অতি প্রাচীন কাল হ'তে খুব উন্নত স্তরের সভ্যতার অস্তিত্বের নিদর্শন আমরা পাই। এই সভ্যতার বয়স যে কত তা ঠিক করে বলা চলে না—তবে এ কথা ঠিক যে ৬।৭ হাজার বৎসর আগেও মিশরের লোকেরা বেশ সভ্য ছিল।

মিশরের নানা জায়গায় ছড়ান ছোট ছোট স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব স্তূপ খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এই সব স্তূপের

নীচে ৬।৭ হাজার বৎসরেরও আগেকার মিশরের অধিবাসীর কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। তখনকার দিনে কি করে মানুষকে কবর দেওয়া হ'ত তা সঙ্গের ছবি থেকে বুঝতে পারবে। তখন অবধি মামি করবার মাল-মসলা আবিষ্কৃত হয় নি। মিশরের লোকেরা বিশ্বাস করত যে এক জীবনেই মানুষের জীবনধারা শেষ হয়ে যায় না। পৃথিবী ছেড়ে যাবার পরও পরবর্ত্তী জীবনে মানুষের জীবনধারা অব্যাহত থাকে। সেইজন্য মৃতের পরবর্ত্তী জীবনের জন্য যা দরকার সব কিছু তার মৃতদেহের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হ'ত। এই রকম সব কবরে ৬।৭ হাজার বছর আগেকার মাটির পাত্র, কাপড়ের টুকরো, যব, গম, পাথরের অস্ত্র ও চাষ করবার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। এই সব দেখে মনে হয় যে তখনও পর্য্যন্ত মিশরের লোকেরা ধাতুর ব্যবহার জানত না। কিন্তু যখন অন্য সমস্ত দেশের লোক উলঙ্গ অবস্থায় পর্ব্বতের গুহায় থাকত, মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত ও যব, গম প্রভৃতি শস্যের ব্যবহার জানত না তখনও মিশরের অধিবাসীরা কাপড় ব্যবহার করত ও কি করে শস্য উৎপাদন করতে হয় তা জানত।

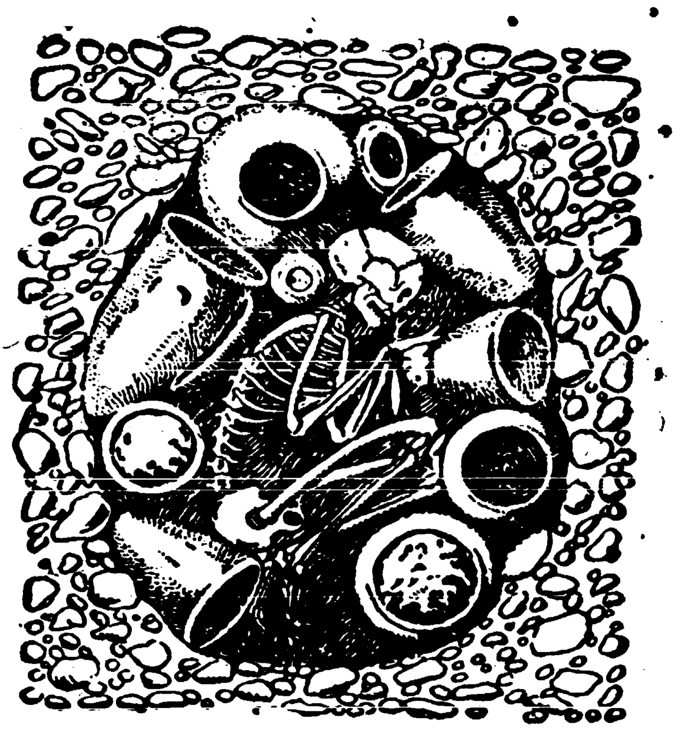

প্রস্তরযুগের মিশরবাসীর কবর।

৪।৫ ফুট গভীর গর্ত্তে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হ'ত। এই রকমের কবরে ৬।৭ হাজার বৎসর আগেকার খাদ্য, পরিধেয় বসন ও মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

মিশরে তখন পর্য্যন্ত কোনও রকম স্থায়ী শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এক একটি অঞ্চলে এক একজন শক্তিশালী লোক আধিপত্য করত। তার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল চাষের জন্য নালা প্রভৃতি কেটে জল সরবরাহ করা। প্রতিবার ফসল তোলা হ'লে পর প্রত্যেক চাষী এক ধামা শস্য এই স্থানীয় মোড়লকে দিয়ে আসতে বাধ্য ছিল—নইলে তার ক্ষেতে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। তা হ'লে তারা কি করে হিসাব রাখত? প্রাচীন মিশরের চাষীদের হিসাব রাখবার ব্যবস্থাও খুব অদ্ভুত ছিল। তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামে থাক তারা বোধ হয় দেখে থাকবে যে বাংলাদেশের

গ্রামে কোনও কোনও বাড়ীতে কেরোসিন তেলওয়ালা বা গোয়ালা প্রত্যেক বার তেল বা দুধ দিয়ে যাবার পর দরজায় অথবা দেওয়ালে খড়ি দিয়ে একটা একটা করে পর পর দাগ দিয়ে যায়। মাসের শেষে এই দাগ গুণে সে মাসের পাওনা হিসাব করে। ৬।৭ হাজার বৎসর, অথবা তারও আগেকার মিশরের লোকেরাও অনেকটা এইভাবে হিসাব রাখত। মোড়লকে কত ধামা শস্য দেওয়া হ'ল—দেওয়ালের ওপর একটা ধামা এঁকে ও পর পর সোজা দাগ কেটে তার হিসাব রাখা হ'ত।

এই ছবি-লিখনের ভিতর দিয়েই পৃথিবীর প্রথম লিখবার চেষ্টা আবিষ্কার করা যায়। এই রকমে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি কথার জন্য তারা আলাদা আলাদা ছবি তৈরী করেছিল। আমাদের দেশে সরকারি কাগজপত্রে একটা মুকুটের ছবি

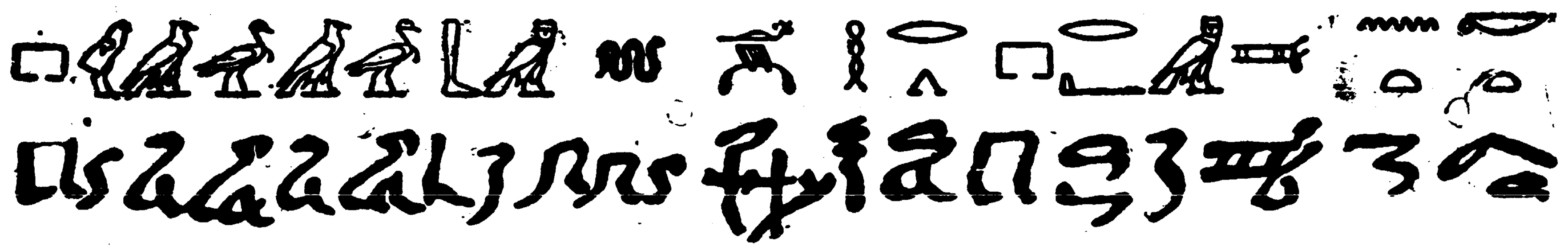

মিশরের লেখার নমুনা

এই রকমের লেখা (উপরের লাইন) ছবি-লিখন অথবা হায়রোগ্লিফ্ নামে পরিচিত। এইভাবে লিখতে খুব সময় নিত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য পরে টানা লেখার প্রচলন হয়। এর নাম হায়রেটিক। নীচের লেখা এই টানা লেখার নমুনা। আরও পরে আমাদের শর্ট হ্যাণ্ডের মত আর এক রকম লেখা প্রচলিত হয়—তার নাম ডেমোটিক।

দেখতে পাবে। এই মুকুটের অর্থ রাজা। প্রাচীনকালে মিশরের লোকেরা দেশের রাজার পরিবর্ত্তে ঈগল পাখীর ছবি ব্যবহার করত। একটি পদ্মফুল ১০০০ সংখ্যা বোঝাত। আমাদের দেশেও পদ্ম বলতে একটা বিশেষ সংখ্যা বোঝায়। এই রকমে ছবির ভিতর দিয়ে যে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'ল তা "হায়রোগ্লিফ্" নামে পরিচিত। কিন্তু এই ভাবে লিখতে অনেক সময় নিত—তাই আরও পরে হায়রোগ্লিফ্-এর উপর নির্ভর করে আর এক রকমের লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তার নাম "হায়রেটিক"। আমাদের ছাপা লেখা ও টানা লেখার মধ্যে যে পার্থক্য হায়রোগ্লিফ্ ও হায়রেটিকের মধ্যেও সেই পার্থক্য। আগুনের আবিষ্কারের পরই লিখনপদ্ধতি ও কালি-কলমের আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে সব চাইতে বড় দান।

অতি প্রাচীন কালেই মিশরের লোকেরা সময়কে ভাগ করা দরকার মনে করেছিল। এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তারা এক মাস ধরত—যদিও তখনও মাস কথাটা ব্যবহারে আসে নি। মনে কর "ক" "খ"এর কাছ থেকে কয়েক ধামা শস্য ধার করেছে। চুক্তি হ'ল এই যে আটবার পূর্ণিমা হয়ে গেলে "ক" "খ"কে তার শস্য ফেরৎ দেবে। এইভাবে সাতবার পূর্ণিমা হয়ে গেলে "ক" বুঝতে পারত যে তার ধার শোধ করবার সময় হয়ে এল। কিন্তু এই হিসাবের দোষ এই যে এইভাবে বৎসরকে সমানভাবে ভাগ করা যায় না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য তারা যে উপায় অবলম্বন করল তা এখন পর্য্যন্ত চলে আসছে। বৎসরকে ১২টি ৩০ দিনের মাসে ভাগ করা হ'ল। এইবার মাসের শেষে পাঁচদিন উৎসবের দিন বলে ধরা হ'ল। এইভাবে বৎসরকে ৩৬৫ দিনে ভাগ করা হ'ল। কিন্তু তখনও প্রতি চার বৎসর অন্তর বৎসরে একদিন করে বেশী ধরার কথা তাদের মনে হয় নি। পরে অবশ্য এই ভুল তারা শুধরিয়ে নিয়েছিল। এই রকমে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২৪১ সনে প্রথম পঞ্জিকার আবিষ্কার হ'ল। এই আবিষ্কারই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার—যার দিন ঠিক করে বলা চলে।

কিন্তু এখন সমস্যা হ'ল কি করে কোন্ বৎসর কি ঘটনা হয়েছিল তা ঠিক করা যাবে। তখনও বৎসর গুণবার কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নি। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বৎসরের সব চাইতে স্মরণীয় ঘটনার নামে সেই বৎসরের নামকরণ করা হ'ত। মিশরের দক্ষিণদিকে ট্রগ্লোডাইট্ নামে এক জাতি ছিল। এক বৎসর এই জাতিকে একদল মিশরের লোক গিয়ে জয় করে এল। সে বৎসর এই ছিল সব চাইতে স্মরণীয় ঘটনা—তাই সে বৎসরের নাম হ'ল "ট্রগলোডাইট্ বিজয়ের বৎসর"। এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে এই রকমে বৎসর ঠিক রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। তোমার ঠাকুরমা যদি তোমার বাবার বয়সের হিসাব করতে বসেন তবে লক্ষ্য করবে যে তিনি অনেকটা এইভাবে হিসাব করবেন—"ক"-এর জন্ম হয়েছিল ভূমিকম্পের বৎসর—তার পাঁচ বৎসর পর "খ" এর জন্ম—অতএব "খ"এর বয়স এত। মিশরের প্রাচীনতম কীর্ত্তিগুলিতে এইভাবে বৎসর ঠিক রাখবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। একটি পাথর আবিষ্কার করা হয়েছে

তাতে ৭০০ বৎসরের হিসাব খোদাই করা আছে। মিশরের ইতিহাস রচনার জন্য এই পাথরটি অমূল্য। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩,৪০০ সন হ'তে এই পাথরে বৎসরের হিসাব রাখা আরম্ভ হয়েছে ও প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২,৭০০ সনে হিসাব শেষ হয়েছে। এই পাথরটি "পালার্‌মো পাথর" নামে পরিচিত।

কিন্তু এইভাবে বৎসরের হিসাব রাখবার প্রথাও খুব সুবিধাজনক ছিল না। বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা প্রত্যেক বৎসরই ঘটত না। আবার এ রকম ভাবে হাজার হাজার বৎসরের হিসাব রাখা চলে না। পরে যখন মিশরে রাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন প্রত্যেক রাজার নামের সঙ্গে তাঁর শাসনের বৎসর যোগ করে দিয়ে বৎসরের নামকরণ হ'ত। মনে কর, এক রাজা ছিলেন পেপি। পেপির রাজত্বের প্রথম বৎসর, পেপির রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর—এইভাবে বৎসরের হিসাব রাখা হ'ত। এতে করে বৎসরের হিসাব রাখা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। এ রকম ভাবে পর পর রাজার নামে শত শত বৎসরের হিসাব পাওয়া গিয়েছে।

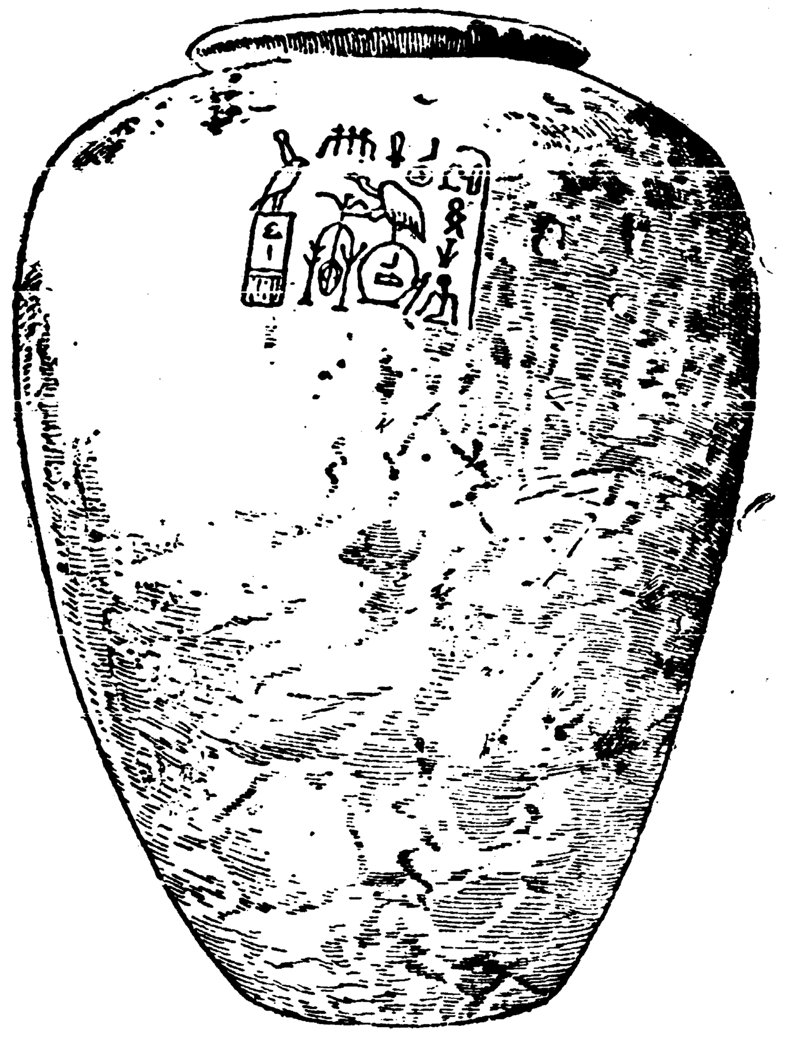
বৎসরের নামকরণের নমুনা
"উত্তর দেশ জয়ের বৎসর এই পাত্র সূর্য্য দেবতার নামে উৎসর্গ করা হ'ল"—এই লিখন পাত্রের উপর খোদাই করে প্রাচীন যুগের এক রাজা সূর্য্য-দেবতার মন্দিরে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে মিশরের অধিবাসীরা অন্য দিকেও উন্নতি করেছিল। ধাতুর আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪,০০০ সনে—অর্থাৎ আজ হ'তে প্রায় ৬,০০০ বৎসর আগে মিশরে ধাতুর আবিষ্কার হয়। মনে কর একদল লোক রাত্রে আগুন জ্বালল। যেখানে আগুন জ্বালা হ'ল সেখানকার মাটির সঙ্গে তামা মিশ্রিত ছিল। আগুনের তাপে তামা মাটি থেকে আলাদা হয়ে গেল। পরদিন সকালে ছাই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তারা দেখতে পেল যে

ছাইএর মধ্যে কি যেন চক্‌চক্‌ করছে। তখন এই লোকদের খেয়াল হ'ল কি করে এই জিনিষটা এল তা জানা। এই খেয়ালের ফলে হ'ল ধাতুর আবিষ্কার। প্রথম প্রথম কেবল মাত্র মেয়েদের অলঙ্কারের জন্যই ধাতুর ব্যবহার হ'ত। পরে এই ধাতু অস্ত্রশস্ত্র ও চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী করবার জন্যও ব্যবহার করা আরম্ভ হ'ল। এর আগে অবধি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরী করবার জন্য কেবলমাত্র পাথরই ব্যবহার করা হ'ত। ধাতুর আবিষ্কারের ফলে পাথরের ব্যবহার লোপ পেল,—লোকের কাজের ক্ষমতা বেড়ে গেল। মানব জাতি প্রস্তর-যুগ হ'তে তাম্র-যুগে প্রবেশ করল। আজকের বিরাট্‌ কারখানা, যন্ত্রপাতি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী—এই সমস্তের মূলে ঐ বুনো মিশরী—যে প্রথম ছাইএর গাদায় তামার আবিষ্কার করেছিল। আগুন, কাগজ ও তামা এই তিনটি জিনিষের আবিষ্কারের কাছে আজ সমস্ত জগৎ ঋণী।

আজ মিশরের সভ্যতার গোড়াপত্তনের কথা তোমাদের বল্‌লাম। এর পর আর একদিন তোমাদের মিশরের গৌরবময় ইতিহাসের কথা বল্‌ব।

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডক্টর রুদ্রের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল করিয়া দিয়া যথা সময়ে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস দেখা দিল। সূর্য্যদেব সারা দিন ধরিয়া তেমনি আলো ঢালিতে লাগিলেন, আকাশ সারা রাত তেমনি তারার আলোয় ঝলমল করিতে লাগিল, পৃথিবী নিজের পথে তেমনি আগেকার মতই চলিতে লাগিল, ডক্টর রুদ্রের সেই ভয়াবহ ধূমকেতুর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ডক্টর রুদ্রের উপর যাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তারা সকলেই প্রথমটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, তার পর ভাবিতে বসিল, নাঃ, ডক্টর রুদ্রের মাথায় নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল বাধিয়াছে! যারা

তাঁর কথা উড়াইয়া দিয়াছিল তারা আরও এক চোট হাসিয়া লইল, তার পর প্রবলভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। খবরের কাগজওয়ালারা আর একদফা কাগজ 'গরম' রাখিবার খোরাক পাইল। ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া আঁকিয়া শিল্পীদের হাতে ব্যথা ধরিয়া গেল। যে সব দেশের গভর্ণমেণ্ট ডক্টর রুদ্রের কথায় নানা রকম সতর্কতার তোড়জোড় করিতেছিলেন তাঁরা বোকা বনিয়া গিয়া ডক্টর রুদ্রকে খুব শাসাইলেন। এমন কি, কেউ কেউ আন্তর্জ্জাতিক আদালতে ডক্টর রুদ্রের বিরুদ্ধে ক্ষতি-পূরণের মামলা আনিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেও ছাড়িলেন না।

১৯৮০—৮১—৮২—৮৩ সন চলিয়া গেল। আকাশের কোন রকম পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ১৯৮৪ আসিল, ১৯৮৫ আসিল, শেষে ১৯৮৬ও আসিয়া চলিয়া গেল, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দুর্ঘটনাই ঘটিল না। ক্রমে ডক্টর রুদ্রের কথা লোকে ভুলিয়া গেল।

কিন্তু ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিলেন আকাশের এক কোণে কেমন একটা অস্বাভাবিক রংএর আলো দেখা যাইতেছে। যেন খানিকটা লালচে ধোঁয়া জমাট বাঁধিয়া আকাশের এক কোণ হইতে উঁকি মারিতেছে। জিনিষটার অস্বাভাবিকত্ব পণ্ডিতদের চোখ এড়াইল না বটে কিন্তু প্রথমটা তাঁরা তার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। ভাবিলেন, ওরকম তো হামেশাই কত কি ঘটে, ও দু'দিনে ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই তাঁদের ভুল ঘুচিল। ঐ অদ্ভুত আলো ধীরে ধীরে সারা আকাশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—তার জ্যোতিঃর তীব্রতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। পণ্ডিতেরা এবার সত্যি-সত্যি ফাঁপরে পড়িলেন। তবে কি ডক্টর রুদ্রের অনুমান ঠিক? এ কি সেই ধূমকেতুটিরই আবির্ভাবের সূচনা! কিন্তু এত দিন পরে!

প্রথমে যে জিনিষটা ছিল নেহাৎ কৌতূহলের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে তাহাই হইয়া দাঁড়াইল গভীর আতঙ্কের বিষয়। সব চেয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন 'থেই' বা শ্যামের নতুন নেতা প্রিন্স অধিপালক। ধরিতে গেলে তাঁরই চেষ্টায় এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শ্যামদেশ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির একটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, সামরিক শক্তিতে আজ শ্যামের যুড়ি মেলা ভার। সম্রাট্ আনন্দ মহীদল বৃদ্ধ হইয়াছেন, প্রিন্স অধিপালকের উপরই দেশের লোকেরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে। সেই তাঁর নিজের হাতে-গড়া বড় সাধের 'থেই' এত শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে! এর কি কোন প্রতিকার নাই?

২৮শে এপ্রিল, ১৯৮৭। আজ ব্যাঙ্কক সহরে একটা বড় রকম চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ছুটাছুটি করিতেছে, ফটোগ্রাফারের দল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—সুবিধা পাইলেই ফটো তুলিয়া লইবে। ব্যাপার আর কিছু নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে

বড় বড় পণ্ডিতেরা আজ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন,—প্রজাধিপক হলে জরুরী বৈঠক বসিয়াছে—পৃথিবীর এই দারুণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে কি করা কর্ত্তব্য তারই আলোচনা হইবে।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা আছেন, অধ্যাপকেরা আছেন, রাজনৈতিকেরা আছেন, রাজপ্রতিনিধিরা আছেন, আরও অনেকে আছেন। জাপানী পণ্ডিত ডক্টর পরোটা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

যথা সময়ে সভার কাজ সুরু হইল। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে প্রিন্স অধিপালক একটা সংক্ষিপ্ত আমন্ত্রণপত্র পড়িলেন, তার পর ডক্টর পরোটা বিশুদ্ধ এস্‌পারান্টো ভাষায় তাঁর অভিভাষণ সুরু করিলেন:

"আপনারা সবাই জানেন," ডক্টর পরোটা বলিতে লাগিলেন, "কী ভীষণ সঙ্কট আশঙ্কায় আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আজ কয়েক মাস হ'ল আকাশের উত্তর কোণে যে আলোর বিভীষিকা দেখা যাচ্ছিল তা ক্রমেই ভীষণ হ'তে ভীষণতর হ'তে সুরু করেছে। প্রথমটা কেউ সেটাকে বিশেষ গ্রাহ্য করে নি কিন্তু সেটার অস্বাভাবিকত্ব এখন আর অবহেলার বস্তু মনে হয় না। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য সাত জন জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্টও আমরা পেয়েছি। সে কমিটির সভাপতি স্বয়ং এবং অন্যান্য সভ্যেরা সকলেই এখানে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরাই তা আপনাদের শোনাবেন।" ডক্টর পরোটা আসন গ্রহণ করিলে কমিটির সভাপতি, মাউণ্ট উইলিয়াম্ অবজারভেটারীর ডিরেক্টর, ডক্টর টমাস্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমাদের কমিটির সমস্ত সভ্য এ বিষয়ে যদিও একমত হ'তে পারেন নি তবুও অধিকাংশ, অর্থাৎ সাত জনের মধ্যে পাঁচ জনই, এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা অতি গুরুতর। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রায় বারো বছর আগে রাঙ্গা পাহাড় অবজারভেটারীর অধ্যক্ষ ডক্টর রুদ্র এক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেদিন থেকে ঠিক চার বছরের মধ্যে এক অতিকায়, অস্বাভাবিক ধূমকেতু পৃথিবীর ওপর এসে পড়বে। তাঁর বিবৃতির স্বপক্ষে যে সব যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাট্য হ'লেও জিনিষটার অসম্ভবত্বের জন্য আমরা তখন তার ওপর ততটা গুরুত্ব দিতে পারি নি। কিন্তু এখন কমিটির এই পাঁচজন সভ্য সিদ্ধান্ত করেছেন যে ডক্টর রুদ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শুধু হয়তো কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁর বছর গুণতির হিসাবে সামান্য ভুল হয়েছিল।"

ডক্টর টমাস্ একটু চুপ করিলেন। ঘরের অপর প্রান্তে ডক্টর হালুয়াচাই—যিনি কিছু দিন আগে ডক্টর রুদ্রের বিবৃতিতে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডক্টর পরোটা তাঁকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিয়া টমাস্‌কে তাঁর বক্তব্য শেষ করিতে বলিলেন।

ডক্টর টমাস্ বলিতে লাগিলেন, "আমাদের পরমতম দুর্ভাগ্য—আজ ডক্টর রুদ্র আমাদের মধ্যে নেই। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হবার পর সারা বিশ্বের যে নিন্দা-বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে তা'তেই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মৃত্যু হয়েছে। সেই ভীষণ আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন নি। আপনারা সবাই জানেন, আজ আট বছর হ'ল ডক্টর রুদ্র সম্বন্ধে কোন খবর জানা যায় নি, কেউ বোধ হয় জানতে আগ্রহও দেখান নি। শোনা যায় তিনি নাকি এই আট বছর তাঁর অব্জারভেটারীর বাইরে বেরোন নি, আপন মনে দিনরাত নাকি খালি কি সব অঙ্ক কষেন! অনেকে অনুমান করছেন ডক্টর রুদ্রের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।"

ডক্টর হালুয়াচাই আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "বন্ধুবর 'ডক্টর টমাস্ এখনও 'অনুমান' করছেন ডক্টর রুদ্রের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। এ 'অনুমান' যে কবে শেষ হয়ে সত্যি সত্যি 'স্থির সিদ্ধান্তে' পরিণত হবে আমি বুঝে উঠতে পারছি না। ডক্টর রুদ্রের মস্তিষ্কবিকৃতি আজ হয় নি—হয়েছে আজ থেকে তেরো বছর আগে—যেদিন তিনি মঙ্গলগ্রহের প্রাণী সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি কথা জনসাধারণে প্রকাশ করেছিলেন। আর তা যদি না হয়ে থাকে তবে বল্ব তিনি অত্যন্ত ধড়িবাজ লোক, সস্তায় নাম কিনবার জন্য কতকগুলি আজগুবি ঘটনাকে সত্য ব'লে চালাবার চেষ্টা করছেন। আজ যে শাস্তি তিনি পাচ্ছেন তা তাঁর প্রাপ্য। কমিটির অন্যতম সভ্য হিসাবে আমি এবং আমার বন্ধু অধ্যাপক ভেঙ্কটরাঘবম্, ডক্টর টমাস্ ও তাঁর মতাবলম্বীদের আবার চ্যালেঞ্জ ক'রে বল্ছি আপনারা এই মাত্র যে ভয়াবহ ধূমকেতুর কাল্পনিক আগমনবার্ত্তা শোনালেন তা একেবারে ভূয়ো। সম্প্রতি আকাশে যে পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে তা একটু অস্বাভাবিক স্বীকার করছি, কিন্তু আমি আশ্বাস দিচ্ছি এতে ভয় পাবার কিছু নেই এ আমি শীগ্গিরই প্রমাণ করব। আর এটা যদি ধূমকেতু সত্যিই হয় তা হ'লেই বা ভয় পাবার কি আছে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি—"

হালুয়াচাইএর বক্তৃতায় বাধা দিয়া কে একজন বলিলেন, "আচ্ছা, ডক্টর রুদ্র কি আমাদের এ অধিবেশনের কথা জানেন?"

অধিপালক উত্তর দিলেন, "জানেন বৈকি, তা ছাড়া তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যে! তাঁর মাথা যদি সত্যি খারাপ না হয়ে থাকে তা হ'লে তাঁর বক্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান্ হবে সন্দেহ নেই।"

প্রিন্স অধিপালকের কথা শেষ হইতে না হইতে বাহিরে একটা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল। জানালা দিয়া দেখা গেল—বাহিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে একটা অটোগাইরো ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

মিনিট কয়েক পরেই উস্কোখুস্কো চুল, শ্রান্ত চেহারার একজন অতি-বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। বৃদ্ধের দেহ ঈষৎ কুব্জ, মুখমণ্ডল অযত্নবর্দ্ধিত শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা, কিন্তু তার ভিতর দিয়া দু'টি চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি কারও চোখ এড়াইল না। অত্যন্ত চেনা মুখ, কিন্তু তবু যেন সহসা চিনিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকিতেছিল। কিন্তু সে ভাব বেশীক্ষণ রহিল না, একটু পরেই চারিদিকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—"ডক্টর রুদ্র! ডক্টর রুদ্র!"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঁচু প্ল্যাটফর্ম্মের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর উদাত্তগম্ভীর এস্পারান্টো ভাষায় কহিলেন, "হ্যাঁ, আমি ডক্টর রুদ্র। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে, সেজন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।"

ঘরের কোণে আবার একটু মৃদুগুঞ্জন শোনা গেল। মনে হইল এ গুঞ্জনে বিস্ময়ের চেয়ে ব্যঙ্গের ভাবই বেশী। ডক্টর রুদ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিয়া চলিলেন, "প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক। গত ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সম্বন্ধে আমি কয়েক বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম তা যথা সময়ে ঘটে নি সেজন্য আমি লজ্জিত, এবং সে ভুলের জন্য প্রাপ্য দণ্ডও আপনারা দিতে কার্পণ্য করেন নি। আমিও মাথা পেতেই তা নিয়েছি। কিন্তু আমি জানতাম আমার আবিষ্কারের মূল কাঠামোর মধ্যে কোন ভুল ছিল না। সামান্য অসতর্কতার জন্য আমার গণনায় হয়তো আট বছর ভুল হয়েছে কিন্তু মহাকালের হিসাবে এই নগণ্য আট বছরকে আমি নিতান্ত তুচ্ছ বলেই মনে করি, এবং আমার বিশ্বাস আপনারাও তা করবেন।

"কিন্তু সে কথা যাক্; আজ অভিযোগের দিন নয়, এবং সে জন্য আমি আসি নি। আপনারা কি এখনও বুঝতে পারছেন না—সেই ভয়াবহ ধূমকেতু আমাদের দুয়ারে সত্যি সত্যি এসে পড়েছে! আর বছর নয়, মাস—মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে পারে তা কি আপনারা এখনও বুঝতে চাইবেন না?"

ডক্টর রুদ্রের আবেগময়ী বক্তৃতা সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, শুধু ডক্টর হালুয়াচাই একবার উদ্ধত স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "ডক্টর রুদ্র, আপনি অসুস্থ। আপনার জায়গা এ নয়। আমরা একটা বিশেষ জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি, আপনি যদি—" কিন্তু পরক্ষণেই "আপনি চুপ্ করুন", "বসে পড়ুন" ইত্যাদি শব্দে তাঁকে বসিয়া পড়িতে হইল।

ডক্টর রুদ্র একে একে অনেক কথাই বলিলেন। এই দীর্ঘ আট বছর তিনি কি ভাবে কাটাইয়াছেন তাহাও সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ধূমকেতুর আবির্ভাবে পৃথিবীর কি কি আশঙ্কা আছে তাহাও জানাইলেন। পৃথিবী যদি ভাঙ্গিয়া যায় বা পুড়িয়া যায় বা পথভ্রষ্ট হইয়া যায় তাহা

হইলে বর্ত্তমান সৃষ্টি লোপ পাইবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করিবার নাই। কিন্তু যদি ধূমকেতুর টানে পৃথিবী তার বর্ত্তমান অবস্থান হইতে একটু কাৎ হইয়া পড়ে তা হইলে হয়তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস নাও হইতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় কম হইবে না। পৃথিবীর উপরকার ডাঙ্গা, মাটী, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র—সব ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে। যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে পাহাড় মাথা উঠাইতে পারে, আবার পাহাড় ডুবিয়া সমুদ্রের কোলে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। ঐতিহাসিক যুগে এমন ব্যাপার আর কখনও হয় নাই, কাজেই এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কষ্টকর। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে ধূমকেতু আট বছর দেরী করিয়া আসিতেছে। এই আট বছর ডক্টর রুদ্র দিবারাত্রি পরিশ্রমে অনেক হিসাবপত্র করিয়া একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার আভাস পাইয়াছেন। তিনি মনে করেন, বিষুব রেখার কাছাকাছি দেশগুলি এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের হাত হইতে কিছু মাত্রায় রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ বোর্ণিও, সুমাত্রা, কেনিয়া, ব্রেজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর প্রভৃতি জায়গাগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা কিছু কম। কাজেই এই সব অঞ্চলগুলি অবিলম্বে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

ডক্টর রুদ্রের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলিল। অবশেষে অধিকাংশের সমর্থনে ডক্টর রুদ্রের পরামর্শ মত ব্যবস্থা করার প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

* * *

২২শে নভেম্বর—১৯৮৭। অসম্ভব গরম পড়িয়াছে। শীতকালে কলিকাতায় ১১০ ডিগ্রী উত্তাপের কথা কেউ কখনও শোনে নাই। কিন্তু হাওয়া-অফিসের খবর, আজকাল সর্ব্বনিম্ন তাপই ১১০ ডিগ্রী। ওদিকে বাতাসের টানও প্রত্যহই বাড়িতেছে। ঝোড়ো হাওয়া প্রায় লাগিয়াই আছে। পথ চলিতে গেলে শরীর অসম্ভব হাল্কা বলিয়া মনে হয়; মনে হয় সর্ব্বদাই কে যেন উপরের দিকে টানিতেছে। আকাশের দিকে তো ভাল করিয়া চাওয়াই যায় না, নিঃশ্বাস নিতেও যেন আজকাল বেশ কষ্ট হয়। অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা রোজই বাড়িতেছে। অক্সিজেন-কারখানাগুলি মাল সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—বাহির হইতেও আমদানী বন্ধ। ওদিকে নবগঠিত আন্তর্জ্জাতিক 'ইকোয়েটরিয়াল বা বিষুবীয় গভর্ণমেণ্ট' নোটিশ জারি করিয়াছেন—উত্তর ও দক্ষিণের ১০ ল্যাটিচুডের (অক্ষ-রেখা) মধ্যে প্রবেশ করিবার পাসপোর্ট আর কাহাকেও দেওয়া যাইবে না—কেননা সেখানে আর তিল ধারণের স্থান নাই। নাঃ, অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুনে

(শ্রীফাল্গুনী রায়)

ভারী ভালো লাগে আজ সকালবেলা
ঝক্‌ঝকে সোনা-ঝরা রোদের মেলা ;
মন কোন্ দূরে যায়,
ডানা মেলে উড়ে যায়,
মানা মানে নাকো আজ সকালবেলা,
ফুলেদের সাথে হবে সকল খেলা।

ওড়না উড়ায়ে যায় দখিন্-হাওয়া,
শিষ দেয় ধানশীষে শিশির-নাওয়া ;
ঘন ঘোর শাল-বনে
গন্ধের জাল বোনে
মৃদু হেসে ঝিরি ঝিরি দখিন্-হাওয়া ;
একা একা হবে আজ নৌকো বাওয়া।

কোথাও দাঁড়িয়ে চেয়ে জেলের ছেলে
জলের ওপরে কালো জালটি ফেলে ;
কোথাও বা শাদা বক
করে শুধু বক বক,
মাছরাঙা বসে থির নয়ন মেলে ;
শিকার কিছুতে তার নাহি যে মেলে।

ফুলেরা গোলাপী রাঙা আগুন জ্বালে,
পাখীর পাখায় যেন সে রঙ্ ঢালে ;
আকাশে রোদের সোনা
পৃথিবী সোনায় বোনা,
নতুন পাতারা মাতে নাচের তালে,
ফুলেরা গোলাপী রাঙা আগুন জ্বালে।

ব্যাগে আজ পড়ে আছে খাতার রাশি,
সাদা আছে অঙ্কের পাতার রাশি ;
বাড়ীর বাঁধন যত
শুধু আজকের মত
দূর করে ঠেলে ফেলে এখানে আসি,
যেখানে উদার নীল আকাশ-হাসি।

ছুটী—আজ ছুটী ভাই,—অগাধ ছুটী,
তাই আজ নেচে হেসে অবাধে ছুটি ;
ছুটেছে ছোট্ট ভেলা
সোনালী সকালবেলা,
খেলা-ছলে চাঁপাবন উজাড়ি' লুটি ;
ছুটী—আজ ছুটী ভাই,—অগাধ ছুটী।

মণি-মঞ্জুষা

(শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

[এই বিভাগে পৃথিবীর নানা দেশের নাম-করা বইগুলির গল্পাংশ প্রকাশিত হবে।]

জেন আয়ার

[জেন আয়ার বিখ্যাত আইরিশ মহিলা ঔপন্যাসিক শার্লট্ ব্রণ্টের লেখা। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর আগে সাহিত্যসমাজে শার্লট্ ব্রণ্টের বিশেষ স্থান হয় নি, তাঁর প্রথম বই "দি প্রফেসার" তো কোন প্রকাশকই প্রকাশ করতে রাজী হন নি। কিন্তু "জেন আয়ার" প্রকাশিত হবা মাত্র দিগ্বিদিকে এই প্রতিভাশালিনী লেখিকার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সমঝদারেরা বইখানিকে ইংরেজী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস ব'লে স্বীকার করে নেন। তাঁর 'শার্লি', 'ভিলেট্' প্রভৃতি বইও খুব নাম-করা।

১৮৫৪ সনে রেভারেণ্ড মিঃ নিকল্‌সএর সঙ্গে এঁর বিয়ে হয় এবং তার পরের বছরই, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়।]

জন্মের পর থেকেই জেন আয়ার পরের দয়ায় মানুষ। তার এক সম্পর্কে খুড়ী—মিসেস্ রীড্ তাকে বছর দশেক বয়স পর্য্যন্ত পালন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার ওপর ভীষণ দুর্ব্ব্যবহার করতেন। কাজেই দশ বছর বয়সে জেনকে যখন লোউড্ স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তখন তার সেটা ভালই লাগল। এই স্কুলেই জেন ছাত্রী থেকে ক্রমে শিক্ষয়িত্রীর পদে উন্নীত হ'ল। তার পর একদিন থর্ণফিল্ড মেনরে মিঃ রচেষ্টারের বাড়ীতে য়্যাডেলা ভারেন্সএর গভর্ণেসের কাজ নিয়ে চলে এল।

এ জায়গাটা জেনের পছন্দই হ'ল। পুরোনো বাড়ী, লোকজনের হট্টগোল নেই, একটা বেশ ভাল অথচ নির্জ্জন লাইব্রেরীও রয়েছে, আর আছে চমৎকার বাগান। জেনের এই রকমই পছন্দ। গৃহকর্ত্তা মিঃ রচেষ্টার লোকটিও তেমনি। গম্ভীর চেহারা, গম্ভীর প্রকৃতি। তাঁর সামনে জেনের কোন সঙ্কোচ আসত না।

রচেষ্টার জেনকে অনেক কথাই বলতেন। তাঁরই কাছে জেন জানল যে য়্যাডেলা ভারেন্স তাঁর নিজের মেয়ে নয়। কিন্তু রচেষ্টারের মনের আর একটা কি গোপন ব্যথা ছিল, জেন সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারল না।

ইতিমধ্যে একদিন রচেষ্টারের ঘরে আগুন লাগলে জেনই গিয়ে আগুন নিভাল। আর একদিন রচেষ্টারের বাড়ীতে মিঃ মেসন নামে এক ভদ্রলোক এলেন স্পেন থেকে। সেদিন বাড়ীতে

একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ছিল। রাত্রে জেন একটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেল। বেরিয়ে এসে দেখল রচেষ্টার চারতলা থেকে নেমে আসছেন। তিনি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলেন। জেনকে সে রাত্রি মেসনের শুশ্রূষা করতে হ'ল, কেননা মেসন খুব আহত হয়েছিলেন। কি ক'রে আঘাত পেলেন সে সম্বন্ধে জেন কিছু জানতে পারল না, শুধু কথাবার্ত্তা থেকে এইটুকু বুঝল যে কোন স্ত্রীলোক এই কাণ্ডের জন্য দায়ী। ভোর হবার আগেই রচেষ্টার মেসনকে একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিদায় ক'রে দিলেন।

এই সময়ে হঠাৎ জেনের খুড়ী তাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে জেন একটা চিঠি পেল—তা'তে তার কাকা জন্ আয়ার তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তাঁর ছেলেপেলে নেই, জেনকেই তিনি মেয়ের মত রাখবেন। কিন্তু চিঠিটার তারিখ ছিল তিন বছর আগেকার। জেনের খুড়ী জেনের ভাল দেখতে পারতেন না, তাই তিনি এ চিঠির কথা এত দিন বলেন নি।

জেন থর্ণফিল্ডে ফিরে এল। এবার রচেষ্টার তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন, জেন রাজী হ'ল। কিন্তু বিয়ের দিন এক কাণ্ড ঘটল। পাদ্রী মন্ত্র পড়াতে যাবেন, এমন সময় একজন লোক এসে বল্‌ল, এ বিয়ে হ'তে পারে না কারণ রচেষ্টার ১৫ বছর আগে স্পেনে বার্থা মেসন নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং সেই বার্থা এখনও বেঁচে আছে এবং থর্ণফিল্ডেই আছে। মিঃ মেসনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ব্যাপারটা সত্যি বলে সাক্ষ্য দিলেন।

রচেষ্টার বিহ্বলকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে কথাটা সত্যি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বার্থা একেবারে পাগল—এবং তাঁর স্ত্রীর বাপ-ভাই প্রভৃতি আত্মীয়েরাও সকলেই তাই। এ সব জেনেশুনে চক্রান্ত ক'রে বার্থার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নিজের বাপ-দাদাও টাকার লোভে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। ১৫ বছর রচেষ্টার বার্থাকে নিয়ে কাটাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এখন বুঝছেন তা অসম্ভব।

রচেষ্টার সবাইকে নিয়ে তাঁর বাড়ীর চারতলার ঘরে গেলেন। ঘরে কোন জানালা ছিল না, শুধু একধারে খানিকটা আগুন জ্বলছিল। মেঝেতে একটি মনুষ্যাকৃতি জীব, উস্কোখুস্কো চুলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরময় ছুটোছুটি করছিল আর মাঝে মাঝে বন্য জন্তুর মত অস্বাভাবিক চীৎকার করছিল। রচেষ্টার বল্‌লেন, 'ইনিই আমার স্ত্রী।"

সেই রাত্রেই জেন থর্ণফিল্ড থেকে পালিয়ে গেল। সঙ্গে যে সামান্য অর্থ ছিল তা একজন গাড়োয়ানকে দিয়ে বল্‌ল, আমাকে এই টাকায় যত দূর পার নিয়ে চল। ৩৬ ঘণ্টা চলবার পর গাড়োয়ান তাকে এক জায়গায় নামিয়ে দিল। সেখান থেকে জেন একা একা হাঁটতে লাগল—গাছের ফল খেয়ে আর পাহাড়ের গুহায় রাত কাটিয়ে সে চলতে লাগল। অবশেষে ভগ্নদেহে,

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আসন্ন অবস্থায় সে রেভারেণ্ড সেণ্ট্ জন্ রিভার্স্ নামে এক পাদ্রীর বাড়ীতে আশ্রয় পেল। পাদ্রীর দু'টি বোন ছিলেন, তাঁরা জেনকে খুব যত্ন করলেন।

সেণ্ট্ জন্‌ই জেনকে একটা মেয়ে-স্কুলে চাকরী জুটিয়ে দিলেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা, ভারতবর্ষে গিয়ে ধর্ম্মপ্রচারক হবেন। জেন তাঁর স্ত্রী হ'তে রাজী আছে কিনা তিনি জানতে চাইলেন।

ইতিমধ্যে জেন জানতে পারল যে তার কাকা মারা গেছেন, আর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জেনই পেয়েছে। আরও জানতে পারল যে সেণ্ট্ জন্ ও তাঁর বোনেরা ঐ কাকারই বোনের ছেলেমেয়ে। জেন তার সম্পত্তির অংশ তাঁদেরও দিতে চাইল।

সেণ্ট্ জন্, বিবাহের প্রস্তাবে জেনের মতামতের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু জেন রচেষ্টারের কথা ভুলতে পারে নি। সে পরদিনই থর্ণফিল্ড্ চলে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে রচেষ্টারের বাড়ী নেই—আছে খানিকটা পোড়া বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। খবর নিয়ে জানা গেল, এর আগের বছরই একদিন দুপুর রাত্রে রচেষ্টারের বাড়ীতে আগুন লাগে। রচেষ্টার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে ছুটে যান কিন্তু সে তখন উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ীর ছাদে উঠে চীৎকার করছে। রচেষ্টার কাছে যেতেই সে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। রচেষ্টারকে অবশ্য জীবিত অবস্থায়ই বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর একটা চোখ একদম বেরিয়ে পড়েছিল, অপরটাও কয়েকদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি এখন মাইল ত্রিশেক দূরে তাঁর এক নির্জ্জন খামার-বাড়ীতে জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন।

জেন শুনে তখনই রচেষ্টারের কাছে হাজির হ'ল, তার পর তাঁকে বিয়ে করল। রচেষ্টারের একটা চোখ কিছু দিন পরে ভাল হয়ে গেল। যথা সময়ে তাঁদের একটি ছেলেও হ'ল। ওদিকে সেণ্ট্ জনের বোনেরাও যথা সময়ে বিয়ে করলেন, আর সেণ্ট্ জন্ চলে গেলেন ভারতবর্ষে তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

(শ্রীগৌরী দেবী)

সাহসের নেশা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশক দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্। কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥০

এটি একটি ছেলেদের উপন্যাস। যারা য়্যাডভেঞ্চারের বই ভালবাস তারা বইটা পড়ে দেখ। ছাপা, কাগজ চিত্তাকর্ষক।

কায়াহীনের প্রতিশোধ—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক ইষ্টার্ণ ল হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥০

এ বইখানিতে নানা ধরণের ছোট ছোট গল্প আছে। প্রথম ভৌতিক গল্পটি নিয়ে বইএর নাম-করণ হয়েছে। মোটা কাগজে ছাপা, অনেক ছবিও আছে।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন মাঘ সংখ্যায় দেখ।]

১। মোহেনজোদড়ো—সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার একটি স্থান। এখানে ভারতের সব চেয়ে প্রাচীন (অনুমান খৃঃ পূঃ ৪০০০—৩০০০ অব্দ) সভ্যতার নিদর্শন মাটী খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মী—প্রাচীন বর্ণমালা। প্রাচীন ভারতের অনেক শিলালিপি এই অক্ষরে লেখা। (কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত এক রকম ছোট গাছকেও ব্রাহ্মী বলে)।

মাওরী—নিউজিল্যাণ্ডের আদিম জাতি।

হানিম্যান্—জার্ম্মান্ চিকিৎসক (১৮শ শতাব্দী)। ইনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করেন।

লুভ্‌র্—প্যারিসের বিখ্যাত চিত্রশালা। সম্রাট্ ১৪শ লুইএর সময়ে তৈরী। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত শিল্পদ্রব্যের নমুনা এখানে সংরক্ষিত আছে।

২। 'পদ্মিনী'র লেখক রঙ্গলাল; মাইকেলের কাব্যের নাম 'মেঘনাদবধ,' 'মেঘদূতবধ' নহে; 'বৃত্রসংহারে'র লেখক হেমচন্দ্র। তুলসীদাস বাঙ্গালী নন, তাঁর রামায়ণ হিন্দী ভাষায় লেখা। জলধর সেন কবিতা বিশেষ লিখিতেন না, তাঁর 'হিমালয়' একখানি উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনী—কাব্য নহে।

৩। কোন রকম আঘাত পাইলে সব জিনিষই কাঁপে। উহার ফলে বাতাসে ঢেউ উঠিয়া শব্দের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ বাতাস যদি সেকেণ্ডে ১০ হইতে ৩০০০ বার কাঁপে তবেই সে শব্দ আমরা কানে শুনিতে পাই।

৪। লিওনার্দ দা ভিঞ্চি (বিখ্যাত শিল্পী ও পণ্ডিত)।

চিঠিপত্র

মাঘ মাসের রামধনু তোমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে জেনে সুখী হ'লাম। রামধনুর জন্মতিথিতে এবারেও আমরা অসংখ্য শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক চিঠি পেয়েছি। আরও কয়েকটা চিঠির অংশ এখানে তুলে দিলাম—

"রামধনু পড়ে খুব খুসী হলাম। ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জনের ছোটবেলার জীবনী শুনতে চাই। এখনকার যুদ্ধজাহাজ বিষয়ে জানতে চাই।"

—শ্রীবীণা রায়

"হেমেন্দ্র বাবুর ছবি দেখলাম। তাঁর গল্প পড়ে চোখের সামনে তাঁর যে একটা ছবি ভেসে উঠত তার সঙ্গে কিন্তু এ ছবির এতটুকু মিল নেই!" —শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীপ্রতিমা চৌধুরী

"শিবরাম বাবুর একটি ছবি নিশ্চয়ই চাই রামধনুর পৃষ্ঠায়—যে রকমে হোক। এ রকম নিজেকে লুকিয়ে রেখে তাঁর লাভ কি? পরলোকগত সম্পাদক মশাইএর ছেলেবেলার কথা জানতে ইচ্ছা করে।"—গ্রাঃ নং ১৯১৯

"সত্যই এ বৎসরের রামধনু সব বিষয়ে চমৎকার হয়েছে।"

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার।

"খুব ভাল লাগল।...হেমেন্দ্র বাবুর ছবি দেখে খুব খুসী হলাম।...রামধনু' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।" — পুণ্যব্রত ঘোষ

"নতুন বছরের নতুন রামধনু এবারে বেশ ভাল হয়েছে।...রামধনুর প্রতি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।—শ্রীঅণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

"বেশ ভাল হইয়াছে।...আগামী বারে ক্রস্‌ওয়ার্ড প্রতিযোগিতা দিয়া একটু মুখ বদ্‌লাইতে দিবেন।" —শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য

"নববর্ষের রামধনু খু-বউ ভালো লাগল। এর সঙ্গে যদি শিবরাম বাবুর একটি লেখা পেতাম তা হ'লে এবারের রামধনু সত্যিই অতুলনীয় হত।" —কুমারী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

"দু' খানি উপন্যাসই খুব ভাল লাগল। বাড়ি চুরি গল্পটি চমৎকার। পালোয়ানের কথা

কুমারী দুর্গারাণী সেন
(এবারের "মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতায়" ইনি পুরস্কার পেয়েছেন।)

পড়লাম। মাঝে মাঝে এ রকম লেখা দিলে খুব ভাল হয়।...উন্নতি কামনা করি।"

—শ্রীঅরুণা সেন

"গত বছরের চেয়েও ইন্‌টারেষ্টিং লাগ্‌ল।"

—শ্রীপঞ্চানন হাজরা

"খুব সুন্দর হইয়াছে।"

—শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

"রবীন্দ্রলাল আমাদের এত দিন হাসির গল্পই শুনিয়েছেন। এবারে তিনি নতুন ধরণের উপন্যাস লিখছেন। আশা করি এটিও তেমনি চমৎকার হবে। প্রথম পরিচ্ছেদ বেশ 'ইন্‌টারেষ্টিং' হয়েছে।"

—শ্রীসীতা রাও

"বর্ত্তমান সংখ্যা সব দিক্‌ দিয়াই আমাদের মনোমত হইয়াছে। "ধূমকেতু" পড়িয়া পরলোকগত সম্পাদকের কথাই বার বার মনে পড়িতেছে।" —শ্রীঅজিতকুমার সান্তাল

"শ্রীউপেন্দ্র মল্লিকের "ভ্যাজাছিলাম না ত" চমৎকার লাগল"—শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রতিযোগিতায় সফলতা লাভ করিয়া অনন্দিত হইলাম।...রামধনুর প্রতি শুভকামনা জানাইতেছি! রামধনু পাইয়াছি।

—কুমারী দুর্গারাণী সেন।

তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, এ বারের "মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতায়" পুরস্কার পেয়েছেন কুমারী দুর্গারাণী সেন। তাঁর ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল। —রাঃ সঃ

খোস-খবর

(শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কলিকাতায় 'শর্ট্‌ ষ্ট্রীট্‌' নামে একটা রাস্তার নাম হয়তো অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। নাম শুনিয়া মনে হয় রাস্তাটা বুঝি ছোট্ট, তাই এই নাম। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মিঃ শর্ট নামে এক ভদ্রলোকের নামে রাস্তাটির ওই রকম "ছোট্ট" নাম হইয়াছে।

* * *

নতুন রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের ছবিওয়ালা চক্‌চকে নতুন দোয়ানী বাজারে বাহির হইয়াছে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। দোয়ানী দেখিয়া সকলেই খুসী। কিন্তু ও হরি, ওদিকে যে এক ভীষণ গলদ বাহির হইয়াছে! তোমরা বোধ হয় জান, কলিকাতায় পথে-ঘাটে 'পাব্লিক্‌ টেলিফোন' আছে। সেখানে একটা যন্ত্রের বাক্স থাকে, তার মধ্যে একটা গর্ত্তে একটা চৌকা দোয়ানী ফেলিয়া দিয়া যেখানে খুসী টেলিফোন করা যায়। কিন্তু এই নতুন দোয়ানীগুলি পুরানো দোয়ানীর মাপে কাটা গর্ত্তে আর

ঢুকিতেছে না। তাই বাধিয়াছে মহা মুস্কিল। চট্‌পট্ অত বাক্স বদ্‌লাইতে সময় এবং খরচ কোনটাই তো কম লাগিবে না!

*   *   *

সেদিন বিলাতে "সারে"র য়্যাডিংটন স্কুলে এক অবাক্ কাণ্ড! ক্লাসে ঢুকিয়া একশ'টি ছেলে অবাক্ হইয়া দেখিল, চিরপরিচিত ব্ল্যাক্‌বোর্ড আর 'ব্ল্যাক্' নাই—বোর্ডের রং একেবারে হলদে হইয়া গিয়াছে, আর তার উপর কালো চক্ দিয়া লেখা হইতেছে! একেবারে 'হাসিরাশির' প্রথম পাতার কাণ্ড! পরে জানা গেল, এই ব্যাপারটি নাকি ছেলেদের চোখ ভাল রাখিবার সাহায্য করিবে!

*   *   *

বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নাম নিশ্চয়ই জান। কিছুদিন আগে লণ্ডন সহরে একটি চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়া তিনি ভারী মজার এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি এই রকম: একবার ভগবান্ একটা রুটীর কারখানা তৈরী করিয়া প্রথম পরীক্ষা করিতে গিয়া রুটীগুলিকে একটু বেশী পোড়াইয়া ফেলিলেন। সেই পোড়া রুটীই হইল কৃষ্ণকায় জাতি। তার পরে তিনি অতিরিক্ত সাবধান হইতে গিয়া একটু তাড়াতাড়ি রুটী তুলিয়া ফেলিলেন—সেই রুটী হইল সাদা জাতি—আমাদের কথায় "সাহেব"। অবশেষে তিনি তুইয়ের মাঝামাঝি ভাবে ভাল করিয়া রুটী সেঁকিলেন—আর সেই হইল আমাদের ভারতীয় জাতি। কথাটা শুনিতে ভালই লাগিতেছে।

*   *   *

টার্জ্জানের ছবি দেখ অনেকেই তবে তাকে বিশ্বাস কখনও করা চলে না—কি বল? কিন্তু সেদিন একটি ১৬ বছরের মেয়ে-টার্জ্জান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। সে চৌদ্দ বছর আনাতোলিয়া পাহাড়ে ভালুকের সঙ্গে ছিল। রোদে পুড়িয়া তার চেহারা হইয়া গিয়াছে কালো। তাহাকে খাবার-দাবার খাইতে দেওয়া হইলে সে খাইতে চাহে না। ১৪ বছর আগে ঐ অঞ্চলে একটি তুই বছর বয়সের শিশু হারাইয়া গিয়াছিল। মেয়েটিকে সেই হারানো শিশু বলিয়াই অনুমান করা হইতেছে। একটা ভালুকী সন্তান হারাইয়া ইহাকে পাইয়া লালনপালন

করে। কয়েক জন তুর্কী পরিব্রাজক পাহাড়ের উপর মেয়েটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

*   *   *

ডাক্তারী গবেষণায় অনেক পরীক্ষা প্রথমটা বানরের উপর করা হয় তা বোধ হয় জান। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সংসদ্‌গুলি এই গবেষণার জন্য বছরে প্রায় ৫০,০০০ বানরের পরলোকের পথ সুরাহা করিয়া দেয়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

খুকুর ঘুম

(কুমারী সুষমা রায়, ভারতী)

ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট খুকী
মায়ের কোলটি ঘেঁষে,
সোহাগ ভরে কর্‌ছে আদর
রূপালী চাঁদ এসে।
বাতায়নের মধ্যে দিয়ে
চাঁদের যাওয়া আসা,

খুকুর সাথে মিতালি তার,
কতই ভালোবাসা!
বাতাস সে যে বইছে ধীরে
ছুঁয়ে কেশের রাশি,
খুকুর কানে বল্‌ছে যেন
'তোমায় ভালোবাসি'।

"ক্ষুদ্রের দান"

(শ্রীদীপালি মৈত্র)

সুন্দর আকাশ 'পরে ফোটে যত তারা,
ধরণীরে দেয় নিজ আলোকের ধারা।
নিজেরে নিঃশেষি' দিয়া পায় কতটুক ?
তাহার সমস্ত যায়, ভরে না ত' বুক !
রাত্রিশেষে সূর্য্য ওঠে, আসে নিজ স্থানে ;
তারার সে ক্ষুদ্র আলো ভরে অভিমানে।
সূর্য্যের প্রখর তেজে তারা নাহি ফুটে,
চন্দ্রের কিরণ মাঝে সে যে জাগি' উঠে।

আঁধারে ঢাকিলে বিশ্ব ব্যথিতের মত
ধরণীর পানে সেও হয় যে প্রণতঃ।
এই যে গোপন লীলা, মান অভিমান,
প্রত্যহ নীরবে চ'লে আসিছে সমান :
কিন্তু, কোন দিন তারা নাহি ফুটে যদি
বেদনায় লুপ্ত হয়ে থাকে নিরবধি,
জগতের আসে যাবে কিবা তা'তে কা'র ?
যেত যদি সূর্য্য যেত, হ'ত অন্ধকার।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকে ত' কেহ নাহি পুছে,
স্বার্থ দিয়া চিরদিন জগতেরে বুঝে।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয় ; মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

গত বারের উত্তর

৩নং—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী ও বেকারী দর্পণে পাওয়া যাইবে।' —অনিমা সেন

"Pears' Cyclopaedia"এর রন্ধন বিভাগে।

—শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য

"The Economical Cookery Book for Indian" by G. L. Rএ পাওয়া যাইবে। —শ্রীরীণা রায়

২নং—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রীর "সরল হিন্দী শিক্ষা"—শ্রীকল্যাণী দেবী

১নং প্রশ্নের অনেক উত্তর এসেছে। তার মধ্যে থেকে সঠিক উত্তর বারান্তরে বেরোবে।

নতুন প্রশ্ন

শর্ট্ ওয়েভ, লং ওয়েভ, মিডিয়াম্ ওয়েভ্, ভাল্‌ভ্, ওয়াট্, এ. সি., ডি. সি. প্রভৃতি বলিতে কি বুঝায় ?

—শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

কলকাতায় মহা সমারোহে 'নিখিল ভারত' ও 'পূর্ব্ব ভারত' টেনিস প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এবারকার খেলার বিশেষত্ব—যুগোস্লেভিয়ার বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় পুনসেক ও মিটিক এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। খেলার ফল এই রকম হয়েছে : সিঙ্গ্‌ল্‌সএ জয়ী হয়েছেন পুনসেক—ফাইনালে ১১-৯, ৬-৪, ৭-৫ গেমে যুধিষ্ঠির সিংকে হারিয়ে। ডাব্‌ল্‌স ফাইনালে পুনসেক ও মিটিক সোহানী ও সোনীকে ৬-৩, ১১-৯, ৩-৬, ৭-৫ গেমে হারিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন মিস্ লীলা রাও—মিস্ উড্‌ব্রিজ্‌কে হারিয়ে। ছোটদের প্রতিযোগিতায় খসু সেন বিজয়ী হয়েছেন নরেন্দ্রনাথকে হারিয়ে।

আন্তর্জ্জাতিক খেলায় কিন্তু ভারতই ৩-২ ম্যাচে জিতেছে। সোহানীর অদ্ভুত খেলাই এর জন্য অনেকটা দায়ী।

* * *

কলকাতা ছেড়ে যাবার পর সেদিন পুনসেক একবার গাউস মহম্মদের কাছে হেরে গেছেন। ভারতে এই তাঁর প্রথম পরাজয়। অবশ্য এর শোধ তিনি নিয়েছেন তার পরে ঐ গাউস মহম্মদকেই তু'বার 'লাভ্ সেট্'এ হারিয়ে।

* * *

রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবার বাংলাকে মধ্য ভারতের কাছে পরাজিত হ'তে হয়েছে প্রথম ইনিংস্‌এর ফলাফল অনুযায়ী। এর আগে কয়েকবারই বাংলা দল বিজয়ী হয়েছিল।

* * *

রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যেমন তোড়জোড় করেছিল কার্য্যক্ষেত্রে সে রকম কিছু এখনও ক'রে উঠতে পারে নি। ফিন্‌ল্যাণ্ডবাসীরা যে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে তা সত্যিই অসাধারণ বলতে হবে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা মাত্র ৩৭ লক্ষ, আর রাশিয়ার ১৭ কোটি।

* * *

সম্প্রতি তুরস্ক দেশে এক সঙ্গে পর পর নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে গেছে। ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়বৃষ্টিতে

অসংখ্য গ্রাম, সহর ধ্বসে গেছে, হাজার হাজার নরনারী প্রাণ হারিয়েছে।

* * *

তোমাদের মধ্যে যারা অনেক দিন থেকে রামধনু পড়ছ তারা শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষালের লেখার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত। তাঁর বিলাত থেকে লেখা চিঠি "বিলাতী ডাক" এক সময়ে

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল

রামধনুর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বছর দুই আগেও তাঁর লেখা একটা স্লোভাক্ রূপকথা রামধনুতে বেরিয়েছিল। হিরণ্ময় বাবু পোল্যাণ্ডে পিল্‌সুডস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সমস্ত পোল্যাণ্ডের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয়। জার্ম্মেনী যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখনও তিনি ওয়ারস' সহরে ছিলেন এবং পাছে ভারতীয়দের নামে কলঙ্ক

লাগে এই ভেবে অবিরাম বোমা-বর্ষণের মধ্যেও স্থান ত্যাগ করেন নি। তার পর কয়েক মাস আর তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি জানা গেছে, তিনি বেঁচে আছেন তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় নানা অসুবিধা ভোগ করছেন। তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থও পোল্যাণ্ডের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে।

হিরণ্ময় বাবুর অনেকগুলো ভাষার উপর দখল আছে,—প্রায় ১৯।২০টা বিভিন্ন ভাষা তিনি জানেন। তোমাদের মত তিনিও রামধনুর একজন বিশেষ বন্ধু।

* * *

ভিসুভিয়াস্ পাহাড়ও নাকি আবার জেগে উঠেছে। আশপাশের অনেক লোক প্রাণভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। কে জানে আবার কোন্ দিন পম্পিয়াই-ধ্বংস ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হবে!

লাইব্রেরী

(শ্রী———)

অবিনাশদের বাড়ীতে মস্ত লাইব্রেরী। ঝক্‌ঝকে আলমারীতে চক্‌চকে বইগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সেদিন অবিনাশের বাল্যবন্ধু নবীন এসেছে তাদের বাড়ী বেড়াতে। অনেক দিন পর দুই বন্ধুর দেখা, অবিনাশ বন্ধুকে বাড়ীর সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল।

নবীন একটু কবি মানুষ। লাইব্রেরীটাই তার লাগল সব চেয়ে ভাল। এ আলমারী সে আলমারী দেখতে দেখতে হঠাৎ সে একখানা বই চেয়ে বসল। পড়ে আবার ফেরৎ দেবে।

কিন্তু অবিনাশের চক্ষুলজ্জা বলে কিছু নেই, অম্লানবদনে বল্‌ল, "তা তো হবে না ভাই। বই আমি কাউকে নিতে দেই না—তা সে যেই হোক্ না কেন!"

নবীন দমে গেল, এমনটা সে আশা করে নি। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়ে ব্যঙ্গস্বরে বল্‌ল, "কেন, জানতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে।" অবিনাশ হাসতে হাসতে জবাব দিল। "আমার লাইব্রেরীর প্রায় সব বই-ই যে ঐ ভাবে যোগাড় করা! সেই বিখ্যাত ইংরাজী লাইনটা জান না বুঝি?" অবিনাশ নবীনের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বল্‌ল, "যে অপরকে বই ধার দেয় সে মস্ত বোকা, আর যে সে বই ধার নিয়ে আবার ফেরৎ দিয়ে যায় সে তার চেয়েও বড় বোকা। অতএব—"

"সদুপদেশ বটে!" নবীনও এবার তার হাসিতে যোগ দিল।

৮

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) অশোক (২) চন্দ্রগুপ্ত (৩) জনক (৪) কুন্ত (৫) হর্ষবর্দ্ধন।

উত্তরদাতাদের নাম

দীপেন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্কর, মাষ্টার মহাশয় (ধুবড়ী); ভোম্বল, রামু, অমূল্য, শঙ্কর (জলপাইগুড়ি); আব্দুল হাই, আবদুর রশীদ মোল্লা, আব্দুল জব্বার ও আতাউর রহমান (কালীনগর); সন্তু, বুলু, সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (চাপাই নবাবগঞ্জ); সুপ্রিয়া ও সুধীর (ছাপরা); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, কাজল, পুতুল, মিনু (কালীঘাট); অঞ্জলি, মঞ্জুশ্রী, অর্চ্চিনারায়ণ, অমিতাভ, অনিরুদ্ধ (কলিকাতা); শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (এটোয়া); রত্না দেবী (পাটনা); সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); জগৎ ও পতিত (মুড়াগাছা); অনিমা, সাধনা, ভারতী, অতীন্দ্র রায় (পাবনা); অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রতিভা (ভবানীপুর); ময়না, খোকা, ভোঁদা মিত্র (লক্ষ্ণৌ); অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মা, রাজীব (বালীগঞ্জ); মায়া, ধীরা, সুলক্ষণা দেবী (ফয়জাবাদ); রীণা রায় (টালিগঞ্জ); বেলা, সিপ্রা, প্রবীর, প্রশান্ত, দেবাশীষ (পাতিহাল); শোভনাসুন্দরী দেবী (মধুবাণী); লিলি, বেলা, রবি, বাদল, বর্ষা (চাইবাসা); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগচী (বালুভরা); শান্তি, হরিহর, পুষ্প, গৌরী মজুমদার (বালীগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

'কল' শব্দটির আগে বা পরে অন্য অক্ষর (এক বা একাধিক) যোগ ক'রে এমন এক-একটি নতুন শব্দ তৈরী করতে হবে যার প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ হচ্ছে নীচেকার কথাগুলি। (উদাহরণ :—সমস্ত—কল; উত্তর—সকল।)

(১) সত্যিকার নয়—কল
(২) বিগড়িয়ে গেছে—কল
(৩) ঠিক ঠিক—কল
(৪) গাছে পাওয়া যায়—কল
(৫) যার ভিতরে জল থাকে—কল
(৬) লোকে যা রটায়—কল
(৭) গোলমালের আওয়াজ—কল

(সবগুলির উত্তর পাঠাতে হবে।)

ফুজিয়ামা, জাপান

[শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে

C. H. ARAN & CO., CAL.

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪৬ { ৩য় সংখ্যা

গাব গাছ

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

তোমায় যদি বাসেন ভাল এমন কি শিব-দুর্গাদি,
কোন ক্রমেই করব নাকো আমি তোমার সুখ্যাতি।
হয় নি বয়স, জেনো আমি শৈশবেরি সেই আছি,
ফুল না দিয়ে আমার পানে পেলিয়েছিলে মৌমাছি।
ঠাস্ বুনানী তোমার মালা! অনেক ক্ষণই থাক্‌তো গো,
পরীর গজমুক্তামালার মতন আমার লাগতো গো!
ফুরিয়ে গেল ফুল কুড়ানো, তোমার ফুলের হার গাঁথা,
অনেক বছর অতীত হ'ল ভুলি নি কই তার কথা।

প্রত্যেকটা কড়ে এবং অন্যান্য আঙুলের ডগায় বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিয়ে এসে সমস্বরে বলে উঠছে, 'ওঁ।' সুন্দর গায়ের রঙ, লম্বা লম্বা বিশ্রী দাড়ি থাকলেও মুখের ছাঁদ ভালো, তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় চোখ, প্রশস্ত সমতল কপাল। রাক্ষসদের বড় ভক্তি হ'ল;—তারা সিদ্ধান্ত করলে নিশ্চয়ই এরা দেবতা, আকাশ থেকে নেমে এসেছেন—মাঠে প্রচুর শস্য দেবেন, গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তারা ভক্তিভরে হস্ত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আহ্নিক সেরে চোখ মেলে তাকাতেই আর্য্যসন্তানদের পিলে চমকে উঠল। সর্ব্বনাশ, রাক্ষসেরা যে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন ক'রে ফেলেছে! আক্ষেপ হ'তে লাগল, কেন এমন মূর্খের মত সবাই একসঙ্গে আহ্নিকে বসেছিলেন। আহ্নিক একদিন বাদ পড়লেই বা এমন কোন্ ক্ষতিটা হ'ত? আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের নাম! তাঁরা সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন,—'হা হতোস্মি!'

রাক্ষসেরা ভাবলে, দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করলেন। তারা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হ'ল। তখন আর্য্যদের ধড়ে প্রাণ এল।

ভারতবর্ষে অনার্য্যদের উপরে আর্য্যদের এই প্রথম বিজয়লাভ। সুতরাং ভবিষ্যতেও যে তাঁরা এই অভাবিত অস্ত্রটি ব্যবহার করবেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাঁরা সজোরে ধর্ম্ম চালাতে আরম্ভ করলেন যাতে এই রাক্ষসেরা সহজেই কাবু হ'তে পারে—ভক্তিদ্বারা আক্রান্ত হয়ে বশীভূত হয়। আর্য্যদের এই অস্ত্র অসম্ভব কার্য্যকরী হ'ল। জ্ঞাতভাইদের তাঁরা খবর পাঠিয়ে ডেকে আনতে লাগলেন, ও ক্রমে মন্ত্রতন্ত্র আর যাগযজ্ঞের ভড়ং এবং ঈশ্বর ও পাপের ভয় দেখিয়ে অনার্য্যদের অতি সহজে কাবু ক'রে ফেললেন। রাক্ষসেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর্য্যদের বিস্তর জায়গা ছেড়ে দিলে। আর্য্যেরা কৌশলে জায়গা হাত ক'রে চাষবাস, পশুপালন আর শাস্ত্র তৈরীতে লেগে গেলেন। বলতে লাগলেন—'ভগবান্ কর্ত্তৃক আমরা সংস্কৃতি আর সভ্যতা বিতরণ করবার জন্য তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা অসভ্য কিন্তু তোমাদেরও একদিন সভ্য ক'রে তুলব,—শুধু আমাদের আরাম ক'রে খাবার-পরবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

কিন্তু সর্ব্বত্রই মন্দ লোক থাকে, রাক্ষসদের মধ্যেও ছিল। তারা আর্য্যদের রকম-সকম দেখে খুসি হতে পারল না। বলতে লাগল,—'আমাদের এখানে বেশ আস্তানা গেড়ে বসেছেন দেখছি! জাতভাইদের আমদানি ক'রে ক্ষেতখামার বিলি-ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। আমাদের দেশবাসীদের চাকর বানিয়ে খাটিয়ে মারছেন। আর একবার দেমাকটা দেখ না, যেন আমরা ভারি অসভ্য, কিছুই জানি নে, কিছুই পারি নে, ওঁরা তাই দয়া ক'রে আমাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করতে এসেছেন। বলি, দেমাকীর দল, মহেঞ্জোদড়োটা একবার ঘুরে দেখে আয় না, অনার্য্যদের সভ্যতার একটু পরিচয় পেয়ে আসবি! এক গাল দাড়ি রাখিস, শালপাতায় খাস, জল রাখবার কলস

বানাতে শিখলি নে, ভালো ক'রে সুতো কাটতে জানিস নে—তার একবার চাল দেখ না! শুধু যাগযজ্ঞ হোম, এ সবই যেন একমাত্র সভ্যতা!'

এই সব লোক গ্রামে সহরে সর্ব্বত্র আর্য্যবিদ্বেষ প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগল। বললে, 'জাগো, অনার্য্যেরা, জাগো। এই বিদেশী শোষণকারীদের দেশ থেকে দূর করতে হবে। তোমাদের মাঠের ফসল ওরা লুটে খাচ্ছে; এত কাল যে দেবতাদের তোমরা পূজো ক'রে এসেছ সেই পাথর, সেই বটগাছ, সেই সাপ আর হাতী প্রভৃতি প্রকৃত দেবতাদের ত্যাগ করতে বলে আর্য্যেরা তোমাদের জাত মেরে বেড়াচ্ছে। এবং লজ্জার কথা, আমাদের যুবকেরা এই স্বার্থান্বেষী আর্য্যদের অনুকরণ ক'রে লম্বা লম্বা দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছে, এবং কেউ কেউ ওদের মত অনুস্বার বিসর্গ লাগিয়ে কথা বলতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করছে। জাগো, সবাই জাগো, নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা কর।' এই প্রচারে ফল হ'ল। ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা বিজয়-লাভের পন্থাটা সর্ব্বত্র আর কার্য্যকরী হ'ল না। আর্য্যদের বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হ'তে হ'ল,—যদিও তারা সর্ব্বত্রই বলে বেড়াতে লাগল, অনার্য্যদের মঙ্গলের জন্যই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের লড়তে হচ্ছে, অনার্য্যদের সভ্যতাদানই তাদের একমাত্র ব্রত ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কাঁহাতক আর পারা যায়! ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক আর্য্যদের কথায় অবিশ্বাস এবং তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল; আর্য্য-বিদ্বেষ ব্যাপক হয়ে উঠল। যুদ্ধ না ক'রে আর কোনও জায়গা বা সুবিধা হাত করা যায় না। এবং যদিও আর্য্যদের বুদ্ধি বেশী এবং অস্ত্রশস্ত্র অনার্য্যদের তুলনায় অত্যধিক কার্য্যকরী, তবু সংখ্যার কথাটা ভেবে দেখতে হয়। অনার্য্যের তুলনায় তারা হাজারে একও নয়। প্রকাশ্যভাবে আর্য্যে-অনার্য্যে যুদ্ধ বেধে গেলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সত্ত্বেও কতদিন আর টিঁকে থাকা যাবে! আর্য্যদের ভয় হতে লাগল, আর্য্যবিদ্বেষ এমন তীব্র হয়ে উঠতে থাকলে শীঘ্রই হয়তো তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে ফিরতে হবে। সেখানে খাবে কি?

তোমরা ভাবছ, কি মিথ্যেবাদী লেখক। জিলিপীর গল্পের আশা দিয়ে লোভ লাগিয়েছিল, এখন কিনা ভারতবর্ষের ইতিহাস সুরু ক'রে দিয়েছে—যা বছরের পর বছর শুনে কান ঝালা হয়ে যায়। হতাশ হয়ো না,—সবুরে মেওয়া ফলে। জিলিপী এইবার আসবে।

রাজ্যের রাজা গালে হাত দিয়ে ভাবছেন, মন্ত্রী পাকা মাথা চুলকোচ্ছেন, নরপতি, গ্রামনী এরা দূরে বসে উফ্ আফ্ ক'রে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। খবর শুভ নয়। গুপ্তচর সংবাদ এনেছে, দুই প্রতিবেশী অনার্য্য রাজা একযোগে এ-রাজ্য আক্রমণ করবার গোপন উদ্যোগ করছে। কোথায় দখল-করা জমি চাষবাস ক'রে, ভেড়া চরিয়ে আর্য্যেরা সুখস্বচ্ছন্দে বসবাস করতে চায়

আর তার জায়গায় কিনা দু'তিন মাস অন্তর অন্তর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ! এমন হ'লে কি ব্যবসা-বাণিজ্য চলে! কিন্তু এবার 'পরিস্থিতিটা' আরও জটিল; এতদিন তাদের এক গ্রাম বা এক শাখা-জাতির সঙ্গে লড়তে হয়েছে—একতা সম্বন্ধে অনার্য্যদের জ্ঞানই ছিল না। এইবার খবর এসেছে, দ্রাবিড়দের দুই শাখা-জাতির দুই বিভিন্ন রাজ্য একত্রে আর্য্যরাজ্য আক্রমণ করবে। সে দুই রাজ্যের একটা আর্য্যরাজ্যের পূবে, অন্যটা পশ্চিমে। উভয় দিকে আক্রান্ত হ'লে এই মুষ্টিমেয় সৈন্য কি ক'রে পেরে উঠবে, তাই আর্য্য-সরকারের বিষম ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। চাষাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে, লাঙল ছাড়, দেশরক্ষা পাঁচ সাত জনের কাজ নয়, সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে। তরোয়ালের মরচে ঘষে সাফ্ করো, ধনুকে নতুন জ্যা লাগাও, কাঠ ফেঁড়ে বল্লম কেউ ভোঁতা করতে পারবে না। কিন্তু একে শত্রুপক্ষের জনবল আর্য্যদের চাইতে বহুগুণ বেশী, তার উপর লেজ আর টিকি দুদিকেই আক্রমণ,—সমস্ত রাজ্যের লোক দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে।

রাজা বল্‌লেন, 'মন্ত্রী, তোমাকে বরখাস্তই করতে হবে। তিন তিনটে দিন উত্তীর্ণ হ'ল, এর মধ্যেও কোন উপায় খুঁজে পেলে না?'

'মহারাজ', মন্ত্রী নত-বদনে মাথা চুলকিয়ে বল্‌লেন, 'মুস্কিল হয়েছে কি, আমাদের কথায় আর ওরা বিশ্বাস করে না। ভেবেছিলেম একটা রাজনৈতিক চাল চালি। দু-রাজ্যের রাজাকেই সাদরে আহ্বান ক'রে আদর-আপ্যায়ন ক'রে দিই, বর্ম্ম আর তরোয়াল উপহার দিই, রাজ চক্রবর্ত্তী-টর্ত্তি সব উপাধি-টুপাধিগুলি তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে খুসি করি—বলি, আপনারা চিরদিনের জন্য আমাদের মিত্রশক্তি হলেন। ঐ উদ্দেশ্যে, তাদের আমন্ত্রণ ক'রে দূতও পাঠিয়েছিলেম। কিন্তু এমন বদ্‌মাস, দু'জনেই বাজে অজুহাতে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে।'

'কি চমৎকার তোমার বুদ্ধি, মন্ত্রী!' রাজা সব্যঙ্গে বললেন, 'একেবারে বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছ। যারা যুদ্ধের জন্য তৈরি, সারা দেশটাকেই যারা লুটপাট্ ক'রে নিতে চায়, তারা সামান্য দুটো উপাধির লোভে…'

'আজ্ঞে, উপাধিতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে বৈকি।' মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, 'তবে এ-ক্ষেত্রে, এ-ক্ষেত্রে…একটা সন্ধিটন্ধি না করলে…'

'সন্ধি!' রাজা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ফেললেন। 'সন্ধি করতে হবে অনার্য্যের সঙ্গে? তুমি কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছ, মন্ত্রী? এই অসভ্য দেশে এসে আর্য্য-মহিমা তুমি এম্‌নি ভাবেই জলাঞ্জলি দিতে চাও? ধিক্ তোমাকে!' রাজামশাই উত্তেজনাবশে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মন্ত্রী, বার্দ্ধক্যহেতু তোমার বুদ্ধির উৎস শুষ্ক হয়েছে। অদ্য থেকে তোমাকে অবসর…'

মন্ত্রী করযোড়ে বললেন, 'আর একটি রাত্র সময় দিন, প্রভু! যদি আগামী কল্য প্রভাতের মধ্যে…'

'তথাস্তু।' প্রভু বললেন, এবং গোঁফ পাকাতে পাকাতে আসন পরিগ্রহ করলেন।

রাজ্যময় রাষ্ট্র হ'ল, মন্ত্রীমশায় হয় আগামী কাল প্রভাতের মধ্যে এমন বুদ্ধি বাৎলাবেন যাতে রাজ্য রক্ষা পায়, নয়তো তাঁর চাকুরি যাবে। চাকুরি গেলে উনি খাবেন কি? লাঙল ধরতে জানেন না যে চাষবাস ক'রে খাবেন। সবাই মন্ত্রীমশায়ের আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তাঁর জন্য আক্ষেপ করতে লাগল।

মন্ত্রীগিন্নী ধীরে ধীরে এসে বললেন, 'রাত হয়েছে, এবার খাবে এস।'

মন্ত্রীমশায় তখন বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন। রাত ক'টা বেজেছে, কে খেয়াল করে? যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় এমন কোনও উপায়ই খুঁজে পেলেন না। সেনাপতি তো সোজা জবাব দিয়েছে, 'এমন লাঙল-চষা সৈন্য নিয়ে রাজ্যের দুটো সীমান্ত সাম্‌লান যায় না। কত বার আপনাকে বলেছি, প্রজাদের কাজ ভাগ ক'রে দিন, সবাইকে খামারে লাগাবেন না। রাজস্বের কিছুটা বাঁচান, একটা স্থায়ী সৈন্যদল গড়ে' তুলি। তাতে কি তখন কান দিয়েছেন? বলেছেন, জাতি-ভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে…এখন সাম্‌লান।…' ইত্যাদি।

'আর দেরি ক'রো না, পিত্তি পড়বে।'

'ওঃ, আর্য্যা, তুমি!' মন্ত্রীমশায় অবহিত হয়ে বললেন, 'চাকরিটা যে যেতে বসেছে, শুনেছ?'

'গেলেই হ'ল আর কি!' গৃহিণী অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন। 'ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণের কাছে মাগনাই এতদিন মাথা কুটে মরেছি! সব ঠিক আছে।'

'কেমন, কেমন?'

'দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলুম। স্বপ্নে দেখলুম এক নতুন পিঠে ভেজে তোমাকে খাওয়াচ্ছি। সেই পিঠে পেটে যাওয়া মাত্র তোমার মাথার চতুর্দ্দিকে এক দিব্যজ্যোতিঃ ফুটে বেরুলো। সারা রাজ্যময় তোমার জয় জয়কার পড়ে' গেল। রাজামশাই সোনার মুকুট খুলে তোমার মাথায়—'

'বল কি?' মন্ত্রীমশায় সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'বানাবার প্রণালীটা মনে রেখেছ তো?'

'শুধু মনে? তৈরিও ক'রে রেখেছি।' হেসে আর্য্যানী বল্‌লেন, 'খাবে চল।'

মন্ত্রীমশায়কে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে হ'ল না।

এমন ক'রে দেবতার আশীর্ব্বাদে স্বপ্ন থেকে জিলিপীর জন্ম হ'ল। সেই সদ্যোজাত জিলিপীতে কামড় দিয়েই মন্ত্রীমশায় বুঝতে পারলেন, মাথার রগগুলো কেমন বেঁকে বেঁকে উঠছে। সরল যা ছিল সবই ক্রমে জটিল হয়ে উঠতে লাগল। সব কিছুই যেন পেঁচিয়ে উঠছে। মন্ত্রীমশায়

ভয় পেয়ে চীৎকার করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু সহসা তাঁর আবর্ত্তমান মগজের থেকে এক বুদ্ধির বিজয়লক্ষ্মী উঠে এল। ভয়ের বদলে তিনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। বল্‌লেন, 'মেরে দিয়েছি।'

দুই শত্রু রাজ্যের মধ্যে এক করে সাপ পূজো আর অন্য করে নেউল পূজো। আর্য্যরাজ্যের মহামান্য মন্ত্রীমশায় লোকজন ডেকে পাঠালেন। বল্‌লেন, 'যেখানে যত নেউল আছে, রাত শেষ হবার আগেই ধ'রে নিয়ে এস।' সাপুড়েদের ডেকে বল্‌লেন, 'দু'হাজার সাপ চাই।' হুকুম পেয়েই চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত লোকেরা ছুটল; এবং দু'দণ্ড পার হ'তে-না-হ'তে পাঁচ হাজার সাপ আর দশ হাজার নেউল এনে হাজির করলে।

তখন মন্ত্রীমশায় গুপ্তচরদের ডাকিয়ে বল্‌লেন, 'একদল সাপগুলি নিয়ে নেউল-দেবতার রাজ্যে ছেড়ে দাও, আর অন্যদল নেউলদের নিয়ে নাগদেবতার রাজ্যে ছেড়ে দিয়ে এস। আজ রাত্রের মধ্যেই এ সব হওয়া চাই, এর অন্যথা হ'লে প্রত্যেকের গর্দ্দান যাবে।'

পর দিন প্রভাতে নেউল-দেবতার রাজ্যে দেখা গেল কোথা থেকে শ'য়ে শ'য়ে সাপ হাজির হয়ে কিল্‌বিল্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে, আর যত গর্ত্তে যত নেউল ছিল, বেরিয়ে এসে তাদের আক্রমণ আরম্ভ করেছে। দেখে তারা আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। এদিকে নাগদেবতার রাজ্যে লোকেরা দেখলে অসংখ্য নেউল কোথা থেকে উপস্থিত হয়ে গর্ত্তে গর্ত্তে সাপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেবতাকে রক্ষা করবার জন্য লোকেরা মিটিং বসালে।

দু' রাজ্যেই সাপে নেউলে বিষম ঝগড়া বেধে গেছে। খবর পাওয়া গেল, নেউল-দেবতার রাজ্যে চার হাজার সাপ খুন হয়েছে। নাগদেবতার রাজ্যের লোক ক্ষেপে উঠল। নেউল-দেবতার রাজ্যে তাদের দেবতার অপমান! তাদের রাজ্যের রাজামশায়কে তারা ও-রাজ্যে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতে বাধ্য করলে। নেউল-দেবতার রাজ্যের লোকেরাও চটে আছে। জনমত-অনুসারে তাদের রাজাও কৈফিয়ৎ চাইলে, 'তোমাদের জহ্লাদেরা গত দু'দিন ছ' হাজার নেউল-দেবতা খুন করেছে কেন?'

ওরা বল্‌লে, 'তোমরা মিথ্যুক।' এরা বল্‌লে, 'তোমরা পাজি।' এরা বল্‌লে, 'সব তোমাদের শয়তানি।' ওরা বল্‌লে, 'সব তোমাদের বদ্‌মাসি।' ওরা বল্‌লে, 'কাল সন্ধ্যার মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পেলে আমরা তোমাদের প্রতি যুদ্ধঘোষণা করব।' ওরা বল্‌লে, 'আজকের মধ্যেই কৈফিয়ৎ পাঠিয়ো, নইলে মজাটা টের পাবে।'

শীঘ্রই সাপ-রাজ্য আর নেউল-রাজ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল।

আর্য্য রাজা নিজ মাথার সোনার মুকুট খুলে মন্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিলেন। বল্‌লেন,

'ধন্য মন্ত্রী, তুমি ধন্য। সমস্ত ভারতবর্ষকেই তুমি রক্ষা করেছ। এটাই সভ্যতার শাণিততম অস্ত্র। এই নব অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা বিদ্রোহী রাক্ষসদের জব্দ ক'রে আমরা সভ্যতা বিস্তার করতে থাকব। কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'নিশ্চয়, মহারাজ, নিশ্চয়।' মন্ত্রী সবিনয়ে বল্‌লেন।

'এ-বুদ্ধি কোথা থেকে পেলে? রাতারাতি এমন অদ্ভুত অমোঘ বুদ্ধি দান করতে পারে কে?'

'জিলিপী।' মন্ত্রী সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করলে।

আমাদের শরীরের মোটর গাড়ী

(অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি. এম্.বি)

তোমরা সকলেই বোধ হয় মোটর গাড়ীতে চড়িয়াছ। অনেকের মোটর গাড়ী আছে এবং কেউ কেউ হয়তো মোটর গাড়ী চালাইতেও শিখিয়াছ। আচ্ছা, মোটর গাড়ীর সঙ্গে আমাদের শরীরের জুড়ী গাড়ীর কখনও তুলনা করিয়াছ কি? এ জুড়ী গাড়ী আমাদের দুই পায়ের জুড়ী গাড়ী। যাদের বাড়ীতে মোটর গাড়ী নাই তাদের এই তুলনাটী ভাল লাগিবে আশা করি।

মোটর গাড়ী এঞ্জিনে চলে। এঞ্জিন কথাটার মানে জান কি? এঞ্জিন মানে এক রকম যন্ত্র যা কোনও বস্তুর শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারে। রেলের এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া জলকে বাষ্প করা হয় এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে রেলের এঞ্জিন চলে। তোমরা অনেকেই বোধ হয় ওয়াট্‌ সাহেবের বাষ্পীয় এঞ্জিনের পরিকল্পনা করিবার গল্পটি জান। ওয়াট্‌ সাহেব একটী কেটলীর জল আগুনের উপর ফুটিবার সময় দেখিতে পান যে ঐ গরম জলের বাষ্প মধ্যে মধ্যে কেটলীর ভারী ঢাকনাটীকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। উহা হইতেই তাঁর বাষ্পের শক্তি কাজে লাগাইবার কথা মনে আসে। উত্তপ্ত বাষ্প চারিদিকে জোরে ছড়াইয়া পড়িতে চায় এবং তার এই গুণটীর সাহায্য লইয়া বাষ্পীয় এঞ্জিন তৈরী করা সম্ভব হইয়াছে। মোটামুটী বাষ্পীয় এঞ্জিন ও পেট্রোল মোটর-এঞ্জিনের

নির্ম্মাণ-কৌশল এবং কাজ করিবার প্রণালী অনেকটা একই রকমের। এখানে তার সামান্য একটু বর্ণনা দিতেছি।

এই ধরণের এঞ্জিনগুলির প্রধান অংশ হইতেছে একটী 'সিলিণ্ডার' এবং তার মধ্যে উঠিতে নামিতে পারে এমন একটী 'পিষ্টন'। তোমরা সাইকেলের পাম্প দেখিয়াছ ত, অনেকটা সেই রকম আর কি! পেট্রোল এঞ্জিনে এই সিলিণ্ডারের মাথাতে এমন ভাবে বন্দোবস্ত আছে যে একটা নল দিয়া পেট্রোল ও বাতাস আসিতে পারে। সিলিণ্ডারের উপর ছিপির মত একটী প্লাগ্ বসান থাকে তাহাতে ২টী তার থাকে। এই তারের মধ্যে মুহুর্মুহুঃ তড়িৎ চালিত হইবার বন্দোবস্ত আছে। তড়িতের আগুনে পেট্রোল পুড়িয়া যে উত্তপ্ত গ্যাসের উদ্ভব হয় তাহারই চাপে পিষ্টনটী নীচে নামিয়া যায়। পিষ্টনটীর হাতল যদি গাড়ীর চাকার সঙ্গে এমন ভাবে লাগান থাকে যাহাতে উহা নামিলে চাকাটীও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে তবে পিষ্টন নামিলে গাড়ীও কিছু আগাইবে। পিষ্টন সিলিণ্ডারের মধ্যে কতকটা নামিয়া গেলেই গ্যাসটুকু একটী ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইতিমধ্যে চাকাটী ঘুরিয়া পিষ্টনকে আবার উপরে পাঠাইয়াছে। এখন আবার প্লাগে আগুন হইল, আবার কিছু গরম গ্যাস ঠেলিয়া পিষ্টনকে নামাইয়া দিল—চাকা বেগে ঘুরিতে লাগিল এবং তোমরা মহানন্দে মোটর গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে লাগিলে। পরের পৃষ্ঠায় মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের একটী ছবি দিলাম, তাহা হইতে ব্যাপারটা অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের সঙ্গে আমাদের শরীরের একটু তুলনা কর। আমরা বাতাসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য পোড়াইয়া তাহার লুক্কায়িত শক্তিকে দিয়া নানা প্রকার কাজ করিতেছি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের দেহই এক একটা এঞ্জিন রূপে গণ্য হইতে পারে। মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের চেয়ে আমাদের এঞ্জিনের কৃতিত্ব কি কম? বরং সব বিষয়ে বেশী। ধর একটা মোটর গাড়ী ৪।৫০০০ টাকার কমে পাওয়া যায় না, মাসিক খরচ পড়ে ১০০ টাকার বেশী এবং ৭।৮ বছর পরে গাড়ী অকেজো হইয়া পড়ে। আর আমাদের শরীর ভালভাবে চালাইতে জানিলে

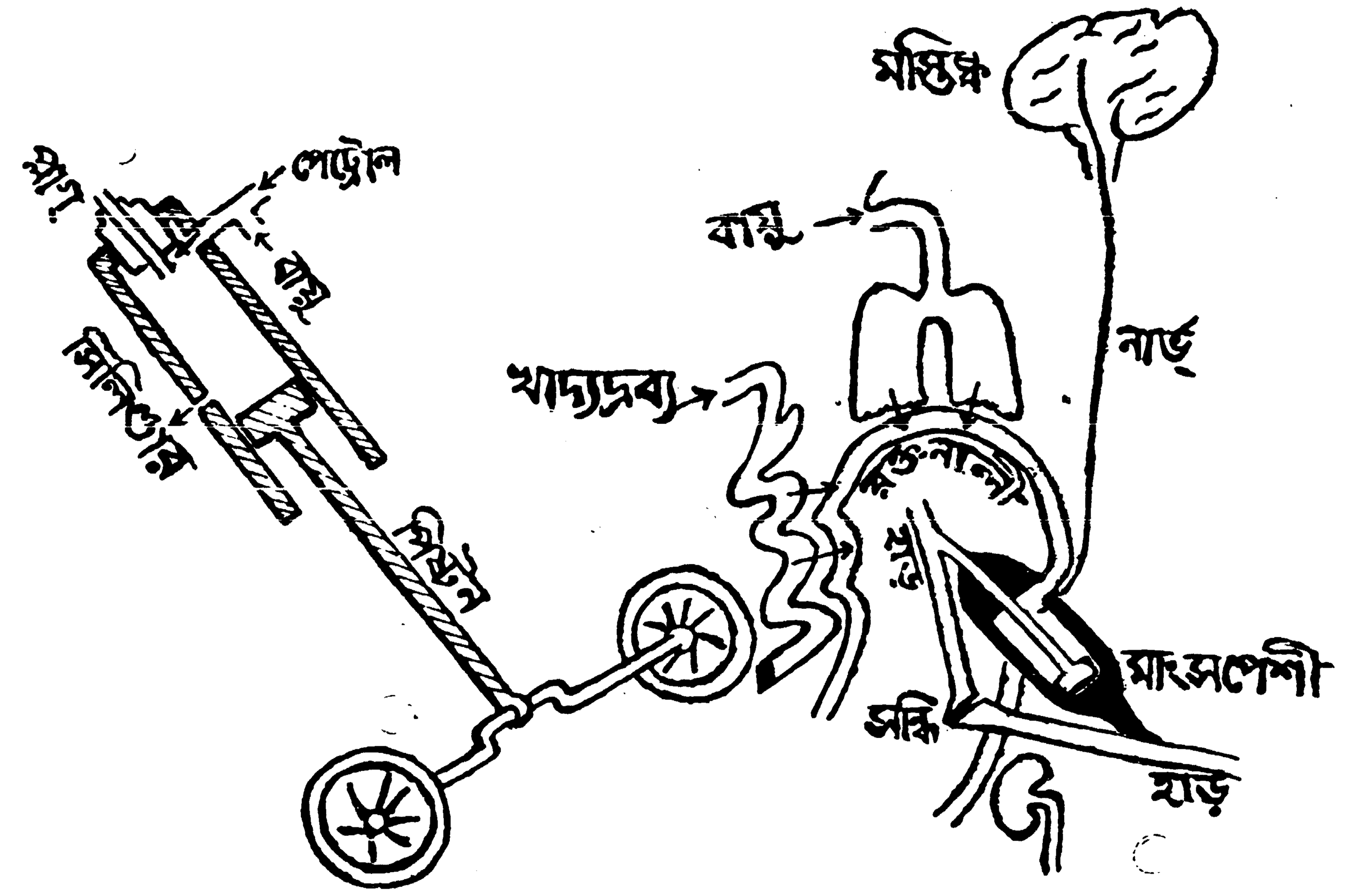

মোটর গাড়ীর এঞ্জিন আমাদের শরীরের মোটর-এঞ্জিন

৫।১০ টাকা মাসিক খরচে ১০০ বছর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। আমাদের শরীর চালাইবার জন্য আলাদা ড্রাইভারের দরকার নাই। এঞ্জিনের সঙ্গে ড্রাইভার যোড়াই আছে। আমাদের মস্তিষ্কই হইতেছে ড্রাইভার।

একটা লোক, ধর আমাদের দেশের চাষী মজুরেরা, মাসিক ৪।৫ টাকার খাবার খাইয়া রোজ ২০।২৫ মাইল চলিতে পারে বা চলে। একটা সোজা অঙ্ক কষা যাক্।

একটা লোকের খরচ মাসে ৫৲ হইলে, এক শ' বছরে ধর ৬০০০৲ টাকা হইল। সেই খরচে ২৫ মাইল রোজ হিসাবে সে চলিতে পারে ৮ লক্ষ মাইল। মাইল প্রতি খরচ কত হইল? এক টাকায় এক শ' মাইল।

মোটর গাড়ীর বেলায় গোড়াতেই তো ৫০০০৲ লাগিবে। মাসিক ১০০৲ খরচ হিসাবে ১০ বছরে আরো ১২০০০৲ অর্থাৎ একুনে ১৭০০০৲ টাকা খরচ; তাহাতে ধর সে ৩ লক্ষ, ৪ লক্ষ বা ৫ লক্ষ মাইল যাইবে। মাইল প্রতি কত খরচ হইল? টাকায় কুড়ি মাইল। সুতরাং তোমার আমার শরীর এ বিষয়ে মোটর গাড়ী হইতে ৫ গুণ শ্রেষ্ঠ। অবশ্য এটা হইল নিছক্ চলার কাজ। আমাদের শরীর চলা ছাড়া আরো নানা রকম কাজ করে--যেমন ধর, কথা বলা, লেখা, সেলাই করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। তোমার মোটর গাড়ী তা পারে না।

তা হইলে এটা মোটামুটী বেশ বোঝা গেল যে আমাদের পদযুগলের জুড়ী গাড়ী মোটর গাড়ীর তুলনায় বড় একটা কেউ কেটা নয় বরঞ্চ অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য মোটের উপর অনেক বেশী চলিতে পারিলেও আমাদের জুড়ী গাড়ী বেগে ঘণ্টায় ১০০ মাইল কখনও যাইতে পারে না বটে।

তোমরা এতক্ষণ হয়তো ভাবিতেছ যে আমাদের শরীরের সঙ্গে মোটর এঞ্জিনের এমন কি মিল আছে যে তাদের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে। এবার সেইটাই একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক্।

প্রথমেই তা হইলে বলিতে হইবে আমাদের দেহে সিলিণ্ডার, পিষ্টনগুলি কোথায়। আমাদের মাংসপেশীগুলিকে এক-একটী সিলিণ্ডার, পিষ্টনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই পেশীগুলি হাড়ের সঙ্গে লাগান আছে এবং ইহারা সঙ্কুচিত প্রসারিত হইলে সেই অঙ্গ চালিত হয়। আচ্ছা, এই সিলিণ্ডারে তাহা হইলে আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি আসিয়া পোড়ে, সুতরাং খাদ্যদ্রব্য এবং বাতাস দুইএরই সেখানে পৌছান দরকার। তা কি করিয়া সম্ভব হয়? খাবার মুখ দিয়া আমরা পাকস্থলীতে পাঠাই এবং সেখান হইতে খাবার অন্ত্রে যায়। অন্ত্রে খাবারগুলি জীর্ণ হইয়া তরল অবস্থায় রক্তদ্বারা শোষিত হইয়া রক্তনালী দিয়া মাংসপেশীতে

আসে। আমরা বাতাস ফুস্ফুসে টানিয়া লই। তথা হইতে রক্ত তাহা শোষণ করিয়া রক্তনালী দিয়া মাংসপেশীতে পাঠায়। সুতরাং সিলিণ্ডারে পেট্রোল ও বাতাস যেমন আসে, তেমনি আমাদের মাংসপেশীতে খাদ্যদ্রব্য ও বাতাস পৌছিল। তাহা পোড়ে কি করিয়া? মাংসপেশীতে আবার প্লাগ্ এবং তড়িৎ প্রবাহ আছে নাকি? হ্যাঁ, তাও আছে; আমাদের মস্তিষ্ক হইতে সরু তারের মত নার্ভ আসিয়া মাংসপেশীতে শেষ হইয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই নার্ভ দিয়া তড়িৎশক্তি আসিবে, এবং মাংসপেশীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বাতাসের সাহায্যে পুড়িয়া যাইবে। ফলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া হাত পা নাড়াইবে, তুমি তোমার দেহকে পদযুগলের জুড়ী গাড়ী দিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু তাপেরও সৃষ্টি হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের শরীরও একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী বিশেষ। মোটর গাড়ীতে বড় জোর ৬।৮।১২টা সিলিণ্ডার আছে, আমাদের দেহে শত শত সিলিণ্ডার আছে। তাহাদের সাহায্যে আমরা চলাফেরা ছাড়া আরো বহু প্রকার কার্য্য করিতে পারি।

মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের পাশে আর একটা ছবি দিলাম। এটির সঙ্গে মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের তুলনা কর। অনেক কিছু মিলিয়া যাইবে। অবশ্য একটা কথা বলা দরকার যে মাংসপেশীকে সিলিণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করিলেও বস্তুতঃ ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এবং কারুকার্য্য আরো সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র।

আমাদের দেহের আর একটী শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া আজ এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক্। তোমার মোটর গাড়ী যদি ভাঙ্গে তবে যত দিন না তুমি সেই ভাঙ্গা অংশটী বদল করিতেছ তত দিন তোমার গাড়ী অচল। কিন্তু মনে কর তোমার পদযুগলের জুড়ী গাড়ীর একটী পা ভাঙ্গিয়া গেল। তুমি পা বাঁধিয়া দিন কতক বিছানায় শুইয়া থাক এবং ভাল খাবার খাও। খাদ্যদ্রব্যই তোমার এঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহারাই আবার তাহা যুড়িয়া দিবে। সুতরাং আবার বলি যে আমাদের এই জুড়ী গাড়ীর তুলনা নাই।

তোমরা সর্ব্বদা মোটর চড়িয়া সেই জুড়ী গাড়ীকে পঙ্গু করিও না। নিজ

শরীর সম্বন্ধে আরো জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর যাহাতে ইহাকে ভাল করিয়া ব্যবহার্য্য রাখিতে পার। তাহাতে বহুদিন তোমার নিজের, দশের এবং দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।*

নগদ বিদায়

(বন্দে আলী মিয়া)

গাজনতলার মহেশ মালী সে
কিপ্‌টে যে অতিশয়
হাত দিয়ে তার গলে নাকো জল
পাড়ার লোকেরা কয়।
কারবার তার টাকা ধার দেয়া
কিন্তু এমন সুদ
দশ টাকা হয় ছ'মাসে তিরিশ—
হিসাব সে অদ্ভুত!
সকাল-বিকাল খাতা বগলেতে
বাহিরায় তাগাদায়,
নেয় না আসল—মহেশ শুধুই
সুদের কড়িটি চায়।
লোকে বলে তারে, দেখিলে উহারে
অন্ন নাহিক' জোটে,
নাম নিলে তার হাঁড়ি ফাটে, দিন
ভালো নাহি যায় মোটে।

সেই বৎসরে পূজার আগেতে
রোগে তারে যেন পেলে,
পড়িল জ্বরেতে মহেশ মালীর
একটি মাত্র ছেলে।
তার কিছু দিন পরেতে তাহার
গৃহিণীরে রোগে ধরে,
হোমিওপ্যাথির ছিল যে শিশিটি
একদিনে খালি করে।
সারে না তবুও—মেলে না স্বস্তি—
মহেশ তো নিরুপায়,
শহর হইতে ডাক্তার এনে
করিবে না অপব্যয়।

রক্ষাকালীর দুয়ারেতে গিয়া
ভূমে পড়ি লুটাইয়া
কহিল মহেশ সজল চক্ষে
গলায় কাপড় দিয়া—
"জগৎতারিণী হে মাতা করালী,
রক্ষা কর গো প্রাণ,
প্রাণের বদলে প্রাণ দেব মাগো,
জোড়া মোষ বলিদান।
তোমারি মতন রঙ তার কালো—
পুষ্ট নধর দেহ,
মানুষের চেয়ে মহিষ ভালো মা,
নাই তাহে সন্দেহ।

---

* এই প্রবন্ধে মোটামুটী তুলনায় মাংসপেশীর সঙ্কোচনকে 'হিট্‌-এঞ্জিন্' (Heat Engine) এর মত বলিয়া ধরা হইল। বস্তুতঃ মাংসপেশী কি ভাবে সঙ্কুচিত হয় পণ্ডিতেরা এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে ইহা সত্য যে খাদ্যদ্রব্য দহনই মাংসপেশীর কার্য্যকরী শক্তির উৎস। —লেখক।

মহিষ লইয়া গৃহিণী পুত্র
ফিরাইয়া দিয়া যাও,
শুনিয়াছি মাগো, ভক্ত যা দেয়
তুমি তো তাহাই নাও।"

মহিষের লোভে সেবার বোধ হয়
কৃপা করিলেন কালী,
গিন্নী ও ছেলে সুস্থ হইল—
হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মালী।
দিনের পিছুতে আসে যায় দিন,
হ'ল শেষ ছয় মাস
দেবীর 'পরেতে ক্রমে ক্রমে তার
কমে আসে বিশ্বাস।
এমন সময়ে স্বপ্নে একদা
দেবী দেন দরশন,
বলেন, "মহেশ, মানতের কথা
হ'ল কি বিস্মরণ?
জোড়া মোষ দেবে করেছ মানস—
বলিদান তাহা দাও।"
মহেশ কহিল, "কেন দিই নাই—
বুঝিতে পার নি তাও!
আমার মতন গরীব মানুষ
এই গ্রামে কেহ নাই,
জোড়া মোষ কেনা টাকা কোথা পাব—
দিতে পারি নিকো তাই।
তা' ছাড়া মহিষ ভীষণ জন্তু
কী করে তাহারে খাবে?
দৈত্যের মত চেহারা তাহার
দেখে তুমি ভয় পাবে।
সেই ভেবে আরো দমে গেনু আমি,
শোনো, তার চেয়ে বলি
মোষের বদলে জোড়া পাঁঠা নিয়ে
তব ঠাঁয়ে দেব বলি।
দেখিতেও বেশ ক্ষুদ্র গড়ন—
মাংসও মিঠে তার,
লুচির সঙ্গে, বুঝিলে মা কালী,
লাগে কি চমৎকার!"
দেবী বলিলেন, "বেশ তাই দিস্।"
বলে দেবী চলে যেতে
ঘুম ভেঙে গেল—মহেশ বেচারী
ঘেমে গেছে গরমেতে।
মনে মনে ভাবে পাঁঠা গোটা দুই
এবার ঠিক সে দেবে,
দেবী তো খাবে না—খাব আমরাই—
কেন মরিতেছি ভেবে।

এর ছয় মাস পরে
দেবী পুনরায় দেখা দেন তারে
রজনী দ্বিপ্রহরে।
দেবীরে দেখিয়া ভয়ে জড়সড়—
মুখ হ'ল তার ম্লান,
এত দিনেতেও কেনে নাই পাঁঠা—
করে নাই বলিদান।
কহিল মহেশ কাষ্ঠ হাসিয়া
যোড় করি দু'টি হাত,
"জানি মাগো, তুমি কেন আসিয়াছ
এমন অকস্মাৎ।
পাঁঠা কিনিবারে হাটবার দিনে
গিয়েছিনু গত মাসে
পাঁঠাও দুষ্ট, কম নয় মাগো,
শিঙ বাঁকাইয়া আসে।
সরে এনু ত্রাসে—ভাবিলাম মনে
এমন জন্তু নয়
যাহা দেখে মাগো, তোমার চিত্তে
হ'তে পারে কভু ভয়।

এমন নিরীহ জীবে দেব বলি
ভাবিয়াছি মনে মনে
জিহ্বা তোমার হইবে রসাল
যার কথা শুনে শুনে।
পায়রা, জান মা—পায়রার মত
নিরামিষভোজী জীব
নাই দুনিয়ায়—যারে ভালোবাসে
তোমার ভর্ত্তা শিব।
ইহা এক জোড়া কিনে নিয়ে কাল
চলে গিয়ে কালী-ঘরে
বলি দিয়ে মাগো, স্পর্শিব জল
বলিনু শপথ করে।”
কালী বলিলেন, “তোর কথা বাপু,
বিশ্বাস নাহি হয়,
একটি বছর কর্‌ছিস্ ছল—
দেরী আর নাহি সয়।
যাহা দিবি দিস্ শীগ্‌গির করে
দিন সাতেকের মাঝে,
আর দেরী হ’লে মানত তোমার
লাগিবে না কোনো কাজে।”
ঘাড় কাৎ ক’রে বলিল মহেশ,
“লজ্জা দিয়ো না মা,
তোমার নিকটে দেখাইতে মুখ
ইচ্ছা যে ক’রে না।”

সেদিনের মত দেবী চলে যেতে
ঘুম ভাঙে মহেশের,
এবার পায়রা দিতেই হইবে—
ওজর হয়েছে ঢের।
এক জোড়া তার দাম আট আনা—
কম নয় কিছুতেই,
এতটা পয়সা বাজে ব্যয় হ’লে
প্রাণে মারা যাবে সেই।

এর চেয়ে ভালো ডাক্তার ডাকা
ভিজিট যদি না লয়;
তবু মোষ থেকে পায়রা হয়েছে—
দেবী ভালো অতিশয়।
আপনার মনে ফন্দি আঁটিয়া
মত্‌লব ঠিক করে
জমিদারদের অনেক পায়রা
মাঠে এসে রোজ পড়ে,—
ফাঁদ পেতে পাখী ধরিয়া আনিয়া
বলি দেবে মার ঠাঁই,
পয়সা বাঁচিবে—ঋণ শোধ হবে—
কোনোই ঝক্কি নাই।
ফাঁদ পেতে রেখে হয়রাণ হ’ল—
ধরা পড়ে নাকো পাখী,
মহেশ খুবই চিন্তিত হ’ল—
হপ্তার নাহি বাকি।

সপ্তাহ পরে পুনরায় দেবী
দিয়ে তারে দরশন
বলেন, “চালাকী দেবতার সাথে
করে না কেহ কখন।
পায়রাও তুই দিতে পারিলি না
এ তোর কেমন কথা!
দিবি কিনা দিবি বলে দে পষ্ট—
আর আসিব না হেথা।”
বিনয় করিয়া কহিল মহেশ
দাঁতে তার জিভ কাটি’
“জগৎ-জননী, শোনো এক ভুলে
সকল হয়েছে মাটি।
পায়রা যে মাগো, পোকা ধরে খায়
ছিল না আমার জানা,
সেই লেগে মাতা, হিংসুক প্রাণী
খেতে করি তোরে মানা।

পায়রার চেয়ে আরো যে নিরীহ
আছে গো এক সে প্রাণী
ইহাতে তোমার অরুচি হবে না
মনে মনে খুব জানি।
পাখীর মতই উড়িয়া বেড়ায়—
ফড়িং তাহার নাম,
তাই দেব বলি, অমত কোরো না—
মোরও লাগিবে না দাম।
দয়া করে তাই নাও মা, এবার
পরে ভালো কিছু দেব,
রাগ করিও না, ঠিক দেব কিছু—
ঠক মোরে নাহি ভেব।”
দেবী হেসে কন, “ফড়িং জুটিল
অবশেষে মোর ভালে!
দিস্ তবে তাই—কি আর বলিব—
দিস্ কালই সকালে।
অনেক রকম কৃপণ দেখেছি—
তোর মত কেউ নয়,
সবার ওপরে যাস্ যেন তুই—
সবে করেছিস্ জয়।
পয়সা খরচ ভয়ে যেন তুই
অনাহারে থেকে থেকে
অপমৃত্যুই ঘটাস্ নাকোরে—
কী হবে অর্থ রেখে?”
মহেশ বলিল, “যত ভাব মোরে
অত ছোট আমি নই,
কতই গো আর জমাতে পেরেছি
শুধু এক লাখ বই।
কাল সকালেই ধরিব ফড়িং—
রাত্রে থাকো মা হেথা,
খেয়ে-দেয়ে তুমি যেও মা চলিয়া
ইচ্ছা তোমার যেথা।”

রাত পোহাইল—ভোর হ’ল যবে—
নিদ্রা ভাঙিয়া উঠি
খাতা বগলেতে মহেশ তখন
গ্রাম পানে গেল ছুটি।
আসলের চেয়ে সুদ তার চাই—
সুদে সংসার চলে,
ব্যাঙ্কের টাকা উপরের দিকে
বাড়ে অতি কৌশলে।
চিন্তায় তার মাথা ঘুরে যায়—
চাই তার আজ টাকা,
টাকা না হইলে দুনিয়া তিক্ত—
মান যায় নাকো রাখা।
চাই টাকা তাই—টাকা শুধু চাই—
মহেশ কেবলি বলে,
কোথায় ফড়িং কোথায় বা কালী—
চিন্তায় টাক জ্বলে।
ছুটাছুটি ক’রে দুপুর বেলায়
মহেশ ফিরিল বাড়ী,
তেল মাখে আর হুঁকা টেনে চলে—
ক্ষুধায় পুড়িছে নাড়ী।
দেয়ালের ’পরে পিঠ ঠেকাইয়া
এলাইয়া দেহভার
ঝির্‌ঝিরে বায়ে চোখ দুটি মুদে
শ্রান্তি জুড়ায় তার;
এমন সময় রুষ্ট হইয়া
রক্ত নয়নে কালী
কহেন আসিয়া, “কি এ ব্যবহার
কহ গো মহেশ মালী?
মহিষ হইতে ফড়িং হইল—
তাও দিলি নিকো মোরে!
ভিখারীর মত বার বার শুধু
আসি যাই তোর দোরে।

আর আসিব না—এত দিনে মোর
মানুষ হইল চেনা,
মানত যদিরে নাই দিস তবে
সাফ্ কথা বলে দে না।"

মহেশের মন ছিল নাকো ভালো,
রাগিয়া উঠিল সে,
"রাতদিন খালি তাগাদায় আস—
আছি কিনা বসে বসে!
তোমার মতন বিনা আয়াসেই
খাবার জুটে না যায়,
সুদের পয়সা তাগাদা করিয়া
বের করা বড় দায়:

ভাবনায় মোর দেহ হ'ল ক্ষয়—
কখন ফড়িং ধরি?
মাঠ থেকে ধরে নিয়ে যেয়ো তুমি
লাগিবে না টাকাকড়ি।
দুইটা ফড়িং দিতে চেয়েছিনু—
নিয়ো তব খুসি যত;
যাক্ বাঁচা গেল—ঋণ শোধ হ'ল
চিরদিনকার মত।"

হাঁফ ছাড়ে মালী—এত দিন পরে
হিল্লে যা হোক হয়;
নগদ পাইয়া দেবীর মুখেতে
ফুটে ওঠে বিস্ময়।

সাপের মুখে

[সত্য ঘটনা]

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি)

বাদশাহী আমলের কথা।

মুকুট ছেলেটি ছিল ভারী দস্যি। পড়াশুনা তার মোটেই ভাল লাগিত না—যা একটু ভাল লাগিত খেলাধূলা। নারিকেল গাছে উঠিতে, তাল ও আম গাছে উঠিতে, ছিপে মাছ ধরিতে, সাঁতরাইতে, দৌড়াইতে সে ছিল সব ছেলেদের মাতব্বর। মুকুটের বাপ ছিল না, অভিভাবকরাও তার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মাঝে মাঝে তাড়নাও হইত। মুকুট মাঝে মাঝে পালাইয়া দুই-এক দিন বাড়ির বাহিরেও বাস করিত।

একদিন মুকুট এক তালগাছে উঠিয়াছে, পাখীর বাসা হইতে ছানা পাড়িবার জন্য—কাহাকে দিবার বায়না আছে। অনতিদূরে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় কয়েকটি সন্ন্যাসী বিশ্রাম করিতেছিলেন। বালকটির কার্য্য-কলাপ তাঁহারা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেছিলেন। বালকটি তালগাছের মাথায় উঠিয়া পাখীর বাসায় হাত দিতে যাইবে

এমন সময় দেখে এক বিষাক্ত সাপ ফণা তুলিয়া তাহাকে ছোবল মারে আর কি! সাপও তাহারই মত পাখীর ডিম চুরি করিয়া খাইবার লোভে উঠিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসীদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ছেলেটি এক হাতে তালের বাখরা ধরিয়াছে, আর হাত পাখীর বাসার দিকে তুলিয়াছে। সাধুরা ভাবিতেছেন, এই বুঝি ছেলেটি তাঁদের চোখের সামনে হয় উঁচু গাছ হইতে পড়িয়া যায়, নয় সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহারা যা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। ছেলেটী বেশ ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে ডান হাত দিয়া সাপটির মাথার পেছন দিক্ দিয়া তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল। সাপটা আর মাথা ঘুরাইয়া ছেলেটিকে কামড়াইতে পারিল না। তখন সাপে বালকে আর একরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাপ তাহার লেজ দিয়া ছেলেটির হাত জড়াইয়া ধরিল। সাপেরা এই ভাবে এমন কষিয়া ধরিতে পারে যে অনেক সময়ে হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ছেলেটি কিন্তু বিচলিত হইল না। তালের বাখরাগুলায় করাতের মত ধার। সে অতি সন্তর্পণে সাপটাকে উহাতে ঘষিয়া ঘষিয়া দু'খণ্ড করিয়া ফেলিল। সাপ মরিয়া গেল। সে তখন তাহার মাথাটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

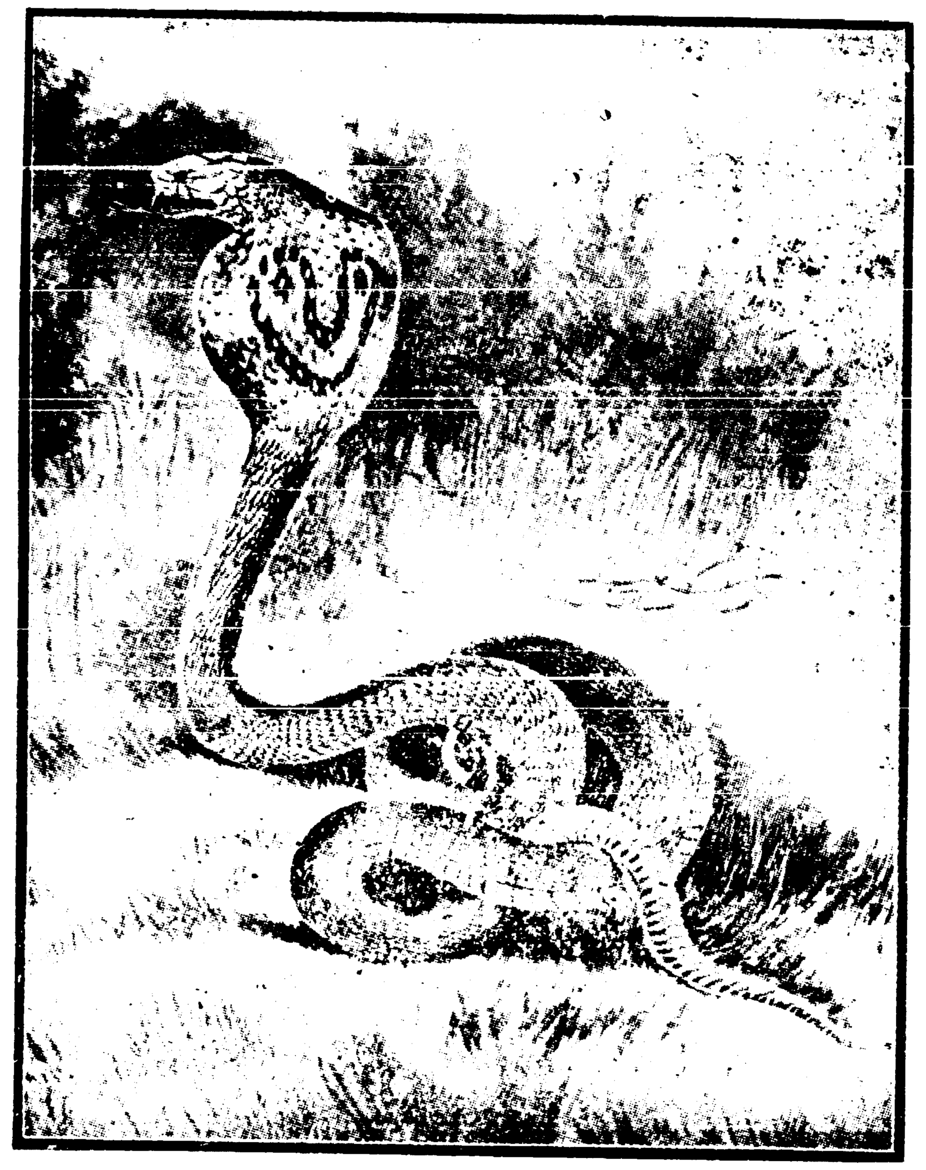

গোখুরা সাপ ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বড় সাধুটি অন্য সাধুদের বলিলেন, এ বালকের যেমন সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতি

তাহাতে এ কালক্রমে একজন বড় লোক হইবে। সাধুরা বালকের সহিত আলাপ করিলেন এবং তাহার বাড়ীর অবস্থা জানিয়া তাহাকে নিজেদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। বালক সাধুদের সঙ্গ লইল।

ভবিষ্যতে এই বালক দিল্লীতে গিয়া নিজ কর্ম্মদক্ষতায় বাদশাহ সরকারে উচ্চ পদ লাভ করে এবং পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া একজন বড় জায়গীরদার হয়। এই ছেলেটির নামই মুকুট রায়।

সম্প্রতি কাগজে এই ধরণের আর একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। একটি নেপালী ছেলে বাঁশী বাজাইতে বড় ভালবাসিত। কিন্তু আত্মীয়েরা তাহা পছন্দ করিত না। নবীন বংশীবাদকের রাতদিন পোঁ পোঁ সাধা কাহারই বা ভাল লাগে?

ছেলেটি একদিন এক নির্জ্জন জঙ্গলে গিয়া মনের সাধে বাঁশী বাজাইতেছিল। সাপেরা বাঁশীর সুর শুনিতে বড় ভালবাসে। বিশেষতঃ একটা বিশেষ সুর আছে যাহার ধ্বনি যেন সাপকে গর্ত্তের ভিতর হইতে টানিয়া লইয়া আসে। বালকটি ঘটনাক্রমে সেই সুর আয়ত্ত করিয়াছিল এবং তাহাই বাজাইতেছিল। সে তন্ময় হইয়া বাজাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে, একটা সাপ তাহার পিঠের উপর দিয়া বাঁশীর সামনে ফণা তুলাইতেছে। ছেলেটির বুদ্ধি ছিল অদ্ভুত। এই প্রাণান্তকর ব্যাপার দেখিয়াও সে একটুও ঘাবড়াইল না। এক হাত দিয়া বাঁশী ধরিয়া প্রাণপণে বাজাইতে লাগিল এবং অপর হাত দিয়া পেছন দিক্ দিয়া সাপের কণ্ঠটি চাপিয়া ধরিল। সাপ আর ফণা ঘুরাইয়া তাহাকে কামড়াইতে পারিল না, কিন্তু তাহার লেজ দিয়া ছেলেটির হাত জড়াইয়া ধরিল। ছেলেটি সেই অবস্থায়ই তাড়াতাড়ি লোকালয়ে আসিল; সাপের লেজের বেষ্টনে হাত তাহার যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছে! লোকেরাও লেজ ছাড়াইতে না পারিয়া তাহাকে ডাক্তারখানায় লইয়া গেল। ডাক্তার বাবু খানিকটা তূলা ক্লোরোফর্‌মে ভিজাইয়া তা দিয়া সাপের মুখ ও নাক চাপা দিলেন। ক্লোরোফর্‌মের শক্তিতে ক্রমশঃ সাপের দেহ অবশ হইয়া আসিলে তাকে টানিয়া ছাড়ান হইল; তার পর সাপটিকে ধ্বংস করা হইল।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[এর উত্তর নিজেরা দাও; না পারলে আগামী মাসের রামধনুতে পাবে।]

(১) টিশিয়ান্, সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস্, হাটন্, জন্ ড্যাল্‌টন্, ঈশা খাঁ, ভোলা ময়রা।—এঁদের চেন কি?

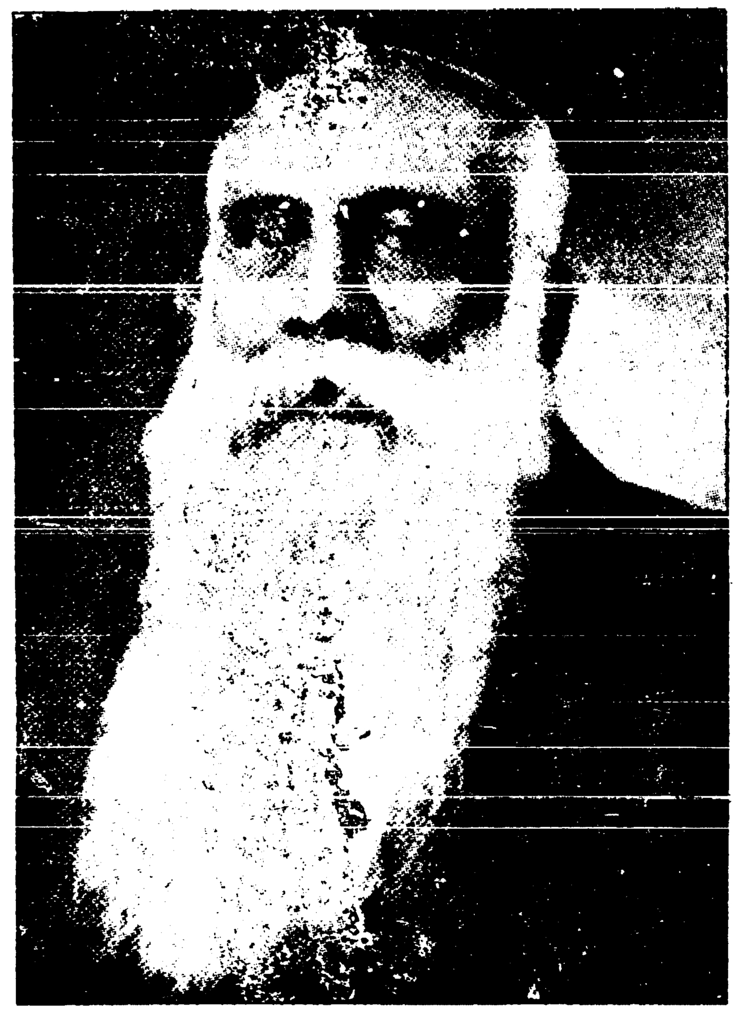

(২) নীচের কথাগুলি বলতে কি বোঝায় জান?—

ইয়েন, এস্পার‍্যাণ্টো, ফ্যারাও, মিটার-গেজ্, খরোষ্ঠী।

(৩) নীচের বইগুলির কোন্‌টা কার লেখা?—

আলালের ঘরের দুলাল, মালবিকাগ্নিমিত্র, ফরসাইট্ সাগা, ওথেলো, ডেভিড্ কপারফিল্ড্, টয়লার্স্ অব্ দি সি, প্যান্, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স্, সে, শী।

(৪) এই সঙ্গে কার ছবি দেওয়া হয়েছে?

শেষ জবাব

(শ্রীমতী করুণা মুখোপাধ্যায়)

একটা ছোট্ট গ্রামে বাস করত নিতাই। গ্রামটা ছোট হ'লেও ওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না, শুধু অভাব ছিল গ্রামবাসীর নিজেদের। তবু তারা স্বেচ্ছায় সে অভাব বরণ করে নিত, কিন্তু গ্রামের মায়া কাটিয়ে অন্য গ্রামে যাওয়ার কল্পনা করতে পারত না। গ্রামের

শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকত একটা বুড়ো বট, আর তার পাশ দিয়ে বয়ে চলত একটা ছোট্ট নদী। সেই বুড়ো বটের তলায় দিনের বেলায় আশ্রয় নিত যত পাড়ার ছেলেরা, আর সন্ধ্যা হ'লে জমা হ'ত পাড়ার যুবক আর বৃদ্ধের দল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়ায় সেই গাছের নীচে বসে গ্রামবাসীদের চলত তর্ক, নিন্দা, বিচার—আবার বিচারের নাম ক'রে অবিচারও কম হ'ত না। বুড়ো বট নীরবে সব শুনে যেত, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সাক্ষী দেবার ক্ষমতা ওর ছিল না। এমনি ভাবে গভীর রাত হ'লে যখন সকলে বাড়ী ফিরত, নিতাইও তখন বাড়ী ফিরত।

নিতাইয়ের বয়স যখন এগার তখন আপন বলতে সংসারে ছিলেন মা, আর পৈতৃক ভিটা। সেই মাও গেলেন মারা, রেখে গেলেন শুধু ছোট্ট কুঁড়েখানা। সংসারে যার সত্যিকারের বাঁধন কিছুই থাকে না, দেখা যায়, সে মানুষ জড়িয়ে থাকে মিথ্যা বাঁধনে। নিতাইয়েরও হ'ল তাই। গ্রামের বিয়ে থেকে মড়া পোড়ান অবধি সব কাজেই নিতাইকে না হ'লে চলত না।

সেই গ্রামেই বাস করতেন বেণী খুড়ো। মহাজনের কারবার করে করে বুড়োর শরীরে দয়া-মায়ার লেশ ছিল না। গরীবকে শোষণ করার নেশাটা বুড়োর যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। নিতাই এটা সহ্য করতে পারত না, মাঝে মাঝে এই নিয়ে বুড়োর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে যেত। যে যত ভয়ই দেখাক্, খুড়োকে কেউ এক পয়সাও সুদ ছাড়তে দেখে নি। তবু নিতাই কিছুতেই ছাড়ত না, প্রাণপণে অসহায় গরীবদের জন্য লড়াই করত।

এমনি ভাবে নিতাইয়ের ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে সাতাশ আঠাশ বছর কেটে গেল। কিন্তু নিয়তির এমনি পরিহাস যে এ হেন কাজের লোককেও ভগবান্ এপারের কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দিলেন। এক অন্ধকার রাত্রে, গ্রামের কার জন্য বন থেকে শিকড় আনতে গিয়ে সাপের কামড়ে নিতাই গ্রামের মায়া কাটাতে বাধ্য হ'ল। দু'চার দিন সকলেই নিতাইএর জন্য একটু দুঃখ করল, আর এ অবিচারের জন্য দোষ দিল ভগবান্কে। এরই বছর খানেক পরের কথা বল্ছি।

সেদিন ছিল খুব বাদলা, চারিধারে কেমন থম্থমে ভাব। পথঘাট জনহীন। এমনি দিনে আর কেউ ঘর থেকে বের না হোক্, খুড়ো কিন্তু বেরিয়েছিলেন টাকার তাগাদায়। ওপাড়ার হারাণ পরামাণিকের সুদের দায়ে ঘটি-বাটী সব বাঁধা পড়েছিল খুড়োর কাছে, তাই সে সব আদায় ক'রে খুড়ো ঘরে ফিরছিলেন আপন মনে। বুড়ো বটের কাছে এসে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, নিতাই সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে খুড়োর মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হ'ল। ভাল করে আবার তাকাতেই দেখেন, নিতাই বড্ড খুসি হয়ে খুড়োর কাছে এগিয়ে আসছে।

নিতাই কাছে এসে, একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল, "এ কি, খুড়ো যে! সব ভাল তো?"

খুড়ো আমতা আমতা করে বল্লেন, "হ্যাঁ, বাবা, আমি একটু কাজে এদিকে গিয়েছিলাম, এখন বাড়ী ফিরছি। তা বাবা, তুমি কি মনে ক'রে এখানে?"

নিতাই হেসে বল্ল, "জানেনই তো খুড়ো, আমি আবার কাজ ছাড়া একদণ্ড বসে থাকতে পারি না, তাই যমরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাজে আমায় লাগিয়ে দিয়েছেন। যখন যাকে আনার দরকার হয়, আমিই সেখানে ছুটে যাই।"

শুনে খুড়োর তো আরও ভয় ঢুকে গেল, অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বাবা নিতাই, আজ তুমি কাকে আনতে যাচ্ছ?" বলেই ভয় হ'ল যে হয়তো তাঁকে নিয়েই টানাটানি করবে যাবার জন্য।

নিতাই বল্লে, "আজ ওপাড়ার হারাণ পরামাণিককে নিতে এসেছি। আজ আপনি ওর যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে আনায় ওর মনে বড্ড আঘাত লেগেছে, সেই দুঃখে ও শুয়ে পড়লে পর, আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসব। লোকে আপনার কত দোষই দেবে কাল, কিন্তু ওরা তো জানে না যে আজ আমার সঙ্গে ওকে যেতেই হ'ত, আপনি একটা উপলক্ষ্য মাত্র!"

এ কথা শুনে খুড়োর বড় আনন্দ হ'ল, সব ভয় উড়ে গেল; একটু এগিয়ে এসে তিনি বল্লেন, "দেখলে বাবা নিতাই, লোকে কত অযথা দোষ দেয় আমায়? আরে, আমার এত কষ্টের পয়সা, এর থেকে কি একটা পয়সা ছাড়লে চলে? যার যা অদৃষ্টের লিখন তার তা হবেই, আমায় দোষ দিলে চলবে কেন? ঠিক বলেছ বাবা, তোমার এমন জ্ঞানের কথা শুনে বড় আনন্দ হ'ল।"

নিতাই হেসে বল্লে, "সত্যি খুড়ো, মানুষ তা বোঝে কই? এই মৃত্যুর জন্যও অন্যকে কত দায়ী করে, অথচ বোঝে না যে এর উপর মানুষের এতটুকুও হাত নেই!"

খুড়ো এবার আর একটু হেসে কাছে এসে বল্লেন, "বাবা নিতাই, সত্যি করে বল না, আমায় কবে নিতে আসবে?"

নিতাই দুঃখের সঙ্গে জানাল যে সে খবরটা এখনও সে খোঁজ করে নি। খুড়ো নিতাইকে ধরে বসলেন যে তাঁকে নিয়ে যাবার বছর খানেক আগে তাকে সঠিক খবর দিয়ে যেতে হবে, এবং সেই বুঝে তিনি এপারের কাজ গুছিয়ে নিতাইয়ের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। নিতাই এ কথায় রাজি হয়ে চলে গেল, আর খুড়োও নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলেন। কেউ যে আর ফাঁকি দিয়ে তাঁর সুদ আটকে রাখতে পারবে না এটা ভেবে তাঁর বড় আনন্দ হ'ল।

এইভাবে কয়েক মাস কাটবার পর হঠাৎ একদিন খুড়োর প্রবল জ্বর দেখা দিল, এবং সেই জ্বর ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করল; কিন্তু খুড়ো নিশ্চিন্ত মনে রইলেন। কারণ নিতাইকে না দেখা অবধি তাঁর কোনও ভয় নেই। কাজেই, ডাক্তার-কবিরাজকে অযথা পয়সা দেওয়ার কোনই দরকার দেখা যায় না।

সেদিন তখন অল্প অল্প সাঁঝের আঁধার এসে ঘর ছেয়ে ফেলছে, এমনি সময়, হঠাৎ খুড়ো চোখ মেলে দেখেন, নিতাই তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে। দেখেই খুড়োর মনটা কেমন বিরক্তিতে ভরে গেল, তবু অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে, নিতাই যে! খবর দিতে এলে নাকি?"

"আজ্ঞে না, আজ আপনাকে নিতে এসেছি।"

"কি বল্‌লি, হতভাগা, আমায় নিতে এসেছিস্! তুই না বলেছিলি যে আমার যাবার কিছুদিন পূর্ব্বে খবর দিয়ে যাবি?" খুড়ো রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নিতাই একটু কাঁচুমাচু হয়ে বল্‌লে, "আজ্ঞে, আমি তো খবর দেবার কথা যমরাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তা তিনি বল্‌লেন যে বহু পূর্ব্বেই নাকি আপনাকে প্রস্তুত হবার খবর দেওয়া হয়েছে।"

"মিথ্যা কথা, আমায় কেউ এসে বলে যায় নি, আমি কিছুতেই তোর সঙ্গে যাব না।" বলে খুড়ো রাগে কাঁপতে লাগলেন।

নিতাই বল্‌লে, "আজ্ঞে, তিনি বল্‌লেন যে জরা, বার্দ্ধক্য বহু দিন পূর্ব্বেই আপনার শরীরে প্রবেশ করেছে। তারাই তো তাঁর দূত। তারা শরীরে ঢুকলেই মানুষের সাবধান হওয়া উচিত, সকল কাজ গুছিয়ে রাখা কর্ত্তব্য। আগে তারা এসে কালো চুলের গোছায় সাদা ছোপ ধরিয়ে দেয়, পরে গায়ের চামড়া শিথিল করে দেয়, শরীরের শক্তি করে দেয় ক্ষয়। তবু যদি মানুষ না বোঝে তবে আর তাঁর দোষ কি? আপনার তো সে সবের কোনটাই বাদ যায় নি? তবে? আমার উপর মিছে দোষ দিচ্ছেন আপনি।"

খুড়ো কি বলতে গেলেন, কিন্তু বলা আর হ'ল না; নিতাইএর নির্দ্দেশে তার আর কয়েকটি সঙ্গী এসে খুড়োকে তুলে নিল।

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

তিন

যে বিরাট্ নীরবতা নেমেছিল রণজিৎদের বসবার ঘরে, বহুক্ষণ পরে সে নীরবতা ভাঙ্গল ওদের বাড়ীর বাইরে একটা মোটার থামার শব্দে।

সকলেই ভীষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল। মীরা উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, সত্যিই তাঁদের বাড়ীর সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড মোটার এসে থেমেছে। মোটার থেকে নামলেন একটী ভদ্রলোক; একটু এগিয়ে আসতেই তাঁর মুখে রাস্তার গ্যাসের আলো এসে পড়ল। মীরা সেই আলোতে তাঁর মুখটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল; পেয়ে সে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে,— "না, অজুদা নয়।"—বলে সে ধীরে ধীরে এসে আবার নিজের জায়গায় বস্‌ল।...কিন্তু, আশ্চর্য্য! সেই ভদ্রলোকটীই যে সটান তাদের বাড়ীর ভিতর ঢুকে হল্ ঘরের ভিতর দিয়ে বসবার ঘরের দিকে আস্‌ছেন!

ভদ্রলোক আস্‌তেই সকলের মধ্যেই একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল—একজন অচেনা লোক, কিছু না বলে কয়ে সোজা একেবারে বাড়ীর মধ্যে!

বিজয় বাবু একটু গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—"কি দরকার আপনার? কাকে চাই?"

ক্লান্তস্বরে উত্তর এল কেবল—"কাকাবাবু, আমি অজু—"

এক তীব্র বিস্ময়ে সকলে একেবারে নির্ব্বাক্ হয়ে গেল। খানিকক্ষণের জন্য সকলে বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে রইল অজয়ের মুখের দিকে—মনে হ'ল সকলে যেন একেবারে জমাট পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—এ যে অসম্ভবেরও বেশী কিছু! অজয়ের সে স্বাস্থ্য কোথায়? সে

সৌন্দর্য্য কোথায় ? তার সে সুন্দর সুগঠিত চেহারা একেবারে শীর্ণ হয়ে গেছে—গায়ের রং গেছে কালো হয়ে, গাল দুটী ব'সে গেছে, চোখের দৃষ্টি গেছে কি রকম নিষ্প্রভ হয়ে ; সমস্ত কপালে পড়েছে অসংখ্য চিন্তার রেখা। কতদিন যে সে কামায় নি—কতদিন যে তা'র চুলে পড়ে নি তেল—তা কে বলবে !

বিস্ময়ের ঘোর একটু কেটে যেতেই বিজয় বাবু অস্ফুটস্বরে বল্লেন, "অজু, এ রকম চেহারা হয়ে গেছে কি করে তোমার ? এ যে কল্পনার অতীত !" ভুলে গেলেন তিনি রণজিৎ আর ইরার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে, যার জন্তে সকলেই এতক্ষণ ছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে।

অজয় একটু ম্লান হেসে শুধু বল্‌লে, "অসুখ করেছিল কাকাবাবু, তা ছাড়া জাহাজে ঘুরেছি সমানে, কাজেই—" বলে মীরার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "বোন্‌টী, আমাকে এক কাপ্‌ চা করে দাও না।" বলে, বস্‌ল সে সামনের একটা কৌচে এতক্ষণ পরে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মীরা এক কাপ্‌ গরম চা তৈরী করে এনে দিল অজয়কে।

অজয় চায়ের কাপ্‌টী শেষ করে মাটীর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কেউই আর সাহস পেল না অজয়কে রণজিৎ আর ইরার কথা নিজে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে।

অজয় একটু পরে নিজে থেকেই সুরু কর্‌লে,—

"অনেকখানি আশা মনের মাঝে নিয়েই সেদিন এখান থেকে জাহাজ ছাড়ি। ভেবেছিলাম দেখা ওদের মিল্‌বেই। দিনের পর দিন তাই ঘুরলাম প্রত্যেক দ্বীপ উপদ্বীপে। প্রত্যেক জায়গায় নেমে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ওদের—কিন্তু কোনও খোঁজই পায় নি। প্রথমটায় একটা 'প্ল্যান' করে ম্যাপ দেখে ঘুরছিলাম। কিন্তু, যতই নিরাশ হ'তে লাগলাম ততই আমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলা কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত তাই জাহাজটী চালান হ'তে লাগ্‌ল অনির্দ্দিষ্টভাবে—কখনও পূর্ব্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও উত্তরে কখনও বা দক্ষিণে। যেখানেই কোনও স্থল পাই সেখানেই জাহাজ লাগাই। সে যে কোন্‌ জায়গা তার কোনও ঠিক নেই—শুধু খোঁজা আর খোঁজা ! এমনি ভাবে কাটল কতদিন কে জানে—দিনরাত্রির হিসাব ত কেউ রাখতাম না। একদিন একটা দ্বীপ দেখ্‌তে পেলাম দূর থেকে ; অভ্যাসবশতঃ সেটার কাছেও জাহাজ বাঁধলাম, নৌকা নামিয়ে পৌঁছুলাম দ্বীপটীতে। কিন্তু মহা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—বুকটা নেচে উঠ্‌ল আনন্দে – মহা আনন্দে। হয়ত এতদিন পরে ওদের দেখা মিল্‌ল। ঐ ত রণজিতের লাইট প্লেনখানি রয়েছে পড়ে—ভেঙ্গে গেছে জায়গায় জায়গায়, কিন্তু চুরমার হয় নি মোটেই ত ! এগিয়ে গেলাম—একেবারে এরোপ্লেনটীর কাছে। কাকেও দেখ্‌তে পেলাম না, চীৎকার করে ডাকলাম—'রণু, ইরা !'—কোনও উত্তর পেলাম না। ভাবলাম, কি হ'ল ! কোনও বিপদ্‌ ঘটে নি ত ওদের ! কোনও বন্য জন্তু—! কিন্তু সে ভাবনা তক্ষণি গেল চলে কারণ কাছেই দেখলাম—

রণজিতের আর ইরার পাইলটের পোষাক রয়েছে খোলা—এমন কি ওরা যে খাওয়া-দাওয়া করেছে ওখানে তারও যথেষ্ট চিহ্নই বর্ত্তমান রয়েছে সেখানে। ইরার আর রণজিতের রাতের কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত রয়েছে ছাড়া—এরোপ্লেনটার মধ্যে। মনে করলাম, নিশ্চয় গেছে কোথাও—হয়ত আহারের খোঁজে, কিংবা অন্য কোনও প্রয়োজনে—এক্ষুণি আস্‌বে ওরা। এক ঘণ্টা কেটে গেল, দু' ঘণ্টা কেটে গেল, তিন ঘণ্টা কেটে চার ঘণ্টা কাট্‌তে চল্‌ল। মনটা আবার এক অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠ্‌ল।..ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌লাম ; হঠাৎ দেখি, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার কাছেই, এরোপ্লেনের উপরে রয়েছে একটা ডায়েরী পড়ে। তুলে নিলাম সেটা ; সেটার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত শুধু তাড়াতাড়ি উল্‌টে গেলাম একবার ; শেষ পাতায় দেখি লেখা রয়েছে—'যদি কোনও দিন আমার আপনার কেউ আসে এখানে তারই জন্য রেখে গেলাম ডায়েরীর এই ক'খানি পাতা—'

"এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্‌লাম সমস্ত ডায়েরীটা। তার পরে যে কতবার সেটা পড়েছি তা বলতে পারি না।"

একটু থেমে অজয় বল্‌লে, "ফিরবার সময় কোথায় যে সে ডায়েরীটা গেল কিছুতেই তা ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। যতখানি মনে আছে ততখানিই বল্‌ছি, রণুরই ভাষায়—

"...শত আনন্দ কোলাহল ও বিদায়-অশ্রুর মাঝে উড়ল আমাদের প্লেনখানি ; ইরার হাতে প্লেন-কণ্ট্রোলের ভার। সেদিন তখন ইরার মুখে সে কি উত্তেজনা আর কি খুসীর রংই না লেগেছে ! মনটা আমারও গান গেয়ে উঠ্‌ল আনন্দে। আমার অত আদরের বোন্‌টী ; তার সে আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে ভুলে গেলাম নিজের স্পীডের রেকর্ড করার কথা। ঠিক কর্‌লাম, এবার এমনি যাই বেড়িয়ে, দু' চারটে দেশ দেখে। নতুন নতুন 'এরোড্রোমে তা হ'লে নাম্‌বে আমাদের প্লেনখানি, নতুন নতুন এরোড্রোম থেকে আবার উড়বে সেটী। ইরার খুসীর তা হ'লে আর অন্ত থাক্‌বে না—নিজের জীবনকে ও ধন্য ব'লে মান্‌বে। এর পরের বার আমি নয় আস্‌ব একা,—স্পীডের রেকর্ড কর্‌তে।

"অত আনন্দের মাঝে তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে আলোর পিছনেই লুকিয়ে থাকে অন্ধকার, আনন্দের পিছনেই থাকে বিপদের সম্ভাবনা।

"কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ প্রকাণ্ড কি একটা উড়ে এল প্লেনটীর সামনে। প্লেনটীর প্রপেলারের সঙ্গে ধাক্কাও লাগল সামান্য। প্লেনটা গেল কাৎ হয়ে—ইরা কোনও রকমে সামলে নিল বটে কিন্তু ভয়ে তার মুখ তখন পাংশু হয়ে গেছে। সে ত কোনও দিন এ রকম লম্বা পাড়ি দেয় নি, কি জান্‌বে সে এ বিপদের কথা ! এ বিপদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও

পরোক্ষভাবে আমার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে! চমকে উঠলাম আমি। সর্ব্বনাশ, মনে হ'ল ঈগলের মত কি একটা প্রকাণ্ড পাখী প্লেনখানির পাশ দিয়ে উড়ে গেল আবার সামনের দিকে। ভারতের যে কোনও বিমানচারীই যে এ বিপদ্‌কে দারুণ ভয় করে। কত এরোপ্লেনের কাঠের প্রপেলার ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে বড় বড় শকুনি বা ঈগলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে। কত ধাতুর প্রপেলার বেঁকে দুম্‌ড়ে গেছে!

"পাখীটা তারই শত্রু ভেবেছে আমাদের প্লেনখানিকে—ভয় পেয়ে তাই আক্রমণ করেছে হয়ত। ইরার সে দিশেহারা মূর্ত্তি এখনও মনে পড়ে। এই বিপদে একটী মাত্র উদ্ধারের উপায় আছে। তাই নলের মধ্যে দিয়ে ইরার কাণে বল্‌লাম—"ইরা, শীগ্‌গির প্লেনটাকে আরও অনেক উপরের লেভেলে তোল্"—কারণ, ঐ সব বৃহদাকার পাখীগুলো যখন ভয় পায় তখন ওরা নীচের দিকে নেমে আসে সজোরে। ইরা মুহূর্ত্তের মধ্যে প্লেনখানিকে দু'শ' তিনশ' ফুট উঁচুতে তুলে ফেল্‌ল। পাখীটাকে এবার আর দেখা গেল না।

"আমি ভয় পেলাম এই ভেবে যে ইরা বোধ হয় এর পর আর কন্‌ট্রোল কর্‌তে পারবে না এরোপ্লেনটাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য ওর মনের জোর; আবার তেমনি চালাতে লাগ্‌ল যেমন চালাচ্ছিল আগে। ভীমবেগে উড়ে চল্‌ল আমাদের এরোপ্লেন; বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে পৌঁছুলাম শেষ পর্য্যন্ত বর্ম্মার আকিয়াব সহরে।

"সেখান থেকে উড়ে পৌঁছুলাম রেঙ্গুন। রেঙ্গুনে কাটালাম একদিন মহা আনন্দে। তার পর আবার ছাড়লাম রেঙ্গুন। রেঙ্গুন ছাড়বার সময় ঘট্‌ল আমাদের এক ভীষণ বিপদ্। এরোড্রোম ছেড়ে উড়বার সময় আমাদের প্লেনখানির তলদেশের সঙ্গে একটা গাছের মাথার লাগল বেশ একটু ধাক্কা—সমস্ত প্লেনখানি উঠ্‌ল প্রচণ্ড জোরে কেঁপে; ভয়ে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে এল—ভাবলাম হয়ত ইহলীলা আজ এখানেই আমাদের শেষ হ'ল। যাই হোক, সে ফাঁড়া কাটিয়ে এরোপ্লেনটী উর্দ্ধে উঠে গেল। ইরা এবারও সারথি এ বায়ুরথের।

"এর পর আমাদের গন্তব্য স্থান হ'ল শ্যামের রাজধানী ব্যাংকক্। মেঘে-ঢাকা পর্ব্বত-শ্রেণীর পরপারে সে দেশ। সেই পর্ব্বতশ্রেণী পার হওয়ার জন্য ইরাকে প্রায় এগারো হাজার ফুট উপরে উঠাতে হ'ল তার রথটীকে—এত উঁচুতে উঠেও কিন্তু পাতলা কুয়াসা আর বৃষ্টি আমাদের পথরোধ করল হঠাৎ। পথ দেখ্‌তে না পেয়ে আন্দাজে চালানোর মত বিপদ্ আর নেই এ সব ক্ষেত্রে। কিছুক্ষণ আমরা চল্‌লাম এক রকম আন্দাজে—খানিকক্ষণ চলার পর মনে হ'ল পর্ব্বতশ্রেণী পার হয়ে এসেছি আমরা। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে প্রায় সাত হাজার ফুট নীচে নেমে এলাম। কিন্তু নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সামনে কালো মত কি একটা রয়েছে দেখা গেল। ইরা ক্ষিপ্রগতিতে প্লেনটীকে দিল ঘুরিয়ে। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে সে কালো

মত পদার্থটী আর কিছুই নয়—সাদা মেঘের অল্প ফাঁক দিয়ে পৃথিবীর খানিকটা দেখা যাচ্ছিল; সাদা মেঘের তুলনায় পৃথিবীর বুক তাই অত কালো দেখাচ্ছিল। আরও খানিকটা নীচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের স্তরও শেষ হয়ে গেল। এবার সামনে সেগুন বন—বহু দূর ধরে চলেছে সে বন। সেই বনভূমি পার হয়ে শেষে পৌঁছুলাম 'ব্যাংকক্'এ।

"ব্যাংকক্ ছাড়ার পরই দেখা মিলল মালয়-উপদ্বীপের। মালয়-উপদ্বীপ ধরে চল্‌লাম্ সিঙ্গাপুর অভিমুখে। হঠাৎ আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি—বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই বাড়্‌তে বাড়্‌তে দারুণ অবস্থায় এসে দাঁড়াল। ইরা আকুলভাবে বল্‌ল আমাকে—'ছোড়দা ভাই, আমি যে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সামনে সব কিছু যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে; নামাব প্লেন? না হ'লে যদি দিক্ ভুল হয়ে যায়?'

"আমি বল্‌লাম—'এখানে প্লেন নামাবার কোন উপায়ই নেই। এর নীচে গভীর জঙ্গল; অতি বড় সাহসী 'পাইলট্'ও এখানে 'প্লেন্' নামাবার কথা ভাবতে পারে না। চেষ্টা করে দৃষ্টি ঠিক রাখ্ বোন্‌টী; ভয় নেই, চালা। সিংগোরায় গিয়ে নাম্‌ব আমরা।'

"চল্‌ল আমাদের এরোপ্লেন—দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই। সিংগোরায় পৌঁছুলাম শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু, এরোড্রোমে যখন নাম্‌ল আমাদের এরোপ্লেন তখন দেখলাম যে এরোড্রোমটী একেবারে বৃষ্টির জল জমে জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। অদ্ভুত দক্ষতা ইরার! আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমি নিজে অত সুন্দরভাবে নামাতে পারতাম না প্লেনখানিকে। আমার কাছে হ'লে হয়ত উল্‌টে যেত সেটা।

"যাই হোক, ঠিক কর্‌লাম, রাত্রিটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন যাত্রা করব সিঙ্গাপুর অভিমুখে। বড় ক্লান্তি আসছিল। ইরারও দেখলাম ক্লান্তি এসেছে বেশ। কিন্তু দেহে ক্লান্তি এলেও মনে ওর একটুও ক্লান্তি নেই।

"আমি বল্‌লাম—'কেমন জব্দ, আর ছোড়দার সঙ্গে এরোপ্লেন চালাবি! কি বলিস্—এবার আমি চালাব?'

"ইরা হিটলারী ভঙ্গিতে বল্‌ল—'জব্দ কিসের? আমার ত দারুণ স্ফূর্ত্তি হচ্ছে। তুমি চালাবে কি? মনে নেই, কথা দিয়েছ সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত চালাব আমি? সিঙ্গাপুর গিয়ে তোমার হাতে প্লেন ছেড়ে দেব—বুঝ্‌লে?'

"আমি হেসে বল্‌লাম, 'বেশ বীরনারী, তাই হ'বে। এখন এস, একটু কিছু খেয়ে রাত্রিটা একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

"খাওয়া শেষ ক'রে শুয়ে পড়লাম, অল্পক্ষণ পরে দু'জনেই পড়লাম ঘুমিয়ে।

"রাত্রি তখন কত জানি না—হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি, ইরা ডাক্‌ছে—'ছোড়দা, ছোড়দা—'

"আমি চম্‌কে উঠে বস্‌লাম, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কি হয়েছে, ইরা ?' .

"ইরা বেশ একটু ভীতভাবেই বল্‌লে—'ছোড়দা, বাইরে কি রকম একটা শব্দ হচ্ছে—শুন্‌ছ ?'

"কাণ পেতে শুনলাম—সত্যিই, বহু দূর থেকে একটা সোঁ সোঁ শব্দ যেন ক্রমশঃই এগিয়ে আস্‌ছে আমাদের দিকে। শব্দটা যেন ক্রমশঃই বাড়ছে—

"ইরা ব্যাকুল হয়ে বল্‌ল—'ছোড়দা, দারুণ ঝড় আসছে। এরোপ্লেনটার কিছু ক্ষতি হ'বে না ত ?'

"আমার বুকটা তখন কাঁপ্‌ছে ভয়ে। ঐ সর্ব্বনেশে ঝড়ের সঙ্গে এর আগেও আমার পরিচয় হয়েছে দু'-একবার। কোন কথা না বলে ছুটে বা'র হয়ে পড়লাম ; ইরাও বা'র হয়ে এল আমার পিছনে পিছনে।

"ইরা বল্‌লে—'ছোড়দা, কি করে বাঁচাবে প্লেনখানাকে ?'

"আমি বল্‌লাম—'মাটীর সঙ্গে কোনও রকম করে ওকে আটকাতে হবে—নইলে ঐ সর্ব্বনেশে ঝড়ে আমাদের এত সাধের প্লেনখানিকে উল্‌টে-পাল্‌টে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যাবে।'

"সারারাত্রি চল্‌ল উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা। সমস্ত রাত্রি ধ'রে চল্‌ল আমাদেরও প্রাণান্তকর চেষ্টা শুধু ঐ প্লেনখানিকে কোনও রকমে মাটীর সঙ্গে আটকে রাখবার জন্ম।

"ভোর হওয়ার একটু আগে ঝড় গেল থেমে ; বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়ছে ! সমস্ত রাত্রি ভিজেছি দু'জনে। ইরাকে কত বার বলেছি—'ইরা, তুই যা, কাপড়-চোপড় বদলে শুয়ে পড়্ গে।' ইরা তার উত্তরে কিচ্ছু বলে নি—একটু হেসেছে কেবল। এই বিপদের মাঝে সে তার দাদাটীকে একা ফেলে চলে যাবে—শুধু তা'র নিজের জন্ম—এতখানি ভীরু সে নয়।

"মনে পড়ে—মনে পড়ে সে রাত্রির ইরার সে মূর্ত্তি। পুরাণে পড়েছি, ইতিহাসে পড়েছি বহু বীরনারীর কথা, আমার এ আদরের ছোট বোনটীর সে মূর্ত্তি মনে পড়্‌লে তাদের কারো তুলনায় তাকে ছোট বলে মনে হয় না। সে কি প্রলয়ঙ্করী রাত্রি ! বৃষ্টি নেমে আস্‌ছে ধরার বুকে জলপ্রপাতের মত। ঝড়ের সে কি ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ! আকাশের বুক চিরে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মাঝে মাঝে বজ্রধ্বনিতে পৃথিবীর বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্য্যোগের সাথে লড়ছে সমানে ইরা—আমার পাশে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে তা'র সর্ব্বাঙ্গ গেছে ভিজে, ঝড়ের ঝাপটায় কত বার তা'র দেহকে দিচ্ছে মাটীর বুকে লুটিয়ে, কত বার তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে আছড়ে ফেলেছে ঐ কঠিন ধাতুময় এরোপ্লেনের গায়ে, কত আঘাত যে সে পেয়েছে, কত জায়গায় যে তা'র গেছে কেটে ! কাদায় হাত পা চোখ মুখ ভর্ত্তি হয়ে গেছে অথচ কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই তার এ সবে ! তবুও, তবুও অদম্য তা'র তেজ ; কি তা'র সাহস, কি তার শক্তি, কি তা'র দৃঢ়তা ! ছোট্ট

বোন্‌টী আমার ! ননীর মত কোমল তার দেহ, কুসুমের মত পেলব তার বাহু দুটী—সেই দেহে, সেই বাহুতে আজ যেন নেমেছে মহাশক্তির প্রভাব ! আমার নিজের শক্তি, সাহস আর মনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে মনে মনে ছিল দারুণ এক গর্ব্ব ; কিন্তু, আজ সে গর্ব্ব ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌ল ছোট বোনটীর শক্তি, সাহস আর দৃঢ়তার কাছে। অত বিপদের মাঝেও বুকটা আমার ফুলে উঠ্‌ল গর্ব্বে, আনন্দে, এই ভেবে যে ও ত আমারই বোন—আমারই হাতে গড়া প্রিয় শিষ্যা।

"সকাল বেলা ও পড়ল ঘুমিয়ে ; যুদ্ধে বিজয়িনী পরিশ্রান্তা বীর নারীর মত দেখাচ্ছিল ওকে। যখন ওর ঘুম ভাঙ্গল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

"পর দিন ছাড়লাম সিংগোরা—ইরার হাতেই রইল প্লেন-কণ্ট্রোলের ভার।

"সিঙ্গাপুরের পথটুকু বেশ ভাল ভাবেই কাটল। নিরাপদে পৌঁছুলাম।

"সিঙ্গাপুরে কাটালাম দু'দিন ঘুরে ঘুরে। তার পর কিছু পেট্রোল কিনে নিয়ে ছাড়লাম সিঙ্গাপুর। এবার ইরা ছেড়ে দিল আমার উপর এরোপ্লেন কণ্ট্রোলের ভার। এবার আমিই লাগলাম এরোপ্লেন চালাতে।

"অনেকখানি আশা আর আনন্দ নিয়েই সিঙ্গাপুর ত্যাগ কর্‌লাম কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে আমাদের জীবনের যা কিছু আনন্দ তা নিঃশেষ হয়ে গেল সেইদিনই।

অষ্ট্রেলিয়া আর সিঙ্গাপুরের মধ্যে প্রায় দু'হাজার মাইল বিস্তৃত মহাসাগর। তার মাঝে মাঝে দ্বীপের সারি—তা'দের উপর দিয়ে উড়ে চল্‌ল আমাদের প্লেনখানি। বেশ চলেছি, হঠাৎ সামনে দেখি ঘন কুয়াসার জাল বোনা। আমার প্রতি ধমনীর মধ্যে রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেল—মহা এক আশঙ্কায়। কি সর্ব্বনাশ ! কুয়াসার মধ্যে কি করে চল্‌তে হয় জানি—জানি, কি করে এরোপ্লেনের 'লেভেল' আর 'ব্যালান্স্' ঠিক রাখ্‌তে হয়, কি সাবধানতা অবলম্বন কর্‌লে প্লেনের মুখ নীচু হয়ে একেবারে মাথা গুঁজে 'ডাইভ্' না দেয়—কি উপায় অবলম্বন কর্‌লে প্লেনের পাখা কাৎ হয়ে না পড়ে ; 'হোরাইজন্'—মানে দিক্‌চক্রবালের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয় এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু এই কুয়াসা যদি সমানে চলে তা হ'লে কোন্ দিকে যাব—দিক্ ঠিক কর্‌ব কি করে ? এই মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে চলেছি, কোথাও নামবারও ত উপায় নেই ; তা হ'লে যে সলিল-সমাধি !

"যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। দু'দিন দু'রাত্রি কেটে গেল, কুয়াসা কাট্‌ল না। সমানে চালাতে লাগলাম কুয়াসার মধ্যেই—যদি অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে পারি। সময় কেটে যেতে লাগ্‌ল হু-হু করে। তিন দিন পরে কুয়াসা কেটে গেল কিন্তু তখন দেখলাম যে আমরা দিক্ ভুল করে অন্ত কোন দিকে চলে এসেছি ! এ কি কর্‌লাম ! নিজের জন্ত ভাবি নে, মৃত্যুকেও ভয় করি নে।

কিন্তু ইরা, আমার অত আদরের বোন—ইরা! ওর জীবনও কি শেষ হ'বে আমার সঙ্গে? নীচে ঐ বিস্তৃত জলধি—কোথাও ত স্থলের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি না! শেষ পর্য্যন্ত হয়ত সলিল-সমাধিই হ'বে আমাদের। যাই হোক, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে চালাতে লাগলাম এরোপ্লেন। যতক্ষণ পেট্রোল না ফুরোয় ততক্ষণ ত চালাই, খুঁজে দেখি এদিক্ ওদিক্, যদি কোথাও স্থলের দেখা মেলে। দেখা মেলে যদি তা হ'লে হয়ত জীবনরক্ষা হ'তে পারে—নইলে মৃত্যুই হ'বে আমাদের এ অভিযানের পরিণতি—"

এই পর্য্যন্ত বলে অজয় থাম্‌ল। চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। একটু পরে দেখা গেল অজয় ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে। কেউ আর তা'কে জাগিয়ে বিরক্ত কর্‌ল না। ললিতা তার গায়ে একটা চাদর দিয়ে দিলেন; তার পর আস্তে আস্তে সকলে বার হয়ে গেলেন আলোটা নিভিয়ে দিয়ে।

(ক্রমশঃ)

ছুটির কয়েক দিন

[ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এস সি (ক্যাল্), পি-এইচ.ডি (ক্যান্টাব্)]

১৯৩৪ সালের কথা। জুলাই মাস। কেম্বিজ একেবারে খালি। গরমের ছুটিতে সবাই হয় বাড়ী, নয়ত অন্য কোথাও বেড়াতে চলে গিয়েছে। বছরের মধ্যে এই সময়ে একটা মাস আমি বরাবরই একটু কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকি। সারা বছর ধরে ল্যাবরেটরীতে একটানা কাজের পর শরীর আর মন দুই-ই একটু ক্লান্ত থাকে—পরিচিত গণ্ডীর বাইরে গিয়ে তারা একটু বিশ্রাম নিতে চায়। কিন্তু এবারে আমার থিসিস পরীক্ষার জন্য আমাকে একটু বেশী দিন কেম্ব্রিজে থাকতে হয়েছিল, কাজেই একটা দল পাকিয়ে যে বেড়াতে যাব, এমন সঙ্গী কাউকে খুঁজে পেলাম না। তখন বেপরোয়া হয়ে ঠিক করলাম যে একলাই বের হয়ে পড়ব। আমার মতন অভাগা যে দু' তিনজন কেম্ব্রিজে পড়ে ছিল, তারা গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু দু'দিনের বেশী তিষ্ঠতে পারবে না, পালিয়ে আসতে হবে। একলা কি বেড়ান চলে! তার চেয়ে সোজা লণ্ডনে চলে যাও, তোফা থিয়েটার, সিনেমা দেখ, আর হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম কর।" কিন্তু এমন

চমৎকার গ্রীষ্মকালটা লণ্ডনের ধোঁয়া আর বৃষ্টির মধ্যে কাটাতে আমি মোটেই রাজী হলাম না। কাজেই টাইম টেব্‌ল, ম্যাপ্ নিয়ে বসে পড়লাম কোথায় যাওয়া যেতে পারে তাই ঠিক করতে।

এটা একটা বিরাট্ সমস্যার কথা ছিল। হাতে টাকা বিশেষ ছিল না, কাজেই ইংলণ্ড ছেড়ে যাবার কথা একেবারে ভুলে যেতে হ'ল। ইংলণ্ডের উত্তর দিক্‌টা অনেকটা ঘুরে এসেছিলাম. কাজেই ঠিক করলাম এবারে দক্ষিণ, পশ্চিম দিক্‌টা ঘুরে আসা যাক্ - আর যত দূর সম্ভব পায়ে হেঁটেই। পায়ে হেঁটে শুনে তোমরা বোধ হয় একটু আশ্চর্য্য হচ্ছ, কাজেই ঐ বিষয়ে একটু খুলে বলা যাক্।

গত মহাযুদ্ধের পর পায়ে হেঁটে নিজেদের দেশ দেখার উৎসাহটা প্রথম জার্ম্মানীতে দেখা যায়। ঐখানে "উড়ো পাখী" (Wander-Vogel) বলে একটা সমিতি গড়া হয়, তার সভ্যেরা ছুটির সময়ে পায়ে হেঁটে সারা দেশ ঘুরে বেড়াত। ইংলণ্ডেও তারই দেখাদেখি যুব-হোষ্টেল দল (Youth Hostels Association) বলে একটি সমিতি গড়া হয়। এই সমিতি থেকে ইংলণ্ডের সুন্দর সুন্দর জায়গায় একটা একটা বাড়ী ঠিক করা হয়, যেখানে সন্ধ্যার পর সমিতির সভ্যেরা রাত কাটাতে পারে।

এই সব হোষ্টেলে শুধু যে সব সভ্যেরা পায়ে হেঁটে কি সাইকেলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদেরই থাকতে দেওয়া হবে, মোটরে করে ঘুরে বেড়ালে এ সব হোষ্টেলে প্রবেশ নিষেধ। সমিতির বছরের চাঁদা হচ্ছে – পঁচিশ বছরের নীচে সভ্যদের আড়াই শিলিং আর তার চেয়ে বড় সভ্যদের পাঁচ শিলিং। প্রতি হোষ্টেলে প্রতি রাত কাটাবার জন্য এক শিলিং করে মাত্র দিতে হয়। এর বদলে হোষ্টেল থেকে বিছানা আর দু'টি করে কম্বল সে রাত্রের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এ ছাড়া রান্না করার বাসনপত্র প্রভৃতিও দেওয়া হয়। হোষ্টেলগুলি রাত্রের বেলায় শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে; সকালবেলা সভ্যদের আবার হোষ্টেল খালি করে দিতে হয়।

আমি বছরখানেক আগে এই যুব-হোষ্টেল-সমিতির সভ্য হয়েছিলাম; কিন্তু

এ পর্য্যন্ত কোথাও পায়ে হেঁটে বেড়াতে যেতে পারি নি। কাজেই এবারে পণ করলাম যে চাঁদার সদ্ব্যবহার করবই করব।

এখন সাজসজ্জা। পায়ে হেঁটে বেড়াতে গেলে ত আর স্যুটকেশ হাতে বার হওয়া যায় না। এর জন্য সাজ চাই। পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবার ব্যাগ—এর নাম হচ্ছে "র‍্যাক্ স্যাক্"। জিনিষটা হচ্ছে একটা "ওয়াটারপ্রুফ" কাপড়ের ব্যাগ, এর গায়ে দুটা লম্বা পকেট আছে। ব্যাগটা একটা লোহার তিন কোণা ফ্রেমের সঙ্গে লাগান থাকে। লোহার ফ্রেমটা লম্বায় ঘাড় থেকে কোমর পর্য্যন্ত। ফ্রেমের উপর থেকে দু'টো চামড়ার বগলেষ আছে, সে দু'টোকে দুই কাঁধের উপর দিয়ে চালিয়ে দিতে হয়; আর ফ্রেমের নীচে দু' দিক্ থেকে বেল্টের মতন দু'টো ষ্ট্র্যাপ্ (Strap) থাকে, সে দুটি কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিতে হয়। এই সঙ্গে পিঠে র‍্যাক্ স্যাক্ বাঁধা একটি যুবকের ছবি দেওয়া গেল। ছবি থেকে তোমরা র‍্যাক্ স্যাকের অনেকটা ধারণা পাবে।

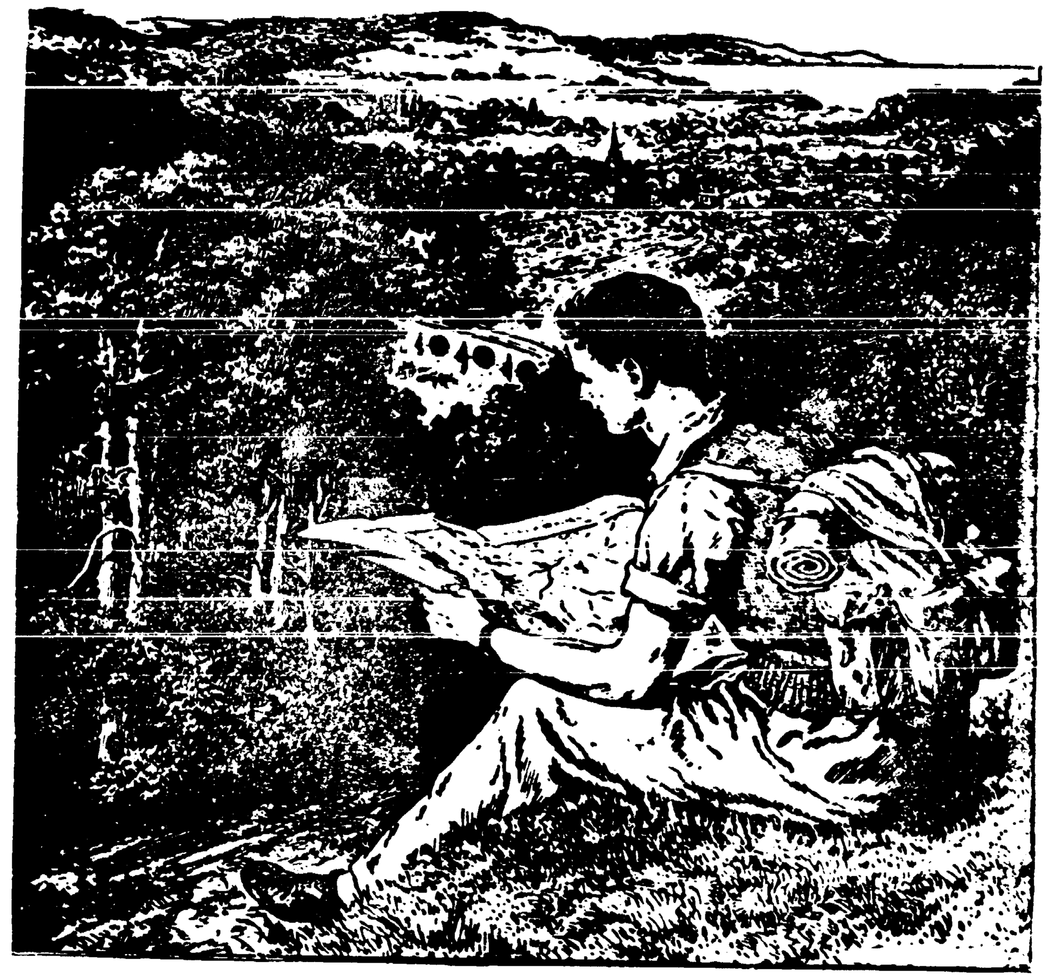

পিঠে র‍্যাক্ স্যাক্ বাঁধা একটি যুবক

সজ্জার মধ্যে হাফ্ প্যান্ট, সার্ট, মোজা—সব দু'টো করে, তা ছাড়া পুলওভার, কোট, আর ওয়াটারপ্রুফ্। এর উপর ম্যাপ, ক্যামেরা প্রভৃতি ত আছেই। সবার উপর একটা স্লীপিং ব্যাগ (Sleeping bag)। হোষ্টেল সমিতি থেকে প্রতি সভ্যকে একটি করে এই ব্যাগ সঙ্গে রাখার হুকুম আছে। এটি কাপড়ের তৈরী একটা ব্যাগ—লম্বায় প্রায় ছ' ফুট। হোষ্টেলে বিছানায় পেতে শুতে হয়। ব্যাগের

ভিতর ঢুকে শোয়ার দরুণ শরীরের কোন অংশ বিছানা অথবা কম্বলের সঙ্গে লাগে না। কাজেই একই কম্বল বা একই বিছানা ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যবহার করাতে কোন ক্ষতি হয় না।

উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হবার পর রওনা হওয়া গেল—মঙ্গলবার ১৭ই জুলাই। প্রথমে লণ্ডন। সেখানে একদিন থেকে তার পরদিন প্যাডিংটন ষ্টেশনে 'কর্নিশ রিভিয়েরা এক্সপ্রেসে' (Cornish Riviera Express) চড়া গেল। যাত্রার প্রথম পর্ব্ব সুরু হ'ল।

কর্নিশ রিভিয়েরা এক্সপ্রেসটি বিলাতের একটি প্রসিদ্ধ ট্রেণ। এটি ইউরোপের সৌখীন (de-luxe) ট্রেণগুলির মধ্যে একটি। এর থার্ড ক্লাস গাড়ী আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়ে ঢের ভাল (ইংলণ্ডের ট্রেণে দুটি মাত্র ক্লাস, ফার্ষ্ট আর থার্ড)। ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল করে চলে, তার মানে পাঞ্জাব মেলের চেয়ে ডবল্ জোরে চলে, আর লণ্ডন ছেড়ে দু'শ' মাইল চলে তবে এ প্রথম থামে।

আমার প্রথম যাওয়ার জায়গা হচ্ছে কিন্তু ওয়েষ্টবেরী (Westbury), লণ্ডন থেকে মাত্র আশী মাইল দূরে। তোমরা হয়ত ভাবছ তবে আমি এ ট্রেণে চড়তে গেলাম কেন—আমার ত ২০০ মাইল গিয়ে আবার ১২০ মাইল ফিরে আসতে হবে! কিন্তু না, আমায় ঠিক ওয়েষ্টবেরীতেই নামিয়ে দেবে। এ ট্রেণের একটা গাড়ী ওয়েষ্টবেরী পর্য্যন্ত যায়। ষ্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে গাড়ীটা চলন্ত ট্রেণ থেকে কেটে দেওয়া হয়। গাড়ীটা চলতে চলতে ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু বাদ বাকী ট্রেণটা উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে চলে যায়। কাজেই আমি যখন ষ্টেশনে নামলাম তখন দূরে একটু ধোঁয়া ছাড়া বাকি ট্রেণের আর কিছুই দেখা গেল না। ভারী মজা, নয় কি!

ওয়েষ্টবেরীতে দেখবার কিছু নেই। এখানে নামার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী ধরে সলস্‌বেরী (Salisbury) যাওয়া। তবু প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, তাই ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে দ্রষ্টব্য কিছু আছে কিনা। শোনা গেল ষ্টেশনের কাছে রোমান্ সিংহ আছে, সেটি বিস্তর লোকে নাকি দেখতে যায়। আমিও সেই শুনে "রোমান্ সিংহ" দেখতে বার হলাম।

কিছু দূর গিয়ে একজন লোককে "সিংহ" কোথায় জিজ্ঞেস করতে সে উপরের দিকে দেখিয়ে দিলে। তাকিয়ে দেখি যে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে খুদে একটা সিংহ আঁকা রয়েছে—অনেকটা তোমরা যেমন ছুরি দিয়ে স্কুলের বেঞ্চে নিজেদের নাম লিখে রাখ। লম্বায় সিংহটি প্রায় কুড়ি ফুট আর আড়ে প্রায় দশ বারো ফুট হবে। দূর থেকে যাতে দেখা যায় তার জন্য সাদা রং করে রাখা হয়েছে। সিংহটি খোদাই হয়েছে প্রায় দু' হাজার বছর আগে, যখন ইংলণ্ড রোমান্‌দের অধীনে ছিল। কিন্তু এই ১৯৩৯ সালেও সে অতি পরিষ্কারই রয়েছে। ইংলণ্ডের বৃষ্টি আর বরফ তার বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি।

পাহাড়ে উঠে সিংহের কাছ পর্য্যন্ত যাবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ফিরে সলস্‌বেরীর গাড়ী ধরতে হ'ল। গাড়ীতে গাইড্‌ বুক পড়ে জানলাম যে ইংলণ্ডের চার পাঁচ জায়গায় নাকি রোমান্‌রা পাহাড়ের গায়ে এই রকম নানা রকম জন্তু জানোয়ারের মূর্ত্তি খুদে রেখেছে। এটা তাদের যুদ্ধে জেতার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার একটা ফন্দি।

সলস্‌বেরী গির্জ্জা

সলস্‌বেরীতে পৌঁছেই ষ্টেশনের বাহিরে গিয়ে সলস্‌বেরী প্রান্তরে (Salisbury plains) যাবার বাসে একটা জায়গা ঠিক করে এলাম। তোমরা হয়ত ভাবছ যে হেঁটে বেড়াবার মতলবে 'যখন বার হয়েছি তখন বাসে চড়ে বেড়ান কেন? এর কারণ হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম মতন সে রাত্রি আমি সলস্‌বেরী থেকে পঞ্চাশ মাইল

দূরে এক জায়গায় গিয়ে থাকব কারণ সলস্‌বেরীতে থাকতে গেলে আর পায়ে হেঁটে সব দেখতে গেলে আমার দু'দিন নষ্ট হবে। কাজেই বাসের ভাড়াতে যা বাঁচাব, তা আমার দু'দিন থাকতে আর খেতে বের হয়ে যাবে'। তোমাদের ত প্রথমেই বলেছি, সস্তায় ঘুরে বেড়ানটা ছিল আমার প্রধান মতলব। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই সব বাসে একজন করে গাইড্‌ থাকে আর সে সমস্ত জিনিষ খুব চমৎকার করে বুঝিয়ে দেয়। হেঁটে গেলেও প্রতি জায়গায় আবার গাইড্‌ ঠিক করে তাকে পয়সা দিতে হবে। বাস্‌ প্রায় এক ঘণ্টা পরে ছাড়বে। কাজেই আমি এর মধ্যে একটা দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে সলস্‌বেরী সহরটা দেখতে বের হলাম। এখানকার গির্জ্জাটি প্রসিদ্ধ আর সত্যই একটা দেখবার জিনিষ। গির্জ্জার জানালাগুলি সবই রঙ্গীন কাচের, আর তাদের উপর খোদাই করা রয়েছে সব খৃষ্টান মহর্ষিদের ছবি। এই জানালার ভিতর দিয়ে সূর্য্যের আলো ঢুকে নানা রঙ্গে গির্জ্জার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, চারিদিকে একেবারে রঙ্গের খেলা হচ্ছে যেন!

বাসের সময় হয়ে এসেছে, কাজেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হ'ল। সলস্‌বেরী ছাড়িয়েই সলস্‌বেরী প্লেন্‌স্‌ (Salisbury plains), তার মধ্যে দিয়ে বাস্‌ চলেছে। চারিদিকে ধূ ধূ করছে তেপান্তরের মাঠ। কে বলবে যে ছ' হাজার বছর আগে এখানে লোকের বসতি ছিল। কিন্তু সত্যই তাই, আর সে সব অজানা দিনের লোকেদের হাতের কাজের স্মৃতিচিহ্ন দেখতেই আমরা যাচ্ছি। স্মৃতিচিহ্নটি হচ্ছে পাথরের গড়া সেকালের একটি মন্দির গোছের জিনিষ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারোটি পাথর গোল করে মাটিতে পোঁতা রয়েছে আর তাদের উপর আড়াআড়ি করে সেই রকম বড় বড় পাথর খিলানের মতন বসান রয়েছে। এই বড় ঘেরের মধ্যে ঠিক ঐ রকম কিন্তু একটু ছোট মাপের আর একটি পাথরের বৃত্ত রয়েছে, আর ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি পাথরের বেদী। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে যে এক একটি পাথর কত উঁচু; আর সেই সঙ্গে মনে রেখ, এর বয়স ছ' হাজার বছরের কম নয়। তখনকার দিনে না ছিল ক্রেন্‌ আর না ছিল মোটর লরী। এই সব ভারী ভারী পাথর বয়ে নিয়ে এসে কি করে যে লাগাল সেইটাই আশ্চর্য্য! এই সমস্ত জিনিষটার নাম হচ্ছে ষ্টোন্ হেঞ্জ (Stone-henge) অর্থাৎ পাথরের বেড়া।

এর ইতিহাস কি? ছ' হাজার বছর আগের কথা ইংলণ্ডের পক্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। এইটুকু জানা যায় যে এই ষ্টোন্ হেঞ্জ ছিল তখনকার দিনের সূর্য্যের মন্দির। এখানে ড্রুইড্ (Druid) বলে পুরোহিতেরা সূর্য্যের পূজা করতেন। এই মন্দিরের অবশ্য আরও উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার দিনে ত এখনকার মতন ক্যালেণ্ডারের সৃষ্টি হয় নি। এই গোল করে বসান বারোটি পাথরের থাম দিয়ে ড্রুইডরা সূর্য্যের চলাফেরার হিসাব রাখতেন আর তখনকার চাষীদের কখন কি ফসল লাগাতে বা কাটতে হবে তা জানিয়ে দিতেন। অবশ্য এর সঙ্গে তখনকার পূজার অনুষ্ঠানের মতন মানুষ বলি প্রভৃতিও হ'ত, আর সে সব পূজা-আর্চ্চা হ'ত ঐ মাঝখানের বেদীটার উপর।

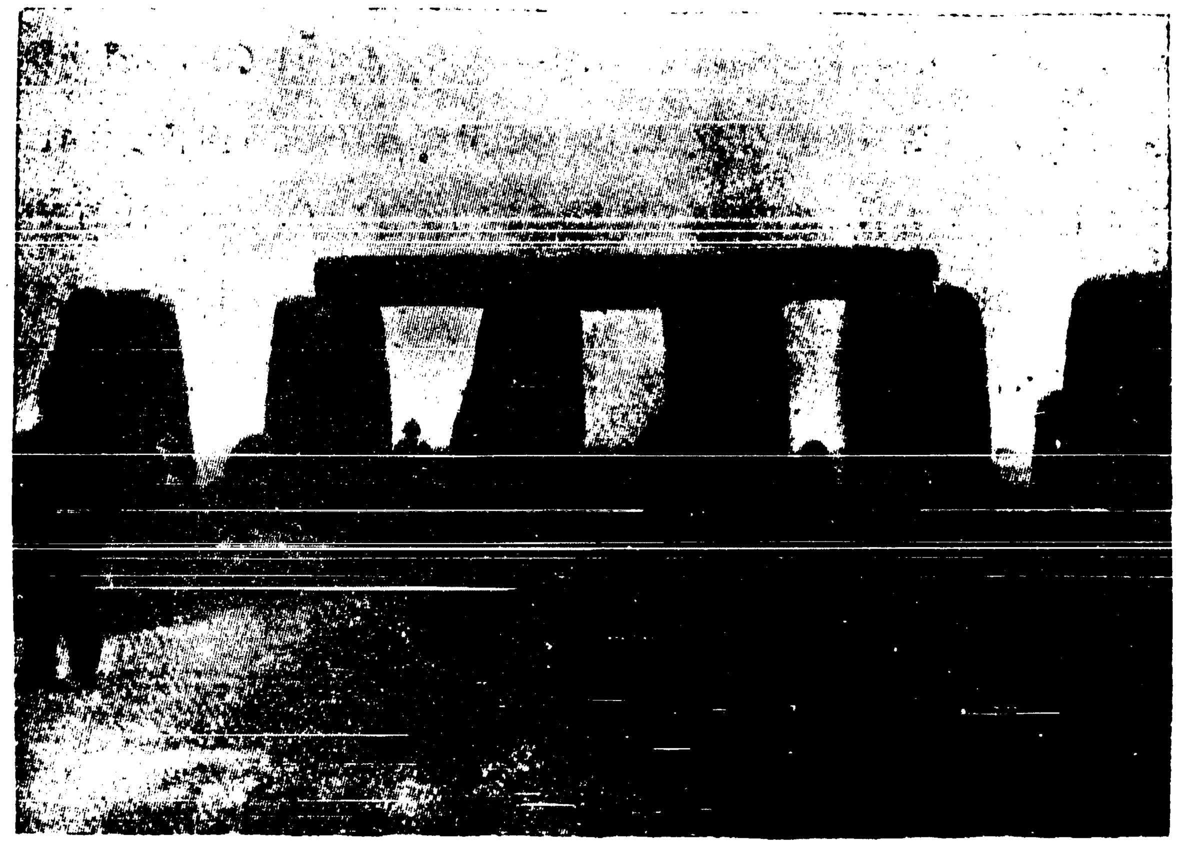
ষ্টোন্ হেঞ্জের ধ্বংসাবশেষ

এ ত গেল ছ' হাজার বছর আগের কথা। এমন কি দু' হাজার বছর আগেও সলস্বেরী প্লেনস্ এ রকম তেপান্তরের মাঠ ছিল না। দু' হাজার বছর আগে ইংলণ্ড রোমানদের হাতে, সলস্বেরীর প্লেনের মধ্যে অনেক জায়গায় রোমান্‌দের বসতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর মধ্যে ওল্ড স্যারাম (Old Sarum) বলে এক জায়গায় একটা রোমান্ দুর্গের কিছু কিছু খুড়ে বার করা হচ্ছে। এই সহর ও দুর্গটি ছিল ঠিক একটি বাটীর মতন দেখতে। সব চেয়ে উপরে, অর্থাৎ বাটীর কানায়, চারিদিক্ ঘিরে ছিল দুর্গ আর তার নীচে, অর্থাৎ বাটীর গায়ের চারিধারে, ছিল সহর। সব চেয়ে নীচে চাষবাস হ'ত আর সেই চাষের জল জোগাত

সহরের যত নর্দ্দামা। সেই সব কবেকার বাড়ীঘরদোরের ধ্বংস কিছু কিছু খুঁড়ে বার করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা সারনাথ বা নালন্দা দেখেছ তারা সহজেই বুঝতে পারবে এগুলি কি রকম দেখতে। অবশ্য খুঁড়ে যা কিছু বার হয়েছে সেগুলি নালন্দা প্রভৃতির তুলনায় নিতান্তই খেলো দরের জিনিষ।

এই সব দেখতে দেখতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল। আমাদের বাসে একজন গাইড্ ছিল, সেই সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল ব'লে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জিনিষ দেখা সম্ভব হ'ল। ওল্ড স্যারাম থেকে আমরা আবার সলস্বেরী ফিরে এলাম। আবার ট্রেণে করে ওয়েষ্টবেরী। সেখান থেকে উইথাম (Witham) হয়ে ওয়েলস্ (Wells) ব'লে সহরে এসে উঠলাম। এখান থেকে ছ' মাইল দূরে উকি হোলস্ (Wookey Holes) ব'লে এক গাঁয়ে যুব-সমিতির হোষ্টেলে সে রাত কাটালাম।

ছুটির প্রথম দিনটা এই ভাবে কাটল। এর পরের ঘটনা বারান্তরে বল্‌ব।

আসছে বৈশাখ থেকে
শিশুসাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
নতুন রহস্যময় উপন্যাস
অমৃত দ্বীপ
ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে প্রকাশিত হবে।

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

[এই বিভাগে পৃথিবীর নানা দেশের নাম-করা বইগুলির সারাংশ প্রকাশিত হবে।]

জ্যাডিগ্

[এই বইটি লিখেছেন ভল্‌টেয়ার। প্যারিসে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ভল্‌টেয়ারের অসামান্ত বিদ্যা-বুদ্ধির কথা সমস্ত পৃথিবীতে সুপরিচিত। তিনি শুধু বড় লেখকই ছিলেন না, বড় দার্শনিক ও সমালোচক বলেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।]

ব্যাবিলন নগরীতে জ্যাডিগ্ নামে একজন যুবক বাস করত। তার বুদ্ধি ছিল খুব, একটি ঘটনা শুনলেই তোমরা তার পরিচয় পাবে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে জ্যাডিগ্ দেখতে পেল যে রাণীর অনুচরেরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কি একটা হারানো জিনিষ খুঁজছে। জ্যাডিগ্‌কে দেখতে পেয়েই প্রধান অনুচর প্রশ্ন করল, 'রাণীর কুকুরটা কোন্ দিকে গেছে জান?'

'সে কুকুরটা কি খুব ছোট?' জ্যাডিগ্ জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

'ঠিক বলেছ।'

'তার কান দু'টো খুব বড় বড়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন্ দিকে গেছে সেটা?'

'আমি সেটাকে দেখি নি কখনও', জ্যাডিগ্ উত্তর দিল, 'আমি জানতামও না যে রাণীর একটা কুকুর আছে।'

অনুচরেরা ভাবল জ্যাডিগ্ নিজে কুকুরটা চুরি করে মিথ্যা কথা বলছে। তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল বিচারের জন্যে। বিচারে জ্যাডিগের নির্ব্বাসন দণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার খোঁজ পাওয়া গেল—জ্যাডিগ্ পেল মুক্তি।

'তুমি কুকুরটার কথা কেমন করে জেনেছিলে তা হ'লে?' প্রধান বিচারক প্রশ্ন করলেন জ্যাডিগ্‌কে, 'তুমি তো বলেছিলে কুকুরটাকে দেখ নি!'

'দেখি নি তো', জ্যাডিগ্ বল্‌ল, 'কেমন করে জানলাম কুকুরটার সম্বন্ধে সে-কথা শুনুন,—বেড়াতে বেড়াতে বালির ওপর পায়ের চিহ্ন দেখে আমি বুঝলাম জন্তুটি খুব ছোট—সামনের পায়ের কাছে দাগ দেখে আমি ধরে নিলাম তার কান দু'টো বড় বড়। এমন সময় অনুচরদের মুখে শুনলাম যে রাণীর কুকুর হারিয়েছে, কাজেই সমস্ত বুঝে ফেললাম।'

কথা শুনে প্রত্যেকে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। জ্যাডিগের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রাজা তাকে প্রধান মন্ত্রী করে নিলেন। জ্যাডিগ্ এই কাজে সাফল্যের পরিচয় দিল। কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের জন্য রাজা তার ওপর ভয়ানক রেগে গেলেন। কাজেই জ্যাডিগ্ সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হ'ল। অনেক ঘুরে, অনেক যায়গায় বুদ্ধি এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়ে জ্যাডিগ্ অকস্মাৎ একজন সাধুর সঙ্গ পেল। সাধুর লম্বা দাড়ি, চেহারা দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়—তিনি একটা বই পড়ছিলেন। জ্যাডিগ্ জিজ্ঞেস কর্‌ল বইটার নাম।

'তুমি পড়বে?' সাধু বইটা জ্যাডিগের হাতে দিলেন। জ্যাডিগ্ বইটা নেড়ে চেড়ে দেখল কিন্তু বুঝতে পারল না এক অক্ষরও।

'কিছু বুঝতে পারছ না, না?' সাধু বল্‌লেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরবে?' সাধু জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'বল, আমার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেই সমস্ত বুঝতে পারবে। ঘুরতে রাজী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'। জ্যাডিগ্ উত্তর দিল।

'বেশ।' তারা দু'জন ভ্রমণ করতে বেরুল।

ঘুরতে ঘুরতে তারা অতিথি হ'ল একজন কৃপণের বাড়ী। লোকটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাদের থাকতে দিল। এই অভদ্রতার জন্যে জ্যাডিগ্ তো চটেই অস্থির। সাধু হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে থাকতে হ'লে কখনও ধৈর্য্য হারিও না।'

তার পর কৃপণের বাড়ী থেকে বিদায়ের সময় সাধু তাকে একটা সোনার বাটি দিলেন এবং বল্‌লেন, 'আপনার ব্যবহারে আমরা খুব খুসী হয়েছি, এই সামান্য উপহার গ্রহণ করুন'। তার পর তারা সেখান থেকে বিদায় নিল। কিছুই বুঝতে না পেরে জ্যাডিগ্ সাধুর পেছন পেছন চলতে লাগল।

কিছু দিন পর তারা এল একজন দার্শনিকের বাড়ীতে। দার্শনিক মশাই অত্যন্ত চমৎকার লোক। তাদের খাতির করে ভেতরে এনে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন এবং থাকবার সুন্দর বন্দোবস্ত করে দিলেন।

শেষ রাত্রে জ্যাডিগ্‌কে ঘুম থেকে তুলে সাধু বল্‌লেন, 'চল, আমাদের এখনই যেতে হবে।' যাবার সময় দার্শনিক মশাইর বাড়ীতে সাধু আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

জ্যাডিগ্ চীৎকার করে উঠল, 'এ কি করলেন আপনি !'

'অবাক হয়ো না, বলছি তোমায় সব। আমারও যাবার সময় হয়েছে তোমার কাছ থেকে, আমার কাজ ফুরিয়েছে।'

'বলুন শীগ্‌গির।' জ্যাডিগ্ চেঁচিয়ে উঠল।

'দেখ', সাধু বলতে লাগলেন, 'সব সময়েই মনে রেখ আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সামান্য কাজেই হঠাৎ কিছু করতে যেও না। তুমি আমাকে এখন দোষ দিচ্ছ আমার কাজের জন্যে কিন্তু শোন কেন আমি ওগুলো করেছি। কৃপণ লোকটাকে আমি সোনার বাটি দিলাম কেন জান? এবার তা হ'লে লোকটা ভদ্র হবে, পাবার লোভে অতিথিবৎসল হবে—ওর পরিবর্ত্তন হবে। বুঝলে?'

'ও !' জ্যাডিগ্ বল্‌ল, 'কিন্তু আগুন লাগালেন কেন?'

'কারণ আমি জানি দার্শনিকের বাড়ীর নীচে গুপ্তধন আছে; বাড়ীটা নষ্ট হয়ে গেলে তবেই সে ওগুলো পাবে, এবং তাতেই তার বেশী উপকার হবে।'

খুসী হয়ে জ্যাডিগ্ বল্‌ল, 'এতক্ষণে সব বুঝলাম।'

'বুঝলে? বেশ। কিছুতেই আশ্চর্য্য হয়ো না; আমি জানি তোমার বুদ্ধি আছে—এ বুদ্ধিকে কাজে লাগিও। মনে রেখ আমাদের জ্ঞান খুব সামান্য।' সাধু এইবার জ্যাডিগের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

এর পর জ্যাডিগের জ্ঞানচক্ষু যেন খুলে গেল। সাধু তাকে শিখিয়ে গেলেন নতুন শিক্ষা। জ্যাডিগের বুদ্ধি তো ছিলই—এর পর আরও বেড়ে গেল। এবং একদিন শুধু তার এই গুণের জন্য ব্যাবিলন নগরের নাগরিকেরা তাকে তাদের রাজা করে নিল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

কিশোর (হিন্দী মাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক শ্রীরামদহিন মিশ্র, সহ-সম্পাদক শ্রীহংসকুমার তেওয়ারী। বাল-শিক্ষা-সমিতি, বাঁকীপুর, পাটনা। বার্ষিক মূল্য ৩৲

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত যে ক'খানি কিশোর-পত্রিকার কথা আমরা জানি এ পত্রিকাখানি নিঃসন্দেহ তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। লেখা, ছবি সব দিক দিয়েই কাগজখানিকে সময়োপযোগী করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, খবরাখবর সবই এতে আছে। আলোচ্য সংখ্যায় (২য় বর্ষ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০) মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "কিশোরাবস্থা," যীশুখৃষ্ট, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির পুণ্যময় জীবনী, যুদ্ধের কথা, মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রভৃতি সুন্দর হয়েছে। আমরা পত্রিকাখানির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ছোটদের

—চিত্রশালা—

"জননী ভাবেন, তাঁর শিশুর মতন
এ তিন ভুবনে এত রূপ কারো নাই।"

—শ্রীপ্রফুল্ল রায় গৃহীত আলোকচিত্র

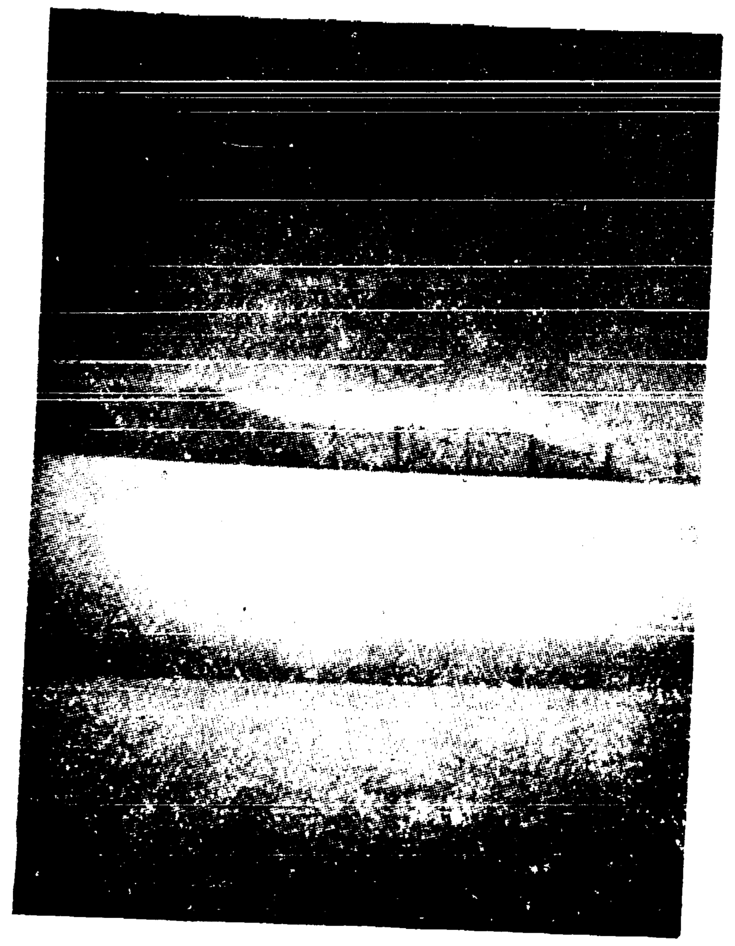

উপরে—কাঞ্চনজঙ্ঘা
নীচে—অস্তাচলের রবি

—শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত আলোকচিত্র

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দু' বছর পরের কথা।

পৃথিবী এখনও টিকিয়া আছে, কিন্তু যে পৃথিবীর সঙ্গে দু' বছর আগে আমাদের পরিচয় ছিল এখনকার পৃথিবীকে আর সে পৃথিবী বলা চলে না। সেদিনকার পৃথিবী আর এখনকার পৃথিবীর চেহারার মধ্যে মিল সামান্যই আছে।

ধূমকেতু আসিয়াছিল, এবং যথা সময়ে চলিয়াও গিয়াছে ; কিন্তু মাত্র কয়েক দিনে পৃথিবীর বুকে সে যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইয়া দিয়া গিয়াছে তার কল্পনা করিতে যাওয়াও পাগলামি। সেদিনকার সেই সৃষ্টিছাড়া ঝড়বৃষ্টি, বিশ্বযোড়া প্রচণ্ড ভূমিকম্প, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সেই বিপুল আলোড়ন—একমাত্র পুরাণের গল্পেই তার একটু-আধটু আভাস পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে কেউ তার কথা ভাবিতে পারে না।

এখন আর পৃথিবীতে হিমালয় পাহাড় বলিয়া কিছু নাই, তার জায়গায় বঙ্গোপসাগরের জলরাশি টলমল করিতেছে। আফ্রিকায় আর দুর্ভেদ্য অরণ্য বলিয়া কিছু নাই, সমস্ত বনজঙ্গল পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যেখানে আটলাণ্টিক মহাসাগর ছিল সেখানে পড়িয়া আছে সাহারার মত এক বিরাট্ মরুভূমি। প্রশান্ত মহাসাগরেরও অনেক জায়গার অবস্থা তথৈবচ। সেখানে আবার মাটী ফুঁড়িয়া দেখা দিয়াছে অসংখ্য পাহাড়—এগুলির অধিকাংশই আগ্নেয়গিরি। এমনি ধারা কত আর নাম করিব! ধূমকেতুর সঙ্ঘর্ষে পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই বটে, কিন্তু এত দিন যে ভাবে সে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল এখন সে আর সে ভাবে নাই, কাৎ হইয়া অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে।

একমাত্র বিষুবরেখার কাছাকাছি দেশগুলি কিছুটা রক্ষা পাইয়াছে, তবে তাদের উপর দিয়াও কম বিপর্য্যয় যায় নাই। ডক্টর রুদ্রের পরামর্শ মত এই সব অঞ্চল আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল, তাই যে অল্পসংখ্যক লোক এ অঞ্চলে আশ্রয় পাইয়াছিল তারা কোন রকমে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। যে সব হতভাগ্য সময় মত আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে নাই বা আশ্রয় পায় নাই তারা পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র সামান্য কয়েক কোটি লোক রক্ষা পাইয়াছে।

তবে যারা রক্ষা পাইয়াছে তাদের অবস্থাও যে বেশী আশাপ্রদ এমন মনে হয় না। প্রথম প্রথম, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে, অবশ্য সর্ব্বত্রই প্রবল অরাজকতা চলিয়াছিল। লোকের হাবভাব দেখিয়া বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে তারা প্রায় একবিংশ শতাব্দীর সভ্য জাত। মনে হইত, পৃথিবীতে সেই আদিম গুহামানবের যুগ বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে! নূতন বিষুবীয় গভর্ণমেণ্ট এখন ধীরে ধীরে অবস্থা প্রায় আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্য দিক দিয়া বিশৃঙ্খলা কমে নাই। গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মুশ্‌কিলে পড়িয়াছেন খাদ্যসমস্যা লইয়া। সমস্ত সমস্যার মধ্যে এইটিই এখন প্রধান। খাদ্যাভাবের আশঙ্কা করিয়া কিছু পরিমাণ খাদ্য আগেই সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তা'তে আর ক'দিন চলে? নতুন খাবার যোগাড় করা এখন খুবই কষ্টকর। চাষবাসের উপযোগী জায়গা নাই—জমির স্বাভাবিক অবস্থা পাইতে এখনও অনেক দেরী। পশুপাখী যা ছিল সবই প্রায় মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শেষ করা হইয়াছে। সামান্য কিছু না রাখিলেই বা চলিবে কেন? এদিকে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ বনসম্পদ্ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, সেখান হইতেও খাদ্য সংগ্রহের আশা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম খাবার তৈরীর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তার জন্যও প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাওয়া যাইতেছে না, আর তা সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও সে অস্বাভাবিক খাদ্যে ভিটামিনের খুবই অভাব। তা'তে দেহের পুষ্টি হইবে কেমন করিয়া? গভর্ণমেণ্ট ভারী ভাবনায় পড়িয়াছেন।

নতুন রাজধানী কুইটো সহরে সেদিন এই লইয়াই মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিয়াছিল। মন্ত্রীরা ছাড়া কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতও সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী মঁসিয় বুঁদে একটা নাতিবৃহৎ বক্তৃতায় ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ চাহিলেন। "আজ যদি ডক্টর রুদ্র আমাদের মধ্যে থাকতেন," মঁসিয় বুঁদে কহিলেন, "তা হ'লে আমাদের আর কোন চিন্তার কারণ থাকত না। নিশ্চয়ই তিনি সেবারকার মত নতুন কোন ব্যবস্থা ক'রে পৃথিবীকে এই দুর্ব্বিপাক থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু আজ তিনি কোথায়!" মহাপ্রলয়ের পর ডক্টর রুদ্রকে কেউ আর দেখিতে পায় নাই। কেউ কেউ বলে, তিনি নাকি শেষ মুহূর্ত্তে সকলের অগোচরে তাঁর অবজারভেটারীতে গিয়া ঢুকিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তারই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর হালুয়াচাই কিন্তু সময়মতই নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজকের সভায়ও তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন, মঁসিয় বুঁদে অনাবশ্যক সকলকার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতেছেন। ডক্টর রুদ্র ছিলেন জ্যোতির্বিদ্—খাদ্যসমস্যার সমাধানে বসিয়া তাঁর জন্য হা-হুতাশ করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁরা কাজ চান, ইত্যাদি।

অনেক বাদানুবাদ, যুক্তিতর্কের পর ঠিক হইল—ছোট ছোট দল গড়িয়া খুব দ্রুতগামী

এরোপ্লেনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালাইতে হইবে। পৃথিবীর কোন্ জায়গায় এখন ঠিক কি অবস্থা তার কিছুই জানা নাই। অভিযানকারীরা খবর লইবে কোথাও এমন জায়গা আছে কিনা যেখানে গেলে লোকে ভাল ভাবে খাইয়া পরিয়া থাকিতে পারে—চাষবাসের আয়োজন চলিতে পারে। নহিলে সকলে মিলিয়া শুধু এই বিষুবীয় অঞ্চলটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইয়া লাভ কি?

এ ব্যবস্থা সকলেরই মনঃপূত হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা হইল। এরোপ্লেন ঠিক হইল। প্রতি দলে ৮।১০ জন লোক লইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন আকাশে উড়িল।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই একখানি বাদে সমস্ত এরোপ্লেন ফিরিয়া আসিল। খবর বিশেষ সুবিধার নয়। এখনও পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলই বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। কোন কোন জায়গায় ত' এখনও প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য অল্পবিস্তর চলিতেছে! অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রপরিসর জায়গাটুকু ছাড়া পৃথিবী এখনও জীববাসের যোগ্য হইতে পারে নাই।

যে এরোপ্লেনখানির ফিরিতে একটু দেরী হইতেছিল কয়েক দিন পরে সেটিও ফিরিল। শুধু তারই খবরে একটু নূতনত্ব ছিল। এ এরোপ্লেনখানি গিয়াছিল উত্তর দিকে,—গ্রীন্ল্যাণ্ড্ পার হইয়া প্রায় মেরুর কাছাকাছিই হাজির হইয়াছিল। সেখানেই সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গিয়াছে। মেরু অঞ্চল সম্বন্ধে এত দিন লোকের যে ধারণা ছিল এ অভিযানে তা সম্পূর্ণ বদ্লাইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই বরফে ঘেরা দেশ, আর সেই রক্ত-জমানো শীত! অভিযানকারীরা তার কিছুমাত্র পরিচয় পায় নাই। অবশ্য, নিরাপদ্ থাকিবার জন্য, তারা একটু বেশী উঁচু দিয়া এরোপ্লেন চালাইয়াছিল। আবহাওয়া বরাবর শান্ত ছিল, টেম্পারেচার কখনও ৭০ ডিগ্রীর নীচে নামে নাই, ওদিকেও ৮২ ডিগ্রীর উপরে উঠে নাই। দোষের মধ্যে একটু নীচের আকাশে একটা কুয়াসার আবরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উপরের আকাশ সর্ব্বক্ষণই সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করিতেছিল। মাঝে মাঝে পাৎলা কুয়াসার ভিতর দিয়া যে দৃশ্য অভিযানকারীদের চোখে পড়িয়াছে তাও খুব বিস্ময়কর। নীচে যেন অখণ্ড সবুজ গালিচা পাতা—আর তার ফাঁকে ফাঁকে খাড়া হইয়া আছে পিরামিডের মত অদ্ভুত আকৃতির কতকগুলি পদার্থ। পাহাড় সেগুলি নিশ্চয়ই নয়, কারণ পাহাড় অত নিখুঁত হইতে পারে না। কুয়াসা তাড়াইবার উপযুক্ত সরঞ্জাম সঙ্গে না থাকায় সাহস করিয়া এরোপ্লেন নামান যায় নাই। কাজেই সে রহস্যেরও সমাধান করিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই।

এই নতুন খবরে চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলের মনেই কৌতূহলের সঙ্গে ক্ষীণ একটা আশার রেখাও ফুটিয়া উঠিল। তবে কি ভগবান্ আবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

আবার মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঠিক হইল, আর একবার নতুন করিয়া ঐ অঞ্চলে অনুসন্ধানী দল পাঠাইতে হইবে এবং এবারকার অভিযানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট এবং নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোকেরাই থাকিবেন।

লোক বাছাই করা হইল, দলের নেতা হইলেন বহুভাষাবিদ্ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক চন্দ্র। সব শুদ্ধ কুড়ি জন যাত্রী লইয়া "আশাবাদী" নামে বিরাট্ একখানি এরোপ্লেন আবার আকাশে উড়িল। ডক্টর হালুয়াচাইও এই কুড়ি জনের মধ্যে একজন।*

(ক্রমশঃ)

ডাকাতের পাল্লায়

(শ্রীরাধারাণী দেবী)

ভজহরি বাবু একেবারে পুরোদস্তুর সহুরে লোক। ছেলেবেলা থেকে কলকাতার গলিতে মানুষ, এবং সেই গলিতেই জীবনের চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন। পাড়া-গাঁ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বড় ভয়ানক। সেখানে ঝোপে-ঝাড়ে চোর-ডাকাত লুকিয়ে থাকে, বাগে পেলেই ক্যাঁক্ ক'রে এসে ধরে। তা ছাড়া রাতের বেলা যাঁরা মাছ খেতে আসেন, বেলগাছে যাঁরা বাসা বাঁধেন তাঁদেরও আধিপত্য নাকি পাড়াগাঁয়েই বেশী। এ ছাড়া সাপ, শেয়াল, ইঁদুর, গিরগিটি, জোঁক কেঁচো, বিছে, কেন্নো—এরা তো আছেই। বাপ্, সে কথা ভাবাই যায় না।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, সেই ভজহরি বাবুকেই, জীবনের চল্লিশ বছর কলকাতায় কাটিয়ে এসে, শেষ বয়সে পাড়াগাঁয়ে স্থায়ী আড্ডা গাড়তে হ'ল। ভজহরি বাবুর স্ত্রী ছিলেন পাড়াগাঁয়ের মেয়ে এবং বাপের একমাত্র মেয়ে। হঠাৎ ভজহরি বাবুর শ্বশুরমশাই গেলেন মারা, এবং স্ত্রীর দৌলতে শ্বশুরের বিষয়ের মালিক হ'লেন ভজহরি বাবু। কলকাতায় দশ শরিকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ছোট্ট একখানা ঘর নিয়ে থাকার চাইতে পাড়াগাঁয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীতে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ইচ্ছেমত কর্ত্তৃত্ব করার প্রলোভন ভজহরি-জায়া ত্যাগ করতে রাজী হ'লেন না। যে স্ত্রীভাগ্যে ধন,

---

* গত দুই সংখ্যা পড়িয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন যে গল্পটি সম্পূর্ণ আমার কল্পনাপ্রসূত না কোনও বিদেশী গল্পের অনুসরণে লেখা। ইতিপূর্ব্বে যেটুকু বাহির হইয়াছে তা সম্পূর্ণ আমার নিজের কল্পনাপ্রসূত; তবে গল্পের শেষ দিক্টায় একটা ছোট্ট বিদেশী গল্প হইতে সামান্য ঋণ গ্রহণ করা হইবে। —লেখক

সেই স্ত্রীকেই ঘাঁটান ভজহরি বাবু যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। আজন্ম সংস্কার ত্যাগ ক'রে তাঁকে পাড়াগাঁয়ে এসে বসতে হ'ল।

ভজহরি বাবুর শ্বশুরবাড়ী কলকাতা থেকে বেশী দূর নয়, ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। কাজেই ভজহরি বাবু 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারী' করতে আরম্ভ করলেন। শ্বশুরের সম্পত্তি পেলেও চাকরী ছেড়ে দেবার মত আয় সে সম্পত্তির ছিল না।

সে গ্রামে ডেইলি প্যাসেঞ্জারের অভাব ছিল না। বাড়ী ফিরতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যা হ'লেও সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গী থাকায় এ যাবৎ ভজহরি বাবুর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। কিন্তু সে সুখে বাদ সাধলেন তাঁদের আপিসের নতুন বড় সাহেব।

সেদিন সাড়ে পাঁচটা বাজতেই ভজহরি বাবু উঠি উঠি করছেন, হঠাৎ বড় সাহেবের কাছ থেকে ডাক এল। বিলেত থেকে জরুরী তার এসেছে, এখনই তার জবাব দিতে হবে। ভজহরি বাবু যেন এখন বাড়ী না যান।

সাহেবের হাত থেকে যখন ছুটী পেলেন তখন রাত প্রায় ৭টা। ৭টা ২৫এ একটা গাড়ী আছে, সেটা ধরতে পারলে গোটা নয়েকের মধ্যে বাড়ী পৌঁছান যেতে পারে। ভজহরি বাবু উঠি-পড়ি করে ছুটলেন।

ট্রেন যখন ভজহরি বাবুকে তাঁদের ছোট্ট ষ্টেশনে নামিয়ে দিল তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই, শুধু ঝিঁঝির একটানা গুঞ্জন। একটি সঙ্গী নেই, সঙ্গে আলো নেই, অথচ প্রায় এক মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। ভয়ে ভজহরি বাবুর গা ছম্ ছম্ করতে লাগ্ল।

কিন্তু ভেবে লাভ নেই, ভজহরি বাবু তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

ষ্টেশনের ক্ষীণ আলো অদৃশ্য হ'তেই অন্ধকার আরও গাঢ় হ'ল। ভজহরি বাবুর বুকের ধুক্‌ধুকুনি আর একটু বাড়ল। হঠাৎ ওকি! পেছনে কার পায়ের শব্দ না! ভজহরি বাবু আরও জোরে হাঁটতে লাগলেন, পেছনের পদশব্দও আগের চেয়ে দ্রুত হ'ল। ভজহরি বাবুর এক সঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ল। চোর, ডাকাত্‌, ব্রহ্মদৈত্য! নাঃ, আজ আর বোধ হয় রেহাই নেই। ভজহরি বাবু পিছন ফিরে তাকাতে সাহস পেলেন না, সোজা রাস্তা ছেড়ে তিনি একটা সরু পথ ধরলেন। দেখা যাক্ লোকটা কি করে। না, লোকটা তাঁকেই অনুসরণ করছে, নইলে সেও বেঁকবে কেন!

তবু—তবু দেখা যাক্! ভজহরি বাবু এবার একেবারে আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলতে লাগলেন; কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে,—একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকটাও ঠিক তেমনি ভাবে চলেছে যে! ভজহরি বাবুর বুক শুকিয়ে গেল, তিনি রাস্তা ছেড়ে

মাঠ ধরলেন, লোকটাও তাই ধরল। ভজহরি বাবু আর হাঁটতে পারলেন না, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করলেন। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, খানা, ডোবা, বাঁশের বেড়া—কোন দিকেই দৃক্‌পাত না ক'রে মরি-বাঁচি হয়ে ছুটলেন; কিন্তু লোকটা তাঁর পিছু ছাড়ল না, সেও তেমনি অদ্ভুত ভাবে তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করল।

নাঃ, এবার আর রক্ষা নেই, লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাত। ভূত হ'লে ও এতক্ষণ অপেক্ষা করত না। আজ বেঘোরেই তাঁর প্রাণটা যাবে। আঃ, কলকাতা ছেড়ে এসে কি ভুলটাই না করেছেন তিনি!

প্রাণপণে ছুটে শেষে ভজহরি বাবুর দম ফুরিয়ে এল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আর পারেন না। ডাকাতটা নাছোড়বান্দা। হঠাৎ ভজহরি বাবুর একটা বিলিতী উপন্যাসের কথা মনে পড়ল। গল্পের নায়ক এ অবস্থায় কি করেছিল? হ্যাঁ, তাই তাঁকে করতে হবে। মরেন তো সম্মুখযুদ্ধে মরবেন, কাপুরুষের মত নয়। ছেলেবেলা তিনিও জিম্‌নাষ্টিক্ করেছেন, হুঁ।

ভজহরি বাবু হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। ছাতা উঁচিয়ে বল্লেন, "খবর্দ্দার, এক পা নড়েছ কি তুলো ধুনো ক'রে ছাড়ব। চেন না আমায়!"

পেছনের লোকটিও থামল। দৌড়ঝাঁপের ফলে তারও সমস্ত শরীর ছড়ে গেছে, জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। তার চেহারা দেখে ভজহরি বাবু চমকে উঠলেন। এই কি ডাকাতের চেহারা! রোগা লিকলিকে এক ম্যালেরিয়া-রোগী, একেবারে গোবেচারা, জবুথবু লোকটা। ভজহরি বাবুর মার-মূর্ত্তি দেখে আরও ঘাবড়ে গেছে।

লোকটা আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল, "আজ্ঞে, আমি জিতেন বাবুর বাড়ী যাব। ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন, আপনি ঠিক তাঁর পাশের বাড়ীতে থাকেন, আপনার পেছন পেছন গেলেই ঠিক মত পৌঁছব। কিন্তু আপনার যে মাথা খারাপ সেটাও তাঁর বলা উচিত ছিল। এই ভাবেই কি আপনি রোজ বাড়ী ফেরেন?"

ডাকাতের হাত থেকে এ ভাবে উদ্ধার পেয়ে ভজহরি বাবু ঠিক খুসি হ'তে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। *

* একটা বিলাতী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।

সেই স্ত্রীকেই ঘাঁটান ভজহরি বাবু যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। আজন্ম সংস্কার ত্যাগ ক'রে তাঁকে পাড়াগাঁয়ে এসে বসতে হ'ল।

ভজহরি বাবুর শ্বশুরবাড়ী কলকাতা থেকে বেশী দূর নয়, ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। কাজেই ভজহরি বাবু 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারী' করতে আরম্ভ করলেন। শ্বশুরের সম্পত্তি পেলেও চাকরী ছেড়ে দেবার মত আয় সে সম্পত্তির ছিল না।

সে গ্রামে ডেইলি প্যাসেঞ্জারের অভাব ছিল না। বাড়ী ফিরতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যা হ'লেও সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গী থাকায় এ যাবৎ ভজহরি বাবুর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। কিন্তু সে সুখে বাদ সাধলেন তাঁদের আপিসের নতুন বড় সাহেব।

সেদিন সাড়ে পাঁচটা বাজতেই ভজহরি বাবু উঠি উঠি করছেন, হঠাৎ বড় সাহেবের কাছ থেকে ডাক এল। বিলেত থেকে জরুরী তার এসেছে, এখনই তার জবাব দিতে হবে। ভজহরি বাবু যেন এখন বাড়ী না যান।

সাহেবের হাত থেকে যখন ছুটী পেলেন তখন রাত প্রায় ৭টা। ৭টা ২৫এ একটা গাড়ী আছে, সেটা ধরতে পারলে গোটা নয়েকের মধ্যে বাড়ী পৌঁছান যেতে পারে। ভজহরি বাবু উঠি-পড়ি করে ছুটলেন।

ট্রেন যখন ভজহরি বাবুকে তাঁদের ছোট্ট ষ্টেশনে নামিয়ে দিল তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই, শুধু ঝিঁঝির একটানা গুঞ্জন। একটি সঙ্গী নেই, সঙ্গে আলো নেই, অথচ প্রায় এক মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। ভয়ে ভজহরি বাবুর গা ছম্ ছম্ করতে লাগ্ল।

কিন্তু ভেবে লাভ নেই, ভজহরি বাবু তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

ষ্টেশনের ক্ষীণ আলো অদৃশ্য হ'তেই অন্ধকার আরও গাঢ় হ'ল। ভজহরি বাবুর বুকের ধুক্‌ধুকুনি আর একটু বাড়ল। হঠাৎ ওকি! পেছনে কার পায়ের শব্দ না! ভজহরি বাবু আরও জোরে হাঁটতে লাগলেন, পেছনের পদশব্দও আগের চেয়ে দ্রুত হ'ল। ভজহরি বাবুর এক সঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ল। চোর, ডাকাত, ব্রহ্মদৈত্য! নাঃ, আজ আর বোধ হয় রেহাই নেই। ভজহরি বাবু পিছন ফিরে তাকাতে সাহস পেলেন না, সোজা রাস্তা ছেড়ে তিনি একটা সরু পথ ধরলেন। দেখা যাক্ লোকটা কি করে। না, লোকটা তাঁকেই অনুসরণ করছে, নইলে সেও বেঁকবে কেন!

তবু—তবু দেখা যাক্! ভজহরি বাবু এবার একেবারে আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলতে লাগলেন; কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে,—একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকটাও ঠিক তেমনি ভাবে চলেছে যে! ভজহরি বাবুর বুক শুকিয়ে গেল, তিনি রাস্তা ছেড়ে

মাঠ ধরলেন, লোকটাও তাই ধরল। ভজহরি বাবু আর হাঁটতে পারলেন না, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করলেন। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, খানা, ডোবা, বাঁশের বেড়া—কোন দিকেই দৃক্‌পাত না ক'রে মরি-বাঁচি হয়ে ছুটলেন; কিন্তু লোকটা তাঁর পিছু ছাড়ল না, সেও তেমনি অদ্ভুত ভাবে তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করল।

নাঃ, এবার আর রক্ষা নেই, লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাত। ভূত হ'লে ও এতক্ষণ অপেক্ষা করত না। আজ বেঘোরেই তাঁর প্রাণটা যাবে। আঃ, কলকাতা ছেড়ে এসে কি ভুলটাই না করেছেন তিনি!

প্রাণপণে ছুটে শেষে ভজহরি বাবুর দম ফুরিয়ে এল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আর পারেন না! ডাকাতটা নাছোড়বান্দা! হঠাৎ ভজহরি বাবুর একটা বিলিতী উপন্যাসের কথা মনে পড়ল। গল্পের নায়ক এ অবস্থায় কি করেছিল? হ্যাঁ, তাই তাঁকে করতে হবে। মরেন তো সম্মুখযুদ্ধে মরবেন, কাপুরুষের মত নয়। ছেলেবেলা তিনিও জিম্‌নাষ্টিক্ করেছেন, হুঁ।

ভজহরি বাবু হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। ছাতা উঁচিয়ে বল্লেন, "খবর্দ্দার, এক পা নড়েছ কি তুলো ধুনো ক'রে ছাড়ব। চেন না আমায়!"

পেছনের লোকটিও থামল। দৌড়ঝাঁপের ফলে তারও সমস্ত শরীর ছড়ে গেছে, জল-কাদায় মাথামাখি হয়ে গেছে। তার চেহারা দেখে ভজহরি বাবু চমকে উঠলেন। এই কি ডাকাতের চেহারা! রোগা লিকলিকে এক ম্যালেরিয়া-রোগী, একেবারে গোবেচারা, জবুথবু লোকটা। ভজহরি বাবুর মার-মূর্ত্তি দেখে আরও ঘাবড়ে গেছে।

লোকটা আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল, "আজ্ঞে, আমি জিতেন বাবুর বাড়ী যাব। ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন, আপনি ঠিক তাঁর পাশের বাড়ীতে থাকেন, আপনার পেছন পেছন গেলেই ঠিক মত পৌঁছব। কিন্তু আপনার যে মাথা খারাপ সেটাও তাঁর বলা উচিত ছিল। এই ভাবেই কি আপনি রোজ বাড়ী ফেরেন?"

ডাকাতের হাত থেকে এ ভাবে উদ্ধার পেয়ে ভজহরি বাবু ঠিক খুসি হ'তে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। *

* একটা বিলাতী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।

"মরা চিঠি"র অফিস

(শ্রীহেমলতা দেবী)

সম্রাট্ শের শাহের সময় আমাদের দেশে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হয়। অবশ্য তার আগেও ঘোড়া ডাকত, কিন্তু ঘোড়ার 'ডাক' ছিল না। চিঠিপত্র লিখে আত্মীয়পরিজনের খোঁজখবর নেওয়া সে যুগে ছিল দুরূহ ব্যাপার।

কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিষই বদলেছে। এখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই ডাকবিভাগের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। সময় বাঁচাবার জন্য আজকাল এরোপ্লেনে বাতাসের ডাক বা এয়ার মেলের চল হয়েছে। ইয়োরোপে, আমেরিকায় বড় বড় সহরে তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র চালান দেবার জন্য মাটীর তলায় নল বসান হয়েছে—বাতাসের চাপে বিদ্যুৎগতিতে তার ভিতর দিয়ে চিঠি ছুটে যাচ্ছে।

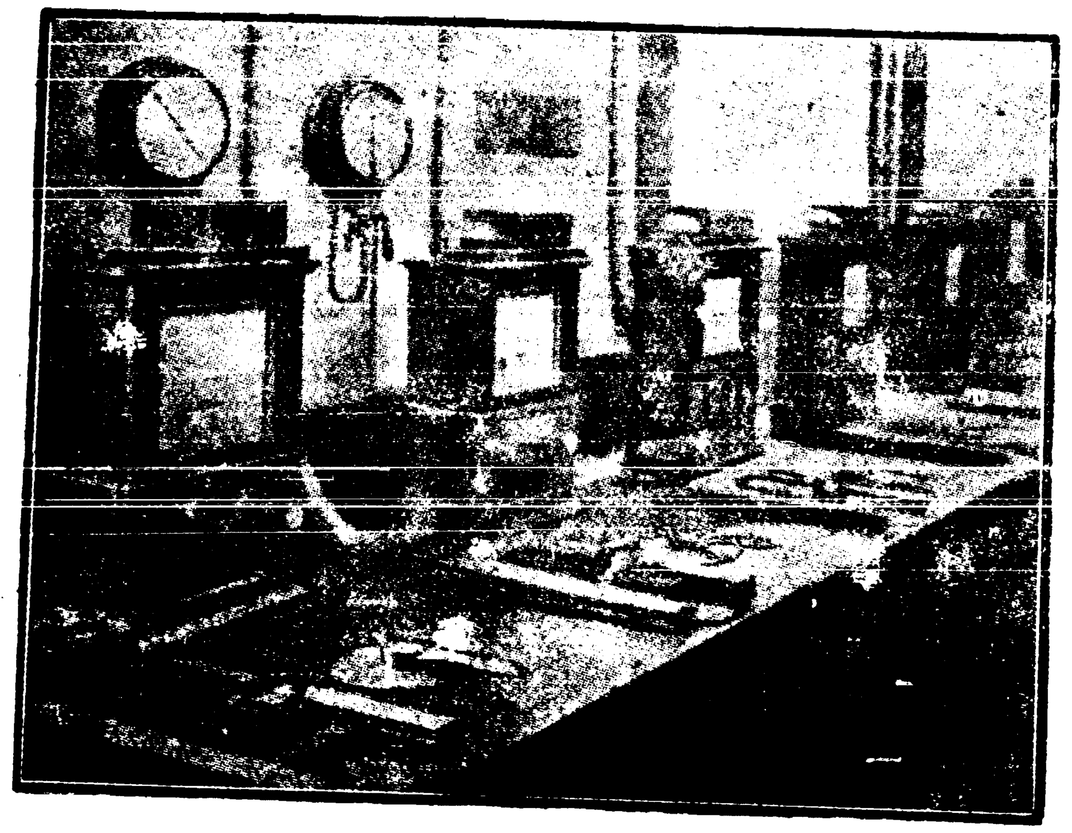

বাতাসের চাপের সাহায্যে চিঠি পাঠাবার ডাকঘর

কিন্তু এত সুবন্দোবস্ত ক'রেও লোকের অসতর্কতার জন্য ডাকঘরকে কম ভুগতে হয় না। চিঠি লিখে তার ঠিকানাটা ঠিক মত লিখতেই বহু লোকে গোলমাল ক'রে বসে—ফলে সে চিঠি আর গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে না। এই সব চিঠিকে ডাকঘরের লোকেরা বলেন "মরা চিঠি"—ডেড্ লেটার। বড় বড় সহরে এই সব "মরা" চিঠির গতি করবার জন্য "ডেড্ লেটার অফিস" বলে আলাদা অফিস থাকে। অফিসের লোকদের কাজ হচ্ছে, এ রকম ঠিকানাহীন চিঠি বা পার্শেল পেলে তা খুলে পত্র-লেখকের ঠিকানা খুঁজে বার করা,

তার পর তাঁকে তা ফেরৎ দেওয়া। কিন্তু অনেক সময় চিঠি খুলেও পত্রলেখকের ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে আর কি করা যেতে পারে!

ডেড্ লেটার অফিসের কাজ যে খুব সামান্য তা ভেব না। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরের ডেড্ লেটার অফিসের একটা বিবরণ দিচ্ছি। সেখানে নাকি প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৬০ হাজার নামগোত্রহীন চিঠি এসে হাজির হয়, অর্থাৎ বছরে কয়েক কোটি। এ ছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৮।১০ লাখ পার্শেলও আসে।

এই সব খাম বা পার্শেলে অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত চিঠি থাকে। খামের মধ্যে শত শত টাকার নোট্ প্রায়ই পাওয়া যায়। প্রেরক টাকা পাঠাবার ডাকমাশুল ফাঁকি দিতে গিয়ে আসল টাকাটাই খুইয়ে বসে। পার্শেলের মধ্যে সময় সময় অনেক মারাত্মক জিনিষ থাকে—যেমন ডিনামাইট্, বোমা, বিষাক্ত জ্যান্ত পোকামাকড় বা জ্যান্ত সাপ ইত্যাদি। সম্ভবতঃ পত্রলেখক পত্রগ্রাহকের প্রতি শত্রুতা বশতঃ সেগুলি পাঠায়। অনেক নিষিদ্ধ জিনিষ—যেমন কোকেন, আফিং বা অন্য মাদক পদার্থ, অস্ত্রশস্ত্রও সময় সময় পাওয়া যায়। আবার উপহারের সামগ্রী, হীরা-জহরৎ, বই, খেলনা, জামা-কাপড় এ সবও থাকে।

এই সব মালিক-হারা জিনিষ প্রতি বছর নীলামে বিক্রী করা হয়। গভর্ণমেণ্ট তা' থেকে লাখে লাখে টাকা পেয়ে থাকেন।

খোস-খবর

'গিনি' নামক স্বর্ণমুদ্রা তোমরা সবাই বোধ হয় দেখেছ। আফ্রিকার গিনি নামক জায়গা থেকে সোনা এনে ঐ মুদ্রা তৈরী হ'ত বলে ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। আগে ওর দাম ছিল ২১ শিলিং। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে আজকালকার ২০ শিলিং দামের 'সভারেন্' নামক স্বর্ণমুদ্রার চলন আরম্ভ হয়। এর আর এক নাম "পাউণ্ড"। পাউণ্ড নাম হবার কারণ হচ্ছে, ঐ মুদ্রায় যে সোনা থাকত তা এক পাউণ্ড ওজনের রূপার দামের সমান।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অক্সফোর্ড সব চেয়ে প্রাচীন; তার পর কেম্ব্রিজ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজ ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কেম্ব্রিজ পিটারহাউস কলেজ স্থাপিত হয় ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে।

ভারতের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন কলকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)।

* * *

কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ওষুধ, তা তোমরা জান। পেরুদেশে সিঙ্কোনা জাতের গাছের ছাল থেকে এই ওষুধ প্রথম তৈরী হয়। সে দেশের ভাষায় গাছের ছালকে বলে 'কুইনা', তার থেকেই কুইনাইনের নামকরণ হয়েছে।

* * *

নিউ মেক্সিকোতে কতকগুলি নাম-করা বড় বড় গুহা আছে। এই সব গুহায় রাজত্ব করে বাদুড়েরা। কত অসংখ্য বাদুড় যে এখানে বাস করে তা কল্পনা করাও কঠিন। এক পণ্ডিত এদের আসা-যাওয়ার সময় দেখে হিসেব করে বলেছেন যে প্রত্যহ অন্ততঃ তিন শ'-সাড়ে তিন শ' মণ পোকামাকড়কে এই সব বাঁদুড়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আত্মবলি দিতে হয়।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়; মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নন।]

মাঘের ১নং প্রশ্নের উত্তর—

ইউ-বোট্ — এক রকম জাহাজ। জলের উপর দিয়া এবং তলা দিয়া যাইতে পারে। জলের তলা দিয়া যাইবার সময় ভিতরে জল ঢুকিতে পারে না। জলের তলায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইলে নাবিকেরা অক্সিজেন ব্যবহার করে। ইহা হইতে টর্পেডো ছুঁড়িয়া শত্রুপক্ষের জাহাজ ঘায়েল করিয়া দেওয়া যায়। অপর নাম 'সাবমেরিন'।

—শ্রীঅরুণা সেন।

সাবমেরিন নানা ধরণের আছে—'এ', 'বি', 'সি', 'ডি', 'এম্', 'কে', 'ইউ', ইত্যাদি। জার্ম্মান্দের তৈরী একটি

বিশেষ ধরণের নাম 'ইউ-বোট'। এগুলি আকারে বেশ বড়,—দূর সমুদ্রে ঘুরিয়া টর্পেডো এবং শক্তিশালী কামানে সজ্জিত, বেড়াইতে পারে।

—শ্রীরমলা নন্দী

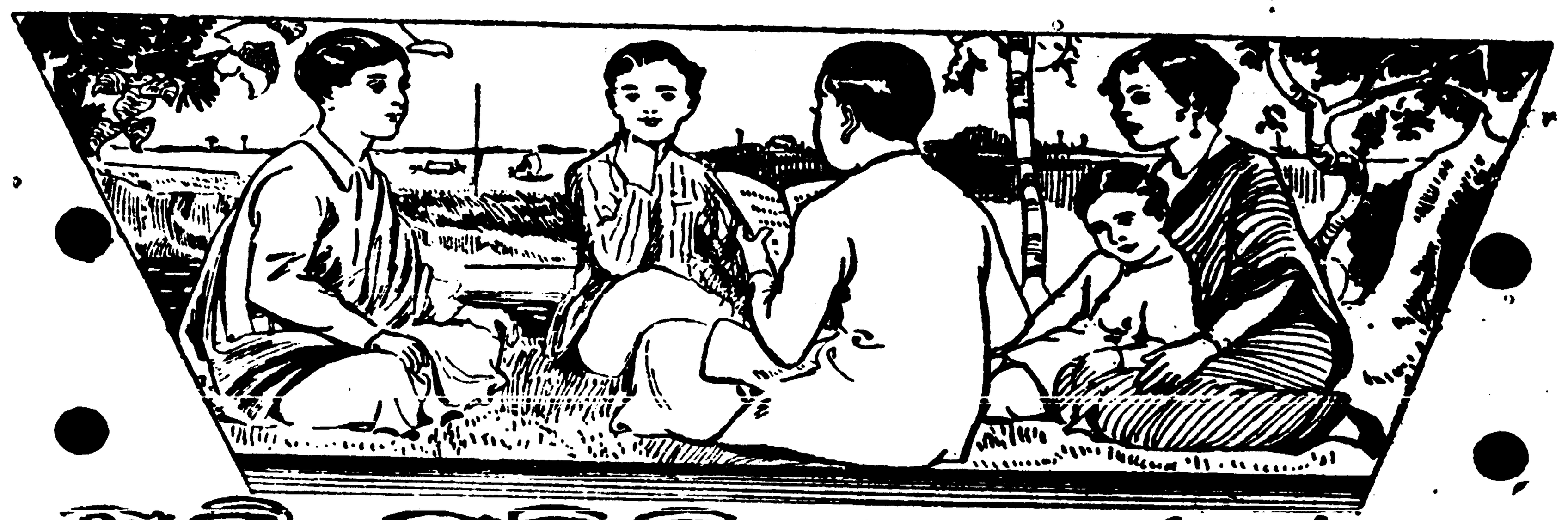

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

ঊষার আলো

(শ্রীঅজয়কুমার মিত্র)

ঊষার আলো, ঊষার আলো!
তোমার মধুর হাতছানিটি
আজকে আমার ঘুম ভাঙ্গালো।
গভীর বনের মাথার 'পরে
তোমার আলো পড়লো ঝরে,
বনের পাখী অবাক্ চোখে
তোমার পানে ঐ তাকালো।

'বউ কথা কও' রাতের বেলা
ঘুমিয়ে ছিল গভীর বনে,
তোমার আলোর আভাস পেয়ে
অমনি সে গান উঠলো গেয়ে,
আঁধার আলোর মাঝখানেতে
বসলো গিয়ে আপন মনে।

তোমার কোমল স্পর্শ পেয়ে
ফুলকুঁড়িরা জাগলো হেসে;
তোমার আলো ফোটার সাথে
নৈশবায়ুর গমন-পথে
শুকতারারে কে নেয় ডেকে
কোন্ সুদূরে আঁধার দেশে!

ঊষার আলো, ঊষার আলো!
তুমি মোরে জাগিয়ে তোলো,
হৃদয় আমার রাঙ্গিয়ে তোলো।
মনের কালি দাও মুছিয়ে,
তিমির যত দাও ঘুচিয়ে,
আজ ভোরেতে তোমার কাছে
আশীষ মাগি, ঊষার আলো!

ফাল্গুনের রামধনুর সমালোচনামূলক অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। রামধনু যে প্রত্যেককেই আনন্দ দিতে পেরেছে এ সংবাদে আমরা খুব খুসী হলাম। তোমরা অকপটে তোমাদের মনের কথা খুলে লিখবে এই আমরা চাই। কোন ক্রুটী থাকলে তাও জানাবে—যাতে সে ক্রুটী, সম্ভব হ'লে, আমরা সংশোধন করতে পারি। তোমাদের সব চিঠিতেই দেখছি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থাকে। কয়েকটি নমুনা এ মাসেও দেওয়া গেল। —রাঃ সঃ

"ইচ্ছা ছিল একটু সমালোচনা করি, কিন্তু কিছুই খুঁত দেখলাম না…নিরাশ হয়ে ও ইচ্ছায় ক্ষান্ত দিলাম।" —শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস।

"…মনেতে একটু দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু রামধনু খুলিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। 'ধূমকেতু' আমার খুব ভাল লাগিতেছে।"

—শ্রীরেণুকণা রায় (কুমার)

"শিল্পী আলাবক্স অঙ্কিত পার্থসারথি ছবিটি দেখিয়া ভারি আনন্দ হইল। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষালের জীবনী পাঠ করিতে খুব ইচ্ছা হইতেছে।…মিশরের কথা ভারী সুন্দর।"

—শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

"এ মাসের রামধনুও খুব সুন্দর হইয়াছে। "ধূমকেতু" চমৎকার হইতেছে।"

—শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

"আমি অনেক ছেলেদের পত্রিকা পড়িয়াছি —তাদের মধ্যে ইহা (রামধনু) শ্রেষ্ঠতম।

—শ্রীমদনলাল সরাওগী।

"'বাংলার গান' সব চেয়ে ভাল লাগল। শিবরাম বাবুর লেখা ভাল, কিন্তু তিনি যেন জোর করে হাসাতে চান। গল্পের বিস্তৃতি বিরক্তিকর ব্যাপার। নিবারণ বাবুর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রামধনুর সম্পদ্। "মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর" খুব জমবে। "ধূমকেতুর" ভাষার গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করবার মত।"

—আতাউর রহমান, প্রবীরকুমার দাশগুপ্ত।

"শিবরাম বাবুর এ মাসের গল্পটী অতি সুন্দর লাগল।" —রাবেয়া খাতুন।

"'পশুরাজের কবলে' খুব ভাল লাগল।… শিবরাম বাবুর গল্প পেয়ে সত্যিই খুব খুসী হলাম কিন্তু ছবির আশা কি আমাদের ত্যাগ করতে হবে?"

—অরুণা সেন

"মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর—বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক, কিন্তু পড়তে ভারী ভাল লাগছে। বৈজ্ঞানিক সম্পাদকের বৈজ্ঞানিক উপন্যাসটি একেবারে নতুন ধরণের লেখা। এ রকম লেখা পড়েছি বলে মনে পড়ে না।"

—কল্যাণী দত্ত।

রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। ফাইনালে মহারাষ্ট্র দল যুক্ত-প্রদেশকে ১০ উইকেটে পরাজিত করেছে। প্রফেসর দেওধর ছিলেন মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক। যুক্তপ্রদেশ দলের অধিনায়ক পালিয়া এই খেলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

* * *

বোম্বাইএ আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতাও শেষ হয়েছে। ফাইনালে বোম্বাই দল দিল্লী দলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। গতবারের বিজয়ী বাংলা দল এবার সেমিফাইনালে বোম্বাই দলের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেছে।

* * *

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণাকার ধারণ করছে। রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডকে অনেকটা কাবু করে ফেলেছে—ফিন্‌ল্যাণ্ডের অনেক জায়গা দখল করেছে, ব্যাপক বিমান আক্রমণে অনেক জায়গা ধ্বংসও করেছে।

* * *

কয়েক দিন পরেই (মার্চের শেষ দিকে) রামগড়ে এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। এবারকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ও সভাপতি পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু মৌলানা আজাদ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছেন। এবারকার নির্ব্বাচনে বাংলা দেশ ভোট দিতে পারে নি।

* * *

সম্প্রতি ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই

প্যাটেল প্রভৃতি এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।

* * *

জার্ম্মান্ যুদ্ধে একটু ঢিলে পড়েছিল, আবার তা মাথা খাড়া দিয়ে উঠছে। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ আবার সুরু হয়েছে। জাহাজ ডুবি তো লেগেই আছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন, এবারে হয়তো ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক দেশও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) নকল (২) বিকল (৩) অবিকল (৪) বাকল (৫) কলসী (৬) কলঙ্ক (৭) কলরব।

উত্তরদাতাদের নাম

স্বপ্টার ভোম্বল (বজ্রযোগিনী); রামু, অমূল্য শঙ্কর, বাণী (জলপাইগুড়ী); ভোলাদাদা, **কমল, দীপেন্দ্রনাথ** দত্ত, লালদিদি (ধুবড়ী); অনিমা রায়, বড়মামা, বৌদি, মা, ছোড়দি (পাবনা); আন্দ, বাসু, শিবু, শেলী, বেবি (নাগপুর); বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা): সুনন্দা সেন (বরিশাল); অরুণচন্দ্র রায়, বেবী, সতী, রেণু মৈত্র (রাজসাহী); অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); শোভনা দেবী (মধুবানি); জগৎরঞ্জন ও পতিত (মুড়াগাছা); সন্তু, বুলু ও সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (চাঁপাই নবাবগঞ্জ); সুবীব, সুপ্রিয়া. মঞ্জুশ্রী বসু (ছাপরা); রাণা রায় (টালীগঞ্জ); দি ভৌমিকস এবং ভট্টাচার্য্য (বালীগঞ্জ); সুমিতা রায়চৌধুরী (গিরিডি); কুট্টু বাচ্চু (ধুবড়ী); বাণী, কিকি, খোকা, উমা, বুলি, বাবলু (চাইবাসা); মঞ্জুশ্রী, বাপ্পা, কুশ, লব (ভবানীপুর); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, কাজল, পুতুল, মিনু (কলিকাতা) ; গীতা মুখার্জ্জি (বানিয়াদি); শান্তিকান্তি চাটার্জ্জি (চাঁদপুর); অরুণা সেন (কলিকাতা); রেণু, মণি, খুচু, রঞ্জিত (ভাগলপুর); সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ও তৃপ্তি (বেনারস); জগন্নাথ বিশ্বাস ও তেজেন্দ্রবিকাশ মিত্র (আলিপুর দুয়ার); যূথিকা চন্দ্র (মাদ্রাজ); সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); রমা ও দীপক নিয়োগী (কলিকাতা); বেলারাণী, শিপ্রা, প্রবীর, প্রশান্ত, দেবাশীষ, প্রীতিকণা মজুমদার (পাতিহাল); পীযূষকুমার সেন (হেনজাদা); সুধাংশুরঞ্জন বক্সী (ভবানীপুর); রত্না দেবী (পাটনা); রমেশচন্দ্র পট্টনায়ক (ভিরিঙ্গি);

শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (এটোয়া); অঞ্জলি, মিঠু, ঝচ্চু, বিজু, হুলু, মনোজ, উমা, আশীষ, শ্যামল (কলিকাতা); বেলা, বাদল, বটা, বাবলী, বাবলা (চাইবাসা); মালু, মাধু, মনু, মতু, নমু ও মনো (চটখিল); কালিদাস পাল (বালুভরা); অণিমা পাল, মিঠু, অপু, খুকু (শিলং); মোহাম্মদ আলী, আলতাফউদ্দীন, আতাউর, প্রবীর (লাখপুর—শিমুলিয়া); দীপালি মৈত্র, ফুলদি, বাসবী ও মালবী (পাটনা); প্রগতি সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (মান্দারকান্দি); অরুণকুমার মিত্র (মুজঃফরপুর); জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); সুনীলকুমার সরকার (লাহেরিয়া সরাই); যতীশ, বিকাশ, বিজন, অশোকচন্দ্র শ্যাম (শ্রীহট্ট); সত্যনারায়ণ লাহিড়ী (ময়মনসিংহ); দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য (চট্টগ্রাম)।

নূতন ধাঁধা

নীচের খালি স্থানগুলি এরূপ ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে যে প্রথমটিতে যে শব্দ বসিবে তার পরেরটিতেও সেই শব্দটিই বসিবে, শুধু তফাতের মধ্যে পরের শব্দটির প্রথম অক্ষর প্রথম শব্দটির প্রথম অক্ষরের ঠিক পরের অক্ষর (বর্ণমালা অনুযায়ী) হইবে। যেমন—প্রথম শব্দটি যদি হয় 'ফল', পরেরটি হইবে 'বল', প্রথমটি যদি হয় 'কানা', পরেরটি হইবে 'খানা'।

(১) সয় — কে এক — কাপড় — না ক'রে বরঞ্চ কিছু — দিও।

(২) চোখে যে — এল ! না এ রাগের — ? দাঁড়াও ও — ভাঙ্গছি।

(৩) ঐদিকে — , — ক'রে দাঁড়িও না ; সামনে দেখ্‌ছ না — — মল করছে !

(৪) বড় বা — হয়েছ ; মেরে গায়ের — তুলে নেব। —না দিয়ে দেখছ কি ? ওতে গায়ের — মিটবে না।

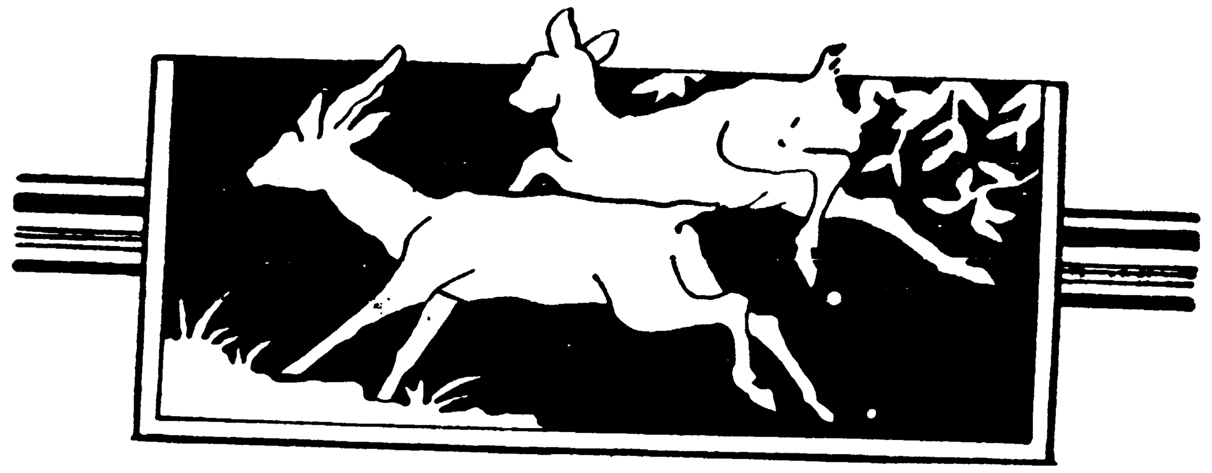

মাঘ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

কবিতার জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত, গ্রাঃ নং ৮৪৭।

ছবির জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীহরিহর মজুমদার, গ্রাঃ নং ১৮৭৪।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা ও ছবি এবং যাঁরা পুরস্কার পেলেন তাঁদের ছবি (তাঁদের আপত্তি না থাকলে) শীঘ্রই রামধনুতে প্রকাশিত হবে।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচে যে দশ জন কবির নাম দেওয়া হ'ল এঁদের মধ্যে তোমার মতে কবি হিসাবে কে সব চেয়ে বড়, কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয় এই ভাবে বলতে হবে। প্রত্যেক কবির নামের পাশে তাঁর স্থান ১, ২, ৩ এই ভাবে নম্বর দিয়ে পাঠাতে হবে। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখে এই কাগজটুকু কেটে পাঠাবে, অন্য কাগজে পাঠালে গ্রাহ্য হবে না। গ্রাহক নং লাগবে না—যে কেউ যোগ দিতে পার, কিন্তু এই ছাপা কুপনে উত্তর পাঠাতে হবে। সব মিলিয়ে ভোট নেওয়া হবে, এবং সেই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি যার উত্তর হবে সে-ই পুরস্কার পাবে। ১লা বৈশাখের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে উত্তর পৌঁছান চাই।

————————————————————এইখানে কাট।

ভারতচন্দ্র রায়	রজনীকান্ত সেন
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অক্ষয়কুমার বড়াল
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস
নবীনচন্দ্র সেন	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নাম...

ঠিকানা...

হর-পার্ব্বতী

[সি, এইচ্, আরান্ এণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে

C. H. ARAN & CO., CALCUTTA.

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৭ { ৪র্থ সংখ্যা

রামধনু

(কাদের নওয়াজ)

রামধনু আছে,—নাই শোভা 'মনোরঞ্জন',
খঞ্জন আঁখি নাই, আছে শুধু অঞ্জন।
পূজা-বাড়ী কাঁদে একা,
প্রতিমা না যায় দেখা,
খেলা শেষ না হইতে ভাঙ্গিয়াছে খেলা হায়,
নাই নাই বলি কাঁদে সানাই যে নিরালায়!

সপ্ত রঙের সেই রামধনু আজো ওই
উঠিয়াছে নভে হায়, হেরি প্রাণ নাচে কই?

কোথা 'মনোরঞ্জন'—
আভা তার অতুলন !
'বিশ্বেশ্বর' আছে, আছে 'ক্ষিতি', বহে বায়,
'মনোরঞ্জন' শোভা নাই শুধু ধরা গায়।

নূতন বরষে হাসে হরষে ছেলের দল,
ঢোল কলমীর ফুলে ছেয়েছে দীঘির জল ;
রাখাল চরায় ধেনু
মাঠেতে বাজায়ে বেণু,
উড়িছে ফুলের রেণু বাতাসেতে করি ভর,
কাঠবিড়ালীর বাসা দুলিছে শাখার পর।

ভুলি সব শোক দুখ রামধনু তরে আজ
প্রাণের আশিস্ কবি পাঠায় কবিতা মাঝ।
খোকা-খুকু রও সুখে,
রামধনু নভো বুকে
উঠুক সুষমা ঢালি, নাচুক ছেলেরা সব,
হউক দীর্ঘজীবী বাঙলার 'কুশ-লব'।

কবিকিশোর

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্.এ)

'গঙ্গা আর নমসার বিল'

পালাপার্ব্বণ লেগেই থাক্‌ত গ্রামে। মাসের পর মাস ধ'রে নানা রকম পূজো হচ্ছে। ষষ্ঠীপূজো, চণ্ডীপূজো, মনসাপূজো (সিজু গাছ পুঁতে)—তার পর দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, কার্ত্তিক, সরস্বতীপূজো—আর নানান্ রকম ব্রত, উপোস, পারণের ব্যাপার আমাদের গ্রামে থাক্‌তই লেগে। ছোট বয়সে শুধু এই উৎসবই

পড়েছে চোখে। তা ছাড়া আমাদের মজার, আমোদের পূজো ছিল ধর্ম্মপূজো আর গাজনের চড়কপূজো। এ ছাড়া মনে পড়ে কোজাগর লক্ষ্মীপূজো, বিজয়াদশমীর ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না আর মিলনের আনন্দ-কোলাহল আর নানান্ রকম খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপার। একের পর এক এ সমস্ত মনে আসে। মাঝে মাঝে বাড়ীর পূজো ছাড়া বারোয়ারী পূজো হ'ত—আমরা সব অপরাজিতা লতা হাতে বেঁধে বেলপাতায় দুর্গানাম লিখে বিজয়াদশমীর জন্য প্রস্তুত হ'তাম। আমাদের ঠাকুর বিসর্জ্জন হ'ত কাছাকাছি একটা বিলে—'নমসা'র বিল তা'র নাম। সেখানে আমরা হেঁটে গিয়ে বেলপাতা আর অপরাজিতা লতা হাত থেকে খুলে বিলের কালো জলে ফেলে দিতাম। তার পর বাইচ্ খেলা হ'ত। আরও সব কাছাকাছি গ্রাম থেকে প্রতিমা আস্‌ত। এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রতিমা বিলের জলে নৌকোয় ঘুরিয়ে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হ'ত। মাঝে মাঝে আমরা তালডিঙিতে চেপে বিলের জলে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আস্‌তাম। বিসর্জ্জন আমাদের দেখ্‌তে নেই—

সেজন্যে সন্ধ্যের আগেই আমরা চ'লে আস্‌তাম। তার পর বিজয়াদশমীর এ-পাড়া ও-পাড়া বেড়ানো আর প্রণাম করা চল্‌ত। এখন সেই পূজোর আনন্দ বা রোমাঞ্চ আর নেই। পূজো হ'বে শুন্‌লে কি আনন্দ-ই না হ'ত !

'নমসা'র বিল মনের দ্বার খুলে দিল আমার। বিলটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। বারো মাস তা'র সম্পূর্ণ খাতটাতে জল থাকে না। বর্ষায় সারা খাতটা জলে ভ'রে যায়। আর যদি বান নামে, তা হ'লে কাছাকাছি সব বিলগুলিই এক সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আর একটা বড় গঙ্গার মত দেখায়। পাশাপাশি কি এত বিলও আছে! যাঁ'রা এখানে ঐতিহাসিক গবেষণা কর্‌বেন তাঁদের পক্ষে অনেক সুবিধে। নমসার

বিল, তা'র কিছু দক্ষিণে রাখ্‌রাখালির বিল, তা'র পরেই গঙ্গার বর্ত্তমান খাত। নমসার বিলের উত্তরে সেওড়াতলার বিল, তা'র কিছু দক্ষিণে বেলেজোল (এটা অবশ্য কাটা খাল, বর্ষায় একে ছোটখাট বিলেরই মত মনে হয়;— এই রকম ভাবে সমস্ত মাঠ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—খালে জোলে আর বিলে ভর্‌তি।

এগুলি দেখ্‌লেই মনে হয়, এককালে এই সব খাতেই গঙ্গার বহতা ছিল, তার পরে কালক্রমে বহতা বা প্রবাহ স'রে স'রে মুখ বন্ধ হ'য়ে বিলের উৎপত্তি হ'য়েছে। নমসার বিলের খানিকটা পূর্ব্বদিকে শোনা যায় এক বাঁধানো ঘাট আছে—আর কাছাকাছি মাইলখানেকের মধ্যে আছে এক প্রকাণ্ড গড়ের স্তূপ (যা' এখনো খোঁড়া হয় নি)। কেউ কেউ এ সব নিয়ে গবেষণা কর্‌ছেন শোনা যায়—অন্ততঃ প্রবন্ধাদি লিখ্‌ছেন এ সব নিয়ে। সাতটা গ্রাম পাশাপাশি, একই নামের। তা'দেরই একটিতে ঐ গড় আছে—যা'র বাঁধানো ঘাট পুরোনো গঙ্গার খাতে অর্থাৎ নমসার বিলে এসে পড়েছে। সেই গড় দেখেছি অনেকবার ছোট বয়সে। প্রকাণ্ড উঁচু স্তূপ—অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, তা'র পূর্ব্বে আর দক্ষিণে তু'টি প্রকাণ্ড পুকুর, আর চারিপাশে ভ'রে আসা বা ভরাট হ'য়ে-যাওয়া পরিখার চিহ্ন। দেখ্‌লেই মনে হয়, কিছু একটা ছিল, কোনো প্রাচীন রাজার বাড়ী হয়ত, কিংবা খুব বড় জমিদারের বাড়ী; তা'র সময় নির্ণয় করা বা তা'র সম্বন্ধে গবেষণা করার কাজ বিশেষজ্ঞের। নমসার বিলের পূর্ব্বদিকে এক নিবিড় বন, প্রায় তুর্ভেদ্য বল্‌লেই চলে। একটা ছোট পথ তা'র মধ্যে আছে—একজনের বেশী মানুষ যেতে পারে না। সেই বনে শোনা যায়, 'সের' বা বাঘ থাকে, সাধু খাজিরের আস্তানা সেটা। প্রকাণ্ড একটা বটগাছ এক অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের উপরে শাখা-প্রশাখা ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন ধ'রে বনস্পতিত্ব করছে। তা'রই নীচে থাকেন নির্জ্জনবাসী ফকির। তাঁ'র মাথার জট পা স্পর্শ করেছে। শনি-মঙ্গলবারে সেখানে খুব ভিড় হ'ত—সেই ফকিরের 'ভর' উঠ্‌ত। মানুষের ভবিষ্যৎ বল্‌তেন তিনি মাথা নেড়ে নেড়ে। সেখানে গিয়েছি ছোট বয়সে—কোনো এক দূর গ্রাম থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফির্‌বার পথে। যত দূর মনে পড়ে, নিবিড় বন

সেই প্রথম দেখেছি। ফকিরের চেয়ে বিস্মিত হ'য়েছিলাম বটগাছ দেখে। ছোট মন্দিরটিকে গ্রাস করেছে বিশাল বট; গ্রাস করেছে বটে, কিন্তু মন্দিরটিকে আবার সে তা'র বিশাল বিশাল ঝুরি দিয়ে ঘিরে রেখেছে, একেবারে নিরাপদ করেছে। এই ত হ'ল নমসার বিলের পূর্ব্ব পারের কথা, বিলের পশ্চিম পারে আছে আর এক অরণ্য। সেটা নমসার বিখ্যাত কালীবাড়ী। কিন্তু সে বড় সুন্দর। অসংখ্য তরুলতায়, বটে, অশ্বত্থে জায়গাটিকে সুন্দর, সুশীতল ক'রে রেখেছে। সেখানে গিয়েছি অনেক বার। এক সাধু বাবা সেখানে থাক্‌তেন, তাঁর সিঁদুর-মাখানো বিশাল ত্রিশূল, আর বিপুল তাঁর দেহ—শুধু এই মনে আছে। জায়গাটিতে এত স্নিগ্ধ ঘন ছায়া—আর সেই ছায়ায় বসেছি কত বার ছোট বয়সে। একদিনের কথা মনে আছে। আমরা অনেকে গেছি সেখানে নেমন্তন্ন খেতে। আমি গেছি, কোট প্যান্টালুন প'রে কি ধুতি পরে, ঠিক মনে নেই। সঙ্গে আমাদের মুখুজ্যে মশায় আর এক দূর সম্পর্কের দাদা, আরও আমাদের গ্রামের অনেকে গেছেন।

দাদার স্বভাব ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর একটু খবরদারী করা— 'এই কি হচ্ছে?'—এই রকম ভাব। মুখুজ্যে মশায়ের কোল ঘেঁষে চুপ্‌চাপ্ আছি ব'সে। এমন সময় দাদা আমার সমবয়সী আর একটি ছেলেকে আমার সাম্‌নে নিয়ে এলেন। মনে আছে, তার খুব ভদ্র বেশভূষা, কোট-প্যান্ট পরা—একেবারে সাহেব। দাদা তা'কে নিয়ে এসে বল্‌লেন, 'দেখি, তুমি কেমন ইংরেজী শিখেছ! চব্বিশ ঘণ্টা মাষ্টার ত আছেই লেগে, ইংরেজী কেমন শিখ্‌লে দেখি! কই, কথা কও দেখি এই ছেলের সঙ্গে, কেমন তুমি দেখি একবার!'

আমার সমস্ত সঙ্কোচ সত্ত্বেও উঠে দাঁড়া'তে হ'ল কিন্তু আমাদের মধ্যে ইংরেজী কথাবার্ত্তা কি হ'য়েছিল তা' কিছুই মনে নেই। বোধ হয় ইংরেজী কথাবার্ত্তায় সেই প্যান্টপরা ছেলেরই জিত হ'য়েছিল। সকলে তা'র পিঠ চাপড়া'তে

আর প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লেন—আমি পিঠ চাপড়ানো থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলাম।

তার পরে সেখানে কালীপূজোর ভোগ খাওয়া হ'য়েছিল। অদ্ভুত সব শাক পাতার তরকারী—তা'র আস্বাদ যেন এখনো মুখে লেগে আছে আমার! তার পরে বর্ষার দিনে তালডিঙি চ'ড়ে বিল দিয়ে ফিরে এসেছি গ্রামে। খানিকটা পথ অবশ্য হেঁটেই আস্‌তে হ'য়েছিল।

*

গঙ্গা ক্রমাগত স'রে স'রে যায়। আমাদের গ্রাম যেদিকে, সেদিকে তা'র ভাঙনের দিক্। ক্রমাগত গঙ্গা ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে সর্‌তে সর্‌তে আমাদের গ্রামের দিকে আস্‌ছে। এমন যদি সম্ভব হয়, যে, গঙ্গা ঐ সমস্ত পুরোনো খাতের সঙ্গে মিশে গেল, তা হ'লে কেমন হ'বে বলা যায় না। গঙ্গা বা ভাগীরথীই সৃষ্টি করেছে দেশ, বিলের সংখ্যাধিক্য দেখ্‌লে তাই মনে হয়। বর্ষার দিনে ষ্টীমার আস্‌ত আমাদের গঙ্গায়। গঙ্গার লাল ঘোলা জল তা'র প্রকাণ্ড চাকায় আবর্ত্তিত হ'তে দেখেছি ছোট বয়সে—আর ষ্টীমারের বাঁশী শুন্‌তাম গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে। ট্রেণের শব্দ, ষ্টীমারের বাঁশীর শব্দ গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে শুনে বড় অদ্ভুত মনে হ'ত। কত দূরে চলেছে ই. আই. আর—কাটোয়া লাইনের ট্রেণ, তা'র স্পষ্ট শব্দ আস্‌ত আমার কাণে। কৌতূহল হ'ত—রাত্রের নিথর নিস্তব্ধ বায়ুস্তরে শব্দ ভেসে যায় অনেক দূর, এ তথ্য তখন জানা ছিল না। বোধ হয় অনেক জিনিষ জানা না থাকাই ভালো—জান্‌লে তা'র রহস্য চ'লে যায়, কোনো চমৎকারিত্ব থাকে না।

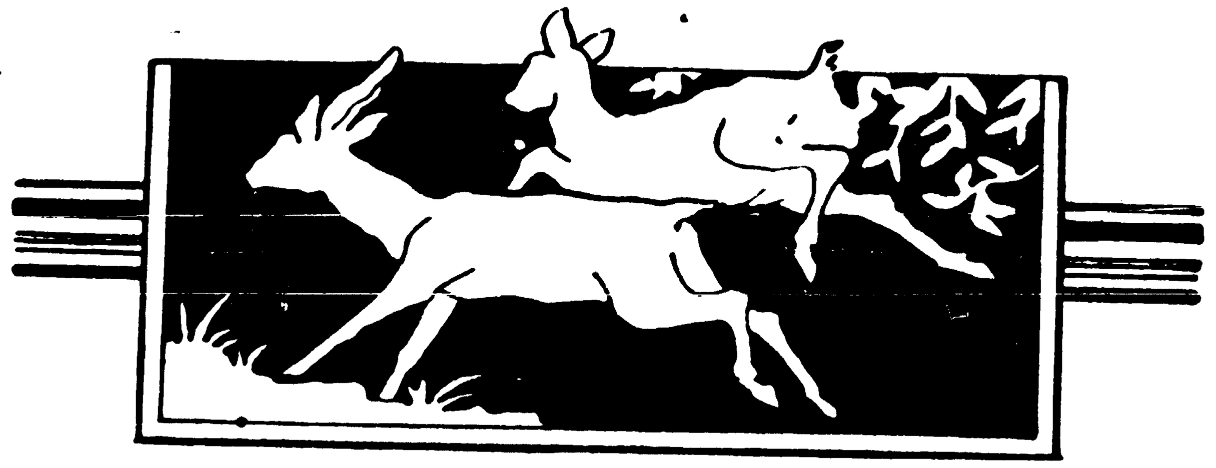

ডাকুর ছেলে

(কুঞ্জনাথ)

রঞ্জন আমার বন্ধু।

আমার চেয়ে বেঁটে, আমার চেয়ে কালো, আমার চেয়ে ঢের বেশী জোর তার গায়ে, আর ঢের বেশী সাহস তা'র বুকে। দেবু-দা'র আখড়ায় আমরা শিখতাম যু-যুৎ-সু'র প্যাঁচ; কিন্তু রঞ্জন যেন কেমন করে এ বিদ্যায় আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে উঠল। দেবু-দা'কে বলতে হ'ল,—'বড় হ'লে রঞ্জনটাই আমার নাম রাখবে।' রাখবে যে তা' আমরাও জানতাম, কিন্তু স্বীকার করত না কেবল রাধানাথ। রাধানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট-বয়। পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটা ওর এমনি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে সারা বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগেও ও ফার্ষ্ট হ'তে পারত। অঙ্কের মাষ্টারমশাই তিনকড়ি বাবুর কথায় ও ছিল 'ক্ষুদে নিউটন।' আর রঞ্জন? তিনকড়ি বাবু বলতেন, 'রঞ্জনটার কিস্‌সু হবে না; ওটা একটা আস্ত বাঁদর।'

কিন্তু আমরা জানতাম, এই আস্ত বাঁদরকেই তিনকড়ি বাবু একটু ভয় করে চলতেন। রঞ্জনের প্রোমোশন্ ছিল প্রায় 'অটোম্যাটিক'। এটা নতুন নয়, রঞ্জনের বাবার আমল থেকেই নাকি এ নিয়ম ইস্কুলে চ'লে আসছিল। রঞ্জনের বাবা ইস্কুল থেকে নাম পেয়েছিলেন 'ডাকু রায়'। ইস্কুল তিনি ছেড়েছিলেন বহুদিন, কিন্তু ইস্কুলের মাষ্টার-মশায়রা তাঁকে ছাড়েন নি। রঞ্জনের এতটুকু কিছু গুণ্ডামির পরিচয় পেলেই তাঁরা পুরোনো আমলের নজির দেখিয়ে তারস্বরে বলতেন, 'ডাকুর ছেলে তো! হবে না কেন।'

হ'লও তাই। স্বনামধন্য হবার আগেই রঞ্জন পিতৃনামের খ্যাতি লাভ করল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল আমার। বড়-রা এসে মেজ-কাকার কানে মন্তর দিলেন, 'করছ কি শৈলেশ, রঞ্জনটার সঙ্গে মিশে মিশে কুঞ্জটাও যে দিন দিন বাঁদর হ'তে চল্‌ল! রঞ্জন তার বাপের নাম রাখছে, কিন্তু কুঞ্জকেও তা রাখতে হবে তো!' মন্তরে কিন্তু বিশেষ ফল হ'ল না। মেজ-কাকা রঞ্জনের বাবার ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন, এখনো তাই। রঞ্জনের নামে নালিশ যদি বা তিনি সইতেন, রঞ্জনের বাবার নামে নালিশ তাঁর সইত না। মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে মেজ-কাকা বল্‌লেন, 'হবে বৈকি! তবে, রঞ্জন দুষ্টু ছেলে বটে কিন্তু অসৎ নয়। আর ডাকুর কথা? তা' ডাকুর পর মাষ্টার মশায়রা অমনি আর একটা বাঁদরই বা কই গড়তে পারলেন!' কাজেই বাঁশের

সার্টিফিকেটের জোরে রঞ্জন আমাকে পাশে রাখবার অধিকার পেয়ে গেল। এও সেই পুরোনো আমলের নজির ছিল ব'লেই।

কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে; রঞ্জনের বাবা বিখ্যাত ডাকু রায়েরও ছিল। ছেলের নামে অনেক নালিশ তাঁর কানে আসত। বড় হ'য়ে নিজের নামের কীর্ত্তি-কাহিনীগুলো তাঁর মনকে বিচ্ছুর মত কামড়াতে সুরু করেছে, ছেলেকেও পাছে কামড়ায় এই ভয়ে দুই হাতে ছেলের উপর শাসন সুরু করলেন। ছেলে কিন্তু দমল না, বাপের শাসন মুখ বুঁজে স'য়ে স'য়ে ক্রমেই শক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল। পাঁচ ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় গাছের ডালে একটি ঘণ্টা ঝুলে, উপোস করে, চাবুক খেয়ে ছেলের 'ডানপিটে' হবার প্রথম ভাগ শেষ হ'ল। 'দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হবার আগেই ডাকু রায় ধৈর্য্য হারালেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে একদিন পটাপট্ গোটা কত মামুলি চড়-চাপড় বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'হতভাগা, আমি নিজে ব'য়ে গেছি বাঁদরামি ক'রে, তুমিও যেতে চাও? আজই তোকে তোর মামার কাছে পাঠাচ্ছি। এখানে থেকে বাঁদরামি করে বেড়ানো তোমার বের করছি দাঁড়াও।' রঞ্জন মুখ বুঁজে প্রত্যেকটি চড়-গাল পেতে নিল; একটি কথা বল্লে না, এক ফোঁটা জল গড়াল না তার চোখ দিয়ে।

সেদিনের শাস্তির একটা গুরুতর কারণ ছিল। বিকেল বেলা রাধানাথের সঙ্গে রঞ্জন কথায় কথায় হঠাৎ বাজি ধ'রে বসল, রাত বারোটার পর রঞ্জন একা একা শ্মশানে যাবে। রঞ্জন গিয়েওছিল কিন্তু রাধানাথের দল গোপনে পিছু নিয়ে যখন দেখলে যে বাজি তা'রা হারতে বসেচে তখন ভয় দেখানোর জন্যে হঠাৎ কে-এক ছোকরা হুম্ ক'রে রঞ্জনের সামনে লাফিয়ে পড়ল। অমাবস্যার রাত, তায় শনিবার। যে লাফিয়ে পড়েছিল, রাম নাম স্মরণ ক'রে সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারেই রঞ্জন তার গালে এমন এক চড় বসাল যে সে কেবল একটিবার 'আঁক্' করেই ঘু'রে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথের দল দৌড়ে এল; টর্চ্চের আলোতে দেখা গেল রাধানাথ মাটিতে চিৎপাৎ,—মুখময় রক্ত। রঞ্জন চমকে উঠল। তার পর নিজেই রাধানাথকে কাঁধে তু'লে বাড়ি নিয়ে এল, নিজেই ডেকে আনল ডাক্তার, নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করল। রাধানাথের বাঁ কানের পর্দ্দা ফেটে গিয়েছিল, ডাক্তার অবশ্য অভয় দিয়েই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে চ'লে গেলেন।

পরদিনই নালিশ এল রঞ্জনের বাবার কাছে।

দুপুর বেলা রঞ্জন এল; এসেই গম্ভীর হ'য়ে ভাবতে ব'সে গেল।

বল্লাম, 'হ্যাঁরে রঞ্জন, কথাটা সত্যি?'

রঞ্জন সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে, 'আমার দোষ কি বল্ তো কুঞ্জ? ও যদি ভয় না দেখাত তা হ'লে কি ওর গায়ে হাত তুলি?'

কথাটা সত্যি। নিজের চেয়ে দুর্ব্বল ছেলের গায়ে রঞ্জন জীবনে কোন দিন হাত

তোলে নি। কিন্তু রাধানাথটার ওপর আমি নিজেও খুব সন্তুষ্ট ছিলাম না; ওর ওই ভালো-ছেলেমির দেমাক আমার সইত না। বল্লাম, 'বেশ করেছিস।'

রঞ্জন বল্লে, 'না রে। বড্ড লেগেছে রাধার। আমি চ'লে গেলে আমার হ'য়ে ওর কাছে তুই ক্ষমা চেয়ে নিস।'

অবাক্ হ'য়ে বললাম, 'চ'লে গেলে মানে? কোথায় চ'লে গেলে?'

রঞ্জনের গলা ভারি হ'য়ে উঠল; বল্লে, 'আজই মামা-বাড়ি চল্লাম।'

বল্লাম, 'তাই নাকি? ফিরবি কবে?'

রঞ্জন বল্লে, 'ফিরব না।'

সত্যিই আজ অবাক্ করলে রঞ্জন। বল্লাম, 'ফিরবি নে কি রে?'

রঞ্জন হাসতে চেষ্টা করে বললে, 'মানুষ হ'তে যাচ্ছি যে! এখানকার বাঁদরামি আমার শেষ হ'ল রে, কুঞ্জ।'

বুঝলাম, এটা শাস্তি। কিন্তু এত বড় শাস্তি ওকে ডাকু কাকা দিলেন কি ক'রে! এর চেয়ে দশ ঘা চাবুকও যে ওর ভাল ছিল!

রঞ্জন চ'লে যেতেই ওকে না জানিয়ে চুপি চুপি ডাকু কাকার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ডাকু কাকা তখন মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছেন; আড়চোখে আমাকে একবার দেখে কাগজে চোখ রেখেই বল্লেন, 'দুপুরবেলা কি মনে করে রে?'

বল্লাম, 'রঞ্জনের জিওমেট্রিখানা দিতে এসেছিলাম।'

ডাকু কাকা মুখের ওপর থেকে কাগজ নামিয়ে দুই চোখ কপালে তুলে অবাক্ হ'য়ে বল্লেন, 'রঞ্জনের জিওমেট্রি! আছে নাকি? কি ক'রে সে ওটা দিয়ে?'

বল্লাম, 'আমাদের পড়ানো হয় যে!'

ডাকু কাকা আবার মুখের উপর কাগজ তুলে ধরে বল্লেন, 'তবে তোরাই ওটা রেখে দে। কেন মিছেমিছি বইখানা ওকে দিয়ে নষ্ট করবি?'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'রঞ্জন আজ মামা-বাড়ি যাবে নাকি, কাকা?'

কাগজে চোখ রেখেই ডাকু কাকা বল্লেন, 'চুলোয় যাক্।'

তার পর একটু থেমে বল্লেন, 'তবে একেবারে চুলোয় যাবার আগে সেখানে ছাড়া আর যাবেই বা কোথায়?' বুঝলাম, কোন উপায় নেই; রঞ্জনকে যেতেই হবে।

আমাকে চ'লে আসতে দেখে ডাকু কাকা হঠাৎ কাগজখানা ভাঁজ ক'রে রেখে বল্লেন, 'কিচ্ছু করছে না এখানে থেকে, কেবল বাঁদরামি ক'রে বেড়াচ্ছে। মামারা ওর সবাই বিদ্বান্, মামাতো ভাইগুলোও বেশ ভাল ছেলে। ওদের মধ্যে থাকলে শোধরাতেও পারে। কি বলিস?'

বলবার যা ছিল, ডাকু-কাকার কাছে তা' কোন মতেই বলা চলে না; কাজেই বল্‌লাম, 'যাক্।'

ডাকু-কাকা বল্‌লেন, 'হ্যাঁ যাক্। তার পর এই তো সামনেই পূজোর ছুটি, তার পর বড় দিন, তার পর গরমের বন্ধ,—যাতায়াত তো লেগেই রইল। কি বলিস?'

বল্‌লাম, 'সে তো ঠিকই।' সুতরাং রঞ্জনকে যেতেই হ'ল।

যাবার দিন গাড়িতে উঠে রঞ্জন বল্‌লে, 'ভূত-পুকুরে একা-একা যাস নে কুঞ্জ; আর রাধাকে বলিস, পূজোর ছুটিতে এসে আমি ওকে সন্দেশ খাওয়াব।'

বল্‌লাম, 'চিঠি লিখবি তো রঞ্জন?'

রঞ্জন বল্‌লে, 'ধ্যেৎ, ও-সব চিঠি-ফিঠি আমি লিখতে পারি নে।'

বল্‌লাম, 'লিখিস রঞ্জন; তোর চিঠি পেলে আমার বেশ লাগবে।'

চোখে আমার আর একটু হ'লেই জল এসে পড়েছিল; গাড়ি ছেড়ে দিল। জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে যত দূর দেখা যায়, রঞ্জন চেয়ে রইল।

মামা-বাড়ি এসে রঞ্জন মুস্কিলে পড়ে গেল। জেলার নাম-করা উকিল তার বড় মামা; মেজ মামা এঞ্জিনিয়ার; সেজ মামা ডাক্তার; সেজ মামার ছেলে সুব্রত এবার ম্যাট্রিক্ দেবে,—স্কলারশিপের আশা করছে। মামাতো বোনেদের একজন কলকাতায় বোর্ডিং-এ থেকে বি-এ পাশ করেছেন; একজন আই-এ পড়ছেন, আর একজন আসছে বার ম্যাট্রিক্ দেবে। এদের মধ্যে রঞ্জন এসে পড়ল একেবারে খাপ-ছাড়া গোঁজামিল হ'য়ে। কেবল তাই নয়; মামা-বাড়িতে রঞ্জন আসবার অনেক আগে এসেছে রঞ্জনের খ্যাতি; কাজেই অভ্যর্থনাটাও হ'ল একটু ঘটা করেই। বড় মামী বল্‌লেন, 'ও মা! একি চেহারা হয়েছে তোর! সন্থ জঙ্গল থেকে ধ'রে আনলে যেন!'

মেজ-দি নিরুপমা বল্‌লেন, 'মাগো! আমার তো ভয়ই হয়েছিল কে-না-কে বাড়িতে ঢুকছে ব'লে!'

রঞ্জন দ'মে গেল। কেমন ক'রে এরি মধ্যে সে দিনের পর দিন থাকবে! কিন্তু থাকতেই হবে যে। এ তার বাপের দেওয়া শাস্তি। কোন দিন প্রতিবাদ করে নি, আজও করবে না।

বড়-দি বি-এ পাশ করেছেন। এই অসাধারণ ব্যাপারটা পাছে কারো নজর এড়িয়ে যায় এই ভয়ে তাঁকে তাঁর পদ-মর্য্যাদা বেশ একটু উঁচু করেই তু'লে ধ'রে রাখতে হয়। কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেন না; কলকাতার বন্ধুদেরকে চিঠি লিখে, বই প'ড়ে, সেলাই ক'রে যেটুকু সময় পান, মেজ-দি আর সুব্রতর পড়া ব'লে দিতেই সেটুকু কেটে যায়। তাঁর সতর্ক তত্ত্বাবধানে কয়েকটা দিন রঞ্জন বেশ পড়াশুনা করবার চেষ্টা করল; কিন্তু সে কেবল চেষ্টাই হ'ল, মনটা রইল অনেক

দূরে,—তুলসী-হাটার জঙ্গলে। মামারা বুঝলেন, ছেলেটার সুমতি হচ্ছে; বড়-দি বুঝলেন, ইচ্ছে করলেই যে-কোন কলেজের প্রফেসর হিসেবে তিনি নাম করতে পারেন; রঞ্জন বুঝল, এমন ক'রে বেশী দিন চলবে না,—চলতে পারে না।

পূজোর ছুটি এসে গেল, কিন্তু এল না রঞ্জন। বড় মামা লিখেছেন, 'সবে পড়াশুনায় মন দিয়েছে, এরি মধ্যে এখন দলে গিয়ে মিশলে আবার হয়ত বেঁকে বসবে; সুতরাং ছুটিতে রঞ্জন এখানেই থাকবে।'

এদিকে ষষ্ঠীর বোধনে সানাই বেজে উঠল, বুকের ভেতরে আমার কেঁদে উঠল সেই বাজনা; ওদিকে ভোর থেকে বাজছে নবমীর মঙ্গল আরতি, জানালার ধারে আকাশের দিকে চোখ তু'লে ব'সে ভাবছে রঞ্জন।

বড়-দি এসে বল্‌লেন, 'ক'-দিন থেকে ডাঁশা পেয়ারা খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে, রঞ্জন; যাবি একবারটি বাজারে?'

রঞ্জন চম্‌কে উঠে বল্‌লে, 'বাজারে! কেন, ভূত-পুকুরের গাছে তো—'

রঞ্জনের চোখের দিকে চেয়ে বড়-দি অবাক্ হ'য়ে গেলেন; বল্‌লেন, 'না না, কারো গাছে হাত দিস নে; মণ্টু আর তুই বাজারে যা।'

মণ্টু সুব্রতর ডাক-নাম। রঞ্জন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, 'তাই যাচ্ছি, বড়-দি।'

পথে পড়ল হালদারদের ফলের বাগান। হালদারদের পেয়ারার নাম আছে বাজারে। প্রাচীর-ঘেরা বাগান, লোহার ফটক, ফটকে দুষ্‌মনের মত সাঁওতাল মালী। রঞ্জনের চোখ জ্ব'লে উঠল; বল্‌লে, 'মণ্টু, দেখছিস পেয়ারা?'

মণ্টু ভয়ে ঘেমে উঠল; বল্‌লে, 'না রে, কাজ নেই। হালদাররা লোক খারাপ।'

রঞ্জন বল্‌লে, 'দুত্তোর হালদার! এমন পেয়ারা কি ছাড়া যায়! তুই এই পাঁচীলের গোড়ায় এক মিনিট দাঁড়া, আমি যাব আর আসব।'

মণ্টু কিছুতেই রাজি হবে না; রঞ্জন অনেক ক'রে তা'কে বুঝিয়ে রাজি ক'রে প্রাচীর বেয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। সাঁওতাল মালীটা কিন্তু আড়চোখে সবই দেখেছে; হাতে-নাতে ধরবে ব'লেই চুপ করে ছিল। রঞ্জন ভেতরে ঢোকা মাত্র সে শেয়ালের মত চুপি চুপি এসে হঠাৎ খপ্ ক'রে মণ্টুর হাত ধ'রে ফেল্‌লে। মণ্টু ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। মালী সে চীৎকারে কান দিলে না; রাগে গরগর করতে করতে লোহার মত শক্ত হাতে চড় তুলল। সে চড় মণ্টুর গালে পড়লে গাল থাকত না; কিন্তু মণ্টুর গালে চড় পড়ল না, প্রাচীরের ওপর থেকে ঝুপ্ ক'রে রঞ্জন পড়ল মালীর কাঁধে। মুখ থুবড়ে প'ড়ে পাথরের নুড়িতে লেগে মালীর ঠোঁট কেটে রক্তের স্রোত বইল, সাঁওতালের পো চোখে অন্ধকার দেখলে।

ব্যাপারটা সামান্ত ; কিন্তু সামান্ত ব্যাপারকেই গুরুতর ক'রে তুলতে হালদারদের জোড়া নেই। সেই দুপুরেই বড় মামার কাছে এল সতীশ হালদারের চিঠি,—হয় টাকা, নয় মামলা। বড় মামা চ'টে আগুন ! ডাক পড়ল রঞ্জনের। তর্জ্জন ক'রে বড় মামা বল্‌লেন, 'মেরেছিস্ কেন হালদারদের মালীকে ?'

রঞ্জন বল্‌লে, 'ও কেন মারতে এসেছিল মণ্টুকে ?'

বড় মামা মুখে-মুখে কথা সইতে পারেন না ; গরম হ'য়ে বল্‌লেন, 'বেশ করেছিল। মারবে না ! পূজো করবে ! পরের বাগানে চুরি করে খেলে মারবে না ?'

রঞ্জন জোর গলায় বল্‌লে, 'চুরি তো মণ্টু করে নি, আমি করেছি।'

রাগলে বড় মামার জ্ঞান থাকে না ; বল্‌লেন, 'এটা চোর-ছ্যাঁচড়ের আড্ডা নয়, ভদ্দর লোকের বাড়ি। ভাল ভাবে থাকতে পার, থাক ; নইলে চোর পুষতে পারব না।'

রঞ্জনের কপালের দুটো শির দড়ির মত ফুলে উঠল ; দাঁতে দাঁত চেপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াল।

সেই যে রঞ্জন বাড়ি থেকে বেরোল, আর সেখানে ঢুকল না। বিকেল বেলা তার খোঁজ পড়ল, কিন্তু খুঁজে তা'কে পাওয়া গেল না। তার পর সোরগোল প'ড়ে গেল, চারদিকে লোক ছুটল, থানায় খবর গেল, কিন্তু রঞ্জন নিরুদ্দেশ। যারা খুঁজতে বেরিয়েছিল, রাত দশটায় ফিরে এসে তারা ব'সে পড়ল। বড় মামা অপ্রস্তুত, বড়-দি ভেবে সারা, সুব্রত ভয়ে জড়-সড়।

দশমীর দিন সকাল বেলা সবে হাত-মুখ ধুয়ে নতুন গল্পের বইখানার পাতা ওল্টাচ্ছি, রঞ্জন এসে ধপ্ ক'রে পাশে ব'সে পড়ল।

চম্‌কে উঠে তার হাত ধ'রে বল্‌লাম, 'কখন এলি রে ? 'রাত্তিরে বুঝি ?'

'না রে, এই আসছি, এখনো বাড়ি যাই নি। কিছু খাওয়াবি, কুঞ্জ ? পেট জ্ব'লে যাচ্ছে।'

অবাক্ হ'য়ে বল্‌লাম, 'এই আসছিস কি রে ? এখন গাড়ি কোথায় ?'

রঞ্জন চুপি চুপি বল্‌লে, 'গাড়িতে নয়। কাউকে বলিস নে, কুঞ্জ ; গৌড়ের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা পথ ; সারা রাত হেঁটেছি।'

অবাক্ হ'য়ে রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

•

বেলা আটটার সময় ডাকু-কাকার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লাম, 'আচ্ছা কাকা, একটা রাত্তিরে কোন ছেলে যদি চোদ্দ ক্রোশ পথ হাঁটতে পারে, আজকের দিনে কি ব'লে আপনি তা'কে আশীর্ব্বাদ করেন ?'

ডাকু-কাকা বড় বড় ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'বলিস কি রে ! সে মরদের বাচ্চাকে আমি বুকে ক'রে রাখব যে ! একটা মানুষের মত মানুষ হবে সে। তুই পারিস নাকি ?'

কী ভালই যে লাগল ডাকু-কাকার কথা শুনে ! মুখে বল্‌লাম, 'না, কিন্তু রঞ্জন পারে।'

ডাকু-কাকা থতমত খেয়ে বল্‌লেন, 'রঞ্জন ! কে বল্‌লে ?'

বল্‌লাম, 'আজকের দিনে আপনি ওকে বকতে পাবেন না, কাকা ; রঞ্জন ফিরে এসেছে।'

ডাকু-কাকা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বল্‌লেন, 'ফিরে এসেছে ! কেমন ক'রে এল ?'

'যেমন ক'রে এলে আপনি ওকে মানুষের মত মানুষ বল্‌বেন, ঠিক তেমনি ক'রে।'

ডাকু-কাকা কোন কথা বল্‌লেন না ; কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, আর রঞ্জনের ভয় নেই।

দুপুরে নতুন জামা-কাপড় প'রে এসে রঞ্জন দাঁত বের করে বল্‌লে, 'কেমন দেখাচ্ছে রে ?'

হেসে বল্‌লাম, 'আস্ত বাঁদরের মত।'

আমাদের ভাগ্যবিধাতা

(অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি, এম্.বি)

তোমরা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ যে পৃথিবীর ২০০ কোটী মানুষের মধ্যে অর্দ্ধেক স্ত্রী এবং বাকী অর্দ্ধেক পুরুষ হইল কেন ? আবার দু'জন লোকই বা হুবহু একই রকম হইল না কেন ? আমাদের যে কোনও একজনের সঙ্গে আর এক জনের তুলনা কর। দেখিবে কি দেহের গঠনে, শরীরের উচ্চতায়, গায়ের রংএ বা পারিপাট্যে কিংবা বুদ্ধিতে একজন অপর জন হইতে বিভিন্ন। এমন দুইটী লোক দেখিতে পাইবে না যাহারা সব বিষয়ে এক রকমের। তোমরা অবশ্য বলিবে, যমজ ভাইএরা ত' অনেক সময় দেখিতে ঠিক একই রকমের হয়। কিন্তু যদি শারীরিক সাদৃশ্যের কথা না ধর তবে দেখিবে যে যমজ ভাইদের মধ্যেও মানসিক বিকাশে অনেক তফাৎ দেখা যায়। ইহার কারণ কি ? এক ক্লাশে পড় ৪০টী ছেলে, একই রকম ভাবে "মানুষ" হইলে। ইহার মধ্যে বৎসর কয়েক পরে দেখা গেল যে এই ক্লাশের একজন শারীরিক উৎকর্ষতায় অপর সকলকে

ছাড়াইয়া গেল—সে হয়ত মোহনবাগানের গোষ্ঠ পালের মত বিখ্যাত খেলোয়াড় হইল অথবা গোবর বাবুর মত পালোয়ান হইল। আর একজন হয়ত আশু বাবুর মত হাইকোর্টের জজ্ ও ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত হইল। আর একজন হইল চিত্তরঞ্জনের মত দেশপ্রেমিক। বাকীরা সারা জীবন রোগে ভুগিয়া কায়ক্লেশে জীবন কাটাইল। ইহার কারণ কি? ইহা কি কেবল অদৃষ্টের খেলা, না এই জীবনের পুরুষকার বা চেষ্টার ফল? এই লইয়া অনেক পণ্ডিতের অনেক মত বড় হইয়া শুনিবে। আমি আজ একটা মতের কথা তোমাদের বলিব।

ইহজীবনের চেষ্টাই মানুষের সাফল্যের কারণ এই কথাটার মধ্যে একটা মস্ত গলদ আছে। বড় হইবার ইচ্ছাই অনেকের হয় না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাশে ফার্ষ্ট হইবার জন্য চেষ্টা কর বটে কিন্তু দেখিবে এক দল নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। আবার কাহারও কাহারও বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেও শরীর ও মনের যোগ্যতার অভাবে বড় হইতে পারে না। সারা জীবন প্রাণপণে ফুটবল খেলিলেই শুধু গোষ্ঠ পাল হওয়া যায় না, আর দিনে ১৪ ঘণ্টা পড়িয়াও সকলে হাইকোর্টের জজ্ হইতে পারে না। তা হইলে এ ব্যাপারে আরো কোনও কারণ আছে। শারীরতত্ত্ববিদেরা এর 'কারণ' আবিষ্কার করিয়াছেন আমাদের শরীরেরই মধ্যে।

তাঁহারা বলেন, মানুষের স্বাতন্ত্র্যের বা ব্যক্তিত্বের জন্য দায়ী তাহার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থির কাজ করিবার ধারা। গ্রন্থি আমাদের শরীরে অনেক রকমের আছে। তাহাদের কাজ হইতেছে রক্ত হইতে মালমসলা লইয়া শরীরের বিভিন্ন প্রকারের রসের সৃষ্টি করা। এই সকল রস নানা রকমে ব্যবহারে লাগে। এক প্রকার গ্রন্থি আমাদের পাচক রস তৈরী করিতেছে এবং সেইজন্য আমাদের খাবারগুলি সহজে পরিপাক হইতেছে। আমাদের ত্বকে বা চামড়ায় আছে ঘর্ম্মগ্রন্থি। বৃক্ক (Kidney)ও এক রকম গ্রন্থি। ইহারা রক্তের দূষিত জিনিষগুলিকে ঘাম ও মূত্ররূপে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে। এ সব গ্রন্থি ছাড়াও আর এক ধরণের গ্রন্থি আছে যাহাদের সৃষ্ট রস বাহিরে না আসিয়া আবার রক্তের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহারাই আমাদের সব রকম শারীরিক ও মানসিক কাজগুলিকে চালায়। পণ্ডিতদের

মতে ইহারাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। যে লোকের এই গ্রন্থিগুলি সতেজ ও সবল এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রসের সরবরাহ করিতে পারে সেই লোকই সব বিষয়ে "চৌকস" হইবে। কিন্তু তা সচরাচর হয় না। হয়ত একদল গ্রন্থি প্রবল হইয়া লোকটীকে অসাধারণ ধী-সম্পন্ন করিল কিন্তু অপর গ্রন্থিদের রসের অভাবে সেই লোককেই হয়ত দুর্ব্বল দেহে দিন কাটাইতে হইল। আবার আর একজন হয়ত একদল গ্রন্থির সাহায্যে শারীরিক উৎকর্ষতা লাভ করিল কিন্তু অন্যের অভাবে মানসিক পঙ্গু হইয়া রহিল। আবার শরীর ও মন কিছুরই উৎকর্ষতা নাই এমন লোকেরও অভাব নাই—সব রকম গ্রন্থি-ই সেখানে নিস্তেজ বলিয়া। সুতরাং এই মত অনুযায়ী আমাদের কপালের লিখন লেখে এই ছোট ছোট গ্রন্থির দল। অবশ্য এই সব গ্রন্থি কেমন হইবে সেটা কতকটা নির্ভর করে পূর্ব্বপুরুষের উপর এবং কতকটা ঠিক কিসের জন্য তা এখন পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যাই হোক্ এই সব ভাগ্য-বিধাতাদের কথা হয়ত তোমাদের ভাল লাগিবে। ইহাদিগকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—(১) গলায় থাইরয়েড ও পারাথাইরয়েড, (২) পেটে বৃক্কের উপরে সুপ্রারেনাল, (৩) পুরুষ ও স্ত্রী বাচক গ্রন্থি, (৪) মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্কের নীচে—পিটুইটারী।

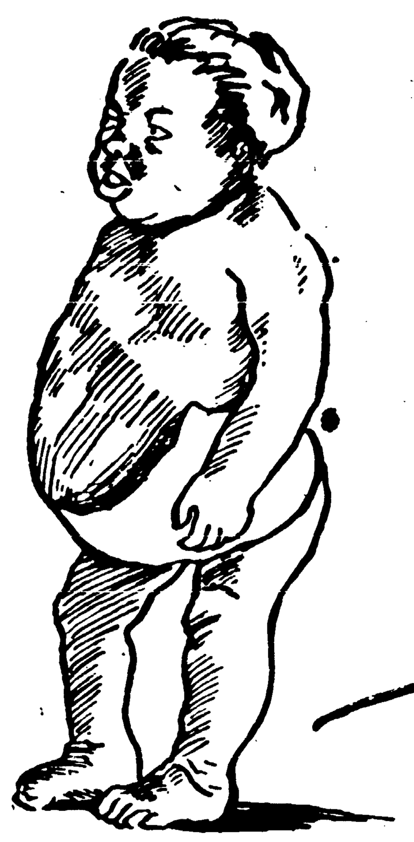

থাইরয়েড অভাবে হাবাগোবা বামন

থাইরয়েড দীপ্তি

ইহাদের মোটামুটী কাজ কি এবার আলোচনা করা যাক্।

থাইরয়েড আমাদের পুষ্টির সহায়তা করে, ইহার অভাবে শরীর সুগঠিত হইতে বা বাড়িতে পারে না। মানসিক উৎকর্ষতার জন্যও ইহা দায়ী কারণ ইহা

মস্তিষ্ক ইত্যাদির গঠনের সাহায্য করে। ইহা দ্বারা শরীরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যগুলি যথারীতি দগ্ধ হয় অর্থাৎ খাদ্যের দুই রকম উদ্দেশ্য—শরীর গঠন করা, এবং দহনের দ্বারা শরীরকে গরম রাখা ও শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেওয়া, দুইটাই সফল হয় থাইরয়েডের সাহায্যে। ইহার অভাবে মানুষ শরীর ও মন দুই দিক্ দিয়াই পঙ্গু হয়, আবার ইহার উৎকর্ষতায় মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটে, দেহেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। অবশ্য ইহার রসাধিক্যে মানুষ ধী-সম্পন্ন না হইয়া ভাবপ্রবণ ও চঞ্চলমতি হয়।

প্রত্যেক থাইরয়েড গ্রন্থিতে এক জোড়া পারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। ইহাদের কাজ রক্তে ক্যালসিয়াম্ বা খটিকের ভাগ ঠিক রাখা। শরীরে ক্যালসিয়াম্ অনেক রকম কাজে লাগে। আমাদের কাঠামো বা কঙ্কাল ক্যালসিয়াম্ দিয়া তৈরী; ইহার সাহায্যে রক্ত জমাট বাঁধে, মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং স্নায়ু শীতল থাকে। পারাথাইরয়েড অভাবে এক প্রকার ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

সুপ্রারেনাল গ্রন্থি দুটী টুপির মত বৃক্কের উপর থাকে। ইহার দুটী অংশ। বাহিরের অংশ শরীরের রক্তকে জলীয় অবস্থায় রাখে। ইহার অভাবে রক্ত শুকাইয়া যাওয়াতে মানুষ বাঁচিতে পারে না, ইহার আধিক্যে মানুষ কঠোর পরুষ-ভাবাপন্ন এবং কর্কশাকৃতি হয়।

সুপ্রারেনালের ভিতরের অংশ যে রসের সৃষ্টি করে তাহার নাম 'এড্রিন্যালিন'। ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ড উত্তেজিত হয়, রক্তনালী সঙ্কুচিত হইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে শরীরে সর্ব্বত্র রক্ত চলাচল ভাল ভাবে হইতে পারে। তা ছাড়া মাংসপেশীগুলিও বেশী চিনি পায় এবং তাহা পোড়াইয়া ভাল ভাবে কাজ করিতে পারে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বিপদ্-আপদে এই রস শরীরের সর্ব্বত্র বেশী করিয়া চালিত হওয়ায় আমরা বিপুল উদ্যমে বিপদ্ এড়াইবার অনেক রকম উপায় অবলম্বন করিতে পারি। এই রসটী আজকাল ঔষধ রূপে ডাক্তারেরা খুব বেশী ব্যবহার করেন।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক গ্রন্থিগুলিই কোন মানুষকে পুরুষের আকার, কোন মানুষকে স্ত্রীর আকার দিতেছে। গোড়াতে আমাদের প্রত্যেকের দুইটী গ্রন্থিই ছিল—পরে

একটী গ্রন্থি বাড়িয়া ও অপরটী শুকাইয়া যাওয়াতে আমরা কেউ পুরুষ কেউ বা স্ত্রী হইয়াছি। তোমরা খবরের কাগজে মাঝে মাঝে পড়িয়া থাকিবে যে অমুক জায়গায় একজন স্ত্রীলোক ক্রমে পুরুষ হইয়া যাইতেছেন। তাহার কারণ—দিন কয়েক স্ত্রী-বাচক গ্রন্থি সতেজে বাড়িয়া মানুষটাকে স্ত্রীলোক করিয়াছিল; পরে তাহা যদি শুকাইয়া যায় এবং পুরুষ-বাচক গ্রন্থিটী বাড়িতে আরম্ভ করে তবে স্ত্রীলোকটী পুরুষ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? দু'টীরই যদি অভাব ঘটে তবে ক্লীব মানুষের সৃষ্টি হয়।

অবশেষে গ্রন্থি-সম্রাট্ পিটুইটারী। ইহার কার্য্যের ইয়ত্তা নাই। ইহাই বাকী সব ভাগ্য-বিধাতাদের নিয়ন্তা। তা ছাড়া ইহার আর এক কাজ হইতেছে শরীরের কঙ্কালের গঠন ও পুষ্টি। পিটুইটারী রসের প্রাচুর্য্যে অতিকায় মানবের আবির্ভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহার রসের অভাবে বামনের সৃষ্টি হয়।

পিটুইটারী বৃদ্ধিতে অতিকায় মানব   পিটুইটারী অভাবে বামন

আজ তোমাদের খুব সংক্ষেপে এগুলির কথা বলিলাম। তোমরা বড় হইয়া এই অতীব শক্তি-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিদের ক্ষমতার বিষয় পড়িয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবে সন্দেহ নাই।

বিনির জন্মদিনে—

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বিনির জন্মতিথি আবার আসন্ন হয়েছে, বিনি নিজেই আমাকে জানিয়ে রেখেছিল। এক মাস আগে থেকেই, বল্‌তে গেলে। এবং এবারও তার কলেজের বন্ধুদের নেমন্তন্ন কর্‌বে, সে-নোটিশও আমি পেয়েছিলাম। একটু ভয়ে-ভয়েই ছিলাম, বল্‌তে কি!

বিনির কলেজের বন্ধুদের অপছন্দ করি, এ কথা আমি বল্‌তে পারব না। ভয়? না, ভয় করব কেন? ভয় করবার কিছু নেই।

অপব্যয়ের আশঙ্কা? তাই বা এমন কি? একটা বই লিখ্‌তেই বা কতটা, আর, তা বেচে ফেল্‌তেই বা কতক্ষণ? তা ছাড়া, মাস খানেক থাক্‌তেই যখন নোটিশ্‌ পেয়ে গেছি—যথা সময়েই, বল্‌তে গেলে—

না, সে সব নয়। কেবল ঐ প্রফুল্ল-নলিনী—

আমি বরাবর দেখেছি, যুক্তাক্ষর দিয়ে মেয়েদের নাম হ'লেই মারাত্মক। ত্রৈলোক্যতারিণী, কৈবল্যদায়িনী, দিগন্তবাসিনী—এ সব শুন্‌তেই বুকে ধাক্কা লাগে কেমন! প্রথম আলাপেই খতম্‌ হয়ে যেতে হয়।

এবং বিনির এই বন্ধুটি! কেবল নলিনী হ'লেও কোন ক্ষতি ছিল না। প্রফুল্লই হ'তে পার্‌তাম আমি, কিন্তু একেবারে এবং একাধারে প্রফুল্লনলিনী হয়েই মাটি করেছে, আমাকেও দমিয়ে দিয়েছে।

মেয়েদের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই যদি মধুসূদনকে স্মরণ কর্‌তে হয়—মাইকেল্‌ মধুসূদনকে—তা হ'লেই তো হয়েছে। আলাপ মানেই তো মিত্রতা? ভাব জমাবার ভূমিকা অন্ততঃ? কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ বজায় রেখে আলাপ চালানো মুস্কিল। আমি অন্ততঃ পেরে উঠি নে। বুক কাঁপে আমার।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিনিকে একবার শুধিয়েছিলাম: "প্রফুল্ল? প্রফুল্লও আস্‌বে তো?"

বিনি ঘাড় নেড়েছে: "বাঃ! সে না এসে পারে?"

এবং আমি খুব উৎফুল্ল হ'তে পারি নি।

বিনি ফার্স্‌ট্‌ ইয়ারে পড়্‌বার সময়ে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার পরিচয়,—প্রথম যে বারে কলেজের বন্ধুদের জন্মদিনের আসরে আন্‌বার ও সুযোগ পেল; এবং সেই প্রথম দর্শনেই।

তার আগে তার ইস্কুলের বন্ধুদের নিয়ে কখনও ভীতির কারণ ঘটে নি। তারা আমার কাছেই ঘেঁষ্‌ত না। নিজেদের চেঁচামেচি, ক্যারম্‌ বোর্ড্‌ আর কেক্‌-পুডিং নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌ত। ব্যস্তিব্যস্তই থাক্‌ত বল্‌তে গেলে। দৈবাৎ কেউ একটু ঘনিষ্ঠতা দেখালে চকোলেট্‌ দিয়েই তাকে নিরস্ত করা যেত। সহজেই যেত। গোলমাল ছিল খুবই, কিন্তু কোন গোল ছিল না।

কিন্তু প্রফুল্ল-নলিনী প্রথম দর্শনেই অটোগ্রাফের খাতা বের ক'রে বস্‌ল।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লাম।

অটোগ্রাফে আমার ভারী ভয়। ওর খাতায় দু' এক ছত্রের কবিতা ছড়ানোই দস্তুর। আর কবিতা আমার আসে না, একদম্‌ না। এক কালে অবশ্যি আস্‌ত, খুবই আস্‌ত, ঘন ঘনই বল্‌তে গেলে, কিন্তু আজকাল আসা ছেড়ে দিয়েছে। কেন, বল্‌তে পারি না।

কবিতারা ভারী খেয়ালী। অন্ততঃ আমার কবিতারা।

এই সংবাদ জানাতেই প্রফুল্ল-নলিনী হেসে উঠ্‌ল: "কী যে বলেন! কবিতা আবার আসে না! না ডাক্‌তেই তো এসে পড়ে। টন্‌ কে টন্‌ আসে। দিস্তাকে দিস্তা উড়ে যায়। কবিতা লিখে লিখেই আমার কলম ক্ষয়ে গেল।—"

এই ব'লে, কোত্থেকে জানি নে,—মন্ত্রবলেই কিনা কে বল্‌বে—ম্যাজিকের মতই প্রকাণ্ড এক খাতা বের ক'রে বস্‌ল।

"আপনাকে দেখাবার জন্যেই এনেছি। ছন্দটন্দগুলো একটু শুধ্‌রে দিতে হবে আপনাকে। আর মিলটিল গুলো—"

প্রায় শ' আড়াই কবিতা। পয়ার, কাপ্‌লেট্‌, সনেট্‌, লীরিক্‌, গাথা—মায় গদ্য কাব্য পর্য্যন্ত। প্রায় সবই আমাকে দেখে দিতে হ'ল। তাতেও নিস্তার পেলুম না। তাকে শুনিয়ে দিতে হ'ল আবার; আমি পড়্‌লাম, সে শুন্‌ল। তারপরেও, আর একবার শুনে দিতে হ'ল সে সব। সে পড়্‌ল, এবং আমি—আমিই শুন্‌লাম। সারা বেলা সেদিন কবিতাচ্ছন্ন হয়েই কেটে গেল।

এবং তার ধাক্কাতেই জ্বরে পড়ে গেলাম। ভারী বাঁকা রকমের জ্বরে। টাইফয়েড্‌ দাঁড়াল তাই থেকে। সেই কবিতা থেকেই, আমার বিশ্বাস।

বিনির সেকেণ্ড ইয়ারের জন্মদিনে, চিল্‌কোঠায় গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌লাম। কাউকে না জানিয়ে, বিনিকেও না। প্রিভেন্‌সন্‌ ইজ্‌ বেটার্‌ দ্যান্‌ কিওর্‌।

নিরিবিলিতে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম বোধ হয়। হঠাৎ সচকিত হয়ে জেগে উঠ্‌লাম। জেগে উঠেই দেখ্‌লাম—দেখ্‌লাম এবং শুন্‌লাম। কাকে আর? প্রফুল্ল-নলিনীকে।

"বেশ লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। একলা একলাই! বেশ!"

"না, লুকোচুরি খেল্‌ব কেন? এই, এই একটু—"

"এবার কতগুলো খণ্ডকাব্য লিখেছি! এই দেখুন!—"

পেল্লায় সব কবিতা-ভর্ত্তি প্রকাণ্ড এক খাতা বার করে প্রফুল্ল-নলিনী।

না, অজ্ঞান হয়ে যাই নি; বেশ মনে আছে আমার। অজ্ঞান হয়ে গেলে রক্ষা পেতাম। সেবার আমার হুপিংকাফ্‌ হ'ল। সেই খণ্ডযুদ্ধে, খণ্ডকাব্যের সংঘর্ষেই কিনা কে জানে!

এবার বিনির থার্ড্‌ ইয়ার্‌। প্রফুল্লরও। দুঃখের বিষয়, একজনেরও একবারও ফেল্‌ যাবার নামটি নেই। ফেল্‌ গেলে কী যে হয়, ক্ষতি কী, আমি তো বুঝি নে! বরং, কারো সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র না ক'রে, একা-একাই এক আধবার ফেল্‌ যাওয়া বোধ হয় ভালোই! স্বাস্থ্যের পক্ষেই ভালো, নিজের না হ'লেও নিজের আত্মীয়-স্বজনের, অন্ততঃ।

আর, নিতান্তই, ফেল্‌ যদি নাই যেতে পারা যায় নেহাৎ, ডবল্‌-প্রোমোশন্‌ নিতে কি? বিনি বলে, কলেজে নাকি ডবল্‌ প্রোমোশন্‌ দেয় না। একেবারেই ও-পাট নেই। কলেজ তো আর পাঠশালা নয়। ফ্যাসান্‌ আর কাকে বলে!

এবার বিনির থার্ড্‌ ইয়ার্‌। কিন্তু এবারের ধাক্কা কি সাম্‌লাতে পার্‌ব? কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ব কোন গতিকে? বার বার তিন বার, কম নয়!—এবার বোধ হয় আমার প্যারালিসিস্‌ হয়ে যাবে।

এবার ও কী নিয়ে হাজির হবে কে জানে! মহাকাব্যই ফেঁদে ফেলেছে কি না, কি ক'রে বল্‌ব?

"তুমি দিন দিন এ রকম শুকিয়ে যাচ্ছ কেন দাদা?" বিনি একদিন জিজ্ঞেস করল আমায়।

"না। শুকোব কেন? বেশ আছি তো।"

"উহুঁ। দিন দিন মন-মরা হয়ে যাচ্ছ কি রকম!"

"তোর যেমন!—" যতখানি সম্ভব, যত দূর সাধ্য হেসে উড়িয়ে দিতেই সচেষ্ট হই: "স্ফূর্ত্তি-গুলো জমিয়ে রাখ্‌ছি। বাজে খরচ হ'তে দিচ্ছি নে। তোর জন্মদিনের প্রফুল্লতার জন্যেই জমিয়ে রাখ্‌ছি সব।"

বিনি কতকটা আশ্বস্ত হয়। "এই শাড়ীটা পড়্‌লে কেমন হয় সেদিন? দেখ তো দাদা?"

"খাসা মানাবে তোকে।"

"তার সঙ্গে এই ব্লাউজ্‌! কী বল? কেমন, চমৎকার নয় কি?" বিনি খুসি হয়ে ওঠে: "কিন্তু দুঃখের কথা দাদা, তোমার সেই ভক্তটি এবার আস্‌বে না বোধ হয়।"

"কে ভক্ত?" নিস্পৃহ কণ্ঠে আমি বলি।

"কেন, তোমার সেই প্রফুল্ল। তুমি যার খোঁজ কর্‌ছিলে। কিন্তু, কেবল প্রফুল্লর সঙ্গেই তুমি অতটা মেশো, তোমার এটা অন্যায়, দাদা! ভারী পক্ষপাত তোমার আমি বল্‌ব! ভালো নয় কিন্তু। কেন, আমার আর সব বন্ধুরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তারা কি মানুষ নয়? মেশ্‌বার যোগ্য নয় তারা?"

"আমি কি বলেছি, নয়? কিন্তু মিশি কখন্‌? ফুর্‌সৎ কই? ফাঁকই পাই নে বল্‌তে গেলে।" সাফাই দিতে চেষ্টা করি।

"ইচ্ছে থাক্‌লেই ফুর্‌সৎ হয়। সেবার তুমি চিল্‌কোঠায় গিয়ে ওর কবিতা শুন্‌তে লাগ্‌লে। কবিতা শুনেই কাটিয়ে দিলে সারাদিন! ওরা কি মনে ভাবে বলো তো? প্রফুল্ল না হয় কবিই, ভালো কবিই হয় তো, কবিতাটা লিখ্‌তে শিখেছে বটে, মিলটিলগুলোও ওর আসে,—আপ্‌না থেকেই নাকি এসে যায়—কিন্তু ওরাও যে কিছু জানে না এমন তো না! অনেকেই তো ভালো বুন্‌তে পারে, গাইতেও জানে কেউ কেউ, এক-আধজন নাচ্‌তেও পারে অদ্ভুত। কেন, সে সব জানা কি কিছুই না নেহাৎ?"

"তা—তা—আমি কী কর্‌ব?" আম্‌তা আম্‌তা করি আমি: "আমায় কী কর্‌তে বলিস্‌?"

"কেবল একজনের সঙ্গেই অত মেশাটা কি ভালো?"

"আমি কি আর মিশি? আমাকে মিশিয়ে নেয়।" করুণ কণ্ঠে আমি বলি: "জোর করেই মিশিয়ে ফেলে। তোর ঐ প্রফুল্লর সঙ্গে, আমি কি রকম, পেরে উঠি নে, কিছুতেই।"

"হ্যাঁ, ওর একটা পার্সোনালিটি আছে, সে কথা মানি, আর তোমারও ওই জিনিসটিরই হয়েছে অভাব, কেবল ওই পার্সোনালিটির, সে কথাও সত্যি। মেয়েদের সাম্‌নে তুমি কেমন উপে যাও যেন, আমি চিরদিন দেখে আসছি। যাক্‌, এটা একটা দুঃসংবাদ যদিও, তোমার সাহিত্যিকটি এবার আর আসছেন না।" বিনির মুখে-চোখে একটা বিজাতীয় জিঘাংসার ভাব প্রকাশ পায়: "প্রফুল্ল এ-তল্লাটেই নেই।"

"য়্যাঁ? নেই? নেই নাকি?" তৎক্ষণাৎ আমার পার্সোনালিটি যেন উড়ে আসে কোত্থেকে, উড়ে এসে জুড়ে বসে এক মুহূর্ত্তেই: "কোথায় গেল? গেল কোথায়?"

"মাস খানেক থেকে আস্‌ছে না কলেজে। আজ নেমন্তন্ন কর্‌তে ওদের বাড়ী গেলাম। কেউ নেই এখানে। কোথায় নাকি ওরা চেঞ্জে গেছে শুজব।"

সঙ্গে-সঙ্গেই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি: "যাক্‌ গে। যেতে দে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন কর্‌লি শুনি?"

"প্রফুল্ল বাদ, কলেজের বন্ধুদের প্রায় সবাইকে। পাড়ার কাকে কাকে করা যায়, বলো তো?"

"কাকে কাকে কর্‌বি ভেবেছিস্?"

"আইভিদিকে তো বল্‌তে হয়?"

"মিস্ সেন? তা বল্‌তে পারিস। দোষ কি?"

"তাঁর হোষ্টেলের দু'একটি মেয়েকেও ঐ সঙ্গে। আর, প্রতিমা আর তার বর?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! প্রতিমাকে তো অবশ্যি।"

"অবিনাশ বাবু আর তাঁর বোনকে না করা কি ভালো দেখায়?"

"না না, তাঁদেরকেও করা দরকার।"

"জোয়ারদার মশাই, ওঁর গিন্নী, আর—আর—বেণুকেও তো?" এবার বিনি একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই নিক্ষেপ করে যেন।

"হ্যাঁ, বেণুকেও বই কি!" বেণুকেও আমি ভয় খাই নে। প্রফুল্লহারা হয়ে, উৎফুল্লতার আতিশয্যে, বেণুর পরাক্রম সহ্য কর্‌তেও আমি প্রস্তুত। নেমন্তন্নের তালিকার জোড়াতালি নিঃশেষ ক'রে বিনি জিজ্ঞেস করে: "তুমি? তুমি কাউকে কর্‌বে না? তোমার বন্ধুদের কাউকে?"

"কাকে করি? কাউকে তো মনে পড়্‌ছে না। তবে প্রমোদকে কর্‌লে হয়। ওর বিয়ের নেমন্তন্নে যেতে পারে নি। অত ক'রে ডেকেছিল! এই তো দিন পনের আগে দেওঘরে বিয়ে হয়ে গেল বেচারার।" চিন্তা ক'রে আমি বলি: "ওকে সহানুভূতি জানানো উচিত।"

"প্রমোদ বাবু মন্দ না। বেশ আমুদে লোক উনি।"

"হ্যাঁ, ওকে করা চাই। প্রমোদ না হ'লে আমোদ জমে না। কথায় বলে আমোদ-প্রমোদ।"

প্রমোদকেও করা হয়। প্রমোদ আর প্রমোদের বউকে। আমার তরফ থেকেই করি। ওর বিয়েয় না-যাওয়ার দুঃখ যদি ওর দূর হয়। আমার ভয়ানক বন্ধু প্রমোদ।

জন্মদিনের আসর জমে উঠেছে। বিনির কলেজের বন্ধুরা এসে গেছে কোন্ কালে। পাড়ারও কেউ বাদ যান্ নি। বেণু পর্য্যন্ত হাজির, তার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই। গুল্‌তি, এয়ার্ গান্, খর্‌তাল্ সব কিছু-সমভিব্যাহারে। কেবল চুইংগাম্ আর চকোলেটের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোন উপায়ে ওকে নিরস্ত্র রাখা হয়েছে, এখনকার মত।

বাহিরের ঘরে প্রমোদের গলা পাই:

"কই? শিব্‌রাম? শিব্‌রাম কোথায়?"

বল্‌তে বল্‌তে প্রমোদ আসরে পদার্পণ করে: "তোমার সঙ্গে এঁর আলাপ ক'রিয়ে দিই। আমার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ কর্‌লে খুসী হবে—"

ও! তা হ'লে সস্ত্রীকই এসেছে প্রমোদ, সুখের কথাই! আমিও হাসিমুখে এগোই।

"এসো, এসো, লজ্জা কি?" নেপথ্যের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে প্রমোদ বলে: "আমার বউ একজন নামজাদা লোক হে, সব কাগজেই লেখা বেরোয় ওর। বড়দরের লেখিকা একজন—! পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের। ইনি আমার বন্ধু, শিবরাম, গল্পটল্প লেখেন, আর ইনি—"

কে আসে প্রমোদের পেছনে? প্রফুল্লনলিনী ছাড়া আর কে?

ছুটির ক'দিন

[ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এস্-সি (ক্যাল্), পি-এইচ্.ডি (ক্যান্টাব্)]

পায়ে হেঁটে ইংলণ্ডের দক্ষিণ, পশ্চিম দিক্‌টা দেখবার সদিচ্ছা নিয়ে বেরিয়েছি সে কথা তোমাদের গেল বারে বলেছি, এবং আপাততঃ উকি হোল্‌স্ গাঁয়ে যুব-সমিতির হোষ্টেলে উঠেছি সে কথাও তোমরা শুনেছ।

উকি হোল হোষ্টেলটি ওখানকার একটি চাষার সম্পত্তি। চাষা বলতে ঠিক আমাদের দেশের চাষী লোকের কথা যদি তোমাদের মনে হয় তবে ভুল বুঝবে। ঐ উকি হোল গাঁয়ে তার কিছু জমিজমা আছে, খান দুয়েক বাড়ীও আছে। জমিতে সে নিজে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে লোক খাটিয়ে ফসল ফলায়। তারই একটি বাড়ীর একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছে হোষ্টেলের জন্য। এইটি হ'ল 'কমন্ রুম' অর্থাৎ আড্ডাঘর। এর পাশে ছোট্ট একটি ঘরে দু'টি কেরোসিন ষ্টোভ ও রাঁধবার বাসনপত্র রয়েছে। এই রান্নাঘরটিও হোষ্টেলের দখলে আছে, আর এ ঘরের জিনিষপত্র সব যুব-হোষ্টেল সঙ্ঘের সম্পত্তি। সভ্যদের শোবার ঘর হচ্ছে বাড়ী থেকে একটু দূরে। এটি আগে ঐ চাষীর একটি খামার ঘর ছিল। খামার ঘরটি দোতলা; নীচে আগে গরু থাকত ও উপর তলায় খড় প্রভৃতি গরুর খাবার রাখা হ'ত। এই দোতলায় এখন গোটা তিনেক জানালা লাগিয়ে আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

করে হোষ্টেলের শোবার ঘর তৈরী হয়েছে। ঘরটি বেশ বড়ই, প্রায় খান কুড়িক লোহার স্প্রীংএর খাট পাতা রয়েছে। খাটগুলি অনেকটা হাসপাতালে রোগীদের যে রকম খাট দেওয়া হয় সেই রকম। প্রত্যেক খাটে একটি করে গদীও রয়েছে। এই খামার ঘর থেকে নেমেই দরমা দিয়ে ঘেরা একটু জায়গা। এইটে হচ্ছে বাথ-রুম্, হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। প্রায় অধিকাংশ হোষ্টেলই এই রকম, কাজেই এই হোষ্টেলটির বিষয় একটু ভাল করেই লিখলাম; এর থেকে সাধারণ হোষ্টেলগুলি সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নিতে পারবে।

আমি গিয়ে দেখি যে হোষ্টেল প্রায় ভর্ত্তি। বাড়ীওয়ালা চাষীর স্ত্রী-ই এই হোষ্টেলের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম, এই সন্ধ্যাবেলা যদি বলে জায়গা নেই তা হলে ত বেজায় মুস্কিল। আবার সেই মাইল তিনেক হেঁটে ওয়েলসে গিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। হোষ্টেলের নিয়ম হচ্ছে যে একদিন আগে থেকে খবর দিয়ে জায়গা রিজার্ভ করে রাখা। খবর না দিয়ে এসেছি কাজেই থাকতে দেবার জন্য জোরও করতে পারি না। যা হ'ক বাড়ীর কর্ত্রী কিন্তু একমুখ হেসে জানালেন যে একটি জায়গা আছে। বইয়ে নাম সই করে ছুটি কম্বল নিয়ে তাঁর সঙ্গে এসে আমার খাট দেখে গেলাম অর্থাৎ দখল করে গেলাম। এর পর খাওয়া। সারা দিন ঘোরাঘুরির পর আবার রান্নাঘরে ঢুকে খাবার তৈরী করতে মোটেই প্রবৃত্তি ছিল না, কাজেই চাষীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু খাবার দিতে পারবে কিনা। জানা গেল যে ঠাণ্ডা খাবার কিছু মিলতে পারে। তথাস্তু, তাই খাওয়া যাবে। চাষার বাড়ীর খাবার ঘরে গিয়ে সেই খাবার খাওয়া গেল। পরিষ্কার ঘরটি। এক কোণে উনুন (বিলাতে গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে রান্নাঘর আর খাবার ঘর প্রায় একই ঘরে হয়)। কয়লার লোহার উনুন, ধোঁয়া একটা নল দিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়, কাজেই রান্না হ'লেও ঘরটি মোটেই আমাদের রান্নাঘরের মতন কালী আর ঝুলে ভর্ত্তি নয়। আর এক কোণে জলের কল, একটি হাত ধোবার বেসিন লাগান। জল পাইপ দিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়. কাজেই কল খুললে ঘরে জল থৈ থৈ মোটেই করে না। বেসিনটি বেশ বড় আর তার সঙ্গে একটি কাঠের তক্তা লাগান। খাওয়া-দাওয়া

হ'লে এঁটো বাসনপত্র ঐ বেসিনে রেখে ধুয়ে ঐ তক্তার উপর রেখে দেওয়া হয়। ধোয়া বাসনের জল গড়িয়ে বেসিনে পড়ে বাইরে চলে যায়। ঘরে একটুও জল পড়ে না। ঐ সব বাসন তার পর মুছে পাশেই একটি র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা হয়—পরে ব্যবহারের জন্য। ঘরের মেঝেয় অয়েল ক্লথের মতন একটি জিনিষ বিছান। এর নাম হচ্ছে লিনোলিয়াম্ (Linoleum)। এ ছাড়া চেয়ার, খাবার টেবিল, খাবার রাখার জন্য মিট্সেফ্ এবং তা ছাড়া একটি গ্রামোফোন ও একটি রেডিও-ও আছে। ঘরে এত জিনিষ, কিন্তু ঢুকে সেটা মোটেই নজরে পড়ে না কারণ সব জিনিষ এত চমৎকার করে সাজান আছে! খাবার আর রান্নাঘর ছাড়া এটা ওদের সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরও। উনুনের আগুনে ঘরটি বেশ গরম থাকে, কাজেই অন্য ঘরে গিয়ে আবার আগুন জ্বালিয়ে কয়লা খরচ করতে বাড়ীর কর্ত্তা কি গিন্নী কেউ রাজী নন। কাজেই এই ঘরেই রেডিও আর গ্রামোফোন রাখা রয়েছে—গান আর দিনের খবর শুনে সময় কাটাবার জন্য। এখন বল, আমাদের দেশে চাষীর বাড়ী কি এই রকম?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠতে প্রায় ন'টা বেজে গেল। বাইরে তখনও বেশ আলো রয়েছে—ও দেশে গ্রীষ্মকালে "রাত" দশটা পর্য্যন্ত বেশ আলো থাকে, সূর্য্যই অস্ত যায় প্রায় সাড়ে আটটার সময়। কিন্তু এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে সেই "দিনের আলোতেই" শুতে গেলাম আর এক ঘুমেই রাত কাবার। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন ছ'টা বেজে গেছে। ঘর সূর্য্যের আলোয় ভর্ত্তি, আর ঘরের অন্যান্য সব লোকও বের হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা তৈরী করে খেয়ে বের হয়ে পড়লাম চেদারের দিকে (Cheddar)। চেদারের নাম তোমরা শুনে থাকতে পার, কারণ এখানকার পনির প্রসিদ্ধ।

চেদার উকি হোল থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে। যাবার রাস্তাটি বড় সুন্দর। ছ'দিকে বড় বড় পাহাড় উঠে গেছে—প্রায় ছ' শ' সাত শ' ফুট উঁচু, মাঝখান দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, কিন্তু ছ'দিকে উঁচু পাহাড় থাকার জন্য মনে হচ্ছে যেন একটা সরু গলির মধ্য দিয়ে চলেছি। এই পাহাড়ের সারির নাম হচ্ছে মেনডিপ্স্ (Mendips)। তোমাদের স্কুলের জিওগ্রাফিতে নাম পাবার মতন বড়

পাহাড় এ নয় কিন্তু তা হ'লেও খুবই সুন্দর দেখতে। এই পথটির নাম হচ্ছে চেদার গর্জ্জ (Cheddar Gorge)। এই পাহাড়গুলিতে অনেক গুহা রয়েছে কিন্তু সব চেয়ে নামজাদা গুহা দুটি আছে চেদার গ্রামের কাছে। এই গুহা দুটির নাম হচ্ছে গফ্ কেভ্ ও কক্স কেভ্ (Gough cave and Cox's cave)। এই গুহাগুলি এককালে কোন নদীর পথ ছিল কিন্তু কালে কালে নদীর জল শুকিয়ে যাবার দরুণই হ'ক কি অন্য যে কারণে হ'ক এখন এগুলি শুকিয়ে গেছে। অবশ্য এই শুকানো ব্যাপারটা নেহাৎ আজকাল হয় নি—ব্যাপারটি ঘটেছিল অন্ততঃ কুড়ি ত্রিশ হাজার বছর আগে কারণ যখন এই সব গুহাগুলি পরিষ্কার করা হয় তখন তাদের ভিতর থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের এবং রেণহরিণ ও ম্যামথ প্রভৃতি জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়েছিল। এই সব জন্তু ইংলণ্ড থেকে, এমন কি সারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে আর ঐ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের বংশধরেরা এখনও চেদারের আশেপাশে আছে কিনা সেটা একটা মস্ত গবেষণার বিষয়।

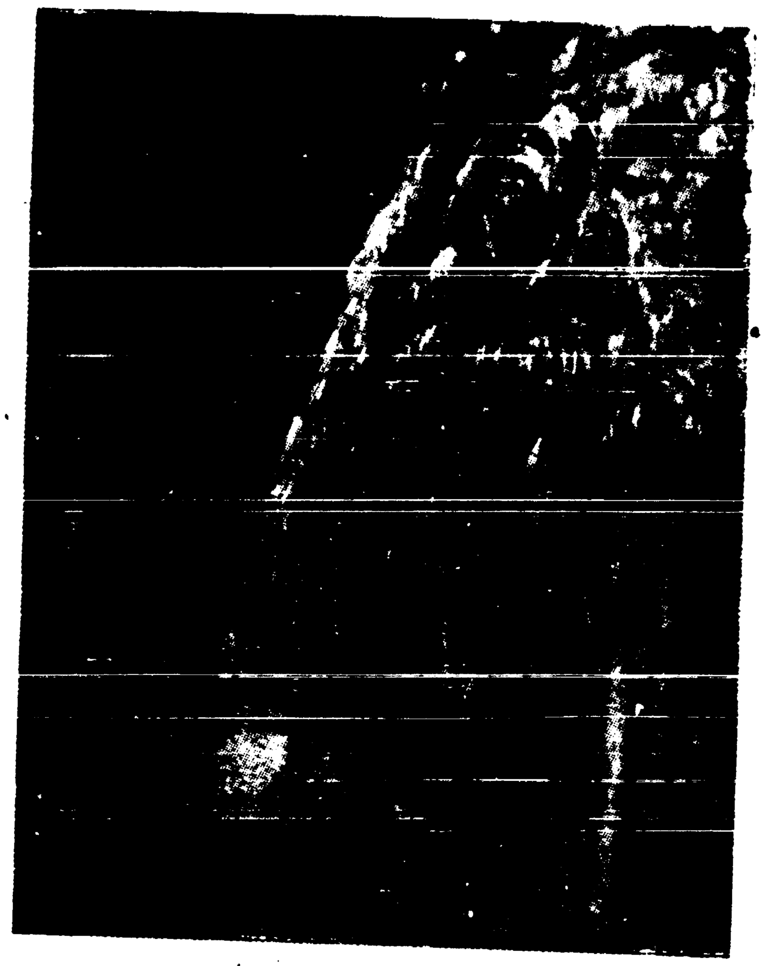

গফ্ কেভ্ এ অপরূপ পাথুরে চূণের ঝাড়

কিন্তু সেকালের জন্তুদের হাড় পাবার জন্যই যে এই সব গুহার খ্যাতি তা নয়। এদের নাম হয়েছে এরা যে সব সুন্দর জিনিষ নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তারি জন্য। নদী শুকিয়ে গেলেও পাহাড়ের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে ও এখনও পড়ছে। এই সব জলে মিশান আছে চূণ। এই জল বাতাসের সঙ্গে লাগার সঙ্গে সঙ্গে এর ভেতরের কিছু চূণ জমে পাথুরে চূণ হয়ে যাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে ফোঁটা ফোঁটা করে এই হাজার হাজার বছর

পড়ার জন্য এই হয়েছে যে ফাটলের ধার থেকে আরম্ভ করে নীচের দিকে নেমে গেছে পাথুরে চূণের ঝাড়। শুধু এই নয়, নীচে গুহার মেঝেয় যে জল পড়েছে তার মধ্যের চূণও আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে গেছে। ফলে হয়েছে যে মেঝে থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে পাথুরে চূণের থাম সব। এই গুহার ছাদ থেকে ঝোলা পাথুরে চূণের ঝাড়ের নাম হচ্ছে ষ্ট্যাল্যাগ্সাইট্ (Stalagcite), আর মেঝের উপর থামগুলির নাম হচ্ছে ষ্ট্যালাগ্মাইট্ (Stalagmite)। জিনিষটি কত আস্তে আস্তে হচ্ছে তা জানলে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে—এক ইঞ্চি লম্বায় বাড়তে এক শ' বছরের উপর লেগে যায়। এই ঝাড়গুলি কোনটি সাদা, কিন্তু অধিকাংশই লাল নীল প্রভৃতি রঙ্গে রাঙ্গান। এই রঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে জলের মধ্যে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু মিশান থাকার দরুণ। প্রকৃতি এই সামান্য মালমশলা নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে নিজের মনে খেলে গেছেন আর তার ফলে তৈরী হয়েছে চমৎকার চমৎকার সব স্তূপ ও ঝাড়। কোনটা প্রজাপতির ডানার মতন, কোনটা থিয়েটারের পর্দ্দার মতন। এক কোণে একটি স্তূপ দেখে মনে হয়—যেন একটি জলপ্রপাত জমে রয়েছে! যেদিকে চোখ চলে সেদিকেই নানা রঙ্গের নূতন নূতন সব দৃশ্য দেখা যায়। ছবি দেখে তোমরা একটু হয়ত আভাস পাবে কিন্তু চোখে না দেখলে এগুলি কিছুই উপভোগ করা যায় না।

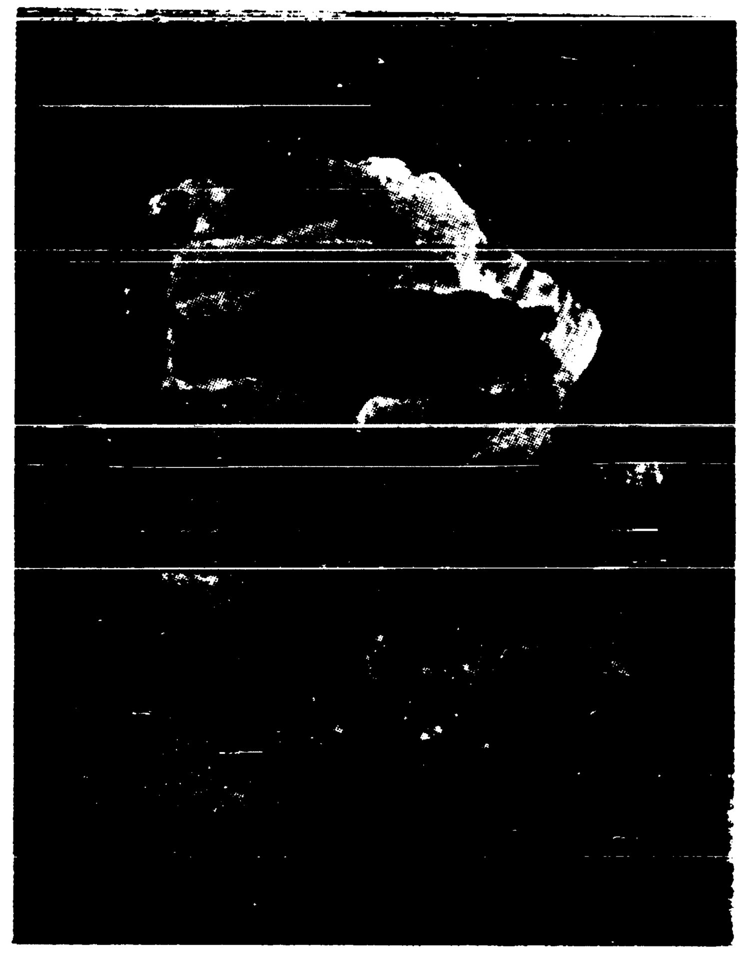

গুহার মধ্যে পাথুরে চূণ জমে জলপ্রপাতের মত দেখাচ্ছে।

এই গুহাগুলির ভিতর অবশ্যই খুব অন্ধকার, সেইজন্য এই দুটি গুহায় ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে গুহার দৃশ্যগুলিকে লোকের চোখের উপর ফুটিয়ে তোলার জন্য। এ ছাড়া প্রত্যেক দলের সঙ্গে এক-একজন করে

গাইড্‌ও থাকে, কারণ যাঁদের জানা নেই তাঁদের এই গুহার মধ্যে অলিগলিতে পথ হারিয়ে যাওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয়।

গুহার ভিতর একবার ঢুকলে আর বের হতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বেলা বেড়ে চলেছে কাজেই বের হয়ে আসতে হ'ল। কাছেই একটি রেস্তঁরো—নামটি খুব জব্বর—Caveman's Cafe অর্থাৎ গুহাবাসীর কাফে। কিন্তু নাম এই হলে কি হয়, রেস্তঁরোটি রীতিমত সৌখীন, যে কোন বড় সহরের রেস্তঁরোর চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। কেভ্‌ম্যান্ কেন, কেভ্‌ম্যানের ঠাকুর্দ্দাও বোধ হয় স্বপ্নে এ রকম রেস্তঁরোর কথা ভাবতে পারে নি (অবশ্য কেভ্‌ম্যান্‌দের যে রেস্তঁরার কোন দরকার ছিল তা নয়, বেচারারা দিন গেলে একটু শিকার করা মাংস ঝলসিয়ে নিয়ে খেতে পারলে বর্ত্তে যেত)। যাই হ'ক এই রেস্তঁরায় একটু লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে উকী হোলের দিকে ফের রওনা হলাম।

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

চার

পরদিন সকাল। বাড়ীর সকলেই চায়ের টেবিলে উপস্থিত—অজয়ও। গত রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে আজ তার ক্লান্তিটা যেন একটু কমেছে মনে হ'চ্ছে—অবশ্য দেহের ক্লান্তি, মনের নয়। মনটা তার সমান ক্লান্তিতেই ভরে আছে।

চায়ের কাপ্‌টা শেষ করে সে বল্‌লে—"কাল রাতে কি ঘুমই নাম্‌ল চোখে! আপনাদের

অনেকেরই হয়ত সারা রাত জেগেই কেটেছে—রণু আর ইরার কি হ'ল তাই ভেবে ভেবে। কিন্তু, আমি—"

ললিতা বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "না, ভাই; তা'তে কি হয়েছে? রাতও ত অনেক হয়েছিল কাল। তোমার শরীর এত খারাপ; কাল রাতেই তোমাকে টেনে এনে আমরাই করেছি অত্যাচার তোমার উপর।"

অজয় একটু ম্লান হেসে বল্‌লে—"আচ্ছা, সুরু করি তার পর থেকে—রণুরই ভাষাতে বলি যেমন বলছিলাম—

"—চালাতে লাগ্‌লাম আমার প্লেনখানি অনির্দ্দিষ্টভাবে—শূন্যপথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, যদি কোথাও স্থলের দেখা মেলে। পেট্রোল ফুরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে আমার আর ইরার জীবনের শেষের মুহূর্ত্ত ক'টাও। ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ভীতির কোন চিহ্নই সেখানে নেই, উদ্বেগের কোনও ছায়াই পড়ে নি ওর মুখে। আশ্চর্য্য মেয়ে!

"পেট্রোলের ট্যাঙ্ক খালি হয়ে এসেছে—আর মাত্র ঘণ্টা পাঁচ ছয় চল্‌বে কোনও রকমে আমাদের প্লেনখানি—তার পর, তার পর নাম্‌বে সে নীচের দিকে সজোরে; প্রবেশ কর্‌বে অতল জলধিগর্ভে। মুহূর্ত্তগুলি হু-হু করে কাট্‌তে লাগ্‌ল। মৃত্যুর সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে। চোখ ফেটে জল বা'র হয়ে এল ইরার জন্য। রুদ্ধকণ্ঠে ডাক্‌লাম—'ইরা, বোন্‌টী—'

"ইরার মুখে সে কি অপূর্ব্ব হাসি!...আশ্চর্য্য! সে বল্‌লে হেসে—'ছোড়দা, কি স্ফূর্ত্তিই যে হচ্ছে আমার তা' তোমাকে বল্‌তে পারি নে। মরণ ত একদিন আসতই, ছোড়দা, না হয় আরও দু' দশ বৎসর পরে—এই ত তফাৎ! কিন্তু সে একঘেয়ে চিরপুরাতনভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে—রোগে ভুগে ভুগে মরা—ছিঃ। এ কেমন নতুন রকমের সুখমৃত্যু, বল ত? উদার আকাশের নীচে, এরোপ্লেনে চড়ে নেমে যাব অতল জলধি-তলে আমরা দুটী ভাইবোনে; সেখানেই হ'বে আমাদের শেষ শয়ান।'— বলে সে যেন আনন্দে চোখ দুটী বন্ধ কর্‌ল।

"আর মাত্র দু' এক ঘণ্টা প্লেনটী চল্‌বে, তার পরে সব শেষ। ভাবলাম, কেন অমন ভাবে মরব? মৃত্যু এসে কেন আমাদের কণ্ঠরোধ কর্‌বে? আমরাই এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে কর্‌ব আলিঙ্গন। পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই প্লেনখানি নিয়ে 'ডাইভ্' দেব নীচের দিকে। সোজা চলে যাব সমুদ্রের গর্ভে।

"প্লেনখানিকে নিয়ে 'ডাইভ্' দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ ইরা ডাক্‌ল—'ছোড়্‌দা!' দেখি ইরার চোখ দু'টো যেন জ্বল জ্বল কর্‌ছে; সে বল্‌লে—'ছোড়দা, ঐ দেখ, দূরে, কালো মত কি দেখা যাচ্ছে—হয়ত কোনও দ্বীপ হ'তে পারে—হয়ত মরা হ'ল না আর আমাদের এ যাত্রা। চালাও ঐ দিক্ লক্ষ্য করে।'

"সত্যিই দূরে, সমুদ্রের বুকের মাঝে কালো মত জমাট কি একটা দেখা যাচ্ছিল। কোন দ্বীপ হওয়ারই সম্ভাবনা। রক্ত আমার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; বুকটা আশার আনন্দে উঠ্‌ল দুলে। জীবন—আবার হয়ত চল্‌ব জীবনের পথে। যে মরণকে করতে যাচ্ছিলাম আলিঙ্গন তা'কে দিলাম বিদায়। সেই কালো জায়গাটা লক্ষ্য করে চালালাম আমাদের প্লেন।...কিন্তু, কিন্তু এ কি! কতখানি এগিয়ে গেলাম তবুও ও জায়গা আগে যত দূরে ছিল এখনও তত দূরেই মনে হ'তে লাগল! অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! মরণের জন্য ত প্রস্তুতই হয়েছিলাম, তবে, আবার বাঁচবার এ দুরাশা মনে জাগিয়ে এ কষ্ট দেওয়া কেন?

"ইরা বল্‌ল—'চালাও ছোড়দা', হতাশ হোয়ো না। যত দূর চলে চলুক প্লেনখানি। যদি না পৌঁছুতে পারি ও জায়গায়—প্লেনখানি যদি ডোবেই, আমরা ডুব্‌ব না। প্লেন ডুব্‌বার ঠিক আগেই প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব; তার পর? তার পর আছে তোমার আর আমার বাহুতে শক্তি আর সাঁতারের ক্ষমতা।'

"আমি আর কিছু বল্‌লাম না ওকে। সমুদ্রের বুকে সাঁতার কাট্‌তে গেলে কতখানি শক্তির প্রয়োজন তা জানে না ইরা: তা ছাড়া হাঙ্গর যে হানা দেয় সমুদ্রের মাঝে তাও হয়ত ওর খেয়াল নেই।

"খানিক পরে অদৃষ্ট বোধ হয় সুপ্রসন্ন হ'ল; জায়গাটা কাছে মনে হ'তে লাগল—দূরবীণ দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল এবার যে সত্যিই সেটা একটা দ্বীপ, চতুর্দ্দিকে ভীষণ বন, সমুদ্রের ধারে খানিকটা শুধু বেলাভূমি।

"আর একটু, আর একটু যেতে পারলেই পৌঁছুতে পারি। পার্‌ব না, পার্‌ব না? ...পেট্রোল শেষ হয়ে গেছে—প্লেনের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল ব'লে। নাম্‌ছে—নাম্‌ছে প্লেন।—দ্বীপটাও এসে গেছে, আর শ' কয়েক গজ মাত্র।...ব্যস, আর ভয় নেই। এসে গেছি, এসে গেছি! যদি নামবার সময় বিপদ না ঘটে!

"যত দূর সাধ্য তত দূর সাবধানে নামালাম প্লেন; তবুও সামান্য ধাক্কা লাগল একটা গাছের সঙ্গে। প্লেনটা ভেঙ্গে গেল দু' এক জায়গায়। ইরার কপালটা গেল কেটে; আমার বাঁ হাতে আঘাত লাগল বেশ একটু, শরীরের দু' এক জায়গায় কেটেও গেল।.. যাই হোক, আপাততঃ প্রাণে ত বাঁচলাম; মৃত্যুর সামনা সামনি দাঁড়িয়েও তাকে এড়াতে পেরেছি—ইরা বেঁচেছে।

"আঘাতের ধাক্কা সামলে ওঠার পর মনে হ'ল—আপাতমৃত্যুর হাত থেকে ত রক্ষা পেলাম বটে, কিন্তু সত্যাই কি রক্ষা পেল আমাদের জীবন? এ কোন্ জায়গা? এখানে এই ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত দ্বীপে কোনও মানুষ বাস করে কিনা তাও জানি না! বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা

পাওয়াও হয়ত দুষ্কর হ'বে। অদূরভবিষ্যতে উদ্ধার পাওয়ার কোনও আশা আছে কিনা—কে বল্‌বে? যত দিন উদ্ধার না পাই তত দিন জীবন ধারণ কর্‌ব কি খেয়ে?

"সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছিল ক্রমশঃ সেই অজানা দ্বীপের বুকে। সামান্য কিছু খেয়ে দু'জনে সে রাত্রির মত আশ্রয় নিলাম এরোপ্লেনের ভিতরে। চোখ জড়িয়ে আস্‌ছিল ঘুমে—আমার কোমরে যে রিভলভারটা ছিল সেটা খুলে হাতের কাছে রাখলাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম দু'জনে।

"রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল জান্‌তে পার্‌লাম না। আমাদের ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন সে অজানা দ্বীপের উপর প্রভাতের আলো নেমে এসেছে।

"কাটল দু'দিন। সঞ্চিত আহার্য্যও শেষ হয়ে এল। সামনে গভীর অরণ্য—প্রবেশ কর্‌তে সাহস হয় না; তবুও প্রবেশ করতে হ'ল আহারের অন্বেষণে। ইরাকে সঙ্গে নিয়ে সেই গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে চল্‌তে সুরু কর্‌লাম। প্রতি মুহূর্ত্তে কি এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠ্‌তে লাগল। এই বিপদ্‌-সঙ্কুল পথে একমাত্র ভরসা আমার রিভলভারটা। ডান হাতে রিভলভারটা ধরে আর বাঁ হাতে ধরে ইরার হাত অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে লাগলাম সেই ভীষণ অরণ্যের পথে।

"বেশ খানিকক্ষণ চলেছি, হঠাৎ মনে হ'ল, আমাদের আশে-পাশে বনের মধ্যে কা'রা যেন আমাদের দু'জনকে অনুসরণ কর্‌ছে। সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল আমাদের। কি সর্ব্বনাশ! কি কর্‌ব? আর অগ্রসর হ'ব না ফিরে যাব তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। ভেবে দেখ্‌লাম যে পিছিয়ে কোনও লাভ নেই; আমাদের ত কোনও নিরাপদ আশ্রয় নেই যে পিছিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেব! শেষ পর্য্যন্ত ঠিক কর্‌লাম, অদৃষ্টে যাই থাক, এগিয়েই যাব। রিভলভারটা শক্ত ক'রে হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে চল্‌লাম এগিয়ে—"

অজয়ের কথার মাঝেই রণজিতের বাবা—বিজয় বাবুকে উঠ্‌তে হ'ল, বাইরে কে একজন তাঁকে ডাক্‌ছেন।

অজয় তাই চুপ কর্‌ল একটু; অপেক্ষা কর্‌তে লাগল বিজয় বাবু ফিরে আসার জন্য।

(ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

হাতী

হাতী যতই মোটা যতই ভারী হোক্ না কেন সে
ল্যাজে সুড়সুড়িটি খেলে পরেই উড়বে আকাশে।

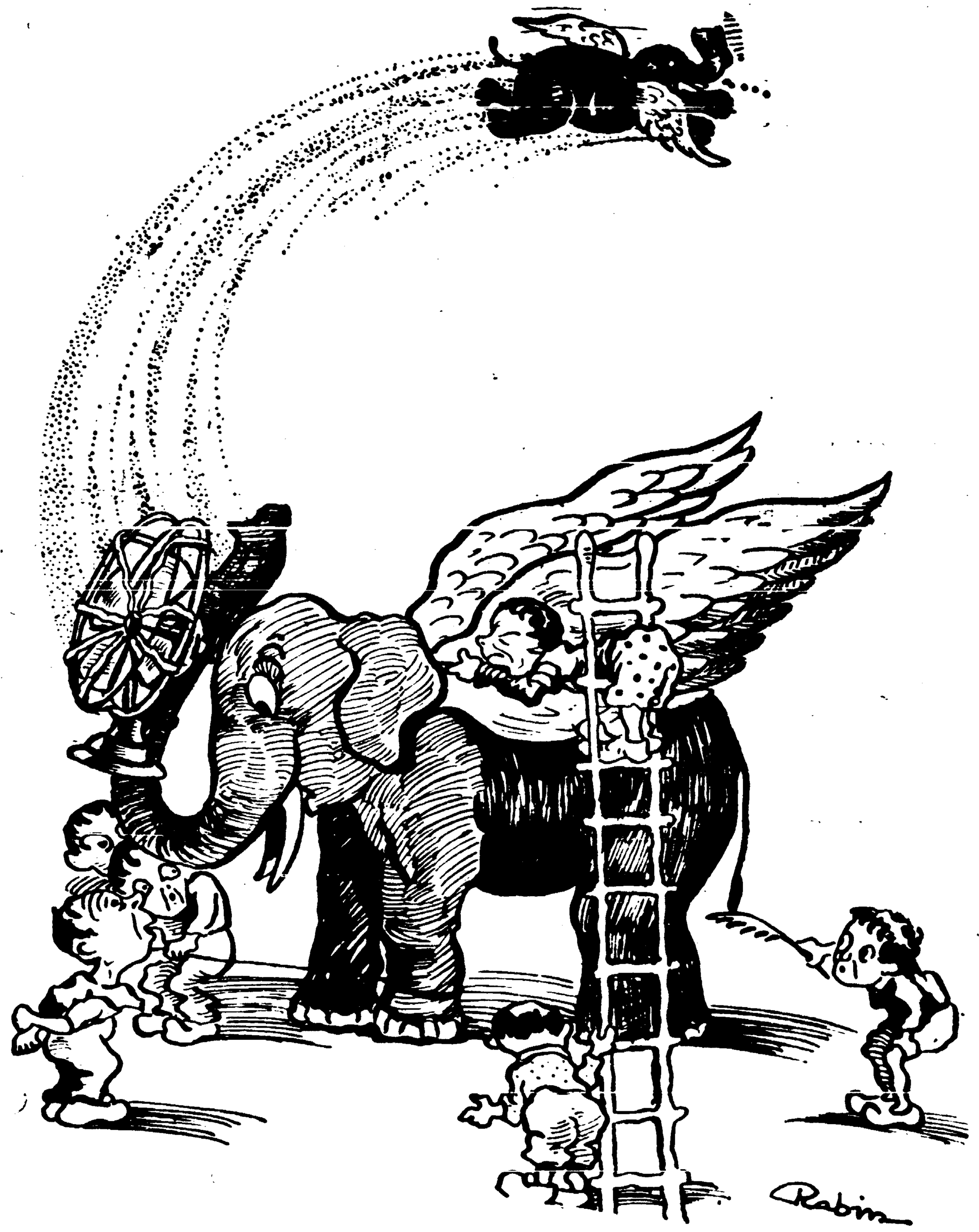

তবে চাই বটে তা'র মস্ত দুটো ডানা—
নাকে ফিট্ করানো টেবিল ফ্যান্ একখানা—

এবার ল্যাজের কাছে সুড়সুড়ি দাও তার
দেখ ছুটল হাতী—উড়বে সে এবার।

বাঘ ও ভেড়া

বাঘ যতই পাজী বদ্‌মেজাজী হোক না কেন সে
খেলে কাইকুতুটি খিলখিলিয়ে উঠবে সে হেসে।
ভেড়া— মরে গেলেই 'মটন' যাদের কয়—
তাদের বাঘের কাছে যাওয়াই উচিত নয়—
কারণ কাতুকুতু দেবার আগেই তারা
ভয়েই 'মটন' হবে, থাক্‌বে না ক' ভেড়া।

মিশরে পিরামিডের যুগ

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ)

তোমরা মিশরে সভ্যতার গোড়ার কথা জেনেছ। কি করে ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সভ্যতা এগিয়ে গেল তাও তোমরা পড়েছ। মিশরের সভ্যতার ইতিহাসে ধাতুর আবিষ্কারের পরের স্তর পিরামিডের যুগ—কিন্তু এই দুইটি স্তরের মধ্যে ব্যবধান হাজার বছরেরও বেশী।

ছবির ভেতর দিয়ে পিরামিডের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। পিরামিড যে পৃথিবীর আটটি বিরাট্ কীর্ত্তির মধ্যে একটি তাও তোমরা জান। কিন্তু পিরামিড কি ও কেন তৈরী হয়েছিল তা জান কি? মিশরের লোকেরা অতি প্রাচীন কাল হ'তেই পরলোকে বিশ্বাস করত—তাই প্রাচীনতম যুগের মিশরীয়েরা মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে মৃতকে কবর দিত। পরে, মৃতকে কবর দিয়ে তার উপর রৌদ্রে শুকান ইটের স্তূপ তৈরী করে দেওয়া হ'ত। ধাতুর আবিষ্কার হ'লে পর মিশরীয়েরা ধারাল যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শিখল ও এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাথর কি করে কাটতে হয় তাও শিখে গেল। মৃতের শরীর যাতে করে নষ্ট না হয় তার জন্য তারা কবরে দেবার আগে মৃতদেহকে নানা রকম ওষুধ মাখিয়ে দিত। এই রকম মৃতদেহকে ম্যমি বলা হয়। গত ১০০ বৎসরের মধ্যে মিশরে মাটি খুঁড়েও এই রকম অনেক ম্যমি পাওয়া গিয়েছে।

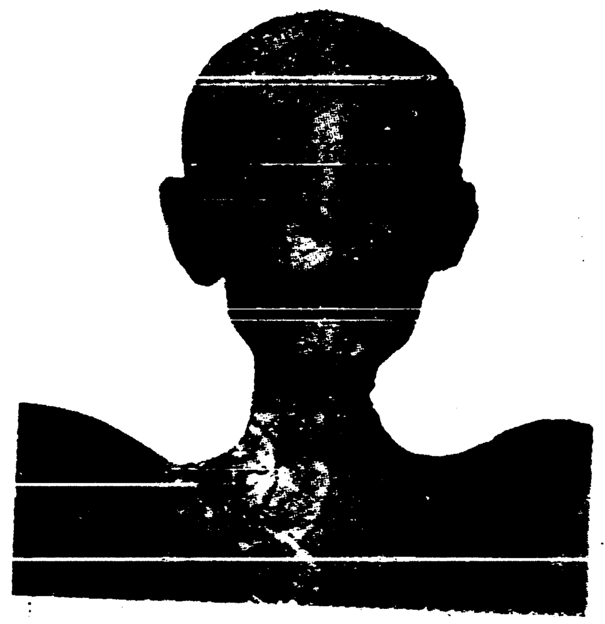

একজন প্রাচীন মিশরীয় রাজার ম্যমি

মিশরীয়েরা দেখল যে মাটির কবরে অথবা ইটের স্তূপে মৃতদেহ ও তার সঙ্গের জিনিষপত্র ভাল অবস্থায় থাকে না। ধাতুর আবিষ্কারের পর কোন এক মিশরীয় দেখতে পেল যে ধাতুর ধারাল অংশ দিয়ে পাথর কাটা যেতে পারে। তখন থেকে পাথরের স্তূপের নীচে মৃতদেহ কবর দেবার প্রথা আরম্ভ হ'ল। পিরামিড এই প্রথারই ক্রম-বিকাশের ফল। বড় বড় পিরামিডের অনেক নীচে একটা লুকোন পাথরের গর্ত্তে রাজার মৃতদেহ রক্ষিত হ'ত—তার চারদিকে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠত ছোট ছোট পিরামিডের সহর। এই সব ছোট ছোট পিরামিডে রক্ষিত হ'ত রাজার আত্মীয়-স্বজন, অনুচর প্রভৃতির মৃতদেহ। এইভাবে এক রাজার পিরামিডকে কেন্দ্র করে মৃতের নগর গড়ে উঠত। এই সব ছোট ছোট পিরামিডের অধিকাংশই আজ লোপ পেয়েছে কেবল তিনটি পিরামিড তিন জন প্রতাপশালী রাজার স্মৃতি আজও বহন করছে। আবার এই সব পিরামিড থেকে মিশরের তখনকার প্রচলিত ধর্ম্ম

সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। পিরামিডগুলি ছিল মিশরীয়দের প্রধান দেবতা সূর্য্যদেবের প্রতীক।

মিশরের যে মনীষী প্রথম পাথরের বাড়ী তৈরী করেছিলেন তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। প্রায় ৪০০০ বৎসর আগে রাজভাস্কর ইম্‌হোটেপ্ তাঁর রাজার মৃতদেহের জন্য এক পাথরের বাড়ী তৈরী করেন। এই পাথরের তৈরী কবরকে পিরামিডের যুগ ও কাঁচা মাটির তৈরী ইটের স্তূপের যুগের সংযোগস্থল বলা যেতে পারে। ইম্‌হোটেপের আবিষ্কারের পর থেকে মিশরে কবর তৈরী করবার জন্য পাথরের ব্যবহার খুব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মিশরীয়েরা মৃতের জন্য পাথরের বাড়ী তৈরী করলেও নিজেরা থাকত মাটির ইটের তৈরী বাড়ীতে। রাজপ্রাসাদও এই ইট দিয়েই তৈরী হ'ত। ফলে মৃতের স্তূপ সব পড়ে আছে—কিন্তু জীবিতের বাড়ী-ঘরের চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ নেই। ইম্‌হোটেপের তৈরী যোসের রাজার কবর ও সব চাইতে বড় পিরামিডের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১০০ বৎসরের। আধুনিক কাল ভিন্ন সভ্যতার এত দ্রুত উন্নতি আর কোনও যুগে দেখা যায় নি। পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে গিজের পিরামিড তৈরী হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের ২৯০০ বৎসর আগে। এই পিরামিড ১৩ একর জায়গার ওপর তৈরী। ২,৩০০০,০০০ খণ্ড পাথর এই পিরামিড খাড়া করতে লেগেছিল, প্রত্যেকটি পাথরের ওজন গড়ে আড়াই টন। প্রত্যেকটি ধারের মাপ ৭৫৫ ফুট; যখন তৈরী হয় তখন এই পিরামিডের উচ্চতা ছিল ৫০০ ফুট। পুরানো কাগজপত্রে পাওয়া গিয়েছে যে এই পিরামিড তৈরী করবার জন্য ১০০,০০০ লোক ২০ বৎসর ধরে খেটেছিল।

যে রাজা এতগুলি লোককে ২০ বৎসর ধরে খাটাতে পেরেছিলেন তাঁর রাজত্বও রাজকোষের বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু ধারণা করতে পারবে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯০০ সালে সমস্ত মিশর এক রাজার অধীনে এসেছিল এবং রাজশাসন-পদ্ধতিও খুব উন্নত হয়েছিল। বিরাট্ রাজত্ব কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেকটি প্রদেশ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীনে দেওয়া হ'ত। তিনি প্রদেশ শাসন করতেন ও সম্রাটের প্রাপ্য নিয়মিতভাবে রাজধানীতে পাঠাতেন। মিশরের লোকেরা সম্রাট্‌কে দেবতার মত ভক্তি করত ও তাঁর নাম মুখে আনত না। সম্রাট্‌কে বোঝাতে হ'লে

তারা বলত "ফ্যারাও"। রাজধানীতে বসে সম্রাট্ সাম্রাজ্য চালাতেন; রাজপ্রাসাদ ঘিরে ক্রমে ক্রমে বিরাট্ নগর গড়ে উঠেছিল। উত্তর মিশরের মেম্‌ফিস্ নগরই ছিল প্রথম রাজধানী—যার বিবরণ আমরা প্রাচীন কাগজ, পিরামিডের গায়ে পাথরে খোদাই করা লিখন প্রভৃতি থেকে পেয়েছি।

যে যুগের কথা আমি আজ বলছি তাকে পিরামিডের যুগ বলতে পার। খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বৎসর আগে থেকে এই যুগের আরম্ভ। এর পরের ৫০০ বছর

মিশরের একটি প্রাচীন পিরামিড

ধরে এই-যুগ ছিল। এই সময় মিশরের রাজা সমস্ত মিশর জয় করেছিলেন ও মিশরের বাইরেও সেনা ও নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ছবি থেকে জানতে পারা যায় যে ভূমধ্যসাগরে মিশরের নৌবাহিনী পাড়ি দিয়েছিল ও ফিনিসিয়া জয় করে সেখান থেকে অনেক ফিনিসিয়ান্‌কে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে মিশরের বাণিজ্যও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশরের দক্ষিণে মিশরীয় ব্যবসায়ীদের কবর পাওয়া গিয়েছে। এই সব কবর থেকে জানা যায় যে হাতীর দাঁত, কাঠ, উটপাখীর পালক ও সুগন্ধি জিনিষ দক্ষিণ অঞ্চল হ'তে মিশরে আমদানী হ'ত। লোহিত সাগরেও মিশরের বাণিজ্য জাহাজ ব্যবসা করতে যেত—তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এই সময়কার ইতিহাসের প্রধান উপকরণ মন্দির ও পিরামিডের গায়ে খোদাই করা ছবি ও লিখন। এ সব

থেকে তখনকার মিশরীয়দের দৈনন্দিন জীবন কি ভাবে কাটত তা খুব ভাল ভাবে জানা যায়।

তখন পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে ঘোড়ার ব্যবহার আরম্ভ হয়'নি—গাধাই তখন ছিল ব্যবসায়ীদের প্রধান সম্বল। ধাতুর মধ্যে তামার ব্যবহার খুব বেশী ছিল। কাচের বাসনপত্রও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হ'ত ও সুন্দর সুন্দর মাটির তৈরী বাসনও পাওয়া গিয়েছে। তখন পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অধিবাসীরা বর্ব্বর যুগ অতিক্রম করতে পারে নি—কিন্তু মিশরীয়েরা এই সময়ও খুব উন্নত স্তরের সভ্যজীবন যাপন করত। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত টাকার প্রচলন হয় নি—বিনিময় ছিল ব্যবসার প্রধান উপকরণ। এই ৫০০ বৎসরের ভিতর মিশরে ললিতকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিরও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। নানা দেবতার মন্দির ও পিরামিডে যে সব কাঠের ও পাথরের খোদাই কাজ পাওয়া গিয়েছে তা মিশরীয়দের সুরুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। এই সময়কার তিনজন ফ্যারাও ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন—তাঁদের নাম খুফু, খাফরা ও মেনকরা। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মৃতদেহের জন্য তিনটি বিশাল পিরামিড তৈরী করে গিয়েছিলেন। বিখ্যাত স্ফিন্‌ক্স—সিংহের শরীরে মানুষের মাথা—খাফরার কীর্ত্তি। তাঁর নিজের তৈরী পিরামিডকে এই মূর্ত্তি পাহারা দিচ্ছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি মিশরের ইতিহাসের এই গৌরবময় যুগের অবসান হয়। এই যুগের শেষের দিকে ফ্যারাওরা আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা ও রাজদরবারের ওমরাহ শ্রেণীর লোকেরা ক্রমশঃই এত ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠছিলেন যে ফ্যারাওরা আর তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারছিলেন না। আবার এই ওমরাহরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ও ফ্যারাওএর দরবারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য ঝগড়া আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের নিজেদের ভিতর ঝগড়া ও মারামারির ফলে দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল ও কেন্দ্রীয় শাসন না মেনে এক-এক জায়গায় এক-একজন প্রতাপশালী লোক স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ফ্যারাওএর প্রাধান্য লোপ পেয়ে গেল।

প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন ও ফ্যারাও নামে মাত্র কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু

ফ্যারাওএর প্রাধান্য লোপ পেলেও এই এক হাজার বৎসরে মিশর নানা দিক্ দিয়ে প্রভূত উন্নতি করেছিল। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫৮০ সালে সমগ্র মিশর আবার এক ফ্যারাওএর শাসনাধীনে এসেছিল। এই যুগকে সাম্রাজ্যের যুগ বলা হয় এবং এই সময়ই মিশরের সভ্যতা সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠছিল। মিশরের এই পরম গৌরবময় যুগের ইতিহাস তোমাদের আর একদিন বলা যাবে।

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চঞ্চল বায়ু-সমুদ্রে পাখা ছড়াইয়া ঝড়ো বাতাসের মতই ভীমবেগে "আশাবাদী" উড়িয়া চলিয়াছে—সোজা উত্তর মুখে। নীচে ধূ-ধূ করিতেছে বিরাট্ আটলাণ্টিক মরুভূমি; দেখিয়া দেখিয়া চোখে যেন জ্বালা ধরিয়া যায়।

একটু পরেই দৃশ্যপট বদ্‌লাইয়া গেল—মরুভূমি মুছিয়া দেখা দিল নীল জলরেখা। অধ্যাপক চন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ঐ বোধ হয় নিউ ইয়র্ক্ হ্রদ পার হয়ে এলাম।"

মিঃ আপ্পাবাম উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তার পরই আসবে বোধ হয় ক্যানাডা সাগর। ছিপ ফেলে তিমি ধরতে চান তো তৈরী হয়ে নিন।"

"না, তার চেয়ে একেবারে হাডসন পাহাড়ে গিয়ে বরফ খাওয়া যাবে। যা গরম পড়েছে!"

কিন্তু হাসিঠাট্টার চেষ্টা বেশীক্ষণ চলিল না। কারণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ উপভোগের মত মনের অবস্থা কারোই ছিল না। অধ্যাপক চন্দ্রও ইহা বুঝিতে পারিয়া চুপ্ করিলেন।

পর দিন সকাল বেলা মেরুরাজ্য দেখা দিল।

না, আগেকার রিপোর্টে ভুল নাই। বাস্তবিকই এ এক নতুন দেশ। না শীত না গ্রীষ্ম, এ এক চমৎকার আবহাওয়া! থাকিবার পক্ষে আদর্শ জায়গাই বটে। অধ্যাপক চন্দ্রের নির্দ্দেশ

মত কুয়াসা তাড়াইবার যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হইল। একটু পরেই নীচের দিকে চাহিয়া "আশাবাদীর" কুড়িজন যাত্রী যুগপৎ গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

নীচে,—যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল সবুজ শস্যক্ষেত্র।—যেন কোন নিপুণ কারিগর দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে অতি যত্নে এগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছে। গত দু' বছরের মধ্যে এক সঙ্গে এতটা সবুজ রং কেহ দেখে নাই। সেই সবুজ গালিচার উপর সূর্য্যের সোনার কিরণ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। কুয়াসার ভিতর দিয়া এত সূর্য্যকিরণ আসিল কি করিয়া! না, কুয়াসা এখন আর নাই, কোন্ যাদুকরের সোনার কাঠির স্পর্শে কখন তা কাটিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শুধু সবুজ ক্ষেতই নয়, আশ্চর্য্য হইবার মত আরও কতকগুলি জিনিষ সেখানে ছিল। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি পিরামিডের মত—কিন্তু আকারে তার চেয়েও অনেক বড় ঢিপি

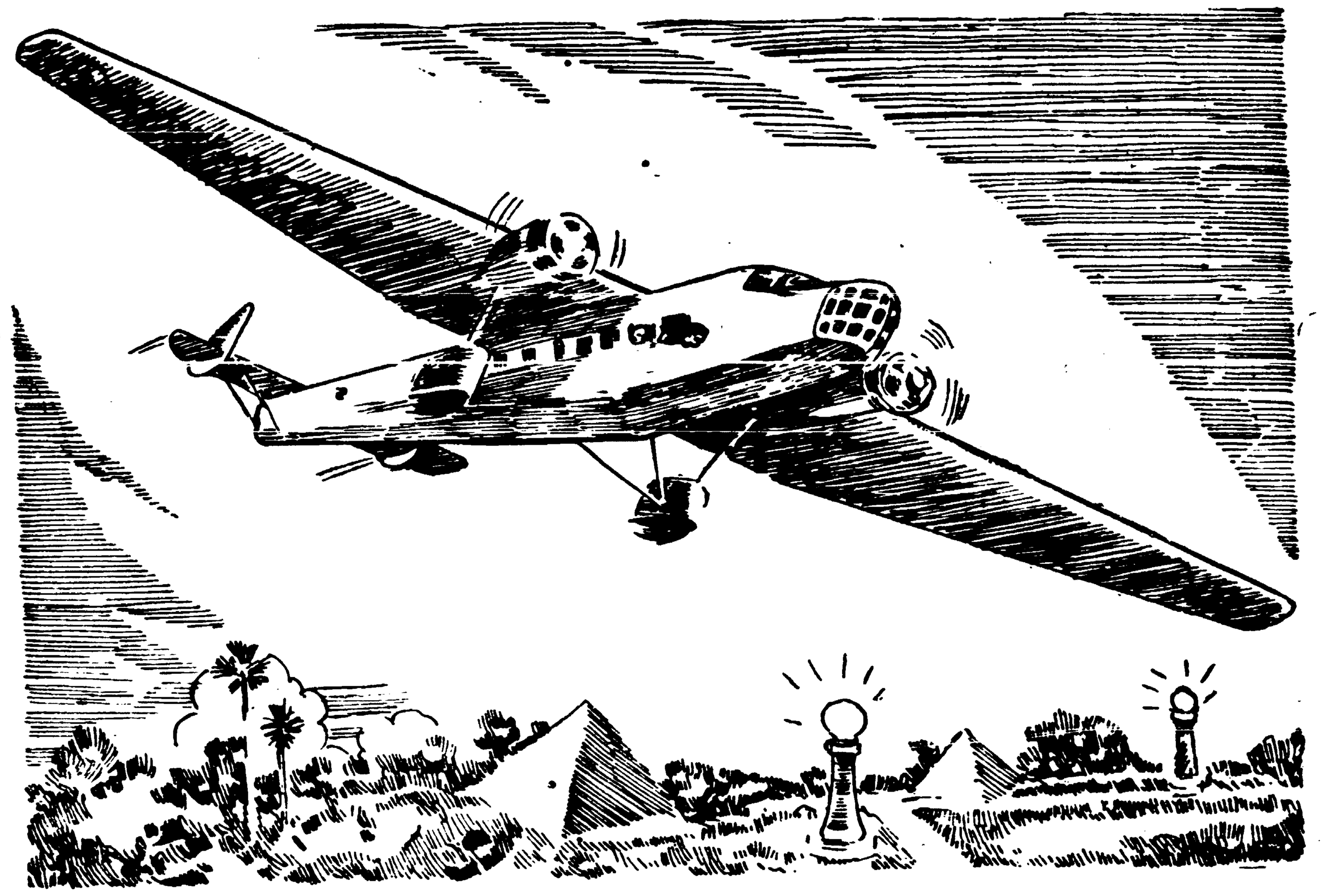

সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি পিরামিডের মত······ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে।

খাড়া হইয়া আছে, আর তারই কাছাকাছি ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে কতকগুলি অদ্ভুত পদার্থ—দূর হইতে দেখিলে সেগুলিকে আলোকস্তম্ভ বলিয়া ভুল হয়। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সমুদ্র আছে বলিয়া তো মনে হয় না, তবে আলোকস্তম্ভই বা কিসের জন্য? আবার আলোক-স্তম্ভের মাথাগুলিও অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল!

অধ্যাপক চন্দ্র পাইলট্‌কে প্লেন্ আরও নামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

আরও খানিকটা নামিবার পর নীচের দৃশ্য স্পষ্টতর হইল। দেখা গেল, সম্মুখের একটা পিরামিডের দরজা খুলিয়া গিয়াছে এবং তার ভিতর দিয়া পিঁপড়ের মত সুগঠিত সারিবদ্ধ একদল জীব জলস্রোতের আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে।

পর মুহূর্ত্তেই একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে নীচেকার সুশৃঙ্খল জনতায় একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। অধ্যাপক চন্দ্র ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁর পাশেই ডক্টর হালুয়াচাই দু' হাত দিয়া একটা বড় বোমা তুলিয়া নীচে ফেলিবার আয়োজন করিতেছেন।

"ডক্টর হালুয়াচাই!" বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে অধ্যাপক চন্দ্র কহিলেন, "আমাকে যখন অভিযানের নেতা করা হয়েছে তখন আমাদের কি করতে হবে না হবে তা আমিই ঠিক করব। তা ছাড়া এখানে এয়ার-মার্শাল্ ম্নোস্কি রয়েছেন, বোমা ফেলবার প্রয়োজন হ'লে তিনিই তার জন্য সুপারিশ করবেন। আপনার এ ব্যবহার ডিসিপ্লিন ভঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথম বোমাটিও আপনিই ফেলেছেন বুঝতে পারছি। এর জন্য হয়তো আমাদের—"

অধ্যাপক চন্দ্রের কথা আর শেষ হইল না। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়া এরোপ্লেনের শব্দ বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীব্র রৌদ্রালোক সকলের হাত-পা ঝলসাইয়া দিল। যাত্রীরা সকলেই উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু অবশ দেহে পক্ষাঘাত রোগীর মত সকলেই নিজ নিজ সীটে গড়াইয়া পড়িলেন। মনে হইল, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনের এঞ্জিন দু'টিও বিকল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এরোপ্লেন মাটীতে ভীমবেগে আছড়াইয়া পড়িল না,—প্যারাশুটের মত অতি ধীরবেগে—যেন হাল্কা বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে নীচে নামিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্যারাশুটের মতই ধীরে ধীরে বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে "আশাবাদী" মাটীতে আসিয়া থামিল। অধ্যাপক চন্দ্র একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখনও একেবারে অবশ—এক চোখ ছাড়া কিছুই নাড়াইতে পারিলেন না। সহযাত্রীদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁদেরও সকলকারই অবস্থা তাঁরই মত।

যে জীবগুলিকে উপর হইতে পিঁপড়ের সারির মত মনে হইয়াছিল তারা ততক্ষণে তাঁদের এরোপ্লেন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সকলে সশঙ্কনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন; না, এরা কোন কিম্ভূত-কিমাকার জীব নয়, সকলেই মানুষ—সকলেরই দীর্ঘ, সুবিশাল দেহ, উন্নত নাসা, চেহারার মধ্যে বলিষ্ঠ ভাবই বেশী। শুধু পোষাকটা একটু অদ্ভুত ধরণের। মেরুবাসী হইলেও চেহারায়, পোষাকে বা অন্য কোন দিক্ দিয়া এস্কিমোদের সঙ্গে এদের কোনও মিল নাই।

তাদের মধ্য হইতে কয়েক জন ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, তার পর দরজা খুলিয়া এরোপ্লেনের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে তারা এরোপ্লেনের ভিতরকার সমস্ত আসবাবপত্র খুঁটিনাটী করিয়া পরীক্ষা করিল, তার পর কয়েক জনের উপর সেগুলির জিম্মা করিয়া দিয়া অধ্যাপক চন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের শরীর তল্লাস আরম্ভ করিল। কোমরের রিভলভার, বাইনকুলার, হাত-ঘড়ী কোন কিছুই তারা খুলিয়া নিতে ছাড়িল না। তার পর, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করিবার পর, তাঁদের অবশ দেহগুলি তুলিয়া লইয়া আবার সেই রকম শ্রেণীবদ্ধভাবে পিরামিডের দিকে অগ্রসর হইল।

পিরামিডের মাঝখান দিয়া একটা, প্রায় বড় রাস্তার মতই প্রশস্ত, বারান্দা চলিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোয় সে বারান্দা ঝলমল করিতেছে। তার দু'পাশে অসংখ্য ঘর,—ছোট বড় নানা আকারের। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, উঠান ইত্যাদিও দেখা যাইতেছে। সমস্ত পিরামিডটা যেন একটা বড় রকম দুর্গ, কিন্তু আগাগোড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেই প্রশস্ত বারান্দা দিয়া মেরুবাসীরা তাদের কুড়ি জন বন্দীকে বহন করিয়া একটা বড় ঘরে আনিয়া নামাইল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মেয়ে পুরুষ নানা দিক্ হইতে ভিড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। এই অদ্ভুত লোকদের আগমনবার্ত্তা তাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে বেশী দেরী হয় নাই।

কিন্তু বন্দীদের বেশীক্ষণ এ ভাবে উত্যক্ত করা হইল না। একটু পরেই আর একজন একটু হোমরা-চোমরা গোছের চেহারার লোক আসিয়া অদ্ভুত ভাষায় অন্য সকলকে কি বলিল, ফলে বন্দীদের রেহাই দিয়া সকলে নিজ নিজ কাজে প্রস্থান করিল।

সে রাত্রি কুড়িজন অভিযানকারীর সেইভাবেই কাটিল; নড়িবার সাধ্য নাই, কথা বলার উপায় নাই, অথচ সকলেরই সজ্ঞান অবস্থা। এমন ভীষণ অবস্থার কথা কেউ কখনও ভাবিতেও পারে নাই। শেষ রাত্রের দিকে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর তখনও ভাল করিয়া হয় নাই; অধ্যাপক চন্দ্র হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, ঘরের ভিতরটা একটা মৃদু ঈষৎ নীলাভ আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। দেহের অসাড় ভাবটাও যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। হাত-পা নাড়িবার চেষ্টা করিতেই সেগুলি কার্য্যক্ষম মনে হইল। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করিয়া অধ্যাপক চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, অদূরে সঙ্গীদেরও অনেকে উঠিয়া বসিয়াছে। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড কাঠের পাত্রে প্রচুর ফলফলারি সাজান। এমন টাটকা ফল বহু দিন তাঁদের চোখে পড়ে নাই। ফলগুলির দিকে চাহিতেই মনে হইল, হ্যাঁ, ক্ষুধাটা ভালমতই পাইয়াছে।

খাওয়া-দাওয়া তৃপ্তির সঙ্গেই শেষ হইল। তার পর আলোচনা সুরু হইল এখন কি কর্ত্তব্য। এ তাঁরা কোথায় আসিয়া পড়িলেন! এই অদ্ভুত লোকগুলি কোথা হইতে আসিল! হাব-ভাব দেখিয়া তো বেশ সভ্য বলিয়াই মনে হয়, এ কোন্ সভ্যতা হঠাৎ মাটী ফুঁড়িয়া দেখা দিল! কিন্তু এই

আশ্চর্য্য ব্যাপারে বিশেষ বিচলিত তাঁরা হইলেন না—কারণ এ দু' বছর ধরিয়া এর চেয়েও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে। কিছুতে আশ্চর্য্য হওয়া এখন তাঁরা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য না হইলেও চিন্তিত হইবার কারণ যথেষ্ট ছিল। তাঁরা সকলেই এখন বন্দী, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র যা ছিল সবই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কোন রকম উৎপীড়ন না করিলেও এই অদ্ভুত মানুষগুলি এর পরে তাঁদের লইয়া কি করিবে কিছুই ঠিক নাই।

ডক্টর হালুয়াচাই উদ্ধত স্বরে কহিলেন, "বোমা ফেলে ভাল করছিলাম কিনা দেখলেন তো! আমাকে বাধা না দিলে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা হ'ত না। কয়েকটি বোমা খেলেই বাছাধনরা আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হ'তেন, এ সব বাড়াবাড়ি করবার সাহস পেতেন না। আমাদের এই বিপদের জন্য দায়ী আমাদের ক্যাপ্টেন।"

মিঃ আপ্পারাম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু এদের এ সাহসটা যে আপনার ঐ একটা বোমা ফেলার দরুণ হয় নি তাই বা কেন মনে করছেন? এদের শক্তি-সামর্থ্যের যা নমুনা পাচ্ছি তাতে তো নেহাৎ দুর্ব্বল বলে এদের মনে হয় না। হয়তো এমনও হ'তে পারে যে ঐ বোমায় এদের কোন প্রাণহানি হয় নি বলেই আমরা প্রাণে বেঁচে আছি। ২।১ জন ঘাল হ'লে আমাদের কুড়ি জনকেই হয়তো ওরা এতক্ষণে খতম্ করে দিত।"

"বাদ-প্রতিবাদ ক'রে এখন লাভ নেই, যা হয় নি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ডক্টর হালুয়াচাই, ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে আপনার কথাবার্ত্তা আর একটু সংযত হওয়া দরকার।" অধ্যাপক চন্দ্র মন্তব্য করিলেন।

ডক্টর হালুয়াচাই আপন মনে গজরাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জবাব দিতে সাহস পাইলেন না।

ইহার পর উপস্থিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতে লাগিল, কিন্তু করিবার মত কিছুই স্থির করা গেল না।

বাহিরে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরের দরজা আবার খুলিয়া গেল। গত কালকার সেই হোমরা-চোমরা চেহারার লোকটি ঘরে ঢুকিয়া অদ্ভুত ভাষায় কি বলিল। কেহই কিছু বুঝিল না—শুধু অধ্যাপক চন্দ্র ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কানটা আর একটু আগাইয়া দিলেন। কিন্তু লোকটি এবার আর কথার পুনরাবৃত্তি করিল না—ইসারায় তাকে অনুসরণ করিবার আদেশ জানাইল। সঙ্গীর দল জিজ্ঞাসুনেত্রে অধ্যাপক চন্দ্রের দিকে তাকাইলেন। দরজার পাশে একদল সশস্ত্র রক্ষী দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া চন্দ্র জানাইলেন, আপাততঃ আদেশ না মানিয়া লাভ নাই।

(ক্রমশঃ)

অমৃত-দ্বীপ

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

[গোড়ায় একটুখানি গৌরচন্দ্রিকার দরকার। যদিও "অমৃত-দ্বীপ" নতুন উপন্যাস, তবু এর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত "ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন" নামে উপন্যাস থেকে। বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মাণিক ও ইন্স্পেক্টার সুন্দরবাবু কয়েকটি রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তদ্বিরে নিযুক্ত হয়ে 'তাও' ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক প্রাচীন চীনা সাধক লাউ-ৎজুর জেড-পাথরে গড়া একটি ছোট প্রতিমূর্ত্তি এবং অমৃত দ্বীপে যাবার একখানি ম্যাপ হস্তগত করে। খৃষ্ট জন্মাবার ছয়শত চার-বৎসর আগে চীনদেশে লাউ-ৎজুর আবির্ভাব হয়।

চীনদেশের প্রাচীন পুঁথি-পত্রে প্রকাশ, তাও সাধুদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে একটি দ্বীপ আছে, তার নাম "অমৃত-দ্বীপ।" সেখানে 'সিয়েন্' অর্থাৎ অমররা বাস করে। সেখানে অমর-লতা জন্মায়, তার অমৃত-ফল ভক্ষণ করলে মানুষও অমর হয়। যারা তাও-ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, অমৃত-দ্বীপে যাওয়া। আর, সেখানে গেলে লাউ-ৎজুর মন্ত্রপূত প্রতিমূর্ত্তি সঙ্গে থাকা চাই।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের মতন তাও-ধর্ম্মও পরের যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার মধ্যে ক্রমেই ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক আর হরেক রকম ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। তাও-সাধকরা বলে, তাদের সিদ্ধপুরুষরা কেবল অমরই হয় না, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ।

আধুনিক যুগে এ-সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বটে, কিন্তু চীনাদের পবিত্র পাহাড় থাইসানের তলদেশে অবস্থিত থাইআনফু মন্দিরে গিয়ে এক সমাধিমগ্ন তাও সিদ্ধপুরুষকে দেখে রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্ নামে এক জার্ম্মান সাহেব সবিস্ময়ে লিখেছেন, "এই সমাধিস্থ তাও-সাধক মৌনব্রতী। তিনি কত কাল খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করেন নি। বাইরের কোন-কিছুই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে না। তাঁর দেহ শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, দেখতেও তাঁকে মড়ার মত, কিন্তু তাঁর দেহ সম্পূর্ণ তাজা, একটুও প'চে যায় নি।" (The Soul of China নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

"অমৃত-দ্বীপে"র পাঠকদের পক্ষে এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট। যাঁদের আরো কিছু জানবার আগ্রহ আছে তাঁরা "ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন" প'ড়ে দেখবেন। ইতি—লেখক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শত্রুর উপরে শত্রু

জাহাজ ভেসেছে নীল জলে। এ জাহাজ একেবারেই তাদের নিজস্ব।

অমৃত-দ্বীপে যাবার সমস্ত জলপথটাই তাদের ম্যাপে আঁকা ছিল। সেই ম্যাপ দেখেই বোঝা যায়, কোন বাণিজ্য-তরী বা যাত্রী-জাহাজই ও-দ্বীপে গিয়ে লাগে না, 'চার্টে' ও-দ্বীপের কোন উল্লেখই নেই।

কাজেই বিমল ও কুমারের প্রস্তাবে একখানা গোটা জাহাজই 'চার্টার' বা ভাড়া করা হয়েছে। এটাও তাদের পক্ষে নতুন নয়। কারণ এইরকম একখানা গোটা জাহাজ ভাড়া ক'রেই তারা একবার "লষ্ট্ আট্‌লান্টিস"-কে পুনরাবিষ্কার করেছিল। *

জয়ন্ত, মাণিক ও সুন্দরবাবুর এ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল না। বিমল ও কুমার একরকম জোর ক'রেই তাদের সঙ্গে টেনে এনেছে।

কাজে-কাজেই তাদের পুরাতন ভৃত্য ও দস্তুরমত অভিভাবক রামহরিও যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গ নিতে ছাড়ে নি।

এবং এমন ক্ষেত্রে তাদের চির-অনুগত চতুষ্পদ যোদ্ধা বাঘাও যে সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে আসতে ছাড়বে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাদের পুরাতন দলের মধ্যে কেবল বিনয়বাবু আর কমলকে এবারে সঙ্গীরূপে পাওয়া গেল না। বিনয়বাবু এখন ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কুইনিন ও আদার কুচির সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত এবং কমল দেবে এবার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা।

জাহাজখানির নাম "লিট্‌ল্ ম্যাজেষ্টিক"। আকারে ছোট হ'লেও যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এর মধ্যে চমৎকার সাজানো-গুছানো 'লাউঞ্জ', 'ডাইনিং সেলুন,' 'প্রমেনেড ডেক' ও 'পাম-কোর্ট' প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। এ-রকম জাহাজ 'চার্টার' করা বহুব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু বিমল ও কুমার যে অত্যন্ত ধনবান্ এ-কথা সকলেই জানেন। তার উপরে জয়ন্তও বিনা পয়সার অতিথি হ'তে রাজি হয় নি এবং সেও রীতিমত ধনী ব্যক্তি।

জাহাজ তখন টুংহাই বা পূর্ব্বসাগর প্রায় পার হয়ে রিউ-কিউ দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

উপরে, নীচে, চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কেবল অনন্ত নীলিমা—কাছে চঞ্চল, দূরে শান্ত।

এই নীলিমার জগতে এখন নূতন বর্ণ সৃষ্টি করছে নিম্নে শুধু শুভ্র ফেনার মালা এবং শূন্যে শুভ্র সাগর-বিহঙ্গের দল। প্রকৃতির রঙের ডালায় এখন যেন আর কোন রং নেই।

প্রাকৃতিক সঙ্গীতেও এখানে নব নব রাগিণীর ঝঙ্কার নেই। না আছে উচ্ছ্বসিত শ্যামলতার মর্ম্মর, না আছে গীতকারী পাখীদের সুরের খেলা, বইছে কেবল হু-হু শব্দে দুরন্ত বাতাস এবং জাগছে কেবল আদিম সাগরের উচ্ছল কল্-কল্ মন্ত্র—এ-দুই ধ্বনিরই সৃষ্টি পৃথিবীর প্রথম যুগে, যখন সবুজ গাছ আর গানের পাখীর জন্মই হয় নি।

* "নীলসায়রের অচিন্ পুরে" নামক উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

খোলা 'প্রমেনেড ডেকে'র উপরে পায়চারি করতে করতে মাণিক বললে, "আমাদের এই সমুদ্র-যাত্রা শেষ হ'তে আরো কত দেরি বিমলবাবু?"

বিমল বললে, "আর বেশী দেরি নেই। চার ভাগ পথের তিন ভাগই আমরা পার হয়ে এসেছি। ম্যাপখানা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আরো কিছু দূর এগুলেই বোনিন্ দ্বীপপুঞ্জের কাছে গিয়ে পড়ব। তাদের বাঁয়ে রেখে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে প্রায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে। তারপর অমৃত-দ্বীপ।"

মাণিক বললে, "দ্বীপটি নিশ্চয়ই বড় নয়! কারণ তাহ'লে নাবিকদের 'চার্টে' তার উল্লেখ থাকত। এখানকার সমুদ্রে এমন অজানা ছোট ছোট দ্বীপ দেখছি তো অসংখ্য। অমৃত-দ্বীপকে আপনি চিনবেন কেমন ক'রে?"

—"ম্যাপে অমৃত-দ্বীপের ছোট্ট একটা নক্সা আছে, আপনি কি ভালো ক'রে দেখেন নি? সে দ্বীপের প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তার চারিপাশই পাহাড় দিয়ে ঘেরা—পাহাড় কোথাও কোথাও দেড়-দুই হাজার ফুট উঁচু। তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, দ্বীপের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের উপরে আছে ঠিক পাশাপাশি পাঁচটি শিখর। সব-চেয়ে উঁচু শিখরের উচ্চতা দুই হাজার তিন শো ফুট। এ-রকম দ্বীপ দূর থেকে দেখলেও চেনা শক্ত হবে না।"—ব'লেই ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সমুদ্রের পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আচ্ছা বিমলবাবু, আমরা যাচ্ছি তো পূর্ব্বদিকে! অথচ আজ ক'দিন ধ'রেই আমি লক্ষ্য করছি, আপনি যখন-তখন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন! এর মানে কি?"

জয়ন্ত এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললে, "এর মানে আমি আপনাকে বলতে পারি। বিমলবাবু দেখছেন, আমাদের পিছনে কোন শত্রু-জাহাজ আসছে কি না!"

—"এখানে আবার শত্রু আসবে কে?"

—"কেন, কলকাতাকে যারা ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছিল, আপনি এরি মধ্যে তাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি?"

—"কী যে বল তার ঠিক নেই! সে দল তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে!"

—"কেমন ক'রে জানলেন?"

—"পালের গোদা কুপোকাৎ হ'লে দল কি আর থাকে?"

দূরবীণ নামিয়ে বিমল বললে, "আমার বিশ্বাস অন্য রকম। সে দলের প্রত্যেক লোকই মরিয়া, তারা সকলেই অমৃত-দ্বীপে যাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ও-দ্বীপের ঠিকানা তারা জানে না, কারণ ম্যাপখানা আছে আমাদের হাতে। আমরা যে তাদের দেশের কাছ দিয়ে

অমৃত-দ্বীপে যাত্রা করেছি, নিশ্চয়ই এ-সন্ধান তারা রাখে। যারা লাউ-ৎজুর মূর্ত্তি আর ঐ ম্যাপের লোভে সুদূর চীন থেকে বাংলাদেশে হানা দিতে পেরেছিল তারা যে আর একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবে না, এ-কথা আমার মনে হয় না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, শেষ চেষ্টা মানে? আপনি কি বলতে চান, তাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজের জলযুদ্ধ হবে?"

—"আশ্চর্য্য নয়।"

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে ও উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য্য নয় মানে? জলযুদ্ধ অম্‌নি হ'লেই হ'ল? আমাদের সেপাই কোথায়? কামান কোথায়?"

কুমার হেসে বললে. "কামান নেই বা রইল, আমাদের সকলেরই হাতে আছে অটোমেটিক বন্দুক। আর আমাদের সেপাই হচ্ছি আমরাই।"

সুন্দরবাবু অধিকতর উত্তেজিত হয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিকট স্বরে "হুম্" শব্দ ক'রে মস্ত এক লাফ মেরে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে পড়লেন।

মাণিক বললে, "কি হ'ল সুন্দরবাবু, কি হ'ল? আপনার ভুঁড়িটা কি ফট্ ক'রে ফেটে গেল?"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "যাও, যাও! দেখতে যেন পাও নি, আবার ন্যাকামি করা হচ্ছে! কুমারবাবু, আপনার ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে এবার থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন। আমাকে দেখলেই ও-বেটা কোত্থেকে ছুটে এসে ফোঁশ্ ক'রে আমার পায়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলে কি শোঁকে, বলতে পারেন মশাই?"

মাণিক বললে, "আপনার পাদপদ্মের গন্ধ বাঘার বোধ হয় ভালো লাগে।"

—"ইয়ার্কি কোরো না মাণিক, তোমার ইয়ার্কি বাঘার ব্যবহারের চেয়েও অভদ্র। ঐ নেড়ে-কুত্তোটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, চল্‌লুম আমি এখান থেকে।"

সুন্দরবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হ'লেন, বাঘা বিলক্ষণ অপ্রতিভভাবে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। এ লোকটি যে তাকে দু-চোখে দেখতে পারে না, এটা সে খুবই বোঝে। তাই বাঘার কৌতূহল হয়, সুন্দরবাবুকে কাছে পেলেই সে তাঁর পা শুঁকে দেখে। মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করবার এর চেয়ে ভদ্র উপায় পৃথিবীর কোন কুকুরই জানে না।

....

পরদিন প্রভাতে 'ব্রেক্‌ফাষ্ট'র পর বিমল ও কুমার জাহাজের ডেকে উঠে গেল। জয়ন্ত লেব্‌লাঁকের লেখা একখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নিয়ে 'লাউঞ্জে' গিয়ে আরাম ক'রে বসল, মাণিকও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, "জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত দেখছি, বিমলবাবু আর কুমারবাবু

অদৃশ্য শত্রুর কাল্পনিক ছায়া দেখবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, আর তোমরা গাঁজাখুরি ডিটেক্‌টিভের গল্প নিয়েই বিভোর! কারুর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবার ফাঁক নেই!"

জয়ন্ত জবাব দিলে না। মাণিক বললে, "আচ্ছা, এই রইল আমার বই! এখন প্রকাশ করুন আপনার প্রাণের কথা।"

সুন্দরবাবু নিম্নস্বরে বললেন, "কথাটা কি জানো? এই অমৃত-দ্বীপ, অমর-লতা, জলে-স্থলে-শূন্যে চিরজীবী মানুষের অবাধ গতি, এ-সব কি তুমি বিশ্বাস কর ভায়া?"

—"আমার কথা ছেড়ে দিন। আগে বলুন, আপনার কি মত?"

—"হুম্, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! বিমল আর কুমার বাবুর মাথায় তোমাদেরও চেয়ে বোধ হয় বেশী ছিট্ আছে!"—ব'লেই সুন্দরবাবু ফোঁশ্ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—"হঠাৎ অমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন?"

—"কি জানো ভায়া, প্রথমটা আমার কিঞ্চিৎ লোভ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সবই ভুয়ো! যা নয় তাই!"

—"কিসের লোভ সুন্দরবাবু?"

—"ঐ অমর-লতার লোভ আর কি! ভেবেছিলুম দু-একটা অমৃত-ফল খেয়ে যমকে কলা দেখাব। কিন্তু এখন যতই ভেবে দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমরা ছুটেছি মরীচিকার পিছনে, কেবল কাদা ঘেঁটেই ফিরে আসতে হবে।"

—"তাহ'লে আপনি কেবল অমর হবার লোভেই বিমলবাবুদের অতিথি হয়েছেন?"

—"না বলি আর কেমন ক'রে? অমর হ'তে কে না চায়?"

—"অমর হওয়ার বিপদ্ কত জানেন?"

—"বিপদ্?"

—"হ্যাঁ, দু-একটার কথা বলি শুনুন। ধরুন, আপনি অমর হয়েছেন। তার পর কুমারবাবুর কুকুর বাঘা হঠাৎ পাগ্‌লা হয়ে গিয়ে আপনাকে কামড়ে দিলে। তখন কি হবে?"

—"হুম্, কী আবার হবে? আমি হাইড্রোফোবিয়া রোগের চিকিৎসা করাব!"

—"চিকিৎসায় রোগ যদি না সারে, তাহ'লে? আপনি অমর, সুতরাং মরবেন না। কিন্তু সারাজীবন—অর্থাৎ অনন্তকাল আপনাকে ঐ বিষম রোগের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।"

—"তাই তো হে, এ-সব কথা তো আমি ভেবে দেখি নি!"

—"তার পর শুনুন। আপনি অমর হ'লেও আপনার দেহ বোধ করি অস্ত্রে অকাট্য হবে না। কেউ যদি খাঁড়া দিয়ে আপনার গলায় এক কোপ্ বসিয়ে দেয়, তাহ'লে কি মুস্কিল হ'তে পারে ভেবে দেখেছেন কি? আপনি অমর। অতএব হয় আপনার মুণ্ড, নয় আপনার দেহ,

নয়তো ও-দুটোই চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেই কন্ধকাটা দেহ আর দেহহীন মুণ্ড নিয়ে আপনি অমরতার কি সুখ ভোগ করবেন ?”

—“মাণিক, তুমি কি ঠাট্টা করছ ?”

—“মোটেই নয়। অমর হওয়ার আরো সব বিপদের কথা শুনতে চান ?”

—“না, শুনতে চাই না। তুমি বড্ড মন খারাপ ক’রে দাও। অমৃত-ফল পেলেও আমি আর খেতে পারব কিনা সন্দেহ।”

জয়ন্ত এতক্ষণ কেতাবের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। এখন কেতাব সরিয়ে বললে, “সুন্দরবাবু, অমৃত-দ্বীপের কথা হয়তো রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকের শুক্‌নো বৈজ্ঞানিক জগতে সরস রূপকথার বড়ই অভাব হয়েছে। সেই অভাব-পূরণের কৌতূহলেই আমরা বেরিয়েছি অমৃত-দ্বীপের সন্ধানে। সুতরাং অমর-লতা না পেলেও আমরা দুঃখিত হব না। অন্ততঃ যে ক’দিন পারি রূপকথার রঙিন কল্পনায় মনকে স্নিগ্ধ ক’রে তোলবার অবকাশ তো পাব! আর ওরই মধ্যে থাকবে যেটুকু অ্যাড্‌ভেঞ্চার, সেটুকুকে মস্ত লাভ ব’লেই মনে করব!”

এমন সময়ে একজন নাবিক এসে খবর দিলে, বিমল সবাইকে এখনি ডেকের উপরে যেতে বলেছে।

সকলে উপরে গিয়ে দেখলে, ডেকের রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখে দূরবীণ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, “বিমলবাবু কি আমাদের ডেকেছেন ?”

বিমল ফিরে বললে, “হ্যাঁ জয়ন্তবাবু! পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন।”

পশ্চিম দিকে চেয়েই জয়ন্ত দেখতে পেলে, একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে এগিয়ে আসছে।

বিমল বললে, “আমি খুব ভোরবেলা থেকেই ও-জাহাজখানাকে লক্ষ্য করছি। প্রথমটা ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয় নি। কিন্তু তার পরে বেশ বুঝলুম, ও আসছে আমাদেরই পিছনে। জানেন তো, এখানকার সমুদ্রে চীনে-বোম্বেটেদের কি রকম উৎপাত! খুব সম্ভব, আমাদের শত্রুরা কোন বোম্বেটে-জাহাজের আশ্রয় নিয়েছে। দূরবীণ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও-জাহাজখানায় লোক আছে অনেক—আর অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। আমাদের কাপ্তেন-সায়েবের সঙ্গে আমি আর কুমার পরামর্শ করেছি। কাপ্তেন বললেন, জলে ওরা আক্রমণ করলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে না।”

—“তাহ’লে উপায় ?”

—“দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখুন।”

দক্ষিণ দিকে মাইল দুয়েক তফাতে রয়েছে ছোট্ট একটি তরুশ্যামল দ্বীপ।

—“আমরা আপাততঃ ঐ দ্বীপের দিকেই যাচ্ছি। আশা করি শত্রুদের জাহাজ আক্রমণ করবার আগেই অমরা ঐ দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব। তার পর পায়ের তলায় থাকে যদি মাটি, আর একটা যুৎসই স্থান যদি নির্ব্বাচন করতে পারি, তাহ’লে এক হাজার শত্রুকেও আমি ভয় করি না। আপনার কি মত ?”

জয়ন্ত বললে, “বিমলবাবু, এ অভিযানের নায়ক হচ্ছেন আপনি। আমরা আপনার সহচর মাত্র। আপনার মতেই আমাদের মত।”

সুন্দরবাবু নীরস স্বরে বললেন, “তাহ’লে সত্যি-সত্যিই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে ?”

কুমার বললে, “তা ছাড়া আর উপায় কি ? বিনা যুদ্ধে ওরা আমাদের মুক্তি দেবে ব’লে বোধ হয় না। তবে আশার কথা এই যে, আমরা ওদের আগেই ডাঙায় গিয়ে নামতে পারব।”

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, “এর মধ্যে আশা করবার মত কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঐ চীনে বোম্বেটে বেটারাও তো দলে দলে ডাঙায় গিয়ে নামবে ?”

—“ভুলে যাবেন না, আমরা থাকব ডাঙায়, গাছপালা বা ঢিপিঢাপা বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। আমাদের এই অটোমেটিক বন্দুকগুলোর সুমুখ দিয়েই নৌকোয় ক’রে ওদের ডাঙায় এসে উঠতে হবে। আমাদের এক-একটা অটোমেটিক বন্দুক প্রতি মিনিটে কত গুলি বৃষ্টি করতে পারে জানেন তো ? সাতশো! আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত মারণাস্ত্র!”

সুন্দরবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, “কিন্তু এ-ভাবে মানুষ খুন ক’রে শেষটা আইনের পাকে আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে না তো ?”

কুমার হেসে বললে, “সুন্দরবাবু, এ জায়গা হচ্ছে অরাজক। এই বোম্বেটেদের জল-রাজ্যে একমাত্র আইন হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো।”

সুন্দরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “হুম্!”

বিমল তখন আবার চোখে দূরবীণ লাগিয়ে শত্রু-জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে আর দূরবীণের দরকার হয় না। খালি চোখেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তার ডেকের উপরে দলে দলে চীনেম্যান ব্যস্ত, উত্তেজিত ভাবে এদিকে-ওদিকে আনাগোনা বা ছুটাছুটি করছে!

হঠাৎ বিমল দূরবীণ নামিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। তার মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি ভয়-চকিত।

বিমলের মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্ন! কুমার রীতিমত অবাক্ হয়ে গেল।

জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, “কি হ’ল বিমলবাবু, আপনার মুখ-চোখ অমনধারা কেন ?”

বিমল দূরবীণটা জয়ন্তের হাতে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, “শত্রু-জাহাজের পিছনে

চেয়ে দেখুন, বোম্বেটেদেরও চেয়ে ভয়াবহ এক শত্রু আমাদের গ্রাস করতে আসছে! আমি এখন 'ব্রিজে'র ওপরে কাপ্তেনের কাছে চললুম, আরো তাড়াতাড়ি ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠতে না পারলে আর রক্ষা নেই!"

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "বোম্বেটেরও চেয়ে ভয়াবহ শত্রু? ও বাবা, বলেন কি?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ সুন্দরবাবু! এমন আর এক শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, যার নামে ভয়ে কঁপে সারা ছনিয়া! তার সামনে আমাদের অটোমেটিক বন্দুকও কোন কাজে লাগবে না!"

—এই ব'লেই বিমল জাহাজের 'ব্রিজে'র দিকে ছুটল দ্রুতপদে। (ক্রমশঃ)

খোস-খবর

'ওয়াই.এম্.সি-এ'র নাম তোমরা সবাই জান। ভারতের ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় এঁদের শাখা আছে। ওয়াই.এম্.সি.এ অর্থাৎ Young Men's Christian Association। যুবকদের আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে জর্জ্জ্ উইলিয়াম্স্ নামে এক ভদ্রলোক এই সমিতি স্থাপন করেছিলেন—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে।

*　　*　　*

ইংলণ্ডের রাজা নিজের খরচের জন্য ৪১০০০০ পাউণ্ড বৃত্তি পান। এই টাকার মধ্যে তাঁর হাত-খরচ, চাকরবাকরের খরচ, সংসার-খরচ ইত্যাদি সব চালাতে হয়। হাত-খরচের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে ১১০০০০ পাউণ্ড। এ ছাড়া রাণী ও রাজকুমারী আলাদা বৃত্তি পান। রাণী পান ৭০০০০ পাউণ্ড আর রাজকুমারী এলিজাবেথ পান ৬০০০ পাউণ্ড।

*　　*　　*

সুমাত্রা দ্বীপে র‍্যাফ্লেসিয়ার নামে এক জাতের ফুল দেখা যায়। এদের এক-একটা বেড়ে প্রায় দেড় ফুট হয়, ওজনেও হয় ৮।৯ সের।

*　　*　　*

ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ে খোলা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে ঠানা

পর্য্যন্ত—২১ মাইল (জি, আই. পি)। বাংলা দেশে প্রথম রেলগাড়ী চলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে—কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ—১২১ মাইল (ই.আই. আর)।

ঠং নয়, ঠক্

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

রাত সাড়ে বারোটায় পবিত্র এসে হাজির! একেবারে ঘোড়ায় জীন চড়িয়ে! আমি তখন মেসে ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু পবিত্রর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—পরলোকে গেলেও শোনা যায়—আমি ত' মাত্র ঘুমিয়ে—এবং সে ঘুমও এমন কিছু চিরনিদ্রা নয়। কাজে কাজেই ঘুম ভেঙে গেল প্রথম ডাকেই। বিরক্ত হলাম—হবার কারণও ছিল। গত তিন রাত্রি চোখের ছ'পাতা এক করতে পারি নি এবং সেইজন্যই আজ রাত্রে শোয়ার আগে ঘুমের জন্য বিধিমত রাজসূয় যজ্ঞ করে শুয়েছিলাম। আমার রুমের দরজা বন্ধ করেছিলাম—মেসের অন্যান্য মেম্বারদের অবাঞ্ছিত বন্ধুত্ব এড়াতে। ছারপোকাদের অনাথ করে চৌকী ছেড়ে মাটীতে সটান হয়েছি। এর উপর ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার এবং শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর পায়ে হেঁটেই উঠিয়েছি—অকারণ পুলকে নয়—ঘুমকে গাঢ় করবার জন্যই শুধু। এ হেন সময়ে পবিত্রর আহ্বান—যত পবিত্রই হোক—অতীব বিরক্তিজনক। আর তাও বা কি কারণ থাকতে পারে এত রাত্রে এত ডাকাডাকির?

—"এই যে রমেশ!" পবিত্রর প্রথম কথা।

আমি যে নেহাৎ-ই আমিই আছি, কিছুই বদলাই নি সেটা হাবভাবে প্রকাশ করি; "তা এত রাত্রে যে? আমি ভেবেছিলাম বুঝি ডাকাত পড়ল—"

—"হেঃ, মাত্র সাড়ে বারোটায়ই ডাকাত পড়বে—" পবিত্র তার পানের ছোপ লাগা দাঁত বার করে ফেলে—হাসে বলে সন্দেহ হয়।

—"তার পর?" আমি আসল ব্যাপার জানতে উৎসুক।

—"টাকা দিতে পারিস ক'টা? ধার?" পবিত্র খোলসা করে।

—"টাকা ধার! পকেটে মাত্র একটা ঠন্ঠনে টাকা—কাল সকালে আমাকেই ধার করতে হবে হয়তো!"

—"পরিহাস করছিস?" পবিত্রর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

—"পরিহাস ? নামমাত্র না।"

—"তবে ঐ টাকাটাই দে—একটা টাকা—"

—"য়্যাঃ ?"

—"কাল সকালে যখন ধার করবি তখন নয় একটা টাকা বেশী করেই করবি ! রাতে ত' তোর কোন খরচ নেই ; তা হ'লে—"

যুক্তিতে হার মানব কিনা ভাবছি—টাকাটা দেওয়া উচিত হবে কিনা তাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখছি—পবিত্র আমার পেরেকে ঝোলানো সার্টের সকাশে গিয়ে গভীর মনোনিবেশ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ সুরু করে দেয়। গুপ্তস্থান থেকে টাকাটা খসিয়ে এনে পকেটস্থ করে—আমার কোন রকম বাক্যস্ফূর্ত্তি হবার আগেই। আমি একেবারে হাঁ-হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ি বলতে গেলে। ইতিমধ্যে পবিত্র টাকাটা বার করে মাটীতে ঠং করে বাজাতে চেষ্টা করে। আওয়াজ বের হয়, কিন্তু ঠং নয়, ঠক্! পবিত্র চমকে ওঠে, আমিও। সমস্বরে দু'জনেই বলে উঠি, "অচল নাকি রে ? দেখি ?—"

তার পর পবিত্র একাই বলে, "ডাহা অচল—তাই ত !"

পরে আমার দিকে ফেরে, "তুমি ত' আচ্ছা ইয়ে—কই উচ্চবাচ্য করছ না তো বিশেষ ? অচল টাকাটা বেশ ত' ভুলিয়ে ভালিয়ে গছিয়ে দিচ্ছিলে আমাকে !" আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু পবিত্র পয়লা-নম্বরের দুর্ম্মুখ—ও যখন মুখ খুলেছে তখন বোজানো ও বোঝানো দুশ্চেষ্টা মাত্র। "তুমি ত' ভারী খারাপ লোক হে—বেশ চালিয়ে দিচ্ছিলে ! তুমি খুন করতে পারো দরকার হ'লে। নেহাৎ নয় ধার-ই চেয়েছিলাম—না দেবে না হয় নাই দেবে—বড় জোর গালে একটা চড়-ই মারতে—তা ব'লে কিনা অচল টাকা—একেবারে হাজতে যাবার পথ ! এর থেকে বালিশের তলায় সাপ রেখে এলে পারতে—একটা আস্ত গোখরো !—তুমি বন্ধু হয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে মারবার ব্যবস্থা করছিলে—কি ভয়ানক লোক !—একটা টাকা না হয় অচল হয়ে খোয়াই যেত—কিন্তু সেটা কি আমাকে খোয়ানোর চেয়ে ভাল হ'ত না ?" রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে পবিত্র প্রস্থান করে।

আমি ভাবতে বসি। টাকাটার মধুর ঝঙ্কার আমি আজ সন্ধ্যায়ও একবার উপভোগ করেছি। তবে সে কি আমারই ভুল !

ভোরে ঘুম ভাঙতেই পূর্ব্বরাত্রের কথা স্মরণ করে ছুটি ধার করতে—না হ'লে চা চাখা পর্য্যন্ত বন্ধ—ধারে কেউ ও সব দেয় না আমাকে। জন দু'য়েক বন্ধু হয়ে এবং নিরাশ হয়েই ফিরছি, পথে শরৎদা'র সঙ্গে দেখা। শরৎদা'কে আঁকড়ে ঝুলে পড়ি, "সুপ্রভাত—শরৎদা'। চা খাওয়াও।" এমনভাবে বলি, শরৎদা' আর না করতে পারে না।

ধীরেসুস্থে পেয়ালা শেষ করে বলি, "কিছু ধার দিতে পারো শরৎদা' ? একটা টাকা ? নেই ?—"

—"উহুঁ, পয়সাকড়ি কিছু নেই ; কাল রাত্রে পবিত্রর কাছে আট আনা পয়সা মিল্‌ল—তাও ত' চায়ে—"

"ওঃ, তোমাকে ধার দেবার জন্যই বুঝি হতভাগা ধার করতে গিয়েছিল আমার কাছে রাত বারোটায়—"

—"রাত বারোটায় কই ? ওর কাছ থেকে আট আনা পেয়েছি আটটা-ন'টা নাগাদ ; আর সে ত' ধার নয়—সে ত আমার ন্যায্য পাওনা—অচল টাকার বদলে পেয়েছি।"

—"য়্যাঃ ! তার মানে ?"

—"কেন, তুই জানিস্ না ? আধা দামে সব অচল জিনিষ ও কিনে নেয় যে ! আমার কাছে একটা ডাহা সীসের টাকা পড়ে ছিল—টাকাটা চালাতে চেষ্টার কসুর করি নি—কিন্তু সব বৃথা। তার পর এত দিন সেটা পড়ে ছিল অনাদরে,—কাল পবিত্রই বাড়ীতে গিয়ে আগ্রহ করে সেটা অর্দ্ধেক দামে কিনে নিলে, বল্‌লে ও ঠিক চালিয়ে নেবে।"

গত রজনীর সমস্ত রহস্য তরল হয়ে আসে।

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়"—বলে গম্ভীর মুখে আমি উঠে পড়ি।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন চৈত্র সংখ্যায় দেখ।]

(১) টিশিয়ান্—মধ্যযুগের ইটালীর বিখ্যাত চিত্রকর ; সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান্ সাহিত্যিক ; হাটন্—ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড়—এ পর্য্যন্ত টেষ্ট ম্যাচে এক ইনিংসএ ইনিই সব চেয়ে বেশী রান্ করেছেন ; জন্ ড্যাল্‌টন্—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—'এটম্' ('পরমাণু')-বাদের জনক, ঈশা খাঁ—বার ভুইঞার অন্যতম বিখ্যাত ভূম্যাধিপতি ; ভোলা ময়রা—বাগবাজারের বিখ্যাত কবিওয়ালা। (২) ইয়েন—জাপানী মুদ্রা বিশেষ ; এস্পার্যাণ্টো—বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ চয়ন করে গঠিত সর্ব্ব জাতির উপযোগী ভাষা বিশেষ ; ফ্যারাও—প্রাচীন মিশরের রাজাদের এই নামে অভিহিত করা হ'ত, মিটার গেজ্—যে রেল লাইনের দু' পাটীর মধ্যে ব্যবধান এক মিটার (৩ ফুট ৩$\frac{3}{8}$ ইঞ্চি), খরোষ্ঠী—প্রাচীন ভারতে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত বর্ণমালা।

(৩) টেকচাঁদ ঠাকুর, কালিদাস, জন্ গল্স্ওয়ার্দি, শেক্সপীয়ার, চার্ল্‌স ডিকেন্স, ভিক্তর হুগো, নুট্ হাম্সুন, আলেক্জান্দার ডুমা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাইডার হ্যাগার্ড্।

(৪) স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

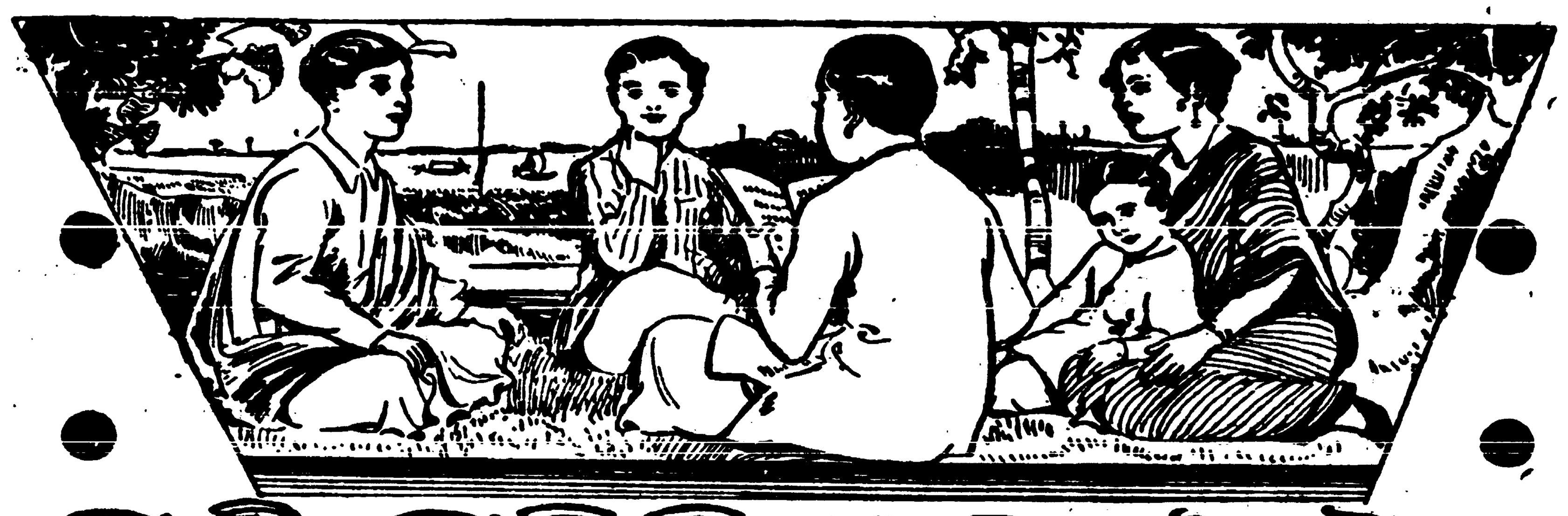

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

হাসি ও অশ্রু

(শ্রীমতী গৌরী দেবী)

শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনে
চৈত্র আজ নিতেছে বিদায়,
তাই বুঝি ধরণীর কোণ
বেদনায় ভরিবারে চায়!
ক্ষণিকের মালা গাঁথা তার
আজিকে হয়েছে সমাপন,
স্নিগ্ধ শান্তি বুলাইতে গায়
চুপি চুপি আসিছে মরণ।

না ফুরাতে বিদায়ের ব্যথা
কার আগমনী ঐ বাজে?
ছন্দে ছন্দে গন্ধে রূপে গানে
ঘুমন্ত প্রকৃতি ঐ সাজে!

হে সুন্দর, ওগো অপরূপ,
দেখা দিলে সুন্দরের হাটে,
মাধবী আঁকিয়া দিল আসি
জয়টীকা তোমার ললাটে।

আনন্দে সবুজে শ্যামলীতে
ভরি' গেল বিশ্বের দুয়ার,
আকাশে বাতাসে শুধু হেরি
নবীনের বিচিত্র সম্ভার।

একটুখানি হাস

(শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

শিক্ষক—বল তো পৃথিবী কি দিয়ে তৈরী?

ছাত্র—আজ্ঞে, কমলালেবুর মত কোয়া আর রস দিয়ে।

শিক্ষক—য়্যাঁ!

ছাত্র—কেন স্যর, আপনিই তো সেদিন বললেন পৃথিবী দেখতে ঠিক কমলালেবুর মত।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ মাসে তোমরা চিঠিপত্র বিভাগের জন্য এত বেশী চিঠি লিখেছ যে আমাদের ছোট্ট কাগজে তাদের জায়গা কুলিয়ে ওঠান সম্ভব হ'ল না। তবে সকলেই প্রায় নানা ভাবে গত মাসের লেখাগুলির প্রশংসা করেছ দেখে আনন্দিত হলাম। সে সব লেখা তোমাদের কারো কারো ভাল লাগে নি সে সবও অকুণ্ঠিতচিত্তে জানিয়েছ দেখে আরও খুসী হলাম। প্রত্যেকটি লেখা তোমাদের প্রিয় করবার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

নববর্ষের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চিঠিও এবার আমরা অনেক পেয়েছি।

গত বারের রামধনুতে তোমাদের একজন পোল্যাণ্ড প্রবাসী শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষালের কথা জানতে চেয়েছিলে। তদুত্তরে হিরণ্ময় বাবুর ভাইবোন টুটু-মিনু আমাদের চিঠিতে জানিয়েছেন যে কিছুদিন আগে তাঁরা তাঁদের একজন সুইস্ বন্ধুর মারফৎ তাঁদের দাদা হিরণ্ময় বাবুর খবর পেয়েছেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পেলেই কলকাতা রওনা হবেন—এবং যত দূর সম্ভব স্থলপথে আসতে চেষ্টা করবেন। তাতেও বেশ একটু দেরী হবে। যা হোক্ তিনি ফিরে এলে রামধনুর বন্ধুরা সম্ভবতঃ তাঁর নিজের মুখেই তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী শুনতে পাবেন।

গত বারের পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ছবি আসছে বারে প্রকাশিত হবে।

—রাঃ সঃ

সম্প্রতি রাঁচীর কাছে রামগড়ে এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরে "গাঁওগ্রে" অর্থাৎ সহর থেকে দূরে গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। এর আগে ত্রিপুরী, হরিপুরা প্রভৃতি জায়গায় কংগ্রেস হয়ে গেছে। রামগড় জায়গাটিও প্রাকৃতিক দৃশ্যে অতি মনোরম। বিহারের অনেক জায়গা খোঁজাখুঁজি করে কর্তৃপক্ষ এ জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন। কাজেই সকলে মনে করেছিল, এদিক্ দিয়ে এবারকার কংগ্রেস খুবই সাফল্য লাভ করবে।

কংগ্রেস নগর সাজান হ'ল। অজস্র অর্থব্যয়ে বড় বড় রাস্তা, বিজলী আলো প্রভৃতি নগরের যা কিছু সুবিধা 'গাঁও'মে বসাবার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে বাদ সাধলেন পর্জ্জন্যদেব। এবারকার অধিবেশনের সময় এমন ভীষণ বৃষ্টি সুরু হ'ল যে, ধরতে গেলে ভাল করে সভা বসতেই পারল না—অবিরল বারিপাতের মধ্যে কোন রকমে 'নমঃ নমঃ' করে সংক্ষেপে কাজ সেরে তল্পিতল্পা গোটাতে হ'ল। এমন কি সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

এবারকার কংগ্রেস-সভাপতি

সাহেব তাঁর অভিভাষণটাও পড়ে উঠতে পারলেন না। নানা জায়গা থেকে যাঁরা এখানে যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁদেরও এবার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয়েছে।

*　　*　　*

এবারকার কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী

দলের নেতারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজিও সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

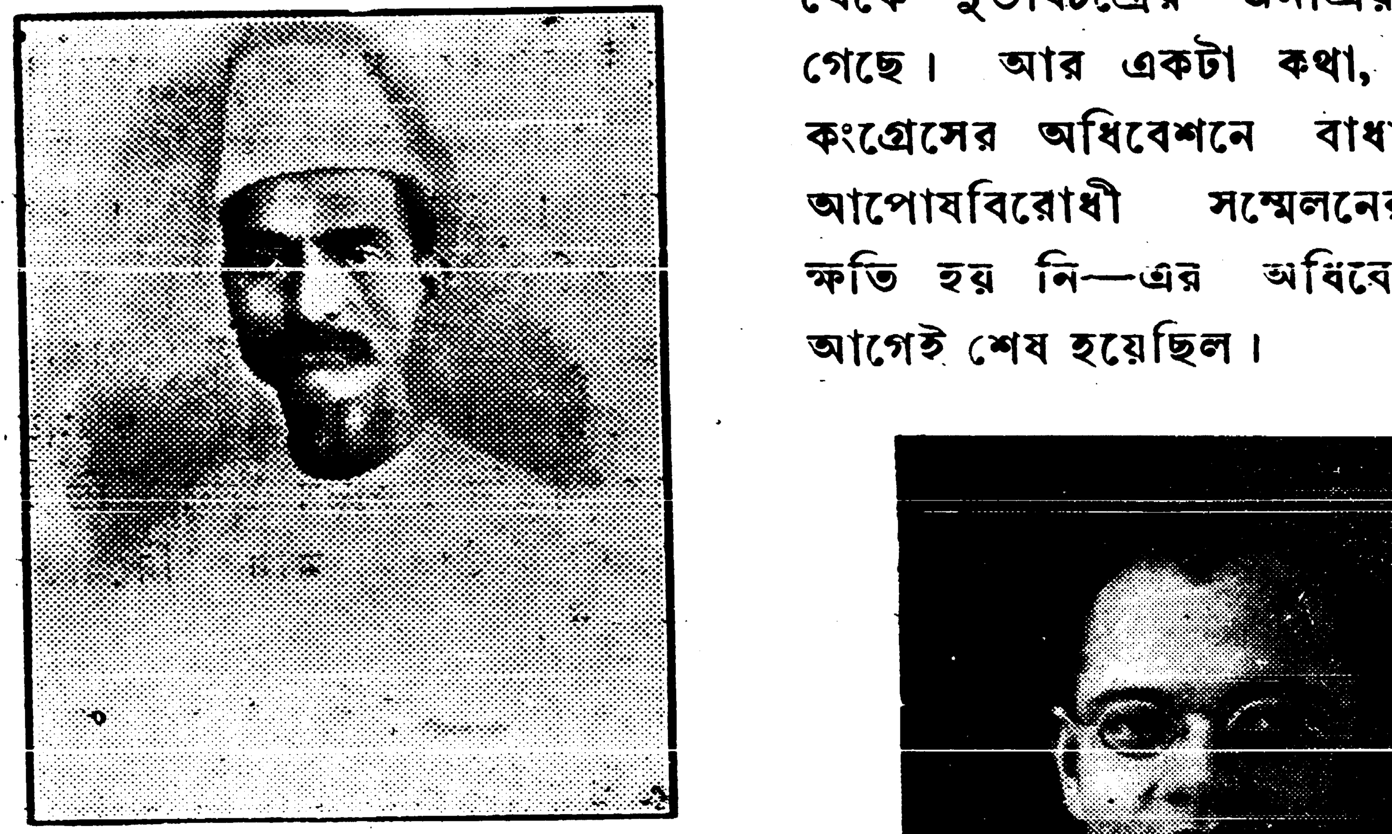

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

*　　*　　*

ঠিক রামগড় কংগ্রেসেরই পাশে এবার আর একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়েছিল; তার নাম আপোষবিরোধী সম্মেলন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী। সহস্র সহস্র কৃষাণ পায়ে হেঁটে এসে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল এবং সভায় যোগদানকারীদের সংখ্যা নাকি কংগ্রেসে যোগদানকারীদের মতই হয়েছিল। সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র যে সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন তাও কংগ্রেস-সভাপতির চেয়ে কোন অংশে কম হয় নি। এর থেকে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বোঝা গেছে। আর একটা কথা, বৃষ্টির জন্য কংগ্রেসের অধিবেশনে বাধা পড়লেও আপোষবিরোধী সম্মেলনের বিশেষ ক্ষতি হয় নি—এর অধিবেশন বৃষ্টির আগেই শেষ হয়েছিল।

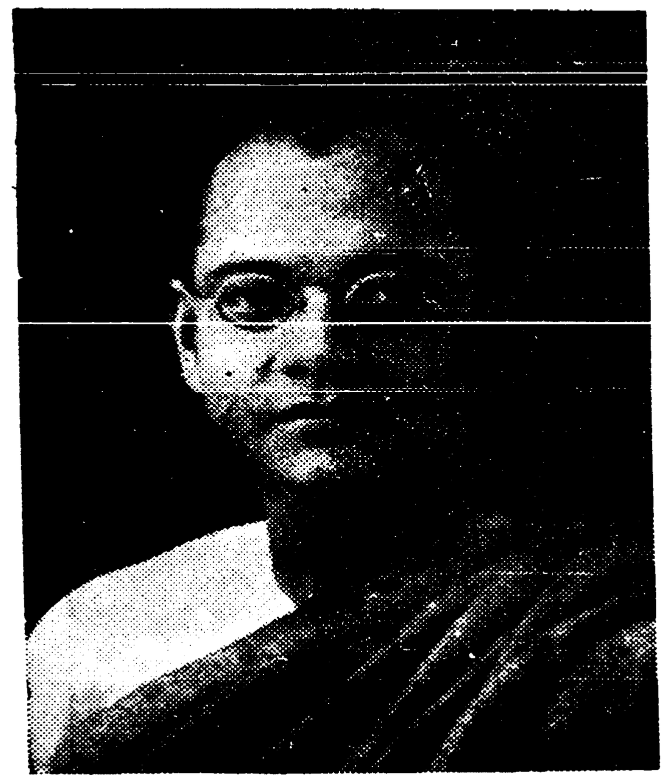

সুভাষচন্দ্র

*　　*　　*

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফিন্ল্যাণ্ডের বিরোধের অবসান হয়েছে, এবং সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে যে রাশিয়ার আক্রমণে ফিন্ল্যাণ্ডের অবস্থা শোচনীয়

হয়ে পড়লেও ফিন্‌রা বীরের মত বাধা দিয়েছিল। এই সন্ধির সর্ত্তে অবশ্য রাশিয়াকে তাদের দেশে অনেকগুলি সুবিধা দিতে হয়েছে।

* * *

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তোমরা সবাই জান, তাঁর লেখা বইও তোমরা অনেকে পড়েছ। বিদ্বান্‌, বাগ্মী এবং দেশ-প্রেমিক কর্ম্মী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। সেদিন হঠাৎ মোটর-দুর্ঘটনায় তাঁকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

* * *

দীনবন্ধু সি. এফ্‌. এণ্ডরুজ সাহেবও আর ইহলোকে নেই। যে ক'জন বিদেশী ভারতে এসে ভারতবর্ষকে নিজের দেশের মত ভালবেসে ভারতবাসীর স্বার্থের জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করে গেছেন এই ইংরেজ মনীষীর নাম তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এণ্ডরুজ সাহেব ভারতে আসেন তার পর এখানেই তাঁর কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। গান্ধীজিই তাঁর নাম দিয়েছিলেন "দীনবন্ধু"।

খাঁ আব্‌দুল গফুর খাঁ ও মহাত্মা গান্ধী

* * *

প্রসিদ্ধ সুইডিশ মহিলা সাহিত্যিক সেল্‌মা লাগারলফ্‌এর মৃত্যু হয়েছে। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে ইনিই প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান—১৯০৯ সনে। এঁর অনেক উপন্যাস পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

* * *

কলকাতায় হকী লীগ্‌ শেষ হয়ে এল। এবারে কে চ্যাম্পিয়ন্‌ হবে তাই নিয়ে এখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। খুব সম্ভবতঃ বি. জি. প্রেসের ভাগ্যেই এবার এ সম্মান লাভ জুটবে।

কল্‌কাতা বৌবাজার সায়ান্স এসোসিয়েশনের অধ্যাপক ডাঃ কৃষ্ণন্‌ সম্প্রতি বিলাতের রয়াল সোসাইটির সভ্য (এফ্‌.আর.এস্‌) হয়েছেন।

ইয়োরোপের যুদ্ধ আবার পুরো দমে আরম্ভ হ'ল। ২৮শে চৈত্রের খবর—জার্ম্মেনী হঠাৎ ডেনমার্ক্‌ এবং নরওয়ের রাজধানী দখল করে বসেছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) তান, থান, দান, ধান। (২) বান, ভান, মান। (৩) চল, ছল, জল, ঝল। (৪) চাল, ছাল, জাল, ঝাল।

উত্তরদাতাদের নাম

প্রসূন, বাণী, শঙ্কর, ঘটন (রংপুর); হরিহর, শান্তি, চাঁদু, গৌরী, পুষ্প মজুমদার (বালিগঞ্জ); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, কাজল, পুতুল, মিন্টু, মুক্তি (কালীঘাট); অনিল, নিখিল, নিরু, প্রভা, বিভা, মায়া (জলপাইগুড়ি); অমিয়কুমার মিত্র (বরাহবাজার); কল্লোল, কলাপী (শিলং); শান্তনু, শুভেন্দু, শান্তি (শ্রীরামপুর); রত্না দেবী ও জয়ন্ত রায় (পাটনা); ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (দিনাজপুর); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); সুধীর, সুপ্রিয়া, মঞ্জুশ্রী বসু (ছাপরা); জগৎরঞ্জন ও পিপিদি (মুড়াগাছা); বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); অজিতকুমার সান্যাল ও কল্যাণী দেবী (পাবনা); গীতারাণী মুখার্জ্জি (বেনিয়াড়ি); শোভনা দেবী (মধুবনী); অশোক, বিজন, বিকাশ, যতীশচন্দ্র শ্যাম (কাষ্টঘর); তপনেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (ময়মনসিংহ); চণ্ডী, জবা, কুন্দ (দানাপুর); মায়া, বাণী, গীতা, কাজল, রণু (ফয়জাবাদ); অঞ্জলি, বিজু, চন্দা, আশীষ, শ্যামল, উমা বাচ্চু, শেফালী, মনোজ (কলিকাতা); সতীশ, কফিল উদ্দীন, রশীদ, মঞ্জুল, প্রবীর, আতাউর (লাখপুর—শিমুলিয়া); অনিমা রায়, দাদা, ভারতী (পাবনা); বিভু, দুলু, নন্দ, পিলু, খুকী, দিদি মাষ্টার মশাই (পাটনা); সন্তু, বুলু, সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার, মাষ্টার মশাই (চাঁপাই নবাবগঞ্জ); কুট্টু, বাচ্চু (ধুবড়ী); রিণা রায় (টালিগঞ্জ); ডলি, বেলু, লিলি, বুড়ু, অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরৈল); মাষ্টার মহাশয়, সলিল, রামবাবু, সমীন, দীপেন্দ্রনাথ দত্ত, কমল, অমল; মায়া দেব (কলিকাতা); দুলাল ঘোষ

(কুমুণ্ডা) ; ডলি বসু (কলিকাতা) ; দাদা, দিদি, ছোড়দা, ছোড়দি, মাষ্টার মশাই, কুশলকুমার বাগচী (বালিগঞ্জ) ; মালবিকা, বাসন্তিকা, বিশ্ব, শ্যামু, মাম্মা, বীরু, ছবি, লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি (পাটনা) ; বেলা, ধোর্দ্দণ্ডকুমার, ডিনামাইট, দশাবতার, অণ্ডক্রয়েন (চাইবাসা) ; বিচ্চু ও খুকু (কলিকাতা) ; কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল) ; বেলা, সতী, প্রবীর, প্রশান্ত, সিপ্রা, দেবাশীষ, প্রীতি (পাতিহাল) ; বাসু, ভোম্বল, কানু, শম্ভু, কালী, গৌর, শ্রীমন্ত (শালিখা) ; অমূল্যধন দাশ শর্ম্মা (ভবানীপুর) ; কণা চাটার্জ্জি (পেগু) ; পাঁচু, পঞ্চমী, রাখু (বারাসত) ; প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগচী (বালুভরা) ; অণিমা, প্রীতিমাসী, মিনতি, দীপালি, অনিলা (শিলং) ; অজয়কুমার দত্ত ও অরুণা (পাটনা) ; শুভাশীষ সরকার (সরিষা) ; সুধাংশু-রঞ্জন প্রামাণিক (কলিকাতা) ; কালিদাস পাল (বালুভরা) ; প্রয়াগ সেবাশ্রম বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ (এলাহাবাদ) ; সুমিতা রায় চৌধুরী (কলিকাতা) ; রাধু, উমা, বুদ্ধু (বরিশাল), সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা) ; রমলা নন্দী (শিলং) ; ছাত্রসংঘ (ভাদুড়া এম্. ই. স্কুল) ; জগন্নাথ বিশ্বাস (আলিপুর দুয়ার) ; রামপ্রসাদ কুশারী ও ছোড়দি (কুমিল্লা) ; শক্তি, শাশাঙ্ক, বিমল, অবনীকান্ত বসু (বনগ্রাম) ; মানবেন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) ; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) ; বেলা, বুলু, ভোলা ও রামজীবন ভট্টাচার্য্য (ভাটপাড়া) ; আশাক, অমিয়, প্রভাত, (ভবানীপুর) ; কুমারী নমিতা ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ; দিলীপ ব্যানার্জ্জি ও দাশুমামা (জলপাইগুড়ী) ; ভোম্বল, কালিদাস, মণি, বণ্টু, পরেশ (বজ্রযোগিনী) ; ছত্রপতি সরকার (গোলাঘাট)। কয়েকখানি চিঠির মধ্যে নাম বা গ্রাঃ নং পাওয়া যায় নাই। (এবার হইতে কেবল মাত্র যিনি গ্রাহক বা গ্রাহিকা শুধু তাঁদেরই নাম প্রকাশিত হইবে।)

নূতন ধাঁধা

নীচের খালি জায়গাগুলি এ ভাবে পূর্ণ করতে হবে যে প্রথমটিতে যে শব্দ বসবে পরেরটিতে সেই শব্দটিই উল্টে বসবে। যেমন প্রথমটা যদি হয় 'দাস', পরেরটা হবে 'সদা'।

—র ওখানে সুখের — নেই। খুব —, আম — দই ক্ষীর লেগেই আছে। সবাই ভাল—, — করে। আরামে —, — বলার লোকে— অভাব নেই, — পাশেই বাগান। সেখানে —, খেলা, পড়া — চলবে।

(সম্পূর্ণ উত্তর পাঠাতে হবে।)

স্বর্গের দূত

[শিল্পী স্যর যোশুয়া রেনল্ডসের আঁকা পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি]

C. H. ARAN & CO. CAL.

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ { ৫ম সংখ্যা

রামধনু

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

সাত সাগরের তলে
যে সাত মাণিক জ্বলে
তাহারি কিরণে তৈরী কি তব
সাত-রঙা ওই তনু ?
আঁখি-প্রিয় রামধনু !

জল-ভরা মেঘে রবি
আঁকে শুনি তব ছবি,
ভাবের তুলিতে মোরা সেই রূপ

এঁকে প্রাণে, খুসী হনু ;
হিয়া-হরা রামধনু !

কিসে বা কেমনে সে কে
কি উপকরণে মেখে
গড়িল তোমারে, চাহি না জানিতে
শুধু জানি, প্রতি অণু
চারু তব, রামধনু !

আলো চাল আর সিদ্ধ চাল

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি)

আমাদের বংশে আগে আলো চাল খাওয়ার প্রথা ছিল। প্রথাটার বোধ হয় চল হইয়াছিল ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কারণ হইতে। তবে এখন উহা অনেকটা আভিজাত্যের লক্ষণে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা নিতান্ত অব্রাহ্মণের মত খাওয়া-দাওয়ার ভক্ত তাঁহাদেরও অনেককে বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা কিন্তু আলো চাল খাই।"

আমার বাবা প্রথম সিদ্ধ চাল খাওয়া আরম্ভ করেন। তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় একটু লজ্জিতভাবেই তিনি নিজের কুলাচার-বিচ্যুতির এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন (সে অবশ্য বহুকাল আগের কথা) : তিনি বলিয়াছিলেন, "আলো চালটা যে খুব ভাল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোকেও জানে আলো চাল খুব উগ্র পদার্থ। উহাকে সহ্য করিতে হইলে বেশ একটু দুধ, ঘি খাওয়ার প্রয়োজন। 'আমাকে কাজকর্ম্মের খাতিরে একবার এমন একটা জায়গায় কিছুকাল বাস করিতে হইয়াছিল যেখানে বর্ষার দুই তিন মাস ধরিয়া খেসারীর ডাল ছাড়া অন্য খাবার খুব কমই জুটিত। ঐরূপ খাবার খাইয়া আমার

একবার গুরুতর আমাশা হয়; তাহা আর সারিতে চাহে না। তখন একজন কবিরাজ বলিয়াছিলেন, আপনার আলো চাল খাওয়া এখানে সহ্য হইবে না, সিদ্ধ চাল ব্যবহার করুন। সেই অবধি আমি সিদ্ধ চাল ব্যবহার করিতেছি।"

আলো চাল উগ্রপদার্থ, উহার সঙ্গে দুধ-ঘি খাওয়া আবশ্যক এ কথা এখনও শুনিয়াছি। শ্রদ্ধার আতিশয্য থাকিলে যেটা দোষ সেটাকে গুণ বলিয়া মনে হয়। আলো চাল সিদ্ধ চালের অপেক্ষা কম পুষ্টিকর পদার্থ। উহার সেই পুষ্টি-হীনতার অভাব মিটাইতে হয় উহার সহিত দুধ, ঘি, তরকারী প্রভৃতি পুষ্টিকর পদার্থ মিশাইয়া।

ফাঙ্ক নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন—চালের উপরের আবরণে এমন একটা জিনিষ থাকে যাহা বেরিবেরি রোগের ঔষধ। তিনি চালের অনেকটা কুঁড়া সংগ্রহ করিয়া য়্যালকোহল্ দিয়া তাহা হইতে এক পদার্থ আকর্ষণ (Extract) করিয়া বাহির করেন। একটি বেরিবেরি-গ্রস্ত মোরগকে ঐ পদার্থ খাওয়াইয়া বা তাহার শরীরে জিনিষটি ঢুকাইয়া দিয়া দেখা গেল উহাতে মোরগটার অসুখ খুব তাড়াতাড়ি সারিয়া গেল।

বহু কাল হইল রেঙ্গুন জেলের ডাক্তারগণ লক্ষ্য করিলেন, জেলের বর্ম্মিজ বন্দীগণের বেরিবেরি হইয়াছে কিন্তু সেই জেলেই তামিলদেশীয় বন্দীদের উক্ত পীড়া হয় নাই। দেখা গেল বর্ম্মিজরা আলো চাল খায় আর তামিলরা খায় সিদ্ধ চাল। সিদ্ধ চাল প্রবর্ত্তন করার ফলে বর্ম্মিজদের পীড়া ভাল হইয়া গেল।

ফাঙ্ক যে জিনিষটা চালের কুঁড়া হইতে পাইয়াছিলেন তাহার নাম ভিটামিন 'বি'। ঐ ভিটামিন চাল, গম প্রভৃতির বাহিরের আবরণে থাকে। কাঁড়িয়া চাল বা গম পরিষ্কার করিলে উহা কুঁড়ার সহিত বাহির হইয়া যায়। খুব সাদা ধবধবে চাল ও ময়দায় ঐ ভিটামিন-মাত্রা কম, এ জন্য আজকাল ঢেঁকীছাঁটা লাল চাল এবং সমস্ত গমের (Whole wheat) লাল আটা যাহাতে লোকে বেশী মাত্রায় ব্যবহার করে তাহার আন্দোলন সকল দেশেই হইতেছে।

তবে সিদ্ধ চালের সম্বন্ধে একটা নূতন কথা সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ভিটামিন 'বি' জলে দ্রবীভূত হয়। এজন্য উহার আর একটা নাম "Water

soluble vitamin"—অর্থাৎ "জলে দ্রবণীয় ভিটামিন"। ধান হইতে চাল তৈয়ারী করিবার সময় উহা জলে ভিজাইয়া সিদ্ধ করা হয়। পরে সেই ধানের খোসা ফাটিয়া গেলে মেঝেতে ঢালিয়া শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া চাল তৈয়ারী করা হয়। চালের বাহিরের আবরণে অবস্থিত ভিটামিন জলে দ্রবীভূত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত চালের মধ্যে প্রবেশ করে। সিদ্ধ চাল প্রস্তুত করিতে হইলে ধানে যে জল দেওয়া হয় তাহা প্রায় সমস্তটাই চালের গায়ে শুকাইয়া যায়, এজন্য বেশী ভিটামিন নষ্ট হয় না। এই সকল কারণে কাঁড়া সাদা সিদ্ধ চাল একেবারে ভিটামিন-শূন্য নহে। অবশ্য লাল সিদ্ধ চালের ভিটামিন-মাত্রা আরও বেশী। লাল আলো চালেও ভিটামিন থাকে কিন্তু ধবধবে সাদা আলো চালে ভিটামিন অতি অল্পই থাকে। যাহাদের বেশী পয়সা আছে তাঁহাদের সাদা আলো চাল ব্যবহার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুধ, ঘি, আনাজ ও ডাল ব্যবহার করিয়া আলো চালের পুষ্টির অভাব নিরাকরণ করিতে হইবে।

সাধারণের পক্ষে সিদ্ধ চাল ব্যবহার করাই বেশী পুষ্টিকারক ও নিরাপদ। উহাতে দুধ, ঘি, আনাজ, ডালের মাত্রা কিছু কম হইলেও ক্ষতি হইবে না।

মহাযুদ্ধের আর এক দিক্

(শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী)

ঝলমলে দিনের আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আটলান্টিকের বুকের উপর। নীল—গাঢ় নীল জল বহু দূরের ঝাপসা রেখায় মিশে গেছে হাল্কা নীল আকাশের সাথে। দূরের ওই কালো বিন্দু আরও এগিয়ে এলে দেখা যাবে একটি ছোট্ট জাহাজ ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে আসছে। জাহাজের দু'দিকে চকচকে ছোট্ট দু'টি কামান, এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে ভীরু মেয়েটির মত জাহাজটা জল কেটে এগিয়ে আসছে; অতি সন্তর্পণে—একটু যেন ভয়ে ভয়েই।

কিন্তু এমন গরম বাজারে আটলান্টিকের বুকে কামানওয়ালা জাহাজ কেন? যুদ্ধের ব্যাপারে নিশ্চয়ই তবে? উঁহু, যুদ্ধের জাহাজ হতে যাবে কোন দুঃখে! জাহাজে আছে শুধু কোশ্চেন পেপার, ইউনিভার্সিটির জন্য। ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এর কোশ্চেন পেপার ছেপে চলেছে। বস্তাবন্দী হয়ে আছে সংস্কৃত আর কেমিষ্ট্রি, বাংলা আর ফিজিক্স, লজিক আর ভূগোল; পরম সদ্‌ভাবে ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছে সব।

হঠাৎ আকাশের উপর বোঁ বোঁ একটা শব্দ শোনা গেল—তার পরেই দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উড়ে এল জাহাজের মাথার উপর, আর তারা বোমা ফেলতে লাগল মুহুর্মুহুঃ।

দাউ দাউ করে জাহাজে আগুন ধরে গেল—পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে ডুবে গেল ছোট্ট সুন্দর জাহাজটি। পোড়া আর আধ-পোড়া কোশ্চেন পেপার কোথায় গেল ভেসে কে জানে!

আগুনের মত এ খবর যথাস্থানে এসে পৌঁছাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। উপায় কি হবে এখন? নতুন প্রশ্ন তৈরী করে ছাপার সময় কই আর! চার তলার বন্ধ ঘরে বসল তাঁদের জরুরী মিটিং। ভাইস্‌চ্যান্সেলার মশাই ঘোষণা করে দিলেন তার পরে কাগজে কাগজে: পরীক্ষা হবে না এবার—কোন পরীক্ষাই না। যারা 'ফিস' দিয়েছে তারা সবাই ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করে গেল এবার।...এক অভ্রভেদী আনন্দ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রমহলে এর পরে।

সতেরোর থিয়োরেমের 'একষ্ট্রা' করতে গিয়ে পেন্সিলটা চিবিয়ে যখন প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ করে এনেছে তখন কানুর মাথায় এ সব কল্পনাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। তা যদি হয়? লক্ষ লক্ষ ছেলের নিষ্কলুষ আশীর্ব্বাদ কি সেই অজানা বোমারুর মাথায় গিয়ে পড়বে না? কিন্তু সত্যি সত্যি তা কি হতে যাচ্ছে নাকি,—অন্ততঃ কানুর ভাগ্যে কোন দিন তা হবে নাকি?

এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছে কানু পাড়ার ইস্কুল থেকে। ছেলে যে খারাপ মরে গেলেও কানু সে কথা স্বীকার করবে না। তবে ফাঁক তালে যদি হয়ে যায় তবে মন্দ কি? বারান্দার ওধার থেকে কার চটির শব্দ শোনা যেতেই কানু আবার জিওমেট্রির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ঘরে ঢুকলেন মণি, মানে কানুর ছোড়দা—এ বছরেই যিনি ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হয়েছেন। প্রতি পদক্ষেপেই কলেজীয় ভাব ফুটিয়ে তুলে মণি এগিয়ে এল কানুর কাছে। ডানদিকে ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ করে অল্প মোটা গলায় বল্‌লে: 'কানু', তার পর ঘাড়টা বাঁদিকে ঘুরিয়ে মিহি সুরে বল্‌লে, 'সকাল থেকে কতটুকু পড়েছিস?'

কানু একটু রসিকতার সুরে বল্‌লে, 'আর পড়াশোনা! কোশ্চেনের জাহাজই যদি ডুবে গেল মাঝ রাস্তায়—'

'তার মানে?' মণি একটু অবাক্ হয়ে বল্‌লে, 'তার মানে? কোশ্চেনের মাঝ পথ কি? ও আবার আসবে কোথা থেকে?'

কানু ছোড়দা'র অজ্ঞতায় একটু মুচকি হাসি সামলাতে পারল না কিছুতেই—'কেন, আমাদের কোশ্চেন ত' বিলাতে ছাপা হয়—সেখান থেকেই ত' আসবে?'

'কে—কে তোকে এ সব বাজে কথা বলেছে?'

কানু বল্‌লে, 'বাঃ, এ ত' সবাই জানে। বহুদিন আগেই—ছোটবেলা থেকেই আমি জানি এ সব—।' খবরটা শুনেছে কানু কালই বিকালে দেবুর কাছে—দেবু কানুর জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু।

—'ফের বাঁদরামী হচ্ছে কানু? ফাজিল হয়ে গেছিস অতিরিক্ত—'

—'কানুর কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই—' ঘরে ঢুক্‌ল মিনু, কানুর সাক্ষাৎ ছোড়দি, সেও এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছে পাড়ার মেয়ে-স্কুল থেকে। 'ফাজলামির কথা হলেই বুঝতে হবে কানুর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু—'

'তুই থাম্', কানু কি ওকেও ভয় করে চলবে নাকি? 'বেশী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ না, পালা এখান থেকে—'

'কি? কি বল্‌লি?' মিনুর পিক্টোগ্রাফ হাত থেকে পড়ে গেল, 'লজ্জা করে না তোর ম্যাড়া কোথাকার—টেষ্টে অঙ্কে লাড্ডু মেরেছিস?'

'আর তুই—তুই?' কানু প্রতিহিংসাপরায়ণ। 'হাইজীনে ফেল করিস আবার মুখ দেখাস্—পালা শীগ্‌গির এখান থেকে—'

'ওমা, কি মিথ্যুক! আমি আবার হাইজীনে ফেল করলুম কবে? আমিই বলে হাইজীনে ফার্ষ্ট হয়ে আসছি বরাবর! সেদিনই ত' রেখার বার্থ-ডে পার্টিতে মিস্ সানিয়াল বল্‌লেন, মিনু তুমি—'

'তুই আবার বার্থ-ডে পার্টিতে গেলি কবে?' মাঝখান থেকে বলে উঠ্‌ল মণি। 'বাঃ এই ত' গেল শনিবারের আগের শনিবার! সেই যে লাল পাৎলা 'টিস্যু' সাড়ীটা পরে—সেই যে বাবা যেটা কিনে দিয়েছিলেন নিউমার্কেট থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা পরে মিণ্টুর দাদার বিয়েতে গেছিলুম। রেখা কিন্তু বার বার বলছিল সেদিন আমায়, তোকে যা মানিয়েছে ভাই এ সাড়ীটা পরে সত্যি! সত্যি ভাই, সুন্দর দেখাচ্ছে আজ তোকে। আর আমাদের সেই চালিয়াৎ নীহার পরে এসেছিল এক জমকালো লাল সাড়ী, তাতে আবার জড়ির বুটি—ছি ছি ছি, কি টেষ্ট্ যে ওর মাগোঃ—' মিনু সত্যি সত্যি মুখ বিকৃত করে ফেল্‌ল।

কানু ধমক দিয়ে বল্‌লে, 'ফের বাজে গল্প! যেতে বলছি না তোকে এখান থেকে—'

'তবে বলছিলি কেন হাইজীনএ ফেল করেছি, বাঁদর কোথাকার!'

মণি বল্‌লে, 'সারা সকাল ঝগড়া করবি নাকি তোরা? এই কানু, শীগ্‌গির পড়তে বস। সায়েন্স আছে না তোর? কত দূর পড়েছিস? বল্ ত' হাইড্রোজেন কি করে তৈরী করে? নাইট্রোজেন?' কানু চুপ করে রইল এবার।

মণি মুরুব্বী চালে বল্‌লে, 'ইংরাজীতে ত' তোরা আবার পড়িস না বুঝি! জ্বালাতন! ইউনিভার্সিটির কাণ্ডমাণ্ড! কাগজে দস্তুরমত লেখালিখি হওয়া উচিত এই নিয়ে—' [মাস খানেক আগে আনন্দবাজারের চিঠিপত্র বিভাগে মণির একটা চিঠি বেরিয়েছিল বলে শোনা যায়।] চটি ফট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যেন মণি চলে গেল, আর ঠিক সেই সময় চাকর এসে জানাল কানু বাবুর মাষ্টার মশায় এসেছেন, কাজেই মিনুও আস্তে আস্তে চল্‌ল দাদার পেছন পেছন।

মাষ্টার মশায় এসে বস্‌লেন চেয়ারে। 'একষ্ট্রা তুটো হয়েছে কানু?'

কানু কিন্তু ওধার দিয়েও গেল না। একটু যেন আব্দারের সুরেই বল্‌লে, 'আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আমাদের কোশ্চেনের জাহাজটা পথে ডুবে যেতে পারে না?'

'না পারে না।' বল্‌লেন মাষ্টার মশাই, 'কেন, ডুববে কেন? আর কোশ্চেন যে অন্যখানে ছাপা হয় কে তোমাকে বলেছে কানে কানে?'

'বাঃ, দেবু যে বল্‌লে কোশ্চেন এখানে ছাপা হয় না—বিলাতে হয়। তবে পথে ত' জাহাজ ডুবে যেতেও পারে।'

'বলছি পারে না, তবু তর্ক!' মাষ্টার মশায় গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন, 'কই, একষ্ট্রা কই?'

'পারি নি কর্‌তে'—কানু বিড়বিড় করে বল্‌লে।

'পার নি কর্‌তে? ট্রান্‌স্লেশন? তাও হয় নি?' মাষ্টার মশাই দস্তুরমত চীৎকার করে উঠলেন।

'এসেটা লিখেছ? কাল যেটা দিয়ে গেছিলুম?'

কানু পুনশ্চ ঘাড় নাড়ল।

'য়্যাঁ, তাও হয় নি!' নরহরি বাবু আর রাগ সামলাতে পার্‌লেন না, ঝাঁপিয়ে পড়ে আচ্ছা করে কানুর কান তুটো মলে দিলেন। 'এসেটাও কর নি তুমি, পাজী ছেলে!'

কানমলা খেয়ে রাগে কানুর কানের ডগা জ্বালা করে উঠ্‌ল। কট্‌মট্ করে মাষ্টার মশাইএর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ পাগলের মত বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে ঝড়ের মত ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। এত বড় ছেলেকে কানমলা দিয়ে মাষ্টার মশাইএরও একটু অনুতাপ হ'ল—গলাটাকে একটু নরম করার চেষ্টা করে ডাকলেন, 'এই কানু, শোন এদিকে—এই কানু!'

ততক্ষণে কানু একেবারে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়েছে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানুর নিজের জীবনের উপর কেমন একটা ঘেন্না এসে গেল হঠাৎ। পরীক্ষার আর বাকী কই? তার উপর আবার আজকের ব্যাপার। বাবার কানে গেলে খুব যে আদর করবেন না এ কথাটাও মনের আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল থেকে থেকে। বড় বড় লোক ঠিক এমনি সময় পড়লে কি করতেন? কানু একবার চোখ বুজে ভেবে নিল। তার পর বিদ্যুতের মত একটা অদ্ভুত 'আইডিয়া' তার মাথায় যেন ঝিলিক মেরে গেল। বাড়ী থেকে পালিয়ে যুদ্ধে গেলে কেমন হয়—যে যুদ্ধের জন্য এত কেলেঙ্কারী! অনেককেই ত' নিচ্ছে—কাগজে বেরিয়েছে সেদিন। 'মাস্‌ল্' দুটো টিপে নিল একবার কানু, এ রকম চেহারা পেলে লুফে নেবে যে কোন দল। ঠিক! মনে মনে ভবিষ্যৎ প্ল্যানের একটা খসড়া করে নিল সে। যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা অনেকেই এ রকম ভাবে মাথা উঁচু করেছেন। আর লাইব্রেরী থেকে আনা সে বইটাতেও কানু পড়েছে কাঞ্চন না কি নামের ছেলেটির গৃহত্যাগের মূল কারণ এই রকম উর্দ্ধতন পুরুষের জিঘাংসা-বৃত্তি। তার পর কাঞ্চন কি বেঘোরে মারা গিয়েছিল নাকি? কানু রাস্তা দিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে সুরু কর্‌ল।

ডালহৌসী স্কোয়ারে কানু যেখানে থাম্‌ল সেটাই বিখ্যাত "বাংলার মুগুর' এর অফিসের সামনেটা—সেখানেই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল কিনা। সেখান থেকে কানু শুনল তাকে নাকি যেতে হবে বড় আপিসে—যেখানে ছেলে বাছাই করা হবে দেখেশুনে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের উপর দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দূরে হাঁপাতে হাঁপাতে কানু পৌঁছল সেখানে; খটমটে ইংরাজীতে কি একটা লেখা আছে অফিসের গায়ে; কানু নম্বরটা একবার মিলিয়ে নিল, তার পর রুমালে মুখ মুছে অত্যন্ত 'স্মার্ট' হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌ল।

সিঁড়ির মুখেই গোবেচারা গোছের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কানু একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, 'দেখুন, কাগজে দেখলাম যুদ্ধে পাঠাবার জন্য কয়েকজন বলিষ্ঠ, সাহসী এবং কর্ম্মঠ লোককে আপনাদের দরকার। এ সম্বন্ধে আমি—'

ভদ্রলোকটি বাধা দিয়ে বল্‌লেন—'ওঃ বুঝেছি। 'আপনাকে তা হ'লে রামগতি বাবুর কাছে যেতে হবে। আপনি এই বারান্দা দিয়ে সোজা চলে যান। গিয়ে ডান দিকের ঘরটা পার হয়ে সামনের বারান্দাটা ঘুরে সরু একটা পথ পাবেন। সেটা দিয়ে একটু গেলেই একটা চত্বরের মতন দেখবেন। তারই বাঁদিকে আছে লাল একটা চওড়া বারান্দা, তার গায়েই মস্ত বড় একটা ঘর রয়েছে। সেখানে অনেক লোক কাজ কর্‌ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করলেই তারা রামগতি বাবুর ঘরটা দেখিয়ে দিতে পারবে বোধ হয়।' ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে নেমে গেলেন। কানু হতাশ হয়ে খুঁজতে আরম্ভ করল।

পাকা আধ ঘণ্টা পরে কানু সেই বিখ্যাত ঘরের সামনে এসে পৌঁছল।

বহু লোক মাথা নীচু ক'রে কাজ করে যাচ্ছে, কেউ কেউ কাজের ভান করছে, অন্ততঃ ভান করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই। জনৈক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে কানু বল্‌লে, 'দেখুন, রামগতি বাবুর ঘরটা কোন্ দিকে জানেন কি?'

ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত বল্‌লেন, 'তা আর জানি না—আজ তিরিশ বছর এখানে কাজ কর্‌ছি? কিন্তু কেন বল দেখি হে? আমাদের ডিঙ্গিয়ে একেবারে রামগতি বাবুর কাছে তোমার কি দরকার?' কানু বুক ফুলিয়ে বল্‌লে সে যুদ্ধে যেতে চায়। ওর কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো হঠাৎ বাজখাঁই গলায় হেসে উঠলেন, 'তুমি যুদ্ধে যাবে নাকি? হোঃ হোঃ, শুনেছ হে প্রাণকেষ্ট, শুনলে হে রাধাগোবিন্দ, শুনলে, ইনি নাকি যুদ্ধে যাবেন, হিঃ হিঃ হিঃ!'

প্রাণকেষ্ট আর রাধাগোবিন্দ শেয়ালের মত হেসে উঠ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে।

রাগে কানু ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল শক্ত করে। তার পর একটু পরে, ওদের হাসির বেগ কমলে, বল্‌ল, 'রামবাবুর ঘরটা দেখিয়ে দেবেন না তা হ'লে আমাকে আপনারা—আচ্ছা বেশ, আমিই খুঁজে নিচ্ছি।' রাগে গরগর করতে করতে কানু চলে গেল। রামগতি বাবুর পাত্তা অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই মিল্‌ল। সব শুনে তিনি বল্‌লেন, 'যুদ্ধে যেতে চান? আচ্ছা, তা হ'লে একটা দরখাস্ত করুন ওইখানে বসে বসে। হ্যাঁ, একটা দরখাস্ত করতে হবে—ইংরেজীতেই। বাড়ী থেকে পালিয়ে আসছেন বুঝি? না? তবে? ও, সংসারে আপনার কেউ নেই—বাপের বন্ধুর কাছে মানুষ; তাই ভাল লাগছে না এখানে থাকতে? সব কথা স্পষ্ট করে লিখে দিন! হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের মত ইয়ং ম্যানেরাই ত' যাবেন।' অনেক ধস্তাধস্তির পর কানু যখন চিঠিটা শেষ করে উঠ্‌ল তখন ঘামে তার জামাটা দস্তুরমত ভিজে গেছে।

রামবাবু বললেন, 'লিখেছেন? বেশ, এখন ওই ঘরে গিয়ে মিঃ চাকলাদারকে দিয়ে আসুন, উনিই আপনাকে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবার।'

'এই চাপরাশী, চাকলাদার সাহেবকো এ চিঠি দে আও'—কানুর যেন এখন থেকেই একটু মিলিটারী স্বর। মিঃ চাকলাদারের চাপরাশী ঘরে ঢুকে গেল। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীমান্ কানুর ডাক পড়ল ঘরে।

ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে ভারী পর্দ্দাটা সরিয়ে কানু ঢুকে পড়্‌ল। বিশ্রী চেহারার ফাইলের আড়ালে মিঃ চাকলাদার মাথা নীচু করে কানুর দরখাস্তখানাই পড়ছেন বোধ হয়। কানু অত্যন্ত বিনীত হয়ে একটা নমস্কার করে দাঁড়াল। ভদ্রলোক স্রেফ লক্ষ্যই করলেন না। ছি ছি ছি, একটা নমস্কার এমন মাঠে মারা গেল—কানুর আফশোস্ হতে লাগ্‌ল রীতিমত।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কানুর কেমন যেন ভয় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। দূর ছাই, দরকার নেই যুদ্ধে গিয়ে—এখনও ফেরার সময় আছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মিঃ চাকলাদার

মুখ তুললেন ফাইলের আড়াল থেকে। কানু স্পষ্ট তাঁর মুখ দেখতে পেল এবার। ঘরে যদি সেই মুহূর্ত্তে একটা বাজ পড়ত সশব্দে, তবে কানু হয়ত এতটা আশ্চর্য্য হত না, কিংবা কানু যদি দেখতে পেত তার বহু দিনের স্বর্গগত দাদামশাই তার দিকে প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছেন তা হলেও কানু বোধ হয় এতটা ভয় পেত না! কানু দেখল তার সামনে বসে আছেন তার মামা—মিঃ চাকলাদার সেজে বসে আছেন কতিপয় মামার সেজ জন। একটা ঠাণ্ডা বরফ-গলা জল কানুর শিরদাঁড়া পাকিয়ে পাকিয়ে নীচে নেমে গেল।

ভেসে এল মামার কথা, 'হুম্, ঠিক বুঝেছি ধুরন্ধরটি কে—এমন নামের বাহার আর কার হবে? তা ছাড়া এমন কদাকার হাতের লেখা—বিশ্রী ইংরেজী! পড়াশুনার পাট উঠিয়ে দিয়েছ দেখছি, হুঁ!' কানু হাসবার চেষ্টা করল একটু বিনা কারণেই।

কি বিপদ্! তার মামারাও যে চাকলাদার এ কে মনে রাখতে গিয়েছিল!

একটু সেফ্ সাইডে থাকলেই হ'ত। ছি ছি; আর মামা মিলিটারী আপিসে কি একটা চাকরী করেন সে শুনেছিল কিন্তু এমন বিশ্রী চাকরী যে করেন তাই বা কে জান্‌ত? আর মামা তো ছিলেন পুনা না বোম্বাইএ। কলকাতায় বদলী হবার কথা শুনেছিল বটে কানু, কিন্তু কবে এলেন!

হাত বাড়িয়ে মামা ফোন্ তুললেন—হ্যাঁ, বাবার অফিসেই, কানু স্পষ্ট শুন্‌ল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে।

বাঙ্গালী বীর বসন্তকুমার

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম.এ, বি.এল্)

আজ একজন শক্তিকুশলীর কথা তোমাদের বল্‌ব। আমি তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর শক্তি-প্রতিভার সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি সেটুকুই বল্‌ব—তোমাদের তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য। তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটি তোমাদের কাছে বোধ হয় অপরিচিত নয়, রামধনুতেই একাধিকবার তাঁর কথা তোমরা পড়েছ।

তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ করবার সুযোগ পাই শিমুলতলায়। সেটা ইংরাজী ১৯৩২ সাল হবে। খুব বিপদের মাঝে অসহায় অবস্থায় যখন পড়েছিলুম তিনিই

বন্ধুরূপে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একদিন বিকেলে আমি ও আমার স্ত্রী দু'জনে বেড়াতে বেরিয়েছি। বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা পথ চলে গেছি ঝাঁঝাঁর দিকে। পথে সন্ধ্যা হওয়ায় আমরা বাড়ীর দিকে ফিরতে আরম্ভ করলুম। হাতে আমার ছিল একগাছি বাঁশের লাঠি ও একটী টর্চ্চ। এই দুটোই ছিল আমার পথের সম্বল। এক জায়গায় যেখানে রুক্ষ পাহাড় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে এসে মনে কেমন একটু ভয় হ'ল। আমার স্ত্রীও যে বেশ ভয় পেয়েছেন তাও বুঝতে পারলুম। যাই হোক্, এক রকম জোর করেই বলে ফেল্‌লুম, 'কিছু ভয় নেই, চল।' খানিক দূর এগিয়ে দেখি মিট্‌মিটে আলো হাতে একদল লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু সাহস পেলুম, কিন্তু ভগবান্ বিরূপ হলেন। সেই লোকগুলোর চেহারা যমদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। তাদের কাছে আস্‌তে দেখে আমার অবস্থা তখন যা হ'ল তা তোমরা খানিকটা অনুভব কর্‌ছ নিশ্চয়ই।

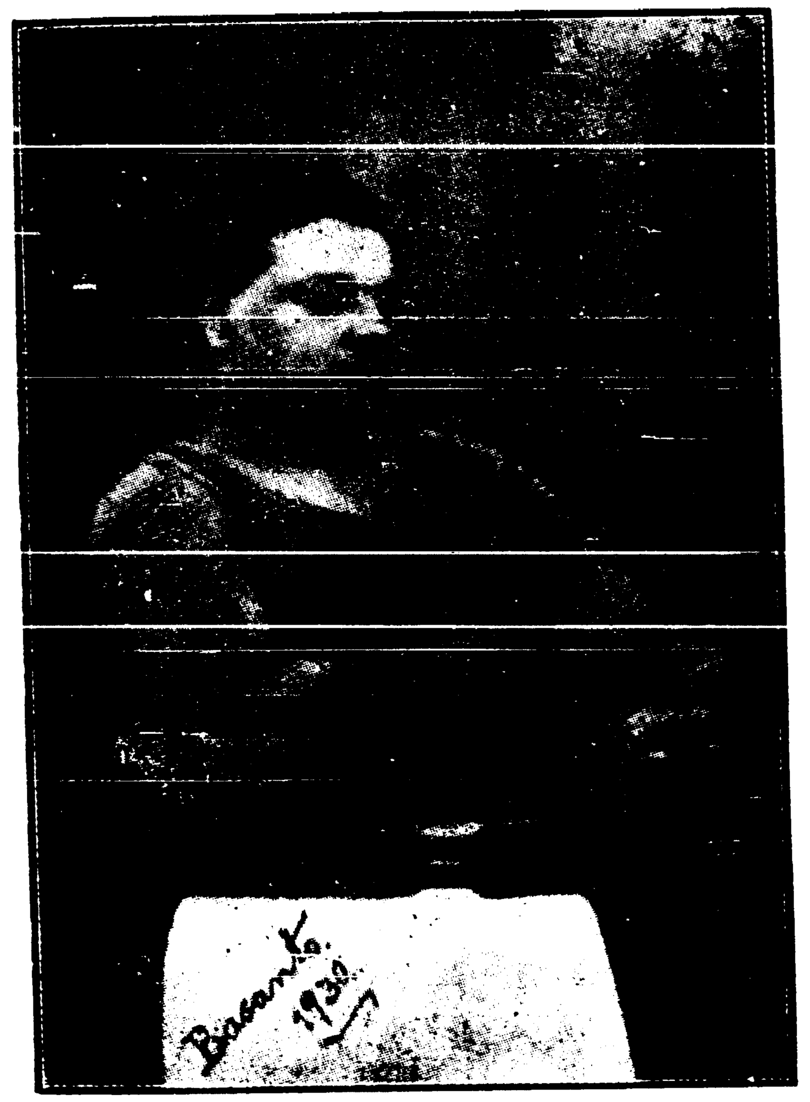

বাঙ্গালী বীর বসন্তকুমার

হঠাৎ তাদের একজন আমার জামাটা ধরে জুলুম আরম্ভ করে দিলে। আর একজন অমনি একটা হাত ধরে ফেল্‌লে। আমি "যা থাকে বরাতে" বলে বাঁ হাত দিয়ে একজনের গালে বেশ জোরে এক চড় মেরে দিলুম। ব্যাস্, আর যাই কোথায়! সেই তের-চৌদ্দ জন জংলি ডাকাত আমাকে একেবারে শূন্যে তুলে ফেল্‌ল। হঠাৎ মাটীর উপর ধড়াস্ করে পড়লুম্। প্রথমটা যেন কিছুই বুঝতে পারছিলুম না, হঠাৎ ডাকাতের মশালের আলোতেই চেয়ে দেখি কে একজন লোক

হিংস্র ডাকাত-দলের মাঝখানে পড়ে বিপুল সাহসে ও সিংহবিক্রমে তাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লেগে গেছেন।

আমি উঠতে পারলুম না। সেই অবস্থায় গড়াতে গড়াতে রাস্তার এক পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে যা দেখলুম তাতে রক্ত জল হয়ে গেল। এই নতুন লোকটী কে তোমরা বুঝতে পারছ কি? ইনিই বসন্তকুমার।

হুটো জোয়ান্ সামনে পিছন থেকে বসন্তকুমারের গলা জড়িয়ে ধরে দিলে তাঁকে ফেলে। কিন্তু দেখতে দেখ্তে বসন্তকুমার কৌশলে পা দিয়ে এমন ধাক্কা মারলেন যে দু'জনেই একেবারে কাৎ!

একজনের হাত ধরে বসন্তকুমার কি যে করলেন অমনি সেই ডাকাতটা হুম্ড়ি খেতে খেতে আমার পাশে শুয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। শেষে যা হ'ল তাতেই বোঝা গেল কি বিরাট্ শক্তির অধিকারী বসন্তকুমার! একটা ডাকাতের হুটো পা ধরে এমন ভাবে ঘোরাতে লাগ্লেন তিনি যে দলের আর সকলে কে কোথায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে তা আর দেখ্তে পাওয়া গেল না। যেটার পা ধরে বসন্তকুমার "লাঠি খেলা" করছিলেন সেটাই বোধ হয় দলের সর্দ্দার। সর্দ্দার বশ্যতা স্বীকার করে মশাল নিয়ে এগুতে লাগল, আর আমরাও তার পেছন পেছন চলে বাড়ী এলুম।

পর দিন সকালে তাদের সেরা সেরা জোয়ান্ বসন্তকুমারের কাছে এসেছিল তিন-চারটী ধনুক ও একখানি খাঁড়ার মত অস্ত্র নিয়ে। তাদের দেখবার জন্য সেখানে খুব ভীড় হয়ে গিয়েছিল। বসন্তকুমার তাদের কসরৎ দেখাতে বল্লেন। একজন তীর ধনুক নিয়ে দূরের একটা গাছের গুঁড়িতে তীর বিঁধিয়ে দিলে। বসন্তকুমার তাকে গাছটার একটা ডালে তীর বিঁধাতে বল্লেন। সে পারলে না এবং তাদের দলের কেউই পারলে না। বসন্তকুমার রোয়াকের উপর বসে হাস্তে হাস্তে তীর ধনুক নিয়ে নিমেষের মধ্যে সেই ডালটায় তীর বিঁধিয়ে দিলেন। আবার তীর ধনুক ধরলেন বসন্তকুমার। 'গাছের ঐ পাতাটা কাট্ছি' এই কথা বল্তে না বল্তেই তীর ছুটল এবং সেই পাতাটাকে কেটে ফেল্লে। ডাকাতেরা সেই তীর ধনুক বসন্তকুমারের পায়ের তলায় রেখে দিলে। তার পর খাঁড়ার মত

সেই অস্ত্র দিয়ে তাদের একজন গাছের একটা গুঁড়ি এক কোপে কেটে ফেল্লে। বসন্তকুমার সেখানা নিয়ে ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে যেমন চালালেন, সার সার দাঁড়ান চার পাঁচটা গাছের গুঁড়ি কেটে গেল এবং গাছগুলো হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

বসন্তকুমার তখন তাদের সঙ্গে শারীরিক কসরৎ যুড়ে দিলেন। বজ্রের মত তাঁর ডান হাতটা জমির উপর সোজা ক'রে রাখলেন, দু'জন জোয়ান্ সে হাত কিছুতেই জমি ছাড়া করতে পারলে না। দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন, দু'জনে তাঁর হাত ধরে এক ইঞ্চিও টেনে আন্তে পারলে না! ডান পায়ের সামনের ভাগ দিয়ে একজনের একটা পা চেপে ধরলেন বসন্তকুমার। সেই জোয়ান্টা অনেক চেষ্টা করেও তার পা খুলে নিতে পারলে না।

শিমুলতলায় থাক্তেই আর একদিন বসন্তকুমারের দেহের শক্তির আর একটী পরিচয় পাই। আমরা সকলে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমাদের বিশ্রামের স্থান হয়েছিল একটা পাহাড়ের মাথায়। গল্প কর্তে কর্তে আমার এক বন্ধু, বিনোদ বাবু, বলে উঠলেন, "আচ্ছা ওস্তাদজী, (বসন্তকুমারকে আমরা ওস্তাদজী বলতুম) এত তো কসরৎ দেখান, এই পাহাড়ের সঙ্গে কসরৎ কর্তে পারেন?" অমনি প্রকাণ্ড একখানা পাহাড়ের চাঁই-এর সঙ্গে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দিলেন বসন্তকুমার। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর হাত ও কাঁধের জোরে সেই প্রকাণ্ড পাহাড়ের চাঁইটাকে এমন ধাক্কা মারলেন যে সেটা উঁচু থেকে গড়াতে গড়াতে জমির ওপর এসে পড়ল। যেখানটায় পড়ল সেখানটায় একটা গভীর গর্ত্ত হয়ে গিয়ে পাথরখানা গেঁথে রইল।

শক্তির উপকারিতা অনেক। তোমরাও বসন্তকুমারের মত শক্তি অর্জ্জনে আত্মনিয়োগ কর। বাংলার ঘরে ঘরে বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করুক্!

সমুদ্রতলের রহস্য

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

পৃথিবী জয় করেছে বলে মানুষ যতই বড়াই করুক পৃথিবীর সিকি ভাগের সঙ্গেও আজ পর্য্যন্ত তার ভাল করে পরিচয় হয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ পৃথিবীর মাত্র এক ভাগ হচ্ছে ডাঙ্গা, বাকী তিন ভাগই জল—অর্থাৎ সমুদ্র। আর এই সমুদ্র সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও নিতান্ত অসম্পূর্ণ রয়েছে।

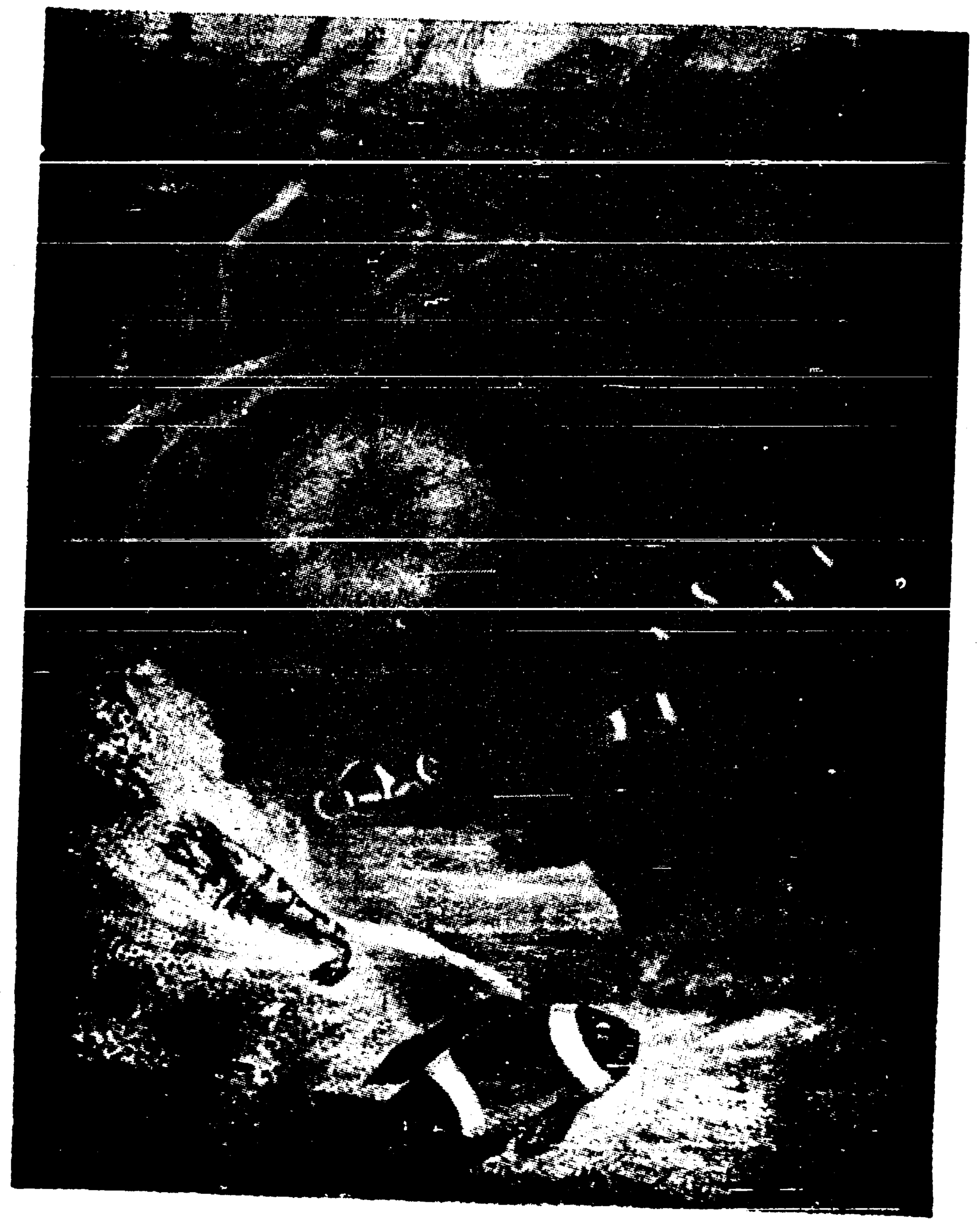

সমুদ্রের নীচেকার আশ্চর্য্য বাগান

সমুদ্রের ভিতরটা অদ্ভুত চেহারার, অদ্ভুত প্রকৃতির নানা রকম জীবজন্তুতে ভরা সে খবর অবশ্য সকলেই জানে। এই সব বিচিত্র জীবজন্তুর অনেকের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ও আছে—রামধনুতেও তোমরা অনেক বার তাদের কথা পড়েছ। তা ছাড়া সমুদ্রের নীচেকার আশ্চর্য্য বাগান—অদ্ভুত জলজ উদ্ভিদ্, ডুবো পাহাড় ইত্যাদির কথাও হয়তো অনেকে জান। কিন্তু সাধারণতঃ সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত অগভীর অঞ্চলের সঙ্গেই মানুষের বেশী পরিচয় হয়েছে; ডুবুরীর পোষাকে বা অন্য কৌশলে সমুদ্রের খুব বেশী নীচে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

তবে ঐটুকুতেই সে বহু রকম সামুদ্রিক জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পেয়েছে—কারণ সমুদ্রের বেশীর ভাগ জানোয়ারই অপেক্ষাকৃত অগভীর অঞ্চলে বাস করে। এরও কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না। সূর্য্যের আলো জলের যে পর্য্যন্ত ভেদ করে পৌঁছতে পারে, নিঃশ্বাস নেবার মত অল্পবিস্তর অক্সিজেন যেখানে জলের মধ্যে পাবার ব্যবস্থা আছে বড় বড় জীবজন্তু সেখানেই যে বেশী পাওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু সমুদ্রের সবটাই তো আর ও রকম অগভীর নয়! এমন অনেক জায়গা আছে যেখানকার গভীরতা কম ক'রে ৫।৬ মাইল। অর্থাৎ হিমালয় পাহাড়টাকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেও পাহাড়ের মাথার উপর বেশ খানিকটা জল থেকে যাবে। ডুবুরীর পোষাকে অত নীচে যাওয়া সহজ নয়—অসম্ভবই বলা চলে। অন্য কোন রকম সহজসাধ্য উপায়ও মানুষ খুঁজে পায় নি। কাজেই গভীর সমুদ্রের নীচেকার অঞ্চল প্রায় অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোক নন। লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের গ্রহ-তারা সম্বন্ধে তাঁরা নিত্য নতুন খবর আবিষ্কার করছেন আর এই পৃথিবীরই বুকে সমুদ্রের তলাকার খবর যোগাড় করতে গিয়ে তাঁরা বোকা বনে যাবেন! এও কি একটা কথা হ'ল?

শুধু পণ্ডিতদের ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য নয়, সমুদ্রের তলা সম্বন্ধে ভাল রকম জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হ'ল আর এক দিক্ দিয়ে। তোমরা জান বিলেতে টেলিগ্রাফ্ পাঠান'কে বলা হয় 'কেব্‌ল্' করা। টেলিগ্রাফ্ তারের ভিতর দিয়ে যায়, কাজেই বিলাতের সঙ্গে টেলিগ্রাফের সংযোগ রাখতে হ'লে দু'দেশের মধ্যে তারের সংযোগ থাকা চাই। এই তার নেওয়া হয়েছে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে। শক্ত নলের মধ্যে তার বসিয়ে সেই নল সমুদ্রের তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্যাপারটি নেহাৎ সহজ নয় এবং এর জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে হাঙ্গামাও কম পোহাতে হয় নি। এই সব হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই সমুদ্রতল সম্বন্ধে ভাল রকম জ্ঞান থাকা দরকার হয়ে পড়ে। কোথায় সমুদ্র কতখানি গভীর, কোথাকার জলে কতটা তাপ ইত্যাদি অনেক তথ্যই জানা প্রয়োজন হয়। এর ওপর যোগ

দেন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা। প্রাণিতত্ত্বের দিক্ দিয়েও গভীর সমুদ্রতলের নানা খবর পণ্ডিতদের দরকার।

গভীর সমুদ্র সম্বন্ধে তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর অন্ত নেই। ক্যাপটেন কুক্, জন্ রস্, জেম্‌স্ রস্, ডব্লিউ. টমসন্ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে কত পণ্ডিতই না কত ভাবে সমুদ্রতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন! ১৯০২ সনে কোপেনহেগেন সহরে সাগরতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এক আন্তর্জ্জাতিক সংঘও গঠিত হয়েছে। পৃথিবীর

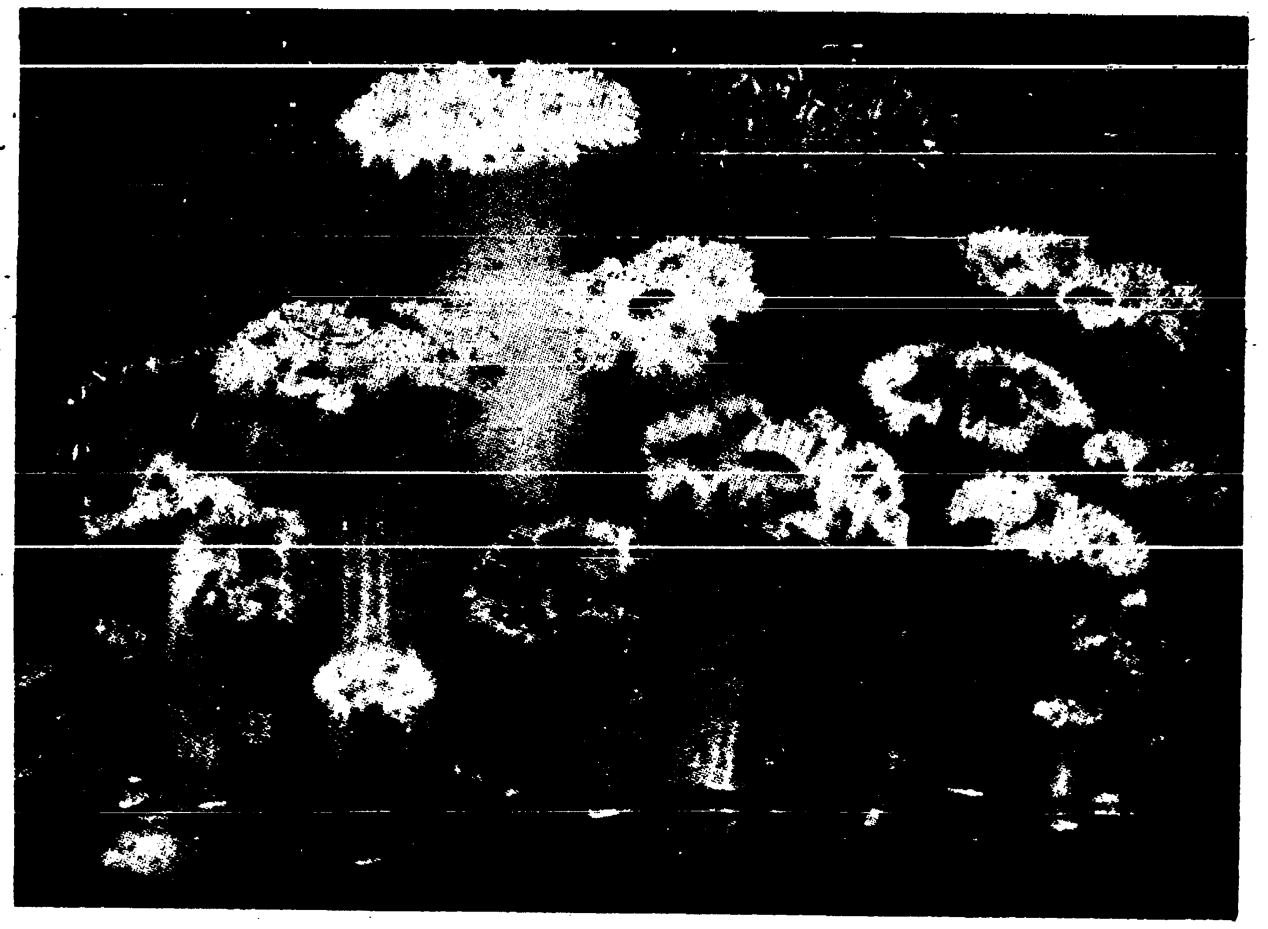

সমুদ্রের নীচেকার ফুলের মত অদ্ভুত জীব

প্রায় সমস্ত বড় বড় দেশের পণ্ডিতেরাই এর সভ্য হয়েছেন এবং এঁদের সকলকার চেষ্টার ফলে সমুদ্রতল সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা গেছে।

সমুদ্রতল সম্বন্ধে জানতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার কোথায় সমুদ্র কতটা গভীর। এই গভীরতা মাপাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় "সাউণ্ডিং"। সাউণ্ডিং-এর জন্য নানা রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটা যন্ত্রে একটা সুদীর্ঘ ইস্পাতের তারের সঙ্গে একটা ধাতুর তৈরী চোঙ্গা জাতীয় জিনিষ বেঁধে সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হয়। চোঙ্গাটি তলায় ঠেকলে ইস্পাতের তার দিয়ে একটা কাঁপুনি উঠে সে খবর

জানিয়ে দেয়। কতটা তার জলে নামান হ'ল দেখে সহজেই সে জায়গার গভীরতা ঠিক করা যায়। আগে তারের জায়গায় দড়ী ব্যবহার করা হ'ত। তা'তে ছিঁড়ে যাবার ভয় থাকে ব'লে লর্ড কেলভিন সাহেব প্রথম তারের ব্যবহার সুরু করেন। কিন্তু এতেও একটু অসুবিধা ছিল। খুব বেশী গভীর জলে নামাতে হ'লে চোঙ্গাটা বেশ ভারী হওয়া দরকার, নচেৎ ভয়ানক সময় লাগে। আবার চোঙ্গা বেশী ভারী হ'লে তা অতখানি টেনে তোলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ব্রুক্ নামে একজন আমেরিকান্ এ অসুবিধা দূর করবার জন্য এক নতুন উপায় বার করেন। চোঙ্গাটার সঙ্গে একটা ভারী লোহার বল যুড়ে দেওয়া হয়, চোঙ্গা সমুদ্রতল স্পর্শ করলেই বল্‌টা খুলে পড়ে, চোঙ্গা তুলতে তখন আর অসুবিধা হয় না। চোঙ্গার মধ্যে আরও এমন কয়েকটা ব্যবস্থা থাকে যার ফলে সেটাকে উপরে তুললে তার সঙ্গে সমুদ্রতলের খানিকটা জল, মাটী এবং সময় সময় ছোট ছোট জলজীবও তুলে আনা যায়। তা ছাড়া চোঙ্গার কাছে এবং তারের নানা জায়গায় থার্ম্মোমিটার বসান থাকে—তা থেকে সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের তাপ সম্বন্ধেও সঠিক খবর জানা যায়।

তাপ, গভীরতা ইত্যাদি খবর সংগ্রহ করা ছাড়া গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা জলজীবদের ধরে আনবার জন্যও এক ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তাকে বলা হয় 'ড্রেজ্।' এটি বেশ বড়সড় জিনিষ। গভীর সমুদ্রে নামিয়ে এটি দিয়ে খানিকটা মাটী চেঁছে নেওয়া হয়, আর সেই সংগৃহীত সম্পত্তি জালে আটকিয়ে ওপরে তোলা হয়। ব্যাপারটি ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষও বটে। কিন্তু এর সাহায্যে সমুদ্রতলের অনেক কিছুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং বৈজ্ঞানিকদের কাছে সেগুলি অমূল্য সম্পদ্।

সমুদ্রতলা নিয়ে এই সব গবেষণার ফলে সম্পূর্ণ না হ'লেও গভীর সমুদ্রতল সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর পাওয়া গেছে। গভীরতার দিক্ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরই আর সবের উপর টেক্কা দিয়েছে। এর কোন কোন অংশ ৩২০০০ ফুট অর্থাৎ ৬ মাইলেরও বেশী গভীর। সমুদ্রের গভীরতা সাধারণতঃ ফ্যাদম্ দিয়ে মাপা হয়। এক ফ্যাদম্ হচ্ছে ৬ ফুট।

গভীর সমুদ্রে অর্থাৎ হাজার খানেক ফ্যাদম্ নীচে জলের তাপ সাধারণতঃ

৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রী। বিষুবরেখার কাছে যে তাপ দেখা যায় মেরুর কাছে তাপ তার চেয়ে ২।৪ ডিগ্রী মাত্র কম।

গভীর সমুদ্রের অনেক জায়গায়ই সূর্য্যের আলো ভাল করে পৌঁছতে পারে না—কাজেই সেখানে সর্ব্বক্ষণ সূচীভেদ্য অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে। অথচ সে সব জায়গার বাসিন্দা অনেক জীবের দেহেই চোখ আছে দেখা যায়। (অবশ্য চক্ষুহীন অন্ধ প্রাণীও অনেক পাওয়া যায়।) এ থেকে কেউ কেউ সন্দেহ করেন—সমুদ্রের তলায় স্থান বিশেষে হয়তো এমন কিছু আছে যা থেকে আপনা-আপনি আলো বেরোয়,—যেমন আমাদের জোনাকি পোকার শরীরে হয়। তবে এটা ঠিক যে গভীর সমুদ্রের অনেক জীবের এ রকম শরীর থেকে আলো বার করবার ক্ষমতা আছে—অন্ধকার সমুদ্রে সে আলো খুবই কাজে লাগে।

সমুদ্রের তলায় মশালধারী জীব

সূর্য্যের আলো না থাকলে কোন গাছপালাই বাঁচতে পারে না, কাজেই অন্ধকারময় গভীর সমুদ্র জলজ উদ্ভিদ্‌দের পক্ষেও বেশী উপযোগী জায়গা নয়। তবে অনেক পণ্ডিত মনে করেন কতকগুলি গাছপালা তাদের প্রয়োজনীয় আলো নেয়

পূর্ব্বোল্লিখিত মশালধারী সামুদ্রিক প্রাণীদের শরীর থেকে এবং প্রতিদানে নিজেরা তাদের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

গভীর সমুদ্রে জলের চাপও নেহাৎ কম নয়, অত চাপ আমাদের পরিচিত বড় বড় জানোয়ারদের পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর; এ জন্যও বড় বড় সামুদ্রিক জানোয়ার বেশী নীচে বড় একটা দেখা যায় না। তা ছাড়া অত নীচেকার জলে অক্সিজেনের ভাগও (দ্রবীভূত) নেই বললেই চলে। খুব ছোট এবং আদিম যুগের প্রাণীর সংখ্যাই সে অঞ্চলে বেশী।

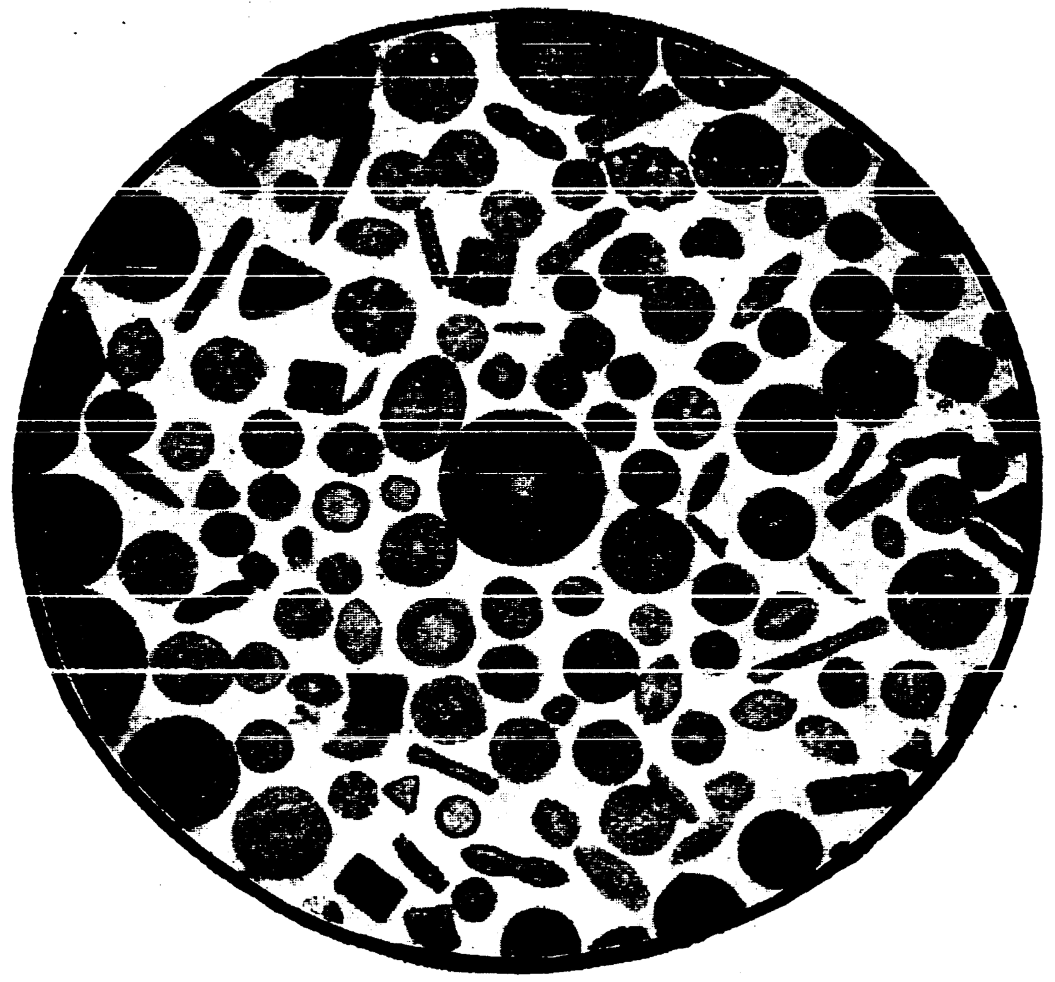

সমুদ্রের তলার ধূলো—অণুবীক্ষণের নীচে এই রকম সুন্দর দেখায়।

সমুদ্রের উপরিভাগে যে সব জানোয়ার বাস করে মৃত্যুর পর তাদের সকলেরই কঙ্কাল নীচে নেমে আসে। জলের মধ্যে নানা রকম ঘষাঘষি আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সেগুলোর অধিকাংশই খুব সূক্ষ্ম দানায় পরিবর্ত্তিত হয়ে পড়ে আর সেই মিহি দানা গিয়ে একদম তলায় জড় হয়। সমুদ্রতলের এই সব মিহি দানা বা সামুদ্রিক ধূলো অণুবীক্ষণের নীচে ভারী অদ্ভুত দেখায়। তা ছাড়া সমুদ্রতলের মাটী সাধারণতঃ একটু নীলাভ, লালচে কাদার স্তরও (Red Clay) অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

সমুদ্রের নীচে আর একটা কাণ্ড মাঝে মাঝে ঘটে। সাধুভাষায় তাকে বলা যায় "সমুদ্রকম্প"। ডাঙ্গায় যেমন ভূমিকম্প, এও তেমনি। সমুদ্রের জল মাটী চুঁইয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকলে পর সেখানকার উত্তাপে বাষ্প হয়ে আবার

ঠেলে বেরিয়ে আসে। ফলে সমুদ্রবক্ষে দেখা দেয় প্রচণ্ড আলোড়ন। সমুদ্রের মধ্যে অনেক সময় এমন সব ঘটনা দেখা যায় যার কারণ সহজে বুঝে ওঠা যায় না। অনেক পণ্ডিত এই সমুদ্রকম্পকেই সেগুলির জন্য দায়ী মনে করেন।

হাতেম-তাই

[শেখ সাদী হইতে]

(শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর)

স্তাবকেরা যবে করিতেছে সবে
হাতেমের গুণগান,
কহিল হাতেম "থাম থাম সবে,
ঝালাপালা হ'ল কান।
এই শহরের প্রান্তে রয়েছে
মোর চেয়ে ঢের বড়
একজন লোক বড়ই কাঙাল,
তারই গুণগান ক'র।
চল্লিশ উট কোরবাণী করি
করেছিনু আয়োজন
মস্ত ভোজের, অবারিত দ্বার
সবার নিমন্ত্রণ।
আমার বাড়ীতে জুটিল সবাই,
করিলাম অনুভব
তৃপ্তি সুখের সঙ্গে সে দিন
অপূর্ব্ব গৌরব।
আসিতেছিলাম উষ্ট্রে চড়িয়া
বনের প্রান্ত দিয়া,
দেখিলাম এক কাঙাল বৃদ্ধ
কাঠকুটা কুড়াইয়া
জড়ো করিতেছে এক জায়গায়;
বলিলাম তারে ডাকি'
'হাতেমের বাড়ী বড় খানা আজ,
তুমি তাহা জান না কি?
সবাই গিয়াছে, তুমি যাবে নাক?
সেথা আজ নওরোজ,
চল্লিশ উট কোরবাণী সেথা
জমেছে বিরাট ভোজ।'
সে বলিল শুধু 'খাটিয়া যে পারে
জুটাতে পেটের ভাত,
তার কি অভাব? হাতেমের দ্বারে
সে কেন পাতিবে পাত?'
তার কথা শুনে হইল আমার
গর্ব্বের অবসান;
গুণগান যদি করিতেই হয়,
কর তার গুণগান।"

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অধ্যাপক চন্দ্র ও তাঁর উনিশ জন সঙ্গীকে প্রহরীরা একটা বড় কামরায় আনিয়া বসাইল। ঘরটি বাস্তবিকই বড়, ঘরের আসবাবপত্রগুলিও একটু নতুন ধরণের। একধারে একটা কালো পাথরের টেবিল, আর সেই রকমেরই একটি চেয়ার;—চেয়ার বলিলে ঠিক বলা হয় না, জিনিষটা অনেকটা সেকালকার রাজারাজড়াদের সিংহাসন জাতীয় পদার্থ। অন্যান্য আসবাবের মধ্যে নানা রকম ধাতুর তৈরী জিনিষই বেশী—এবং সে ধাতুগুলিও সাধারণ ধাতু নয়, এমন কি তাদের সবগুলিকে চিনিয়া উঠাও কঠিন। সব চেয়ে অদ্ভুত জিনিষ হইতেছে ঘরের দেয়ালে কতকগুলি ছবি ও লেখা—বিশেষতঃ লেখার অক্ষরগুলি। আধুনিক কোন চলতি ভাষার অক্ষর সেগুলি নয়, বরঞ্চ সেগুলিকে ছবির ভাষা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন মিশর দেশে প্রচলিত "হায়রোগ্লিফ" অক্ষরের সঙ্গে সেগুলির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

অধ্যাপক চন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেয়ালের লেখাগুলি পড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নাম-করা প্রত্নতাত্ত্বিক, অধুনালুপ্ত বহু প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান, মুখ দেখিয়া মনে হইল লেখাগুলির সামান্য সামান্য অংশ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

"মিষ্টার চন্দ্র!"—সহসা আপ্পারামের কণ্ঠস্বরে অধ্যাপক চন্দ্র চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সামনের সেই কালো পাথরের চেয়ারে একজন সুদর্শন চেহারার ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়াছেন। অধ্যাপক চন্দ্র ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলেন।

ভাবের আদান-প্রদান কি ভাবে হইল তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে প্রায় ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় ইসারা, ইঙ্গিত ও ছবির অক্ষরের সাহায্যে অধ্যাপক চন্দ্র নবাগত ভদ্রলোকটিকে তাঁদের আগমনের কারণ বুঝাইতে সমর্থ হইলেন। তবে নিজে তিনি উহাদের বিশেষ কিছু খবর যোগাড় করিতে পারিলেন না। শুধু বুঝিলেন, এই সুদর্শন ভদ্রলোকটিই এ দেশের নেতা এবং তাঁর নাম নীলাহীরা উংশী।

তাঁদের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীলাহীরা হাঁ, না কিছুই বলিলেন না কিন্তু অনাদরও

করিলেন না ; বিশিষ্ট অতিথির মতই কুড়ি জন আগন্তুককে তাঁর 'পিরামিড'-দুর্গে আশ্রয় দিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল। এই তিন মাস অধ্যাপক চন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা নবগঠিত মেরু-রাজ্যেই কাটাইতেছেন। খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা নাই, ইচ্ছামত ঘোরাফেরাও করিতেছেন। তবে তাঁদের গতিবিধির উপর সব সময়েই বেশ কড়া নজর, রাখা হইতেছে। কোন কিছুতে বাধা না পাইলেও সর্ব্বদা নজর-বন্দী হইয়া থাকাটা বিশেষ আনন্দ-দায়ক নয়। তা ছাড়া দেশের লোক তাঁদের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, এ ভাবে অনিশ্চিতের মধ্যে এখানে পড়িয়াই বা থাকা যায় ক' দিন? সকলেই বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

অধ্যাপক চন্দ্র কিন্তু এই তিন মাস একেবারে নিরর্থক নষ্ট হইতে দেন নাই। বহু চেষ্টায়, বহু পরিশ্রমে তিনি সেখানকার ভাষা অনেকটা শিখিয়া ফেলিয়াছেন ; ফলে নীলাহীরার সঙ্গে তাঁর কিছুটা খাতিরও জমিয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, এই অদ্ভুত লোকগুলি এত দিন কোথায় ছিল, পৃথিবীর এই প্রচণ্ড প্রলয় কাণ্ডের পরও তারা কি ভাবে বাঁচিয়া গেল, এবং এখানকার এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও কি ভাবে এই অল্প দিনে সব কিছু এত সুন্দর ভাবে গুছাইয়া লইল—এ সব বিষয়ে অধ্যাপক চন্দ্র কিছুই জানিতে পারেন নাই, নীলাহীরাও কোন আভাস দেন নাই।

সেদিন বিকালে সঙ্গীদের সঙ্গে অধ্যাপক চন্দ্রের আর একবার এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইল। ডক্টর হালুয়াচাই কয়েক দিন যাবত দলের আর সবাইকে অধ্যাপক চন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। চন্দ্রের আর কি, তিনি খোদ বড়কর্ত্তার সঙ্গে খাতির জমাইয়া লইয়াছেন, পরম সুখে দিন কাটাইতেছেন, দেশের লোকের কথা ভাবিবার তাঁর ফুরসৎ কোথায়? তিনি চেষ্টা করিলে কি আর নীলাহীরার কাছ হইতে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট জবাব পাইতে পারিতেন না? তা ছাড়া এ ভাবে এই অদ্ভুত লোকগুলির নজরবন্দী হইয়া আর কত দিন থাকিতে হইবে তাহাও তো জানিয়া লইতে পারেন! তাঁদের দেশে ফিরিয়া যাইতে দিলেও তো আপদ্ চুকিয়া যায়—অধ্যাপক চন্দ্র তার জন্যও তো একটু চেষ্টা করিতে পারেন!

ডাঃ হালুয়াচাইকে সকলে পছন্দ না করিলেও তাঁর যুক্তিগুলি অনেকেরই পছন্দ হইল, এবং সকলে মিলিয়া অধ্যাপক চন্দ্রকে এ বিষয় চটুপট্ ব্যবস্থা করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় অধ্যাপক চন্দ্র বাগানে নীলাহীরার সঙ্গে দেখা করিয়া আবার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। নীলাহীরা শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি চিন্তা করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "না, মিঃ চন্দ্র, তা সম্ভব নয়। আমরা কম হ'লেও এখানে পঞ্চাশ হাজার জনের কম নই। যে পরিমাণ জমিজমা আর ফসলের ব্যবস্থা আমাদের আছে তা আমাদের পক্ষেই যে খুব যথেষ্ট তা

বলা যায় না। তা ছাড়া এখন, আপনি বলছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খল, কোথাও কিছু পাবার উপায় নেই। যদিও বাইরের পৃথিবী নিয়ে আমরা কোন রকম মাথা ঘামাই না তবু এক্ষেত্রে আমাদের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এর ওপর যদি আপনাদের ওখান থেকে লোকজন আমদানী হ'তে থাকে তবে এখানেও আপনাদের মত অবস্থা দেখা দেবে। নিজেদের লোকের উপর বিনা দোষে অত বড় শাস্তি চাপাতে আমি রাজী হতে পারি না। আপনারা যখন কথাটা তুলেছেন, তখন আমিও বলি, এবার সত্যিই আপনাদের যাবার সময় হয়েছে। আপনাদের খাদ্যাভাবের কথা শুনে চক্ষুলজ্জায় এত দিন আমরা আপনাদের যেতে বলতে পারি নি, কিন্তু আপনারা যখন স্বেচ্ছায় যেতে চাইছেন তখন আর কোন কথাই উঠতে পারে না। কালই আপনাদের যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।" একটু থামিয়া নীলাহীরা আবার বলিলেন, "অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে আমার ভালই লেগেছিল এবং আপনি এখানে থাকলে হয়তো আমি খুসিই হতাম কিন্তু আমার লোকজনের স্বার্থ আমাকে আগে দেখতে হবে, কাজেই আপনাকেও আমি থাকতে বলতে পারি না।"

দু'জনে নিঃশব্দে বেড়াইতেছিলেন, অধ্যাপক চন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।"

"কি বলুন?"

"এই আপনাদের সম্বন্ধে। ধূমকেতুর আবির্ভাবে পৃথিবীতে যে বিপর্য্যয় ঘটেছে আপনাদের এ মেরুরাজ্য তো তার থেকে রেহাই পায় নি—বরঞ্চ এখানকার পরিবর্ত্তনই বোধ হয় সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন। অথচ আপনারা এমন সহজ ভাবে কি ক'রে রক্ষা পেলেন? দু' বছর আগেও, আমরা সবাই জানি, এ সব দেশ চিরতুষারে ঢাকা ছিল। এই অল্পদিনের মধ্যে আপনারা কোথা থেকে এসে এমন সুশৃঙ্খল ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন! আপনাদের এই পিরামিডের মত অদ্ভুত দুর্গ, আলোক-স্তম্ভের মত ঐ অদ্ভুত পদার্থগুলি যতই দেখি আমার যে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না মিঃ নীলাহীরা!"

নীলাহীরা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সময় হ'লে সবই জানতে পারবেন। কিন্তু আমাদের কতটুকু আপনি দেখেছেন! বাইরে থেকে কতটুকুই বা এর দেখা যায়! যদি সময় সত্যিই হয়—"

হঠাৎ নীলাহীরার কথায় বাধা দিয়া সামনের একটা ঘর হইতে প্রবল আর্ত্তনাদ শোনা গেল। নীলাহীরা তাড়াতাড়ি সেদিকে পা চালাইলেন। অধ্যাপক চন্দ্রও তাঁর সঙ্গ নিলেন।

ঘরের এক দিকে একটা টেবিলের উপর শিকল-বাঁধা অবস্থায় দু'টি লোক দাঁড়াইয়া, মুখে তাদের গভীর আতঙ্কের ছাপ। ঘরের অপর পাশে ২।৩ জন লোক অদ্ভুত পোষাক আর

মুখোস পরিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। নীলাহীরা অধ্যাপক চন্দ্রের কাঁধে হাত দিয়া তাঁকে যন্ত্রের সম্মুখে যাইতে নিষেধ করিলেন। সহসা ঘর অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইল, পর মুহূর্ত্তেই সেই অদ্ভুত যন্ত্র হইতে প্রচণ্ড-তীব্র একটা আলো বাহির হইয়া টেবিলের উপরকার লোক দু'টির উপর গিয়া পড়িল। অধ্যাপক চন্দ্র বিস্ময়ে, উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিলেন সেই প্রচণ্ড আলোর মধ্যে লোক দু'টি মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

ঘরের অবস্থা স্বাভাবিক হইলে চন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন, "এ কি মৃত্যু-কিরণ!" নীলাহীরা জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, কতকটা তাই। এই লোক দু'টি বিশ্বাসঘাতক। আমাদের এখানে সকলের সব জিনিষে সমান অধিকার। কারও নিজস্ব বলে কিছুই নেই। কিন্তু এই লোক দু'টি নিজেদের স্বার্থের জন্য ষড়্‌যন্ত্র পাকাচ্ছিল। তাই আপাততঃ এ ভাবে তাদের আয়ত্তে আনা হ'ল।"

"আপাততঃ!" অধ্যাপক চন্দ্রের মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল। নীলাহীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলেন, "চলুন, মিঃ চন্দ্র, আমরা বাইরে যাই।"

কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইয়া যে সরু পথটা পার হইতে হয় সেখান দিয়া যাইবার সময় অধ্যাপক চন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সম্মুখের আর একটা ঘরে, জানালা দিয়া যতটা দেখা যাইতেছে, একজন পক্বকেশ বৃদ্ধ আপন মনে কি লিখিয়া চলিয়াছেন।

"মাপ করবেন মিঃ নীলাহীরা, একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"কেন পারবেন না!" নীলাহীরার মুখে আবার সেই হাসি।"

"আচ্ছা, একটা জিনিষ এখানে আমি এই তিন মাস ধরে লক্ষ্য করছি। আপনারা যাঁরা এখানে আছেন সকলেই যুবক। বয়স্ক লোক এ পর্য্যন্ত এখানে আমার চোখে একটিও পড়ে নি। আপনার বয়সও বোধ করি ৩৫।৩৬এর বেশী নয়। কিন্তু ঐ ঘরে মনে হ'ল একজন খুব বৃদ্ধ লোক বসে কাজ করছেন!"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি ঠিক আমাদের কেউ নন। উনিও অনেকটা আপনাদের মত এখানে অতিথি।"

"আমাদের মত?"

"সেও এক লম্বা ইতিহাস, মিঃ চন্দ্র। বছর দুই আগে ওঁকে আমরা প্রায় মৃত অবস্থায়ই এখানে আবিষ্কার করি। আমাদের চিকিৎসকদের প্রক্রিয়ায় উনি বেঁচে ওঠেন, অবশ্য তখন ওঁর স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা আমরাই ওঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে নতুন ক'রে মানুষ করি। তার পর বছর খানেক হ'ল হঠাৎ ওঁর স্মৃতিশক্তি আস্তে আস্তে ফিরে

আসছে বলে মনে হয়, ফিরে আসেও। আমরা বুঝতে পারি লোকটি পরম পণ্ডিত। তখন থেকে আমরা ওঁকে ওঁর ইচ্ছামত কাজ করতে কোন বাধা দেই নি। উনি ঐ ঘরেই প্রায় সর্ব্বক্ষণ থাকেন আর দিনরাত নানা রকম কাগজপত্র নিয়ে ডুবে থাকেন। কেউ ওঁকে বাধা দেয় না, উনিও কারও কিছুর মধ্যে থাকেন না। আলাপ করতে চান ওঁর সঙ্গে?"

ভদ্রলোককে বিরক্ত করা উচিত নয় বুঝিলেও প্রচণ্ড কৌতূহলই জয়ী হইল। নীলাহীরার সঙ্গে অধ্যাপক চন্দ্র ঘরে ঢুকিলেন। পর মুহূর্ত্তেই বিস্ময়ে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া অস্ফুটকণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি, এ যে ডক্টর রুদ্র!" (ক্রমশঃ)

[ধারাবাহিক উপন্যাস

পাঁচ

বিজয় বাবু ফিরে এসে বস্‌লেন। অজয় আবার সুরু কর্‌ল রণজিৎদের কাহিনী রণজিতেরই ভাষায়—

'...অতি সন্তর্পণে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম বনের ভিতর দিকে। আমাদের আশে-পাশে কিন্তু সমানে পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। অজানা একটা বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌তে লাগল। যে কোন বিপদেরই সামনা-সামনি দেখা মিল্‌লে সাহসের হয়ত তত অভাব হয় না, কিন্তু, যেখানে বিপদ্ থাকে অন্তরালে আর আভাসটী কেবল তার পাওয়া যায় সামনে, সেখানে বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যায় যে!

'ইরা বল্‌লে "ছোড়দা, চল, ফিরি।" ওর মত মেয়ের মুখেও ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট।

'শেষ পর্য্যন্ত ফিরলামই। অস্পষ্ট পদধ্বনির কিন্তু বিরাম নেই। ভূতুড়ে ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস নেই কোনও কালে—ইরারও নেই, আমারও নেই; নইলে ভাবতাম হয়ত

যে কোনও অশরীরীই আমাদের পিছু নিয়েছে। দৃষ্টির অন্তরালে থেকে কে বা কারা যে আমাদের অনুসরণ করছে তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না—তবে কেউ যে করছে এ বিষয় সুনিশ্চিত। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সেই ভীষণ অরণ্যের বাইরে এসে পড়লাম; সঙ্গে সঙ্গে সে অস্পষ্ট পদধ্বনিও আর শোনা গেল না।

'সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আশ্রয় নিলাম আমাদের প্লেনখানির অভ্যন্তরে। ইরা বল্‌লে—'ছোড়দা, আমার ধারণা যে বনের মধ্যে যে শব্দ আমরা শুনেছিলাম সেটা আমাদের মনের ভুল, নিশ্চয়। যদি আমাদের অনুসরণই করে থাকে কেউ তা হলে তা'রা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল আবার ফিরে আসবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এল অথচ তারা না এল আমাদের সামনে না করল কোনও রকম আক্রমণ? এ রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে আমাদের অনুসরণ করে তাদের লাভ কি?''

'ইরার কথার আর জবাব দিলাম না। আমি ভাবছিলাম যে এ সব দ্বীপে বন্য জাতির অভাব নেই। হয়ত ঐ রকম দু'জন একজন বুনো আমাদের শুধু লক্ষ্য করে চলে গেল, হয়ত তা'রা হঠাৎ আক্রমণ করতে সাহস পায় নি—হয়ত সদলবলে এসে তা'রা অতি শীঘ্রই করবে আমাদের আক্রমণ। ভয়ে শিউরে উঠ্‌ল গা। বিদেশীয়দের প্রতি এদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অনেক পড়েছি—অনেক শুনেছি; কিন্তু ইরাকে বলে লাভ কি? দেখা যাক্ কত দূর কি হয়। কোথাও পালাবারও উপায় নেই আর অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় এ অসীম সমুদ্রের বুকে ভাসাও চলে না—আর ভাস্‌বই বা কিসে চড়ে? রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল। আদরের বোনটী আমার নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। ওর সত্যই সুদৃঢ় ধারণা যে ওটা আজ মনেরই ভুল হয়েছিল আমাদের। শব্দটা কাল্পনিক একেবারে।

'রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর হ'তে লাগল। আমাদের চোখে কিন্তু ঘুম আস্‌ছিল না কিছুতেই।

'দুশ্চিন্তাতে মন ভরে আছে। হঠাৎ বনের মধ্যে যেন বহু অস্পষ্ট আলো দেখ্‌তে পেলাম। ক্রমশঃ আলোগুলি এগিয়ে আস্‌তে লাগল। একটু পরেই সেই অস্পষ্ট আলোতে বেশ দেখলাম ভীষণাকৃতি বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি এগিয়ে আস্‌ছে আমাদেরই দিকে। তাদের অনেকের হাতে মশাল, অনেকের হাতে বর্শা, আবার অনেকের হাতে বা তীর-ধনুক। অতি সন্তর্পণেই এগিয়ে অস্‌ছে,—আমরা যাতে জান্‌তে না পারি এই জন্যই ওদের হয়ত অত সতর্কতা! ভেবেছে আমরা নিশ্চয়ই আছি ঘুমিয়ে। ওরা তো জানে না যে রাত আমার জেগেই কাটছে! কিন্তু, জেগে কেটেই বা লাভ কি? আমি একা, ওরা যে অসংখ্য! আমার হাতে রিভলভার—তাই বা সুবিধা কি?

'ওরা এসে পড়েছে—

'ইরাকে জাগালাম; ইরা লাফিয়ে উঠে বসল।

'ওরা এসে ঘিরে ফেল্‌ল আমাদের। উঃ, কি আনন্দ ওদের! কি চীৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে কি নৃত্য ওদের!

'ওদের মধ্যে থেকে কয়েক জন এগিয়ে এল আমাদের কাছে। একজন এসেই কি একটা ব'লে ইরার একটা হাত ধরে সজোরে টান দিলে। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। সেই দানবটাকে গুলি করবার জন্য রিভলভারটা তুলে ধরলাম। ইরা চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ছোড়দা, রিভলভার নামাও।" আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ রিভলভার নামালাম।

'ইরা বল্‌লে,—"বাঁচবার আশা যদি একটুও থাকে—গুলি করলে তা আর একটুও থাক্‌বে না। জান তো, ওদের প্রত্যেক তীরে বিষ মাখান থাকে। আমার সামনে ওরা তোমাকে এখনি তা হ'লে মারবে তীর, কিংবা বর্শা বিঁধে দেবে—আর তুমি যন্ত্রণায়—ওঃ! না না, তার চেয়ে আত্মসমর্পণও ভাল।"

'বুদ্ধিমতী বোন্‌টী আমার—ওর কথা মত আত্মসমর্পণই করলাম। এরই মধ্যে দু' তিনটে বুনো এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে একজন—বোধ হয় ওদের সর্দ্দারই হ'বে—কি বল্‌লে ঐ ক'জনাকে। ওরা দড়ির মত কি একটা জিনিষ দিয়ে আমার হাত দু'টো বেঁধে ফেল্‌ল। তার পর ইরাকে আর আমাকে ইসারা করলে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য। আমরা চল্‌লাম ওদের কথা মত—ওদের সঙ্গে সঙ্গে। ওরা আমাদের ঘিরে মহা তাণ্ডব নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল।

'কিছু দূর এসে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা বাঁশের তৈরী ঘর মত দেখা গেল। ঘরটার মধ্যে তখনও ঘোর অন্ধকার। তার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঘরের দেওয়ালের একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধল আমাকে আর একটাতে বাঁধল ইরাকে। তার পর ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে তারা সব চলে গেল মনে হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টে এই ছিল! এর চেয়ে কত সুখমৃত্যু হ'ত যদি সমুদ্রগর্ভে হ'ত আমাদের শেষ সমাধি।

'এত দিন বই-এ পড়েছি এই সব অসভ্য দ্বীপবাসীদের কথা। কল্পনায় তাদের ছবি এঁকেছি এত দিন—আজ বাস্তবেই মিল্‌ল তা'দের দেখা?

'ইরা বীর-নারী। মৃত্যুকে সে ডরায় না, এত দিন মৃত্যুকে কয়েক বার সামনা-সামনি দেখেও ওর মুখের হাসি মেলায় নি। আজ মৃত্যুভয় নয়—ঐ অসভ্যদের হাতে পীড়নের ভয়ে, অত্যাচারের ভয়ে ও পড়েছে নুয়ে। অন্ধকার ঘর—কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'হঠাৎ ঘরের একটা কোণ থেকে একটা অস্ফুট কাতর-ধ্বনি ভেসে এল যেন! কান খাড়া করে রইলাম।

'অল্পক্ষণ পরে ঘরের সেই কোণ থেকেই কে যেন অতি কাতরভাবেই কথা কইল—পরিষ্কার ইংরাজিতে।'

(ক্রমশঃ)

খুকু

(শ্রীমতী কল্যাণী বসু)

ছোট যূথিকার মত ছোট খুকুরাণী
কচি মুখে কত বলে আধ-আধ বাণী।
ওই দু'টি ছোট হাত
এত জানে উৎপাত,
দুনিয়ার সবেতেই তার প্রয়োজন;
ছোট ওই খেলা-ঘরে কত আয়োজন!

দাদাদের দোয়াতের কালি নিয়ে মাখা,
জামা, জুতো, ছুরী, ছাতা ছড়াইয়া রাখা,
কোথা গেল শ্লেট বই!
খাতাই বা গেল কই?
সব দেখ জড়ো হয় খেলা-ঘরে তার,
ভাইবোন তার চোটে কত পারে আর?

তবুও ব'লো না কিছু অভিমানী মেয়ে—
কথায় কথায় আসে চোখে জল ছেয়ে;
সাত খুন ক'রো মাপ
চেপে যাও চুপচাপ,
বড় আদরিণী মেয়ে, কিছু ব'লো নাকো—
খুকুরাণী, সোনমণি—এই ব'লে ডাকো।

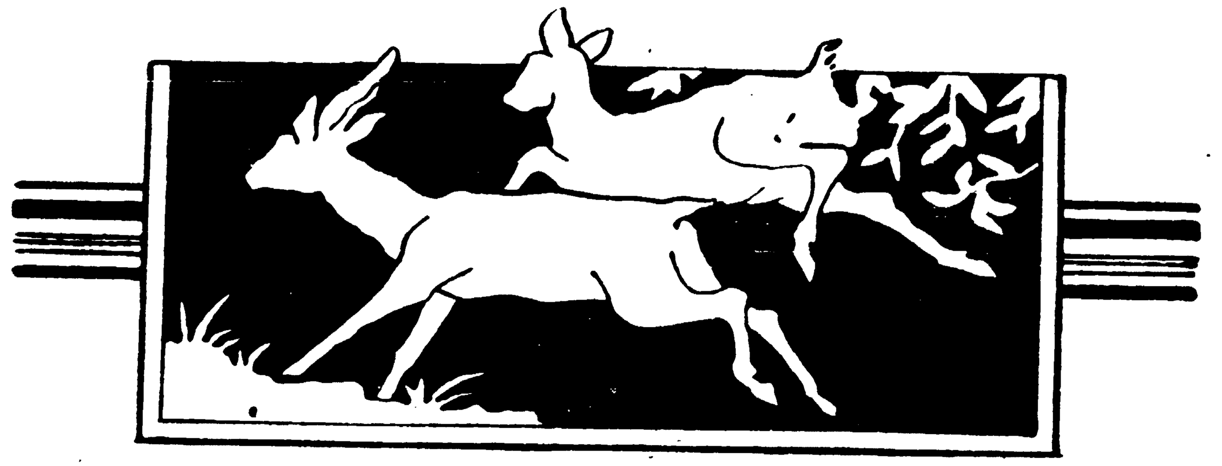

অমৃত-দ্বীপ

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর সাগর-স্নান

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে জয়ন্ত যা দেখলে তা ভয়াবহই বটে!

বোম্বেটেদের জাহাজেরও অনেক পিছনে—বহু দূরে, আকাশ ও সমুদ্রের চেহারা একেবারে বদলে গেছে! নীচে বিপুল মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, উন্মত্ত, বৃহৎ তরঙ্গের পর তরঙ্গ—বলা চলে তাদের পর্ব্বত-প্রমাণ! তারা লাফিয়ে উপরে উঠছে, ঝাঁপিয়ে নীচে পড়ছে, আবার উঠছে, আবার নামছে এবং ঘুরপাক খেতে খেতে ফেনায় ফেনায় সেখানকার নীলিমাকে যেন খণ্ড খণ্ড ক'রে দিয়ে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে উল্কার মতন তীব্রগতিতে! উপরে আকাশেরও রং হ'য়ে গেছে কালো কালো মেঘে মেঘে ঘোরা রাত্রির মতই অন্ধকার! বেশ বোঝা যায়, জেগে উঠেছে সেখানে সর্ব্বধ্বংসী আকস্মিক ঝঞ্ঝাবায়ু—যার মত্তকান্দোলনে দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে বাঁধন-হারা নিকষ-কালো মেঘের জটা এবং ঘন ঘন পদাঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে উথলে উঠছে তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র!

ফিরে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে জয়ন্ত বল্লে, "টাইফুন্?"

কুমার খালি-চোখেই সেদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ঘূর্ণাবর্ত্ত।"

মাণিক বল্লে, "কিন্তু আমাদের এখানে তো একটুও বাতাস নেই, অসহ্য উত্তাপে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে!"

কুমার বল্লে, "ও-সব টাইফুনের পূর্ব্ব-লক্ষণ। এ অঞ্চলে টাইফুন্ জাগবার সম্ভাবনা ঐ লক্ষণ থেকেই জানা যায়।"

জয়ন্ত বল্লে, "কুমারবাবু, সমুদ্র-যাত্রা আমার এই প্রথম, এর আগে টাইফুন্ কখনো দেখি নি। কিন্তু শুনেছি চীনা-সমুদ্রে টাইফুনের পাল্লায় প'ড়ে ফি বৎসরেই অনেক জাহাজ তলিয়ে যায়।"

—"সেইজন্যেই তো ওকে আমরা বোম্বেটেদেরও চেয়ে ভয়ানক ব'লে মনে করছি! বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এখন আমাদের একমাত্র আশা ঐ দ্বীপ। টাইফুনের আগে যদি ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি! হয়তো পারবও, কারণ আমরা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। এই দেখুন, আমাদের জাহাজের গতি আরো বেড়ে উঠেছে!"

এতক্ষণ সুন্দরবাবু ছিলেন ভয়ে হতভম্বের মত। এইবারে মুখ খুলে তিনি ব'লে উঠলেন, "হুম্! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজ এখনো দূরে রয়েছে, সে কি টাইফুন্‌কে ফাঁকি দিতে পারবে?"

কুমার বললে, "ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

মাণিক বললে, "কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! সমুদ্রের আর সব দিক্ শান্ত, কেবল একদিকেই জেগেছে নটরাজের প্রলয়-নাচন!"

কুমার বললে, "সাধারণ 'সাইক্লোনে'র মত টাইফুন্ বহু দূর ব্যেপে ছোটে না, ঐটেই তার বিশেষত্ব! কিন্তু ছোট হ'লেও তার জোর বেশী—যেটুকু জায়গা জুড়ে আসে, তার ভিতরে পড়লে আর রক্ষে নেই!"

দূর থেকে 'মেগাফোনে' বিমলের উচ্চ কণ্ঠস্বর জাগল: "কুমার, তোমরা সবাই ডাঙায় নামবার জন্যে প্রস্তুত হও। কেবল নিতান্ত দরকারি জিনিষগুলো গুছিয়ে নাও।"

সবাই কেবিনের দিকে ছুটল। তারপর তাড়াতাড়ি কতকগুলো ব্যাগ ভর্ত্তি ক'রে আবার তারা যখন ডেকের উপরে এসে দাঁড়াল, দ্বীপ তখন একেবারে তাদের সামনে!

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "সমুদ্র যে এখানে প্রকাণ্ড এক নদীর মত হয়ে দ্বীপের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে! এ যে এক স্বাভাবিক বন্দর!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, আমাদের জাহাজও এই বন্দরে ঢুকছে।"

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, "জয় মা কালী! আমরা বন্দরে আশ্রয় পেয়েছি!"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ, আরো ভালো ক'রে মা-কালীকে ডাকুন সুন্দরবাবু! কারণ তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবী, আর বোম্বেটেরাও এই বন্দরে আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই।"

সুন্দরবাবু দুই হাত জোড় ক'রে মা-কালীর উদ্দেশে চক্ষু মুদে তিন বার প্রণাম ক'রে বললেন, "মাণিক, এ-সময়ে আর ভয় দেখিও না, মা-জগদম্বাকে একবার প্রাণ ভ'রে ডাকতে দাও।"

কুমার ফিরে দেখলে, শত্রুরা দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে প্রাণপণে জাহাজ চালিয়েছে এবং দূরে তার

দিকে বেগে তাড়া ক'রে আসছে সাগর-তরঙ্গ তোলপাড় ক'রে মূর্ত্তিমান মহাকালের মত সুভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত!

দ্বীপের ভিতরে ঢুকে সমুদ্রের জল আবার মোড় ফিরে গেছে, কাজেই জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে মোড় ফিরলে। তখন দ্বীপের বন-জঙ্গল ঠিক যবনিকার মতই বাহির-সমুদ্র, ঘূর্ণাবর্ত্ত ও বোম্বেটে-জাহাজের সমস্ত দৃশ্য একেবারে ঢেকে দিলে।

এমন সময়ে বিমল দৌড়ে সকলের কাছে এসে বললে, "জয়ন্তবাবু, কাপ্তেন বললেন এখানকার জল গভীর নয়, জাহাজ আর চলবে না। নাবিকরা নৌকোগুলো নামাচ্ছে, আমাদেরও জাহাজ থেকে নামতে হবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন?"

—"বোম্বেটেরাও এখানে আসছে, তারা আমাদের চেয়ে দলে ঢের ভারি। আমরা ডাঙায় না নামলে তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারব না।"

সুন্দরবাবু আবার মুষড়ে প'ড়ে বললেন, "তাহ'লে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে?"

—"নিশ্চয়! টাইফুন্ আর বোম্বেটে—আমাদের এখন যুদ্ধ করতে হবে দুই শত্রুর সঙ্গে! ঐ দেখুন, 'সেলর'রা এরি মধ্যে 'লাইফ-বোট' ভাসিয়ে ফেলেছে! ঐ শুনুন, 'মেগাফোনে' কাপ্তেন-সায়েবের গলা! তিনি আমাদের নৌকোয় তাড়াতাড়ি নামতে বলছেন—নইলে ঝোড়ো ঢেউ এখানেও এসে পড়তে পারে! চলুন, আর দেরি নয়। রামহরি, তুমি বাঘাকে সামলাও!"

... ...

লাইফ-বোট যেখানে থামল, সেখানে জলের ধার থেকেই একটি ছোট্ট পাহাড় প্রায় এক-শো ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে।

বিমল বললে, "এইখানেই বন্দুক নিয়ে আমরা সবাই পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করব। বোম্বেটেরা আমাদের বন্দুক এড়িয়ে নিতান্তই যদি ডাঙায় এসে নামে, তাহ'লে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপাততঃ এই পাহাড়টাই হবে আমাদের দুর্গ। কি বল কুমার, কি বলেন জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত বললে, "সাধু প্রস্তাব। কিন্তু বিমলবাবু, একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছেন?"

—"হুঁ, ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ হু-হু, সমুদ্রের হুঙ্কার!"

কুমার বললে, "কেবল তাই নয়—দূর থেকে যেন অনেক মানুষের কোলাহলও ভেসে আসছে!"

রামহরি বললে, "এতক্ষণ চারিদিকে গুমোট্ ক'রে ছিল, এখন জোর-হাওয়ায় এখানকার গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে! ঝড় বোধ হয় এল!"

মাণিক বল্লে, "ঝড় এল, কিন্তু বোম্বেটে-জাহাজ কোথায় ?"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "হুম্ !"

বাঘা বল্লে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ !"

বিমল বল্লে, "তবে কি বোম্বেটেগুলো ঝড়ের খপ্পরেই পড়ল ? দাঁড়াও, দেখে আসি" —ব'লেই সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

রামহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বল্লে, "ওপরে উঠ না খোকাবাবু, ওপরে উঠ না। বেশী ঝড় এলে উড়ে যাবে !"

কিন্তু বিমল মানা মানলে না। পাহাড়ের প্রায় মাঝ-বরাবর উঠেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে একদিকে তাকিয়ে সে চমৎকৃত স্বরে বল্লে, "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ! কুমার, কুমার, শীগ্‌গির দেখে যাও !"

বিপুল কৌতূহলে সবাই দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল—একমাত্র সুন্দরবাবু ছাড়া। তাঁর বিপুল ভুঁড়ি উর্দ্ধমার্গের উপযোগী নয়।

বাস্তবিকই সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য ! যে বিষম টাইফুনের ভয়ে তারা সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সে-ভয়ঙ্কর দ্বীপের দিকে না এসে যেন পাশ কাটিয়েই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে অন্য দিকে হু-হু ক'রে ! দ্বীপের দিকে এসেছে খানিকটা উদ্দাম হাওয়ার ঝটকা মাত্র, কিন্তু টাইফুন্ নিজে যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার শূন্যে দুলছে নিরন্ধ্র অন্ধকার—নীচে কেবল অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে রুদ্র সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গদলের হিন্দোলা ! আর ভেসে ভেসে আসছে প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্ত্তের বিকট চীৎকার, গম্ভীর জল-কল্লোল, বহু মানব-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ !

কুমার অভিভূত স্বরে বল্লে, "এমন বিচিত্র ঝড় আর কখনো দেখি নি ! কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজখানা কোথায় গেল ?"

বিমল বল্লে, "ওখানকার অন্ধকার ভেদ ক'রে কিছুই দেখবার উপায় নেই ! তবে মানুষের গোলমাল শুনে বোধ হচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও কোথায় ছুটে চলেছে, হয়তো সমুদ্র এখনি তাকে গিলে ফেলবে !"

রামহরি সানন্দে বল্লে, "জয় বাবা পবনদেব ! আজ তুমিই আমাদের সহায় !"

... ...

খানিকক্ষণ পরেই চারিদিক্ আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—শূন্যে নেই অন্ধ মেঘের কালিমা, সমুদ্রে নেই বিভীষণের তাণ্ডব-লীলা। একটু আগে কিছুই যেন হয় নি, এমনি ভাবেই মুখর নীলসাগর আবার বোবা নীলাকাশের কাছে আদিম যুগের জীবহীনা ধরিত্রীর পুরাতন গল্প-বলা সুরু করলে।

সূর্য্য সাগর-স্নানে নেমে অদৃশ্য হ'ল, কিন্তু আকাশ আর পৃথিবীতে এখনো আলো যেন ধরছে না ! দূর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখী ফিরে আসছে দ্বীপের দিকে।

পাহাড়ের উপরে ব'সে সবাই বিশ্রাম করছিল। সেখান থেকে দ্বীপটিকে দেখাচ্ছে চমৎকার পরীস্থানের মত। নানা-জাতের গাছেরা সেখানে সঙ্গীতময় সবুজ উৎসবে মেতে আছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণকরে পাম্-জাতীয় গাছেরাই।

কোথাও পাহাড়ের আনন্দাশ্রুধারার মত ঝ'রে পড়ছে ঠিক যেন একটি খেলাঘরের ঝরণা। রূপালী ফিতার মত তার শীর্ণ ধারা সকৌতুকে পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসেছে নীচেকার সুন্দরশ্যাম জমির উপরে—যেখানে শ্যামলতাকে সচিত্র ক'রে তুলেছে রং-বেরঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের দল। খানিক পরেই রাত হবে, তারার সভায় চাঁদ হাসবে, আর নতুন জ্যোৎস্নার ঝল্‌মলে আলো মেখে স্বপ্নবালারা আসবে যেন সেই ফুলদার ঘাস-গালিচার উপরে ব'সে ঝরণার কলগান শুনতে !

বিমল এই সব দেখতে দেখতে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "সহর আর সভ্যতা ছেড়ে পৃথিবীর যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি, রেখায় রেখায় লেখা আছে সৌন্দর্য্যের কবিতা ! সহরে ব'সে হাজার হাজার টাকা খরচ ক'রে যতই 'ড্রয়িং-রুম্' সাজাও, কখনোই জাগবে না সেখানে রূপের এমন ঐশ্বর্য্য, লাবণ্যের এত ছন্দ ! সহরে ব'সে আমরা যা করি তা হচ্ছে আসল সৌন্দর্য্যের 'ক্যারিকেচার' মাত্র, কাগজের ফুলের মতই অসার ! তাই তো আমি যখন-তখন কুৎসিত সহর আর কপট সভ্যতাকে পিছনে ফেলে ছুটে যেতে চাই সৌন্দর্য্যময় অজানা বিজনতার ভিতরে। রামহরি জানে, আমরা দুরন্ত ডানপিটে, খুঁজি খালি য়্যাডভেঞ্চার ! কিন্তু তুমি জানো কুমার, এ কথা সত্য নয় ! চোখের সামনে রয়েছে এই যে অপরূপের নাট্যশালা, আমাদের কল্পনা কি এখানে অভিনয় করতে ভালোবাসে না ? আমরা কি কেবল ঘুষোঘুষি করতে আর বন্দুক ছুঁড়তেই জানি, কবিতা পড়তে পারি না ?"

কুমার বললে, "আমার কি মনে হচ্ছে জানো বিমল ? ঐ ফুলের বনে, ঐ ঝরণার ধারে একখানি পাতার কুঁড়েঘর গ'ড়ে সত্যিকার কবির জীবন যাপন করি ! চারিদিকে বনের গান, পাখীর তান, বাতাসের ঝঙ্কার, মৌমাছির গুঞ্জন, ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির রঙের খেলা, দিনে মাঠে মাঠে রোদের কাঁচা সোনা, রাতে গাছে গাছে চাঁদ্‌নীর ঝিলি-মিলি, আর এরি মধ্য থেকে সর্ব্বক্ষণ শোনা যায় অনন্ত সমুদ্রের মুখে মহাকাব্যের আবৃত্তি ! কল্‌কাতার পায়রার খোপে আর আমার ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

জয়ন্ত বললে, "পৃথিবীকে আমার যখন বড় ভালো লাগে তখন আমি চাই বাঁশী বাজাতে ! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমার সঙ্গে আছে বাঁশীর বদলে বন্দুক। বন্দুকের নল থেকে তো গান বেরোয় না, বেরোয় কেবল বিষম ধমক।"

মাণিক বললে, "কেন জয়ন্ত, খুসি হ'লেই তো তুমি আর একটি জিনিষ ব্যবহার কর! নস্তির ডিবেটাও কি তুমি সঙ্গে আনো নি?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ মাণিক, নস্তির ডিবেটা আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কবিতা কোনদিন ডিবের ভেতরে নস্তির সঙ্গে বাস করে না। আজ আমাদের সামনে দেখছি যে মূর্ত্তিমান সঙ্গীতকে, তার নাচের ছন্দ জাগতে পারে কেবল আমার বাঁশীর মধ্যেই।"

সুন্দরবাবু ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে দোদুল্যমান ভুঁড়ির বিদ্রোহিতাকে আমলে না এনেই পাহাড়ের উপরে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের কবিত্ব-চর্চ্চা আর তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না, বিরক্ত স্বরে বললেন, "হুম্! পাহাড় থেকে ঝরণা ঝরছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে গাছগুলো ন'ড়ে-চ'ড়ে শব্দ করছে, কতগুলো পাখী চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে, আর মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, এ সব নিয়ে এত বড় বড় কথার কিচ্ছু মানে হয় না। চল হে রামহরি, আমরা স'রে পড়ি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কিন্তু যাবেন কোথায়? জাহাজে?"

—"না। গরমে ছুটোছুটি ক'রে শরীরটা কেমন এলিয়ে পড়েছে। এখানকার পাহাড়ের তলায় সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে বেশী ঢেউ নেই দেখছি। একটু সমুদ্র-স্নান করবার ইচ্ছে হয়েছে। রামহরি, কি বল?"

রামহরি বললে, "বেশ তো, চলুন না! আমিও একবার চান ক'রে নিই-গে। আয় রে বাঘা!"

—"কিন্তু তোমার বাঘাকে আগে আগে যেতে বল রামহরি, নইলে ও আবার হয়তো আমার পা শুঁকতে আসবে!"

রামহরি বললে, "বাঘা, সাবধান! আবার যেন আমাদের সুন্দরবাবুর সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাব করতে যেও না! যাও, এগিয়ে যাও।"

বাঘার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল না যে, সুন্দরবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্যে তার মনে আর কিছুমাত্র বাসনা আছে। কিন্তু সে রামহরির কথা বুঝে ল্যাজ উঁচু করে আগের দিকে দিলে লম্বা এক দৌড়।

রামহরির সঙ্গে সুন্দরবাবু যখন পাহাড় থেকে নেমে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের আলো তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে।

রামহরি বললে, "শীগ্‌গির ছুটো ডুব দিয়ে নিন, আলো থাকতে থাকতেই আমাদের আবার জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে।"

—"কিছু ভয় নেই রামহরি, আজ পূর্ণিমা। আজ অন্ধকার জব্দ!"

—"ঐ শুনুন, ভূ দিয়ে জাহাজ আমাদের ডাকছে! ঐ দেখুন, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁরা সবাই নেমে আসছেন!"

সুন্দরবাবু জলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একটি সুদীর্ঘ "আঃ" উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, "বাঃ, তোমাদের বাঘা দেখছি যে দিব্যি সাঁতার কাটছে! আমিও একটু সাঁতার দিয়ে নি। কি চমৎকার ঠাণ্ডা জল! দেহ যেন জুড়িয়ে গেল!"

জল কেবল ঠাণ্ডা নয়, নীলিমা-মাখানো সুন্দর, স্বচ্ছ। তলাকার প্রত্যেক বালু-কণাটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এখানকার জলের মধ্যে কোনই অজানা রহস্য নেই। কাজেই সুন্দরবাবু মনের সুখে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন।

দূর থেকে মাণিক চীৎকার ক'রে বললে, "উঠে আসুন সুন্দরবাবু, অত আর সাঁতার কাটতে হবে না! এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে!"

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "হুম্, কি বললে? হাঙর? তাই তো হে, এ-কথা তো এতক্ষণ মনে হয় নি! বাব্বাঃ! দরকার নেই আমার সাঁতার কেটে!"—তিনি তীরের দিকে ফিরলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভব করলেন জলের ভিতর থেকে প্রাণপণে কে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলে!

—"ওরে বাবা রে, হুম্—হুম্! হাঙর, হাঙর! জয়ন্ত, মাণিক, রামহরি! আমাকে হাঙরে ধরেছে—হু-হু-হু-হু-হুম্!"

রামহরি একটু তফাতে ছিল। কিন্তু সেইখান থেকেই সে স্তম্ভিত নেত্রে বেশ দেখতে পেলে যে, সুন্দরবাবুর দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, সুদীর্ঘ একটা ছায়ামূর্ত্তি!

সুন্দরবাবু পরিত্রাহি চীৎকার ক'রে বললেন, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! হাঙর নয়, এ যে একটা মানুষ! এ যে মড়া! ওরে বাবা, এ যে ভূত! এ যে আমাকে জলের ভিতরে টানছে—ও জয়ন্ত, ও মাণিক!"

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিক তীরের মত পাহাড় থেকে নেমে এল। ভূতের নামে রামহরি একবার শিউরে উঠল বটে, কিন্তু তখনি সে-দুর্ব্বলতা সামলে নিয়ে বেগে সাঁতার কেটে সুন্দরবাবুর দিকে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে পড়ল বাঘা—তার দুই চক্ষু জ্বলছে তখন তীব্র উত্তেজনায়!

—"আর পারছি না, একটা জ্যান্তো মড়া আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—বাঁচাও, বাঁচাও!"

(ক্রমশঃ)

ছোটদের চিত্রশালা

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, বেলুড় মঠ
শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ গৃহীত আলোকচিত্র

বাঁশীর সুর
শিল্পী—শ্রীমতী বেলা সরকার

রেডিয়ো সব সময়েই রেডি

(শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী)

নাঃ, পারা গেল না আর। ওদের ঐ রেডিয়োটার জ্বালায় এ পাড়ায় থাকা পোষাবে না দেখ্‌ছি! দিনরাত উচ্চনিনাদে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। রেডিয়ো ভাল জিনিষ, খুবই ভাল—আধুনিক বিজ্ঞানের একটা অভূতপূর্ব্ব দান। সবই মানছি। কিন্তু তবু, বরাতের দোষে, এই রেডিয়োটাই এখন হয়ে পড়েছে আমার দু কা'নের বিষ। যখনই কোন কাজে—লেখাপড়ার কাজে—মন দিয়েছি, তখনই পাশের বাড়ী থেকে রেডিয়োর স্বরধ্বনি অসুরের মত হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ ক'রে এসে পড়ে। ওর কর্কশ ধ্বনি আমার কাজে ব্যাঘাত জন্মায়।

এই তো সেদিন; যেই আমি একটা গল্প লেখার উপক্রম করেছি, একটা প্লটও ঠিক ক'রে ফেলেছি, এমন কি প্যাডের পাতা খুলে ফাউণ্টেন্ বাগিয়ে প্রায় উদ্যতই আর কি, এমন সময়ে রেডিয়োর স্বরতরঙ্গ ভেসে এল, আমার গল্প-টল্প সব গুলিয়ে গেল—লেখাটেখা সমস্তই ভাসিয়ে নিয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে।

এমন ক'রে আর পারা যায় না।

ওদের কতই না অনুনয় করেছি, "মশাই, জানেন, আপনার রেডিয়োটার জন্যে আমার কত ক্ষতি হচ্ছে জানেন তা? যেই না একটা গল্প ফাঁদি, অমনি আপনার রেডিয়োর ফাঁদে পড়ে মারা যাই- "

ওঁদের সবিস্মিত জবাব,—"কেন, গল্প ফাঁদ্‌তে যান কেন?"

"বাঃ, আমি যে একজন গল্প-লিখিয়ে, জানেন না বুঝি?"

"না তো! কিন্তু দরকার কি গল্প লেখ্‌বার? পড়বার জন্যেই তো? রেডিয়োতেই তো কত চমৎকার চমৎকার গল্প বলে, বসে বসে তাই শুন্‌লেই পারেন। কষ্ট ক'রে আবার লিখ্‌তে যাবার কী দরকার?"

এ কথার জবাব দেওয়া শক্ত।

অবশ্যি, এ কথার একটা জবাব ছিল, পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের এই কথারও। আমাদের ওপরের ভাড়াটেরাই তাই দিলেন।

তাঁরাও একদিন একটা রেডিয়ো কিনে আন্‌লেন।

এখন এঁদের দু'জনের 'উতোর গাওয়ার' ঠেলায় আমি তো প্রায় কাবার হবার যোগাড়!

ওপরের ভাড়াটেদের মেয়েরা আবার রেডিয়োর সঙ্গে নাচ্‌তেও সুরু ক'রে দিয়েছে। ধুপ্‌ধাপ্, ধপাধ্‌প্, ধাপুস্ ধুপুস্ লেগেই রয়েছে।

সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য—অনেকটা জলপ্লাবনের সঙ্গে ভূমিকম্প, বন্যার সঙ্গে মহামারির মতই ভয়াবহ। প্রায় তেমনিই মারাত্মক।

কাঁহাতক্ আর সওয়া যায়? অস্থির হয়ে ওপরে ছুটলাম।

সমস্ত শুনে, ওপরের ভদ্রলোক বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "বুঝেছি, রেডিয়োটায় আপনার বড্ড অসুবিধা হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, গল্প লিখ্‌তে বসতেই পারৃছি নে—"

"বুঝেছি, আপনার গল্প লেখার ব্যাঘাত হচ্ছে। কিন্তু কি করৃব বলুন, আমি সবে নতুন রেডিয়োটা এনেছি, একটু সদ্ব্যবহার করৃব না? তা ছাড়া, আমার বড় মেয়ে শিখ্‌ছে গান, ছোট মেয়েরা নাচ, ওই রেডিয়ো থেকেই। আর আমার ছেলে শিখ্‌ছে রিসাইটেশান্। আর আমি মার্কেট্ রিপোর্ট্ শুনি—বাজারের খবর একটু-আধটু রাখ্‌তে হয় কি না আমায়!"

আমি মুষ্‌ড়ে প'ড়ে ওপর থেকে নেমে আসি। ম্লান মুখে নিরুত্তর হয়ে নামি। এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু বাবার আবার এ বাড়ীটাই ভারী পছন্দ—এ রকম আলো-হাওয়াওলা পূব-দক্ষিণ-খোলা বাড়ী নাকি বিরল—কলকাতায় আর দু'টি নেই। বাড়ী বদ্‌লাবার কথা বল্লে তিনি মারৃতেই আসবেন। এ-বয়সেও বাবাকে আমার ভারী ভয়। হ্যাঁ, বাবার মারকে বিশেষতঃ। বাবা আমার যা বদ্‌রাগী, বাবাঃ!

কিন্তু কিছু একটা করৃতে হবে তো? এ রকম পড়ে পড়ে মার খেয়ে ক'দিন চলে?

ভেবে ভেবে একটা উপায় বার করৃলাম। একটা জবর বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল, এইবার, হ্যাঁ, এইবার।

আজ রাত্রেই, সব নিশুতি হ'লে এ পাড়ার রেডিয়োর তারগুলোকে খচাং ক'রে কেটে দেব গিয়ে।

বারোটা বাজ্‌তেই উঠে পড়লাম।

আমাদের বাড়ীরটাকে আগে সাবাড় করতে হবে। তার পর আমাদের ছাদ থেকে লাফিয়ে গিয়ে ও-বাড়ীরটাকে শেষ করব।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করলাম। ভয়ে বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। সাহসে বুক বেঁধে, পা টিপে টিপে, অনেক কষ্টে ছাদে গিয়ে পৌঁছলাম। বাঁশের মাথায় তারটা জড়ানো। কিন্তু সহজে কি কাটে ছাই? অত মোটা তারকে কিছুতেই কাটা যায় না।

যা হোক্, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে কোন রকমে তো তারটাকে কাটা গেল।

তার পর আর একটার দিকে নজর দিলাম। ও বাড়ীর দিকে। ছাদের কার্নিশের ওপরে দাঁড়ালাম। এখান থেকে এক লাফে—বেশ সন্তর্পণে—নিঃশব্দ এক লাফে পাশের ছাদে যেতে হবে। যদি সশব্দে গিয়ে পড়ি—পাশের ছাদেই কি, আর নীচের খাদেই কি, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ! হাড়গোড় কিছুই আস্ত থাকৃবে না। ধরা পড়্‌লে তো মারধোরেই মারা যাব, আর যদি নীচে গিয়ে পড়ি, তা হ'লে তো কেবল নিজের ধাক্কাতেই খতম্।

যাক্, অতি কৌশলে তো পাশের ছাদে গিয়ে পড়লাম। প্রায় নিঃশব্দেই। অনেক কষ্টে এ-তারটাকেও কাটা গেল।

এই সব সমাধা ক'রে নিজের বিছানায় ফিরৃতেই, ঢং ঢং ক'রে তিনটা বেজে গেল।

যাক্, এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে তোফা একখানা ঘুম! সকাল দশটা পর্য্যন্ত। কাল থেকে আর রেডিয়োর উৎপাৎ নেই।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছি; কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, জানি নে; ভয়ানক সোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

য়্যাঁ! এ কি, রেডিয়োর আওয়াজ নাকি! তাই তো, রেডিয়োর আর্ত্তনাদ বলেই মনে হচ্ছে যেন—!

রেডিয়ো আবার এল কোত্থেকে?

ভয়ঙ্কর আওয়াজ ছেড়েছে দেখ্‌ছি!

লাফিয়ে উঠে বস্‌লাম বিছানায়। এ কি, আমারই ঘরে, আমারই মাথার কাছে রেডিয়ো বসানো!

কী সর্ব্বনাশ!

সাম্‌নেই একটা চেয়ারে বাবা ব'সে—সহাস্যবদনেই ব'সে—"দেখ্‌তো রে মন্টু! দেখ্‌তো রে এটা কেমন হয়েছে? আজ সকালেই আমার এক বন্ধুর দোকান থেকে খুব সস্তাতেই কিনে এনেছি। ভালোই হ'ল, কি বলিস্? যুদ্ধের খবর-টবর বেশ শোনা যাবে এর পর থেকে।"

আগামী সংখ্যায়

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য-নাট্য

"কালো বিদ্যুৎ"

ছুটির ক'দিন

[ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এস্-সি (ক্যাল্), পি-এইচ্.ডি (ক্যাণ্টাব্)]

[পায়ে হেঁটে ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম দিক্‌টায় বেড়াতে বেরিয়েছি; উকি হোল্‌স্ হোষ্টেলে রাত কাটিয়ে চেদারের কাছে বিখ্যাত গফ্ কেভ্ আর কক্স কেভ্ দেখে ফিরে আসবার পথে আমার কাহিনী বন্ধ রেখেছিলাম। তার পর শোন :]

এইবার হোষ্টেলের কাছেই আর একটা গুহা দেখতে গেলাম। এই গুহাটির নাম উকী হোল (Wookey Hole) আর এই গুহার নামের জন্য কাছের গাঁয়ের নামটিও ঐ। গফ্ কেভের কাছে অবশ্য এ গুহা কিছু নয়। তবে এর একটু বৈশিষ্ট্য আছে আর তা ছাড়া আছে একটু ইতিহাস। এখানকার কিম্বদন্তী হচ্ছে যে আগে এই গুহায় এক ডাইনী থাকত। এর উৎপাতে আশপাশের লোকেরা উত্যক্ত হয়ে গাঁয়ের পাদ্রী মশায়কে গিয়ে ধরল যে মশায়, বাঁচান, আর ত পারা গেল না। পাদ্রী মশায়ও তাই শুনে বীরদর্পে গুহায় ঢুকে জর্ডনের জল ছড়িয়ে ডাইনীকে দিলেন পাথর করে। এখন, গুহার ভেতর একটা প্রকাণ্ড ষ্ট্যালাগ্-মাইটের ঢিপি আছে, দেখতে অনেকটা সেটা একটা বুড়ীর মতন। এখানকার লোকেরা বলে যে ঐটাই সেই ডাইনী বুড়ী। গল্পের কতখানি সত্য বলা শক্ত, তবে এটা ঠিক যে যখন বছর পঞ্চাশেক আগে গুহাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় তখন একটি মেয়ের কঙ্কাল এর ভেতর পাওয়া গিয়েছিল। কাজেই হয়ত বহু বছর আগে এখানে কোন গরীব বুড়ী থাকত আর গাঁয়ের লোকের অত্যাচারে তাকে হয়ত এখানেই প্রাণটা হারাতে হয়েছিল।

উকী হোল কিন্তু অন্যান্য গুহার মতন এত পুরোনো নয়। এর মধ্যে যে সব হাড়গোড় পাওয়া গেছে তার কোনটা হাজার দু'য়েক বছরের বেশী পুরোনো নয়। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। এই গুহাটি প্রকৃতপক্ষে একটি গুহা নয়, তিনটি পাশাপাশি গুহা নিয়ে এটা তৈরী। তার মধ্যে প্রথম আর তৃতীয় গুহার মধ্যে দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। হাজার দু'য়েক বছর আগে হয়ত এই নদীটি সমস্ত গুহাটা যুড়ে ছিল, কাজেই মানুষ বা কোন জন্তু-জানোয়ারের এর মধ্যে থাকা সম্ভব হয় নি। মোট কথা হচ্ছে যে অন্যান্য গুহার তুলনায় এটি নিতান্তই শিশু। কিন্তু শিশু

হ'লেও এটি নেহাৎ ছোট নয়। যে তিনটি গুহা নিয়ে এটি তৈরী তার মাঝেরটি উঁচু প্রায় এক শ' ফুট আর শেষেরটি আড়ে প্রায় এক শ' গজ হবে। এই শেষ গুহাটির মধ্যে নদীটি বেশ গভীর,—প্রায় দশ ফুট হবে। কিন্তু জল খুব পরিষ্কার, নীচের বালি, কাঁকর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গুহাটির আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে অন্যান্য গুহার মতন এটি অন্ধকার নয়। উপর থেকে ফাটলের ভিতর দিয়ে সূর্য্যের আলো ঢুকে গুহাগুলিকে বেশ আলো করে রেখেছে। কিন্তু আলোর রংটি হচ্ছে নীল, কাজেই নদীর জলও সুন্দর নীল রংএর দেখাচ্ছিল। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে এদিকে বিশেষ বৃষ্টি হয় নি। সেই সময় নদীর জল খুব কমে যায় আর তখন দেখা যায় যে শেষ গুহাটির পেছনেও আর দু'টি ছোট ছোট গুহা আছে। যে বছর বেশী বৃষ্টি হয় সেই সব বছরে এই ছোট গুহাগুলি জলে একেবারে ভর্ত্তি থাকে।

উকী হোলে বিশেষ ষ্ট্যালাগ্‌সাইট বা ষ্ট্যালাগ্‌মাইট নেই। তার এক কারণ—এটি হচ্ছে নেহাৎ সেদিনের গুহা, আর একটি কারণ হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজা এর ষ্ট্যালাগ্‌সাইট ও ষ্ট্যালাগ্‌মাইটগুলি ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, টুইকেন-হ্যামে (Twickenham) তাঁর প্রাসাদের বাগানে একটি গুহা তৈরী করে সাজাবার জন্য। খুব সম্ভব সেই ডাইনীকে মারতে এসে পাদ্রী সাহেব এর ভেতরের সমস্ত শোভা দেখে গিয়ে কোন রকমে রাজাকে জানিয়েছিলেন, তাই এ রকম কাণ্ড ঘটেছিল। তার পর এ চার শ' বছরে এ সব জিনিষ আর কতটুকুই বা বাড়তে পেরেছে? আমাদের আগের দেওয়া হিসাব মতন মাত্র চার ইঞ্চি—সেটুকুর বাহার আর কিই বা হবে!

এই দেখা শেষ হবার পর আবার হোষ্টেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যাও হয়ে গিয়েছিল। খেয়ে নিয়ে হোষ্টেলের অন্যান্য মেম্বরদের সঙ্গে গল্পগুজব করা গেল। কাল দেরীতে আসার জন্য কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি নি। কালকের দলের অনেকে আজ চলে গিয়েছে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় নূতন লোকও অনেক এসেছে। নিজের নিজের বেড়াবার কথা সবাই বল্‌লে, আর কে কোথায় এর পরে যাবে বা কোথা থেকে আসছে সে নিয়েও আলোচনা হ'ল। এই সব গল্পগুজবের ভিতর

দিয়েই ভবিষ্যতে নিজের প্রোগ্রামও ঠিক করে নেবার সুবিধা হয়। এই সব কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে কখন রাত দশটা বেজে গেছে কারুর হুঁস ছিল না। বাড়ীর গিন্নী এসে মনে করিয়ে দিলেন যে আলো নিভাবার সময় এখন, কাজেই সভা ভঙ্গ করে যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

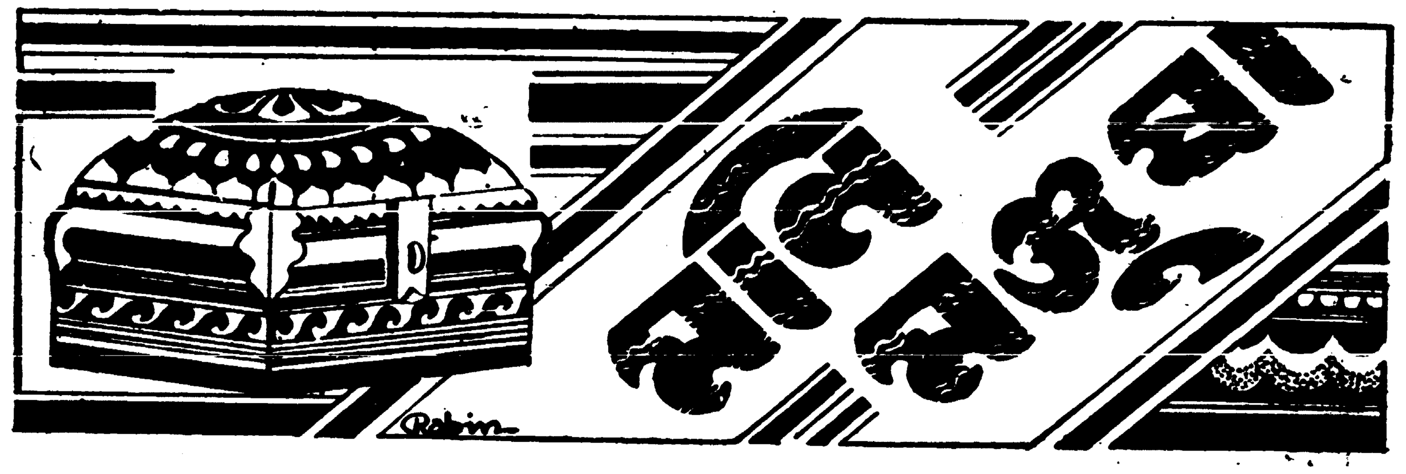

[এই বিভাগে পৃথিবীর নানা দেশের নাম-করা বইগুলির সারাংশ প্রকাশিত হবে।]

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

হার্ট্ অব্ মিড্‌লোথিয়ান্

[এই উপন্যাসখানি লিখেছেন বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যর ওয়াল্টার স্কট্। ইংরাজী সাহিত্যকে অসামান্য নতুন দানে ইনি সমৃদ্ধ করেন। এঁর কতকগুলি ভাল উপন্যাসের নাম—আইভ্যান্ হো, কেনিল্‌ওয়ার্থ, রব্ রয় ইত্যাদি। এঁর জন্ম ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে।]

রুবেন বাটলার আর জেনি ডিন্‌স্ একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। বাটলার ছেলে, আর জেনি মেয়ে। থাকত তারা পাশাপাশি বাড়ীতে। বাটলারের মা বাবা কেউ ছিল না, খুব কষ্টে তার দিন কাটত। জেনির বাবা ডেভিড ডিন্‌স্ ছিলেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং ভদ্রলোক। তিনি রুবেন বাটলারকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। বাটলার আর জেনির মধ্যে ছিল খুব ভাব, তারা একসঙ্গে খেলত, একসঙ্গে পড়াশুনা করত। ঠিক ছিল বড় হ'লে তাদের বিয়ে হবে।

দিন কাটতে লাগল। রুবেন বাটলার লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। আর তার ইচ্ছে ছিল পাদ্রী হবার। তাই একদিন তার গ্রাম ছেড়ে, জেনি আর তার বাবাকে ফেলে রুবেন বাটলার চলে গেল শিক্ষা লাভ করতে।

এদিকে জেনির বাবা আর একবার বিয়ে করলেন। জেনির আর একটি ছোট বোন হ'ল। তার নাম রাখা হ'ল এফি। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এফির রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—ও রকম সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

কিন্তু একদিন এফি পড়ল ভয়ানক বিপদে। কোন গুরুতর অপরাধ করার জন্যে তাকে বন্দী করে রাখা হ'ল কারাগারে—সে কারাগারকে বলা হ'ত হার্ট অব্ মিড্‌লোথিয়ান্। জেনি আর ডেভিড এ ব্যাপারে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল। এফি কিন্তু অপরাধ অস্বীকার করল। এ অপরাধে এফির আর একজন সঙ্গী ছিল। কিন্তু সে লোকটি যে কে সে-খবর্ কেউ জান্‌ল না। এফি কাউকে কোন কথা বল্‌ল না।

এর মধ্যে রুবেন বাটলার শিক্ষা শেষ করে ফিরে এল। এফির ব্যাপার শুনে সে ভেবে পেল না কি বলে ডিন্‌স্ পরিবারকে সান্ত্বনা দেবে। শুধু বল্‌ল, 'ঈশ্বর আপনাদের সুখী করবেন।'

জেনি এফির সঙ্গে হার্ট্ অব্ মিড্‌লোথিয়ানে দেখা করার সুযোগ খুঁজতে লাগল। যদি এফি কিছু স্বীকার করে অথবা অপরাধের সব কথা খুলে বলে জেনিকে—তা হ'লে হয়তো একটা উপায় হ'তে পারে।

অনেক চেষ্টা করার পর কারাগারে দুই বোনের দেখা হ'ল।

জেনি বল্‌ল, 'এফি, কেন তুমি কিছু বল্‌লে না আমায়? কেন, কেন? তুমি কি জান না ছেলেবেলা থেকে নিজের হাতে আমি তোমায় মানুষ করেছি—'

'কেমন করে তোমায় আমি বল্‌ব দিদি', এফি বল্‌ল, 'আমার যে কোন উপায় ছিল না, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কাউকে কিছু বল্‌ব না।'

জেনি এফিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মাঝে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আগেই বলেছি এফির অপরাধের একজন সঙ্গী ছিল। সে লোকটির নাম রবার্টসন। এই রবার্টসন জেনির সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা করে বলেছিল বিচারের সময় মিথ্যা কথা বলে এফিকে বাঁচাতে। জেনি জানত যে রবার্টসনের সঙ্গে এফির খুব ভাব।

জেনি বলতে লাগল, 'যদি তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলতে তা হ'লে তোমাকে এমনি দুঃসহ দুঃখ সহ্য করতে হ'ত না।'

এফি অবাক্ হয়ে বল্‌ল, 'কেউ কিছু বলেছে নাকি তোমায়?'

'প্রত্যেকেই বলছে।'

যে কারাপ্রহরী দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে সে বল্‌ল, 'এ কথা নিশ্চয়ই রবার্টসন বলেছে।'

'দিদি, সত্যি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে নিজে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

'তুমি তো জান না দিদি কি রকম বিপন্ন তার জীবন। কি সে করতে বলেছে তোমায়?'

'মিথ্যা কথা বলে তোমায় বাঁচাতে।'

'কি উত্তর দিলে তুমি তাকে?'

'মিথ্যা!' জেনির কণ্ঠস্বর, 'মিথ্যা! সে যে পাপ এফি!'

'ঠিক বলেছ দিদি, মহাপাপ করে আমায় বাঁচাবার কি প্রয়োজন?'

'রাগ ক'র না এফি, আমি যে মনেপ্রাণে কিছুতেই রাজী হ'তে পারছি না।'

'থাক দিদি, আমি চাই না যে একটা ফড়িংও মিথ্যা বলে আমায় বাঁচায়। আমার মত লোকের জীবনের কি মূল্য?'

একটু পরে জেনি কারাগার থেকে বিদায় নিল।

তার পর সুরু হ'ল এফির বিচার। জেনি এবং তার বাবা ডেভিড্ ডিন্স্ উপস্থিত হ'ল যথা সময়। এফি দাঁড়াল কাঠগড়ায়। কী করুণ মিনতি তার চোখে—সে-দৃষ্টি যেন জেনিকে বলছে, বাঁচাও, যেমন ক'রে হোক আমাকে বাঁচাও।

জেনি উঠে দাঁড়াল। তাকে এবার আসামীর সম্বন্ধে বলতে হবে। একটিবার, শুধু একটিবার মিথ্যা বল্‌লেই এফি রক্ষা পায়। কিন্তু কেমন করে সে তা' বলবে? জেনি জানে না মিথ্যা কথা বলতে। আর একটু আগে সে বিচারপতির সামনে প্রতিজ্ঞা করেছে, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলব না। তবে? জেনি বলে ফেল্‌ল, 'আমি কিছু জানি না, এফি কিছুই স্বীকার করে নি আমার কাছে।'

ডেভিড ডিন্স্ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, এফি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, বিচারালয় বিচলিত হ'ল। জেনি মিথ্যা বলতে পারল না। এফিকে আবার নিয়ে যাওয়া হ'ল কারাকক্ষে, মুক্তি পাওয়া বুঝি তার কপালে নেই।

কিছুক্ষণ পরের কথা। এফি চুপ করে বসেছিল কারাগারে। এমন সময় জেনি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, 'দুঃখ ক'র না এফি, তুমি বাঁচবে, আমি তোমাকে মরতে দেব না—দেব না, কোনমতেই না, আমি যাচ্ছি রাজার কাছে, সব কথা আমি তাঁকে বল্‌ব, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্ষমা করবেন।' জেনি বিদায় গ্রহণ করল।

জেনি যাত্রা করল লণ্ডনে—রাজার উদ্দেশ্যে। যাবার পথে সে দেখা করল রুবেন বাটলারের সঙ্গে। সে তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। রুবেন কিছুতেই জেনিকে একা ছাড়তে চায় না—জেনিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে জেনির একা যাওয়াই ঠিক হ'ল। রুবেন বাটলার তাকে অনেক উপদেশ দিল যাবার সময়। জেনি যাত্রা করল।

অনেক কষ্টে, বহু বিপদের হাত এড়িয়ে জেনি পৌঁছল লণ্ডনে এবং রাণীর সঙ্গে দেখা করার

সৌভাগ্য তার হ'ল। রাণী দয়াবতী—জেনির সমস্ত কথা তিনি মন দিয়ে শুনলেন এবং রাজাকে এফির মুক্তির জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করবেন কথা দিলেন।

রাণীর অনুরোধে কাজ হ'ল। কয়েকদিন পর জানা গেল এফিকে ক্ষমা করা হয়েছে। তবে চোদ্দ বছর হ'ল তার নির্ব্বাসন দণ্ড।

যাক্, নির্ব্বাসন দণ্ড হ'লে কি ক্ষতি? এফি প্রাণে বেঁচেছে তো! মহানন্দে জেনি বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

কিন্তু বাড়ী ফিরে সে শুনল এফি নেই। তবে কি সে মরে গেছে? না, সে চলে গেছে অনেক দূরে—তার বাবা, তার দিদিকে ফেলে সেই রবার্টসনের সঙ্গে।

এদিকে রুবেন বাটলার ভাল হয়ে উঠল। তার পর এক শুভদিনে তার সঙ্গে জেনির বিয়ে হয়ে গেল।

অনেক দিন পর এফির খবর জানা গেল। সে রবার্টসনকে বিয়ে করেছে। রবার্টসন খুব বড় বংশের ছেলে। রাজবিদ্রোহী ছিল বলে ছদ্মনাম নিয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল—তার আসল নাম ষ্টান্‌টন্।

রাজবিদ্রোহ থেকে ষ্টান্‌টন্ মুক্ত হ'ল। এফির সঙ্গে আবার জেনির দেখা হ'ল। খুব সুখে দুই বোনের দিন কাটতে লাগল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

(শ্রীগৌরী দেবী)

হান্‌চ্ ব্যাক্ অফ নত্‌রদাম—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইউ.এন্. ধর এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১৲।

ফরাসী লেখক ভিক্‌তর হুগোর অমর উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ নিয়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে সরল ঝরঝরে ভাষায় এই সুন্দর বইখানি লেখা হয়েছে। তোমরা পড়ে দেখ।

মামার জন্মদিন—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত, শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী বিচিত্রিত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম ৷৷০।

এতে শিবরাম বাবুর তিনটি নতুন গল্প আছে। এক-একটি গল্প এক-একটি হাসির ফোয়ারা। শিবরাম বাবুর অপরূপ রচনাভঙ্গীর সঙ্গে শৈল বাবুর ছবিগুলিও সমানে পাল্লা দিয়েছে।

বৈশাখ সংখ্যা তোমাদের অনেকেরই ভাল লেগেছে লিখেছ। তোমাদের আরও অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। চিঠি হিসাবে সেগুলি বেশ "মিষ্টি" সন্দেহ নেই কিন্তু রামধনুতে প্রকাশের মত কোন নতুন কথা তার মধ্যে না থাকায় সেগুলো প্রকাশিত হ'ল না।

গেল বারের প্রতিযোগিতায় যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল। বৈশাখের প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী সংখ্যায় বেরোবে।

—রাঃ সঃ

শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত
(কবিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন)

শ্রীমান্ হরিহর মজুমদার
(ছবির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন)

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

হতাশা

[রামধনুর কবিতা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত]

(শ্রীসুজাতা গুপ্ত)

সেদিন ভোরে চিতুরাণীর
আগেই ভাঙ্গে ঘুম,
মাস-পয়লা! মনের মাঝে
তাই তো এত ধুম।
সাতটি রংএর রাঙা সাথী
আজ আসিবে যে,
পাতায় পাতায় মধুর-পরশ—
হর্ষে ভাসে যে।
খানিক পরে - ঠুন্-ঠুন্ ঠুন্
শব্দ বাহিরে,
এসে গেছে 'রামধনু' তার
ভাবনা নাহিরে।
তর-তরিয়ে ঝর্ণা-বেগে
চিতু সিঁড়ি নামে,
আচম্বিতে পিছু-ডাকে
তাহার গতি থামে।

শুভ কাজের মুখে বাধা!
চিতু রেগে লাল,
কুঁচ্‌কে ওঠে ছোট্ট কপাল,
ফুলে ওঠে গাল।
পেছন ফিরে দেখ্‌তে পেলে
চাকর বনমালী,
ফ্যাক্-ফেকিয়ে বোকার মত
হাস্‌ছে খালি খালি।
বলে—'দিদি, আস্তে নাবো
পড়বে ভেঙে পা',
ভেংচি কেটে বল্লে চিতু
'বকিস্‌নে কো যাঃ।
'সর্দ্দারী তোর সবই কাজে—
আস্ত একটি ফুল',
ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী চিতু—
ইংলিশে নেই ভুল।

অধীর হয়ে চিতুরাণী
খুল্‌লে দ্বারের খিল,
পিওন তাহার হাতে দিল
টেলিফোনের বিল।
কোন মতে চেপে নিল
ডাগর চোখের জল,
কাগজখানি রইল পড়ে
ছিন্ন ফুলের দল।
পেছন ফিরে পালিয়ে এলো
চিলে কোঠার ছাদে,
ঠোঁটের ওপর ঠোঁটটি দিয়ে
ফুলে ফুলে কাঁদে।
খানিক পরে ভাব্‌তে থাকে
হাতে রেখে গাল,
আজ আসে নি কি হবে তা
আসবে বোধ হয় কাল।
কিন্তু যে হায়—কেটে যে যায়
দিনের পরে দিন,
চিতুর মুখে হাসিখুসী
হয়ে এলো লীন।
পড়াশোনা সবই গেল
শুধু ভাবে বসে,
স্কুলে গিয়ে জ্বালা অনেক—
বকুনী খায় কষে।
ফুলো ফুলো গাল দুটি তার
শুক্‌নো হয়ে এলো,
চোখে বহে অঝোর-ধারা,
চুলও এলো-মেলো।
ছোড়দি বলে 'ওরে চিতু,
কি হ'লো রে তোর?'
দাদা বলে 'মাথার ঘিলু
নড়ে গেছে ওর।'
কথার জবাব দেয়নাকো ও
শুধু ভেবে যায়,
এই জগতে সবই মায়া—
সবই বৃথা হায়।
দাদা-দিদি-বন্ধু-সাথী
সবাই সমান কালো,
এবার থেকে 'কারুক্ষে' ও
বাস্‌বে না আর ভালো।
দেখ্‌তে চাহ তার চেহারা?
আমার সাথে এসো,
হেসো নাকো নেহাৎ বরং
খুক্‌খুকিয়ে কেসো।

কলকাতার হকি লীগ্ যথা সময়ে শেষ হয়েছে। ১ম বিভাগে এ বছর চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে বি. জি. প্রেস। মিলিটারী মেডিক্যাল্‌স্ দল হয়েছে রানার্স্ আপ্। হকিতে দুর্দ্ধর্ষ কাষ্টম্‌স্ দল শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করতে পারে নি।

লীগের পরেই হয় বেইটন্ কাপ্ প্রতিযোগিতা। কলকাতা ফুটবলে যেমন আই-এফ্-এ শীল্ড্, হকিতে তেমনি বেইটন্ কাপ্। ভারতের নানা জায়গা থেকে অনেক শক্তিশালী দল এবারকার এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। ধ্যানচাঁদ সহ "ঝান্সী হিরোজ্"ও এসেছিল। ফাইনাল হয় ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স্ ও ভগবন্ত ক্লাবের মধ্যে। এই খেলায় ভগবন্ত ক্লাব্ খুবই ভাল খেলেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জয়ী হতে পারে নি। এবারকার 'বেইটন্' বিজয়ের সম্মান ভূপালের ভাগ্যেই জুটেছে।

বেইটন্ কাপ্ প্রতিযোগিতার সঙ্গে দু'টি প্রদর্শনী হকি ম্যাচেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। "অল্ ইণ্ডিয়া"ও "অবশিষ্ট" দলের মধ্যে একটা, আর "বাংলা" ও "অবশিষ্ট" দলের মধ্যে একটা। ধ্যানচাঁদ এ দু'টি খেলাতেই যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমটায় ভাল করলেও শেষেরটায় তিনি বিশেষ বাহাদুরী দেখাতে পারেন নি।

* * *

হকির পর ফুটবল্ লীগ্‌ও সুরু হয়েছে। গত বার আই-এফ্-এর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ইষ্ট বেঙ্গল, কালীঘাট ও মহামেডান স্পোর্টিং দল লীগের শেষ দিকে আই-এফ্-এর সংশ্রব ত্যাগ করে যায় এবং বি. এফ্-এ নামে আর একটি সমিতি গঠিত করে। বি. এফ্-এর উদ্যোগে ব্র্যাবোর্ণ কাপ্ খেলা হয়। এবার লীগের গোড়ায় আই-এফ্-এর সঙ্গে এই তিন দলের একটা মিটমাটের চেষ্টা হয়। তার ফলে ইষ্ট বেঙ্গল ও কালীঘাট আবার আই-এফ্-এ তে ফিরে এসেছে, কিন্তু মহামেডান স্পোর্টিং এখনও আই-এফ্-এর সর্ত্তে রাজী হয় নি। অনেকে এই নিয়ে ফুটবল মাঠে

আবার একটা গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা করছেন।

* * *

ইয়োরোপের যুদ্ধ আবার পূরোদমে সুরু হয়েছে তার আভাস গেল বারে দিয়েছিলাম। জার্ম্মান্‌রা নরওয়ের অনেকখানি অংশ দখল করে ফেলেছে। ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যেরা তাদের নানা স্থানে বাধা দিয়েছিল, এবং নরউইজিয়ান্‌রাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু জার্ম্মান্‌রা বিশেষ কাবু হয় নি, এবং সম্প্রতি বহু ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্টে এই নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে।

ওদিকে ইটালিও যে বেশী দিন চুপ্ করে থাকবে তা মনে হচ্ছে না। ভূমধ্য-সাগরের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে তারাও ইতিমধ্যে হাঁকডাক সুরু করেছে। ফলে ব্রিটীশ জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগর ছেড়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসতে আরম্ভ করেছে।

* * *

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর ইহলোকে নেই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম জানে না এমন লোক বাংলার শিক্ষিত সমাজে কমই আছে। বহুভাষাবিদ্ বলে তাঁর নাম ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। বড় বড় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি একাধিক বার সভাপতিত্ব করেছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক-গুলি বইও লিখে গেছেন, তার মধ্যে অর্দ্ধসমাপ্ত বঙ্গীয় মহাকোষ বা বাংলা 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * *

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী নৈহাটীর কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রামে। তোমরা শুনে সুখী হবে কাঁঠালপাড়ায় যে বৈঠকখানা ঘরে বসে তিনি তাঁর বেশীর ভাগ বই রচনা করেছিলেন সে ঘরখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে কিনে নেওয়া হয়েছে এবং তার আমূল সংস্কার ক'রে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি মহা সমারোহে এই বঙ্কিম-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব হয়ে গেছে। তোমরা যারা ই. বি. আর লাইনে যাতায়াত কর তারা নৈহাটীর একটু আগে (কলকাতার দিকে) ট্রেন থেকেই এই বাড়ীখানি দেখতে পাবে।

* * *

কলকাতার রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটির নাম সকলেই শুনেছ। এই সমিতির গ্রন্থাগারে গত ১৫০ বছর ধরে বহু দুষ্প্রাপ্য বই আর হাতে লেখা পুঁথি

সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি জানা গেছে কর্ম্মচারীদের অসতর্কতায় অসংখ্য মূল্যবান্ পুঁথি পোকায় কেটে নষ্ট হয়ে গেছে। খবরটা যার পর নাই শোচনীয় সন্দেহ নেই।

* * *

গত ২৫শে বৈশাখ কবি রবীন্দ্রনাথের বয়স আশী বছর পূর্ণ হ'ল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এ দিন যেন বার বার ফিরে আসে;—বছরের পর বছর ধরে কবি যেন তাঁর অক্ষয় রসভাণ্ডার থেকে অফুরন্ত মধু পরিবেশন করে যেতে পারেন।

* * *

১০ই মে'র যুদ্ধের খবর—জার্ম্মেনী হল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম্ ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করেছে।

খোস-খবর

অটোগাইরো আবিষ্কার করেন ডি-লা-সিয়ার্ভা। এই এরোপ্লেনগুলোর প্রপেলার থাকে মাথার ওপরে আর ঘোরে মাটীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। ফলে এরোপ্লেন সোজা ওপরে উঠে যেতে পারে,—মাটীর ওপর দিয়ে খানিকটা ছুটতে হয় না।

* * *

নয়া দিল্লী বা নিউ দিল্লী সহরের নক্সা পরিকল্পনা করেছিলেন স্যর এডউইন লুটিয়েন্‌স্। ১৯১১ সনে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি এর ভিত্তি স্থাপন করেন; আর উদ্বোধন করেন ডিউক্ অব্ কনট্ (সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের কাকা) ১৯২৯ সনে। নিউ দিল্লী পাঁচ বর্গ মাইল জায়গা নিয়ে তৈরী। খরচ ধরা হয়েছিল ১৪ কোটি টাকা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মাসী, সীমা, মজা, জাম, বাসে, সেবা, থাক; কথা, রও, ওর, বস, সব।

উত্তরদাতাদের নাম

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (বাতু) (হাওড়া); অজিতকুমার সান্যাল, কল্যাণী, মিহির (পাবনা); শক্তিমান মুখোপাধ্যায় (নশিগ্রাম); নিরঞ্জন মজুমদার (নাটোর); সুনীলা বসু (নাগপুর); পঞ্চানন দাস (ত্রিবেণী); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); রাণী রায়, রেণু, বেণু প্রভৃতি (লালমণিরহাট); পীযূষ ঘোষ, ভবানী চাটার্জ্জী (দিনাজপুর); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); সুধাংশুরঞ্জন বক্সী (ভবানীপুর); নীলা মুস্তাফী (কালীঘাট); সুধীর, সুপ্রিয়া, মঞ্জুশ্রী (ছাপরা); সরোজকুমার মল্লিক (হাজারীবাগ); কালিদাস পাল (বালুভরা); রমলা নন্দী (শিলং); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (পাটনা); লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি (পাটনা); সুরমা রায় (খড়্গপুর); অমূল্যধন শর্ম্মা (কলিকাতা ৮); বেলা, সিপ্রা, প্রবীর প্রভৃতি (পাতিহাল); রামপ্রসাদ কুশারী (কুমিল্লা); শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (এটাওয়া); সুজাতা ভাদুড়ী ও শীতল কুমার ভাদুড়ী (শ্রীরামপুর); সুমিতা রায় চৌধুরী (গিরিডি); নীলয় মজুমদার, চন্দ্রাদিদি, দাদুভাই প্রভৃতি (কলিকাতা); অনিল, শান্তি, কান্তি প্রভৃতি (চাঁদপুর): রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদনের সভ্যগণ (সালকিয়া); পাঁচুগোপাল বসু ; তপনেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (ময়মনসিংহ); গিরীন্দ্রনাথ রায় (নৈহাটী)।

নূতন ধাঁধা

তোমরা বুঝি মনে করছ আমি দাঁড়িয়ে আছি? একদম ভুল ধারণা তোমাদের। আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছি!

কি বল্‌ছ? চাবি দিয়ে আমায় আটকে রাখবে? অসম্ভব।

আমাকে ভয় কিসের? আমার গায়ে কাঁটা দেখে? কিন্তু আমি তো সজারু নই, যে কাছে এলে কাঁটা বিঁধিয়ে দেব!

আমি কি বলতে চাই? সব কথা কি জোরে বলা যায়? কান এগিয়ে আন, চুপি চুপি বল্‌ছি।

কি বল্‌ছ? আমাকে চিনতেই পার নি? আচ্ছা, ২০ তারিখ পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, ভেবে দেখ।

নেপোলিয়ান্
[শিল্পী জ্যাক্ লুই ডেভিডের আঁকা পৃথিবীর একখানি সেরা ছবি]

C. H. ARAN & CO. CAL.

চিত্র পরিচয় দেখ।

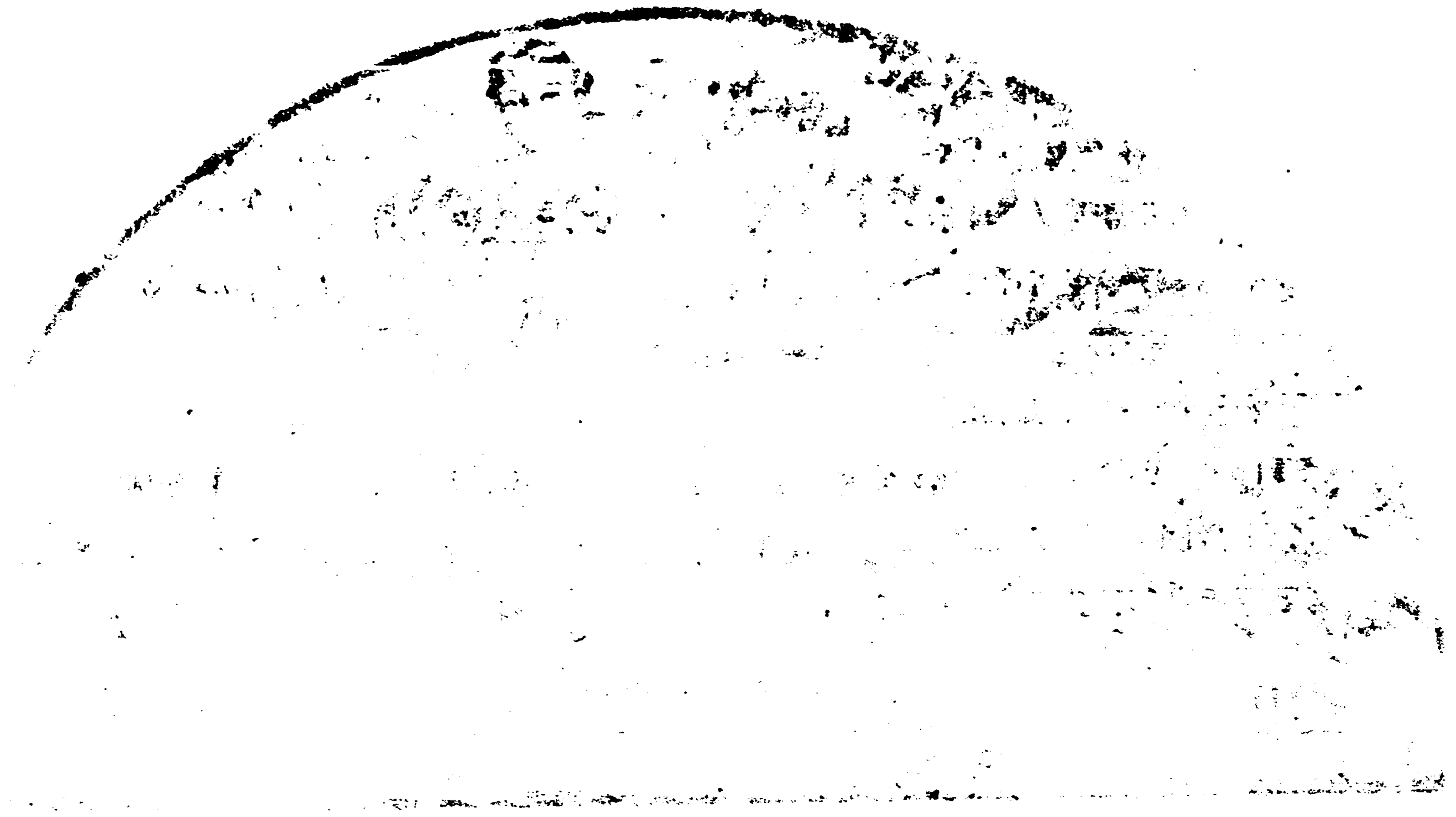

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ — আষাঢ়, ১৩৪৭ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পতঙ্গ

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

কোথায় মাতঙ্গ ভীমকায়!
কোথা ক্ষীণ রে পতঙ্গ মোর,
সুবৃহৎ সৃষ্টির পাতায়
'বর্জ্জাইসে' নাম ছাপা তোর।

স্ফূর্ত্তি যে পাখায়, দেহে, চোখে,
পরীদের 'মথ্‌প্লেন্' তুই,
উড়ন্ত জীবন্ত ফুল তোকে—
ভাবে ধরা কোন্‌খানে থুই।

জানি নাক' তোর কি যে কাজ—
    কি ভাবিস পাই নাক' ভাবি,
ওই দেহে এত কেন সাজ,
    বুঝি না-ত কি সে তোর দাবী !

ন'স তুই কাইজার, জার,
    তোর পাট শ্যামলের দেশ,
মিকাডো থাকুক ঘরে তার
    তোরও দিন কেটে যায় বেশ।

ভয়ে বিধি দেয় নি মোহর,
    আর জিভ্—পাছে বেশী চাহ,
পাও যদি বাহিনী বহর
    পতঙ্গ বনিবে পাতশাহ।

সঙ্গে যবে আন পঙ্গপাল
    ভয়েতে বেপথুমতী ভূমি,
কে বা পায় তোমার নাগাল ?
    একেবারে ডিক্‌টেটর তুমি !

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য. এম্.এস-সি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিলে ডক্টর রুদ্র কথা বলিলেন, "মিঃ চন্দ্র ! আপনি এখানে ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি !"

নীলাহীরাও কম বিস্মিত হন নাই। "মিঃ চন্দ্র, আপনি দেখছি সীমারা মশাইকে চেনেন ! ওঁর নাম কি বল্লেন ? ডক্টর রুদ্র ! আমরা এখানে ওঁর নাম দিয়েছিলাম 'সীমারা' অর্থাৎ 'অতিথি'।"

কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্র ও ডক্টর রুদ্র তখন পরস্পরের অভাবনীয় সাক্ষাতে এতটা বিভোর যে নীলাহীরার কথার দিকে ভাল করিয়া কেহই নজর দিলেন না। নীলাহীরা ব্যাপারটা বুঝিলেন, বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আপনারা যখন এত দিন পরে আপনার জনকে ফিরে পেয়েছেন তখন ভাল ক'রেই আলাপ করুন, আমি এখন আসি।"

নীলাহীরা চলিয়া গেলে অধ্যাপক চন্দ্র ডক্টর রুদ্রকে তাঁদের সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তার পর কহিলেন, "কিন্তু, আপনাকে এ ভাবে এখানে ফিরে পাব তা আমরা কল্পনায়ও আনতে

পারি নি ! আমরা জানতাম, প্রলয়ের সময় আপনার অবজারভেটারীর সঙ্গে আপনিও শেষ হয়ে গেছেন।"

ডক্টর রুদ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ, লোকে ভেবেছিল বটে আমি অবজারভেটারীর মধ্যেই আছি, কারণ আমি বিষুবীয় রাজ্যে যাবার কোন চেষ্টা করি নি। আমার অন্য একটা মতলব ছিল। নানা রকম হিসাবপত্র ঘেঁটে আমার ধারণা হয়েছিল যে মেরুর কাছাকাছি দেশগুলিতেই সব চেয়ে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হবে। ধূমকেতুর প্রথম ধাক্কা সেখানেই এসে লাগবে, ফলে ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যদি কিছু জানা সম্ভব হয় তবে তা সেখান থেকেই সব চেয়ে ভাল করে জানা যাবে। সেখানে যে সে সময় কোন জীবের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয় তা জেনেও কিসের একটা পাগল-করা নেশা যেন আমাকে পেয়ে বসল। এক দিন সময় বুঝে সকলের অলক্ষ্যে কিছু যন্ত্রপাতি সহ আমার নিজস্ব অটোগাইরোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সবাই জানল আমি অবজারভেটারীতেই রয়ে গেছি।

"কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করবার নেশা নিয়ে আমি এ রাজ্যে এলাম তার কিছুই সম্ভব হ'ল না। ধূমকেতু তখন পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে, পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে—তার মধ্যে আমার ছোট্ট অটোগাইরো কি করবে ! তাণ্ডব প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কখন যে আমার সংজ্ঞা লোপ পেল আমার কিছুই মনে পড়ে না।

"তার পর কিছু দিন—সম্ভবতঃ মাসাধিক কাল পরে আমাকে নাকি উদ্ধার করা হয়। নিশ্চয়ই আমার দেহে তখন প্রাণের কোন লক্ষণ ছিল না, তবে কিছু দিন বরফের তলায় চাপা পড়ায় হয়তো দেহটা পচতে পারে নি। কি অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় এই অদ্ভুত লোকগুলি আমাকে পুনর্জ্জন্ম দিল তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি—তবে এটুকু বুঝেছি যে অসীম এদের ক্ষমতা। যাক্, প্রথমটা অনেক দিন আমার স্মৃতিশক্তি বলে কিছু ছিল না; ছোট ছেলেটির মত এদের কাছে নতুন করে আমার ভাষাশিক্ষা সুরু হয়। তার পর ধীরে ধীরে স্বপ্নের মত অস্পষ্টভাবে আমার পূর্ব্বকথা মনে পড়ে। কিন্তু ভেবেছিলাম সে কল্পনায় লাভ কি ? ঝোঁকের মাথায় নিরাপদ আশ্রয়ে না গিয়ে বিপদের মুখে পালিয়ে এসেছিলাম—তার শাস্তি সইতে হবে বৈ কি ! আর ধূমকেতু চলে যাবার পর বিষুবীয় রাজ্যেই বা কি দশা হয়েছে তারও তো খোঁজ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। এখানকার লোকগুলি বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—আর তা ছাড়া বাইরে বেরোবার কোন উপায়ও এরা রাখে নি।"

ডক্টর রুদ্র একটু থামিলেন। চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, এই নীলাহীরা আর তাঁদের অদ্ভুত জাতভাইদের সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন না ? কোথা থেকে এই অদ্ভুত সভ্যতা এক রকম রাতারাতিই এসে এখানে খাড়া হ'ল !"

"প্রথম যখন একটু একটু ক'রে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে, বোধশক্তি বাড়তে থাকে তখন এ নিয়ে আমি খুবই মাথা ঘামিয়েছি বৈকি। কিন্তু এদের কাছে কিছুই জানতে পারি নি। আজকাল আর আমি তাই জানবার কোন চেষ্টাও করি না। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক মিঃ চন্দ্র, এত দিন পরে দেশের লোকদের সঙ্গে দু'টো কথা বলতে পারব জেনে আমার আর সবুর সইছে না, আমাকে আপনাদের আর সবাইকার কাছে নিয়ে চলুন।"

পরের দিনের কথা। অধ্যাপক চন্দ্র তাঁর উনিশ জন সঙ্গী সহ আবার "আশাবাদী"র ভিতর উঠিয়া বসিলেন। ডক্টর রুদ্রও এবার তাঁদের সঙ্গী হইয়াছেন। তাঁকেও এই সঙ্গে বিদায় দিতে মেরুবাসীরা আপত্তি করে নাই। আসিবার সময়ে এরোপ্লেনে যে সব আসবাবপত্র ভরা ছিল বিদায়ের সময়েও মেরুবাসীরা সেগুলি যথাস্থানে ভরিয়া দিয়াছে। নীলাহীরা স্বয়ং অভিযানকারীদের বিদায় দিতে আসিয়াছেন। ফুরফুরে বাতাস বহিতেছে, সোনার আলোয় মাঠের আনাচে-কানাচে ঝলমল করিতেছে। আশবাদী আবার পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুইটো সহরে আবার জরুরী বৈঠক বসিয়াছে। এই ক' মাসে লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। বলিতে কি, এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে আর বুঝি চলে না। কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ— চিনির বদলে কাঠের গুঁড়া হইতে যে কৃত্রিম চিনি বাহির করা হইতেছিল তাও এখন বন্ধ করিতে হইয়াছে—কাঠ বা কাঠের কুচি মিলিতেছে না। মাখন ও খাবার তেলের বদলে হাইড্রোজেনের সাহায্যে রিফাইন্-করা পেট্রোলিয়াম্ জমাইয়া যে কৃত্রিম খাবার তেল বাহির করা হইতেছিল তা'তে পুষ্টির দিক্ দিয়া কোন উপকার হইতেছে না। সমুদ্রের জল বিদ্যুৎ দিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইয়াছে, খাবার উপযোগী নতুন জিনিষ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা জল আর বাতাসের ভিতর হইতে কৃত্রিম কার্ব্বোহাইড্রেট্ জাতীয় খাবার তৈরীর চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু এখনও সফল হন নাই। এদিকে জাতি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—নানা রকম ব্যারামপীড়াও সুবিধা পাইয়া আসর জমাইতেছে। নতুন উপনিবেশ না পাইলে সৃষ্টি এবার সত্যি সত্যি ধ্বংস হইবে। কিন্তু কোথায় উপনিবেশ? প্রধান মন্ত্রীর স্বরে গভীর হতাশা ছাড়া আর কিছুই নাই।

"উপনিবেশ আছে।" ডক্টর হালুয়াচাইএর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "যে উপনিবেশ আমরা দেখে এসেছি তার তুলনা নেই। সে উপনিবেশ এত দিনে আমাদেরই হ'ত যদি আমাদের দলপতি আর একটু যোগ্যতা দেখাতে পারতেন,—যদি আমরা আমাদের অস্ত্রবলের

কিছুটা পরিচয় দিয়ে আসতে পারতাম। তা হ'লে আজ আমাদের এমন রিক্ত হাতে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত ফিরে আসতে হ'ত না। যত বড় শক্তিশালী জাতিই হোক্, আমাদের বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের কাছে তাদের কোন জারিজুরিই খাটত না।"

আপ্পারাম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু পৃথিবীর এই দারুণ অশান্তি শেষ হ'তে না হ'তে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ডেকে আনা কি সুবুদ্ধির পরিচয় হ'ত ডক্টর হালুয়াচাই?"

"নিশ্চয়ই হ'ত যদি সেই নতুন অশান্তি দিয়ে আবার শান্তি ডেকে আনার সম্ভাবনা থাকত। মিঃ আপ্পারাম, ভুলে যাবেন না, এখন যেখানেই থাকি না কেন, আমি জাপানী। আমরা কাপুরুষের জাত নই। গত এক শ' বছর ধরে আমাদের ঐ ছোট্ট দ্বীপটার শক্তির পরিচয় অনেক দেশই পেয়েছিল—রাশিয়া বলুন, চীন বলুন, আমেরিকা বলুন, সবাই জানে। আমাদের মন্ত্র—জোর যার মুলুক তার। আমি এ দেশের ডিক্টেটর হ'লে এই মুহূর্ত্তে মেরুরাজ্য আক্রমণের ব্যবস্থা করতাম।"

ডক্টর হালুয়াচাইএর পক্ষে অনেকেই যোগ দিলেন, এমন কি প্রিন্স অধিপালকও বাদ গেলেন না। অধ্যাপক চন্দ্র মেরুবাসীদের অদ্ভুত, অলৌকিক ক্ষমতা স্মরণ করাইয়া অমন একটা চরম পন্থার আশ্রয় লইতে নিষেধ করিলেন। ডক্টর রুদ্রও সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও অধ্যাপক চন্দ্রের মতে সায় দিলেন। সভায় দুই পক্ষে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ সুরু হইল। অবশেষে ডক্টর হালুয়াচাই-ই জিতিলেন। অধিকাংশের মতে স্থির হইল, মেরুবাসীদের এক সপ্তাহের সময় দিয়া একটা চরম পত্র পাঠান হইবে—উপনিবেশ আমাদের চাই-ই। তা'তে তারা আত্মসমর্পণ করে ভাল, নচেৎ বিষুবীয় গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রবলের কিছু নমুনা তাদের দেখান হইবে। শুধু তাই নয়, ঐ চরম পত্র পাঠান হইবে এমন একজনের হাতে যার মেরুবাসীদের ভাষা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আছে। ডক্টর রুদ্রের বয়স হইয়াছে, অতএব অধ্যাপক চন্দ্রকেই এ ভার লইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

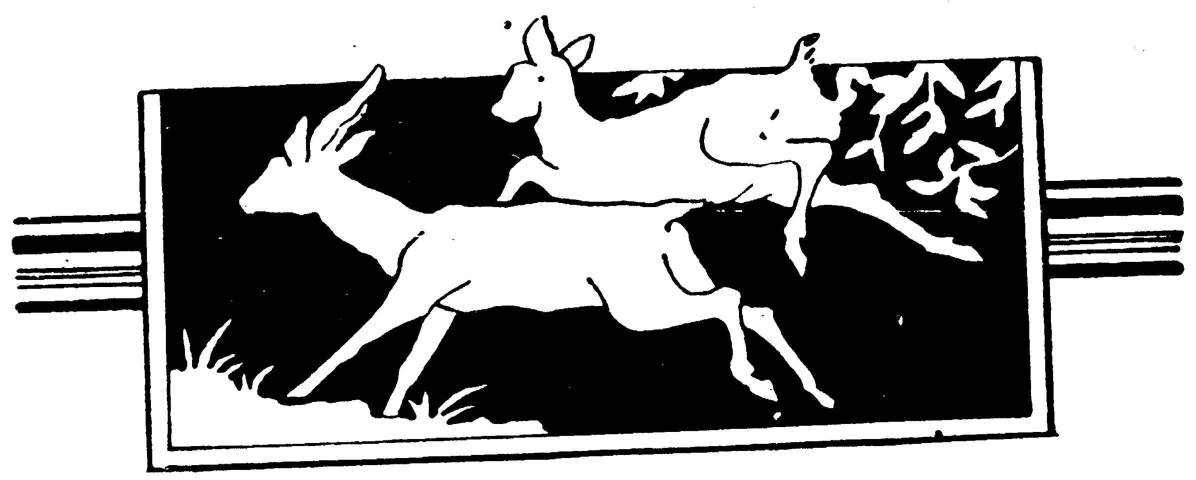

জীবজন্তুর আয়ু

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি)

প্রসিদ্ধ রাশিয়ান্ বৈজ্ঞানিক মেচ্নিকফ্এর কথা তোমরা ইতিপূর্ব্বে রামধনুতে পড়িয়াছ। মেচ্নিকফের জন্ম হয় ১৮৪৫ সনে, মৃত্যু—১৯১৬ সনে। তিনি ছিলেন প্যারিস্ সহরের পাস্তুর ইন্ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার। আমাদের রক্তের ভিতরকার শ্বেতকণিকাগুলি যে আমাদের দেহশত্রু রোগের ব্যাক্টিরিয়াগুলি খাইয়া ফেলিয়া শরীররক্ষী সৈন্যের কাজ করে সে কথা ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। মেচ্নিকফ্ দীর্ঘজীবন (Prolongation of Life) নামে একখানা জনপ্রিয় বই লিখিয়া গিয়াছেন। এই বইএ বিভিন্ন জীবজন্তুর জীবনকাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য

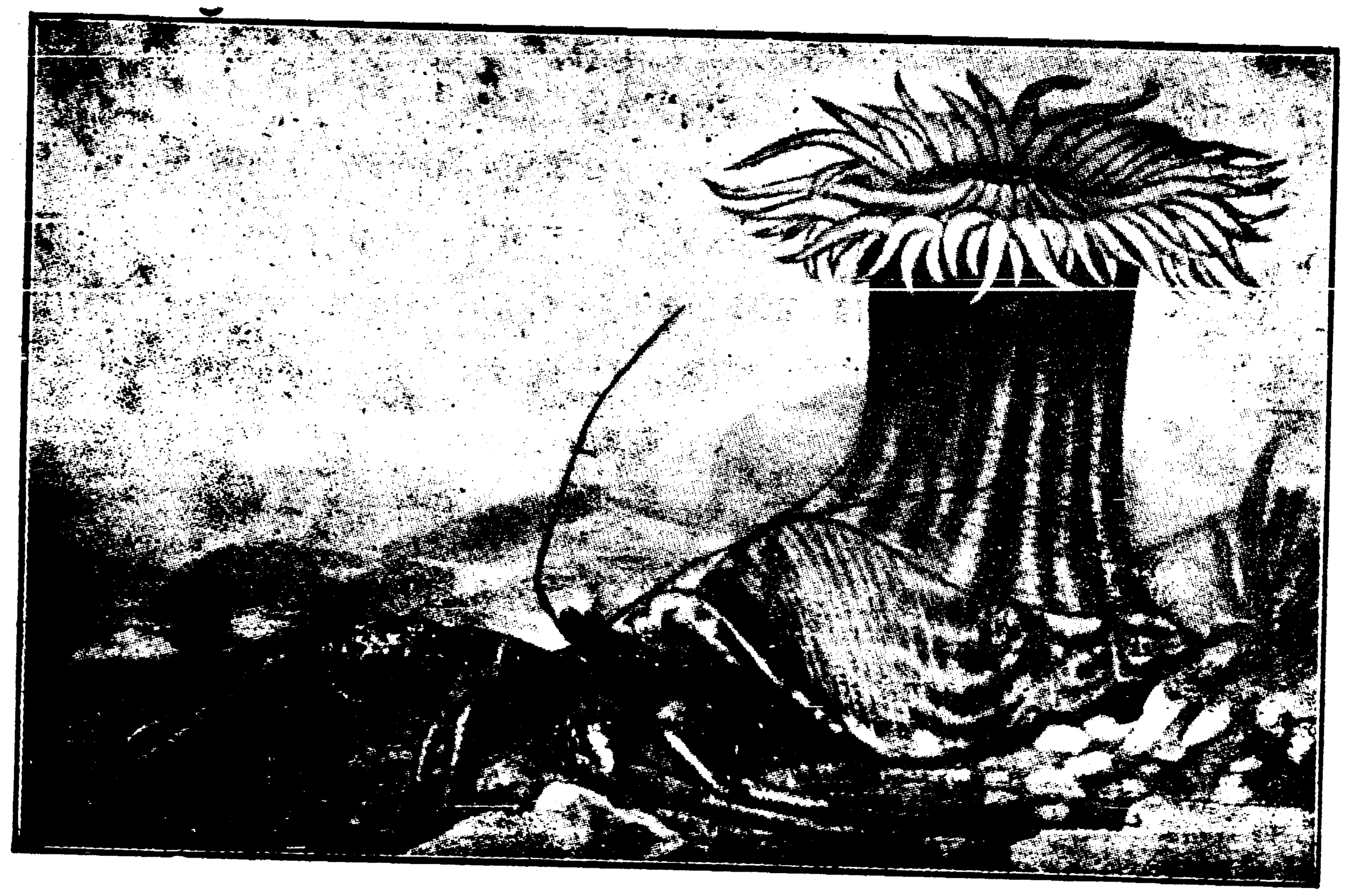

শামুকের পিঠে সামুদ্রিক য়্যানিমোন। এই সামুদ্রিক য়্যানিমোনকে ৬৬ বছর বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। শামুকগুলির কোন কোনটা ১০০ বছরও বাঁচে।

সংগ্রহ করা আছে। তাহা হইতে তোমাদের উপযোগী কয়েকটি কথা বলিতেছি।

সামুদ্রিক য়্যানিমোন (Sea anemone) খুব নিম্নশ্রেণীর জীব; ইহাদের

দেহের গঠন অত্যন্ত সরল; ইহাদের আলাদা পরিপাক-যন্ত্র (Digestive system) নাই, 'নার্ভ-যন্ত্র'গুলিও সম্যক্ভাবে গঠিত নয়। কিন্তু এই জীবও অনেক দিন বাঁচে। মেচ্নিকফ্ হামবুর্গের জল-জন্তুশালায় (Aquarium) একটি কাচের বাটিতে রক্ষিত এবং পালিত ঐ জাতীয় একটি জীবকে ৩০।৪০ বৎসর বাঁচিতে দেখিয়াছিলেন। এডিনবরা সহরে এক প্রাণিতত্ত্ববিদের কাছে একটি সামুদ্রিক য়্যানিমোন ৬৬ বৎসর বাঁচিয়া ছিল।

শামুকদের (Molluscs) জীবনকাল নানা রকম। কতকগুলি অল্প কয়েক বৎসর বাঁচে কিন্তু অপর কতকগুলিকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন সামুদ্রিক ঝিনুক ৬০।৭০—এমন কি ১০০ বৎসরও জীবিত থাকে।

কাকাতুয়া—ইহাদের কোন কোনটা ৭০।৮০ বছর বাঁচে।

বিভিন্ন জাতের পোকা-মাকড়ের (Insects) জীবনকাল বিভিন্ন রকমের। কতকগুলি কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাঁচে, কতকগুলি মাসখানেক বয়সে মরে। দুই এক জাতি ১৩ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। এগুলি গিনিপিগ্, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি বৃহৎ জন্তু অপেক্ষা ঢের বেশী দিন জীবিত থাকে। রাণী মৌমাছি ২।৩ বৎসর বাঁচে কিন্তু কর্ম্মী মৌমাছিরা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। স্ত্রী-পিঁপড়েরা অনেক সময়ে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

মাছের দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

খুব বড় পুরানো পুষ্করিণীর রুই, মিরগেল ও কাতলা মাছ বহু কাল বাঁচিয়া থাকে। ঐ বয়সের পুরানো মাছ ধরা পড়িলে দেখা যায় যে উহাদের মাংস অত্যন্ত শক্ত হইয়া গিয়াছে—দাঁতে চিবানো বেশ কষ্টকর। ইউরোপীয় মাছের মধ্যে স্যামন মাছ (Salmon) প্রায় এক শ' বৎসর বাঁচিয়া থাকে। পাইক মাছ (Pike) তার চেয়েও বেশী দিন বাঁচে। প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বাফুন লিখিয়াছেন যে কার্প (Carp) মাছ দেড় শ' বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

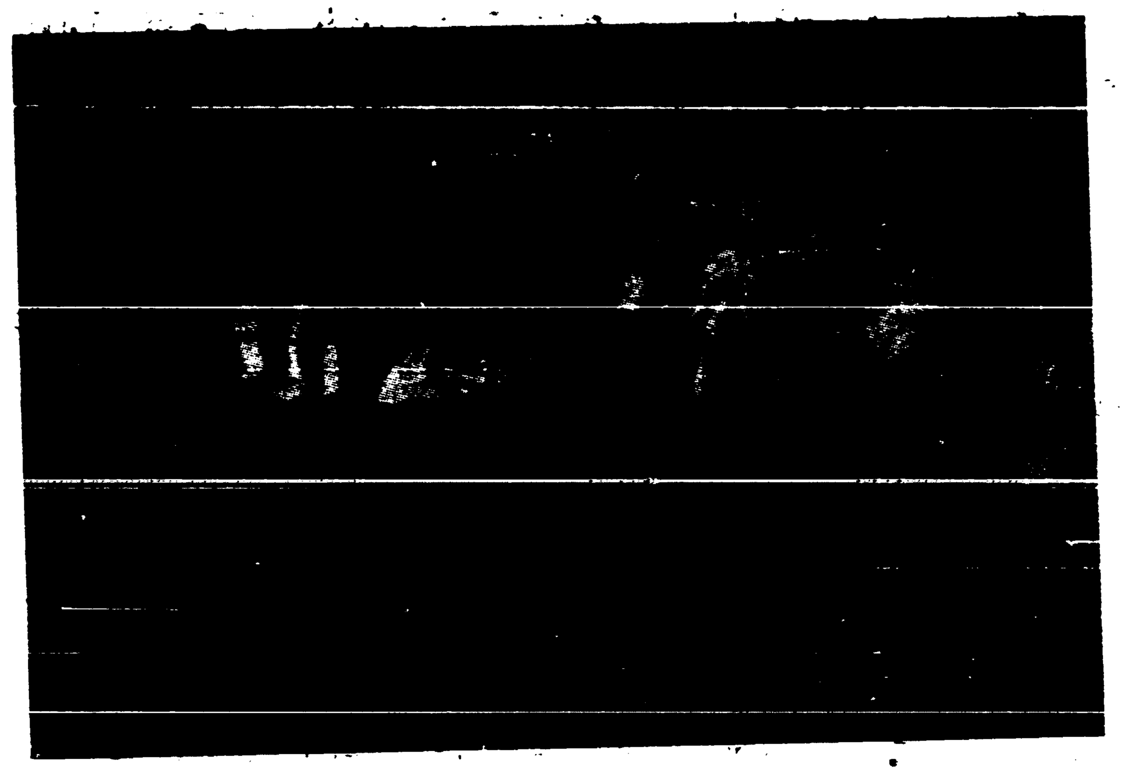

জংলী হাতী—আয়ু ১০০ বছর।

ছোট ছোট বেঙগুলি ১২ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। কোলা বেঙ ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছে শোনা যায়।

কুমীররা প্রকাণ্ড জন্তু; উহাদের শরীরের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু উহারা বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। প্যারিস্ সহরের পশুশালায় রক্ষিত কয়েকটি কুমীর চল্লিশ বৎসরের উপর জীবিত আছে, এবং তাহাদের দেহে বার্দ্ধক্যের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

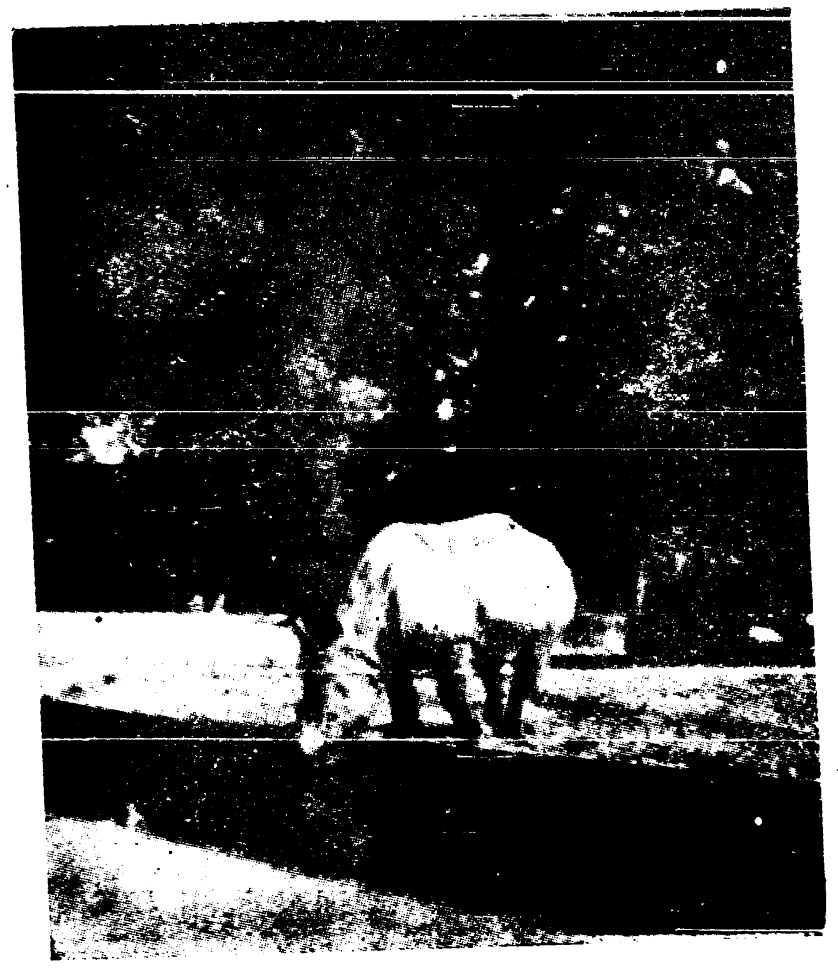

গণ্ডার—কেহ কেহ বলেন ইহারা ৭০।৮০ বছর বাঁচে।

কাছিম কুমীরের চেয়ে ছোট জন্তু হইলেও বাঁচে বহুকাল। কেপ্ টাউনের গভর্ণরের বাগানে একটি কচ্ছপ ৮০ বৎসর বাস করিতেছে; অনুমান করা হয় উহার বয়স ২০০ বৎসর হইবে। লণ্ডনের পশুশালার একটি কচ্ছপের বয়স ১৫০ বৎসর। ক্যাণ্টারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজকের উদ্যানে একটি কচ্ছপ ১০৭ বৎসর বাস করিয়াছিল। আলিপুরের চিড়িয়াখানায়ও একটি অতিবৃদ্ধ কচ্ছপ আছে।

সাপেদের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে বেশী জানা যায় নাই। তবে আমাদের দেশের লোকের সংস্কার—বাস্তু সাপেরা বহু বৎসর জীবিত থাকে।

ভেড়ার পাল—ইহাদের আয়ু ১২।১৪ বছর।

কোন কোন জাতীয় পাখী বহু বৎসর জীবিত থাকে। কাকাতুয়াকে ৭০।৮০ বৎসর বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। গুর্নে নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কতকগুলি পাখীর আয়ু সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন:—কাক—৫০ বৎসর, ঈগল পেঁচা—৬৮ বৎসর, রাজহাঁস—৮৩ বৎসর, শকুনি—১১৮ বৎসর, স্বুবর্ণ ঈগল—১০৪ বৎসর, আর একটি স্বুবর্ণ ঈগল—৮৩।

এই সকল নিম্নজাতীয় জীবের আয়ুর সঙ্গে তুলনা করিলে উচ্চজাতীয় স্তন্যপায়ী জীবদের আয়ু কম বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের মধ্যে হাতী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন বাঁচে। কোন কোন হাতী ১০০ বৎসর বাঁচিয়াছে শোনা যায়। কিন্তু বন্দীকৃত পোষা হাতী বা পশুশালায় রক্ষিত হাতী ২৫।৩০ বৎসরের বেশী বাঁচে না। কেহ কেহ বলেন গণ্ডার ৭০।৮০ বৎসর বাঁচে। কিন্তু প্যারিস সহরের পশুশালায়

একটি গণ্ডার ২৫ বৎসর বাঁচিয়া ছিল। লণ্ডনের পশুশালার একটি গণ্ডার ৩৭ বৎসর জীবিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঘোড়া এবং গরু প্রকাণ্ডকায় জন্তু হইলেও বেশী দিন বাঁচে না। ঘোড়া সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে মারা যায়। তবে গোটা দুই গল্পে পাওয়া যায় যে একটি ঘোড়া ৫০ বৎসর এবং আর একটি ৪৬ বৎসর বাঁচিয়া ছিল। গরু খুব ভাল অবস্থায় ২৫।৩০ বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু বেশীর ভাগই আরও অনেক আগে মারা যায়।

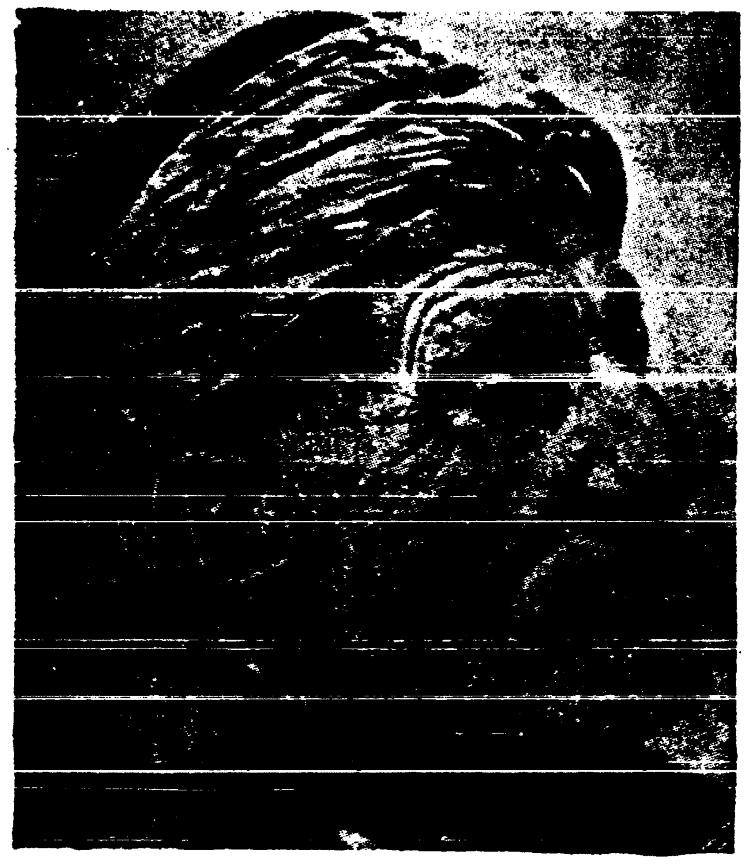

তুরস্কের একজন দীর্ঘায়ু পুরুষ। ইনি ১৪৩ বছর বয়সে মোটর-দুর্ঘটনায় মারা যান।

ভেড়া ১২।১৪ বৎসর বাঁচিতে পারে। কুকুরকে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

মানুষের আয়ু কি রকম তা তো তোমরা জানই। তবে এক শ' বছরের উপর বয়স এমন মানুষও অনেক দেখা যায়। তুরস্কের জোরো আগা কিছুদিন আগে ১৫০ বছরের বেশী বয়সে মারা গিয়াছেন। আর একটি ১৪৩ বছর বয়সের মানুষের ছবি এখানে দিলাম। ইনিও তুরস্কের লোক। বছর কয়েক আগে ইনি মারা যান—স্বাভাবিক ভাবে নহে, মোটর-দুর্ঘটনায়।

কালো বিদ্যুৎ

[রহস্য-নাট্য]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

[পার্ব্বত্য দেশ। অরণ্য। গাছদের অশ্রান্ত মর্ম্মর-ধ্বনি, নির্ঝরের ঝর্ঝর জল-তান এবং মাঝে মাঝে দু-তিন রকম পাখীর সাড়া ভেসে আসছে।

একখানি ডাক-বাংলো দেখা যাচ্ছে।

অমিয় সেন, তাঁর স্ত্রী লতিকা সেন ও তাঁদের বন্ধু কবি সরল রায় ধীরে ধীরে ডাক-বাংলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সূর্য্য অস্তগত, একটু পরেই সন্ধ্যা হবে।]

সরল ॥ অমিয়, এতক্ষণ পরে বোধ হয় দুর্ভাগ্যের ধাক্কা সামলাবার একটা উপায় হ'ল। এই দেখ, আমরা ডাক-বাংলোর কাছে এসে পড়েছি!

লতিকা ॥ (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) আহা, জায়গাটি কি চমৎকার!

অমিয় ॥ হ্যাঁ লতিকা, যিনি এখানে বাংলোর জন্যে স্থান নির্ব্বাচন করেছেন, তিনি আর আমাদের সরল নিশ্চয়ই এক-জাতের মনুষ্য।

সরল ॥ অর্থাৎ ?

অমিয় ॥ অর্থাৎ তিনিও তোমার মতই কবি।

লতিকা ॥ ওদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের স্থির তরঙ্গ-মালা, তাদের কোলে কোলে দুলছে ঘন বনের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, আর ঐ সবুজের উপরে ঝক্‌মকে জরির পাড়ের মতন দেখাচ্ছে ছোট্ট ঝরণাটিকে! আমার আর এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না!

অমিয় ॥ ওটা বলা বাহুল্য। কারণ ইচ্ছা করলেও আজ তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। বনের পথে আমাদের ভগ্নচক্র মোটর হয়েছে নিশ্চেষ্ট, কাজেই আজ রাত্রে ঐ বাংলোর জঠরে প্রবেশ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ই নেই।

লতিকা ॥ তা জানি গো, জানি। কিন্তু মোটরখানা ভেঙেছে ব'লে এখন আর আমার কোন দুঃখই হচ্ছে না।

অমিয় ॥ তার মানে ?

লতিকা ॥ তোমার মোটর অচল না হ'লে তো আজ এমন অপূর্ব্ব শোভার হাটে রাত্রিবাস করতে পারতুম না!

অমিয় ॥ লতিকা, তোমার কাব্য-ব্যাধি দেখছি সরলেরও চেয়ে মারাত্মক।

সরল ॥ অমিয়, তুমি অকারণেই বার বার আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ। কারণ আমি লতিকা দেবীর মত সমর্থন করি না। আমার কাব্য-রাজ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। পেট ভ'রে খেয়ে আরামে সোফায় ব'সে বা বিছানায় শুয়ে কবিতায় প্রকৃতি-বর্ণনা পাঠ করা যায় নিশ্চিন্ত প্রাণে। কিন্তু এই ভয়াবহ বিজন জঙ্গলে শূন্য-উদরে রাত কাটাতে হবে ব'লে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না।

লতিকা ॥ আপনার কথাগুলো অকবির মতন হ'ল সরলবাবু! একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তখন তার রূপোলী রূপের স্বপ্নে এক-রাতের উপবাসকে তুচ্ছ ব'লে মনে হবে।

সরল ॥ উপবাসকে তুচ্ছ ভাবব এত বড় নির্ব্বোধ কবি আমি নই। জানেন তো লতিকা দেবী,

"ডাগর আঁখি, চাঁদের আলো,
ভরা পেটেই লাগে ভালো।"

লতিকা ॥ কবি-মশাই, এত সহজে হাল ছাড়ছেন কেন? এটা যখন ডাক-বাংলো, তখন উদরের শূন্যতা হরণ করবার জন্যে কোন আয়োজনই কি এখানে হ'তে পারে না?

সরল ॥ নির্জ্জন বনের এ-রকম সব ডাক-বাংলোর ব্যবস্থা আমি জানি। আগে থাকতে খবর না দিলে এখানে যা ভক্ষণ করতে হয় তার নাম হচ্ছে বিশুদ্ধ বায়ু।

অমিয় ॥ দেখ সরল, বাংলোর বারান্দা থেকে একটি লোক আমাদের লক্ষ্য করছে।

সরল ॥ হুঁ, লোকটিকে সরকারি কর্ম্মচারী ব'লে মনে হচ্ছে।

অমিয় ॥ আরে, আরে, ওঁকে যে আমি চিনি! মিঃ দত্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস!

সরল ॥ উনিও তোমাকে চিনতে পেরেছেন। ঐ দেখ, তাড়াতাড়ি এদিকেই এগিয়ে আসছেন।

অমিয় ॥ হ্যালো দত্ত-সাহেব, আপনি এখানে বনবাসী কেন? নমস্কার।

মিঃ দত্ত ॥ নমস্কার, নমস্কার! আমিও আপনাকে ঠিক ঐ প্রশ্নই করতে পারি!

অমিয় ॥ আমার মোটরের একখানা চাকা গাড়ীকে ত্যাগ ক'রে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়েছে। ড্রাইভার তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় আছে, আর আমরা এসেছি আশ্রয়ের সন্ধানে।

দত্ত ॥ সঙ্গে শ্রীমতী সেন বুঝি?

অমিয় ॥ হ্যাঁ। আর উনি হচ্ছেন আমাদের বন্ধু, অতি-আধুনিক ধাঁধা-প্রণেতা সরল রায়।

দত্ত ॥ ধাঁধা-প্রণেতা?

অমিয় ॥ অর্থাৎ ভদ্রতার খাতিরে যাকে কবি ব'লে ডাকা হয়। আমার মতে, কবিতা মাত্রই ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরল ॥ মিঃ দত্ত, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমার বন্ধুটির পেশা হচ্ছে কণ্ট্রাক্টারি করা? কিন্তু আজ দেখছি উনি হঠাৎ কাব্য-সমালোচক হবার চেষ্টা করছেন। বাংলা কাব্যজগতের বিপদ আসন্ন!

দত্ত ॥ কাব্য-জগতের বিপদের কথা নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। এখানে এসে একটা জরুরি মামলা নিয়ে ভারি জড়িয়ে পড়েছি।

অমিয় ॥ এই বিজন অরণ্যে জরুরি মামলা! কিসের মামলা?

দত্ত ॥ মামলাটা যে কিসের, এখনো তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবে বড়ই রহস্যময় ব্যাপার। পরে সব শুনবেন। আজ তো আপনারা এখানেই আছেন?

সরল ॥ অবশ্য যদি স্থানাভাব না হয়—

অমিয় ॥ স্থানাভাব হ'লেও আমাদের থাকতে হবে। সামনে রাত্রি, সঙ্গে মহিলা, গভীর অরণ্য। তাড়িয়ে দিলেও যেতে পারব না।

দত্ত ॥ (হেসে) সে ভয় নেই। মিসেস্ সেন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে, বাংলোর ভিতরে গিয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমার বাবুর্চী এখনি চা তৈরি ক'রে দেবে।

সরল ॥ মিঃ দত্ত, আপনি আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করলেন। আপনার বাবুর্চী যখন আছে তখন নিশ্চয়ই এখানে 'দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্'-এর অভাব হবে না! হ্যাঁ লতিকা দেবী, এতক্ষণ পরে আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথা সত্য বটে! এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চমৎকার!

লতিকা ॥ (হাস্য ক'রে) বাবুর্চীর নামেই কবিবরের সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠল নাকি? আচ্ছা, ততক্ষণ আপনি চপ্-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রকৃতিকে উপভোগ করুন, আমি জামা-কাপড় বদ্‌লে আসি। (প্রস্থান)

দত্ত ॥ সরলবাবু, আপনার সৌন্দর্য্যবোধকে আমি এইবারে দুঃখ দিতে চাই।

সরল ॥ তার মানে? আপনার বাবুর্চীর ভাণ্ডারে কি অন্নাভাব হয়েছে?

দত্ত ॥ তা নয়। কিন্তু আপনি যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখছেন, আমি সেখানে দেখছি কেবল অপ্রাকৃতিক বিভীষিকা।

সরল ॥ বিভীষিকা?

দত্ত ॥ হ্যাঁ, দারুণ বিভীষিকা। সেই কথা বলব ব'লেই মিসেস্ সেনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম। আপনারা আজ রাত্রিবাস করতে এসেছেন মৃত্যুপুরীর মধ্যে।

অমিয় ॥ কি বলছেন দত্ত-সায়েব!

দত্ত ॥ অত্যুক্তি করছি না। মাসখানেক আগে সরকারি কাজে ইঞ্জিনিয়ার কুমুদ মিত্র এই বাংলোয় এক রাত বাস করতে আসেন। পরদিন সকালে অনেক বেলাতেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি দেখে সকলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। বিছানা খালি, ঘরের সমস্ত দরজা-জান্‌লা বন্ধ, কিন্তু কুমুদবাবু অদৃশ্য! বাংলোর সর্ব্বত্র, আশপাশের সমস্ত জঙ্গল, পাহাড় তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কুমুদবাবুর কোন চিহ্নই আর পাওয়া যায় নি।

অমিয় ॥ কি সর্ব্বনাশ!

দত্ত ॥ তার এক হপ্তা পরে বাংলোর ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছে এক চাকর। ঠিক একই ব্যাপার। সেও কর্পূরের মতন শূন্যে মিলিয়ে গেছে বন্ধ-দ্বার ঘরের ভিতর থেকে। ব্যাপার দেখে বাংলোর বাকি চাকরেরা ভয়ে দল বেঁধে পালিয়ে গিয়েছে—তাদের ধারণা, এ-সব ভৌতিক কাণ্ড!

অমিয় ॥ তাদের ধারণা হয়তো ভুল নয় দত্ত-সায়েব!

দত্ত ॥ আপনিও ভূত মানেন?

সরল ॥ দিনের বেলায় নয়, রাত হ'লেই আমরা ভূত মানি।

দত্ত ॥ কিন্তু পুলিসের আইনে ভূতের অস্তিত্ব নেই। যে দারোগার এলাকায় এই বাংলো, গেল হপ্তায় তিনি এসেছিলেন এখানে তদারক করতে। কিন্তু তিনিও আর থানায় ফিরে যান নি।

সরল ও অমিয় ॥ (একসঙ্গে) অ্যাঃ, বলেন কি?

দত্ত ॥ হ্যাঁ। দারোগা সমস্ত দরজা-জান্‌লা নিজে ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে শুয়েছিলেন। বাইরে ঘরের দরজার কাছে পাহারায় নিযুক্ত ছিল দুজন চৌকিদার। কিন্তু সকালে বেলা দশটার সময়েও দারোগার ঘুম ভাঙল না দেখে দরজা ভেঙে ফেলা হয়। শূন্য খাট, সব জান্‌লা ভিতর থেকে বন্ধ, কিন্তু দারোগা অদৃশ্য!

অমিয় ॥ চৌকিদাররা রাত্রে কোন শব্দ-টব্দও শোনে নি?

দত্ত ॥ খালি একবার তাদের কাণে গিয়েছিল, ঘরের ভিতরে খাটখানা মড়্‌মড়্ ক'রে উঠেছিল, আর কিছু নয়।

অমিয় ॥ তাহ'লে নিশ্চয় এ-সব ভৌতিক কাণ্ড!

দত্ত ॥ তর্কের অনুরোধে আপনার কথা না হয় স্বীকারই করলুম। ভূতরা যেন অশরীরী,

তাদের ছায়া-দেহ না-হয় দেয়াল বা দরজা-জান্‌লার পাল্লা ভেদ ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু যে-তিনজন মানুষ অন্তর্হিত হয়েছে, তারা তো আর সূক্ষ্মদেহের অধিকারী নয়! তাদের দেহ কেমন ক'রে বাতাসে মিলিয়ে গেল? আর এমন ভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন চাকর আর একজন দারোগার দেহ হরণ ক'রে কোন নিম্নশ্রেণীর প্রেতাত্মারও এতটুকু লাভ হবে না। ঐ তিনজন মানুষের কি হ'ল? কেউ যে তাদের হত্যা করেছে, ঘরের মধ্যে এমন কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। এখানকার জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক আছে বটে, কিন্তু তারা তো দেয়াল ভেদ ক'রে ঢুকতে পারে না! কুমুদবাবু আর দারোগাবাবুর গায়ের জামা আর পায়ের জুতোও পাওয়া গেছে ঘরের মধ্যে। খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁরা কোথাও যেতে পারেন না। এই অদ্ভুত সমস্যা সমাধান করবার জন্যেই আজ পাঁচদিন ধ'রে আমি এখানে বাস করছি, এইবার হয়তো আমাকেই অদৃশ্য হ'তে হবে!

সরল ॥ মিঃ দত্ত, মিঃ দত্ত! আপনার বাবুর্চী যদি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহ'লেও তার হাতের রান্না খাবার জন্যে আমার আর একটুও লোভ নেই! হা ভগবান্, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'!

অমিয় ॥ তাই তো সরল, এ আমরা কোথায় এসে পড়লুম! আবার ফিরে গিয়ে ভাঙা গাড়ীতেই ব'সে থাকব নাকি?

সরল ॥ বাপ্, সেটা হবে আরো ভয়ানক! যে-মুল্লুকে ঘরের ভেতরই এমন কাণ্ড, রাত্রে সেখানে বাইরে থাকলে আর কি রক্ষা আছে?

দত্ত ॥ আমার সঙ্গে মিলিটারি পুলিস আছে, আর আপনাদের হাতেও বন্দুক আছে দেখছি। সুতরাং অতটা ভয় পাবার কারণ নেই।

সরল ॥ না স্যার, বিলক্ষণ ভয় পাবার কারণ আছে। আমাদের দেহই যদি বাতাসে মিলিয়ে যায়, বন্দুক নিয়ে করব কি?

অমিয় ॥ সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক্ ঢেকে গেল। বনের ভেতর ফেউ ডাকছে, নিশ্চয়ই বাঘ বেরিয়েছ। কপালে যা আছে তাই হবে, কিন্তু এখন আমাদের আর বাইরে থাকা উচিত নয়।

দত্ত ॥ হ্যাঁ, এইবার ভেতরে চলুন। কিন্তু দেখবেন, মিসেস সেন যেন ঘুণাক্ষরেও কোন কথা না শোনেন! সরলবাবু, আজ চারিদিকেই পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। এ ক'দিন যখন কিছুই হয় নি, তখন আজকের রাতটাও হয়তো ভালোয়-ভালোয় কেটে যাবে।

সরল ॥ মিঃ দত্তের কথাই যেন সত্য হয়! আজ যদি অদৃশ্য না হই, তাহ'লে কাল অমিয়ের গাড়ী তৈরি না হ'লেও আমি পদব্রজেই বেগে পলায়ন করব!

দত্ত ॥ ভেতরে চলুন।

[বাংলোর একখানি ঘর। লতিকা জান্‌লার ধারে চেয়ারে ব'সে আছে।
অমিয়ের প্রবেশ।]

অমিয় ॥ একলা ব'সে কি করছ ?

লতিকা ॥ পাহাড়ের মাথায় চাঁদের সোনার মুকুট। ঝলমল্ বনে গাছের পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার জয়গান, আর হীরে-মাণিক ছড়াতে ছড়াতে ঝরণা গাইছে পরীলোকের গান। এই সব দেখছি আর শুনছি।

অমিয় ॥ দেখছ, এখানকার জান্‌লায় গরাদে নেই ?

লতিকা ॥ গরাদে-দেওয়া জান্‌লা আমার ভালো লাগে না। মনে হয় যেন, জেলখানায় ব'সে আছি।

অমিয় ॥ লতিকা, সব সময়ে কবিত্ব নিরাপদ নয়। মনে রেখো, আমরা গহন বনের মধ্যে আছি, এ হচ্ছে হিংস্র পশুদের রাজ্য। জান্‌লাগুলো বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত।

লতিকা ॥ দেখ, তুমি যখন সাবধান ক'রে দিলে, তখন একটা কথা বলব ?

অমিয় ॥ কি কথা ?

লতিকা ॥ আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

অমিয় ॥ অস্বস্তি ?

লতিকা ॥ হ্যাঁ, অস্বস্তি আর ভয়। তুমি হেসো না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সাম্‌নের পাহাড়ের ঐ ঝোঁপটার ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর দুটো জলন্ত চোখ মেলে কে যেন আমার পানে তাকিয়ে আর তাকিয়েই আছে! ...... ওকি, ওকি, তোমার মুখ অমন সাদা হয়ে গেল কেন ? ভয় নেই, এটা স্বধু আমার মনেরই ভ্রম!

অমিয় ॥ (ভীত, ব্যস্ত কণ্ঠে) কোন্ ঝোঁপের ভেতর থেকে লতিকা, কোন্ ঝোঁপের ভেতর থেকে ?

লতিকা ॥ কি আশ্চর্য্য, তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? বলছি তো আমার মনের ভ্রম! দেখ না, ওখানে কেউ নেই!

অমিয় ॥ (সাম্‌লে নিয়ে) ওখানে কোন বন্য জন্তু থাকাও অসম্ভব নয়! জান্‌লাগুলো বন্ধ ক'রে দি। (একটা জান্‌লা বন্ধ ক'রে) দেখ লতিকা, ঐ ঝোঁপটা সত্যি-সত্যি কেমন ন'ড়ে উঠল!

লতিকা ॥ জোরে বাতাস বইছে, ঝোঁপ তো নড়তেই পারে!

অমিয় ॥ বাতাসে ঝোঁপের একদিক্‌ই নুয়ে পড়ে। কিন্তু যেদিকে বাতাস আসছে, ও ঝোঁপটা সেদিকেও নুয়ে নুয়ে পড়ল। এ-সব ভালো লক্ষণ নয়। আমি আগে জান্‌লাগুলো বন্ধ ক'রে দি। (জান্‌লাগুলো একে একে বন্ধ করতে লাগল)

লতিকা ॥ এমন চাঁদের আলোকে তুমি কি নষ্ট ক'রে দিতে চাও ?

অমিয় ॥ (জান্‌লা সশব্দে বন্ধ করতে করতে) হ্যাঁ, চাই। প্রাণ থাকলে এমন ঢের চাঁদের আলো দেখবার সময় পাব।

লতিকা ॥ তোমার আজ কি হ'ল বল দেখি ? ভয়ে তোমার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে! তোমার এ রকম ভয়ের কারণ কি ?

অমিয় ॥ আমি ভয় পাই নি লতিকা, আমি খালি সাবধান হ'তে চাই।

লতিকা ॥ ডিনার খেতে ব'সে দেখলুম, তোমরা সবাই যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছ! কারুর মুখেই হাসি নেই, কেউ ভালো ক'রে কথা কয় না, আমাদের পেটুক কবি-মশাইও আজ ক্ষিদে নেই ব'লে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে পড়লেন। তোমাদের ঐ পুলিস-সাহেবও থাকেন থাকেন উঠে গিয়ে লোকজনদের চুপি-চুপি-কি-সব হুকুম দিয়ে আসেন, চারিদিকে বন্দুক-ঘাড়ে সেপাইদের পাহারা, এ-সমস্তই আমি লক্ষ্য করেছি! আসল ব্যাপারটা কি বল তো ?

অমিয় ॥ যা লক্ষ্য করেছ, সবই তোমার মনের ভুল! রাত হ'ল, এখন শুয়ে পড়।

লতিকা ॥ ও কি, তুমি বন্দুকটা পাশে নিয়েই শুয়ে পড়লে! বন্দুকের আজ এত আদর কেন ?

অমিয় ॥ এটা হচ্ছে ভীষণ জঙ্গল। আত্মরক্ষার উপায় ক'রে রাখলুম।

লতিকা ॥ ঘরের জান্‌লা-দরজা সব বন্ধ, কার কাছ থেকে তুমি আত্মরক্ষা করতে চাও ?

অমিয় ॥ তোমার অর্থহীন প্রশ্নের পর প্রশ্নের জালায় যে অস্থির হয়ে উঠলুম লতিকা! নাও, শুয়ে পড়!

লতিকা ॥ হুকুম তামিল করলুম, প্রভু! কিন্তু সরলবাবু কোথায় শুলেন ?

অমিয় ॥ মিঃ দত্তের সঙ্গে। তুমি না থাক্‌লে আমিও সেইখানেই আস্তানা পাত্‌তুম।

লতিকা ॥ মিঃ দত্তের সঙ্গ কি এতই লোভনীয় ?

অমিয় ॥ জঙ্গল হচ্ছে বিপদ্-জনক জায়গা। এখানে নারীর আবির্ভাব হচ্ছে আবার বিপদের উপরে বিপদের মত। দয়া ক'রে আর প্রশ্ন না ক'রে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

[কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।]

লতিকা ॥ ও গো!

অমিয় ॥ কি ?

লতিকা ॥ শুনছ ?

অমিয় ॥ কি শুনব ?

লতিকা ॥ কেমন এক রকম শব্দ ?

অমিয় ॥ (খানিকক্ষণ কাণ পেতে শুনে) বাইরে জেগে রয়েছে খালি বনের কান্না, আর মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ার উচ্ছ্বাস। আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না তো !

লতিকা ॥ না, সে শব্দটা থেমে গেছে।

অমিয় ॥ রাত অনেক হ'ল লতিকা। মিছে জেগে জেগে কাল্পনিক শব্দ শুনে আমাকে চম্‌কে দেবার চেষ্টা ক'রো না। ঘুমিয়ে পড়।

লতিকা ॥ (কাতর স্বরে) ওগো, আমার বড্ড ভয় করছে ! আবার মনে হচ্ছে, কে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছে !

অমিয় ॥ লতিকা, এইবার সত্যি-সত্যিই তুমি হাসালে ! জান্‌লা-দরজা সব বন্ধ, ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে, কোথাও একটা ছায়া পর্য্যন্ত নেই ! আমি ছাড়া এখানে তোমার মুখের পানে কে আর তাকিয়ে থাকবে ?

লতিকা ॥ কেউ এখানে নেই বটে, কিন্তু তবু তার নিষ্পলক চোখ দুটো যেন থেকে থেকে আমার বুকের ভেতর এসে বিঁধছে।

অমিয় ॥ (বিরক্ত স্বরে) লতিকা, তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। তোমার ও-সব পাগলামির কথা আর আমি শুনব না, এই আমি ঘুমোলুম।

[অল্পক্ষণের নীরবতা]

লতিকা ॥ (হঠাৎ সভয়ে উচ্চ আর্ত্তনাদ ক'রে) ওগো, ওগো, ওগো, ওঠ গো !

অমিয় ॥ (ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব'সে) অ্যাঁ—অ্যাঁ ! কি হ'ল, কি হ'ল ?

লতিকা ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) কালো বিদ্যুৎ—কালো বিদ্যুৎ !

অমিয় ॥ (হতভম্বের মত) কালো বিদ্যুৎ ! সে আবার কি ?

লতিকা ॥ ঠিক যেন একটা কালো বিদ্যুৎ দেয়ালের উপরে ছড়িয়ে প'ড়েই আবার সাঁৎ ক'রে মিলিয়ে গেল !

অমিয় ॥ কোথায় ? কোন্ দিকে ?

লতিকা ॥ ঐখানে গো, ঐখানে !

[বাইরে থেকে দ্বারে ঘন ঘন ধাক্কা !
সরলের কণ্ঠস্বর ॥ দরজা খোলো, দরজা খোলো !]
[অমিয় দরজা খুলে দিলে। বন্দুক হাতে ক'রে মিঃ দত্ত ও সরলের প্রবেশ]

দত্ত ॥ মিসেস্ সেন অমন চেঁচিয়ে উঠলেন কেন ?

সরল ॥ কি হয়েছে লতিকা দেবী, আপনার মুখ মড়ার মতন সাদা কেন ? আপনার দেহ যে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছে ! কী দেখেছেন আপনি ?

অমিয় ॥ কালো বিদ্যুৎ !

দত্ত ॥ (সবিস্ময়ে) কালো বিদ্যুৎ আবার কাকে বলে ?

অমিয় ॥ জানি না দত্ত-সায়েব ! হয়তো লতিকার চোখের ভ্রম !

লতিকা ॥ (ক্রন্দন-স্বরে) না গো, না ! ভ্রম নয় গো, আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি ! ঠিক ঐখানে ! দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল !

সরল ॥ এ ঘর নিরাপদ নয়। আমার নাকে কেমন একটা বন্য গন্ধ আসছে !

অমিয় ॥ কবিদের ঘ্রাণ শক্তি দেখছি সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রখর। আমি কিন্তু কোন গন্ধই পাচ্ছি না।

দত্ত ॥ (গম্ভীর স্বরে) মিঃ সেন, এটা কৌতুকের বিষয় নয়। মিসেস সেন নিশ্চয়ই কিছু দেখেছেন ! (নিম্ন স্বরে) জানেন মিঃ সেন, কুমুদ মিত্র আর দারোগাবাবু এই ঘর থেকেই অদৃশ্য হয়েছিলেন !

সরল ॥ কিন্তু কালো বিদ্যুৎ বলতে কি বুঝব ? আর এই বন্য গন্ধটা ? মিঃ দত্ত, আপনি কি কোন গন্ধ পাচ্ছেন না ?

দত্ত ॥ পাচ্ছি ব'লেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু গন্ধটার উৎপত্তি কোথায় ? দরজা-জান্‌লা বন্ধ। ঘরের চার দেয়াল, খড়ের চাল, খাটের তলা সব পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখানে অন্য জীবের মধ্যে উড়ছে কেবল গোটাকয়েক মশা ! তবু এখানে কালো বিদ্যুৎ খেলে কেন, আর বন্য গন্ধই বা আসে কেন ? এ যে অসম্ভব রহস্য !

[আচম্বিতে বাইরে বিষম একটা কোলাহল উঠল। উপর-উপরি বন্দুকের শব্দ]

দত্ত ॥ (সচমকে) ও কিসের গোলমাল ? সেপাইরা বন্দুক ছোঁড়ে কেন ?

[দরজার সামনে একজন চৌকিদার ছুটে এল]

চৌকিদার ॥ (ভীত চীৎকারে) হুজুর ! কালা সয়তান—কালা সয়তান !

দত্ত ॥ কালা সয়তান !

(ঘরের খড়ের চালের উপর ভীষণ ঝটাপটির শব্দ)

অমিয় ॥ ও আবার কি ব্যাপার ! চালখানা ভেঙে পড়বে নাকি ?

লতিকা ॥ (আর্ত্ত চীৎকার ক'রে) ঐ ! ঐ ! ঐ !

অমিয় ॥ (সভয়ে) দত্ত-সায়েব—দত্ত-সায়েব ! দেয়ালের উপর, চালের তলাকার ফাঁকের দিকে তাকিয়ে দেখুন !

দত্ত ॥ (স্তম্ভিত স্বরে) প্রকাণ্ড কালো-মত কী ওটা ?

সরল ॥ তীব্র হিংসা-ভরা দু-দুটো চক্ষু যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে !

অমিয় ॥ বন্দুক ছোঁড়ো—বন্দুক ছোঁড়ো ! অজগর ! ও যে অজগর সাপ !

(মিঃ দত্ত, অমিয় ও সরল তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বন্দুক তুলে গুলিবৃষ্টি করলেন। ভীষণ গর্জ্জন ক'রে সাংঘাতিক রূপে আহত মস্ত-বড় এক কৃষ্ণবর্ণ সর্পের সুদীর্ঘ দেহ মটির উপর আছ্ড়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল।)

লতিকা ॥ (অভিভূত স্বরে) মা গো !

অমিয় ॥ লতিকা অজ্ঞানের মত হয়ে গেছে—ওকে নিয়ে আমি বাইরে যাই।

দত্ত ॥ সকলকেই বাইরে যেতে হবে, ওর ল্যাজের একটা ঝাপ্‌টা গায়ে লাগলে দেহ গুঁড়িয়ে যাবে।

[সকলের তাড়াতাড়ি বাইরে প্রস্থান।]

অমিয় ॥ আমাদের গুলিতে সাপটার মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে।

সরল ॥ বাপরে বাপ, এত-বড় অজগর জীবনে আমি দেখি নি ! ওর দেহটা বোধ হয় সতেরো-আঠারো হাত লম্বা !

দত্ত ॥ (একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) এতক্ষণে সব রহস্য পরিষ্কার হ'ল। ঘরের চাল আর দেওয়ালের মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে ঐ ভীষণ জীবটা ভিতরে ঢোকবার পথ আবিষ্কার করেছিল। ওর দেহের এক পাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষ মারা পড়ত। তারপর মৃতদেহটা গ্রাস ক'রে ও আবার ঘর থেকে ঐ পথেই বেরিয়ে যেত। আজও ও শিকার ধরতে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু ঘরের লোক জাগ্রত দেখে কালো বিদ্যুতের মতই সাঁৎ ক'রে আবার বাইরে অদৃশ্য হয়। সেখানে সেপাইদের বন্দুকের গুলি খেয়ে বা শব্দে ভয় পেয়ে আবার ভিতরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর আমাদের গুলিতে ওর সব লীলাখেলা ফুরিয়ে গিয়েছে !

সরল ॥ লতিকা দেবীর উপমা দেবার শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। কালো বিদ্যুৎ ! চমৎকার উপমা !

দত্ত ॥ মিসেস্ সেন অনায়াসেই পুরস্কার দাবি করতে পারেন। কারণ, ধরতে গেলে এক রকম ওঁর জন্যেই এত-বড় একটা রহস্যের কিনারা হ'ল, আমারও মান বাঁচল।

লতিকা ॥ (শ্রান্ত, ক্ষীণ স্বরে) হ্যাঁ মিঃ দত্ত, আপনার কাছ থেকে আমি একটা পুরস্কার দাবি করতে পারি।

দত্ত ॥ কি পুরস্কার, বলুন ?

লতিকা ॥ কাল ভোরেই আপনার মোটরে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পারবেন ?

দত্ত ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মানুষখেকোর মেলায়

[সত্য ঘটনা]

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্)

আমার ভবঘুরে খুড়োমশায়ের কাছে শোনা আফ্রিকার আর একটা কাহিনী তোমাদের শোনাব'। এবার মানুষখেকো সিংহের কথা নয়, মানুষখেকো মানুষের কথা। তাই ব'লে ভেবো না যে যা'দের কথা বলতে যাচ্ছি তা'রা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রাক্ষস-খোক্কসদের মত, কুলোর মত কান, মূলোর মত দাঁতওয়ালা জীব, কিংবা কুম্ভকর্ণের মাস্‌তুতো ভাই। আফ্রিকার মানুষখেকোরা ঠিক্ সে রকম কিম্ভূত-কিমাকার নয়। সুবিধে সুযোগ হ'লে আর পাঁচ রকম মাংসের বদলে একটা মানুষ ধ'রে ফলার ক'রতে পারে, এই পর্য্যন্ত ! তা'ও আবার চুপি চুপি। নইলে আবার সুসভ্য ইংরেজ, ফরাসী বা বেলজিয়ানদের কানে সে কথা গেলে আর রক্ষা নেই, তখনি গ্রামকে গ্রাম শাস্তি পা'বে। যেমন, একবার একজন শিখ ওভারসিয়ারকে বাগে পেয়ে একদল মানুষখেকো তা'কে জলযোগ ক'রে ফেলে। তা'র হাড়মাস সবই তারা খেয়ে ফেলেছিল, চামড়া দিয়ে ডুগ্‌ডুগি বানিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু মাথাটা নিয়ে নাকি তাদের ছেলেরা গেণ্ডুয়া খেলায় লাগিয়েছিল। বেচারারা জান্‌ত'ও না যে এটা একটা অপরাধ, আর এই বেহুঁসিয়ারীই তাদের কাল হ'বে। ওদিকে সেই শিখটীর খবর না পেয়ে তা'র খোঁজে একদল লোক বেরোয়, তারা খুঁজতে খুঁজতে সেই গ্রামে গিয়ে ছেলেদের মুখে তাদের অদ্ভুত বল্ খেলার গল্প শুনে তবে আসল ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারে। ফলে সে গ্রামের প্রত্যেকটী ছেলেবুড়ো নাকি এমন শাস্তি পেয়েছিল যে সে অঞ্চল থেকে মানুষ খাওয়ার খবর পরে আর কখনও পাওয়া যায় নি'। তাই ব'লে যে

কেউ আর কখনও মানুষ খায় নি', তা' নয়। আমার খুড়োমশায় তো একবার স্বচক্ষে একদল কাফ্রিকে মানুষ খাবার আয়োজন ক'রতে দেখেছিলেন। সেই কথাই বলি।

খুড়োমশায় পূর্ব্ব-আফ্রিকার বনজঙ্গল যখন জরীপ হয় তখন সেই বিভাগে কাজ করতেন। ডার-এস্-সালাম সহরে ছিল বড় আপিস, কিন্তু জঙ্গলে জঙ্গলেই

আফ্রিকার জঙ্গলে ; একজন সাহেব একদল বুনো কাফ্রির পাল্লায় পড়েছেন।

তাঁকে ঘুরতে হ'ত বেশীর ভাগ। অবশ্য, একা ঘুরতেন না, রীতিমত ফৌজ চল্‌ত সঙ্গে। ছু'জন বড় সাহেব, জন তিনেক ছোট কর্ম্মচারী, কতকগুলি কুলী, একদল অস্ত্রধারী সৈন্য, রসদ নেবার জন্য কয়েকটা উট ইত্যাদি নিয়ে সে এক ছোটখাট দিগ্বিজয় যাত্রা আর কি! হ'বেই না বা কেন? হয়ত' ছু'মাস তিন মাস ধ'রে জঙ্গলের ভেতরে থাক্‌তে হ'বে, সেখানে মানুষের খাদ্য পাবার সম্ভাবনার চেয়ে মানুষকে খেতে চায় এমন জানোয়ারের সংখ্যা বেশী। তাই এত সাবধানতা। এমন কি এমনও দেখা গেছে যে একটু দূরে ঝোপের ভেতর সিংহ সাবধানে দলের

সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছে, অত বড় দল দেখে আক্রমণ করবার সাহস হ'চ্ছে না, কিন্তু তাগ ক'রে আছে যে একজন একটু দল-ছাড়া হ'য়ে পড়লেই টুপ্ ক'রে তা'কে তুলে নিয়ে যা'বে। কিন্তু সিংহ মারবার হুকুম নেই, কাজেই সিংহকে দেখেও এদের চুপ করে থাকতে হ'ত।

একবার খুড়োমশায়রা এই রকম বেরিয়েছেন। এবার পাকা ছু' মাসের ধাক্কা, ছু'শ' মাইল ঘুরতে হ'বে। চেন, ফিতে, কম্পাস নিয়ে সব চ'লেছেন তো চ'লেছেনই। জরীপের কাজ চ'লছে। সাহেবরা ক্লান্ত হ'লে উটের পিঠে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হ'য়ে চাপেন, আর সকলের তো চরণ বাবুর জুড়ীই সম্বল। বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়, নদী-পাহাড় সব পার হ'য়ে চলেছেন। এইভাবে চল্‌তে চল্‌তে একদিন জঙ্গলের ভেতর শুনতে পাওয়া গেল যেন খুব চাপা একটা গোলমালের শব্দ, অনেক দূর থেকে ভেসে আস্‌ছে। সকলেরই একটু কৌতূহল হ'ল। এই একঘেয়ে জঙ্গল মাপতে মাপতে যাওয়া, তা'র মধ্যে একটু যেন নূতনত্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই সেই আওয়াজটা ধ'রে এগোতে লাগ্‌লেন। খানিকক্ষণ বাদেই গোলমালটা যেন আর একটু স্পষ্ট হ'য়ে এল'। হঠাৎ জঙ্গল শেষ হ'য়ে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লেন সবাই, সেখানে আর বড় ঘন গাছ নেই, সবই নীচু ঝোপঝাড়। সেই মাঠটা গিয়ে শেষ হ'য়েছে দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে। আওয়াজটা সেই পাহাড়ের গোড়া থেকেই ভেসে আসছে বোঝা গেল। সাহেবরা তখন ঠিক্ করলেন যে দলবল শুদ্ধ সেখানে না গিয়ে আগে একজন কাফ্রি চাপরাশী পাঠিয়ে খবরটা আনানো যাক্। একজন ছোকরাকে রওনা ক'রে দিয়ে তো খুড়োমশায়রা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন, সে ফিরে এসে কি বলে তা শোনবার জন্য।

সেই কাফ্রি ছোকরা ফিরে এসে যা খবর দিল', তা' বড় ভয়ানক। সে বল্‌লে যে ঐ পাহাড়ের গোড়ায় একদল অসভ্য লোক জমায়েৎ হ'য়েছে একটা মানুষ খাবার জন্য। আর সেই খাওয়া উপলক্ষ্যে একটু আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন হ'চ্ছে। তারই আওয়াজ আকাশ-পাতাল বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে সাহেবদের দলের কানে এসে পৌঁছচ্ছে।

সাহেবরা তো শুনেই ঠিক্ করে ফেললেন যে গিয়ে ঐ বীভৎস ব্যাপারে বাধা দিতে হ'বে। যে কথা সেই কাজ। দলবল তখন হৈ হৈ ক'রে মাঠ পার হ'য়ে পাহাড়ের তলায় গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখেন এক এলাহী ব্যাপার। শ'খা'নেক শ'দেড়েক কাফ্রি মিলে হল্লা করছে, সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাকের দুম্ দাম্ শব্দ। কেউ কেউ বা বর্শা হাতে নাচ সুরু ক'রে দিয়েছে; একপাশে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। সবাই ব্যস্ত। সাহেবদের দলটী দেখে তা'রা যেন একটু শশব্যস্ত হ'য়ে উঠল'। বড় সাহেব তাদের সর্দ্দারকে ডেকে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। সে বল্‌লে যে তারা কোনও সাহেবসুবো বা সাহেবদের প্রজা কাউকে ধ'রে আনে নি ফলার করবার জন্য। তাদেরই মধ্যে একজনের ঘুমের ব্যারাম (Sleeping sickness) হ'য়েছে; তা'র এখনও প্রাণ আছে বটে, কিন্তু শীগ্‌গিরই মরে যা'বে, কেননা এ রোগ সারে না। তারা অপেক্ষায় আছে, লোকটা মরলেই তা'কে একটু সেঁকে নিয়ে খেয়ে ফেলবে। মিছিমিছি খাবার জিনিষটা ফেলে দেবে, তা'রা সে রকম বে-হিসেবী কাজ করে না। আর, এতে তো স্বাভাবিকভাবে অন্যায় কিছু নেই, তারা তো আর জ্যান্ত মানুষ মেরে খাচ্ছে না, ঐ লোকটার মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তো তারা অপেক্ষা করছেই। আজকাল তো

আফ্রিকার বন্যভূমির আর একটি দৃশ্য।
মাটীতে যে গোল গোলে দাগ দেখা যাচ্ছে ওগুলো হাতীর পায়ের দাগ। বোঝা যাচ্ছে, এক পাল বুনো হাতী অল্প আগে এখান দিয়ে চলে গেছে।

সাহেবদের জ্বালায় এ রকম সুযোগও কালেভদ্রে এক-আধটার বেশী আসে না, কাজেই এ নিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করাটাও দোষের বিষয় নয়।

সাহেবরা যখন দেখলেন যে ব্যাপারটা নিয়ে ওদের বেশী দোষ দেওয়া যায় না, তখন তাঁদের রাগ প'ড়ে গিয়ে দয়ার উদ্রেক হ'ল। তাঁরা রোগীকে দেখতে চাইলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে কয়েকজন লোক একটী লোককে ঘিরে রয়েছে; সেই লোকটীর শরীরে কোনও রোগের লক্ষণ নেই, এক যা' সে ঘুমিয়ে আছে। আফ্রিকার জঙ্গলে এক রকম বিষাক্ত মাছি আছে, তার কামড়েই এই 'কুম্ভকর্ণ' রোগের উৎপত্তি হয়। রোগীর সমস্ত চৈতন্য অবশ হ'য়ে থাকে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে তার পর হঠাৎ মারা যায়। জংলীদের ভেতর এর কোনও চিকিৎসা নেই, কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসায় কতক কতক সেরে যায় এমন দেখা গিয়েছে। সাহেবরা ভাবলেন যে এ লোকটাকেও চিকিৎসা ক'রে বাঁচান যায় কিনা দেখতে হ'বে। তখন সুরু হ'ল দরাদরি। জংলীরাও তাদের ফলার খুসী-মনে ছাড়তে চায় না, সাহেবরাও জেদ ছাড়বেন না। শেষে ঠিক্ হ'ল যে লোকটাকে নিয়ে তা'র বদলে ওদের দেওয়া হ'বে একটা উট, যাতে লোকটাও রক্ষা পায় অথচ এদের খাওয়া আর উৎসবটাও না মাঠে মারা যায়।

লোকটাকে তো একটা উটের পিঠে তুলে নেওয়া হ'ল। এখন তা'কে নিয়ে কি করা? চিকিৎসা তো আর জঙ্গলে হয় না, সহরও অনেক—অনেক দূরে। কিন্তু সাহেবরা যখন জেদ ধ'রেছেন তখন আর উপায় কি? এঁদের যাবার কথা টাবোরা ব'লে একটা জায়গা পর্য্যন্ত, কিন্তু সেটা বেজায় দূরে। তার চেয়ে কাছে একটা সহর আছে, সেটা দিন দুয়েকের পথ, আর একদিকে যেতে হ'বে। তাই যাওয়া হ'ল। সে সহরের নাম মোশি। সেখানে যাবার পথেই লোকটা না অক্কা পায় তার জন্য যা কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে ছিল তাই দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তো অনেক কষ্টে লোকটাকে জীবন্ত অবস্থায়ই মোশির হাসপাতালে এনে ফেলা হ'ল। তার পর সকলে আবার জঙ্গলে ফিরে এলেন। আবার জরীপ সুরু হ'ল। আর, টাবোরা পর্য্যন্ত যেতে পথে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নি।

টাবোরা থেকে ফিরতে অনেক দিন দেরী হ'ল। এর মধ্যে ব্যাপারটা

সকলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরবার পথে যখন সেই জায়গাটায় আসা গেল যেখানে ঘটনাটা হ'য়েছিল, তখন হঠাৎ মনে পড়ল লোকটার কথা। সকলেরই মনে একটা কৌতূহল হ'ল সেই লোকটার কি হ'ল তা' জানবার জন্য। কেউ কেউ বল্লে, সে কি আর বেঁচে আছে? কিন্তু আর সকলের ধারণা যে সে মরে নি'। যাই হ'ক, সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য সকলে আবার মোশির উদ্দেশ্যে রওনা হ'লেন। সেখানে পৌঁছে হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে সকলেই আনন্দের সঙ্গে খবর পেলেন যে সে লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছে, এমন কি তা'র অন্য কোথাও যাবার যায়গা না থাকায় সে হাসপাতালেই কাজ করছে। তাকে ডেকে আনা হ'ল। দিব্যি সুস্থ সবল একজন কাফ্রি সভ্য পোষাক প'রে এসে হাজির। সাহেবদের পরিচয় পেয়ে তা'র কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঘটা! সে কিছুতেই সাহেবদের ছাড়বে না। সাহেবদেরও তার ওপর একটু মায়া ব'সেছিল, তাকে নিয়ে তাঁরা চ'লে এলেন। সে এর পরে অনেক কাল বড় সাহেবের চাপরাশীগিরি ক'রেছিল, নিজের জাতভাইয়েদের মধ্যে ফিরে যায় নি। আর, খুড়োমশায়দের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে বলত' তার স্বাহিলী ভাষায়—'জাম্বু বানাকুবা' (নমস্কার মহাশয়!)।

বেঙ্

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক)

বেঙ্ চলে, বেঙ্ চলে,
কাদা জলে বেঙ্ চলে,
কাদা-গোলা ঘোলা জলে
বেঙ্ চলে রে;

ভুঁদো বেঙ্, ভোঁদা বেঙ্,
পেট মোটা গোদা বেঙ্,
নাক খেঁদা বোদা বেঙ্—
সেও চলে রে!

বেঙ্ চলে, চলে বেঙ্
থপ্ থপ্ থপ্,
কাদা পোকা খায় বেঙ্
গপ্ গপ্ গপ্,
বর্ষায় ভিজে বেঙ্
সপ্ সপ্ সপ্।

বেঙ্ চলে, চলে বেঙ্,
ঠ্যাং ছোড়ে—সরু ঠ্যাং,
ল্যাং মারে—ট্যাড়া ল্যাং
ল্যাং মারে রে!

গম্ভীর কোলা বেঙ্,
গাল-গলাফোলা বেঙ্,
ধাড়ি বেঙ্, পোলা বেঙ্
সবে চলে রে!

বেঙ্ নাদুস্-নুদুস্
চলে থপাস্ থপাস্,
যায় হাপুস্ হুপুস্
পড়ে ধপাস্ ধপাস্!

রাশভারী জাঁদা বেঙ্,
কুঁদো বেঙ্, কোঁদা বেঙ্,
ক্ষুদে, দুঁদে, হাঁদা বেঙ্
সবে চলে রে!

উপরেতে মেঘ ডাকে,
নীচে ডাকে বেঙ্,
কড় কড় কড় কড়
ঘ্যাঙর ঘ্যাঘ্যাং

চীন জয় অসম্ভব !

(শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর)

বন্ধুরা একদিন কথা পাড়ল, বল্লে—তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর এই যুদ্ধে চীনারা শেষ পর্য্যন্ত জিতবে ?

বল্লাম—জিতবে কি না জানি না, তবে শেষ পর্য্যন্ত জাপানীরা যে তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না, এ কথা ঠিক।

—এবং এই ঠিক তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বল ? জান তো, অমন রাশিয়াকে জাপানীরা হটিয়ে দিয়েছিল, তার তুলনায় এই চীনাদের কি আছে ? না আছে ভাল সৈন্য, না আছে অস্ত্র-শস্ত্র, কি নিয়ে তারা লড়বে ?

বল্লাম—দেখ, শুধু গুলিগোলা আর বোমা দিয়ে দিন কয়েকের জন্য লোককে ভীত-চকিত করা যায়, কিন্তু চীনের মত একটা বিরাট্ দেশকে তাতে জয় করা যায় না। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কোটি লোককে জয় করতে হ'লে যে 'মর‍্যাল-ফোর্সে'র' (Moral force) দরকার তা জাপানের নেই, সেইজন্যই চীনাদের কাছে তাদের হারতে হবে।

তারা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লে—তুমিও যে দেখি 'মর‍্যাল্ ফোর্সে'র' বুলি ধরেছ, গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য হ'লে নাকি ?

—এটা অত্যন্ত সাধারণ কথা, সামান্য চেষ্টা করলেই বোঝা যায়। চীনের চল্লিশ কোটি নরনারী যদি মনে-প্রাণে জাপানীদের মানব না বলে প্রতিজ্ঞা করে, তা হ'লে প্রত্যেক মানুষটির পিছনে একটি করে জাপানী সৈনিক লাগিয়ে রাখতে হবে, অন্ততঃ যদি প্রতি বাড়ীতে একজন করে রাখতে হয়, তা'হ'লেও জাপানে তত মানুষ পাওয়া যাবে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত চীনকে আয়ত্তে রাখা জাপানীদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

—তুমি কি বলতে চাও, চীনাদের সেই রকম মনের জোর আছে ?

—যদি নাও থাকে তা'হলেও প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষায় সেই মনের জোর গড়ে উঠবে এবং উঠছে। আমি একটা ঘটনা জানি, সেইটা তোমাদেরকে বল্লেই বুঝতে পারবে।

তর্কের উৎসাহ মুহূর্ত্তে কমে গেল, গল্প শোনার ঔৎসুক্যে সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বলতে সুরু করলাম :

সানের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে সিঙ্গাপুরে।

আলাপটা আকস্মিক।

ট্রেনে যাচ্ছিলাম। কামরাটি খালি দেখে একদল যুবক হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। প্রথমে অত লক্ষ্য করি নি, অমন কত জনই তো ওঠে নামে, কে কাকে দেখে ? নিজের মনে একখানি বই পড়ছিলাম, সহসা তাদের কয়েকটা কথা কানে এসে বিঁধল, শুনলাম, তারা ইংরাজীতে ভারতীয় ও চীনাদের নিন্দা করছে। আমার পাশে একটি চীনা যুবক বসেছিল, দেখলাম সেও মুখ তুলে তাকিয়েছে।

তাদের মুখের পানে তাকিয়েই বুঝলাম তারা জাপানী। দলে তারা ছ'জন। আমার সামনে যে ছেলেটি বসেছিল সে আমার মুখের উপর এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বিদ্রূপের চোখে আমার মুখের পানে একবার তাকিয়ে বলে উঠল—'আমরা চীনের আধখানা জয় করেছি, আর এক বছরে বাকিটাও জয় করে ফেল্‌ব। তার পর এশিয়ার অন্য দেশগুলি তো আছেই।'

যুবকটি গর্ব্বিত-দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লে আমার মুখের উপর। অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলাম, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন কথা বলতেও প্রবৃত্তি হ'ল না, আবার বইয়ের উপর দৃষ্টি ফেললাম।

শুনলাম পাশের চীনাটিকে একজন জিজ্ঞেস করছে—'তুমি চীনা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায় থাক ?'

—'নান্‌কিন্।'

—'তা হ'লে তুমি এখন আমাদেরই প্রজা, বেশ বেশ।'

—'তা তোমার নামটি কি ?'—আর একজন জিজ্ঞেস করলে।

—'কম্‌রেড্ সান্।'

—'কম্‌রেড্ ! কম্‌রেড আবার কি ? আমাদের প্রজাদের মধ্যে আবার কমরেড কি ? সব 'স্লেভ্'। এবার থেকে তুমি 'স্লেভ্ সান্' বলবে, বুঝলে ?'

সানের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। কি যেন একটা কড়া কথা সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন কথাই সে বল্লে না।

ইতিমধ্যে কোন এক সময় প্রথম যুবকটী পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলে, কিন্তু তার মধ্যে আর সিগারেট নেই দেখে প্যাকেটটী ছুঁড়ে ফেলে দিলে জানালা দিয়ে ; তার পর সানের পানে ফিরে বল্লে—'দেখো সান, পরের ষ্টেশনে ট্রেন থামলে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনবে।'

অপর একটী যুবক মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে সানের পিঠে এক চাপড় মেরে বল্‌লে—'নিশ্চয়! তুমি এখন হ'লে আমাদের প্রজা, আমাদের খুসি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, করতেই হবে।'

সান এবারও কোন জবাব দিল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে এল, প্লাটফর্ম্মে গাড়ী ইন্ করছে দেখা গেল। প্রথম যুবকটি এবার পকেট থেকে একটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে সানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে—'এই নাও, নিয়ে এস। জাপানী সিগারেট কিনবে, বুঝলে?'

—'আমি পারব না', সান উত্তর দিলে।

—'পারবে না! কেন?'

—'আমার ইচ্ছা।'

—'ইচ্ছা!' জাপানী যুবকটী ঠাস্ করে সানের গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

চকিতে সান উঠে দাঁড়াল, তারপরেই দু'হাতে সুরু করল অজস্র মুষ্টিবৃষ্টি। প্রথম যুবকটি কয়েকটি ঘুষি খেয়ে পড়ে গেল, বাকী পাঁচ জন ঘিরে ধরল সানকে। কিন্তু সানের কাছে তাদের এগুতে হ'ল না, সানের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে কারুর নাক ফাটল, কারুর চোখের কোলে পড়ল কালো কালশিরা।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে থামল ষ্টেশনে। সান চকিতে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। যুবকেরা হৈ চৈ করে উঠল। সানকে ধরার জন্য যখন তারা গাড়ী থেকে নাম্‌ল সান তখন ষ্টেশনের কোথাও নেই।

তার পর।—

কাজের ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। এম্‌বুলেন্স ইউনিটের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে, সারাদিনে স্নানাহারের ঠিক মত সময় পাওয়া যায় না। কোথায় বোমা পড়ছে, কবে কোথায় বোমা পড়েছে, কোথায় ঘটছে জাপানীদের ধ্বংসলীলা, তারই পিছনে ছুটে চলেছি,—সুবিধামত যদি কারুর সেবা করতে পারি, কোন অভাগা যদি বাঁচে! কখনও বা জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে, মাথার উপর বোমারু প্লেনগুলো যখন নেমে আসে, কামানের সামনে থেকে যখন আহতদের তুলে আনতে হয়, মনে হয় এখনি বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। কখন মরব তার ঠিক নেই, তবু কাজ করতে হয়।

একদল স্বার্থলোভী মানুষ নির্ব্বিচারে খুন করে যায়, আর একদল মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তাদের বাঁচাতে চায়—অদ্ভুত এই মানুষের চরিত্র!

ইয়াংসি নদীর ধারে আমাদের তখন তাঁবু পড়েছে। ক'দিন ধরে যখন তখন সে অঞ্চলে এয়ার-রেড্ হচ্ছে। আমাদের এমবুলেন্স আর স্কাউটের দল ছুটোছুটি করছে, আহতদের তুলে আনছে ধ্বংসস্তূপ থেকে। প্রত্যেকের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, অপারেশন করা, এম্‌পুটেট্ করা প্রভৃতি অসম্ভব কাজের চাপ পড়েছে। কখন যে কি করি, একটা নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

একদিন সন্ধ্যায় একজন আহতের হাত ব্যাণ্ডেজ করছি, লোকটি বল্‌লে—'ডাক্তার, তুমি হিন্দু?'

বল্‌লাম—'হ্যাঁ।'

—'আমার সেরে উঠতে ক'দিন লাগবে ডাক্তার?'

হাতখানি কনুইয়ের নীচে থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, বল্‌লাম—'ঠিক কিছু বলা যায় না।'

—'তবু?'

—'তিন চার সপ্তাহ।'

—'তিন-চা-র সপ্তাহ! প্রায় এক মাস?'—যুবকটীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল। বল্‌লে—'তার আগে আমায় সারিয়ে তুলতে পার না ডাক্তার?'

হাসি পেল, বল্‌লাম—'মানুষ ইচ্ছা করলে জগতের অনেক অনিষ্ট করতে পারে, কিন্তু ভাল করার ক্ষমতা তার কতটুকু!'

কতক্ষণ আমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে—'ডাক্তার, তুমি কখনও সিঙ্গাপুরে ছিলে?'

মাথা দুলিয়ে জানালাম—ছিলাম।

—'তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, তোমার সঙ্গে এর আগেও আমার দেখা হয়েছিল—আমায় চিনতে পার, ডাক্তার?'

একবার ভাল করে ভেবে নেবার চেষ্টা করলাম। তার সদ্য-অপারেশন-করা রক্তহীন বিবর্ণ মুখখানি ধূলোবালির রুক্ষতায় যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা'তে এখন তাকে চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। তথাপি তাকে খুসি করার জন্যই বল্‌লাম—'তোমায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না।'

যন্ত্রণাকাতর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বল্‌লে—'এত শীগ্‌গির ভুলে গেলে ডাক্তার? সেই ট্রেনে জাপানীরা আমায় সিগারেট কিন্‌তে দিলে, তাদের সঙ্গে মারামারি করলাম...'

এবার সব কথা মনে পড়ল। বল্‌লাম—'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।'

চীনাটী বল্‌লে—"সেই অপরাধের ক্ষতি পূরণের জন্যই এই হাতখানি দিতে হ'ল ডাক্তার।

ওরা আমার পিছু নিয়েছিল। আমি ঠিক সময় মত সাবধান হ'তে পারি নি; দু'দিন দু'রাত লুকিয়ে ছিলাম এক খড়ের গাদার মধ্যে। আমায় না পেয়ে শেষে ওরা সারা গ্রামেই আগুন লাগিয়ে দিলে,—যে যেখানে ছিল জীবন্ত পুড়ে মরল। তা আমিও তাদের ছাড়ি নি; সেই রাত্রেই খড়ের গাদা থেকে বের হয়ে তাদের চারজনকে কুকুরের মত গুলি করে মেরেছি, বাকী দুটোকেও শেষ করতাম, কিন্তু আমার হাতখানা জখম হয়ে গেল তাই। দলবল নিয়ে ওরা আমার পিছনে তাড়া করেছিল, কিন্তু আমায় ধরা কি ওদের কাজ! সেই ছুটোছুটিতেই বড় বেশী রক্তক্ষয় হয়েছে, শরীরটা বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তা ডাক্তার, আমি বাঁচব তো?'

—'নিশ্চয়!'

—'তা আমায় একটু তাড়াতাড়ি সারিয়ে দাও দিকি ডাক্তার, বাকী দুটোকে শেষ না করে আমি সুস্থির হ'তে পারছি না। সারা গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে, ওঃ!'

ওদিকে একটী রোগী চীৎকার করে উঠল। ব্যাণ্ডেজটা ততক্ষণে শেষ করে এনেছি, তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম সেদিকে।

যুবকটী যে ক'দিন সেইখানে ছিল প্রতিদিন আমাকে একবার স্মরণ করিয়ে দিত,—'ডাক্তার, আজ আট দিন, আজ দশ দিন,' ইত্যাদি। যেন দিনগুলির হিসাব রাখার উপরেই তার সেরে ওঠা না-ওঠা নির্ভর করছে।

উনিশ দিনের বিকালে তাকে আমরা মুক্তি দিই। তখন সে প্রায় সুস্থ হয়ে এসেছে।

তার পর ছ'মাস কেটে গেছে।

কত জন আহতের সেবা করলাম, কত সেরে চলে গেল, মরেও গেল কত জন! এম্বুলেন্স ইউনিট্ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছ'টি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। একদিন এসে পড়লাম হাংচাউ ফ্রন্টের পিছনে।

ক'দিন কাজ একটু কম পড়েছে। জাপানী বোমারুরা এই অঞ্চলটিকে ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারে নি বলে মনে হ'ল। পাহাড়ের আড়ালে আব্‌ডালে মাঝে মাঝে চীনাদের বিমান-বিধ্বংসী কামান জাপ বোমারু বিমানগুলোকে বিপর্য্যস্ত করে তুলছে। তার উপর গরিলা-বাহিনীর আক্রমণ তো আছেই,—জাপানীরা সুবিধা করে উঠতে পারছে না।

অবসর পেলে ফাঁকা আকাশের নীচে পাহাড়ের কোলে এসে দাঁড়াই। খানিকক্ষণের জন্য মনকে ছেড়ে দিই ভারতবর্ষের পানে। আহতের কাতরোক্তি শুনতে পাই না, আয়ডোফর্মের গন্ধ নাকে আসে না, রক্তের লালিমা চোঁখে পড়ে না। মনটাকে যেন একান্ত নিজস্ব করে পাই, নিজের চিন্তাকে নিয়ে খেলা করি।

সেদিনও এমনি এক সন্ধ্যায় এক গাছের কোলে ঠেস্ দিয়ে বসে আছি, এক চীনা এসে সামনে দাঁড়াল, বল্‌লে—'গুড্ ইভ্‌নিং ডক্টর!'

বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকালাম।

আমার কোন কথার অপেক্ষা না রেখেই খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে সে আমার পাশে বসে পড়ল, বল্‌লে—'কাম ফতে ডাক্তার!'

লোকটির কাপড় জামা ধূলিমলিন, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে; মুখে ধূলোর স্তর জমে উঠেছে। ভবঘুরে পাগল বলে মনে হ'ল, ভয় পেয়ে গেলাম।

লোকটি বল্‌লে—'আমায় চিনতে পারছ না ডাক্তার! আমি সান।'

একখানি কাটা-হাত চোখের সামনে তুলে ধরলে; এবার চিনলাম। বল্‌লাম—'তার পর, কি খবর?'

—'প্রতিশোধ নিলাম, প্রতিশোধ। সেই ছ'জনের দু'জন বাকী ছিল, তাদের শেষ করে দিয়েছি।'

চুপ করে রইলাম। সে বলে চল্‌লে—'হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখি তারা এদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করেছে, কথায় কথায় গুলি চালিয়েছে, কত বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে!—যত দেখতে লাগলাম, যত শুনতে লাগলাম ততই মাথার মধ্যে জ্বলতে লাগল। প্রতিশোধ নেবার জন্য দিনের পর দিন্ মতলব ঠাওরাতে লাগলাম। শেষে একদিন আমার সুযোগ মিলে গেল। একটি ছোট সহর দখল করে ওরা সহর লুঠ করতে বেরুল, দলে দলে ছড়িয়ে পড়ল সহরের মাঝে। লেফ্‌টেন্যান্ট কিন্তু বেরুল না, সৈন্যদের লুঠের একটা বড় অংশ সে তো পাবেই, মিছে ঘোরাঘুরি করে লাভ কি? বন্ধুকে নিয়ে সে সাকির পিপে খুলে বসল। আমি তখন তাদের অদূরে এক গাদা মৃতদেহের মাঝে মড়ার মত পড়ে আছি। তাদের নেশার আমেজটা যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তে একেবারে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলাম, বল্‌লাম—চিনতে পার? আমাকে দেখেই তারা হতচকিত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করতে গেল, কিন্তু তার আগেই আমি তাদের দু'জনকেই শেষ করে ফেল্‌লাম। তার পর কাল সারা রাত মার্চ্চ করেছি। দূর থেকে দেখলাম তুমি বসে আছ, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।'

জিজ্ঞেস করলাম—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'ঠিক নেই। লড়াই তো আর করতে পারব না; একখানি হাত নেই, অসুবিধা অনেক। এখন শুধু ঘুরে বেড়াব, আমেরিকা থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত, পৃথিবীময় সাড়া তুলব—'ওদের বয়কট কর। ওরা যে ব্যবসার জোরে জগতের বুকে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আমাদের ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছে, সেই ব্যবসা ওদের ধ্বংস করব।'

বলতে বলতে হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, বলে উঠল—'আমার আর সময় নেই, চললাম। অনেক কাজ বাকী, সময় নষ্ট করতে পারছি না। তুমি আমার জন্য যা করেছ তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, গুড্ বাই।'

আমার কোন কথার অপেক্ষা না রেখে সে চলতে সুরু করল।

কত দিন পরে চীনাদের এক নিউজ্ বুলেটিনে একখানি ছবি চোখে পড়ল, আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে জাপানী জিনিষ বয়কট করার জন্য এক মিছিল বেরিয়েছে। তার মধ্যে চীনাদের চেয়ে আমেরিকান্ই বেশী চোখে পড়ে। মিছিলের পুরোভাগে একখানি মুখ চেনা-চেনা লাগল। তার ডান হাতে এক 'ফেষ্টুন' মাথার উপর তুলে ধরেছে—'জাপানী জিনিষ বয়কট কর।' ছবির নীচে দেখলাম সানের নাম, সেই সে আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। আর সন্দেহ রইল না।

এইখানেই গল্প শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম—সমগ্র চীনে যদি এই ধরণের শত করা দু'জন,—মানে প্রায় এক কোটি লোকও থাকে, তা হ'লে জাপানীদের পক্ষে কোন দিনই সে দেশ জয় করা সম্ভব হবে কি?

শ্রোতাদের মধ্যে সহসা কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

কবিকিশোর

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্.এ)

নিশির ডাক

ঘুমের ঘোরের কথায় আরও নানা কথা মনে পড়্ল। ছোট বয়সে এমনি কথাপ্রসঙ্গে অনেককে বল্‌তে শুনেছি—তা'কে নিশিতে ডেকে নিয়ে গেছে—বা তা'কে নিশিতে পেয়েছে। ব্যাপারটা তখন ঠিক বুঝ্‌তে পারতাম না। যা'রা ও কথা বল্‌ত, তা'দের জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌ত তা'রা—রাত্রে ঘুমের ঘোরে তুমি জান্‌তেও পার্‌বে না, তোমাকে ডেকে নিয়ে যা'বে—নিয়ে গিয়ে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কখনো বা মেরে ফেলে কখনো বা পথ ভুলিয়ে কষ্ট দেবে।

বল্‌তে কি, ব্যাপারটা বিশ্বাস করি নি। বিশ্বাস করা যায় না এমন ত কত

আজগুবি ঘটনার কথা শোনা যায়। তার পর আমরা নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে তাঁদের কথা ভুলেই যাই। এ ক্ষেত্রেও হ'ল তাই—নিশির ডাকের কথা মন থেকে একেবারেই মুছে গেল।

আমাদের গ্রামের পাশেই আর একখানি গ্রাম। সেখানে আছে এক প্রকাণ্ড পুকুর—আর তা'র ধারে ধারে লোকের বসতি। বেশীর ভাগ লোক মুসলমান। তা'দের ওখানেই হ'বে, কিংবা মুচীপাড়াতেই হ'বে, মাঝে মাঝে খুব জোরে বাজনা বাজে। রাত্রের প্রথম প্রহরে, যখন শেয়ালরা একবার হুক্কাহুয়া সেরে নেয় তখনই শুতে যেতাম। তার পর, মাঝে মাঝে হয়ত উঠ্‌তাম—বাইরে আস্‌তে হ'ত। কিন্তু পিসিমা, ঠাকুরমা, যে কেউ একজন থাক্‌তেন সেই সময়ে পাশে। হয় পিসিমা, নয় ঠাকুরমার কাছে শুতাম—বেশীর ভাগ পিসিমার কাছেই শুয়ে থাক্‌তাম।

মাঝে মাঝে আমার বড় অসুখ হ'ত। ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি ছোট বয়সে খুবই। সেদিন বোধ হয়—সবে অসুখ থেকে উঠেছি, পথ্য করেছি কি করি নি ঠিক মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে জ্বরও চল্‌ছে আবার খাওয়াও চল্‌ছে তা'র সঙ্গে সঙ্গে, জ্বরটা একটু কমে গেলে,—এই রকম হ'ত। এ সময়টার স্মৃতি যেন মন থেকে যায় না কিছুতে। দুপুরে রোদে অত্যন্ত গরম রোয়াকের উপর দিয়ে হেঁটে গেলাম আর জ্বর গায়েই খেতে লাগ্‌লাম চিংড়ীর অম্বল দিয়ে ভাত! কিংবা জ্বর ত আস্‌বেই, জ্বর আস্‌বার আগেই দু'টো ভাত খেয়ে নেওয়া যাক্—এ রকম ইচ্ছা প্রায়ই হ'ত। যাক্, এই ম্যালেরিয়ার কথা আবার পরে বলা যা'বে। মোট কথা এ সময়ে খুবই দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছিলাম। পিসিমার কোল ঘেঁষে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে চুপ ক'রে শুয়ে আছি। হয়ত গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়েই গেছি। হঠাৎ আমার মনে হ'ল কোথায় যেন খুব জোরে জোরে বাজ্‌না বাজ্‌ছে, আর এদিকে যেন ভোর হ'য়ে এসেছে। বাজ্‌না যে কোন্ দিক্ থেকে বাজ্‌ছে, ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু ঝম্ ঝম্ ঝম্ কুড়কুড় ক'রে বাজনা চলেছেই বেজে—আর কে যেন আমাকে বল্‌ল, আমার ভেতর থেকে—ঐখানে চল, ঐখানে তোমাকে যেতে হ'বে। বিছানা ছেড়ে কখন যে উঠে পড়েছি নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই!

দালানের দরজার খিল খুলে বাইরে এসেছি—অন্ধকার রাত থম্ থম্ করছে। কাপড়-জামা খোলা অবস্থাতেই কিংবা হয়ত কাপড়খানা কাঁধের উপর ঝুল্‌ছিল এইভাবে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি, সদর দরজা খুলে। হেঁটেই চলেছি, সেই বাজ্‌নার শব্দ যেখান থেকে আস্‌ছে সেখানে আমাকে যেতেই হ'বে। এমন সময় পিসিমা ছুটে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে ধ'রে ফেল্‌লেন। বোধ হয় দরজার খিল খোলার শব্দে তাঁ'র ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

সম্ভবতঃ একেই নিশির ডাক বলে। গভীর রাত যেন ছেলেদের ডেকে নিয়ে যায়—গাঢ়, গভীর ঘুমের মধ্যে কে যেন ডাকে তা'দের! হয়ত সত্ত্বার মূলের সেই গভীর সাগর, সে তা'র তরঙ্গে তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়—সেই অন্ধকার পাথারে!

আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে—বাজ্‌না বেজে চলেছে, মাঠ আর বাঁশবনের ওপারে পাশের গ্রামে। তা'র শব্দ এখনো যেন আমার কানে লেগে রয়েছে।

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

ছয়

শোনা গেল—"আপনারা কে? কি করে এ দ্বীপে এসে পড়লেন?"

উত্তর দিলাম ইংরাজিতে। ঐ অজানা স্বরকেই উত্তর দিলাম—বল্‌লাম আমরা কে, কি করে এসে পড়েছি এই দ্বীপে। এবার ঐ স্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে, আপনিই বা কি করে এলেন এ দ্বীপে?"

স্বর উত্তর দিলে—"আমি একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক—'এথ্‌নোলজিষ্ট্' কাকে বলে জানেন? আমি একজন তাই। দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে ঘুরে তাই আমি এই সমস্ত অসভ্য আদিম জাতিদের সব তথ্য সংগ্রহ করি। ওসেনিয়া দ্বীপ থেকে এমনি সব তথ্য সংগ্রহ করে ফিরছিলাম আমি। পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ে আমার জাহাজ গেল ডুবে। লাইফ্-বোটে চড়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে শেষ পর্য্যন্ত এসে ঠেকেছিলাম এই দ্বীপে। আপনাদেরই মত ভাগ্য-দোষে পড়লাম এদের হাতে। এরা এদিকের অন্যান্য দ্বীপবাসীদের চেয়েও আরও অসভ্য, আরও বিশ্রী এবং ভীষণ এদের রীতিনীতি।"

এদিকে এতক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে, সূর্য্য হয়ত উঠেছে আকাশে, তবে এই বনের মধ্যে অসংখ্য বৃক্ষরাজি ভেদ করে তার রশ্মি এসে পৌঁছায় নি এত দূর। তা হ'লেও আলো হয়েছে বেশ। ঘরটাতে অনেক উঁচুতে একটা জানালা ছিল, সেটা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে দেখ্‌তে পেলাম যে ঘরের কোণে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় এক ভদ্রলোক পড়ে আছেন মাটীতে। তাঁর দেহ যেন মাটীতে মিশিয়ে গেছে।

তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না যে এদের মধ্যে রীতি আছে—"হেড্-হান্‌টিং" মানে মানুষের মাথা কেটে দেবতার সামনে বলি দেওয়া; তা'তে নাকি ওদের জাতির শক্তি বাড়ে। 'হোয়াইট্ ম্যান্', মানে সাদা চামড়া যে সব মানুষের, তা'দের মাথাই ওদের কাছে বেশী মূল্যবান্। আপনাদের দেশের লোককেও ছাড়ে না—বিদেশীর ত?"...একটু থেমে আবার বল্‌লেন—"আমাকে ত নিয়ে গেল বলি দেওয়ার জন্য। বহুসংখ্যক লোক জড় হয়েছে, তাদের সামনে একটা প্রকাণ্ড লম্বা পাথর—সেইটাই নাকি ওদের দেবতা। আর একদিকে একটা উঁচু জায়গায় বসে ওদের সর্দ্দার। আমাকে মাঝখানে রেখেছে ফেলে। আমাকে ঘিরে বসেছিল ওরা সকলে দু তিনটা সারি করে। মদের মত কি একটা জিনিষ খাচ্ছিল সবাই। খানিক পরে ওরা সকলে উঠে দাঁড়াল, আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ সুরু করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল ওদের সেই মাদলের মত বাজনা।...তার একটু পরে ওদের নৃত্য শেষ হ'ল, তখন ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌ল সেই পাথরটার সামনে। আর একজন খাঁড়ার মত কি একটা অস্ত্র নিয়ে এল।...সে আমার ঘাড়ের উপর সেই খাঁড়ার মত অস্ত্রটা তুলেছে—হঠাৎ সর্দ্দারটা চীৎকার করে উঠ্‌ল। আমি ওদের ভাষা জানি কিছু কিছু—দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে একটু-আধটু শিখেছিলাম। সর্দ্দার বল্‌লে—'দেখ্‌ছিস না, ওর কপালে কাটার দাগ?' সর্দ্দারের চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে। অন্য সকলে তখন ভয়ে কাঁপ্‌ছে। আমাকে বলি দেওয়া ওদের আর হ'ল না।"

ভদ্রলোকের এই কথায় আমি যেন আশার একটু ক্ষীণ আলোক দেখ্‌তে পেলাম।

বল্লাম—"আমার বোনের ত' কপাল কেটেই গেছে সেদিন এরোপ্লেন নামাতে গিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ; আমারও দু' এক জায়গায় কেটে গেছে, কপালটাও না হয় এই দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে সেই ভদ্রলোক বল্লেন—"ও কাজও কর্‌বার চেষ্টা করবেন না। প্রথমতঃ আপনার বোনের কপাল কাটা না কাটায় কিছু আসে যাবে না। কারণ স্ত্রীলোককে ওরা বলি দেয় না। উপরন্তু, ওদের সর্দ্দার হয়ত আপনার বোনকে বিবাহই করবে। কারণ, ওদের প্রত্যেকের একটী করে স্ত্রী থাক্‌লেও সর্দ্দারের বহু স্ত্রী থাকা নিয়ম। আপনার বোনটীকে যদি বিবাহ করে তা হ'লে তাকে সর্দ্দারের দাসীবৃত্তিই করতে হ'বে সারা জীবন। বলি দেবে ওরা আপনাকে। আপনি ভাববেন না যে যদি আপনার দেহে কোন কাটা দাগ থাকে বা আপনি অঙ্গহীন হন কোন রকম, তা হ'লে আপনি নিস্তার পাবেন।...তা হ'লেও আপনার মরতে হ'বে, তবে সে বহু যন্ত্রণা পেয়ে, তার পর, আমি যেমন যন্ত্রণা পাচ্ছি তেমনি যন্ত্রণা পাবেন। যদি আপনার দেহে কোনও খুঁত থাকে তা হ'লে আজ দেবতার পায়ে আপনার মাথাটা ছুঁইয়ে এনে ফেলে রেখে দেবে আমার মত হাত-পা বেঁধে। প্রত্যহ একবার করে ঐ পাথরটার কাছে নিয়ে যাবে আর ওর গোড়ায় মাথা ছুঁইয়ে আন্‌বে। একটী বৎসর এমনি করার পর তখন আপনাকে বলি দেবে—তখন নাকি আর দোষ হয় না। কাজেই, এই রকম এক বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করে মরার চেয়ে প্রথম দিনে মরাই ভাল—মরতে যখন হ'বেই শেষ পর্য্যন্ত।"

আমি আস্তে আস্তে বল্লাম—"পালান যায় না কোনও রকমে ?"

ভদ্রলোক হতাশভাবে একটু হেসে বল্লেন—"পালাবেন কি করে ? বাইরে রাতদিন পাহারা দিচ্ছে ওদেরই একজন না একজন। তার উপর পালিয়ে যাবেনই বা কোথায় ? ওদের ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব যে—"

দরজা খুলে গেল—প্রবেশ কর্‌ল তিনজন লোক। একজন ঐ ইংরাজ ভদ্রলোকটীকে নিয়ে চলে গেল। বুঝলাম ওঁর সেই দৈনন্দিন মাথা ঠেকানর পালা হ'তে চল্‌ল।

আর দু'জন প্রথমে আমার আর ইরার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পরে আমার ডান হাতের সঙ্গে বাঁধল ইরার বাঁ হাত। তার পর ইঙ্গিত কর্‌লে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য। নিরুপায়ভাবে চল্‌লাম ওদের সঙ্গে ; কোথায় তা জানি না, কেন তাও জানি না। আজই কি বলি দেবে, না, বিশেষ কোনও একটা দিনক্ষণ দেখে বলি দেবে—কিছুই জানি না। অনিশ্চিতের গভীর পথে চল্‌তে লাগ্‌লাম দুই ভাইবোনে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে—গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। (ক্রমশঃ)

কুতবের গৌরব-স্মৃতি
শ্রীবিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত গৃহীত আলোকচিত্র

অমৃত-দ্বীপ

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবন্ত মৃতদেহ

—"ডুবে মলুম, ডুবে মলুম, বাঁচাও!"—সুন্দরবাবু আবার একবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

তিনি বেশ অনুভব করলেন, দু'খানা অস্থিচর্ম্মসার, কিন্তু লোহার মতন কঠিন এবং বরফের মতন ঠাণ্ডা-কন্‌কনে বাহু তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে পাতালের দিকে টানছে, ক্রমাগত টানছে!

দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তার দিকে ভালো ক'রে তাকাতে পারলেন না বটে, কিন্তু আব্‌ছা-আব্‌ছা যেটুকু দেখতে পেলেন তাই-ই হ'ল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। সে হচ্ছে একটা মৃত-মানুষের—জীবন্ত মৃত-মানুষের—মূর্ত্তি, আর তার চোখদুটো হচ্ছে মরা মাছের চোখের মত!

রামহরি দু-হাতে জল কেটে এগুতে এগুতে সভয়ে দেখলে, "হুম্" ব'লে বিকট এক চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবু হুস্ ক'রে ডুবে গেলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে বাঘাও দিলে জলের তলায় ডুব।

ওদিকে বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিকও ততক্ষণে জলে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু তাদের আর বেশীদূর এগিয়ে আসতে হ'ল না। হঠাৎ দেখা গেল, সুন্দরবাবু আবার ভেসে উঠে প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে আসছেন! বাঘাও আবার ভেসে উঠেছে!

রামহরি খুব কাছে ছিল। সে দেখতে পেলে, জলের উপরে খানিকটা রক্তের দাগ এবং বাঘার মুখও রক্তাক্ত।

ব্যাপারটা বুঝে তারিফ ক'রে সে বল্‌লে, "বাহাদুর বাঘা, বাহাদুর!"

কিন্তু সেই আশ্চর্য্য ও অসম্ভব মূর্ত্তিটার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সকলে ডাঙার উপরে উঠল। সুন্দরবাবু আর রামহরি ও বাঘা ছাড়া সে বিকট মূর্ত্তিটাকে আর কেউ দেখে নি, সুতরাং আসল ব্যাপারটাও এখনো কেউ বুঝতে পারলে না।

বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে, লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে সুন্দরবাবু হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মত।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "সুন্দরবাবু, আপনাকে কি হাঙরে ধ'রেছিল?"

কুমার বল্‌লে, "না বিমল, তা হ'তে পারে না। হাঙরে ধরলে উনি অমন অক্ষত দেহে ফিরে আসতেন না।"

বিমল বল্‌লে, "হুঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু তবে কে ওঁকে জলের ভেতরে আক্রমণ করতে পারে?"

সুন্দরবাবু বেদম হয়ে খালি হাঁপান আর হাঁপান। এখন তাঁর একটা "হুম্" পর্য্যন্ত বলবার শক্তি নেই। বাঘা গম্ভীর মুখে এসে সুন্দরবাবুর সর্ব্বাঙ্গ শুঁকে বোধ হয় পরীক্ষা ক'রে দেখলে যে, তাঁর দেহ অটুট আছে কিনা! পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হ'ল, কারণ ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

জয়ন্ত বল্‌লে, "এখানে জলের ভেতরে অক্টোপাস থাকে না তো?"

রামহরি বল্‌লে, "কি বল্‌লেন?"

—"অক্টোপাস।"

—"তাকে কি মানুষের মতন দেখতে?"

—"মোটেই নয়। তোমাকে কতকটা বোঝাবার জন্যে বরং বলা যায়, তাকে দেখতে অনেকটা বিরাট ও অদ্ভুত মাকড়সার মত। সমুদ্রের জলে তারা লুকিয়ে থাকে আর আটখানা পা দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধ'রে মাংস-রক্ত শুষে খায়।"

—"না বাবু, না। আপনি যে কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের কথা বল্‌লেন নিশ্চয়ই সেটা ভয়ানক, কিন্তু সুন্দরবাবুকে যে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে দেখতে মানুষের মত।"

বিমল বল্‌লে, "কি যে বল রামহরি! মানুষ কি জলচর জীব? জলের ভিতর থেকে আক্রমণ ক'রে সে কি এতক্ষণ ধ'রে জলের তলাতেই ডুব মেরে থাকতে পারে?"

মাণিক মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সেই বিশাল হ্রদের মত জলরাশি একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। তাদের জাহাজ আর লাইফ-বোট ছাড়া তার উপরে আর কোন জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নেই। বিমল ঠিক কথাই বলেছে। সুন্দরবাবুকে যে আক্রমণ করেছিল নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়!

রামহরি দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "না খোকাবাবু, আমি মিছে কথা বলি নি। সে মানুষ কিনা জানি না, কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতই। সুন্দরবাবুর কোমর সে নীচে থেকে দু-হাতে আঁকড়ে ধ'রেছিল। কাচের মত পরিষ্কার জলে তার হাত, পা, মুখ, দেহ বেশ দেখা যাচ্ছিল।"

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁপ-ছাড়া হ'ল সমাপ্ত। দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে ব'সে তিনি বল্‌লেন, "হুম্। রামহরি কিচ্ছু ভুল বলছে না। আমাকে ধরেছিল একটা জ্যান্তো মরামানুষ!"

—"জ্যান্তো মরা-মানুষ!"

—"হ্যাঁ, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি—একেবারে আসল মড়া! আমি তার হাতের ছোঁয়া পেয়েছি—একেবারে কন্‌কনে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! কিন্তু সে জ্যান্তো, তার হাতের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল! মরা মাছের মত স্থির দুই চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল—বাপ রে, ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়!"

রামহরি বল্‌লে, "জ্যান্তো মড়া মানেই হচ্ছে, পিশাচ। সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই কোন পিশাচের পাল্লায় প'ড়েছিলেন! ভাগ্যে আমাদের বাঘা ছিল, তাই এ-যাত্রা কোন গতিকে বেঁচে গেলেন! বাঘার কাছে পিশাচও জব্দ!"

সুন্দরবাবু কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে বাঘার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "হুম্। বাঘা, আয় রে, আমার কাছে আয়! এতদিন তোকে আমি চিনতে পারি নি। এবার থেকে আর তোকে আমি কিছু বল্‌ব না, তোকে ভালো ভালো খাবার খেতে দেব। লক্ষ্মী কুকুর!"

মাণিক বল্‌লে, "সুন্দরবাবু, আপনি নিশ্চয় মৎস্যনারী আর নাগকন্যার গল্প শুনেছেন?"

সুন্দরবাবু বেশ বুঝলেন মাণিকের মাথায় কোন নতুন দুষ্টুমি বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাঁর পিছনে লাগা তার চিরকেলে স্বভাব। বল্‌লেন, "হুঁ, শুনেছি। কি হয়েছে তা?"

—"আমার বোধ হয় কোন মৎস্যনারী কি নাগকন্যা আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছিল!"

একটু গরম হয়ে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে সে কি করত?"

—"বিয়ে করত। আপনাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল কিনা।"

একেবারে মারমুখো হয়ে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "চোপরাও মাণিক, চোপরাও! তোমার মতন ত্যাঁদোড় আমি জীবনে আর দেখি নি, আমার হাতে একদিন তুমি মার খাবে জেনো।"

বিমল গম্ভীর মুখে ভাবতে ভাবতে বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?"

—"কিছু না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি, সুন্দরবাবুর চোখের ভ্রম হয়েছে।"

—"সুন্দরবাবুর আর রামহরির—দু'জনেরই একসঙ্গে চোখের ভ্রম হ'ল?"

—"ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার ফলেই আজ আমরা এখানে এসেছি। সেই মামলাটার কথা ভেবে দেখুন। লোকের পর লোক দেখতে লাগল, শূন্য-পথে ছায়ামূর্ত্তির মতন কে উড়ে যায়। কিন্তু তারা সকলেই কি ভুল দেখে নি? ... ... হুঁঃ, জ্যান্তো মড়া! পিশাচ! সে আবার বাস করে জলের তলায়! এ-সব কি বিশ্বাস করবার কথা?"

—"বিশ্বাস আপনাকে কিছুই করতে বলছি না জয়ন্তবাবু! কিন্তু আমার মত হচ্ছে, এ ব্যাপারটার মধ্যে কোন অলৌকিক বা অসাধারণ রহস্য থাকলেও থাকতে পারে। জীবনে

অনেকবারই আমাকে আর কুমারকে এমন সব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, যা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতে কি, অলৌকিক ব্যাপার দেখে দেখে এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এটাও ভুলবেন না যে, আজ আমরা সকলেই চলেছি কোন্ এক অজানা দেশে, অলৌকিক দৃশ্য দেখবারই আশায়। এখন আমরা সেই অমৃত-দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। আজ হয়তো এইখান থেকেই অলৌকিক রহস্যের আরম্ভ হ'ল। ঐ শুনুন, জাহাজ থেকে আবার আমাদের ডাকছে, সন্ধ্যাও হয়েছে, আর এখানে নয়।"

'পাম্'-জাতীয় একদল গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদের মুখ উঁকি মারছিল সকৌতুকে। জলে-স্থলে-শূন্যে সর্ব্বত্রই জ্যোৎস্নার রূপলেখা পড়েছে ছড়িয়ে এবং দিনের সঙ্গে রাতের ভাব হয়েছে দেখে অন্ধকার আজ যেন ভয়ে নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করতে পারছে না।

সকলে একে একে 'লাইফ-বোটে' গিয়ে উঠল। হ্রদের স্বচ্ছ জল ভেদ ক'রে চাঁদের আলো নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেখানে যাকে খুঁজছিল তাকে দেখতে পেলে না। তবু একটা ভয়াবহ অসম্ভবের সম্ভাবনা হ্রদের নীলিমাকে ক'রে রেখেছিল রহস্যময়।

... ...

... ...

... ...

চাঁদের বাতি নিবিয়ে দিয়ে এল অরুণ প্রভাত। মহাসাগরকে আলোময় ক'রে সে পূর্ব্বাকাশে এঁকে দিলে তরুণ সূর্য্যের রক্ত-তিলক। জাহাজ বেগে ছুটেছে অমৃত-দ্বীপের উদ্দেশে।

ডেকের উপরে 'মর্ণিং ওয়াক্' করতে করতে সুন্দরবাবু জাহাজের রেলিং ধ'রে একবার দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখদুটো উঠল চম্‌কে। উত্তেজিত স্বরে তিনি ডাকলেন, "জয়ন্ত! মাণিক! বিমলবাবু! কুমারবাবু!"

সবাই এদিকে-ওদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, সুন্দরবাবুর জোর-তলবে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে এল।

সুন্দরবাবু বিবর্ণমুখে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করলেন।

জাহাজের পাশেই নীলজলে ভাসছে মানুষের একটা রক্তহীন সাদা মৃতদেহ। তার ভাবহীন, নিষ্পলক ও বিস্ফারিত দুটো চোখ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জাহাজের দিকে। তার আড়ষ্ট দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, স্রোতের বিরুদ্ধে বেগবান্ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভেসে চলেছে সোঁ-সোঁ ক'রে!

হতভম্ব মুখে জয়ন্ত বল্‌লে, "আমি কি স্বপ্ন দেখছি?"

বিমল কিছু বল্‌লে না, রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে আরো ভালো ক'রে মূর্ত্তিটাকে দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু তিক্তস্বরে বল্‌লেন, "মাণিক, ঐ কি তোমার মৎস্যনারী? দেখছ, ওটা একটা বুড়ো চীনেম্যানের মড়া? ওই-ই কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল।"

মাণিক বল্‌লে, "নিশ্চয় ও বোম্বেটে-জাহাজের যাত্রী ছিল, কালকের 'টাইফুনে' জলে ডুবে মারা পড়েছে।"

—"হুম্, মারা পড়েছেই বটে! তাই স্রোতের উল্টোমুখে এগিয়ে চলেছে কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে!"

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে, "সকলে রাম-নাম কর—রাম-নাম কর। ও পিশাচ, আমাদের রক্ত খেতে চায়!"

কুমার বল্‌লে, "বিমল, 'তাও'-সাধুদের কথা স্মরণ কর। যারা 'সিয়েন্' বা অমর হয়, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ! আমরা হয়তো অমৃত-দ্বীপের কোন 'সিয়েন্'কেই আজ চোখের সামনে দেখছি।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "আজকের যুগে ও-সব আজগুবি কথা মানি কি ক'রে?"

বিমল বল্‌লে, "না মেনেও তো উপায় নেই জয়ন্তবাবু! ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার সময়েই আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দিই নি যে, কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী কত শত বৎসর বেঁচেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না? সময়ে সময়ে তাঁরও দেহ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে গঙ্গাজলে ভেসে ভেসে বেড়াত? ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা তো পৌরাণিক কথা নয়, আধুনিক যুগেরই কথা!"

—"বিমলবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবার মত যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, আর চোখের সামনে যা স্পষ্ট দেখছি তাকে উড়িয়ে দেবার শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেছি! এও কি সম্ভব? বেগবান্ অথচ আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট মৃতদেহ ছোটে আধুনিক কলের জাহাজের সঙ্গে! এর পরেও আর অবিশ্বাস করব কিসে? এখন অচল পাহাড়কেও চলতে দেখলে আমি বিস্মিত হব না!"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "ও-সব তর্ক থো করুন মশাই, থো করুন। আমার কথা হচ্ছে, 'সিয়েন্'রা কি মানুষের মাংস খায়? নইলে ও কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল কেন?"

বিমল বল্‌লে, "বোধ হয় ও আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে। ও তাই বাধা দিতে চায়, আমাদের আক্রমণ করতে চায়!"

"তাই নাকি? হুম্!"—ব'লেই সুন্দরবাবু এক ছুটে নিজের কামরায় গিয়ে একটি বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন।

কুমার বল্‌লে, "আপনি কি করতে চান সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "আমি দেখতে চাই, অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে তারা কেমনধারা অমর? আমি দেখতে চাই, ঐ জ্যান্তো মড়াটা বন্দুকের বুলেট হজম করতে পারে কিনা?"

রামহরি সভয়ে বল্‌লে, "পিশাচকে ঘাঁটাবেন না বাবু, পিশাচকে ঘাঁটাবেন না। কিসে কি হয় বলা তো যায় না!"

—"আরে, রেখে দাও তোমার পিশাচ! পুলিসের কাজই হচ্ছে যত নরপিশাচ বধ করা!"—এই ব'লেই সুন্দরবাবু বন্দুক তুলে সেই ভাসন্ত দেহটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলেন।

ফল কি হয় দেখবার জন্য সকলে অপেক্ষা করতে লাগল, সাগ্রহে।

(ক্রমশঃ)

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়; মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

ফাল্গুনের প্রশ্নের উত্তর

শর্ট, মিডিয়ম ও লং ওয়েভ:—গান বাজনা ইত্যাদিকে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করা হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে শর্ট, লং ও মিডিয়ম কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। মিটার দ্বারা এই তরঙ্গ মাপা হয়, ১ মিটার প্রায় ৩৯" ইঞ্চি। শর্ট ওয়েভের এক একটী তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১০—১০০ মিটারের মধ্যে যে কোন মাপ হইতে পারে; সেইরূপ মিডিয়ম ওয়েভ ২০০—৫৫০ মিটারের মধ্যে এবং লং ওয়েভ ১০০০—২০০০ মিটারের মধ্যে যে কোন মাপের হইতে পারে। শর্ট ও মিডিয়ম ওয়েভই আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় কিন্তু লং ওয়েভ ইউরোপেই ব্যবহৃত হয় কারণ আমাদের দেশের আবহাওয়া ইহার উপযোগী নহে।

এ. সি. ও ডি. সি:—বৈদ্যুতিক প্রবাহ যদি একটী তারের মধ্য দিয়া আসিয়া অপর একটী তারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় তবে তাহাকে ডি. সি. অর্থাৎ ডিরেক্ট কারেণ্ট কহে। কিন্তু তাহা যদি একভাবে না যাইয়া গতি পরিবর্ত্তন করে তবে তাহাকে এ. সি. অর্থাৎ অল্‌টারনেটিং কারেণ্ট কহে।

ওয়াট:—মোটর গাড়ীর শক্তি বুঝিবার নিমিত্ত যেরূপ হর্স পাওয়ার ব্যবহার করা হয় সেরূপ কোন কার্য্যে বৈদ্যুতিক শক্তি কতটা লাগিবে বা কতটা খরচ হইল তাহা বুঝিবার নিমিত্ত ওয়াট ব্যবহৃত হয়।

ভাল্‌ভ্:—এই কথাটার মানে হইতেছে যে ইহা এরূপ কোন জিনিষ যাহার মধ্য দিয়া কোন কিছু জিনিষ কেবল মাত্র একদিকেই যাইতে পারে, উল্টাদিকে ফিরিয়া

আসিতে পারে না। যেমন হাওয়া-পাম্পের মুখে ভাল্‌ভ্‌ থাকার নিমিত্ত হাওয়া ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে পারে কিন্তু বাহির হইতে ভিতরে যাইতে পারে না। তেমনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যখন শব্দ গ্রহণ যন্ত্রে পৌঁছে তখন উহা বহুমুখী থাকে এবং তাহাকে একমুখী করিবার নিমিত্ত এই ভাল্‌ভ্‌ ব্যবহৃত হয়।

—অরুণা সেন

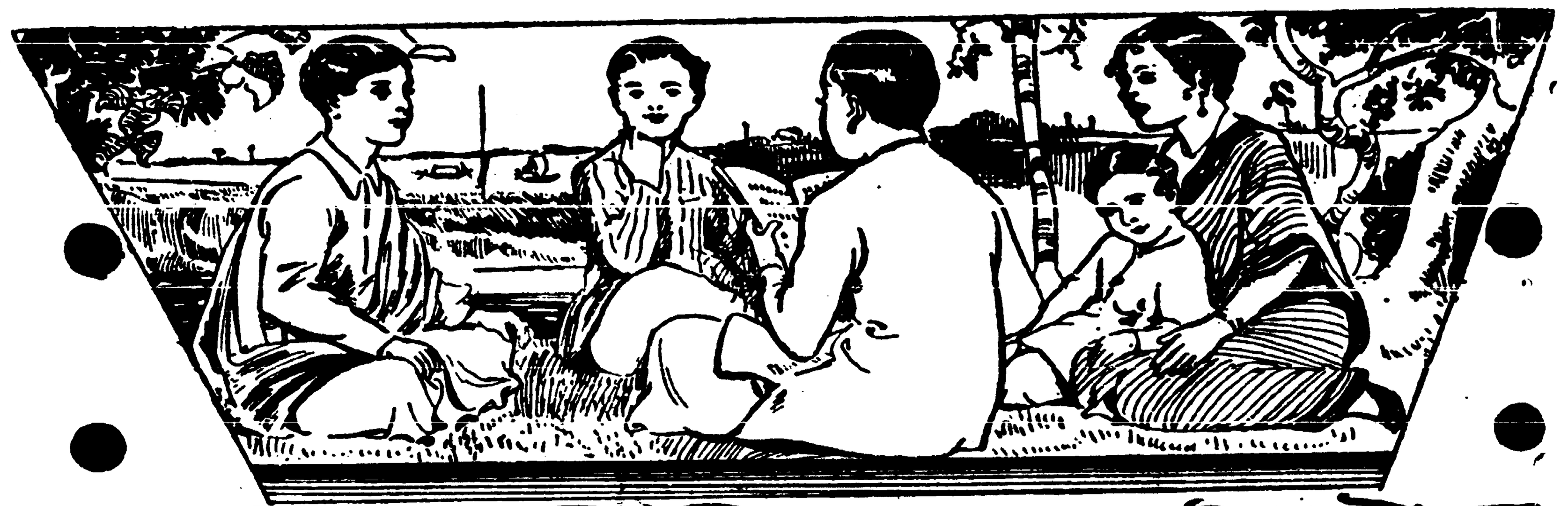

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

পেগুর চিঠি

(শ্রীমণীন্দ্র দে)

সম্পাদক মহাশয়,

পূজার ছুটিতে পেগুতে বসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে বেশ আমোদেই দিন কাটাইতেছি।

বর্ম্মাদেশের মধ্যে পেগু একটি নাম-করা সুন্দর সহর; লোক সংখ্যাও এখানকার কম নয়। ভারতীয়—বিশেষতঃ বাঙ্গালী এখানে অনেক আছেন। পেগু একটি রেলওয়ে জংশন্ এবং রেঙ্গুন-ম্যাণ্ডালে ট্রাঙ্ক্ রোডের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা একটি বড় ব্যবসার কেন্দ্র। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ইতিহাসবিখ্যাত প্যাগোডা বা 'ফয়া' আছে। উহাদের কোন কোনটা অতি-বৃহৎ এবং দেখিতেও অতি সুন্দর। গত ১৯৩০ সনº পেগুতে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে একটি সুন্দর প্যাগোডার অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। এই

প্যাগোডাটিতে প্রতি বৎসর মার্চ্চ এপ্রিল মাসে খুব বড় মেলা হয়। মেলা সাত দিন পর্য্যন্ত থাকে।

এখানে আর একটি প্যাগোডা আছে সেটিকে আমরা বলি "শোয়া ফয়া"। এখানে ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে শোয়াইয়া তৈরী করা হইয়াছে। মূর্ত্তিটি সোনালী রংএর—খুব বড় আর লম্বা; পায়ের তলায় নানা রকম পাথর দিয়া সাজানো। এখানেও প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে।

পেগুকে পেগু নদী দুই ভাগ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উপরে একটি সুদৃশ্য পোল। পেগু নদীতে সব সময়ে জল থাকে না, বর্ষাকালে খুব জল হয়; মাঝে মাঝে বন্যাও হয়। এই বৎসর পেগু টাউনে পর পর তিনবার বন্যা হইয়া গেল। এজন্য এবার চাষাদের বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে, কারণ পেগুর চারিদিকে অনেক ধান জন্মে, এখানকার প্রধান ফসলই ধান। এই বৎসর অন্যান্য বৎসরের মত অত ধান জন্মিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

পেগুতে বড় বড় কাষ্ঠের বংসাল (Sawmill) আছে। পেগুর পাহাড়ে খুব বড় বড় ও চমৎকার মজবুৎ কাঠ পাওয়া যায়। সেই সমস্ত কাঠ রেলে অথবা নদীতে ভাসাইয়া এখানে আনা হয়। কাঠ অবশ্য যে কেউ কাটিতে পারে না। কাটিতে হইলে গভর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ নিতে হয়। এখানে চাউলের কলও অনেক।

পেগু একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহর। এখানকার ঘরবাড়ী সমস্ত কাঠের, এবং দেখিতে ভারী সুন্দর। বর্ম্মাদের বাতি জ্বালাইবার দিন আসিয়া পড়িল। আমাদের লক্ষ্মীপূজার দিন হইতে সুরু হইবে। এটি এদের বেশ বড় উৎসব। এই সময় বর্ম্মারা কাগজ দিয়া নানা রকম সুন্দর সুন্দর বাতি ঘরে ঘরে জ্বালাইয়া রাখে—এমন কি স্কুলেও বাতি জ্বালান হয়।

'হারানো দিনের স্মৃতি'

(শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল)

সহর ছেড়ে নদীর ধারে নিত্য আমি আসি,
জলের কোলে ঢেউয়ের দোলা দেখতে ভালবাসি।
ঢেউয়ের দোলায়, কলস্বরে প্রাণে উজান লাগে,
মনের মাঝে হারিয়ে-যাওয়া শতেক কথা জাগে।

মাঠের ধারে, নদীর পারে একলা বসে থাকা,
সকাল বেলা নদীর জলে সোনার আলো মাখা।
নিঝুম দুপুর, তালের মাথায় একলা ঘুঘুর ডাক,
নীরব সবই, মাঝে কেবল, মাঝির উচ্চ হাঁক।

তালের ছায়া দীর্ঘ ক'রে রবির নামা পাটে,
পাখীর ফেরা আপন কুলায়, চাষীর চলা বাটে।
হাটের লোকের নৌকো ক'রে ফেরা আপন ঘরে,
সুদূর দিনের এ সব কথায় মনটা কেমন করে।

সোনার রবি, সোনার ছায়া, স্বপন মায়া মেখে,
নদীর সাথে কইত কথা, সোনার ছবি এঁকে।
মিলিয়ে আলো দূর দিগন্তে নাম্‌ত আঁধার সাঁঝে,
পথিক দলে পান্থশালায় থামত পথের মাঝে।

রাতের মায়া—আঁধার মায়া, স্বপন-ঘেরা কায়া,
দিনের শেষে আসত রে ঘুম, নামত চোখে ছায়া।
কোথায় গেল সে সব সময়! পাব না হায় ফিরে,
ছায়ার মত দীর্ঘ হ'য়ে বয়স চলে ধীরে।

কোন্ এক দিনে সন্ধ্যা বেলায় মিলিয়ে যাব আমি,
পথ চলিতে পথের মাঝে হঠাৎ যাব থামি'।
বেদন-ভরা মধুর এ সব ভাবতে ভালবাসি,
তাই তো ওরে, নদীর ধারে নিতুই আমি আসি।

চৈত্র মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

পাঠক-পাঠিকার ভোটে দশ জন কবির নাম গুণানুসারে এই রকম হয়েছে :—

১ম—মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬ষ্ঠ—ভারতচন্দ্র রায়
২য়—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৭ম—রজনীকান্ত সেন
৩য়—নবীনচন্দ্র সেন	৮ম—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৪র্থ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯ম—অক্ষয়কুমার বড়াল
৫ম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১০ম—গোবিন্দচন্দ্র দাস

এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠিয়েছেন শ্রীরমা দত্ত (পোঃ ও গ্রাম সিংরৈল, ময়মনসিংহ)। এবারকার পুরস্কার তিনিই পাবেন। আগামী সংখ্যায় আবার নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা দেওয়া হবে।

চিত্র-পরিচয়

এবারকার মুখপত্রে যে ছবিখানা দেওয়া হয়েছে সেটি একটি পৃথিবী-বিখ্যাত ছবি। মহাবীর নেপোলিয়ান্ আল্‌স্ পাহাড় পার হয়ে যাবার জন্ত তাঁর সৈন্তদের ডাকছেন। নেপোলিয়ানের মুখে দৃঢ় সংকল্প আর অদ্ভুত তেজস্বিতার ভাব ফুটে উঠেছে। (এবার থেকে আমরা আস্তে আস্তে পৃথিবীর বিখ্যাত ছবিগুলি রামধনু মারফৎ তোমাদের উপহার দেব। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়ও এই রকম একটি ছবি দেওয়া হয়েছিল ;)

কলকাতার ফুটবল-বিরোধ শেষ হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গেও আই-এফ্-এর একটা মিটমাট হয়েছে এবং মহামেডান স্পোর্টিং দল লীগ্ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। গোড়ার দিকে "কালীঘাট" প্রথম স্থান অধিকার করে ছিল, এখন গত বারের লীগ্-বিজয়ী মোহনবাগান প্রথম যাচ্ছে। ইষ্টবেঙ্গল এবং রেঞ্জার্স্— এরাও উপরের দিকেই আছে। মহামেডান স্পোর্টিং অল্প কয়েকটা ম্যাচ্ খেলেছে, কিন্তু তাতেই তাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ— মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিংকে ২ গোলে হারিয়েছে।

*　　*　　*

প্রসিদ্ধ টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়, নবনগর দলের অমর সিং আর ইহলোকে নেই। তাঁর খেলা তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ। "বোলার" হিসাবে এদেশে তাঁর সমকক্ষ বোধ হয় আর কেউই ছিল না, তাঁরই সাহায্যে ভারতীয় দল বহু ম্যাচে সাফল্য লাভ করেছিল। 'ব্যাটিং'এও তিনি নেহাৎ কম ছিলেন না। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে ক্রীড়া-জগতে প্রচণ্ড ক্ষতি হ'ল সন্দেহ নেই।

*　　*　　*

ইয়োরোপে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গেল বারের রামধনু প্রকাশিত হ'বার পর আরও অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। জার্ম্মান্‌রা হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের বেশীর ভাগ অংশ এবং ফ্রান্সেরও কোন কোন জায়গা —এমন কি ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্ত্তী কয়েকটা ফরাসী নগর দখল করে ফেলেছে। ৪ঠা জুনের খবর—প্যারিস সহরের উপরও বোমা বর্ষণ হয়ে গেছে। মিত্রশক্তিও জার্ম্মেনীতে পাল্টা বোমা বর্ষণ করেছে।

হল্যাণ্ডের রাণী ইংলণ্ডে চলে গেছেন। বেলজিয়ামের রাজা প্রথমটা জার্ম্মান্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। অবশ্য বেলজিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট (এখন ফ্রান্সে স্থানান্তরিত) রাজার আদেশ না মেনে যুদ্ধ চালাবেন ঠিক করেছেন।

ওদিকে নরওয়ের যুদ্ধের পরই বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্টে খুব সোরগোল হয় এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন্ পদত্যাগ করেন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে—এবার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন মিঃ চার্চ্চিল। অবশ্য চেম্বারলেন্ সাহেবও বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার মধ্যে আছেন, তবে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নয়।

ফ্ল্যাণ্ডার্সে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। মিত্রশক্তি নানা স্থানে জার্ম্মান্‌দের প্রচণ্ড বিক্রমে বাধা দিচ্ছে। যুদ্ধের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। ওদিকে ইটালী যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধে নামতে পারে বলে মনে হচ্ছে। তা হ'লে আমেরিকারও মিত্রপক্ষে যোগ দেবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ অধিবেশন সমারোহের সঙ্গে শেষ হয়েছে। সভাপতি হয়েছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ-চন্দ্র ঘোষ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন।

*　　*　　*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্পোরেশনের সহযোগিতায় কলকাতায় একটা "বৈ জ্ঞা নি ক যা দু ঘ র" (Science Museum) তৈরী করবার কথা বিবেচনা করছেন। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্র সা র বৃ দ্ধি র জন্য এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ঘড়ি

উত্তরদাতাদের নাম

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); সতী, গোপাল ও রেণুকা মৈত্র (রাজসাহী); শোভনা দেবী (মধুবনী); ছানু, কানু, সুশীলকান্ত বিশ্বাস (কুমিল্লা); শৈলেশ, অনিল, নিখিল, বিনু, শান্তি, ছায়া, মায়া (জলপাইগুড়ি); দেবদাস চ্যাটার্জ্জী (হাজারীবাগ); দীপেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); শক্তিরাম মুখার্জ্জী (নসিগ্রাম); লীলা দাস (কুমিল্লা);

নীলয় মজুমদার, মঞ্জু, ইন্দিরা ও দিদিভাই (কলিকাতা); বাণী, কিকি, খোকা, উমা, বুলী, বাবলু (চাইবাসা); ভবানীপ্রসাদ চ্যাটার্জ্জী (দিনাজপুর); পঞ্চানন দাস (ত্রিবেণী); নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (পাটনা); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); রত্না দেবী (পাটনা); সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার (চাপাই-নবাবগঞ্জ); কুট্টু ও বাচ্চু (ধুবড়ী); অনিমা, লতিকা, লাবণ্য, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দ্বারিকানাথ মণ্ডল (মাদারীপুর); রমলা নন্দী (শিলং); কালিপদ পাল (রাজসাহী); প্রসিত ও প্রস্তোৎ বাগ্চী (রাজসাহী); কমলা দত্ত (মানকাচর); শুভাশীষ সরকার (সরিষা); শান্তিকান্তি চ্যাটার্জ্জী (চাঁদপুর); বাণীমঞ্জুষার সভ্যবৃন্দ (যশোহর); অজিত, পিল (খুলনা); মতিলাল চৌধুরী (রংপুর); শৈলেন্দ্রকুমার দে (গৌহাটী); প্রভা, প্রীতি, সুকু, ভবানী, হণ্ডু (উড়িষ্যা); রমেন্দ্রনাথ মিত্র (রাঁচী); কাকা, কাকীমা, অশোককুমার দত্ত, পূর্ণিমা, অরুণ, জ্যোৎস্না, ঝরণা, তূলিকা (বহরমপুর); ইন্দ্রানী রায় (পাটনা); প্রেমব্রত দাশগুপ্ত (বেনারস); আশালতা গুহ, রবী রায়, মনোজিৎ গুহ, রণজিৎ গুহ, চিত্রা চক্রবর্ত্তী (ঢাকা) কল্যাণব্রত দাশগুপ্ত (বর্দ্ধমান); সুনীলকুমার সরকার (লাহেরিয়া-সরাই); সুধাংশুরঞ্জন প্রামাণিক (কলিকাতা); লিলি, বেলা, রবি, বাদলা, বর্ষা (সিংভূম)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীপাঁচুগোপাল বসু)

রাম বাবু আমার জ্যেঠামশায়ের বন্ধু। সেদিন হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল জ্যেঠা মশাইএর কাছে—"আসছে বৃহস্পতিবার আমার ১৬শ জন্মদিন, তোমাকে আসতে হবে।" চিঠিটা দেখে অবাক্ হলাম। রাম বাবু আর জ্যেঠামশাই একই বছর জন্মেছেন, আর জ্যেঠামশাই তো এই ১৯৪০এ ৬৪ বছর পার হ'লেন! রাম বাবুর কি তবে মাথা খারাপ হয়েছে? জ্যেঠামশাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ধমক দিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ, ও ঠিকই লিখেছে। এখন যা, পালা।"

পালিয়ে তো এলাম কিন্তু রহস্যের সমাধান তো হ'ল না। তোমরা বুঝিয়ে দিতে পার?

বিপদের আভাস

রয়াল একাডেমি অব্ আর্টস্-এর শিল্পী
এইচ. হার্কোর্টের অনুসরণে

শিল্পী—শ্রীসুশীলনারায়ণ রায়

C. H. ARAN & CO CAL

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৭ { ৭ম সংখ্যা

রাত-দুপুরে 'টাপুর-টুপুর'

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

রাত-দুপুরে 'টাপুর-টুপুর'
বাজায় নূপুর
বাদল-রাণী,
অন্ধকারে
বন্-বাদাড়ে
উড়ছে সজল আঁচলখানি।
বাতাস কাঁপে বেত্‌স বনে,
মাদার তলে আঁধার কোণে—
ভেজা-ঝিঁঝির ঝাঁঝর বাজে,—
মাঝে মাঝে;

ধারা-জলের তলে তলে
ভিজ্‌ছে জোনাক্ দলে দলে,—
সোনা-ব্যাঙের শানাই শুনি জলার ধারে
বারে বারে।

ঝাঝর-আকাশ জুড়ে জুড়ে
মেঘ-ডমরু গভীর সুরে
বাজায় কে আজ শেষের রাতে ?
বাদল মেয়ে জল-ঘুঙুরে
রাত-দুপুরে
নাচ জুড়েছে তারই সাথে।

ঘুম-ভাঙা কোন্ অচিন্ পাখী
করছে উদাস ডাকাডাকি!
ঘুম-হারা আজ আমার আঁখি
রাত-দুপুরে,—
মন মেতেছে টাপুর-টুপুর মধুর সুরে।

ঝাপ্‌সা সজল আষাঢ় রাতি—
বাদল বাতাস উঠ্‌ছে মাতি;
রবি বাবুর গানখানি আজ জাগ্‌ছে শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
"বহু যুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এলো আমার মনে।"

অভিশপ্ত হীরা

(শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়, বি. এস্-সি)

অনেকে বিশ্বাস করেন যে কোন কোন মণিমুক্তার সঙ্গে সময় সময় মানুষের ভাগ্যও জড়িত থাকে। দু'শ' বছরের মূর্ত্তিমান্ অভিশাপ "হোপ্" নামক হীরা খানি নাকি এই রকম। এর রোমাঞ্চকর ইতিহাস শুনলে অবাক্ হ'তে হয়। এখনও নাকি এ হীরকটীর অভিশাপ কাটে নি। ওর বর্ত্তমান অধিকারী এভালীন ম্যাকলীনকে এই সেদিনও সাংঘাতিক বিপদে পড়তে হয়েছিল। তাঁকে গুম্ করবার ভয় দেখিয়ে চিঠি এসেছিল এবং ফলে কয়েকজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্ তাঁকে সর্ব্বদা আগলে রাখ্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন।

শোনা যায় এই হীরাটি প্রথমে ছিল ভারতবর্ষের কোন এক হিন্দু-মন্দিরে। ট্যাভেনার সেখান থেকে হীরাটী হস্তগত করে। হীরাটী অত্যন্ত উজ্জ্বল—অদ্ভুত সুন্দর নীল রংএর—ওজনও ছিল প্রায় ৬৭ ক্যারাট। হিন্দু দেবতার এই পবিত্র হীরকটী লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাভেনার হিন্দু দেবতার সাংঘাতিক অভিশাপ পেয়েছিল কিনা কে জানে?

হোপ্ ডায়মণ্ডের প্রথম বলি ট্যাভেনার নিজে। শোনা যায় কিছুকাল পরেই ভ্রমণে বেরিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কতকগুলি বন্য কুকুরের হাতে প্রাণ হারায়। এর পরের ইতিহাস খানিকটা জানা যায় নি। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই তাঁর সুন্দরী রাণী মেরী এণ্টনিয়েটের জন্য প্যারিসে এটী ক্রয় করেন। কিন্তু রাণীর অনিন্দ্যসুন্দর গলায় হীরকটী অতি অল্পকালই থাকতে পেয়েছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লবের সময় হীরক সমেত রাণীর গলাটি দ্বিখণ্ডিত করা হয়। হীরাটী বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে। এর পর সেটাকে দু' টুকরো করা হয়। ৪৪½ ক্যারাট ওজনের বড় খণ্ডটী লণ্ডনের এক জহুরীর হাতে গিয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী হেনরী টমাস্ হোপ্ হীরকটী ক্রয় করেন। হোপের স্ত্রীর মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৮৮৭) হীরকটী তাঁর শোভাবর্দ্ধন করেছিল। মরবার সময় হীরকটী তিনি তাঁর মেয়ে ডাচেস্ অব্ নিউ ক্যাস্‌ল্

এর কনিষ্ঠ পুত্রকে (পরবর্ত্তী কালে লর্ড হোপ্) স্বীয় সম্পত্তি সহ দান করে যান।

এইবার পুনরায় দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হ'ল। লর্ড্ হোপ্ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দেনায় ডুবলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অভিনেত্রী মে য়োপকে বিবাহ করলেন। যে হীরকটী একদিন হিন্দু দেবতার শোভাবর্দ্ধন করত সেটী এখন থিয়েটার ষ্টেজে আবির্ভূত হ'ল। তাঁদের বিবাহ সুখের হয় নি। মে য়োপ্ তাঁদের দুর্ভাগ্যের

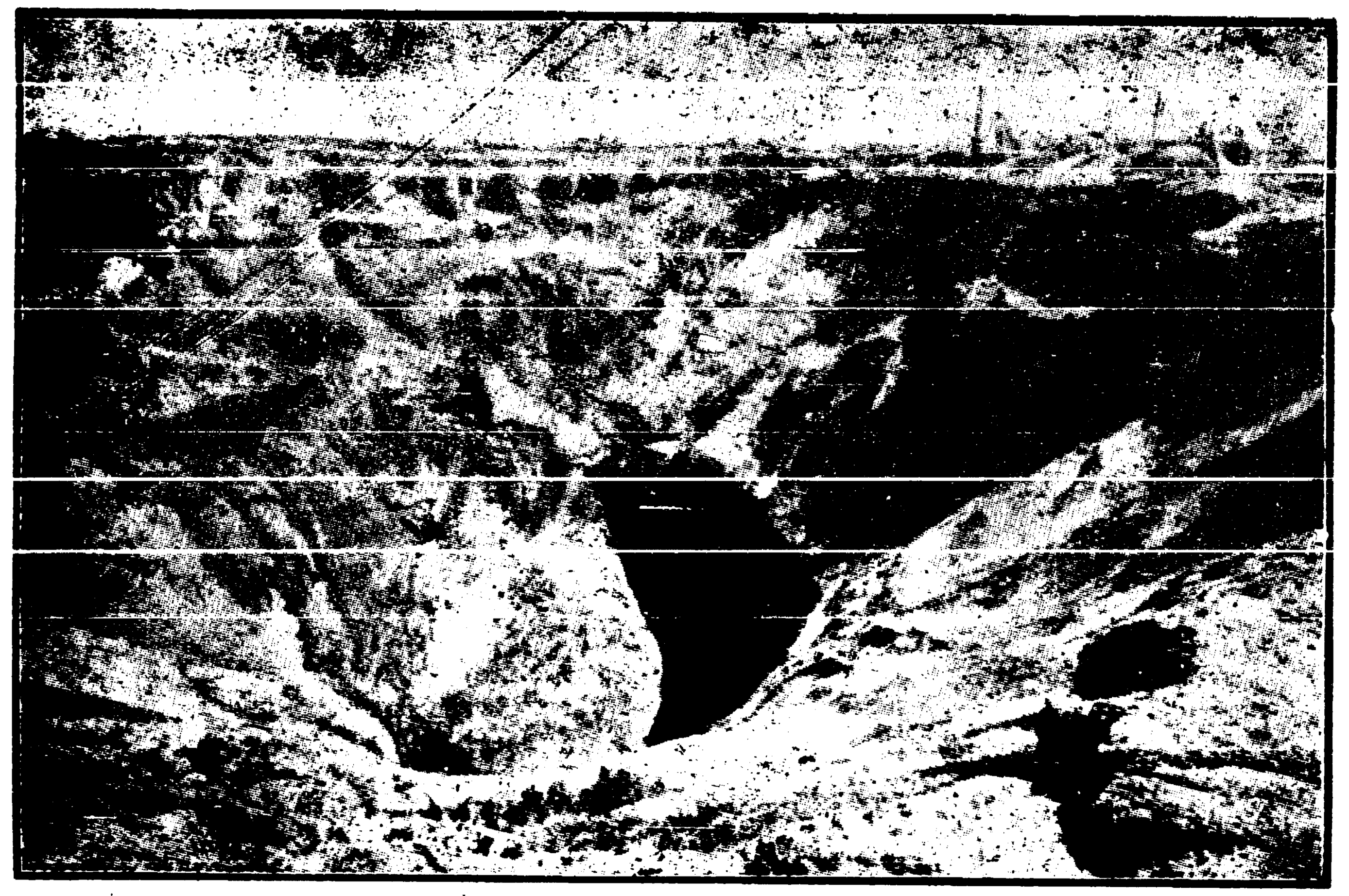

যেখান থেকে হীরা আসে। আফ্রিকার হীরক-খনির একটি দৃশ্য

জন্য হীরাটীকেই দোষ দিতেন। লর্ড দেউলে হয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হীরাটী কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হ'ল।

হীরাটী পুনরায় আবির্ভূত হয়ে যে কাণ্ড ঘটালে তা উপন্যাসেই শোনা যায়। হীরকব্যবসায়ী স্যর্ কাস্পার ব্লাক্-এর কাছে একদিন একটী বৃদ্ধ এসে ময়লা একটা থলি থেকে কতকগুলি হীরা বার করলে। "ব্রাইটনে শেরীফের নীলাম থেকে সস্তায় কিনেছি," সে বল্লে—"একজন অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামীর সম্পত্তি নীলাম হ'ল। হীরাগুলি একটা পরিত্যক্ত ট্রাঙ্কে পাওয়া যায়। নকল বলে এগুলো কেউ-ই কিনতে চায় নি।" এই হীরাগুলির মধ্যেই তিরিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের নীলাটী ছিল। স্যর্ কাস্পার একজন আমেরিকান্ হীরকব্যবসায়ীকে ওটি বিক্রী করলেন। তাঁরা আবার সেটি বিক্রী করলেন সুলতান আবদুল হামিদকে। হামিদ তাঁর এক বেগমকে সেটি উপহার দিলেন। এইভাবে নীলাটী থিয়েটার ষ্টেজ থেকে প্রবেশ কর্‌ল হারেমে।

ফলে আবার বিদ্রোহ ও রক্তের স্রোত বইল। নীলার অধিকারিণী বেগমকে ছোরা মেরে হত্যা করা হ'ল। হোপ্ ডায়মণ্ডকে তার পর আমরা আমেরিকায় দেখতে পাই। বিশ্বযোড়া দুর্নাম সত্ত্বেও মিসেস্ ম্যাকলীন্ হীরকটী এম্, কার্টারের কাছ থেকে এক শ' চুয়ান্ন হাজার ডলার দিয়ে কিনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মাকে টেলিফোনে জানালেন যে তিনি এখন বিশ্ববিখ্যাত হোপ্ ডায়মণ্ডের অধিকারিণী। এ কথা শুনে তাঁর মা তো প্রায় মূর্চ্ছিত হবার জোগাড়। তিনি এক বন্ধুকে নিয়ে স্বয়ং এভালীনের বাড়ীতে এলেন এবং হীরকটী ফিরিয়ে দিতে বিস্তর অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই এভালীনের মন টল্‌ল না। এর এক বছরের মধ্যেই তাঁর মা ও সেই বন্ধুটী হঠাৎ অসুখে মারা গেলেন—কে জানে হয়তো ঐ অভিশপ্ত হীরাটী স্পর্শ করেছিলেন বলেই।

এর পর মিসেস্ ম্যাকলীন হীরাটী কা'কেও স্পর্শ কর্‌তে দেন নি—অবশ্য নিজে ছাড়া। নিজেও তিনি এখনও বিশ্বাস করেন—হীরকটী অভিশাপগ্রস্ত। হীরাটীকে অভিশাপমুক্ত করবার জন্য একবার তিনি এক পুরোহিতের কাছে ওটা নিয়ে গিয়েছিলেন। পুরোহিত হীরাটী একটী চেয়ারে রেখে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করতে যাবেন—ঠিক সেই সময় নাকি তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হ'ল! ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি সুরু হ'ল। বজ্রপাতের ভীষণ শব্দে পুরোনো গীর্জ্জাটী থর থর করে কাঁপতে লাগল। সামনের মাঠের একটা প্রকাণ্ড গাছ বাজের ঘায়ে সশব্দে পুড়ে গেল। এভালীনের মনে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল।

যাই হোক, পুরোহিতের আশীর্ব্বচনও হীরাটিকে শাপমুক্ত করতে পারে নি। এভালীনের জীবনে এর পরে আরও দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁর আর্থিক সৌভাগ্যেও

নাকি ভাঁটা দেখা দিয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীতে এভালীন হোপ্ ডায়মণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস

সাত

অনিশ্চিতের পথে চলেছি—গভীর অরণ্যের পথে।

ইরার মুখের সে দীপ্তি গেছে নিভে। অতি ধীরে ধীরেই বল্লে সে,—"ছোড়্দা, তুমি ত' জান, মরণকে আমি কোনও দিনই ভয় করি নে—বরঞ্চ বিশেষ দু' এক প্রকারের মরণকে আমি ভালবেসেই আলিঙ্গন কর্তে চিরকাল রাজি; সেদিন যেমন সোজা নেমে যাচ্ছিলাম এরোপ্লেনের বুকে চড়ে সোজা সমুদ্রের অতলগর্ভে: কি সুখমৃত্যুই হ'ত যে! আজ এদের হাতে মরলে সে রকম সুখমৃত্যু হয়ত হ'বে না—তবুও ত' রোগে গলা টিপে মেরে ফেলার চেয়ে ভাল।…কিন্তু, যা শুন্লাম ঐ ভদ্রলোকটীর কাছে তাতেই যে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে আসছে ছোড়্দা।… আমাকে ত ওরা মারবে না—আমাকে ওদের দাসীবৃত্তি কর্তে হ'বে যে আজীবন! আজীবন সহ্য কর্তে হ'বে ওদের অমানুষিক অত্যাচার, পীড়ন। তার উপর—উঃ, আমারই চোখের সামনে ওরা তোমাকে দেবে বলি!…" ইরার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্তে লাগ্ল।

ইরার চোখে জল! ইরার চোখে জল এই প্রথম দেখলাম আমার জীবনে। আমি জানি, ইরা ভালবাসে তার ছোড়্দাকে নিজের চেয়েও। আজ যে ও ব্যথায় ভেঙ্গে পড়েছে সে শুধু এই ভেবে যে ওরা ওর ছোড়দা'কে নৃশংসভাবে করবে হত্যা—ওকে না করে।…স্বার্থপর মানুষ! এই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, ছোট বোন্টীর এই অসীম ব্যাকুলতার মাঝেও মনটায় আনন্দের একটু ছোঁয়াচ লাগল এই ভেবে যে ছোট বোন্টীর অন্তরে কতখানি অগাধ ভালবাসাই না জমে রয়েছে

আমার জন্য! তার জন্যই না আজ ও এমনি করে ভেঙ্গে পড়েছে—ওর মত মেয়েরও চোখ ফেটে জল বা'র হয়েছে!

আমিও আমার নিজের মনের কোণে বাঁচবার কোন ক্ষীণ আশা দেখ্তে পাচ্ছিলাম না। তবুও জোর করেই বল্লাম—"ইরা, তোর মত মেয়ের এত কাতর হ'লে চল্বে কেন? মৃত্যুর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনকে দৃঢ় রাখতে হ'বে আমাদের। আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্তে হ'বে, বাঁচবার কোনও উপায় মেলে কি না কোনও দিক্ থেকে।"

চলেছি সমানে সোজা গভীর অরণ্যের পথে। ঐ অসভ্য দুটোও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। একটা চলেছে ঠিক আমাদের আগে, আর একটা চলেছে আমাদের পিছনে আমাদের হাতবাঁধা দড়িটার একটা প্রান্ত ধ'রে।

হঠাৎ সামনের লোকটা থম্কে দাঁড়াল। কান পেতে কি যেন শুন্ল। ফিরে তাকাল আমাদের পিছনের লোকটার দিকে। ওর মুখে বেশ একটা আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখলাম। কি বলাবলি কর্ল ওরা দু'জনে। তার পর তাড়াতাড়ি ওরা যে পথে যাচ্ছিল সে পথ ছেড়ে আমাদের নিয়ে অন্য পথে চল্তে লাগ্ল। চল্তে লাগ্ল অতি সন্তর্পণে।

ইরা বল্লে, "ছোড়্দা, ওরা কি রকম ভয় পেয়েছে, দেখছ? নিশ্চয় ওরা কোনও বিপদের আভাস পেয়েছে।" ফিস ফিস্ করেই বল্লে ইরা।

আমি বল্লাম—"যদিও দৈহিক আকৃতিতে ওরা মানুষ বটে, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে পশুদের সঙ্গেই ওদের মিল বেশী। ওদের হয়ত আমাদের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি নেই কিন্তু ওদের ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের চেয়ে ঢের প্রবল—ঠিক পশুদের মতই। তোর আমার শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি যেখানে পৌঁছায় না, ওদের শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি তার চেয়ে ঢের বেশী দূর পৌঁছায়। তা'ছাড়াও ওদের একটা জন্মগত ক্ষমতা থাকে—যাকে আমরা ইংরাজিতে বলি 'ইন্‌ষ্টিংক্ট্'—যার দ্বারা ওরা বহু পূর্ব্ব থেকেই বিপদের একটা আভাস পেতে পারে।…যাই হোক, কি বিপদের আভাস ওরা পেয়েছে তা বুঝতে পাচ্ছি না—তবে এটা তুই ঠিকই বলেছিস্ যে বিপদের আভাস ওরা একটা পেয়েছে।… দেখা যাক্, হয়ত ওদের ঐ বিপদ্ থেকেই আমাদের পরিত্রাণ মিল্তে পারে।"

চলেছি নতুন পথ ধরে,—বেশ খানিকক্ষণ চলেছি।

হঠাৎ সামনের লোকটা আবার থম্কে দাঁড়াল। এবার আর কান পেতে শোনার দরকার হ'ল না। আমরাও এবার বেশ স্পষ্ট শুন্তে পেলাম—এক সঙ্গে অনেকগুলো কি যেন বাজ্ছে—দম্, দম্, দম্…। তার সঙ্গে অনেকগুলো মানুষেরও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, যেন ভেসে আস্ছে কানে। তা'রা যেন ঐ বাজ্নার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে কি একটা বল্ছে—"ওয়া, ওয়া, ওয়া—লী; ইয়া, ইয়া, ইয়া—লী; ওয়ালো, ইয়ালো—উয়ো।"

তা'রা সেই গভীর অরণ্য ভেদ ক'রে আমাদের দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে মনে হ'ল। এরা আমাদের নিয়ে আবার অন্য পথ ধরল! পথ বল্‌লে ভুল হয়—বিপথ বলা উচিত। কারণ এর আগে যে দুটো পথ ধরে চলেছিল ওরা আমাদের নিয়ে তার চতুর্দ্দিকে গভীর অরণ্য হলেও, পথ দুটো মানুষ চলে চলে অনেকখানি করে বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার যেখান দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চল্‌ল—সেখান দিয়ে কোন পথ নেই। মানুষের পায়ের চিহ্নও কোনওদিন বোধ হয় পড়ে নি সেখানে। ওদের দেখে মনে হ'ল যে ওরাও জঙ্গলের সে অংশ চেনে না। ওরা যে কোথায় চলেছে তা ওরাও জানে না—বনবাদাড় ভেঙ্গে আমাদের টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে ছুটেছে—প্রাণের ভয়ে।

ইরার আর আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও।

ইরা বল্‌লে—"ছোড়্‌দা, প্রাণ যে যায়! এরা কোথায় টেনে নিয়ে চল্‌ল আমাদের? কি হ'ল এদের? ঐ শব্দ শুনে এরা এত ভয় পেল কেন? ও শব্দ কিসের—কারা ও রকম চীৎকার কর্‌ছে?…"

কথা বল্‌বার সময় তখন নয়। তবুও মাঝে মাঝে তা'রা যখন থামছিল একটু তখনই হয়ত একটু কথা বল্‌বার ফুরসুৎ পাচ্ছিলাম।

ইরার কথার উত্তরে বল্‌লাম—"ওরা বুঝ্‌তে পেরেছে যে আর এক বিপক্ষ দলের অসভ্যরা আস্‌ছে ওদেরই আক্রমণ কর্‌বার জন্য। দরকার হয় ত' ওরা যুদ্ধ কর্‌বে এদের দলের সঙ্গে। যুদ্ধের কারণ হচ্ছি বোধ হয় আমরাই দু'জন।"

ইরা অবাক্ হয়ে গেল, বল্‌লে, "কেন—আমরা কি কর্‌লাম?"

আমি বল্‌লাম—"শুন্‌লি না, ঐ ভদ্রলোক বল্‌লেন যে ওদের ধারণা যে ওদের দেবতাদের সামনে আমাদের বলি দিলে ওদের জাতির শক্তি বাড়ে। এ সব বৃহৎ অরণ্যবেষ্টিত জায়গায় দু' তিন দল অসভ্য বাস করে অনেক সময়। ওদের মধ্যে সব সময় চলেছে রেষারেষি—যখন তখন কারণে অকারণে বাধে তুমুল যুদ্ধ—নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলে ওদের মাঝে। এ দলেরা আমাদের হস্তগত করেছে এ খবর হয়ত ও-দলের লোকেরা পেয়েছে। তাই আস্‌ছে ওদের কাছ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে। এরা দুটোয় যদি আমাদের নিয়ে পালাতেও পারে এবং ওদের দলের মাঝে হ'তে পারে উপস্থিত তা হ'লেও নিস্তার নেই। প্রচণ্ড লড়াই সুরু হ'বে নিশ্চয়ই দুই দলের মাঝে। তবে এখন এই দুটোকে যদি ওরা ধরতে পারে তা হ'লে এদের দুটোকে বর্শার আঘাতে শেষ করে রেখে আমাদের নিয়ে ওরা চলে যাবে।"

ইরা বল্‌লে—"আমাদের ফেলে রেখে এরা দুটো পালাচ্ছে না কেন?"

উত্তরে বল্‌লাম—"আমাদের ফেলে রেখে পালালে এদের জীবন যে অন্য দিক্ থেকে বিপন্ন হ'বে! এদের দলের লোকেরা এদের প্রাণ নিয়ে নেবে যে!"

ইরা বল্‌লে—"আমাদের তা হ'লে নিস্তার নেই যে দলের হাতেই পড়ি না কেন। বলি আমাদের দেবেই, তা সে যে দলই হোক—"

চলেছি সমানে ঐ রকম ভাবে ওদের টানেতে বন-জঙ্গল ভেদ করে।

কিছু দূর যাওয়ার পর সেই শব্দ আর চীৎকার কমে এল অনেকটা, শেষকালে আর শোনাই গেল না।

এরা এবার একটু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। আমাদের চেয়ে প্রাণের ভয় যেন ওদেরই এখন বেশী।

এবার ওদের একজন আমাদের নিয়ে এক এক জায়গায় একটু করে অপেক্ষা কর্‌তে লাগল আর অপর লোকটা বনের মধ্যে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বেশ করে দেখে আস্‌তে লাগ্‌ল কোনও দিক্ থেকে ওরা আস্‌ছে কি না। ফিরে এসে এটাকে কি বল্‌তে আবার এরা আমাদের নিয়ে কিছু দূর এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল। এমনি ভাবে চলতে লাগ্‌ল এরা পথ খুঁজে খুঁজে। ওদের চলা দেখে বেশ বুঝতে পার্‌লাম আমরা যে এই গভীর অরণ্যের এ অংশে কোনও দিনই এরা কেউ আসে নি। প্রাণের ভয়ে শুধু এই অজানা জায়গায় ছুটে এসেছে—এখন পথ খুঁজে পাচ্ছে না ওদের নিজের আস্তানায় পৌঁছুবার জন্য।

চলেছে এই রকম ভাবে। সেবারও ঐ আগেকার লোকটা গভীর অরণ্যের মধ্যে এগিয়ে গেছে। আমাদের নিয়ে এ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওর প্রতীক্ষায় অন্যবারেরই মত।…এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার কানে এল আমাদের—তার পর একটা অতি কাতর আর্ত্তনাদ; তার পর একটা অতি অস্পষ্ট গোঁয়ানির শব্দ—তার পর সব নিস্তব্ধ। এই লোকটার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল ওর দেহ। ও বোধ হয় ভেবেছে যে নিশ্চয় বিপক্ষ দলের কেউ অলক্ষ্যে ওদের পিছু নিয়েছে—সেই শেষ করেছে ওর সঙ্গীকে।

আমাদের আর ভয় কি? মরণের পথে চলেছে যারা তা'দের আর কিসের ভয়?

তবুও একটা অজানার দুশ্চিন্তা আছে বই কি—তাই ভাবলাম, কি হ'ল লোকটার! সত্যিই কি ওদের বিপক্ষদলের কারো হাতে ওর জীবন শেষ হ'ল! না, অকস্মাৎ অন্য কিছু ঘট্‌ল ওর অদৃষ্টে—!

এ লোকটা আমাদের নিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এগিয়ে চল্‌ল—ওর সঙ্গীর সন্ধানে।"

অজয়ের কথার মাঝে বাধা দিয়ে ললিতা বল্‌লেন, "এখন আর নয় অজয়, বেলা প্রায় একটা বাজ্‌ল। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। সন্ধ্যার সময় আবার সুরু ক'রো—কেমন?"

অজয় একটু ম্লান হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা, বেশ।"

সকলেই উঠ্‌ল এক সঙ্গে, তখনকার মত। (ক্রমশঃ)

ছুটির ক'দিন

[ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এস্-সি (ক্যাল্), পি-এইচ্.ডি (ক্যাণ্টাব্)]

এর আগের কয়েক সংখ্যায় তোমাদের আমার ভ্রমণ পর্ব্বের গোড়ার পর্ব্বটুকু শুনিয়েছিলাম। এই পর্ব্ব শেষ হ'ল উকি হোলের হোষ্টেলে। এই বার আসল অভিযান সুরু হবে। উকি হোলের হোষ্টেলের দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে র‍্যাক্‌স্যাক্ পিঠে চাপিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। এবার যেতে হবে দূরে,—ইংলণ্ডের সব চেয়ে পশ্চিম মুখে কর্ণওয়ালে। এই কর্ণওয়ালের পেনজ্যান্স (Penzance) বলে জায়গা পর্য্যন্ত রেল চলে, এই পেনজ্যান্সে ঠিক করলাম দিন কতক বাসা গেড়ে আশপাশটা বেশ করে দেখে নেব। যেতে হবে ট্রেণে আর সে ট্রেণও ধরতে হবে ওয়েল্‌স্ থেকে। তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ওয়েল্‌স্ হচ্ছে উকি হোল থেকে চার মাইল দূরে। ভোরবেলা গাঁয়ের পথ বেয়ে ওয়েল্‌সে যেতে সত্যি খুবই ভাল লেগেছিল। আমাদের ধারণা যে ইংলণ্ডে ফুল খুব কম, কিন্তু সহর ছাড়িয়ে একটু পাড়াগাঁয়ে গেলেই এটা যে কত ভুল ধারণা সেটা বোঝা যায়। চারিদিকে নানা রকম ফুলের ছড়াছড়ি, রাত্রের শিশিরে ধুয়ে গাছপালাগুলি ঝলমল করছিল। নানা রকম পাখীর ডাক—একলা যে পথ চলছি তা মোটেই মনে হচ্ছিল না। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল দু'দিন আগে ত এই পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর এ পথটা হেঁটে যেতে কি বিরক্তিই না লেগেছিল! মনে হচ্ছিল যে পথ যেন আর ফুরাতেই চায় না! আর এবার, এতটুকু মনে হ'ল না যে এতটা পথ হেঁটে এসেছি!

ট্রেণের কিছু দেরী ছিল, কাজেই ঘুরে ফিরে ওয়েল্‌স্ সহরটি দেখে নিলাম। ছোট জায়গা, বিশেষ কিছু দেখবার নেই। এখানকার ক্যাথিড্রেলটি মন্দ দেখতে

নয়। সকালে বন্ধ ছিল, ভিতরে ঢুকতে পারা গেল না, বাইরে থেকেই দেখা গেল। দেখতে অনেকটা কলকাতার এখনকার সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথিড্রেলের মতন।

ওয়েল্‌স্ সোজা লাইনে পড়ে না, কাজেই সোজা লাইন ধরার জন্য অনেকগুলি ছোটখাট ট্রেণ বদলী করে তবে যেতে হ'ল। ওয়েল্‌স্ থেকে উইথাম, ক্যাসেলবেরী, টটন্ হয়ে প্লিমাথে এসে উপস্থিত হলাম। টটন্ (Tauton) থেকে প্লিমাথ আসার সময় আমার গাড়ীতে একটি ইংরাজ ছেলে উঠল। ট্রেণ ছাড়ার পরই বুঝতে পারলাম যে ছেলেটি আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য খুবই উৎসুক। দু' একটা বাজে কথার পর আলাপটা বেশ জমে উঠল। ছেলেটির নাম জ্যাক্ বুস্, এক্সীটারে পাব্‌লিক স্কুলে পড়ে। আমি কেম্ব্রিজে আছি শুনে কেম্ব্রিজের অনেক কথা জিজ্ঞেস করল। স্কুলের পড়া শেষ করে তার কেম্ব্রিজে ঢোকার ইচ্ছা আছে, তার কারণ বাচ খেলায় তার খুব উৎসাহ আছে আর স্কুলের দাঁড় টানার দলে সে নাকি আছে। এখন স্কুল বন্ধ, তাই ছুটিতে তার পিসিমার কাছে যাচ্ছে—সেণ্ট অতেল বলে একটি জায়গায়। আলাপ এতই জমে উঠল যে প্লিমাথে যখন লাঞ্চ খেতে গেলাম তখন জ্যাক্‌ও আমার সঙ্গে গেল আর জোর-জবরদস্তী করে আমার বিলটাও সে শোধ করে দিল। এ ঘটনাটি তোমাদের বল্‌লাম কারণ এখানে অনেকেরই বিশ্বাস যে ইংরাজরা বিশেষ আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে চায় না। আমার নিজের কিন্তু যতটুকু অভিজ্ঞতা তা'তে এর উল্টাটাই দেখেছি, ওদেশে বরং ওরা আমাদের সঙ্গে মেশবার জন্য আগ্রহই প্রকাশ করে। শুধু এটা নয়, এই বেড়ান'র সময়েই দেখেছি এরা হাসিমুখেই আমাকে এদের নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে. কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা এতটুকু দেখি নি।

প্লিমাথে কিন্তু জ্যাক্‌কে ছেড়ে যেতে হ'ল। তার কারণ এখানে আমি আবার কর্ণিশ রিভিয়েরা এক্সপ্রেস ধরলাম, সেটা সেণ্ট অতেলে থামে না। বিদায়ের আগে সে কিন্তু বারবার করে মাইনহেডে গেলে তাদের বাঁড়ী যেতে বল্‌লে, সেখানেই তার বাবা ব্যবসা করেন। এ ছাড়া সে পেনজ্যান্সে একটী বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দিল ও একটি আলাপী চিঠিও দিয়ে দিল। এতে আমার খুব সুবিধাই হয়েছিল

কারণ পেনজ্ঞান্সে কোন যুব-হোষ্টেল নেই, কাজেই কোথায় যে আমি উঠব তার কোন ঠিক ছিল না।

প্লিমাথ ইংলণ্ডের একটা বড় বন্দর। এককালে এর প্রতিপত্তি আরও বেশী ছিল কিন্তু এখন সাদাম্টন হয়ে এর যশ কমে গেছে। তোমাদের মধ্যে যারা "Westward Ho" বইটি পড়েছ তারা হয়ত প্লিমাথ সম্বন্ধে অনেক খবরই জান। এই প্লিমাথ থেকে কর্ণিশ রিভিয়েরা এক্সপ্রেস বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ট্রেণ থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটা বেশ দেখায়। অনেক নদী নালাও এসে সমুদ্রে পড়েছে, কাজেই দু' মিনিট অন্তর অন্তর এক একটা করে ব্রীজ পার হতে হচ্ছিল। এখানে আরোহীরা যাতে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে পারে তার জন্য ট্রেণের গতিও খুব কমিয়ে দেওয়া হয়, ঘোড়ার সেই ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগ আর থাকে না।

ল্যাণ্ডস এণ্ডে পাহাড় আর সমুদ্রের দৃশ্য

বিকাল পাঁচটার সময় পেনজ্ঞান্সে পৌঁছান গেল। চ্যাপেল রোডে জ্যাক্ বুসের ঠিকানা দেওয়া বাড়ীতে গিয়ে ওঠা গেল। বাড়ীটা মন্দ নয়। কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে পেনজ্ঞান্স সহর দেখতে বার হলাম। সমুদ্রের উপরই একটি প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, এর নাম হচ্ছে প্রমিনাড্ (Promenade)। ইউরোপের সমুদ্রের ধারে সব সহরেই এই রকম একটি করে রাস্তা থাকে। এই রাস্তারই একপাশে মস্ত বড় বাগান। বাগানের মধ্যে ব্যাণ্ড বাজাবার জায়গা রয়েছে;

তা ছাড়া সমুদ্রের জল তুলে নিয়ে এসে ছোট ছেলেদের স্নান করার ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে।

পেনজ্ঞান্সের সামনে সমুদ্রের তীর ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের মত বাঁকা। দক্ষিণ দিকে একটা ছোট পাহাড় উঠে গেছে, তার গায়ে স্তরে স্তরে সব বাগান বাড়ী; সন্ধ্যার পর সে সব বাড়ীতে আলো জ্বালা হ'লে নীচের রাস্তা থেকে বেশ সুন্দর দেখায়। উত্তর পশ্চিম দিকে পেনজ্ঞান্স থেকে একটু দূরে সমুদ্রের ভিতর থেকে একটা পাহাড় উঠে গেছে, তার উপর একটি দুর্গ আছে। এখন অবশ্য সেটা একটি ক্রীশ্চান সন্ন্যাসীদের থাকবার আড্ডা। পাহাড়টির নাম সেণ্ট মাইকেলস্ মাউণ্ট। পেনজ্ঞান্স দেখতে অনেকটা ইটালীর প্রসিদ্ধ বন্দর নেপ্ল্সের মতন—কাজেই গাইড-বুকে এর নাম হচ্ছে কর্ণওয়ালের নেপ্ল্স্। কিন্তু নেপ্ল্সের আসল যে সৌন্দর্য্য দূরের ভিসুভিয়াস পাহাড়, তার কোন জুড়িই পেনজ্ঞান্সে পাওয়া যায় না।

প্রমিনাডে বেড়াতে বেড়াতে একজন সিংহলী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম জয়াশেখর। আমারই মতন একলা বেড়াতে বের হয়েছে। ঠিক করা হ'ল যে দু'দিন পরে আমরা পেনজ্ঞান্স থেকে কিছু দূরে "শিলি" দ্বীপপুঞ্জ দেখতে যাব। দ্বীপগুলি খুবই নাকি ভাল দেখতে। নানা কথাবার্ত্তার পর বাড়ী ফিরে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাওয়া গেল।

সকালে উঠে দেখি যে সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা, যে কোন সময় আবার বৃষ্টি আরম্ভ হতে পারে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, কারণ সেদিন আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়ান প্রোগ্রাম ছিল। দুর্গা বলে ওয়াটারপ্রুফ চাপিয়ে র‍্যাক্ স্যাকে কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্যস্থল হচ্ছে ছ' মাইল দূরে ল্যাণ্ডস্ এণ্ডে (Land's End)। ম্যাপে দেখতে পাবে যে এইটাই হচ্ছে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শেষ সীমানা। এর পর ধূ ধূ করছে আটলাণ্টিক মহাসাগর। যেতে যেতে মাথার উপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি জিনিষটা ওদেশে এতই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার যে সেটা গায়ে মাখতে গেলে কাজ চলে না। ল্যাণ্ডস্ এণ্ডে পৌঁছাবার পরই কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠল।

ল্যাণ্ড্স্ এণ্ডে সমুদ্রের দৃশ্য ছাড়া দেখার আর কিছু নেই, কিন্তু সেই দৃশ্য দেখেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রায় দেড়শ' ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে আটলান্টিকের ঢেউ এসে আছড়িয়ে পড়ে চারিধারে জলের কণা ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাস আর জল এই দুটিতে মিলে খেলা করে পাহাড়ের কোণকে নানা রকমে গড়েছে ও গড়ছে। ছবি দেখে তোমরা হয়ত একটু আভাস পাবে। তা ছাড়া পাহাড়ের উপর বড় বড় পাথরও হাওয়া আর বৃষ্টির দাপটে নানা রকম চেহারা নিয়েছে। কোনটা ভালুকের মতন, কোনটা মানুষের মুখের মতন। এই সব পাথর চারিদিকে ছড়ান আছে। লক্ষ লক্ষ গাং-চিল তার উপর

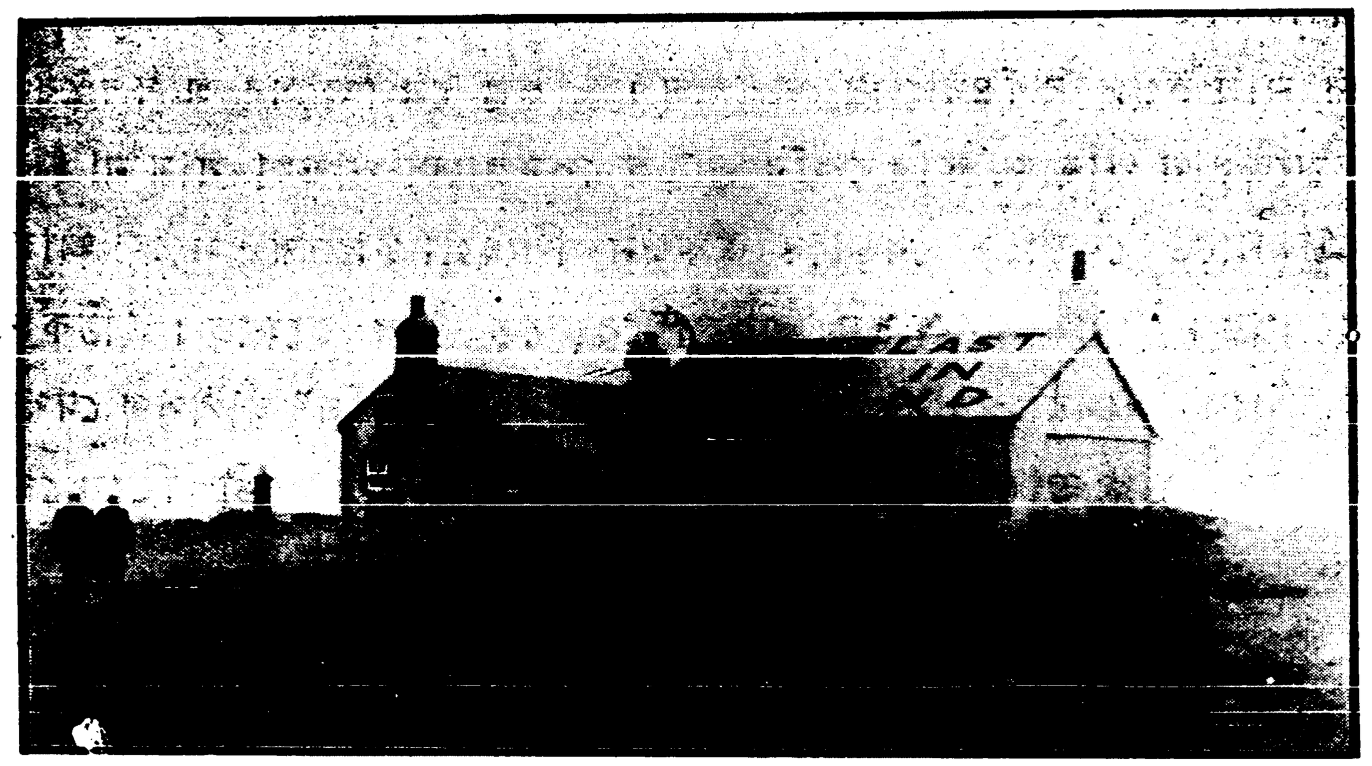

'ইংলণ্ডের প্রথম ও শেষ বাড়ী'

বাসা বেঁধে রয়েছে। তাদের চীৎকার, ঝড়ো হাওয়ার গোঁ গোঁ আওয়াজ, জলের শব্দ—এই সব মিলে এক তুমুল কন্সার্ট্ সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলেছে।

ইংরাজ জাত ব্যবসায়ী লোক। এই জায়গায় পাহাড়ের উপরে একটা ছোট রেস্তোরাঁ আছে। তার উপর লেখা—'ইংলণ্ডের প্রথম ও শেষ বাড়ী'। যারা ইংলণ্ডে আসছে আমেরিকা থেকে তারা ইংলণ্ডের কাছে এসে সব প্রথম এই বাড়ীটিই দেখতে পাবে, কাজেই তাদের কাছে এটি ইংলণ্ডের প্রথম বাড়ী। আর যারা ইংলণ্ড ছেড়ে যাচ্ছে তাদের কাছে এটিই হবে ইংলণ্ডের শেষ বাড়ী।

ল্যাণ্ড্স্ এণ্ড্ থেকে আবার হেঁটে সমুদ্রের ধার ধরে কেপ্ কর্ণওয়াল পর্য্যন্ত যাওয়া গেল। পথে দু' তিনটি পাড়াগাঁ পড়ল। গাঁয়ের লোকেরা অধিকাংশই জেলে—সমুদ্রে মাছ ধরে তাদের দিন চলে। কিন্তু গ্রামগুলি দেখতে ঠিক ছবির মতন।

মাথার উপর সূর্য্যদেব তখন তাঁর সমস্ত শক্তি ঢালছেন। সকালের ওয়াটার-প্রুফ, এমন কি গায়ের কোটও র‍্যাক স্যাকে পোরা হ'ল, তবু ঘেমে নেয়ে অস্থির। দু' তিনটি চাষার বাড়ীতে গিয়ে জল চেয়ে খাওয়া গেল। তারা বোধ হয় জীবনে কখনও কালো লোক দেখে নি, কিন্তু খুব যত্ন করে সবাই জল খাইয়ে দিল।

কেপ্ কর্ণওয়ালের কাছে সেণ্ট জাষ্ট বলে জায়গা থেকে বাসে করে ফিরে এলাম বিকেলে চা খাবার আগেই। চা খেয়ে, পেনজ্যান্সে এক কার্ণিভাল হচ্ছিল, জয়াশেখরের সঙ্গে সেই কার্ণিভালে গিয়ে সময় কাটান গেল।

এর পর দিন পেনজ্যান্সের কিছু দূরে নিউ কি (New quay) বলে একটি জায়গায় বেড়াতে গেলাম। জায়গাটা নূতন, সমুদ্রে স্নানের এখানে খুব সুবিধা আছে বলে অনেক লোক এখানে বেড়াতে আসে। এত লোকের ভিড় কিন্তু আমার বিশেষ ভাল লাগল না। নিউ কি জায়গাটি আটলান্টিকের উপর—আমি সেইখানে একটি ছোট পাহাড়ে একটি নির্জ্জন জায়গায় শুয়ে শুয়ে সারা দুপুর কাটিয়ে দিলাম। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে কাছেই ক্র্যান্টব্ বলে একটি গাঁয়ে গিয়ে পড়লাম। একটি চাষার বাড়ীর দরজায় লেখা দেখলাম যে এখানে চা পাওয়া যায়। ভিতরে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিলাম। চায়ের সঙ্গে ছিল এক প্লেট ষ্ট্রবেরী ও চমৎকার মিষ্টি ক্রীম। এই রকম চা এ অঞ্চলে খুব প্রিয়, আর সস্তার মধ্যে খুব ভাল জিনিষই এরা দেয়। চা খাবার পর ফিরে এসে ট্রেণে করে আবার পেনজ্যান্স পৌঁছান গেল। বাড়ী যখন পৌঁছালাম তখন রাত ন'টা। সামান্য কিছু খেয়ে তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়া গেল, কারণ পরের দিনই আমাদের "শিলি" দ্বীপপুঞ্জ দেখতে যাবার কথা।

পুরুষস্য ভাগ্যম্

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

"তুমি কি হারমোনিয়াম্ কিন্‌বে দাদা?" বিনি এসে জিজ্ঞেস করে আমায়।

"হারমোনিয়াম্? হারমোনিয়াম্ কেন?" আমি অবাক্ হয়ে যাই: "এত জিনিস থাক্‌তে হারমোনিয়াম্ যে হঠাৎ?"

"জোয়ারদার মশাই তাঁর হারমোনিয়াম্‌টা বেচে ফেল্‌চেন কিনা—" বিনি বল্‌তে থাকে।

"আহা, ফেল্‌চেন নাকি? ফেল্‌লে বেঁচে যাই। কী বিচ্ছিরি আওয়াজ ওটার—বাব্‌বাঃ! আর, জোয়ারদার দিনরাত ওইটে নিয়েই পড়ে থাকে। ওদের কাঁদুনি শোন্‌বার ভয়ে ও-রাস্তা দিয়েই হাঁটি নে আমি। বাঁচা যায় বেচে ফেল্‌লে।"

"আমি ভেবেছিলুম জিনিসটা তুমি ফস্‌কাতে দেবে না, কিনে ফেল্‌বে এই দাঁওয়ে। আমার গলা সাধা হ'ত, তুমিও বাজ্‌নাটা অভ্যেস করতে পারতে। ভালো বাজিয়ে হ'তে পারাটা কি কম নাম?" বিনি আমাকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করে। "লেখকের নামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"

"তা হোক্ গে—" আমি অনায়াসে ত্যাগ স্বীকার করতে পারি: "হারমোনিয়াম্ কিনে কাজ নেই আমাদের। ও ভারী হাঙ্গাম্! ওর আওয়াজ শুন্‌লে লেখাটেখা সব মাথায় উঠে যাবে আমার!"

"তুমি ভারী একগুঁয়ে, দাদা!" বিনি ক্ষুব্ধচিত্তে চলে যায়, ব'লে যায় যেতে যেতে: "লিখে তো সব হয়! ভারী উনি লেখক! লেখক না ছাই! লিখে তো কাঁচ্‌কলা পান! ভালো কথাই বল্‌ছিলাম, বাজিয়ে হাত পাক্‌লে, ভালো বাজিয়ে হতে পারলে দু' পয়সা পেতেন তব্। অন্ততঃ বিখ্যাতটা হতেন। নামটা জান্‌ত সকলে।"

বিনির খেদোক্তিতে বিচলিত হয়ে আমিও বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। বিনির 'দাদৃনিন্দা' আমার ভালো লাগে না। আমার মনে আঘাত লাগে। সত্যি বল্‌তে কি, আমাদেরও, এই লেখকদেরও, মন ব'লে একটা-কিছু আছে, অন্ততঃ থাকা অসম্ভব নয়। সেই মনের মধ্যে গিয়ে, বিনির কথাগুলো, জুতোর পেরেকের মতো খচ্‌খচ্ করতে থাকে। এত খচ্‌খচানি আমার সহ্য হয় না। নাঃ, এ হেন বোনের সান্নিধ্যে বাস করা বনবাসেরই নামান্তর।

কী ভেবেছে আমায় ও? নামের জন্যে আমি যেন 'হা-পিত্যেশ' হয়ে বসে আছি! নাম কেন্‌বার খাতিরে গলায় দড়ি দিতেও রাজি হয়ে যা'বো? বা রে! আহ্লাদ আর কি! আমার বাজিয়ে হয়েও কাজ নেই, অমন নাম বাজিয়েও কাজ নেই আমার। জোয়ারদারের ওই বীভৎস হারমোনিয়াম্ আমি তা ব'লে গলায় ঝোলাতে পারব না। নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? দুর্ দুর্!!

কিন্তু, রাস্তায় বেরিয়েই কি নিস্তার আছে? পাড়ার যেখানেই যাই, যার কাছেই কান পাতি, শুধু ওই হারমোনিয়াম্ আর হারমোনিয়াম্! কাউকে জানাতে বাকী রাখে নি জোয়ারদার। সবার মুখেই কেবল ঐ এক কথা। একটা ভালো হারমোনিয়াম্ বিক্রী আছে। বেচে দিচ্ছেন আমাদের জোয়ারদার-মশাই। কিন্‌বে কেউ?

এমন কি, আমাদের ঘোষাল তো একজন হারমোনিয়ামওলার কাছে গিয়েই কথাটা পেড়েছে। জোয়ারদার 'মিনিমাম্' দাম চান্ চল্লিশ—কিন্তু কোন হারমোনিয়াম্‌ওলা যদি কেনে তা হ'লে তিনি তিরিশে নাম্‌তেও রাজি আছেন। কেননা, সে-বেচারীকেও তো বেচ্‌তে হবে জিনিসটা, দাম বাড়িয়েই বেচ্‌তে হবে আবার।

ঘোষাল জিজ্ঞেস করেছে: "বলেন তো আরো নামাতে পারি জোয়ারদারকে। ধরে বেঁধে নামানো যায় না যে তা নয়। আরো নামাবো?—" ভারিক্কি চালে ঘোষাল ভ্রূকুঞ্চিত করেছে: "এই ধরুন্, মিনিমাম্ কুড়ি টাকায়?—"

হারমোনিয়াম্‌ওলা ঘোরতর ঘাড় নেড়েছে: "মিনি মাগ্‌নায় দিলেও না। এমন কি মুটে ভাড়া ব'লে যদি এক মুঠো টাকা আমার হাতে গুঁজে দেন তবু নেব না। কিছুতেই না।"

এ রকম ঘোষণার পর, ঘোষালকে,—না, ঘোষালের আর কী দোষ? তবে একটু ভ্যাবাচাকাই খেতে হয়েছে বেচারাকে।

এদিকে, চার ঘণ্টার মধ্যেই, জোয়ারদারমশাই চল্লিশ টাকা থেকে চার টাকায় নেমে এসেছেন। নিজে থেকেই অযাচিত ভাবে নেমেছেন। একেবারে তর্ তর্ বেগেই—কী ভরসায় কে জানে! বোধ হয় যে ভাবে নাড়ী ছাড়ে, সেইভাবেই হারমোনিয়াম্‌টাকে তিনি ছাড়তে চান।

কিন্তু তথাপি, একটি খদ্দেরও আসে নি এখনো।

আমিও একটু আশ্চর্য্যই হচ্ছি, ক্রমশঃই। বাস্তবিক, এত সস্তায়, বল্‌তে গেলে অম্‌নিতেই চলে যাচ্ছে একটা জিনিস—জিনিসের মতো জিনিস—অথচ কারু পাত্তা নেই! এ রকম ক্ষেত্রে খবর পাবা মাত্রই তো মানুষদের লাফাতে লাফাতে চলে আসা উচিত? অন্ততঃ, মড়া ফেল্‌তে

যারা জোটে, অযাচিত ভাবেই জুটে যায়, গায়ে পড়েই ঘাড় পেতে দেয়, তারাই বা এসে জুটছে না কেন ?

ব্যাপার কি সঠিক জান্‌বার জন্যে জোয়ারদারের বাড়ীই গিয়ে হাজির হই।

দেখি, বিস্তর লোক সেখানে জড়। জোয়ারদারমশাই কাগজ কুচিয়ে, রবার্ ষ্ট্যাম্প্ দেগে, শ'খানেক লটারীর টিকিট্ বানিয়ে ফেলেছেন। এক এক টাকা দামের প্রত্যেকটা। এক এক জনকে ধ'রে ধ'রে গছিয়ে দিচ্ছেন এক এক খানা। আট আনা হাত্‌ড়ে পেলেও ছাড়ছেন না, ধার বাকিতেও দিয়ে দিচ্ছেন। আমাকেও একটা কিন্‌তে বল্লেন।

রেঞ্জার্স্, আইরিশ সুইপের বহুৎ টিকিট আমি কিনেছি, কক্ষণো কিছু পাই নি। লটারী জেতা আমার ভাগ্যে নেই। অতএব—হ্যাঁ, এ টিকিট আমি একটা কিন্‌তে পারি বটে। নির্ভয়েই পারি। দু' এক টাকার ওপর দিয়েই যদি পাপ বিদেয় হয়, ঝক্কি নেমে যায়, মন্দ কি ?'

আমি দু'খানা টিকিট কিনি, একখানা নিজের নামে, আর একখানা—না, বিনি নয়—জোয়ারদারের নামেই কিনে ফেলি।

জোয়ারদার কিন্তু ভীষণ আপত্তি করেন : "না না ! আমাকে আবার কেন জড়ানো ? আমি কেন আবার ?"

"ভয় কি ? আপনিও তো পেয়ে যেতে পারেন !" আমি ভরসা দিই : "পুরুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কে বল্‌তে পারে ?"

"আমার দরকার নেই।" অপ্রসন্নমুখে জবাব দেন জোয়ারদার : "তবে নেহাৎই যদি ফের এসে জোটে, এটাকে তা হ'লে আমি লেটার্ বক্‌স্ বানিয়ে ফেল্‌ব।"

"আমি কি করব জানি নে। তবে আমি নিশ্চিন্ত রয়েছি।" জানাই আমি : "আমার বরাতে জুট্‌বে না। আমার তেমন বরাত নেই।"

কিন্তু আমার বরাতেই জুটে গেল !

যে আমি জীবনে কদাপি, রেঞ্জার্স্ কি আইরিশ সুইপ্ সুদূরে থাক্, সামান্য একটা গীর্জ্জা-বাড়ীর চ্যারিটির চার আনার টিকিটের পাঁচ টাকার লাস্‌ট্ প্রাইজ্‌ও পাই নি কখনো, সেই আমিই কিনা, নিজের পাড়ার লটারীতে, প্রথম ধাক্কাতেই, এক মিনিটের মধ্যেই, একটা হারমোনিয়াম্ লাভ ক'রে বস্‌লাম। ভাগ্যের বিপর্য্যয় আর বলে কা'কে ?

যখনই মর্‌তে জোয়ারদারের বাড়ী পা বাড়িয়েছি (যে রাস্তা দিয়ে, প্রাণ গেলেও, সুরাসুরের দ্বন্দ্বভয়ে কখনো আমি হাঁটি নে) তখনই, আমার ভাগ্য যে বদ্‌লাচ্ছে, ভয়ানক ভাবেই বদ্‌লাতে যাচ্ছে, অচিরেই তা আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু, এই প্রাপ্তি-যোগের মুহূর্ত্তখানেক আগেও, ঘুণাক্ষরেও এ হেন সন্দেহ আমার মনে জাগে নি।

'নিয়তি কেন বাধ্যতে' ! শাস্ত্রের কথা। নিয়তি কি ভাবে কেন যে বাধ্য ক'রে ফেলে টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। হাড়ে-হাড়েই টের পাচ্ছি।

ঘাড়ে-ঘাড়েও টের পেলাম। জোয়ারদারমশাই হারমোনিয়াম্‌টা, কোথায় আর চাপাবেন, আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। সহাস্যমুখেই। আমার কেনা ওঁর টিকিটখানাও (বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসেবে) গছিয়ে দিলেন তার ওপরে।

আমার আকস্মিক সৌভাগ্যোদয়ে সকলের ঈর্ষা হ'তে লাগল। চতুর্দ্দিকের হর্ষধ্বনির মাঝ দিয়ে, সমবেত জনতা ফাঁক ক'রে মহাসমারোহে ওটাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। অত্যন্ত বেজার হয়েই বয়ে আন্‌লাম, বলাই বাহুল্য।

যেখানে উনুন্ ধরানোর কয়লা-কাঠ-ঘুঁটে-প্রভৃতি থাক্ করা থাকে, তারই গাদির মধ্যে ফেলে দিলাম ওটাকে। পাঁজার মধ্যে পড়ে পাঁজর ভেঙে মারা যাক্ হতভাগা !

"ওঁ য়্যাঁ…া…া · া…?"

পড়্‌বা-মাত্রই কাঁদুনি গাইতে সুরু কর্‌ল হারমোনিয়াম্‌টা।

তোমার এ কী রকম ব্যাভার হে ?—এই কথাই সমুচ্চ কণ্ঠে আমাকে বল্‌তে চাইল যেন।

পাজির পাঝাড়া ! আমি এক লাথি ঝেড়ে দিলাম তার ওপরে। সেই সপ্রশ্ন কাঁদুনির ওপরেই—তার শেষ প্রশ্নের সূত্রপাতেই ! কাঁদুনি আমার দু'কর্ণের বিষ। বল্‌লাম, বেশ চেঁচিয়েই বল্‌লাম : "চোপ্ রও। চোপ্ রও ! উল্লুক কাঁহাকা !"

"ভ্যাঁ…্যা…্যা…্যা…্যা…া…া…ক্—!" এবার বোধ হয় ও কেঁদেই দিল ভ্যাঁক্ ক'রে।

সুরেলা আর্ত্তনাদ শুনে বিনি ছুটে এল ওপর থেকে।

"য়্যাঁ ? কী হ'ল দাদা ? পড়ে গেছলে বুঝি ? ফসকে হাত থেকে পড়ে গেল নাকি ? আ হা হা ! পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল জিনিসটা ! হায় হায়—"

"তাই তো ! ভেঙে গেল, কী আর হবে !" আমিও দুঃখে যোগদান করি।

"মিস্তিরি ডাকিয়ে সারানো যায় কিনা দেখি।" বিনি বলে।

"নাঃ ! ও আর সারে ? ও গেছে, একদম গেছে। ও আর সারে কখনো ? সার্‌বার নয় আর।"

"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?"

"পাগল হয়েছিস !" আমি ব'লে উঠি : "সার্‌বার ব্যায়রামই না। যাকে বলে সন্নিপাত ! পোলো আর মোলো ! যাক্, কী আর হবে ? লোকসান্ ছিল বরাতে। এক টাকার লটারীতে পেয়েছিলাম, কিন্তু পোড়া কপালে সইবে কেন ? সাহিত্যিকের কপাল বলেছে কেন তবে ?"

ব'লে ভালো ক'রে ওটার হাড় পাঁজরা ভেদ ক'রে দেখি : "নাঃ, কিচ্ছু নেই আর !

হয়ে গেছে এর। বারোটা বেজে গেছে। এখন কেবল জ্বালানি কাঠ বানানো ছাড়া উপায় নেই।" বল্‌তে বল্‌তে মুখখানা ভয়ানক কাঁচুমাচু ক'রে ফেলি।

"সত্যিই কি গেছে?" বিনি সন্দেহ প্রকাশ করে: "আমার মনে হয়, তেমন কিছু হয় নি হয়ত, সবই ঠিকঠাক আছে। কেবল একটু—'

বল্‌তে কি, বিনির সন্দেহ নিতান্ত অমূলক না। আমার নিজেরও সেই রকম আশঙ্কা হচ্ছিল যে কিছুই ওর হয় নি। ওদের প্রাণ কি সহজে যাবার? "এ সব দৈত্য নহে তেমন"— সাধে কি হেমচন্দ্র বলে গেছেন?

"না না, তুই কি জানিস্ হারমোনিয়ামের!" আমি বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি: "এ সব জিনিস পড়লো কি গেল! কাচের পেয়ালার মতো ঠুন্‌কো একেবারে।"

এমন সময়ে ওপরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তেই বিনিকে চলে যেতে হ'ল।

আমি দেখ্‌লাম, আর দেরী নয়, জ্বালানি কাঠে পরিণত কর্‌তে হ'লে, এই ফাঁকে, বিনি এসে পড়বার আগেই ওকে সেরে ফেল্‌তে হবে।

সিঁড়ির মাথা থেকে বিনি চেঁচায়: "দাদা! দাদা! আইভিদি ফোনে ডাক্‌ছেন তোমায়।"

আমি ততক্ষণে একটা দা যোগাড় ক'রে এনে প্রায় কোপাতে যাচ্ছি। তারস্বরেই জবাব দিই: "আইভিদিকে একটুখানি ধরতে বল্। আমি এই এলাম ব'লে।"

শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নেই।

কিন্তু যত সহজ ভেবেছিলাম হারমোনিয়াম্-চোপানো মোটেই তত সোজা নয়, একটুক্ষণেই টের পাই। অবশ্যি, যারা অতি শিশুকাল থেকেই হারমোনিয়াম্ চোপাতে অভ্যস্ত হয়েছে তাদের কথা বলতে পারি নে; কিন্তু আমার মতো একজন আনাড়ির পক্ষে, একটা হারমোনিয়াম্‌কে সাবাড় করাই প্রায় কাবার হবার দাখিল।

পূরো আধ ঘণ্টার গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমে ওটাকে চেলা কাঠে চালিয়ে আনতে পারি। ক'টাই বা আর? কতিপয় মাত্র, নাম মাত্র কয়েক টুক্‌রোয়। একেবারেই আশানুরূপ নয়। পরিশ্রমের অনুপাতে ফল খুব যৎসামান্য, হারমোনিয়ামের আকার-প্রকারের দিক্ থেকে তো বটেই। দামের দিক্ দিয়ে খতিয়ে দেখ্‌লেও ক্ষতিই বল্‌তে হয়। চল্লিশ টাকার এই রকম লম্বা চওড়া একটা জিনিস ভেঙে এই ক'টুক্‌রো খোটে কাঠ? এমন কি আর লাভ? হারমোনিয়াম্‌ওয়ালারা দিনে ডাকাতি লাগিয়েছে, কান মলেই টাকাগুলো নিচ্ছে, বেশ দেখা যাচ্ছে।

যাক্, একেবারে সেরে, ওর গুরুত্বকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে চেলায় সমাধা ক'রে, নিঃশত্রু হয়ে, ক্লান্ত দুর্ব্বল দেহে নড়বড় কর্‌তে কর্‌তে টেলিফোনের কাছে গিয়ে হাজির হই।

"হ্যালো, আইভিদি, কী হুকুম্? বলুন!"

"আপনার বরাত ভালো," আইভিদি বলেন: "একটু আগে আমাদের মেয়ে-ইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হ'ল। গানের ক্লাসের জন্যে আর একটা হারমোনিয়ামের দরকার আমাদের। লটারীতে-পাওয়া ওটা কি আপনি বেচ্‌তে চান? ভালোই দাম পাবেন, এই ধরুন, গোটা পঞ্চাশ—? রাজি আছেন বেচ্‌তে?—য়্যাঁ? কী বল্‌ছেন শুন্‌তে পাচ্ছি নে! চেষ্টা কর্‌লে আরো কিছু বাড়ানো যায়, ধরে বেঁধে আরো কিছু ওঠানো যায় সেক্রেটারীকে। এই ধরুন্, গোটা সত্তর—?"

বিল্বতরু

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আজিকে কোথাও ফোটে নাই ফুল,
যাত্রা করেছি রিক্তাতে,
হে বিল্বতরু, তোমার দ্বারেই
আসিয়াছি তাই ভিক্ষাতে।

তোমার পত্র তোষে আশুতোষে,
মহাকাল সাথে ভাব করে,
চরণেতে ঝরা শুষ্ক পত্রে
নিষাদ মুক্তি লাভ করে।

তোমার পত্র সবার অধিক
প্রিয় জানি হর-পার্ব্বতীর,
তোমার মালাই কণ্ঠে পরেন
তুচ্ছ করিয়া হার মোতির।

তব পত্রের অবাধ আদর
ফুল সে আদর পায় না ক',
বিল্বপত্র প্রসাদী যে পেলে
জয়পত্র সে চায় না ক'।

হে তরু দেবতা, অতি দীন আমি,
কোন প্রশংসা-পত্র নাই,
'আমি যে তাদের' লিখে দাও তুমি
এই পরিচয়-পত্রটাই।

বার্ণার্ড শ' ও জগদীশচন্দ্র

(শ্রীননীগোপাল আইচ)

তোমরা বার্ণার্ড শ'র নাম হয়তো শুনে থাকবে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ যেমন বড় সাহিত্যিক, তেমনি বার্ণার্ড শ' বিলাতের একজন বড় সাহিত্যিক। তাঁর বাড়ী আয়ারল্যাণ্ডে। বহুকাল ধ'রে তিনি অনেক ভাল ভাল নাটক লিখে জগৎ-যোড়া নাম কিনেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বার্ণার্ড শ'

বড় বড় লেখকেরা দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁদের লেখা বই দান ক'রে থাকেন। তাঁদের বন্ধুবান্ধবেরা তাঁদের কাছ থেকে বই উপহার পেয়ে থাকেন। বার্ণার্ড শ' কিন্তু ভারী মজার লোক। তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বড় একটা বই উপহার দেন না, দেশের কোন লাইব্রেরীতে কখনও কোন বই দিয়েছেন ব'লে শোনা যায় নি। এমন একজন লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের জগদীশচন্দ্রকে তাঁর সব বই উপহার দিয়েছিলেন।

রয়াল সোসাইটি ব'লে বিলাতে একটা খুব বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আছে। সারা এসিয়ার মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন লোক এর সভ্য (ফেলো) হওয়ার গৌরব লাভ ক'রেছেন। জগদীশচন্দ্র এর সভ্য ছিলেন।

১৯২৮ সনের কথা। মনীষী চার্লস্ শেরিংটন তখন এই সোসাইটির সভাপতি। একদিন বার্ণার্ড শ' সোসাইটির ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের কথা উঠ্ল। বার্ণার্ড শ' বহু আগেই জগদীশচন্দ্রের কথা শুনেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব বড় ছিল। আজকের কথাবার্ত্তায় বার্ণার্ড শ'র মত লোকও জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় বিচলিত হ'য়ে উঠ্লেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

পরের দিন বৈজ্ঞানিকদের এক সভা। জগদীশচন্দ্র সেই সভায় বক্তৃতা দেবেন। অন্য দিনের চেয়ে একটু শীত বেশী প'ড়েছে। জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বার্ণার্ড শ'র শরীরটা তত ভাল ছিল না। তা' সত্বেও তিনি সেই সভায় গিয়েছেন।

সভায় বৈজ্ঞানিকেরা একে একে উচ্চকণ্ঠে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রশংসা ক'রে গেলেন। বার্ণার্ড শ' কিছু ব'ললেন না। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলী জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিলেন এবং তার উপর লিখলেন, "জগতের সর্ব্বনিম্ন জীবতত্ত্ববিদ্ কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবতত্ত্ববিদ্‌কে উপহার।"

তার পর বার্ণার্ড শ' নিঃশব্দে চ'লে গেলেন।

শক্তিপূজা

[বিজ্ঞানের কথা]

(অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি, এম্.বি)

তোমরা সকলেই জান যে হিন্দুরা শক্তির পূজা করেন। শক্তি ছাড়া কোন কাজই করা যায় না, এই জন্যই বোধ করি শক্তিপূজার উদ্ভব। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগেও মানুষ একনিষ্ঠভাবে শক্তির আরাধনা করিয়া আসিতেছে, তবে এ পূজার উপকরণ অবশ্য ফুল, বেলপাতা বা নৈবেদ্য নয়। গত কয়েক শ' বছর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক ঋষিদের তপোবনে—অর্থাৎ পরীক্ষাগারে শক্তির স্বরূপ বুঝিবার জন্য যে অপরূপ সাধনা চলিতেছে তাহাকেই আমি এক রকমের শক্তিপূজা বলিতেছি। শক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করাই তো শক্তিপূজার একটি শ্রেষ্ঠ প্রকরণ!

যাক্ সে কথা। এখন, এই কয় শতাব্দীর চেষ্টার ফলে পণ্ডিতেরা শক্তি সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

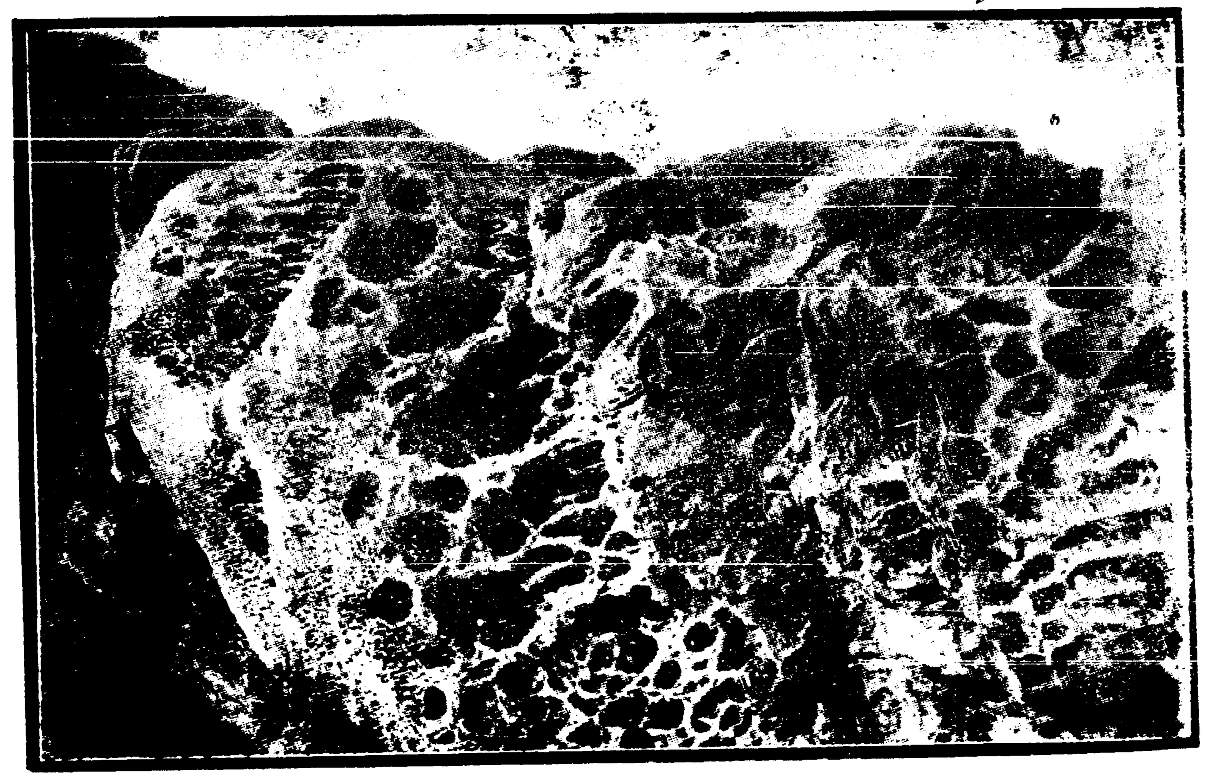

বৃষ্টির জলের শক্তি—পাহাড়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে।

শক্তির প্রকাশ অনেক রকম। তুমি ২ মণ ওজন অবলীলাক্রমে উঠাইতে পার ইহাতে শক্তির এক রকম পরিচয় পাওয়া গেল। তাহা তোমার মাংসপেশীর শক্তি। আবার কয়লা বা কেরোসিন পুড়িয়া যে আলো বা তাপের সৃষ্টি হইল তাহাও শক্তির এক বিকাশ। নদীর জল পর্ব্বত হইতে কল কল করিয়া সাগর

অভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে। কবি তাহার গান গাহিতেছেন। কিন্তু নগণ্য জীবেরা প্রতি বছর বর্ষায় প্রবল বন্যায় তাহারই অসীম শক্তির পরিচয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। আজকালকার দিনে বিদ্যুতের অদ্ভুত শক্তির কথাও কারও অজানা নাই। শক্তির কত রকম রূপ!

প্রথমেই বৈজ্ঞানিকেরা শক্তি সম্বন্ধে এই পরম সত্য আবিষ্কার করিলেন যে শক্তির অপচয় বা ক্ষয় নাই। শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয় মাত্র। কয়লা পোড়াইলে যে তাপের উৎপত্তি হয় তাহা দিয়া মানুষ এঞ্জিনের সাহায্যে নানা রকম কাজ করাইয়া লইতেছে।—রেলগাড়ী চলিতেছে, বিজলী বাতি আলো দিতেছে ইত্যাদি। উত্তাপের শক্তি এইভাবে কার্য্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। পেট্রোল এঞ্জিনে পেট্রোল পোড়াইয়া যে উত্তাপ পাওয়া যায় তাহা দিয়া মোটরগাড়ী চালান সম্ভবপর হইতেছে। একটা মোমবাতি যখন পোড়ে তখন তাহার ভিতরকার লুকান শক্তি উত্তাপ ও আলোর শক্তিতে পরিণত হইতেছে। আমাদের শরীরও একটা এঞ্জিনের মত,—খাদ্যদ্রব্য ক্রমাগত পোড়াইয়া তাহার ভিতরকার শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া দেহের তাপ রক্ষা করিতেছে এবং আমাদের মাংসপেশী দিয়া নানা রকম কাজ করাইয়া লইতেছে। অবশ্য এ কথা মানিতে হইবে যে শক্তির এই যে নিরন্তর বিকাশ তাহার কতকাংশ আমাদের কাজে লাগিলেও অধিকাংশই আপাতঃ দৃষ্টিতে বৃথাই বিকীরিত হইতেছে।

এখন তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে মোমবাতি, কয়লা, পেট্রোল বা খাদ্যদ্রব্যাদি—ইহাদের মধ্যে এত শক্তি লুকাইয়া রহিল কি করিয়া! কোথা হইতে এ শক্তি আসিল? তাহা বুঝিতে হইলে ব্যাপারটা আর একটু তলাইয়া আলোচনা করিতে হইবে। এই পৃথিবীর সব শক্তির মুখ্য উৎস হইতেছে সূর্য্য। সূর্য্য হইতে যে শক্তি সূর্য্যরশ্মিরূপে পৃথিবীতে ছুটিয়া আসিতেছে তাহাই রূপান্তরিত হইয়া মোমবাতি, কয়লা, পেট্রোল বা খাদ্যদ্রব্যাদিতে আশ্রয় লইতেছে। শক্তির এই রূপান্তরের জন্য উদ্ভিদ্-জগতের প্রয়োজন। তোমরা সকলেই জান যে যেমন জল বা সার মাটী হইতে না পাইলে গাছ বাঁচে না তেমনি সূর্য্যালোকও উহার পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। একটা চারাগাছে খুব জল আর সার দাও কিন্তু উহা

ঝুড়ি ঢাকা দিয়া রাখিয়া দাও, দেখিবে গাছটী নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, উহার পাতাগুলি সাদা হইয়া যাইতেছে এবং অবশেষে দেখিবে সমস্ত গাছটীই মরিয়া যাইবে। সুতরাং সূর্য্যালোক গাছপাতার সজীবতার ও বৃদ্ধির কারণ। গাছপাতার সবুজ অংশে সূর্য্যের আলোর শক্তি সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে। সূর্য্যালোকের শক্তি, মাটীর রস এবং বায়ুর কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ বাষ্প লইয়া সবুজ পাতা গাছের আহার তৈরী করে। তাহা খাইয়া গাছ জীবিত থাকে বা বাড়ে। প্রাণীরা আবার উদ্ভিজ্জ খাবার খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের খাদ্যেও আমরা সূর্য্যালোকের শক্তি লুকান অবস্থায় পাই, এবং তাহা কাজে লাগাই। যখন আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন বায়ুর অক্সিজেন বাষ্প আমাদের ফুস্‌ফুস্ হইতে দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। তাহার কতকাংশ খাদ্যকে পোড়াইয়া আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা করে এবং মাংসপেশী দিয়া বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করায়। খাদ্যদহনের ফলে যে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প হয়, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি উদ্ভিদ্ কি করিয়া তাহাকে আবার সূর্য্যালোকের সাহায্যে খাদ্যে পরিণত করে। অতএব সূর্য্যালোকের এই কীর্ত্তি। গাছপাতাই তো মাটীতে থাকিয়া কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। সুতরাং কয়লা, পেট্রোল, মোমবাতি প্রভৃতির শক্তির উৎসও হইতেছে এই সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোকের শক্তির আর কি কোন কাজ নাই? যাহারা ভাল করিয়া ভূগোল পড়িয়াছ তাহারা জান যে

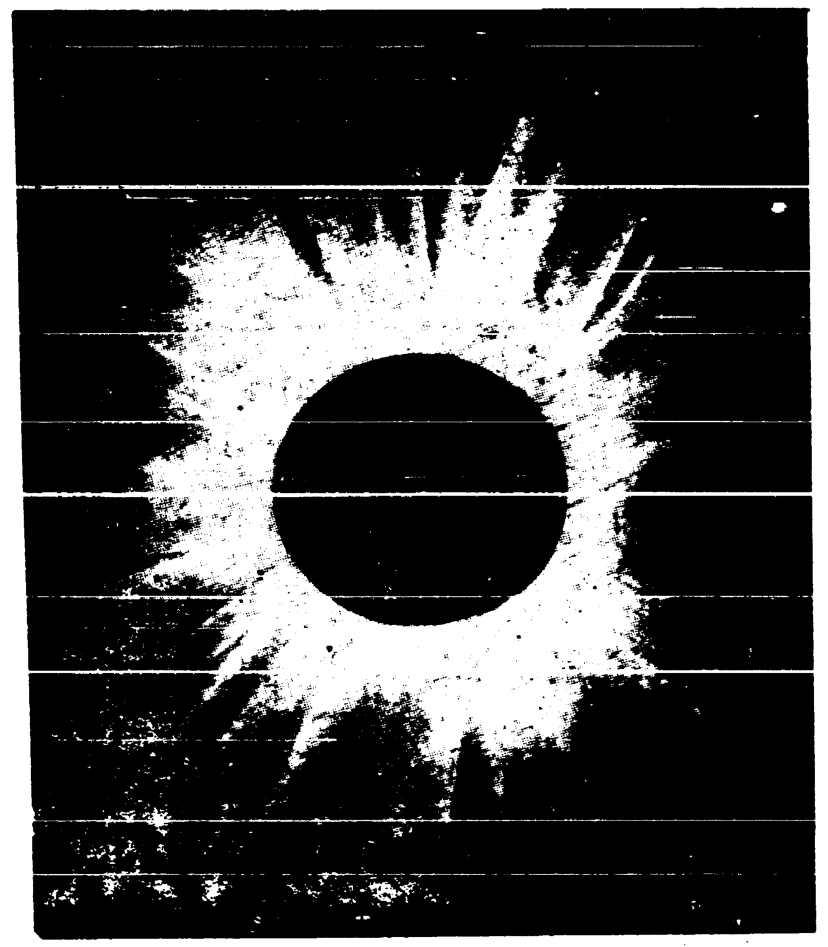

পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস—সূর্য্য
(গ্রহণের সময়ে তোলা ছবি)

সূর্য্যের তাপেই সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে মেঘের সৃষ্টি করে। এই জন্যই আমাদের দেশে গ্রীষ্মের পর বর্ষাকাল উপস্থিত হয়—তখন ঐ জলই আবার নামিয়া আসিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দেয়। যে জল প্রবলবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছিল তাহাই আবার সূর্য্যদেব তুলিয়া মেঘদেশে পর্ব্বতশিখরে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা কি কম শক্তির কথা!

এখন আর এক গোলমালের সৃষ্টি হইল। সূর্য্যদেব যে এই দিনের পর

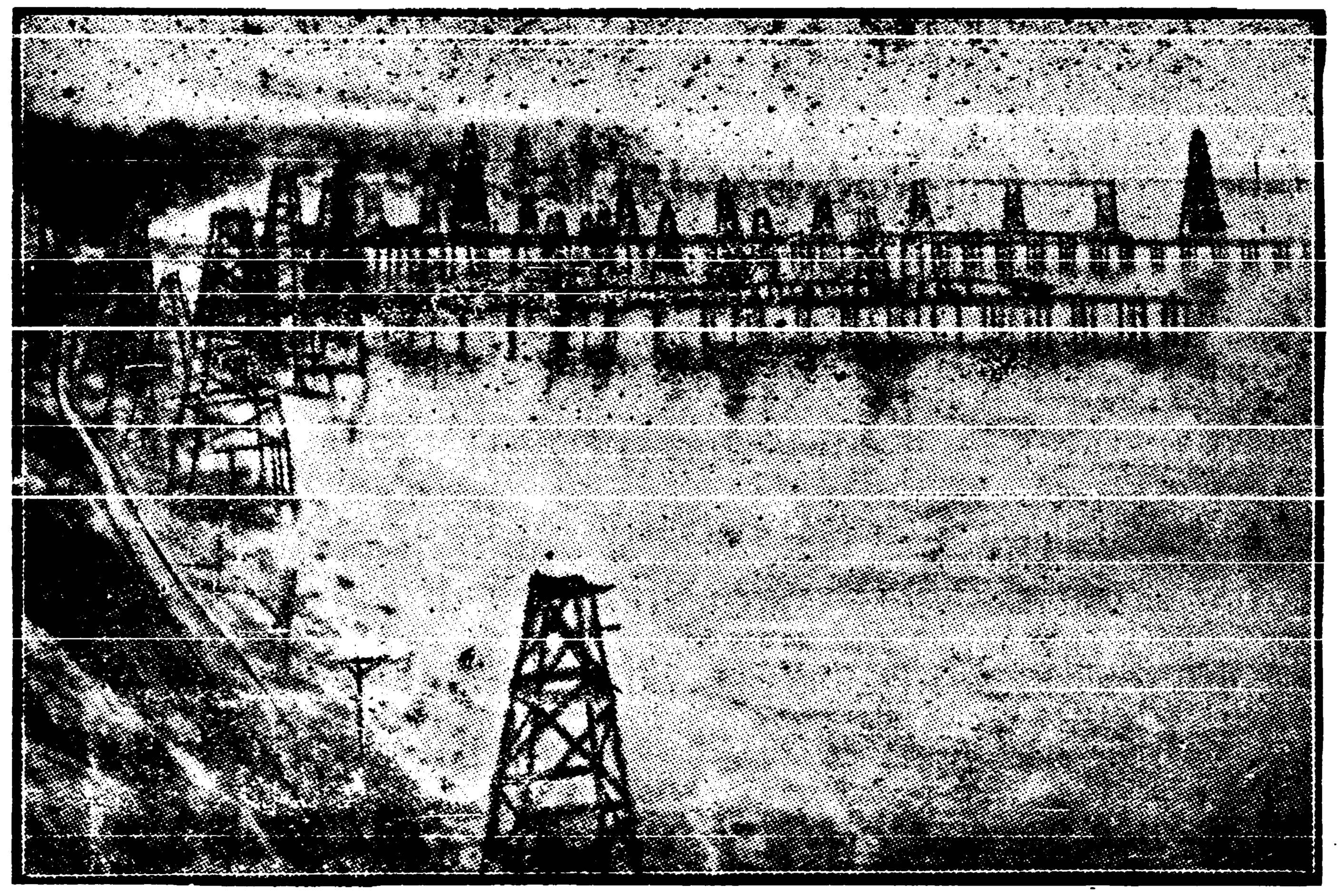

সৌর শক্তির একটি রূপ পেট্রোলিয়াম্—যাহা হইতে পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। ছবিতে পেট্রোলিয়াম্-খনির দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

দিন, মাসের পর মাস, বছর বছর ধরিয়া এই শক্তির বিকাশ করিতেছেন তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ হইতেছে সত্য কিন্তু এই উৎস কি অফুরন্ত? এই শক্তি যখন ফুরাইবে তখন আমাদের কি হইবে? যখন সূর্য্যদেব চাঁদের বা পৃথিবীর মত নিস্তেজ হইয়া যাইবেন তখন জীবের লোপ হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য তাহার জন্য এখন হইতে ভাবিবার প্রয়োজন নাই এবং ভাবিয়াই বা কে কি করিতে

পারিবে ? তবে সান্ত্বনার মধ্যে সে দিনের একটু দেরী আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য্যদেব বৎসরে ১৩৮০০০ ০০০ ০০০ টন হিসাবে ওজনে কমিয়া যাইতেছেন এবং সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইতে তাঁহার লাগিবে মোটে ১০০০০০০০০০ বছর। আবার এও তো হইতে পারে যে সূর্য্যের যে শক্তিটুকু বিকীর্ণ হইতেছে তার সবটাই নষ্ট হইতেছে না। কিছু কিছু আবার সূর্য্যে ফিরিয়া যাইতেছে। অথবা দূর-ভবিষ্যতে আমরা আর এক সূর্য্যের আশ্রয় হয়ত পাইব। যাহা হউক, আপাততঃ কিছুকাল আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

যাক্ সে কথা, মোটামুটী আমরা শক্তির বিকাশের এক দিক্ আলোচনা করিলাম। দেখা গেল অনেক দাহ্য বস্তুতে শক্তি লুকান অবস্থায় আছে এবং সেই জিনিষটি যখন পুড়িয়া অন্য জিনিষে পরিণত হয় তখন শক্তির বিকাশ হয় এবং তাহা দিয়া আমাদের নানা রকম কল্যাণ সাধিত হয়। পোড়া ব্যাপারটা ভয়ানক কিছু নয়, মোটের উপর ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা। অবশ্য ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই সুফল বেশী। এক গাদা খড়ে দেশালাই দিয়া জ্বালাইয়া দিলে যে তাপ বা আলো হয় তাহাকে কাজে লাগান যায় না কিন্তু একটা বলদের শরীরে যখন তাহা ধীরে ধীরে পোড়ে তখন বলদকে দিয়া অনেক কাজ করান যাইতে পারে। কয়লা এমনি পুড়িলে ত বৃথাই তাহার শক্তির অপচয় হইল কিন্তু উনুনের কয়লা কিছু কাজে লাগান যায় এবং একটা এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া মানুষ কত রকমের কাজ করাইতে পারে!

শেষে একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা শক্তির আর এক উৎসের পরিচয় পাইয়াছেন। তোমরা "রেডিয়াম্"এর নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। ইহা অতীব শক্তিসম্পন্ন এবং ইহা হইতে সর্ব্বদাই যে রেডিয়াম্-রশ্মি রূপ শক্তি বাহির হইতেছে তাহার কারণ কোন রূপ দহন-ক্রিয়া নহে। এই রকম প্রত্যেক জিনিষের (অদাহ্য বস্তুরও) ক্ষুদ্রতম অংশ তড়িৎশক্তির অফুরন্ত আধার। মোট কথা আগেকার যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বস্তুকে শক্তির আধার মাত্র ভাবিতেন এবং মনে করিতেন যে সেই শক্তি দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া গেলেই ঐ বস্তু সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া পড়িল। তাঁহারা বস্তুকে শক্তি হইতে পৃথক্ ভাবিতেন

এবং যে বস্তু পুড়িতে পারে না তাহাকে শক্তিহীন ভাবিতেন। এখন সেই ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজকালকার মত এই যে দহন-ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত শক্তির চেয়ে বহু গুণ শক্তির সমষ্টিই বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে। এক কথায় বস্তু ও শক্তি পৃথক্ নহে—তাহাদের সম্বন্ধ আধার ও আশ্রিতের সম্পর্ক নহে। তাহারা একই। এক গ্রাম্ ওজনের একটী বস্তু যে শক্তি সমষ্টিতে তৈয়ারী তাহা পাইতে হইলে ৩০০০ টন কয়লা পোড়াইতে হইবে। সুতরাং কি অপরিমেয় শক্তি প্রত্যেক ধূলিকণাতে আছে তাহা ধারণা করাও যায় না। এই অপরিমেয় শক্তিকে বিকশিত করাইবার সাধনায় মগ্ন আজ জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা। এই বিরাট্ শক্তিকে যদি কখন কাজে লাগাইতে পারা যায় তবে মানবের শক্তিপূজার সাধনা সার্থক হইবে। কিন্তু সেদিন কি আসিবে ? মানুষের শক্তিসাধনা কি এ ভাবে সিদ্ধ হইবে! অথবা অক্ষম মানব আবার গাহিবে—

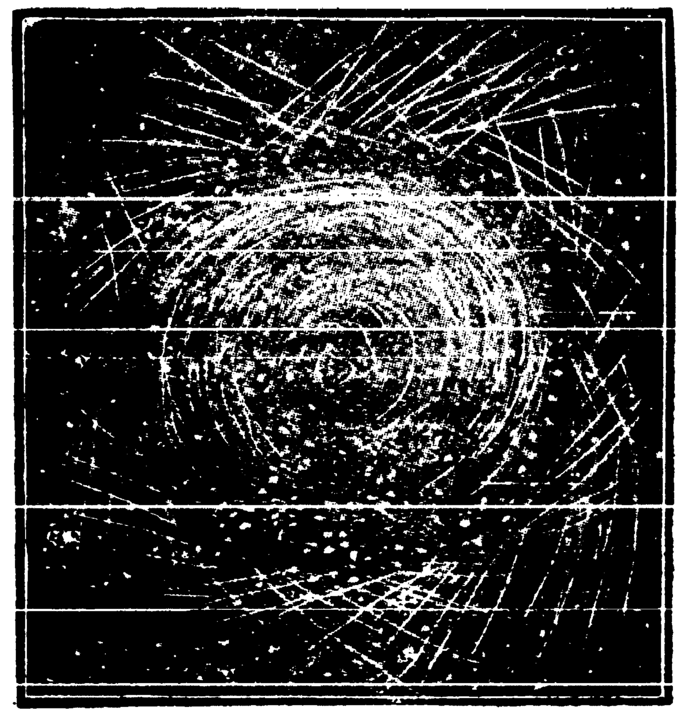

এক টুক্রা রেডিয়াম্,—শক্তির অফুরন্ত আধার।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

নির্ম্মম

(শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল)

জায়গাটা পাহাড়ী—সাঁওতাল-পরগণায়।

বছর দশেক আগে এখানে এসে স্থায়ী ভাবে থাকবার মতলব নিয়ে মিঃ চৌধুরী যখন চাকরীর জায়গা ছেড়ে গেলেন তখন মণ্টুর বয়স মোটে পাঁচ।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে এল তাঁর একমাত্র ছেলে মণ্টু, মণ্টুর মা অন্নপূর্ণা, আর তারই সঙ্গে এল তাঁর সারা জীবনের রোজগার অফুরন্ত অর্থ।

কিন্তু আজ আর মণ্টু নেই দশ বছর আগের সেই ছোট্ট ছেলেটি—মায়ের আঁচলের আড়ালে যে থাকত পালিয়ে। দুঃসাহসী ছেলে আজ মণ্টু। খেলাধূলায় তার যুড়ি মেলা ভার হয়ে উঠেছে এখানে। নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

অবশ্য এর খানিকটা সম্ভব হয়েছে মিঃ চৌধুরীর জন্য। তিনি এই সবই ভালবাসতেন। তাঁর আশা—তাঁর ছেলে তৈরী হয়ে উঠবে ঘরে বসে তাস খেলার জন্য নয়, কায নিয়ে ব্যস্ত থাকবার জন্য। কায ছাড়া তিনি আর কিছু বুঝতেন না, দয়া নয়, মায়া নয়। বলতেন, 'ও সব আমার জন্য নয়—আমার জন্য আছে শুধু কায।'

ছেলের অমঙ্গলের জন্য কোনদিন তাই যদি মণ্টুর মার বুক কেঁপে উঠত—জানাবার উপায় ছিল না কাউকে। মণ্টুর মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে অনেক রাতে তার মা জানাতেন প্রার্থনা ভগবানের কাছে—অজানতে হয়ত গড়িয়ে পড়ত দু-ফোঁটা চোখের জল ; মিঃ চৌধুরী তখন ঘুমিয়ে সারা দিনের কাযের পর।

এই রকম ভাবেই মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী মণ্টুকে—কিন্তু অন্য ছেলে আজ মণ্টু, যার কাছে কায আর কর্ত্তব্য ছাড়াও ছিল অনেক কিছু, মিঃ চৌধুরীর কাছে নিতান্তই যা অদরকারের।

অনেক গোলমাল বাধত এই সব নিয়ে। তাই এখানে এসেই মণ্টু যখন জানাল যে সে একটা কুকুর পুষবে তখন মিঃ চৌধুরী ভয়ানক আপত্তি জানিয়েছিলেন, জানিয়েছিলেন কুকুর তাঁর ভাল লাগে না বলে নয়—কোন দরকার নেই বলে। তবু শেষ কালে তিনি নিজেই এনে দিলেন এক জোড়া বাচ্চা কুকুর—জাতে "সেণ্টবার্ণার্ড"। ভেবেছিলেন হয়ত ছেলে বিগড়ে যেতে পারে—বড় হলে তখন বুঝিয়ে দেবেন—কোন দরকার নেই নিরর্থক এই খরচার।

কিছুদিন আগে তাদের একটা বাচ্চাও হয়েছে—যদিও এখন একটা কুকুর গেছে মরে। হ্যাঁ, নামটা বলা হয় নি, কুকুরের নাম রেখেছিল মণ্টু "সুলতান", আর বাচ্চাটার—"টোগ"।

আজ সেই 'সুলতান' চলে যাবে, চলে যাবে মণ্টুর সঙ্গে। হ্যাঁ, মণ্টু আজ চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে তার মাকে ছেড়ে, তার বাবাকে ছেড়ে—পাহাড়-চূড়োয় ওঠার দুরন্ত অভিযানে ; শুধু সঙ্গে যাবে "সুলতান"।

তাদের দলে সেই একমাত্র বাঙ্গালী। মিঃ চৌধুরী মত দিয়েছেন গর্ব্বের সঙ্গে। তার মাও দিয়েছেন—একমাত্র ছেলে যেতে চায় বলে।

যাবার আগে মাকে প্রণাম করার সময় মণ্টু বল্‌ল,—"মা, তুমি টোগকে দেখ, বাবা হয়ত ওকে তাড়িয়ে দিতে চাইবেন, কিন্তু তুমি আমার কথা বলে তাঁকে থামিও। বেচারার মা'টা গেছে মরে, সুলতানও চল্‌ল আমাদের সঙ্গে। তুমি তার বাচ্চাকে দেখ'।"

দু' সপ্তাহ হয়ে গেছে। খবর এসেছে মণ্টুর। ভালই খবর। তাদের যাবার জায়গায় তারা পৌঁছিয়েছে। কাল তারা পাহাড়ে ওঠা সুরু করবে।

কিন্তু এদিকে হঠাৎ টোগ হয়ে গেল পাগল। মিঃ চৌধুরী জানালেন—ওকে বাঁচিয়ে রাখা আর ঠিক নয়। অন্নপূর্ণা কেঁদে পড়লেন তাঁর পায়ে,—"ওকে মেরো না—বরং দিয়ে দাও কাউকে। মণ্টু আমায় বলে গেছে ওকে দেখতে"।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মিঃ চৌধুরী দাঁড়িয়ে নিজে হাতে গুলি করে মেরে শেষ করলেন "টোগকে"। পাগলা কুকুর ঘরে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক। মণ্টুর মা দাঁড়িয়ে দেখলেন কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারলেন না—তা হ'লে মিঃ চৌধুরী হয়তো হেসে উঠবেন তাঁর মুখের ওপরই ?

সেদিনই চিঠি এল মণ্টুর। চিঠিখানা খুললেন মণ্টুর মা। তার পর পড়তে সুরু করলেন—

"মা, আজ আমার অভিযানের সমস্ত আনন্দ গেছে নিঃশেষ হয়ে। আজ আমি কাঁদতেও পারছি না। তোমার "সুলতান" আর নেই।

"কাল প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফের পথে আমার পা এল অবশ হয়ে, গা এল হিম হয়ে। চলতে পারলাম না আর, তখনও বরফ পড়ছে অবিরাম। বন্ধুরা আমার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন

তখন। আস্তে আস্তে জ্ঞান হারিয়ে আসছে। এমন সময় এল আমার "সুলতান"। পাহাড়ের বুকে দুরন্ত ঠাণ্ডায়, সবাই যখন এগিয়ে যাচ্ছে অনিশ্চিতের দিকে, তখন সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ করে—তুচ্ছ করে সমস্ত বাধাকে, সেই উত্তুঙ্গ পাহাড়ের ওপর দিয়ে বরফের পথে আমায় বয়ে নিয়ে এল তাঁবুর দিকে—আমারই কুকুর "সুলতান"। কিন্তু অত পরিশ্রম তার সহ্য হ'ল না,—সুলতান বাঁচল না। আজ সকালে তাই বার বার মনে পড়ছে 'টোগের' কথা। তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পাহাড়ের পথে যে গেল হারিয়ে—তুমি তার বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রেখো—তার সমস্ত বিপদ্ থেকে।"...

এর পর আর পড়তে পারলেন না মণ্টুর মা। তাঁর চোখের জলে তখন মণ্টুর চিঠি গেছে ভিজে।

ও ঘরে মিঃ চৌধুরী তখন বলছেন—"জানেন মিঃ দত্ত, কুকুরটাকে গুলি করবার সময় মণ্টুর মা কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন; মনে মনে আমি শুধু হাসলাম তাই দেখে। বলতে পারেন মিঃ দত্ত, জীবনে এই সব উচ্ছ্বাসের কি দাম? আমার ত' মনে হয় পৃথিবীতে কর্ত্তব্য আর কায ছাড়া আর কিছুর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

অন্নপূর্ণা চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস সি)

নবম পরিচ্ছেদ

তখনও অন্ধকার ভাল করিয়া কাটে নাই। একটা পাৎলা কুয়াসার চাদর গায়ে টানিয়া সারা আকাশ যেন ঝিমাইতেছে। কয়েকটা তারা যাই যাই করিয়া তখনও যাইতে পারে নাই, বোধ হয় আলস্য ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্বচিৎ দু'-একটা সদ্য-জাগা পাখীর চীৎকার ছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই।

কুইটো এরোড্রোমে একখানি ক্ষুদ্রকায় এরোপ্লেন অপেক্ষা করিতেছিল। এভিয়েটরের পোষাক-পরা একজন ভদ্রলোক ধীরে ধীরে তার দিকে আগাইয়া আসিলেন। লোকটিকে

দেখিলেই বুঝা যায় তাঁর ভিতর দিয়া একটা অশান্তির ঝড় বহিয়া যাইতেছে; সারারাত্রি, সম্ভবতঃ দুর্ভাবনার জন্যই, ঘুম হয় নাই। কোন রকমে ভারী পা দু'টি টানিতে টানিতে তিনি অগ্রসর হইতেছেন।

একটু পরেই অদূরে আলো-হাতে আর একজন লোককে দেখা গেল—সম্ভবতঃ সে এরোড্রোমের কোন কর্ম্মচারী।

এভিয়েটর ততক্ষণে এরোপ্লেনে পা দিয়াছেন। আলো দেখিয়া একবার ফিরিয়া তাকাইলেন, তার পর ধীরস্বরে কহিলেন, "থাক্, আর আলো লাগবে না।" তার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, সুন্দর সিং, কর্ত্তাদের খবর দিয়ে দিও, আমি রওনা হয়ে গেছি। ফিরব কিনা কে জানে!"

সুন্দর সিং ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে তা জানাব। কিন্তু এ তো আপনার সাধ ক'রে মৃত্যু ডেকে আনা প্রফেসর চন্দ্র!" তার পর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চুপি চুপি কহিল, "ঐ জাপানীটাই যত নষ্টের গোড়া। আপনাকে না পাঠিয়ে ওকে পাঠালেই বাছাধন বুঝতেন ঠেলা।"

সুন্দর সিংএর কথা বলার ভঙ্গীতে অধ্যাপক চন্দ্রের বড় দুঃখেও হাসি পাইল। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া তিনি এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলেন। যাত্রী এবার তিনি একা, কাজেই এরোপ্লেন চালাইবার ভারও তাঁকেই লইতে হইবে। থর থর করিয়া একবার কাঁপিয়া লইয়া "সাউণ্ডলেস্" এরোপ্লেন নিঃশব্দে আকাশে উঠিল।

একটু পরেই ভোরের সোনালী আলো এরোপ্লেনের প্রপেলারের উপর আছাড় খাইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া অধ্যাপক চন্দ্র ফিরিয়া চাহিয়া যা দেখিলেন তা'তে বিস্ময়ের তাঁর আর অবধি রহিল না। তাঁরই ঠিক পিছনে, একরাশ জামাকাপড়ের আড়ালে, বসিয়া ডক্টর রুদ্র—সদ্য-ঘুমভাঙ্গা চোখ রগড়াইতেছেন।

"উঃ, অনেকটা ঘুমিয়েছি!" ডক্টর রুদ্র হাসিয়া বলিলেন। "কত দূর এলাম?" তার পর চন্দ্রের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ওঃ, আমাকে এখানে দেখে অবাক্ হচ্ছেন? কাল রাত্রেই মত বদলালাম যে! ভেবে দেখলাম এ অবস্থায় আপনার একা মেরু যাওয়া ঠিক হবে না। আমার ও-দেশে তবু কিছুটা প্রতিপত্তি আছে, হয়তো তেমন অবস্থায় আপনার কিছু কাজে লাগতে পারব, আর কীই বা এমন বুড়ো হয়েছি! তাই চলে এলাম। আপনাকে বিরক্ত না ক'রে আগে থেকেই এরোপ্লেনে এসে বসেছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালই নেই, অন্ধকারে আপনি বোধ হয় এতক্ষণ আমাকে দেখতেই পান নি!" তাঁর মুখে আবার সেই সরল হাসি। অধ্যাপক চন্দ্র কিছু বলিলেন না, শুধু গভীর কৃতজ্ঞতায় ডক্টর রুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাহীরার নিকট তাঁদেরই ভাষায় লেখা সেই নিদারুণ লিপিখানি কম্পিত হস্তে তুলিয়া দিয়া অধ্যাপক চন্দ্র মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এখনই না জানি ক্রুদ্ধ দলপতির মুখ দিয়া কি ভীষণ আদেশ হয়! চিঠি পড়িতে পড়িতে নীলাহীরার মুখচোখ ক্রমেই গম্ভীর হইতে লাগিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া তিনি খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তার পর সহজ কণ্ঠেই কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি এখন সীমারা মশাইএর সঙ্গে গিয়ে বিশ্রাম করুন; দয়া করে এক সপ্তাহের সময় তো আপনারা দিয়েছেনই, যথা সময়েই জবাব পাবেন।" শেষের দিকে তাঁর স্বরে বেশ একটু বিদ্রূপের আভাস পাওয়া গেল।

এই ঘটনার পরই মেরুরাজ্যে খুব একটা ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। নীলাহীরা ও দেশের অন্যান্য বড় বড় লোকদের লইয়া প্রায়ই গোপন পরামর্শ-সভা বসিতে লাগিল। এত চাঞ্চল্য এ অঞ্চলে শীঘ্র দেখা যায় নাই। মেরুবাসীরা যুদ্ধের জন্ম যে ভাল করিয়াই তৈরী হইতেছে তা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

ছয় দিন পরে অধ্যাপক চন্দ্র ও ডক্টর রুদ্রের আবার ডাক পড়িল। একটু সন্ত্রস্তচিত্তেই তাঁরা নীলাহীরার উদ্দেশে রওনা হইলেন। কাল সপ্তাহ পূর্ণ হইবার শেষ দিন, আজই হয়তো ইহাদের চরম উত্তর পাওয়া যাইবে এবং সে উত্তর কুইটো গভর্ণমেণ্ট, এবং আপাততঃ তাঁদের দুই প্রতিনিধির, পক্ষে খুব রুচিকর হইবে বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক চন্দ্রের চোখের সম্মুখে সেদিনকার সেই দৃশ্য—সেই মৃত্যুকিরণের ভয়াবহ প্রদর্শনীর কথা ভাসিয়া উঠিল। ডক্টর রুদ্রও যেন আজ অতিমাত্রায় গম্ভীর।

কালো পাথরের তৈরী প্রশস্ত একটা টেবিলের চারিদিকে অনুরূপ কতকগুলি আসন পাতা। তাহারই উপর নীলাহীরা ও মেরুরাজ্যের দশ-বারোজন প্রতিপত্তিশালী লোক বসিয়া আছেন। আগন্তুকদ্বয়কেও তারই একদিকে বসিবার জায়গা দেওয়া হইল।

নীলাহীরা আগের বারের মত সহজকণ্ঠে বলিলেন, "আপনাদের মহামান্য সরকার বাহাদুরের নিমন্ত্রণ চিঠি আমরা বিবেচনা করেছি, এবং জবাবও ঠিক করেছি। কাল মধ্যাহ্নের পর সে চিঠির সময় উত্তীর্ণ হবে, তার আগেই আমাদের জবাব আপনাদের হাতে পৌঁছবে।" তার পর অতিথিযুগলের দিকে একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনাদের সঙ্কুচিত হয়ে থাকবার কোন দরকার নেই। আপনারা পত্রবাহক মাত্র। আপনাদের দেশের স্বার্থপর গভর্ণমেণ্টের মতের জন্ম আপনাদের দায়ী ক'রে লাভ নেই।"

ইতিমধ্যে কয়েকজন লোক নানা রকম আহার্য্য আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। সেগুলির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া নীলাহীরা হাসিয়া বলিলেন, "যাক্, সরকারী আলাপ-আলোচনা রেখে এখন এগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক্।" এ প্রস্তাবে কারোই বিশেষ আপত্তি দেখা গেল না।

খাইতে খাইতে অধ্যাপক চন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, পরিবেশনকারীদের মধ্যে দু'জন লোকের চেহারা বেশ পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু কোথায় যে তাদের দেখিয়াছেন ঠিক মনে করিতে পারিলেন না। মনে হইল নীলাহীরাও তাঁর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং একবার তাঁর দিকে, একবার পরিবেশনকারীদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। চিন্তিত মুখে অধ্যাপক চন্দ্র আহার সমাধা করিলেন।

পরদিন। দুপুর হইতে এখনও কিছু দেরী আছে। নীলাহীরার জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক চন্দ্র ও ডক্টর রুদ্র ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। শেষে থাকিতে না পারিয়া তাঁরা গুটি গুটি পিরামিড-দুর্গের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে উদার প্রকৃতি তার অপরূপ রূপসম্ভার আজ যেন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঢালিয়া দিয়াছে। নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া বিরাট্ একখানা সবুজ গালিচা দূরে—বহু দূরে শ্যামল বনরেখার ভিতর মিশিয়া গিয়াছে। চারি দিক্ সবুজে সবুজে ছাইয়া আছে। দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না। শুধু এক ঝলক্ পাৎলা রোদ তারই ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলিতে ব্যস্ত। অপরূপ হাস্যময়ী এ দেশ! এ কি কেউ প্রাণে ধরিয়া আর কারো হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে!

সহসা মাথার উপর গুম্ গুম্ আওয়াজ শুনিয়া দু'জনেই চমকিয়া উপরের দিকে চাহিলেন। মাথার উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে—পঙ্গপালের মত অসংখ্য ওগুলি কি উড়িয়া আসিতেছে! তবে কি—তবে কি…! হ্যাঁ, সন্দেহের আর কারণ নাই, বিষুবীয় সরকার তাঁদের দুর্দ্ধর্ষ বিমান-বাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছেন, মেরুবাসীদের কাছে তাঁদের শক্তির কিছুটা পরিচয় দিতে। চরমপত্রের নির্দ্ধারিত সময়টুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁরা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

দেখিতে দেখিতে বিমান-বাহিনী আরো কাছে আসিয়া পড়িল। সংখ্যায় কত হইবে? এক হাজার?—পাঁচ হাজার?—দশ হাজার—? না আরও বেশী? ভাল করিয়া লক্ষ্য করা আর সম্ভব নয়। দেখিতে দেখিতে বুম্-বুম্—জ্রি-জি-জ্রি-জি—বুম-বুম্ শব্দে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিল। মুষলধারে শিলাবৃষ্টির মত সুরু হইল বোমা বর্ষণ; ধোঁয়ায় আর বারুদের গন্ধে বাতাস ঘন হইয়া উঠিল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। অধ্যাপক চন্দ্র ও ডক্টর রুদ্র ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে না উঠিতে স্তম্ভিতনেত্রে দেখিলেন, পিরামিড-দুর্গের ফটক খুলিয়া গিয়াছে, পিপীলিকাশ্রেণীর মত, সুসংবদ্ধ মেরুসৈন্যের দল তার ভিতর দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিতেছে—তার পর ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া ইতস্ততঃ ছড়ান আলোকস্তম্ভগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পর মুহূর্ত্তেই ঘন কুয়াসায় সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেল। তারই আড়ালে বিষুবীয় গভর্ণমেণ্টের বিমান-বাহিনী ঢাকা পড়িয়া গেল। বোমাবর্ষণও ক্ষণতরে বন্ধ হইল।

কিন্তু সে সামান্য ক্ষণের জন্য। কুয়াসা কি ভাবে জয় করিতে হয় বিজ্ঞানকুশলী বিষুবীয় সৈন্যের তা অজানা নয়। কুয়াসা ধ্বংস করিয়া আবার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে তাদের বেশী সময় লাগিল না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সুযোগ তাদের মিলিল না। সহসা কয়েকটি আলোকস্তম্ভ হইতে

তীব্র আলোক-শিখা আকাশে ছড়াইয়া পড়িল।

সার্চ্চ্ লাইটের মত তীব্র আলোক-শিখা আকাশে ছড়াইয়া পড়িল। অধ্যাপক চন্দ্র রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিলেন সে আলোক-শিখার স্পর্শে ভেল্কিবাজীর মত একটি একটি করিয়া সমস্ত এরোপ্লেন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নীলাহীরার গৃহে কিছুদিন আগেকায় দেখা আর একটি দৃশ্যের ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া তিনি মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

[আগামী বারে সমাপ্য]

অমৃত-দ্বীপ

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বীপে

সুন্দরবাবু তাঁর 'অটোমেটিক' বন্দুক ছুঁড়লেন—এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই সাংঘাতিক আধুনিক মারণাস্ত্রের গর্ভ থেকে বেরিয়ে হুড়্-হুড়্ ক'রে বয়ে গেল অনেকগুলো গুলির ঝড়।

কিন্তু মুহূর্ত্তেই সমুদ্রের বুকে ভাসন্ত সেই আশ্চর্য্য জীবিত বা মৃত দেহটা জলের তলায় অদৃশ্য হ'ল!

সুন্দরবাবু বন্দুক নামিয়ে বল্লেন, "হুম্! আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। বেটার গা নিশ্চয় ঝাঁঝ্রা হয়ে গেছে।"

জয়ন্ত বল্লে, "আমার বোধ হয় গুলি লাগবার আগেই ও-আপদ্‌টা সমুদ্রে ডুব মেরেছে!"

বিমল বল্লে, "আমারও সেই বিশ্বাস।"

কুমার বল্লে, "মড়াটা খালি জ্যান্তো নয়, বেজায় ধূর্ত্ত!"

মাণিক বল্লে, "ও হয়তো এখন ডুব-সাঁতার দিচ্ছে!"

রামহরি বল্লে, "রাম, রাম, রাম, রাম! পিশাচকে ঘাঁটিয়ে ভালো কাজ হ'ল না!"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "অমরই বল, জ্যান্তো মড়াই বল আর পিশাচই বল, অটোমেটিক বন্দুকের কাছে কোনই ওস্তাদী খাটবে না। এতক্ষণে বেটার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে অতলে তলিয়ে গেছে।"

কিন্তু সুন্দরবাবুর মুখের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই সেই রক্তশূন্য সাদা দেহটা হুস্ ক'রে আবার ভেসে উঠল! তার মুখে ভয়ের বা রাগের কোন চিহ্নই নেই এবং তার ভাবহীন ও পলকহীন চোখ দুটো আগেকার মতই বিস্ফারিত হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে!

রামহরি আর সে দৃশ্য সইতে পারলে না, ওঠে-কি-পড়ে এমনি বেগে ছুটে আড়ালে পালিয়ে গেল।

বিমল হাসতে হাসতে বল্‌লে, “ও সুন্দরবাবু, এখন আপনার মত কি? দেখছেন, মড়াটা এখনো অটুট দেহে বেঁচে আছে?”

প্রথমটা সুন্দরবাবু রীতিমত হতভম্ব হ’য়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই সে-ভাব সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন, “তবে আমার টিপ্‌ ঠিক হয় নি। রোসো, এইবারে দেখাচ্ছি মড়াটা!… … … আরে, আরে, বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই বেটা যে আবার ডুব মারলে হে! এমন ধড়ীবাজ মড়া তো কখনো দেখি-নি! হুম্‌, কিন্তু যাবে কোথায়? এই আমি বন্দুক বাগিয়ে রইলুম, উঠেছে কি গুলি করেছি। আমার সঙ্গে কোন চালাকিই খাটবে না বাবা!”

কিন্তু দেহটা আর ভেসে উঠল না। সুন্দরবাবু তাঁর প্রস্তুত বন্দুক নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বল্‌লেন, “নাঃ! হতভাগা গুলি খেতে রাজি নয়, স’রে প’ড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে!”

জয়ন্তের মুখ গম্ভীর। সে চিন্তিত ভাবে বল্‌লে, “আজ যা দেখলুম, লোকের কাছে বল্‌লে আমাদের পাগল ব’লে ঠাট্টা করবে। বিমলবাবু, জানি না অমৃত-দ্বীপ কেমন ঠাঁই! কিন্তু সেখানে যারা বাস করে, তাদের চেহারা কি ঐ ভাসন্ত দেহটার মত?”

বিমল মাথা নেড়ে বল্‌লে, “আমিও জানি না।”

মাণিক বল্‌লে, “আমার কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে!”

কুমার বল্‌লে, “ভয়! ভয়কে আমরা চিনি না। ভয় আমাদের কাছে আসতে ভয় পায়।”

মাণিক একটু হেসে বল্‌লে, “ভয় নেই কুমারবাবু, আমিও কাপুরুষ নই। এমন আজ্‌গুবি ভূতুড়ে দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে বটে, কিন্তু সেটা হ’চ্ছে মানুষের সংস্কারের দোষ। আমাকে ভীরু ভাববেন না, দরকার হ’লে আমি ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবেরও সঙ্গে হাতাহাতি করতে রাজি আছি। আমি—”

কুমার বাধা দিয়ে মাণিকের একখানা হাত চেপে ধ’রে বল্‌লে, “আমি মাপ চাইছি মাণিকবাবু! আমি আপনাকে কাপুরুষ মনে করি না।”

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, “তা কুমারবাবু, আপনি আমাকে ভীতুই ভাবুন আর কাপুরুষই ভাবুন, আমি কিন্তু একটা পষ্ট কথা বল্‌তে চাই—হুম্‌!”

—“বলুন। স্পষ্ট কথা শুনতে আমি ভালোবাসি।”

—“আমি আর অমৃত-দ্বীপে গিয়ে অমর লতার খোঁজ-টোঁজ করব না!”

—“করবেন না?”

—“না, না, না, নিশ্চয়ই না। আমি অমর হ’তে চাই না। অমর-লতার খোঁজ করা তো দূরের কথা, আমি আপনাদের দ্বীপের মাটি পর্য্যন্ত মাড়াতে রাজি নই।”

—“কেন?”

—“জয়ন্তের কথাটা আমারও মনে লাগছে। অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে নিশ্চয় তারাও হ’চ্ছে জ্যান্তো মড়া! মড়া যেখানে জ্যান্তো হয়, সে দেশকে আমি ঘেন্না করি। থুঃ থুঃ—হুম্‌! আমি জাহাজ থেকে নামব না।”

—“কিন্তু তারা যদি জাহাজে উঠে আপনার সঙ্গে ভাব করতে আসে?”

—“কী! আমার সঙ্গে ভাব করতে আসবে? ইস্‌, তা আর আসতে হয় না, আমার হাতে বন্দুক আছে কি জন্যে?… … কিন্তু যেতে দিন ও-সব ছাই কথা, এখন কেবিনের ভেতরে চলুন, ক্ষিধের চোটে আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।”

মাণিক বল্‌লে, “এইটুকুই হচ্ছে আমাদের সুন্দরবাবুর বিশেষত্ব। হাজার ভয় পেলেও উনি ক্ষিধে ভোলেন না! হয়তো মৃত্যুকালেও উনি অন্ততঃ এক ডজন লুচি আর একটা ফাউল-রোষ্ট খেতে চাইবেন!”

সুন্দরবাবু খ্যাঁক্‌-খ্যাঁক্‌ ক’রে ব’লে উঠলেন, “মাণিক, ফের তুমি ফ্যাচ্‌-ফ্যাচ্‌ করছ! ফাজিল ছোক্‌রা কোথাকার!”

… … … …

“লিট্‌ল্‌ ম্যাজেষ্টিক্‌” জল কেটে সমুদ্রের নীল বুকে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস রচনা কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে। মেঘশূন্য নীলাকাশ থেকে ঝ’রে পড়ছে পরিপূর্ণ রৌদ্র।

ক্রমে রোদের আঁচ্‌ ক’মে এল, সূর্য্যের রাঙা মুখ পশ্চিম আকাশ দিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে।

কুমার ডেকের উপরে এসে দেখলে, পূর্ব্বদিকে তাকিয়ে বিমল চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বল্‌লে, “কি শুনছ বিমল? মহাসাগরের চিরন্তন সঙ্গীত?”

—“আমি কিছুই শুনছি না ভাই! আমি এখন পূর্ব্বদিকে একটা দৃশ্য দেখবার চেষ্টা কর্‌ছি।”

—“সূর্য্যাস্তের দেরি নেই। এখন তো রঙিন দৃশ্যপট খুলবে পশ্চিম আকাশ। আজ প্রতিপদ, চাঁদও আসবে খানিক পরে। তবে পূর্ব্বদিকে এখন তুমি কি দেখবার আশা কর?”

—“যে আশায় এতদূর এসেছি।”

—“মানে?”

—“কুমার, এইমাত্র দূরবীণে দেখলুম পূর্ব্বদিকে একটি পাহাড়ে-ঘেরা দ্বীপকে—তার একদিকে রয়েছে পাশাপাশি পাঁচটি শিখর! আমি সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। খালি চোখেও তাকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ভালো ক’রে দেখতে চাও তো এই নাও দূরবীণ।”

কুমার বিপুল আগ্রহে দূরবীণটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখে তুলে অবাক্ হয়ে দেখলে; বিমলের কথা সত্য!

ছোট্ট একটি দ্বীপ, তার পায়ে উছ্‌লে প'ড়ে নমস্কার ক'রে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের চঞ্চল ঢেউ এবং তার মাথার উপরে উড়ছে আকাশের পটে চলচ্চিত্রের মত সাগর-কপোতরা। পশ্চিম আকাশের রক্ত সূর্য্য যেন নিজের পুঁজি নিঃশেষ ক'রে সমস্ত কিরণ-মালা জড়িয়ে দিয়েছে ঐ দ্বীপবাসী শ্যামল শৈলশ্রেণীর শিখরে শিখরে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ও যেন মায়াদ্বীপ, চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও-যেন এখনি ডুব মারতে পারে অতল নীলসায়রে!

ততক্ষণে জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও জাহাজের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং রামহরিরও সঙ্গে এসেছে বাঘা। দ্বীপটিকে খালি চোখেও দেখা যাচ্ছিল, সকলে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কুমার বললে, "ওহে বিমল, দ্বীপটি তো দেখছি একরকম পাহাড়ে-মোড়া বল্‌লেই হয়! পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে উপর দিকে অনেকখানি। ও দ্বীপ যেন পাহাড়ের উঁচু পাঁচীল তুলে সমস্ত বাইরের জগৎকে আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছে, ওর ভিতরে যেন বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ! ও দ্বীপে ঢোক্‌বার পথ কোন্ দিকে?"

বিমল পকেট থেকে অমৃত-দ্বীপের নক্সা বার ক'রে বল্‌লে, "এই দেখ। দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচ-পাহাড়ের সব-চেয়ে-উঁচু শিখরওয়ালা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখ। দ্বীপের ভিতর থেকে একটি নদী পাহাড় ভেদ ক'রে সমুদ্রের উপরে এসে পড়েছে। আমাদের দ্বীপে ঢুকতে হবে ঐ নদীতেই নৌকো বেয়ে।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখছি, আমায় যেন জাহাজ থেকে নামতে বলা না হয়।··· ··· কেমন রামহরি, তুমিও তো আমার দলেই?"

রামহরি প্রথমটা চুপ ক'রে রইল। তার পর বল্‌লে, "না বাবু, তা হয় না। খোকাবাবুরা যদি নামেন, আমাকেও নামতে হবে।"

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বল্‌লেন, "সে কি হে রামহরি, ও দ্বীপ যে পিশাচদের দ্বীপ! ওখানে যারা ম'রে যায় তারাও চ'লে বেড়ায়!"

রামহরি বল্‌লে, "খোকাবাবুদের জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি।"

সূর্য্য অস্ত গেল। জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে। ঘনিয়ে উঠল সন্ধ্যার অন্ধকার। জাহাজ তখন শৈল-দ্বীপের পঞ্চশিখরের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

সমুদ্রের পাখীরা তখন নীরব। আকাশ-আসরেও লক্ষ লক্ষ তারা প্রতিপদের চন্দ্রের জন্যে রয়েছে মৌন অপেক্ষায়। দ্বীপের ভিতর থেকেও কোন রকম জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সমুদ্র কিন্তু সেখানেও বোবা নয়, তার কল্লোলকে শোনাচ্ছে স্তব্ধতার বীণায় অপূর্ব্ব এক গীতিধ্বনির মত।

তার পর ধীরে ধীরে চাঁদ উঠল, অন্ধকারের কালো নিকষে রূপোলী আলোর ঢেউ খেলিয়ে।

বিমল বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু, দ্বীপে ঢোকবার নদীর মুখেই আমাদের জাহাজ নঙ্গর করেছে। এখন যদি বোটে ক'রে আমরা একবার দ্বীপের ভিতরটা ঘুরে আসি?"

মাণিক বল্‌লে, "কি সর্ব্বনাশ, এই রাত্রে?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "লুকিয়ে খবরাখবর নেবার পক্ষে রাত্রিই তো ভালো সময়, মাণিক! চাঁদের ধব্‌ধবে আলো রয়েছে, আমাদের কোনই অসুবিধা হবে না।"

বিমল বল্‌লে, "আজ আমরা দ্বীপের খানিকটা দেখেই ফিরে আসব। আমি, কুমার আর জয়ন্তবাবু ছাড়া আজ আর কারুর যাবার দরকার নেই। ফিরে আসবার পর কাল সকালে আমাদের আসল অভিযান সুরু হবে।"

মাণিক নারাজের মতন মুখের ভার ক'রে বল্‌লে, "কিন্তু যদি আপনারা কোন বিপদে পড়েন?"

—"বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই স'রে পড়ব। নয়তো একসঙ্গে তিনজনেই বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্কেত করব। উত্তরে আপনারাও বন্দুক ছুঁড়ে আমাদের জানিয়ে জাহাজের নাবিকদের নিয়ে সদলবলে দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করবেন।"

··· ··· ··· ···

চন্দ্রালোকের স্বপ্নজাল ভেদ ক'রে তাদের নৌকো ভেসে চল্‌ল দ্বীপের নদীতে নাচতে নাচতে। নৌকোর দাঁড় টানছে বিমল ও জয়ন্ত, হাল ধরেছে কুমার। চুপি চুপি কাজ সারবে ব'লে তারা নাবিকদেরও সাহায্য নেয় নি।

খানিকক্ষণ নদীর দুই তীরেই দেখা গেল, পাহাড়রা দাঁড়িয়ে আছে চিরস্তব্ধ প্রহরীর মত। ঘণ্টাখানেক পরে তারা পাহাড়ের এলাকা পার হয়ে গেল।

দুই তীরে তখন চোখে পড়ল মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে ছোট-বড় জঙ্গল ও অরণ্য। চাঁদের আলো দিকে দিকে নানা রূপের, কত মাধুরীর ছবি এঁকে রেখেছে, কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল না তখন তাদের দৃষ্টি।

দ্বীপের কোথাও যে কোন মানুষের চোখ এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করছে, এমন প্রমাণও তারা পেলে না। এ দ্বীপ যেন একেবারে জনহীন—এ যেন সবুজ ক্ষেত্র, বৃহৎ বনস্পতি ও আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়দের নিজস্ব রাজত্ব!

জয়ন্ত বল্‌লে, "বিমলবাবু, এই যদি আপনার অমৃত-দ্বীপ হয়, তাহ'লে বল্‌তে হবে যে এখানকার অমররা হচ্ছে অশরীরী!"

বিমল বল্লে, "কুমার, নৌকোর মুখ তীরের দিকে ফেরাও।"

জয়ন্ত বল্লে, "কেন?"

—"ডাঙায় নেমে দ্বীপের ভিতরটা ভালো ক'রে দেখতে চাই।"

—"কিন্তু নৌকো থেকে বেশী দূরে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

বিমল কি জবাব দিতে গিয়েই চম্‌কে থেমে পড়ল। আচম্বিতে অনেক দূর থেকে জেগে উঠল বহুকণ্ঠে এক আশ্চর্য্য সঙ্গীত! সে গানে পুরুষের গলাও আছে, মেয়ের গলাও আছে! গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বিচিত্র তার সুর—অপূর্ব্ব মিষ্টতায় মধুময়।

কুমার চমৎকৃত কণ্ঠে বল্লে, "ও কারা গান গাইছে? ও গান আসছে কোথা থেকে?"

বিমল নদীর বাম তীরের দিকে চেয়ে দেখলে। প্রথমটা খোলা জমি, তার পর অরণ্য।

সে বল্লে, "মনে হচ্ছে গান আসছে ঐ বনের ভিতর থেকে। নৌকো তীরের দিকে নিয়ে চল কুমার! কারা ও গান গাইছে সেটা না জেনে ফেরা হবে না।"

খানিক পরেই নৌকো তীরে গিয়ে লাগল। বিমল, কুমার ও জয়ন্ত নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল।

বিমল বল্লে, "খুব সাবধানে, চারিদিকে নজর রেখে আমাদের যেতে হবে।"

তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল নরম ঘাসে ঢাকা এক মাঠের উপর দিয়ে। সেই অদ্ভুত সম্মিলিত সঙ্গীতের স্বর স্তরে স্তরে উপরে—আরো উপরে উঠছে এবং তার ধ্বনি জাগিয়ে দিচ্ছে বহুদূরের প্রতিধ্বনিকে! সে যেন এক অপার্থিব সঙ্গীত, ভেসে আসছে নিশীথ-রাতের রহস্যময় বুকের ভিতর থেকে!

যখন তারা বনের কাছে এসে পড়েছে, কুমার হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে চকিত স্বরে বল্লে, "বিমল, বিমল! পিছনে কারা আসছে দেখ!"

বিমল ও জয়ন্ত একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, নদীর দিক্ থেকে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে বহু—বহু মূর্ত্তি! সংখ্যায় তারা পাঁচ-ছয়শ'র কম হবে না!

বিমল মহাবিস্ময়ে বল্লে, "নদীর ধারে তো জনপ্রাণী ছিল না! কোত্থেকে ওরা আবির্ভূত হ'ল?"

যেন আকাশ থেকে সদ্য-পতিত এই জনতার দিকে তারা তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট নেত্রে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে মূর্ত্তিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের মনে হ'ল মূর্ত্তিগুলো মানুষের মূর্ত্তি হ'লেও, প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি হচ্ছে অত্যন্ত অমানুষিক! (ক্রমশঃ)

কবিকিশোর

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্.এ)

ম্যালেরিয়া

নতুন মাষ্টার মশায় চ'লে যাওয়ার পরেও আমাদের বাড়ীতে দুপুরবেলা রামায়ণ বা অন্য কোন বই পড়ার রেওয়াজ ছিল। দুপুরে বাড়ীতে কাউকে ঘুমোতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। মা সেলাই নিয়ে থাকৃতেন, কাকীমা রামায়ণ, মহাভারত পড়্‌তেন, কিংবা কোন পুরাণ গ্রন্থ কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র বা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বই—অনেকে তাঁ'র নিত্য শ্রোতা ছিলেন। ধৈর্য্য ধ'রে বহুক্ষণ ধ'রে কোন কিছু শুন্‌বার ছেলে আমি ছিলাম না। তবে, মাষ্টার মশায়ের প্রভাবে, তাঁ'র কাছ থেকে পুরাণ প্রভৃতির গল্প শুন্‌বার পর থেকে কোন কিছু শুনতে ইচ্ছে হ'ত, আর শুন্‌তামও। মেজদি' ইতিমধ্যে এক-আধটু বড়-সড় হ'য়েছে আর ভেতরে ভেতরে তা'র বিয়ের আয়োজন চলেছে, মাঝে মাঝে তা' কানে আস্‌ত। এই সময়টাতেই আমার প্রায়ই ম্যালেরিয়া হ'ত। দালানে যেখানে মা ব'সে ব'সে সেলাই করতেন, কাকীমার রামায়ণ পড়া শুন্‌তেন, তা'রই কাছে আমার বিছানা থাকৃত পাতা। চুপ্‌চাপ্ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকৃতাম। মাষ্টার মশায়ের কথা প্রায়ই মনে হ'ত। প্রহ্লাদের চরিতকথা তিনি গল্পচ্ছলে একবার শুনিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ পৃথিবীর সর্ব্ববস্তুতে ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পেতেন। আমার মনে পড়ে মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, 'আমরা তাঁ'কে দেখ্‌তে পাই নে কেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে তাকিয়ে থেকো, যে কোন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ্‌তে পা'বে—আর সেটা তাঁ'রই লীলা মনে করবে।'

ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝি নি অত ছোট বয়সে। সেদিনও অসুখ নিয়ে শুয়ে আছি মা'র পাশে। একটা প্রকাণ্ড কাঁথায় তিনি নানা রকম ফুল তুল্‌তেন। সেদিনও সেই সব হচ্ছে। একটু দূরে কাকীমা বোধ হয় রামায়ণ পড়্‌ছিলেন। হঠাৎ মাষ্টার মশায়ের কথা মনে প'ড়ল—সম্মুখে একটু তাকিয়ে রইলাম। দেখ্‌লাম, একটি ছোট্ট পোকা (কি পোকা জানি না) আমার দিকে আসছে। মুহূর্ত্তমধ্যে

পোকাটিকে রঙ্ বদ্‌লা'তে দেখ্‌লাম। সবুজ, লাল, নানা রকম রঙ্! খানিকক্ষণ তা'র দিকে চেয়ে রইলাম। অল্প একটু আগিয়ে এল পোকাটি—তার পরে সে যে কোথায় গেল, আর তা'কে দেখা গেল না। মনে মনে মাষ্টার মশায়ের কথা ভেবে এই ভাব্‌লাম তখন,—এই পোকাটিই ঈশ্বর, আমাকে একবার দেখা দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। এই রকম সরল বিশ্বাস তখন ছিল। কবির কথায় বলা চলে :

"যখন আমি শিশু ছিলাম, নিত্য দিবারাত,
তখন আমার সত্য-সনে ঘটিত সাক্ষাৎ।"

জীবনের পথে অনেক আগিয়ে এসে ঐ কবিতা পড়েছি। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে যে সত্য আছে, তা ছোট বয়সের কথা মনে ক'রে অনুভব কর্‌লাম।

* * অসুখ সম্পূর্ণ সার্‌ল না। দূর গ্রাম থেকে ডাক্তার আস্‌তেন। ওষুধ খাওয়া চল্‌ত। মাঝে মাঝে অসুখের খবরে বিচলিত হ'য়ে কর্ম্মস্থান থেকে বাবা আস্‌তেন বাড়ী। আস্‌বার সময় অনেক ফলমূল নিয়ে আস্‌তেন। অসুখের মুখে সেই সব রুচিকর পথ্য চল্‌ত। এই সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আচার খেতাম আর নানান্ ধরণের গল্পের বই পড়্‌তাম। কোন বই-ই বাদ যেত না। মনে পড়ে এক রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ্ বই প'ড়ে তা'রই অনুসরণে নিজে একখানি বই প্রায় লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলাম। বইএর প্রথমেই এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হ'য়েছে আর এক প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে এসে তা'রই তদন্ত কর্‌ছেন—এইটুকু লিখে রেখেছিলাম। সেখানি মা'র হাতে পড়ে। মা সেখানি নিয়ে আবার আরো সকলকে শুনিয়েছিলেন। * * তার পরে আর উৎসাহ রইল না।

"সংক্ষিপ্ত..."

(কুমারী শোভনা সরকার)

ও পাড়ার সুশীলকে চেন তো? আমাদের সঙ্গেই এক ক্লাসে পড়ত। মগজে বিদ্যা থাকুক না থাকুক পেটের মধ্যে তার কুবুদ্ধির অন্ত ছিল না। তারই সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন।

সেদিনটা শনিবার। শেষ ঘণ্টায় ছিল আমাদের রচনা লিখবার ক্লাস। মাষ্টার মশাই ক্লাসে এসেই বল্লেন, "আজ তোমরা সংক্ষেপে একটি ফুটবল ম্যাচের বর্ণনা লেখ। যার লেখা আগে শেষ হবে সেই আগে ছুটী পাবে।"

এমন লোভনীয় প্রস্তাবে কার না আগ্রহ হয়? আমরা ক্লাসশুদ্ধ ছেলে একেবারে একাগ্রচিত্ত হয়ে খাতার উপর ঝুঁকে পড়লাম। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হ'লেও কত আর ছোট লেখা যায়? একটা বর্ণনা দিতে হবে তো! তা ছাড়া মাষ্টার মশাই নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে রচনাটা পড়তে বলবেন, যা-তা লিখলেও চলবে না।

লিখতে আরম্ভ করেছি—এক মিনিটও বোধ হয় হয় নি, হঠাৎ দেখি, সুশীল দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, "হয়ে গেছে স্যর!"

"য়্যাঁ, এরই মধ্যে হয়ে গেল?" মাষ্টার মশাই চমকে উঠলেন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, কি লিখেচ পড় তো?"

সুশীল উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে পড়ল, "ফুটবল্ ম্যাচ্"। তার পর গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে—"রেফরীর আদেশে বৃষ্টির জন্য আজ ম্যাচ্ বন্ধ রইল। কেমন স্যর, বেশ সংক্ষেপে লেখা হয় নি? এবার বাড়ী যেতে পারি তা হ'লে?"

রচনার সংক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে মাষ্টার মশাই কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। *

* বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে।

(শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ প্রায় শেষ হয়ে এল। এখানকার ফুটবল খেলার পর্য্যায় ক্রমেই নীচের দিকে নামছে—অভিজ্ঞ লোকেদের মত এই।

গেল বছরের লীগ্-বিজয়ী মোহনবাগান এবারে গোড়ার দিকে পর পর রেঞ্জার্স প্রভৃতি কয়েকটি দলের কাছে হেরে যাওয়ায় প্রথমটা অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেই সুরু হয় তাদের (খবরের কাগজের ভাষায়) "অপ্রতিহত অগ্রগতি।" মোহনবাগানের এবারেও চ্যাম্পিয়ন্ হবার সম্ভাবনায় অনেকেই আশান্বিত হয়ে উঠলেন, বিশেষতঃ দুর্দ্ধর্ষ মহামেডান স্পোর্টিংকে ২ গোলে হারাবার পর। এ দলের ব্যাক্ পি. চক্রবর্ত্তী ও টি. চৌধুরীকে প্রায় চীনের প্রাচীরের মতই অভেদ্য বলে মনে হয়েছিল। সেণ্টার হাফে প্রামাণিক আত্মরক্ষা ও আক্রমণ ভাগকে বল যোগান দুই কাজই চমৎকার ভাবে করছিলেন। গোলে কে. দত্ত তো বিখ্যাত খেলোয়াড়! (এবারকার ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় ম্যাচে এঁকেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক করে ভারতীয়েরা ৩—২ গোলে জয়লাভ করেছে)। ফরোয়ার্ডে বিশেষ করে মান্না গুঁই ভাল খেলেছেন। কিন্তু অনেক খেলাতেই তাঁকে ভাল ভাবে বল্ না যোগান'য় মোহনবাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান আর মহামেডান্ স্পোর্টিং পাশাপাশি ছুটছিল—মোহনবাগানই ছিল ওপরে; কিন্তু শেষ দিকে হঠাৎ মোহনবাগান বসে পড়ল। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথমটা করল তারা ড্র, তার পরই মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে কর্দ্দমাক্ত মাঠে শিশুর মত পরাজিত হ'ল—২ গোলে।

মহামেডান্ স্পোর্টিং যদিও এবার আগেকার চাইতে অনেক দুর্ব্বল কিন্তু তবুও এখনও এরাই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য। এদের খেলাতেই সব চেয়ে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে জয়-পরাজয়ের উপর ভাগ্য-বিপর্য্যয় নির্ভর করে সেখানে তারা বিজয়ের জন্য দৃঢ়সংকল্প নিয়েই খেলে, মোহনবাগান যেন ঠিক এদের উল্টো। মহামেডান্ দলের পুরোনো খেলোয়াড়রা

অনেকেই আছেন। গোলে আলি হোসেন এসে দলকে শক্তিশালী করেছেন। আব্বাস চলে গেছেন কাষ্টমস্এ, ফরোয়ার্ডে এবার সাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহামেডান দলের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হওয়া এবার অবধারিত বলা যেতে পারে, মোহনবাগানের চাইতে তারা এখন (১১ই জুলাই) তিন পয়েণ্ট এগিয়ে। আর ক'টাই বা খেলা বাকী!

মোহনবাগানের পরে আছে রেঞ্জার্স ও ইষ্টবেঙ্গল। তেমন ভাল না হ'লেও গোড়ায় ইষ্টবেঙ্গলের রানার্স আপ্ হবার কিছুটা আশা ছিল, কিন্তু শেষ দিকে কাষ্টমস্এর কাছে পরাজিত হয়ে তা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হয়েছে।

নীচের দিকে আছে ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং সর্ব্বনিম্নে ক্যাল্কাটা। যে দুর্দ্ধর্ষ ক্যাল্কাটার নামে এক সময় খেলার মাঠ কাঁপত তাদেরই এবার দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় বিভাগে এবার চ্যাম্পিয়ন্ হবার জন্য অরোরা ক্লাব, ডালহৌসি প্রভৃতি দলের মধ্যে রেষারেষি চলেছে।

এই তো গেল কলকাতার কথা। বোম্বাইএ হারউড্ ফুটবল্ লীগে ওয়েল্চ্ রেজিমেণ্ট পর পর ৬টি ম্যাচে জিতেছে। তাদের চ্যাম্পিয়ন্ হবার খুবই আশা আছে।

ঢাকার সৈয়দ হাসান মেমোরিয়াল্ কাপ্ ফুটবল্ লীগে উয়ারী ক্লাব্ ২০টি ম্যাচ্ খেলে ৩৬ পয়েণ্ট করে চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। তাদের গা ঘেঁষে রানার্স আপ্ হয়েছে ঢাকা ফার্ম্ম। তার পর কেউ ধারে কাছেও পয়েণ্ট পায় নি। ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স ৯ পয়েণ্ট পেয়ে সব চেয়ে নীচে হয়েছে।

কলকাতার লীগ্ শেষ হ'লেই সুরু হবে আই-এফ্-এ শীল্ড্। কিন্তু উত্তেজনার আশা কম। ভাল মিলিটারী দল তো আর বিশেষ আসছে না! এবার নেহাৎই আমি আর তুমি, তুমি আর আমি।

১১ই জুলাই, ১৯৪০

যুদ্ধের খবর

ইয়োরোপের ইতিহাসে এই ক'দিনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে—যে আগুন জ্বলে উঠেছে তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। প্রথম বড় খবর—ইটালি জার্ম্মান্ পক্ষে যোগ দিয়েছে। ইটালি যুদ্ধে নামলে আমেরিকাও ইংরাজ পক্ষে নামবে এই রকম ভাব দেখিয়েছিল কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। আপাততঃ ঠিক হয়েছে আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্ট আর কোনও অস্ত্রাদি ইংলণ্ডে পাঠাবে না। আমেরিকার আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সমরায়োজনের জন্য সেনেট অনেক টাকার বন্দোবস্ত করেছে। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশগুলি সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সর্ব্বতোভাবে বৃটেনকে সাহায্য করছে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় খবর ফ্রান্সের পতন। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পর জার্ম্মান্ বাহিনী ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফরাসী-বাহিনী অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে কিন্তু জার্ম্মেনীর সৈন্যবলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। রাজধানী প্যারিসকে অরক্ষিত বা 'খোলা সহর' বলে ঘোষণা করে তারা গভর্ণমেণ্ট সরিয়ে নেয়। জার্ম্মান্-বাহিনী পরিত্যক্ত সহর দখল করে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্যারিস সহরের পতন দেখে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়।

তার পর নতুন প্রধান মন্ত্রী পেতোঁর নেতৃত্বে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মেনীর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করে—ইটালির সঙ্গেও অনুরূপ প্রস্তাব করতে তারা বাধ্য হয়। জার্ম্মেনী কতকগুলি কঠোর সর্ত্তে সন্ধি করেছে। ফলে ফ্রান্স এখন জার্ম্মেনীর তাঁবেদারী গভর্ণমেণ্টে পরিণত হয়েছে, ভূমধ্য-সাগরেও ফ্রান্স শক্তিহীন হয়েছে। অবশ্য ফ্রান্সের কোন কোন নেতা এ চুক্তি সমর্থন করেন নি—তাঁরা বাইরে থেকে বৃটেনকে সাহায্য করছেন।

বৃটেন এত বিপদের মধ্যেও ধৈর্য্য হারায় নি,—অমিতবিক্রমে তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে। ভূমধ্য-সাগরে ইটালির তারা অনেক ক্ষতি করেছে—জার্ম্মান্ কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনায় একটি ফরাসী নৌবহরও তারা যুদ্ধে জয় করে নিয়েছে। স্থানে স্থানে জার্ম্মেনীর সঙ্গে ইংলণ্ডের বিমান-যুদ্ধ চলেছে। ইংরেজরা বীরবিক্রমে বাধা দিচ্ছে—পাল্টা আক্রমণও চালাচ্ছে।

এদিকে জাপান ফরাসী ইন্দোচীন নিয়ে গোলমাল আরম্ভ করেছে। রাশিয়ার মতিগতি বোঝা ভার। তারা ইতিমধ্যে বেসারবিয়া (রুমানিয়ার কিয়দংশ) অধিকার করেছে।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়; মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

নতুন প্রশ্ন

১। লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন কেন? —শ্রীদীপালি রায়

২। বাংলা ভাষায় 'জার্ণালিজ্‌ম্' (সংবাদপত্র পরিচালনা) সম্বন্ধে কোন বই আছে কি? —শ্রীহিমাদ্রিশেখর বসু

তোমাদের সম্পাদক মশাই অনেক দিন কলকাতা থেকে অনুপস্থিত ছিলেন, সেজন্য গেল বারে 'চিঠিপত্র' বিভাগ দেওয়ার সুবিধা হয় নি। এবারে কয়েকখানা চিঠির অংশ প্রকাশ করা হ'ল।

"প্রিয় রামধনুর গ্রাহিকারা,

আমরা মেয়েরা মিলে পূর্ণিয়ায় ছাত্রী-সঙ্ঘ নাম দিয়ে একটা সঙ্ঘ খুলেছি। এতে নানা বিভাগ আছে, একটা হচ্ছে "ডিফেন্স পার্টি"—অর্থাৎ আত্মরক্ষা এবং প্রয়োজন হ'লে অপরকে সে বিষয়ে সাহায্য করবার উপায় শেখা। এটা শুধু মেয়েদের জন্য, কিন্তু মহিলারাও ইচ্ছা করলে যোগ দিতে পারেন। তোমরা যদি নিজেদের গ্রামে বা সহরে এই রকম একটি ক'রে ছাত্রী-সঙ্ঘ খোল তবে দেশের উপকার হ'তে পারে। কেউ যদি এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে চাও তবে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মাবলী পাঠাতে পারি। এই ঠিকানায় চিঠি দেবে—গীতা ও শক্তি মৈত্র, C/o শ্রীযুক্ত নীলরতন মৈত্র, পোঃ ভাট্টা বাজার, পূর্ণিয়া।"

"...গত সংখ্যায় 'জীবজন্তুর আয়ু' প্রবন্ধে ১৫০ বছর বয়সের মানুষের কথা লেখা হয়েছে। আমি আর একজনের কথা বলছি। এঁর নাম য়িকুপ সোয়া। ইনি জাতিতে রাশিয়ান্—বয়স এখন ১৫৭ বছর। এঁর প্রধান খাদ্য হচ্ছে দই (Fermented Milk)। এঁর দৃষ্টিশক্তি ও চর্ব্বণশক্তি নাকি খুব ভাল।

...আমার কাছে অনেক দেশের এক রকমের ৩।৪ খানা ডাকটিকেট আছে। কোন গ্রাহক আমার সঙ্গে টিকেট বদলাবদলি করতে ইচ্ছুক

হ'লে সুখী হব।"—শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ, C/o শ্রীযুক্ত এল্.এম্. ঘোষ, ভাষাকোষ লেন, পোঃ চাঁদনী চক্, কটক (উড়িষ্যা)।

"কাগজে দেখলুম - গীতাবাঈ জি গ্যাডগিল নামে একজন মহিলা বিমান চালনায় প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পেয়েছেন। রবীন বাবুর "ইরা"ই কি রূপ পরিগ্রহ করল ?"

—শ্রীমালবিকা দত্ত ও শ্রীমাধবিকা দত্ত।

আমাদের বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই একটু খর্ব্বকায়। এ দেশে একটু অতিরিক্ত দীর্ঘকায় লোকদের সময় বিশেষে যে কি রকম বিপদে পড়তে হয় সেদিন কলকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চলে তা দেখা গেছে। ত্রিপুরা-রাজের একজন শরীররক্ষী পাড়াগাঁ থেকে কলকাতা এসেছিলেন, ভদ্রলোক একটু অস্বাভাবিক রকম লম্বা—৭ ফুটের ওপর। পায়ের পাতা দু'টিও তাঁর অসম্ভব রকম বড়। লোকটি রাস্তায় বেরোতেই তাঁর চার দিকে ভিড় জমে যায় এবং একটু পরেই জন কয়েক সুসভ্য পথচারী তাঁর ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে সুরু করে। হয়তো তারা তাঁকে দৈত্য-দানব কিছু ভেবে থাকবে। ব্যাপার এমন গড়িয়েছিল যে শেষটায় লোকটিকে থানায় ঢুকে আত্মরক্ষা করতে হয়। লোকটির বয়স কিন্তু বেশী নয়, মাত্র ১৮ বছর।

সম্প্রতি গান্ধীজি, মিঃ জিন্না ও শ্রীযুত সাভারকর বড়লাট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সিমলায় গিয়েছিলেন। তার পরই দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়ে গেছে। এই বৈঠকে শ্রীযুক্ত আণে ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

* * *

সম্প্রতি ভারতরক্ষা আইনে সুভাষ-চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুভাষ-চন্দ্রের জায়গায় সর্দ্দার শাদ্দুল সিং করিশের ফরোয়ার্ড্ ব্লকের সভাপতি হয়েছেন।

* * *

এবারকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় শ্রীহট্ট সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে শ্রীমতী কনক পুরকায়স্থ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। ইতিপূর্ব্বে কলকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ইতিহাসে আর কোন মেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেন নি। এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে আরও তিনটি মেয়ে স্থান পেয়েছেন। কলকাতা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটের শ্রীমতী লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ম স্থান, ও ভবানীপুর বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীমতী সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত ৯ম স্থান অধিকার করেছেন।

* * *

বাংলা দেশে কিন্তু শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা এখনও শত করা ৪ জন। এ বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য বাংলার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সেখানেই শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। কিন্তু সেখানেও নাকি শত করা মাত্র ৭ জন মেয়ে শিক্ষিতা।

* * *

পৃথিবীতে খাদ্যাভাব যেমন দিনকে দিন বেড়ে চলেছে তাতে অদূরভবিষ্যতে মানুষকে হয়তো ঘাস থেকে খাদ্য তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য ঘাস যে পুষ্টিকারিতার দিক্ থেকে নগণ্য তা মনে ক'র না। সম্প্রতি তিন জন আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে একমাত্র ভিটামিন 'ডি' ছাড়া ঘাসে আর সব ক'টা ভিটামিনই পাওয়া যাবে।

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এ মাসের রামধনুতে ৩৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "বিল্বতরু" শীর্ষক কবিতাটি একটা কাগজে পরিষ্কার ভাবে নকল ক'রে পাঠাতে হবে। যার **হাতের লেখা** সব চেয়ে ভাল হবে তাকে প্রথম পুরস্কার ও তার পরের জনকে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। **সঙ্গের কুপনে** নাম ও ঠিকানা লিখে সঙ্গে গেঁথে দিতে হবে—সঙ্গে কুপন না থাকলে তা গ্রাহ্য হবে না। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। লেখা ১লা ভাদ্রের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পাঠাতে হবে।

এইখানে কাট।

রামধনু
শ্রা ৪৭

নাম...

ঠিকানা...

....

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

রাম বাবু ২৯শে ফেব্রুয়ারী জন্মেছিলেন। কাজেই তাঁর জন্মদিন ৪ বছরে একবার ক'রে, অর্থাৎ প্রত্যেক লীপ্ ইয়ারে ছাড়া, হ'তে পারে না। কাজেই ৬৪ বছরে তাঁর ১৬শ জন্মদিনই হবে।

উত্তরদাতাদের নাম

রত্না দেবী (পাটনা); হিমাংশু মুখার্জ্জি (কলিকাতা); শ্যামসুন্দর মাইতি (কোলাঘাট); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); লিলি, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় (চাইবাসা); বিভু, ঢুলু, নন্দ, পিলু, নন্দুদা (পাটনা); সুধাংশুরঞ্জন বক্সী (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

ছাপাখানায় এক নেশাখোর কম্পোজিটর জুটেছে। হরফ বসাতে গিয়ে সে নেশার ঝোঁকে মাঝে মাঝে কতকগুলি হরফ উল্টে পাল্টে দিয়েছে। যেখানে হবে 'ট' সেখানে হয়তো বসিয়েছে 'ভ', আবার 'ভ'এর জায়গায় বসিয়েছে 'ট'। তবে গুণের মধ্যে, একই হরফের বদলে প্রত্যেকবার একই হরফ বদলাবদলি করেছে এই যা রক্ষে। ছাপাখানার কর্ত্তারাও আবার তেমনি, তাঁরা আবার তাই দিয়েছেন ছাপিয়ে। সে ছাপা পড়ে তো সবাই হতভম্ব! তোমরা পাঠোদ্ধার করে দিতে পার কি? দেখ তো চেষ্টা করে :—

চশিচামায় উনাপ ভীষণ গপত। ঢাচাও মথৈনক। [illegible]শ, রুপী না লিশং ষাঅ; বকেৎ উখাবে তাপা রড়িন। নর্ষাচাশ রড়িমে কশিশ, উমটুচু জশ[illegible] [illegible]অশ্র [illegible]। উ ভানে চি তাবুষ টিচিমে রাপে?

মায়ের আদর

(পৃথিবীর একখানি বিখ্যাত ছবি)

C. H. ARAN & CO.

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৭ { ৮ম সংখ্যা

'বিষ্টি-থামা ভোর'

(শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

'বিষ্টি' সেদিন গেলো থেমে
গগন কিনারায়,
রামধনুকের খুল্‌ল দুয়ার—
মেঘরা ভেসে যায়।
সেখান থেকে ফুলের পরী
হাওয়ায় পাখা মেলে
চুপি চুপি নেমে এলো
ফুলের গন্ধ ঢেলে।

খুকু, তোমার আবোল তাবোল
বকা এখন রাখো,
চুপটী ক'রে সেলেট নিয়ে—
ব'সে ছবি আঁকো।

নইলে পরে পালিয়ে যাবে
রামধনুকের পরী,
আফশোষেতে থাকতে
হবে মুখটি নীচু করি'।

খিড়কি-দুয়ার খুলে খুকু,
এসো বাগানেতে—
দেখবে ওরা ফুল ফোটানোর
খেলায় আছে মেতে।

সবুজ পুতুল, রাঙা পুতুল
খেল্‌বে নেচে নেচে,
ফুলের রাণীর সাথে তারা
ভাব করিবে যেচে।

হলুদ পুঁথির মালা খুকু,
পরিয়ে দিও তারে,
শুধিয়ে নাকো কথামালার
বানান একেবারে।

ফুল ফোটানোর ভালবাসায়
ফুলের দেশের পরী
খুকু, তোমার বুকটী দেবে
পলক মাঝে ভরি'।

বিষ্টি, থামা চিকন ভোরে—
মেঘরা চলে ভেসে,
ভাব করেছে খুকুর সাথে
শিউলি-পরী এসে।

ধূমকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি)

দশম পরিচ্ছেদ

একটু সুস্থ হইয়া অধ্যাপক চন্দ্র দেখিলেন, ডক্টর রুদ্র স্নেহচিন্তিত মুখে তাঁর দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁর পাশে কয়েক জন মেরুবাসীর সঙ্গে স্বয়ং নীলাহীরা দাঁড়াইয়া।

নীলাহীরা প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "আর ভয় নেই; কিন্তু আমাদের তো এখনই যেতে হচ্ছে, বড্ড জরুরী কাজ আছে। এই নিন আপনাদের চিঠির জবাব, সুবিধা হ'লে আপনাদের দেশের মন্ত্রিসভার সামনে যথা সময়ে পেশ করবেন। আপনাদের সৈন্য-বাহিনী সময় উত্তীর্ণ হবার কিছু আগেই আমাদের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তাই আমাদেরও একটু অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। যাক্ সে কথা। এখনও মধ্যাহ্নের কিছু বাকী আছে। দয়া করে তার আগে এ চিঠি খুলবেন না, এই আমার অনুরোধ। আর, যে এরোপ্লেনে আপনারা দু'জনে এখানে এসেছিলেন সেটা আমরা দু'মাইল দূরে বড় মাঠটার শেষে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনই সেখানে চলে যান। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দয়া করে এদিকে আর আসবেন না। ভয় নেই, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলছি।" অভিবাদন করিয়া নীলাহীরা তাঁর সঙ্গীসহ পিরামিড-দুর্গের দিকে প্রস্থান করিলেন।

খানিক ক্ষণ অভিভূতের মত থাকিবার পর ডক্টর রুদ্র কহিলেন, "আর চিন্তা করে লাভ নেই কিছু। এরা অসত্যবাদী নয় বলেই আমি জানি। চলুন, এরোপ্লেনের দিকেই যাওয়া যাক্। চিঠিটা আর এখন খুলে কাজ নেই।"

সূর্য্যদেব মাথার উপর উঠিলেন। এরোপ্লেনের গায়ে হেলান দিয়া অধ্যাপক চন্দ্র ধীরে ধীরে নীলাহীরার চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলেন। মেরুবাসীর ছবির হরফে পরিষ্কার ভাবে লেখা চিঠি—বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপকের পক্ষে তার পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। তা ছাড়া ডক্টর রুদ্রের নিকটও এ অক্ষর অপরিচিত নয়।

দীর্ঘ চিঠি। প্রথমে খানিকটা ভনিতার পর নীলাহীরা লিখিয়াছেন :

"...... এবার আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলি। মেরুর বরফ-ঢাকা অঞ্চলে রাতারাতি নতুন সভ্যতার পরিচয় পেয়ে আপনারা অবাক্ হয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের এ সভ্যতা নতুন সভ্যতা নয়—বোধ হয় পৃথিবীর আদিতম সভ্যতা। সব কথা বুঝতে হ'লে আপনাদের ছাব্বিশ হাজার বছর আগেকার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে!

"এখন পৃথিবীর যে ভৌগোলিক অবস্থা দেখছেন—যা আপনাদের কাছে নতুন লাগছে, তখন তাই ছিল পৃথিবীর আসল চেহারা। মেরুর দেশ তখন সত্যিই বরফে ঢাকা ছিল না—শস্য-শ্যামলা, সমৃদ্ধিভরা ছিল সে দেশ। আর এক,—হ্যাঁ, বলতে দোষ নেই,—এক অতিসভ্য জাতি ছিল সে দেশের অধিবাসী। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল যখন নিতান্ত আদিম মানুষ আর পশুতে ভরা ছিল সেই সময় এত বড় সভ্য জাতি কি করে এ দেশে জন্মাল তা ভাবতে আমাদেরও বিস্ময় বোধ হয়। শুধু সামাজিক জীবনে নয়, বৈজ্ঞানিক প্রতিভায়ও ছিল এরা অদ্ভুত। তারা জান্ত যে শক্তির আসল কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য্য আর এই সূর্য্যকিরণকে বশে আনতে পারলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকবে না। তাই তারা করেছিল। সূর্য্যের আলো আর শক্তি সংগ্রহ করে সেই শক্তিকে সঞ্চিত ক'রে তারা তা দিয়ে অলৌকিক সব কাজ হাসিল করতে পারত। আমাদের এখানকার চারদিকে ইতস্ততঃ ছড়ান আলোকস্তম্ভগুলি দেখে থাকবেন; এগুলি আর কিছু নয়, এগুলি সেই পুঞ্জীভূত সৌরশক্তি—যা সেই অতিবুদ্ধি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জাতি নিজেদের ব্যবহারের জন্য জমা করে রেখেছিল।

"তার পর, আজ থেকে ছাব্বিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এক মূর্ত্তিমান্ অভিশাপের উদয় হ'ল। যে ধূমকেতু দু' বছর আগে এসে সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে আমি তারই কথা বলছি। সীমারা মশাই অর্থাৎ আপনাদের ডক্টর রুদ্র জানেন, এই অদ্ভুত, অসাধারণ ধূমকেতু ছাব্বিশ হাজার বছর আগে আর একবার পৃথিবীর ওপর এসে পড়েছিল এবং সেবারেও পৃথিবীতে ঠিক এমনি ধারাই প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল। কিন্তু তখনকার মেরুবাসী বৈজ্ঞানিকেরা সে ধূমকেতু আসবার অনেক আগেই তার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার ভয়াবহ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় বার করেছিলেন। এবার সেই কথা বলি।

"সৌরশক্তির সাহায্যে তাঁরা অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড করতে পারতেন তা আগেই বলেছি।

সীমারা মশাইএর অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চারের কথা আপনারা শুনেছেন। আর একটা উদাহরণ দেই। অধ্যাপক চন্দ্রের হয়তো মনে আছে একবার আমার সঙ্গে তিনি দু'টি বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেওয়ার দৃশ্য দেখেছিলেন। এক অদ্ভুত আলোক-রশ্মি—যার নাম তিনি দিয়েছিলেন "মৃত্যু-কিরণ", তাই দিয়ে ঐ বিশ্বাসঘাতক দু'টিকে তাঁর চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপক চন্দ্র হয়তো বুঝতে পারেন নি, সেই হাওয়ায় মিলানো লোক দু'টিই গত কাল তাঁকে পরিবেশন করে খাইয়েছে। মেরুর বৈজ্ঞানিকেরা সৌরশক্তি থেকে এই 'মৃত্যুকিরণ' আবিষ্কার করলেন। 'মৃত্যু-কিরণ' নাম অবশ্য এর ঠিক খাটে না। এর সাহায্যে কোন জীব বা বস্তুকে শুধু শক্তি-কণায় পরিবর্ত্তিত করা হ'ত। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষই মূলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণা দিয়ে তৈরী তা আপনারা জানেন। মেরুর বৈজ্ঞানিকেরা তা জানতেন এবং শুধু জানা নয়, তাঁরা যে কোন জিনিষকে ইচ্ছামত শক্তি-কণায় পরিবর্ত্তিত করে ফেলতে পারতেন, আর মজা এই, মৃত্যু-রশ্মির তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী এ পরিবর্ত্তন শুধু এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই সম্ভব হ'ত। অর্থাৎ বেশীক্ষণের জন্য কাউকে শক্তি-কণায় রূপান্তরিত করতে হ'লে বেশী পরিমাণ রশ্মি ব্যবহার করতে হ'ত, অল্পক্ষণের জন্য হ'লে অল্প পরিমাণ রশ্মি লাগত। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ঐ রশ্মির শক্তি আপনি কমে যেত এবং ঐ শক্তি-কণায় রূপান্তরিত জীব বা পদার্থ আবার পূর্ব্ব রূপ ফিরে পেত। মেরুর বৈজ্ঞানিকেরা এই রশ্মির ব্যবহারে এতটা সুপটু হয়েছিলেন যে তাঁরা ইচ্ছা মত ঐ রশ্মি নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে কোন সময়ের জন্য যে কোন পদার্থকে নিশ্চিহ্ন ক'রে আবার তাকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারতেন, অর্থাৎ এক কথায়, 'কাল' বা 'সময়' বলে তাঁদের কাছে কিছু রইল না, সময়ের ওপরেও তাঁরা আধিপত্য বিস্তার করে ফেল্লেন।

"ধূমকেতুর আবির্ভাবের খবর পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা এই প্রণালীরই সাহায্য নেওয়া ঠিক করলেন। ঠিক করলেন এবার এমন ভাবে তাঁরা মৃত্যুরশ্মির সাহায্য নেবেন যাতে আমাদের সমস্ত লোকজন, আসবাবপত্র—যা কিছু, এক কথায় সমস্ত মেরু-সভ্যতা ছাব্বিশ হাজার বছরের জন্য শক্তি-কণায় রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। এর আগে এত বড় পরীক্ষা তাঁরা আর কখনও করেন নি। এর জন্য তোড়জোড় কম করতে হ'ল না। অধিকতর সৌরশক্তি সংগ্রহের জন্য নতুন নতুন বিরাট বিরাট আলোকস্তম্ভ তৈরী করা হ'ল। আর তৈরী করা হ'ল এই সব পিরামিড-দুর্গ, যার মধ্যে মেরুবাসীদের ঢুকিয়ে সহজভাবে তার উপর মৃত্যু-রশ্মি বর্ষণ করা যায়। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। ধূমকেতুর আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সমস্ত মেরু-সভ্যতাকে শক্তিকণা রূপে মহাশূন্যে মিলিয়ে দেওয়া হ'ল।

"ধূমকেতু এল। পৃথিবীর চেহারা গেল বদলে। শস্য-শ্যামলা মেরুভূমি হয়ে দাঁড়াল এক

সীমাহীন তুষার-সাম্রাজ্য। ছাব্বিশ হাজার বছর এই ভাবে কাটবার পর আবার সেই মূর্ত্তিমান্ মহাধূমকেতু এল ফিরে।

"তার পরের ব্যাপার তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন! আমাদের সেই ছাব্বিশ হাজার বছরের ঘুমের পর আবার আমরা জেগে উঠেছি—সেই ছাব্বিশ হাজার বছর আগেকার চেহারা নিয়ে। যে পৃথিবী আমরা হারিয়েছিলাম সেই পৃথিবীই আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। আপনারা যা হারিয়েছেন তা স্বপ্ন মাত্র—অনন্ত কালের কাছে তার কী-ই বা মূল্য!

"হ্যাঁ, এইবার কাজের কথা। আপনাদের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি। যে প্রলয়কাণ্ড আপনাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার পর এই প্রতিকূল অবস্থা—পদে পদে বাধা, অশান্তি, খাদ্যাভাব, এ থেকে রেহাই পাবার উপায় হচ্ছে আমাদের দেশের খানিকটা অংশ দখল করা। এবং সেজন্য যে আপনাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট উত্তেজিত হয়ে চরম পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করবেন দৃষ্টিকটু হ'লেও এটা খুবই স্বাভাবিক। অথচ যে পরিমাণ অঞ্চল আমাদের দখলে আছে তা আমাদের এবং আপনাদের উভয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। আমাদের দেশবাসীর ওপর কোন রকম অন্যায় করতে আমার ইচ্ছা ছিল না; তাই আপনাদের প্রথম বারের প্রস্তাবে আমি আমল দেই নি। কিন্তু এখন, আমার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে, আমরা মত পরিবর্ত্তন করেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ আমরা চাই না। সৃষ্টি এমনিতেই লোপ পাবার গতিক হয়েছে, নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া যুদ্ধ করে তা আরও দ্রুত লোপ করবার পক্ষপাতী আমরা নই। মানুষ পৃথিবীতে শান্তিতে টিকে থাকবে এই আমরা চাই। তাই, যদিও আপনাদের চাইতে শক্তি আমাদের এখন বেশী, তবুও, আমরা ঠিক করেছি, আগামী দশ বছরের জন্য এ মেরু রাজ্য আমরা আপনাদের ছেড়ে দেব। ছাব্বিশ হাজার বছরের সঙ্গে দশ বছর যোগ করা এমন কিছু কঠিন নয়, কাজেই যে ভাবে আমরা ছাব্বিশ হাজার বছর কাটিয়েছি সেই ভাবেই আরও দশ বছর আমরা কাটিয়ে দেব। ইতিমধ্যে আপনারা সুস্থ হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করবেন, যাতে দশ বছর পরে আমরা ফিরে এলে এ রাজ্য আবার আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেন।

"পরিশেষে আপনাদের বিমান-বাহিনীর উপর যে শাস্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তাঁরা অসময়ে এসে উপদ্রব না করলে এর দরকার হ'ত না। আপনাদের চরমপত্রে নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই আমরা বিদায় নিতে পারতাম। যাই হোক্, এ জন্য আপনাদের বিচলিত হবার কারণ নেই, কারণ তাঁদেরও মাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অদৃশ্য করা হয়েছে। একটু পরেই আবার তাঁদের দেখা পাবেন।

"এবার বিদায়। অধ্যাপক চন্দ্র ও সীমারা মশাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।"

চিঠি পড়া শেষ হইলে উভয়েই দূরে তাকাইলেন। দূরের সেই পিরামিড-দুর্গগুলির

কোনটাই আর দেখা যাইতেছে না, এমন কি একটি ছাড়া সমস্ত আলোকস্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। শেষ রশ্মিটুকু বিকীরণের জন্য একটি আলোকস্তম্ভের দরকার ছিল, সেটিকে আর সরান যায় নাই।

মাথার উপর এরোপ্লেনের শব্দে উভয়েরই চমক ভাঙ্গিল। বিষুবীয় গভর্ণমেণ্টের দুর্দ্ধর্ষ বিমান-বাহিনী শত্রুশিবিরের সন্ধান না পাইয়া ধীরে ধীরে মাটীর দিকে নামিয়া আসিতেছে।

ডক্টর রুদ্র ও অধ্যাপক চন্দ্র স্তব্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সমাপ্ত

উই ফা-এন্-নীল

(শ্রীজগৎ সেন)

পিতা নীলের পূজার ধূম পড়ে গেছে মিশরে। নীল নদী মিশর-বাসীর কাছে নদী মাত্র নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বড়;—মিশরের পিতা এবং পাতা, মিশরের প্রাচীন কৃষ্টির এবং সভ্যতা-গৌরবের মাতা এবং ধাত্রী। যাযাবর মানুষ যেদিন প্রথম পদার্পণ করেছিল এ দেশের মরুময় বুকে তখন তাকে চিরদিনের মত শান্তিময় গৃহকোণের আকর্ষণে বেঁধেছিল কে? এই নীল নদীই ত'। তা' না হ'লে স্বচ্ছন্দচারী বেদের দলকে সোণার শিকল পরাত কে?

বছরে দু'বার করে নীলের জলে বন্যা আসে। গ্রীষ্মের পরে যে বন্যা আসে সেটাই বড় বন্যা। তখন সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত আবিসিনিয়ার আগ্নেয় শিলা ধুয়ে বন্যার জল বিস্তর পলি-মাটি বয়ে আনে, আর দুই কূল ছাপিয়ে উঠে ঊষর বালুকার বুকে শ্যামল সুষমার বীজ বপন করে যায়। এই কূলপ্লাবী বন্যার পথ চেয়ে মিশরের ফেলাহিন্ (কৃষক সম্প্রদায়) সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। আজ সেই প্রার্থিত দিন এসেছে। বন্যার জলকে কৃষিক্ষেত্রে বরণ করে নিতেই এই উই ফা-এন্-নীলের অনুষ্ঠান।

মিশরে যদি বেড়াতে যাও ত দেখবে ছোট ছোট গ্রামগুলি লোকে ঠাসা।

স্থানাভাব হ'লেও মিশরবাসী গ্রামের পরিধি বাড়াতে চায় না। যতটা পারে জমি রেখে দেয় পিতা নীলের স্বচ্ছন্দ সঞ্চারের জন্য।

নদী-তীরে লোকারণ্য। সুসজ্জিত বজরা কূলে বাঁধা রয়েছে। ঐ বজরায় পিতা নীলের উৎসর্গীকৃত "কন্যা"কে জলবাসে বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। তাই দেখবার জন্য আসফ এবং ফতিমা জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ফতিমা আসফের বোন।

আসফ ভাবছিল প্রাচীন কালের কথা। তখন কি নিষ্ঠুর প্রথাই না ছিল দেশে। একটা রক্তমাংসে গড়া আস্ত মেয়েকেই ওরা জলে ফেলে দিতে দ্বিধা

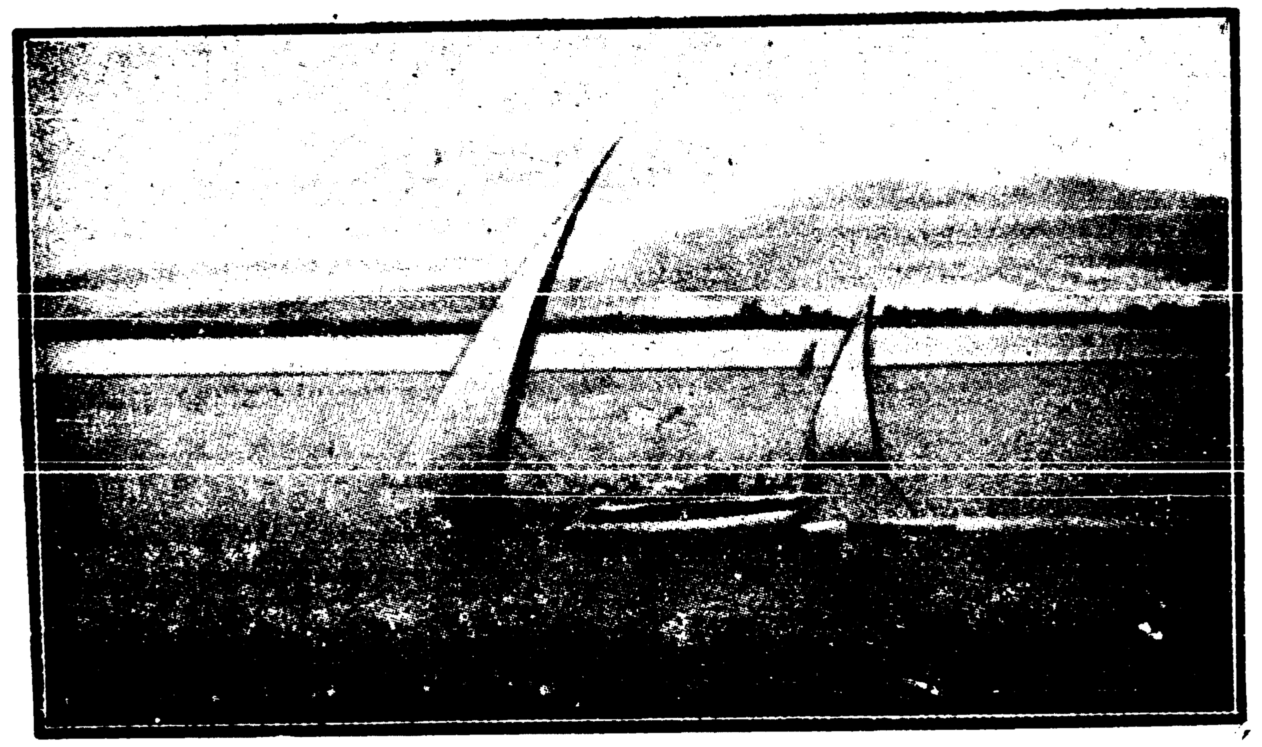

মিশরের পিতা এবং পাতা—নীল নদী

করত না। এখন অবশ্য পিতা নীলের ভাগ্যে যে কন্যা-টি জোটে সে মাটির পুতুল। পিতা নীলের চোখে মাটি এবং রক্ত-মাংসের কোন তারতম্য আছে এমন ত' কই মনে হয় না। তবে কেন যে লোকে এই নিষ্ঠুর প্রথা মেনে চলত কে জানে! আচ্ছা, এখনো যদি সে প্রথারই চলন থাকত? আসফ শিউরে ওঠে,—হয়ত একদিন ফতিমারই ডাক আসত ঐ "কন্যা"-পদে অভিষিক্ত হবার জন্যে। লোকে এই নিয়ে উল্লাস করত, আসফের বাবাকে ভাগ্যবান্ বলত, কিন্তু,—ইস্, বললেই হ'ল কিনা! আসফ কিছুতেই যেতে দিত না ওর আদরের বোনটিকে। এর

জন্যে যদি দেশের লোকের সঙ্গে লড়াই করে ওকে প্রাণ দিতে হ'ত,—তাতেও ও রাজি। আসফ ফতিমাকে যে কতখানি ভালোবাসে সে অন্য লোকে কি বুঝবে। ওরা ত জানে না যে ফতিমা আসফের একেবারে নিজস্ব বোন। আসফেরই দেওয়া নাম নিয়ে ও আজও বেঁচে আছে। ওর ভাই-বোনেদের আর কেউ ত' বাঁচে নি!

আসফের মনে আছে ফতিমার নামকরণের কথা। বাবা চেয়েছিলেন রাবেয়া নাম রাখতে, মার পছন্দ ছিল সোফিয়া, আর আসফ বলেছিল ফতিমা। ঐ তিনটে নাম দিয়ে তিনটে সমান আকারের মোমবাতি একই সঙ্গে জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। 'ফতিমা' নামের বাতিটাই জ্বলেছিল সব চেয়ে বেশীক্ষণ। কাজেই আসফের হ'ল জয়। তাই বোনের ওপর আসফের অধিকার বোধটাও কিছু বেশী।

"কন্যার" বিসর্জ্জন হবে সেই শেষ রাত্রে। ফতিমা আর জেগে থাকতে পারে না, ঘুমে ওর চোখ দুটো জড়িয়ে আসে। আসফ ওকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। প্রহরে প্রহরে তোপের আওয়াজ হয়, ফতিমা ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে জেগে ওঠে। এমনি করেই সমস্তটা রাত কাটল। শেষ রাত্রে যখন বিসর্জ্জন হ'ল তখন ফতিমা ঘুমে অচেতন। অনেক কষ্টে আসফ ওকে নিয়ে বাড়ী ফিরল।

আসফের মনটা আজ খুসীই আছে বলতে হ'বে। কাল থেকে কুত্তব (ইস্কুল) কিছুদিনের মত বন্ধ,—যত দিন নীলের বন্যা থাকবে ততদিন আসফের ছুটি। কিন্তু এত খুসীর মাঝেও একটা অ-খুসীর কারণ আছে।

কুত্তবে যেতেই "ফিকি" (মাষ্টার মশাই) প্রত্যেক ছেলের হাঁটুর নীচে একটা করে লাল ছাপ দিয়ে দিলেন। পিতা নীলের প্রতি ছেলেদের কৃতজ্ঞতার বা ভয়-ভক্তির মাত্রা যে সাধারণ লোকের চেয়ে অনেকখানি কম এটা "ফিকি"র জানা আছে। উনি জানেন যে ওঁর ছাত্রের দল পিতার শাসনকে তেমন ভয় করে না, আদরের ওপরই ওদের লোভ বেশী। পিতা নীলকে পূজা করবার বয়স এখনো ওদের আসে নি, ওরা চায় পিতা নীলের স্নেহময় স্পর্শটুকু সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে। ওরা নীলের জলে ঝাঁপ খেয়ে সাঁতার কাটতে চায়, জল ছুঁড়ে খেলা করতে চায়। কিন্তু এতে পিতা নীলের ওপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় বলেই

বড়রা মনে করেন। তা' ছাড়া বানের জলে সাঁতার কাটায় বিপদের সম্ভাবনাও আছে। কাজেই যে ক'দিন বন্যার জল থাকে সে ক'দিন ছেলেদের জলে নামতে মানা। ফিকি ছেলেদের পায়ে যে লাল রঙের ছাপটি এঁকে দেন তাই হ'ল এই নিষেধের বেড়ী। রঙ আবার এমন বিশ্রী যে ফিকির শাসন অমান্য করতে কোন ছেলেই সাহস করে না। ওতে এতটুকুও জল লাগাবার জো নেই, রঙ উঠে যাবে। কুত্তব যেদিন খুলবে সেদিন ঐ ছাপ "ফিকি"কে দেখাতে না পারলে কি যে হবে তা আসফের বেশ জানা আছে।

সেবার ইসমৎ খুব সর্দ্দারি করে জলে নেমেছিল। "কুত্তব" যেদিন খুলল সেদিন ছাপ দেখাতে না পারার জন্যে ওর যে শাস্তি হয়েছিল তা মনে করলে আসফের হাসিও পায়, ভয়ও করে। হাত দুটো মাথার ওপর তোলা,—হাতের ওপর প্রকাণ্ড এক থালা,—তাতে কি আছে বল দেখি ? না না, মিষ্টি নয়,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থান ইট। নীচের দিকে চলেছে বেত। হাত নামাবার জো নেই। এদিকে বেতের ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটো স্প্রিং-এর মত তিড়িং করে নেচে উঠতে চাইছে। কিন্তু ঐ একথালা ইটের ওজন ঠেলে ওঠা ত' যে সে স্প্রিং-এর কাজ নয়!

তোমরা হয়ত ভাবছ ইসমৎটা কি বোকা! আরে বললেই ত হ'ত যে ঘামে ধুয়ে রঙটা উঠে গেল। মিছেমিছি মার খেতে গেল কেন? তবে আর বলছি কি? পারো ত একবার মিশরে গিয়ে আসফের "ফিকি"-কে বলেই দেখো না হয়, তোমার কথা বিশ্বাস করেন কি না দেখা যাবে। যে দেশে সারা বৎসরে ৫ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না, সেখানে ঘাম হবে কোত্থেকে? ঘাম জিনিসটার নাম পর্য্যন্ত ইসমৎ আর আসফের ভাল করে জানা আছে কি না সন্দেহ।

যাক্, যা বলছিলাম বলি। "কুত্তবে"র ছুটি না হয় হ'ল। কিন্তু নীলের জল মানা। আবার উই ফা-এন্-নীলের উৎসবের জন্য ফতিমাকে কিছু উপহারও দেওয়া চাই। আসফের চাল-চলন তোমাদের চেয়ে একটু ভিন্ন রকমের। ওর বাবা একজন দরিদ্র ফেল্লাহ্ (কৃষক)। কাজেই বাবার কাছে পার্ব্বণী ও চায়ও না, পায়ও না। বরং ছুটির দিনে কিছু কিছু রোজগার করে এনে বাবাকে দেয়।

মা-বাপের সাহায্য করতে ও সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাই ছুটি পেলে ও ওর গাধা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

আসফের গাধা যে সে গাধা নয়। ও আসফের বাড়ীর একজন বল্‌লে হয়। বাড়ীর সর্ব্বত্র ওর অবাধ গতিবিধি। ওর আহার-বিহারের ব্যবস্থা ঠিক আমাদের গৃহপালিত পশুর মত নয়, বরং কতকটা বাড়ীর লোকেরই মত। কিন্তু গাধার বন্ধু বলে আসফকেও যদি তোমরা "গাধা" ভাবো তবে ভারী ভুল করবে।

মিশরের প্রাচীন কীর্ত্তি সভ্য-জগতের একটা বিস্ময়। তাই ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক লোকই মিশরে বেড়াতে আসে। কেউ বা আসে গবেষণা করতে আবার কেউ আসে সৌখীন দেশ-ভ্রমণে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই বড়লোক। ছুটিটা আসফ এই সব ভ্রমণকারীদের নিয়েই কাটিয়ে দেয়। সুবিধামত একজনকে যোগাড় করে গাধাটি ভাড়া দেয়। পর্য্যটক মহাশয় গাধায় চেপে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়ান, আর আসফ ওঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়।

বিদেশী লোকের সঙ্গে ভাব করে নিতে আসফ খুব পটু। সওয়ারীকে খুসি করবার জন্য ও ইচ্ছামত গাধার নামকরণ করে। সওয়ারী ফরাসী হ'লে গাধার নাম হয় নেপোলিয়ন, আমেরিকান হ'লে হয় শাম চাচা (Uncle Sam) আর ইংরেজ হ'লে হয় জন বুল, ইত্যাদি। পর্য্যটকদের মতিগতি সম্বন্ধে আসফের বেশ অভিজ্ঞতা আছে। পর্য্যটক মহাশয়ের যদি প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে জ্ঞান ভালোই থাকে তবে আসফ সেটা আঁচ করে নিয়ে সাবধানে কথাবার্ত্তা চালায়। আর তিনি যদি "গঙ্গারাম"-শ্রেণীর হন তবে ও নিরঙ্কুশ ভাবে "হাইকোর্ট" দেখাতে সুরু করে। বলে,—

'আপনি বুঝি ফ্যারাও আখ্‌ন্-আটনের নাম শোনেন নি? কিন্তু তুত্-আন্‌খ্-আমনের নাম তো জানেন? আখ্‌ন্-আটন্ ছিলেন তাঁরই শ্বশুর। অষ্টাদশ রাজবংশের সব চেয়ে বড় রাজা ছিলেন উনি। সম্রাট্ আখ্‌ন্-আটনের পিতার নাম তৃতীয় আমেন্-হোটেপ্। তিনি ছিলেন আমন্-দেবতার উপাসক,—মূর্ত্তি-পূজক। খুব পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ওঁর কীর্ত্তিকাহিনী কৃষ্ণ-সাগর থেকে ইউফ্রেটিস্ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট্ আখ্‌ন্-আটন যখন মাত্র এগার বছর বয়সে ফ্যারাও

হ'ন তখন তিনিও চতুর্থ আমেন-হোটেপ্ নাম নিয়েছিলেন। আমেন্-হোটেপ্ মানে হ'ল আমনের প্রসাদ। তখন দেশের বেশির ভাগ লোকই মূর্ত্তি-পূজক ছিল, স্বয়ং রাজাও ছিলেন আমন্-দেবতার ভক্ত।

'সম্রাট্ আখ্‌ন্-আটনই রাজবংশে প্রথম দেব-দেবীর পূজার বদলে একেশ্বর সূর্য্যের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর মা ছিলেন একেশ্বর সূর্য্য,—আটন-রা-র ভক্ত। সতেরো বৎসর বয়সে ফ্যারাও চতুর্থ আমেন-হোটেপ্ নিজের নাম বদলে আখ্‌ন্-আটন (রবি-গৌরব) নাম নিলেন। থিব্‌স্ ছিল মূর্ত্তি-পূজক ফ্যারাওদের রাজধানী। আখ্‌ন্-আটন এল্-আমার্ণায় নতুন রাজধানী করে আটনের উদ্দেশে প্রকাণ্ড পিরামিড তৈরী করালেন। এমনি করেই আপনাদের আধুনিক একেশ্বর-বাদের সূত্রপাত হয়েছিল। মূর্ত্তি-পূজা উঠে গেল না কারণ তখনও মানুষ ধর্ম্মের পথে এতটা অগ্রসর হয় নি, তবু বহু দেবতার পরিবর্ত্তে একমাত্র আটনের পূজা প্রচলিত হ'ল।'

শুনতে শুনতে পর্য্যটক-মহাশয়ের চোখ ছানাবড়ার মত হতে থাকে। আসফ টিয়াপাখীর মত বলে চলে,—'কিন্তু সম্রাট্ আখ্‌ন্-আটনের সংস্কারের চেষ্টা স্থায়ী হ'ল না। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান,—সে প্রায় খ্রীষ্টের সাড়ে তেরশ' বছর আগে,—তার পর ফ্যারাও হলেন তাঁর জামাতা তত্-আন্‌খ্-আমন। প্রথমে শ্বশুরের ভয়ে তিনিও নিজের নাম রেখেছিলেন তুত্-আন্‌খ্-আটন্। কিন্তু রাজা হয়ে তিনি আবার আমন-রা-র পূজা প্রচলিত করলেন। সূর্য্যদেব পরমেশ্বরের আসন থেকে আবার নেমে এলেন সাধারণ দেবতার আসনে। একেশ্বরবাদের পতন হ'ল।'

তার পর আসফ গলা নামিয়ে বলে, 'দেখুন, এই যে আমার গলায় পাথরের মালা দেখছেন, এ হচ্ছে ফ্যারাও আখ্‌ন্-আটনেরই গলার মালা,—আটন-রা-র প্রসাদী মালা। আমারই এক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আখ্‌ন্-আটনের সেনাপতি। যুদ্ধজয় করে তিনি এটা সম্রাটের কাছে উপহার পেয়েছিলেন। এর এক আশ্চর্য্য গুণ আছে। এই মন্ত্রপূত মালা যার কাছে থাকে তাদের পরিবারে কোন বিপদ্ হয় না।

কয়েকটা মামুলী বুলি আসফের বেশ জানা আছে। সেই সব শুনিয়ে ও পর্য্যটক মহাশয়কে প্রথমে বিস্মিত এবং তার পর প্রলুব্ধ করে তোলে। তিনি বলেন, 'আচ্ছা. কত পেলে ওটা তুমি বিক্রী করতে পারো ?'

আসফ মুখখানা গম্ভীর করে বলে, 'দেখুন, এ আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি। আমরা মুসলমান হয়েছি বটে, তবুও এ মালার গুণে বিশ্বাস করি।'

তার পর নানা রকমের দরদস্তুর হয়। শেষে বেশ একটা দাঁও মেরে আসফ মালার একটি মাত্র পাথর দিতে স্বীকার করে। তার পর খুসি-মনে বাড়ী ফেরে। যে টাকা পাওয়া গেছে তাতে ফতিমার জন্যে একটা ভাল উপহার কিনেও বাবাকে দেবার যথেষ্ট থাকবে।

আসফ ওর "নেপোলিয়নে"র পিঠে চেপে দিগ্বিজয়ী বীরের মত বাড়ী ফেরে। ফতিমা দূর থেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায় দাদাকে আনতে। ওর কোলে "মাউ"—ওর পোষা বেড়াল,—এত বেশি আদুরে যে ফতিমা ওর বেড়ালকে হাঁটতে দিতেও নারাজ।

আসফ বলে, 'বল্ ত' বোনটি, কি এনেছি তোর জন্যে ?' ফতিমা আন্দাজ করে এটা-ওটার নাম করে, কিন্তু একটা কথাও ওর ঠিক হয় না। শেষকালে আসফ বার করে দেখায়,—একটা চমৎকার রঙিন সিল্কের রুমাল। ফতিমা খুব খুসি হয় উপহার পেয়ে, তখুনি সেটা মাথায় বেঁধে নেয়। তার পর বলে, 'আমার "মাউ"র জন্যে কি আনলে দাদা ?'

—'তাই ত'রে. ওর কথা আমার মনেই ছিল না যে !'

—'আমি কিন্তু ওর জন্যে. একটা মজার জিনিস তৈরী করেছি। কি বল দেখি ?'

—'বলতে পারলাম না। তুই বল্ দেখি কি ?'

—'এস দেখবে', বলে ফতিমা এগিয়ে যায়। আসফ যায় ওর সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের ভেতর গিয়ে ফতিমা দরজা বন্ধ করে দেয়, বলে, 'দাঁড়িয়ে থাকো বাইরে। এখন এসো না। আমি দেখাচ্ছি।'

ফতিমা "মাউ"কে পোষাক পরিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

আসফ অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখে। পোষাকের কাপড়টা যেন চেনা-চেনা। ফতিমা বলে, 'কি দিয়ে করেছি জানো ? তোমার সেই ডোরাদার পা-জামা কেটে।'

আসফের মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। ওর খুব সখের জিনিস। ফতিমার সে দিকে লক্ষ্যই নেই। মনের খুসিতে ও বলেই চলেছে,—'মাকে বলে দিও না কিন্তু। আমি ওটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছি।'

আসফ হেসে ওঠে হো-হো করে। তার পর আদর করে ফতিমার পিঠ চাপড়ে দেয়। এ ধরণের অপরাধ ওর কাছে অপরাধই নয়।

দু'জনে হাসি মুখে মার কাছে যায়।

ছিরিপদর বিপদ্

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

ছিরিপদ—সেই যে গো
মোটা ছেলে তাজ্জানো,
পড়েছে কি বিপদে সে
খবর কি তা জানো ?

ছিরিপদ ভালবাসে ঘুমাতেই—তাইতে
ঘুম দেয় খেতে, শুতে, বসতে ও নাইতে।
ঘোরে ফেরে সদা তার ঢুলুঢুলু চক্ষু,
ঘুমের আমীর যেন বাচ্চাই ছক্কু।
ঘুমাবার জন্যেই এল যেন মর্ত্ত্যে,
ঘুমিয়েই এ জীবন সার্থক করতে।

একরাতে দিন তার শেষে এল ঘনিয়ে,
ঘুম যায় ছিরিপদ মৈনাক ধ্বনিয়ে।
ঘুম ভাঙ্গে আপনারই নাকাড়ার বাদ্যে,
ভাঙ্গা-ঘুম জোড়া আর কুলালো না সাধ্যে।
পারলো না ঘুমের সে আর কাছে ঘেঁষ্‌তে,
নাকের ডাকেতে তার ঘুম গেল ভেস্তে।

আজীবন ঘুমাবার যত করে চেষ্টা,
নাক ডাকে—নাক-ই তার কাল হ'ল শেষটা।

বিচিত্র ভারত

সোনার বাংলা

বাংলার কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

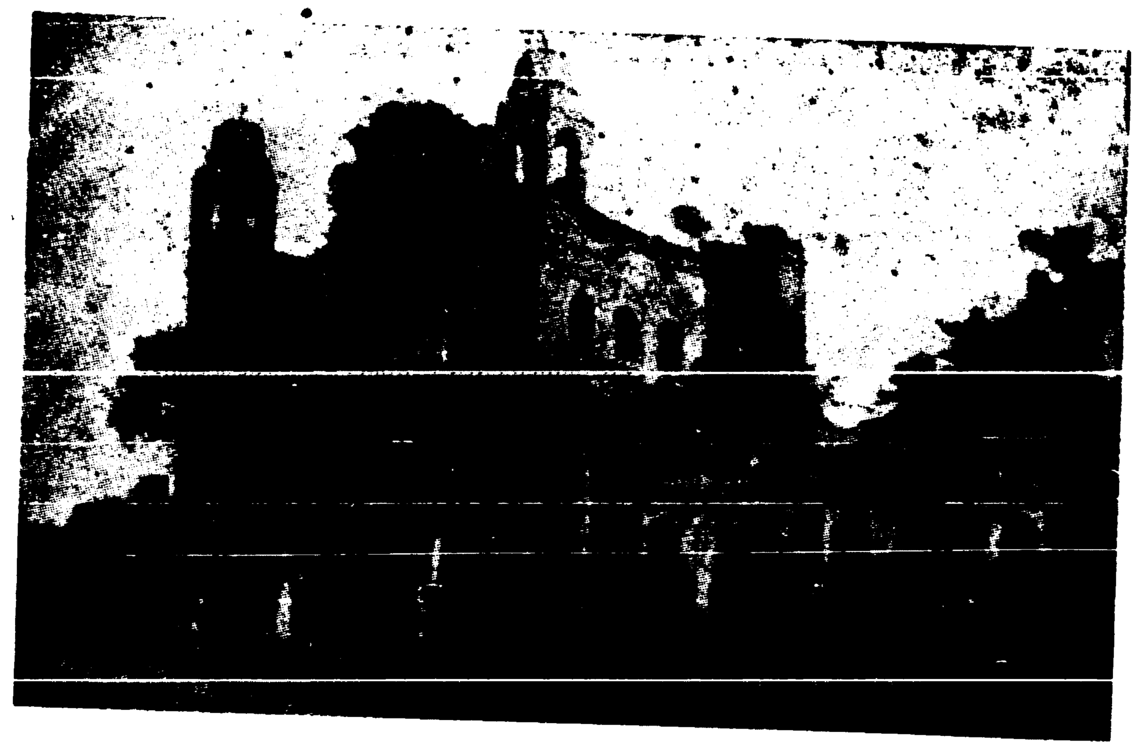

লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

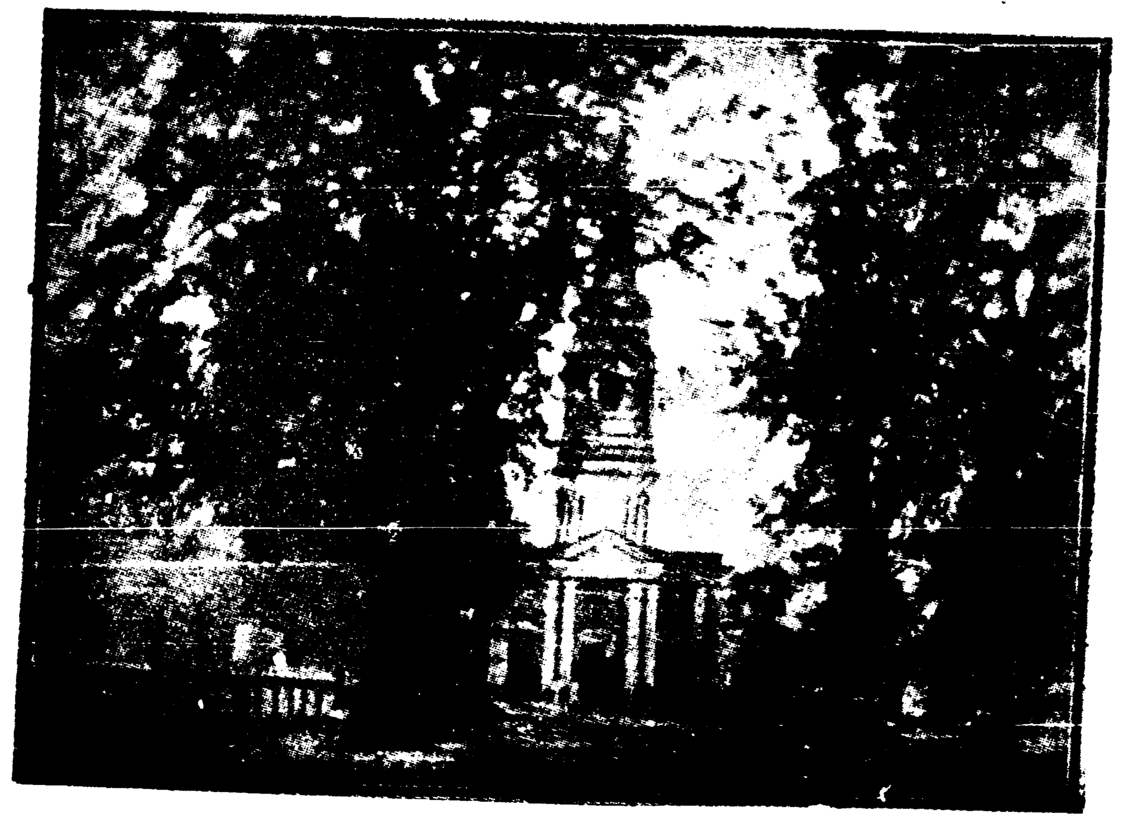

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গীর্জ্জা

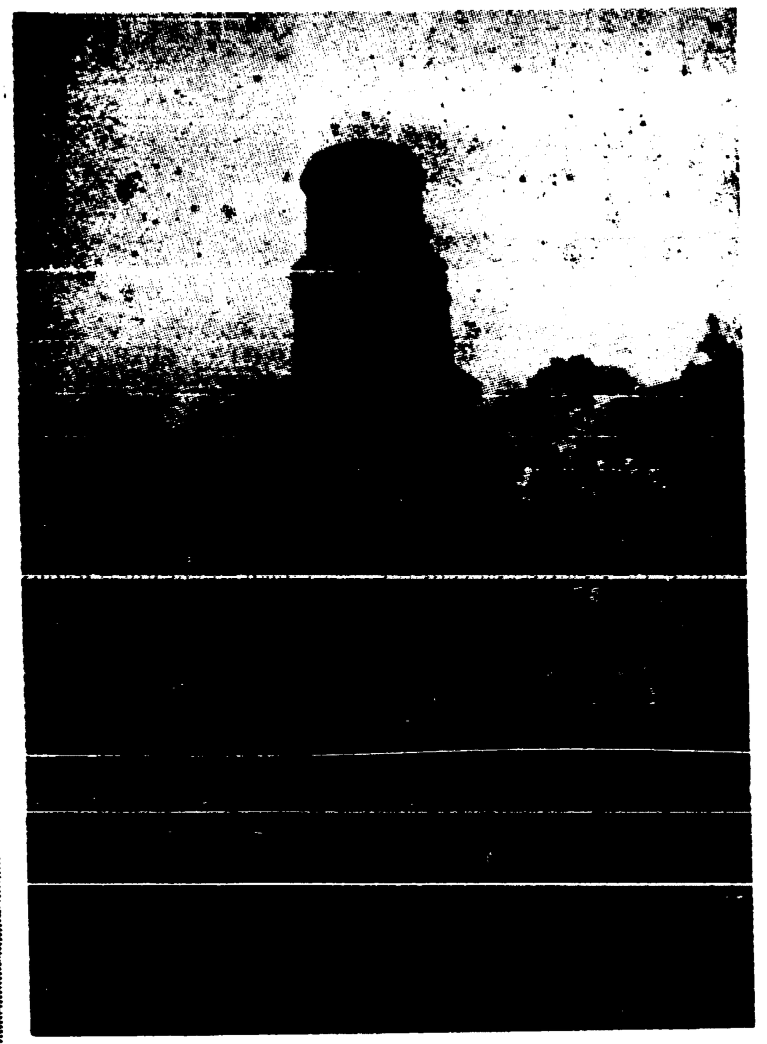

ফিরোজ মিনার
(গৌড়, মালদহ)

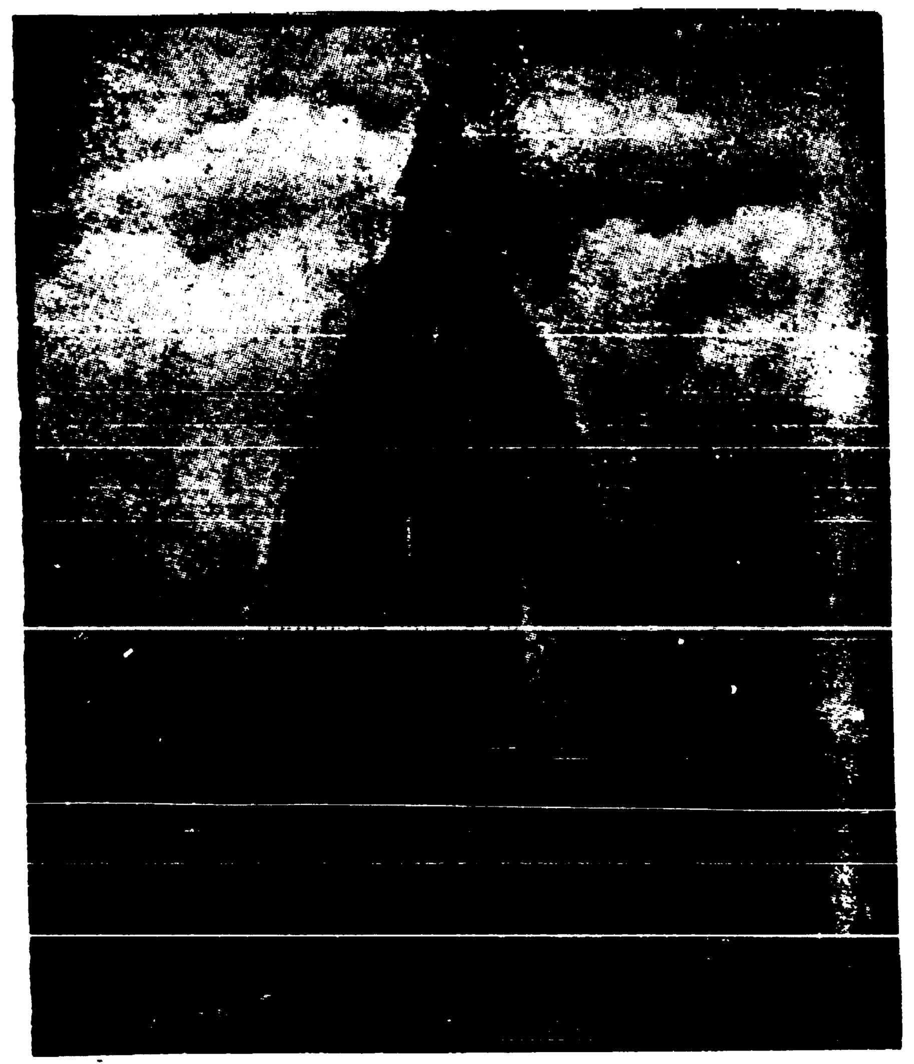

রাজাবাড়ীর মঠ
(কয়েক বছর আগে পদ্মাগর্ভে লুপ্ত)

মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ী

এক রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস লিখ্‌লে হয়। আমার জীবনে এই ধরণের একটা 'য়্যাম্‌বিশন্‌' অনেক দিন ধরেই ছিল। কিন্তু কি ক'রে যে ওই সব লেখে, গল্পচ্ছলেই যদিও, যাতে ক'রে অদ্ভুত আর বিচ্ছিরি যত কাণ্ড—যার মাথা নেই মুণ্ডু নেই—একটার পর একটা ঘটে যায়—পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ঘট্‌তে থাকে—কৌতূহল আর অনিদ্রা সমান তালে জাগিয়ে ধারাবাহিক ভাবে, কিছুতেই আমি ভেবে উঠ্‌তে পারি নে। সত্যি, ভাব্‌তে গেলে, আশ্চর্য্য নয় কি? প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এসেই নাস্তানাবুদ হয়ে পড়; এর পরে, এরও পরে আরো কী দুর্ঘটনা ঘট্‌বে, ঘট্‌তে পারে, ধারণা করতেই তোমার মাথা ঘুর্‌বে—এবং পরের পরিচ্ছেদের গোড়াতেই যখন ব্যাপারটা আরো একটু খোলসা হবে, তখন আবার আপন মনেই বল্‌বে হয়ত: "দূর্‌ দূর্‌! এই! এর জন্যেই এত!" বল্‌তে কি, সমস্ত বইটা শেষ করতে পারলে, অবশেষে, বইটাকে দূরীভূত কর্‌তেই ইচ্ছা জাগে—এবং, বলা বাহুল্য, দেরিও বিশেষ হয় না। কেউ না কেউ এসে,—ছেলে-পিলেরাই সচরাচর—বইটাকে বাগিয়ে নিয়ে চলে যায়, এবং সে-বই, সেই বিদূরিত য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই, আর কখনো ফেরৎ আসে না – নিজের য়্যাড্‌ভেঞ্চারের পথেই বেরিয়ে পড়ে বোধ হয়।

কিন্তু সে যাই হোক্‌, য়্যাড্‌ভেঞ্চারের একটা বই লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরূহ আকাঙ্ক্ষা, আমারও ছিল। কিন্তু কি ক'রে যে মাথা খাটিয়ে ওই রকমের একটা গল্প ফাঁদা যায় কিছুতেই ঠাওর করে উঠ্‌তে পারছিলাম না।

সেই আমারই জীবনে যে এমন এক রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার ঘট্‌বে কে জান্‌ত! একেবারে সত্যিকারের য়্যাড্‌ভেঞ্চার, গল্পের বইয়ে ঠিক যেমন-যেমনটি ঘটে, মাথামুণ্ডুহীন নিখুঁৎ রকমের হু-বহু! কেন যে হ'ল, কি জন্যে যে হ'ল, এমন কি কী যে-হ'ল তার কিছুই আমি খুঁটিয়ে বল্‌তে পারব না। কোথায় যে হ'ল তাও আমার কাছে ধোঁয়াটে।

সেই য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কেবল একটি পরিচ্ছেদই আমি জানি, সেইটাই আমি এখানে বিবৃত করব। তার আগে কী ঘটেছে, এবং পরেই বা কী ঘটিতব্য—জানা নেই আমার। জানার বাসনাও নেই। 'এই একটি মাত্র পরিচ্ছেদই আমার জীবনে ঘটেছিল, অথবা, সেই ক্রমশঃ প্রকাশ্য য়্যাড্‌ভেঞ্চারের এই পরিচ্ছেদটি যখন ঘট্‌ছিল, সেই অশুভমুহূর্ত্তে, আমার জীবন

নিয়ে আমি হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম—এবং, সুখের কথা যে জীবন নিয়েই ফিরতে পেরেছি।

বেশীদিন আগের কথা নয়, বিশেষ এক জরুরি কাজে ডায়মণ্ড হার্‌বার্‌এ যেতে হয়েছিল। ইচ্ছে করেই লাস্‌ট্‌ বাস্‌-এ চেপেছিলাম, যতই ঢিমে তেতালায় চলুক, রাত দুটো তিনটে নাগাদ্‌ গিয়ে পৌঁছতে পারব। মনে মনে একটু য়্যাড্‌ভেঞ্চারের দুরভিসন্ধিও যে না ছিল তা নয়! কল্‌কাতার বাইরে তো কখনো পা বাড়াই নে। রাত দুপুরের পর ডায়মণ্ড হার্‌বারের মত এক অচেনা জায়গায় পৌঁছে, বন্ধুর বাড়ী খুঁজে বের ক'রে, চৌকিদার-পুলিস ইত্যাদির সন্দেহ এড়িয়ে, কড়া নাড়ানাড়ি ক'রে কিংবা দরজা ভেঙেই, বন্ধুকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলা—একটুখানি য়্যাড্‌ভেঞ্চারই বই কি!

বাস্‌-এ আমি একাই যাত্রী।

হুস্‌ হুস্‌ ক'রে বাস চলেছে। কলকাতা পেরিয়ে অনেক দূর এসেছি বেশ বোঝা যায়। অন্ধকার রাতের ভেতর দিয়ে উত্তাল হাওয়ায় পাড়াগেঁয়ে মেঠো গন্ধ ভেসে আসছে; দু'ধারে কোথাও আমবাগান, কোথাও বা বাঁশঝাড়, কোথাও চষা ক্ষেত, কোথাও বা খোড়ো-ঘরের বস্‌তি—আব ছায়ার মতো চোখে এসে লাগে। এরই মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে ভীষণ এক ঝাঁকুনি দিয়ে বাস্‌টা থেমে গেল হঠাৎ।

কল বিগ্‌ড়েছে, গাড়ী আর চল্‌বে না, জানা গেল। আজকের মতো এইখানেই নিশ্চিন্দি।

নিশ্চিন্দি? বল্‌তে কি, বেশ একটু ভয়ই কর্‌তে লাগ্‌ল আমার। অজানা জায়গায়, নির্জ্জন নিশুতিতে কেবল মাত্র ড্রাইভার আর ঐ কণ্ডাক্‌টার্‌—ওদের কণ্ডাক্ট্‌ অকস্মাৎ কী দাঁড়াবে কে বল্‌বে? ওধারে ষণ্ডা-গুণ্ডা ওই দু'জন, আর এধারে নামমাত্র আমি—আমার রীতিমত হৃদ্‌কম্প সুরু হ'ল।

অবশ্যি, নিজেকে আশ্বাস দিতেও কসুর কর্‌লাম না। তেমন ভয়ের কিছু না, সত্যিই হয়তো কল বিগ্‌ড়েছে। বেগ্‌ড়াতেও তো পারে। বেগ্‌ড়ায় না কি? পথে-ঘাটে আকৃচার্‌ই তো মোটরের কল বেগ্‌ড়ায়—না ব'লে কয়েই বিগ্‌ড়ে যায়। কেবল স্থান কাল পাত্র তেমন সুবিধের নয়, আমার মনের মত নয় বলেই কি আর মোটরের কল বেগ্‌ড়াবে না? বেশ তো আমার আব্দার!

তা ছাড়া, এমনও তো হতে পারে যে ড্রাইভারের বেজায় ঘুম পাচ্ছে, গাড়ী টান্‌তে আর রাজি নয়—এবং ঘুম পায় না কি মানুষের? মোটর চালাতে পেলেও ঘুম পেতে পারে।

কিংবা, সব চেয়ে যেটা বেশী সম্ভব, একজন মাত্র আরোহীকে এতটা পেট্রল্‌ খরচ ক'রে

ডায়মণ্ড্‌ হার্‌বার পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলে মজুরি পোষাবে না, তাই ভেবেই মোটরের কল বিগ্‌ড়েছে হয়তো—

"গাড়ী ফের চল্‌বে কখন?" জিজ্ঞেস করতেই, আমার শেষের আশঙ্কাটাই যে সত্য, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম।

জবাব এল: "সেই কাল সাতটা আটটায়। সকাল না হ'লে কোন্‌খানকার কল বিগ্‌ড়েছে জান্‌ব কি ক'রে?"

"এই রাত্রে—এত রাত্রে তা হ'লে তো ভারী মুস্কিল!"

"কাছেই একটা বেসরকারী বাংলো আছে। সেইখানে গিয়ে শুয়ে থাকুন—গেলেই শুতে দেবে। আর রাতও তেমন অন্ধকার নয়। চাঁদও উঠে গেছে এতক্ষণে।" কণ্ডাক্টারটা জানাল।

চাঁদ উঠেছে বটে। সরু এক ফালি চাঁদ। অন্ধকারও অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে দেখলাম।

"কোন্‌ ধারে বাংলোটা? যাব কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে?"

"রাস্তা থেকে নেমে, চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলে যান। আল্‌ ধরে ধরে যান চলে। একটু গিয়ে, সাম্‌নের ঐ বাগানটার আড়ালেই বাংলোটা। বাবুর্চ্চিকে ডাক্‌বেন। লোকটা ভালো—বক্‌শিস্‌ পেলে এত রাত্রেও উঠে রেঁধে দেবে। বাংলোর মালিকও খুব ভদ্রলোক—তাঁর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।"

কেবল শোবার জায়গাই নয়, খাবারও ব্যবস্থা রয়েছে। বাসের কল বিগ্‌ড়ে ভালোই হয়েছে বল্‌তে হবে।

একেই বলে বরাত! না চাইতেই বর পাওয়া!

যাক্‌, বাস্‌ থেকে নেমে রওনা তো দিলাম। চষা জমির ওপর দিয়ে, খানাখন্দে না পড়ে, হাত পা না ভেঙ্গে, আল এবং টাল সাম্‌লে, কোন গতিকে, কেবলমাত্র আকাশের চাঁদের সাহায্যে সেই বাগান-ঘেঁষা বাংলোয় তো গিয়ে পৌঁছলাম।

ভেবে কাহিল হচ্ছিলাম, অনেক ডাকাডাকি কর্‌তে হবে, বন্ধুর জন্যে যে-প্ল্যান্‌ আঁটা ছিল, বাবুর্চ্চির ওপরেই প্রয়োগ কর্‌তে হবে হয়তো, কিন্তু না, কাছাকাছি হতেই বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বল্‌ছে এবং দরজাটাও খোলা দিব্যি চোখে পড়্‌ল!

আস্তে আস্তে দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—গলা খাঁকারি দেব কিনা ভাবছি—এমন সময়ে—ও মা!—

ভয়ানক এক দৃশ্য আমার চোখের সাম্‌নে উদ্ঘাটিত হ'ল!

ঘরের মাঝখানে, খাটে ব'সে, সেই বাংলোর মালিকই হয়তো—হৃষ্টপুষ্ট একজন মানুষ, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—পাক্কা তিন মণের কম নয়। শুধু একটি চুল বাদে সারা মাথায় তার টাক—সেই চুলটিই কেবল খাড়া হয়ে আছে। তার ডান চোখের ওপরে কালো একটা ছোপ্ এবং ডান হাতের পিঠে উল্‌কি দিয়ে হরতনের টেক্কা আঁকা।

এবং তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর একটা মুশ্‌কো লোক, তার হাতে রিভল্‌ভার্। দোর-গোড়াতেই দাঁড়িয়ে।

আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজার আড়ালেই। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম বলাই ঠিক। মাটিতে হঠাৎ এঁটে গেলাম যেন।

সেই তিনমণী লোকটা বল্‌ছিল: "দেখো, আমাকে মারাটা তোমার ভালো হচ্ছে কি? আমায় মেরো না। এখনো আমার বয়েস আছে, দাঁতও রয়েছে; খুব বুড়ো হয়ে পড়ি নি এখনো, এখনো আমায় বাতে ধরে নি। চোখে ছানি না পড়তেই মারা পড়ব, সেটা কি ভালো? বল, তুমি তামাসা কর্‌ছ, ঠাট্টা কর্‌ছ, বল? সত্যি সত্যি মার্‌ছ না আমায়? য়্যাঁ?"

পিস্তল হাতে লোকটি খক্ খক্ ক'রে একটু হাস্‌ল—হাস্‌ল কি কাস্‌ল বলা শক্ত—"হ্যাঁ, মার্‌ব না! তাই বই কি! এত কাণ্ড ক'রে এত কষ্ট ক'রে শেষটায় তোমাকে না মেরেই চলে যাই আর কি! 'অমাবস্যার আর্ত্তনাদ' বইটা তুমি পড় নি তাই এই কথা বল্‌ছ! 'ধরো আর মারো'—সেই বইটাও তোমার না পড়াই রয়ে গেছে মনে হচ্ছে! কিন্তু কি করব, এ-জীবনে তুমি আর পড়বার ফুর্‌সৎ পাবে না—আমি নাচার।—নাও, প্রস্তুত হও।"

এই ব'লে তিনমণী লোকটাকে প্রস্তুত হবার, কিংবা দ্বিতীয় কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই—

"গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুম্!"

সেই মুশ্‌কো লোকটার হাতের পিস্তলটা বাক্যব্যয় করতে স্থরু কর্‌ল।

তিনমণী লোকটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এবং আমিও ধুপ্ ক'রে বসে পড়লাম, সেইখানেই।

পিস্তলহস্ত লোকটার নজর আমার দিকে পড়ল এবার।

"কে হে? তুমি আবার কে এসে জুটলে এখানে? গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নও তো!"

"আজ্ঞে না।" ভয়ে ভয়ে বলি সবিনয়েই: "এম্‌নি এসে পড়েছি। একেবারেই দৈবাৎ! এম্‌নি এসে পড়ে না কি মানুষ? গল্পের বইয়েও তো এসে পড়ে—আপনার ঐ বই দু'টোতেও কত বার এসেছে দেখ্‌তে পাবেন। তবে যদি বলেন, অনুমতি করেন যদি তা হ'লে এখান থেকে চলে যেতেও আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক নই—" বল্‌তে বল্‌তে আমি উঠে পড়ি।

"উঁহুঃ, সেটি হচ্ছে না। যখন এসেই পড়েছ তখন—"

তার অঙ্গুলি হেলনে—পিস্তল-হেলনে বল্‌লেই যথার্থ হবে—আবার বসে পড়তে হয়।

"তা হ'লে যদি আপনার অভিরুচি হয়, নেহাৎ অনিচ্ছা না থাকে,—" আবার আর্জ্জি স্থরু হয় আমার: "আপনি আমাকে মার্‌তেও পারেন। ঐ পিস্তল দিয়েই মার্‌তে পারেন। আমার তেমন খুব আপত্তি নেই। যদিও আমার দাঁত পড়ে নি তবে বাত ধরেছে কিনা বল্‌তে পারব না। তবু যে কারণেই হোক্, বাঁচতে আমার আর লালসা নেই। বেঁচে কি হবে? বেঁচে লাভ? আপনার উল্লিখিত ঐ বই দুটো আমি পড়েছি। এই সেদিনই তো পড়লাম। তাই পড়বার পর থেকেই আমার বাঁচ্‌বার স্পৃহা লোপ পেয়েছে। সেই বই থেকে জানা যায়, এ রকম স্থান-কালে মারাই উচিত, এবং মরাটাই বাঞ্ছনীয়,—এ রকম স্থযোগ ফস্‌কাতে দেয়া ঠিক নয়। আপনারও না, আমারও না। এ রকম অবস্থায় মর্‌লে, মর্‌তে পার্‌লে, কেউ না কেউ আমাদের এই য়্যাড্‌ভেঞ্চার লিখে ফেল্‌বেই, আর, মরে অমর হতে কে না চায়? এবং মেরে হতে পার্‌লে তো কথাই নেই!"

"উঁহু, মরা অত সহজ নয় হে, ফাজিল ছোক্‌রা! অমর হওয়া অত সস্তা না। ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? যেখানে আছ সেইখানে চুপটি ক'রে বসে থাক। আমাকে আগে ভাব্‌তে দাও। এক রাত্রে একটা খুনই যথেষ্ট কিনা, ভেবে দেখি। যদি মনে হয় আরো একটা হ'লে মন্দ হয় না তখন না হয় তোমাকে দেখা যাবে। 'হত্যা-হাহাকার' বইটা তুমি পড়েছ নাকি? ওটাতে এক রাত্রে ক'টা খুন ছিল? ও-বইটা আমি অনেক খুঁজেছি, পাই নি বাজারে, কার লেখা তাও জানি নে। কার লেখা?"

"আজ্ঞে, আমি লিখি নি। য়্যাড্‌ভেঞ্চার আমার বড় আসে না।"

"ফের বাজে কথা? অমন কর্‌লে, কথার ওপর কথা বল্‌লে—ও রকম বাজে বক্‌লে, খুন না করেই,—হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি, খুন না করেই গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব তোমায়,—সোজা তাড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন। অমর হওয়ার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ কর্‌ব,—হুঁ।"

ভয় পেয়ে আমি চুপ্ মেরে গেলাম।

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্।

মুশ্‌কো লোকটা আপন মনেই বল্‌তে থাকে হঠাৎ: "আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে কেমন হয়? এর মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে সেই কাটা মুণ্ডুটা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে গিয়ে প্রেজেণ্ট্ কর্‌লে কেমন হয়? ষ্ট্রেট্ একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে? কোনও য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বইয়ে এ রকমটা ঘটেছে কি? ওহে—ও! পড়েছ নাকি হে কোনও বইয়ে?"

আমাকে উদ্দেশ করেই হাঁক পড়ে, বেশ বুঝ্‌তে পারি। অগত্যা বল্‌তে হয়: "ঘটা আর বিচিত্র কি! এ রকম ঘটেই থাকে। না পড়লেও, ব'লে দিতে পারি।"

"আঃ, বড্ড তুমি বাজে বকো। বল্‌ছি না যে আমায় বকিয়ো না। ভাব্‌তে দাও আমায়।"

এর পর সেই হত্যাকারী ভদ্রলোক একেবারেই ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হ'লেন।

ভেসে উঠ্‌লেন সেই ভোর বেলার দিকে। বাবুর্চ্চি এসে পড়তেই ভেসে উঠতে হ'ল। বাবুর্চ্চির হাতে ব্রেকফাস্‌টের ট্রে, তাতে রুটি, মাখন, চা, ডিম—হৃষ্টপুষ্ট লোকটির জন্যই আনা হয়েছিল বেশ বোঝা যায়। দরজার বাইরে ঐভাবে-বসানো আমাকে এবং দরজার ভিতরে সেই মুশ্‌কো লোকটিকে দেখেই বাবুর্চ্চির মুশ্‌কিল্‌ ঠেকেছিল, তারও পরে, অস্ত্রশস্ত্র, খুন্‌খারাপি ইত্যাদির আম্‌দানি দেখে চায়ের ট্রে ফেলে দিয়ে পিঠটান্‌ দেয়াই সমীচীন হবে কিনা চিন্তা কর্‌ছে বেচারা, এমন সময়ে সেই হত্যাকারী হঠাৎ হাহাকার ক'রে ওঠে: "হয়েছে হয়েছে, ইউরেকা! নিয়ে এস।"

পিস্তলচালিত হয়ে বাবুর্চ্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব্রেকফাস্‌টের ট্রে মুশ্‌কো লোকটির সম্মুখে ধরে দেয়, এবং নিজে এগিয়ে, ধরাশায়ী সেই তিনমণীর পাশে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

"এই কথাই ভাবছিলাম। এই টোস্‌ট্‌-রুটির কথাই! খুন তো কর্‌লাম, কিন্তু তার পরে কি করা যায়, এতক্ষণ ধরে সেই কথাই ভাবছিলাম। এই তো চমৎকার হাতের কাজ রয়ে গেছে! বাঃ! বাঃ! বেশ বানিয়েছ তো টোস্‌ট্‌গুলো। ডিমসেদ্ধও নেহাৎ মন্দ কর নি তো!—"

বাম হস্তে পিস্তল ধারণ ক'রে সেই মারখুনে লোকটা ডান হাতের সদ্ব্যবহার সুরু ক'রে দেয়।

আমিও সেই তালে একটু ফাঁক পেতেই সরে পড়ি সেখান থেকে।

ছুট্‌! ছুট্‌! ছুট্‌! একেবারে সেই বড় রাস্তায়—ডায়মণ্ড হার্‌বার্‌ রোডে। কিন্তু কোথায় বা সেই বাস্‌! কাকস্যপরিবেদনা! সদ্য উত্থিত একজন প্রাতঃকৃত্যকারীর কাছ থেকে থানাটা কোন্‌ দিকে জেনে নিয়ে আবার দৌড় লাগাই।

মাইল দেড়েক দৌড়ে পৌঁছলাম গিয়ে থানায়। এক ছুটেই উঠলাম গিয়ে থানার উঠোনে।

বাংলোর মালিককে বাংলোর মধ্যেই খুন ক'রে রেখেছে, এক্ষুণিই দারোগাকে খবরটা জানানো দরকার। হন্তদন্ত হয়ে, এখুনি গেলে—এখনো গেলে, হাতে-নাতে খুনেটাকে পাকড়ানো যায় হয়তো।

'পাহারোলা'র ইঙ্গিতে বুঝলাম, দারোগা বাবু ভেতরে আপিস-ঘরেই।

এক লাফে ধাপ ক'টা টপকে দরজা ঠেলে আপিস-ঘরে ঢুকলাম।

ঢুকে কী দেখ্‌লাম? দেখ্‌লাম কী?

দেখ্‌লাম দারোগা বাবুটি যেমন লম্বা তেম্‌নি চওড়া—বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ—পাকা তিন মণের কম যান না, পেল্লায় পরিধি নিয়ে তাঁর চেয়ারে বসে রয়েছেন। তাঁর ডান চোখের কাছটায় কালো ছোপ্‌, এবং ডান হাতের পিছনে সবুজ উলকিতে হরতনের টেক্কা। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার, ভদ্রলোকের দেহে প্রাণ নেই—পিস্তল দিয়েই তাঁকে খুন করেছে স্পষ্টই বোঝা যায়। সোজা তাঁর বুকের ভেতর দিয়ে গুলি চলে গেছে সটান্‌।

হ্যাঁ, তাঁরও সারা মাথায় ঝাড়া টাক, শুধু একটি মাত্র চুল খাড়া দাঁড়িয়ে।

কেসিনের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌.এস্‌-সি)

কেসিন! নামটা বিশেষ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে কি? উঁহু, অনেকেই দেখছি মাথা চুলকোতে সুরু করলে! (অবশ্য সকলের কথা আমি বলছি না।) আচ্ছা, তবে পরিচয়টা করিয়ে দেই। এবার কিন্তু ঠকে গেলে আমায় দোষ দিতে পারবে না।

এক বাটি দুধ মুখের কাছে ধর। কি দেখ্‌ছ? কেউ কেউ হয়তো বলবে "বেশ পুরু মত সর দেখছি।" যারা এ কথা বলবে তারা ভাগ্যবান্‌ এবং ঈর্ষ্যার পাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু বেশীর ভাগই সম্ভবতঃ নাক-মুখ বেঁকিয়ে বলবে—"দেখছি শুধু জল।" তার পর, যারা আর একটু বেশী কথা বলতে ভালবাস তারা হয়তো যোগ করবে, "নাঃ, গয়লা বেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, এর একটা বিহিত না করলেই নয়।"

গয়লা অবশ্য সুবিধা পেলেই জল মেশাবে। তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়; বিহিত করতে পারলে সেটা সুখের কথা। কিন্তু গয়লা জল না মেশালেও দুধের বাটীর মধ্যে (একদম খাঁটী দুধ হ'লেও) শত করা প্রায় সাতাশী ভাগ জল থাকবেই। এর কারণ আর কিছু নয়, কারণ হচ্ছে—দুধের একটি প্রধান উপাদানই

হচ্ছে জল। কিন্তু শুধু জলের জন্য আর কেউ দুধের আদর করে না,—জল ছাড়াও দুধে অনেক কিছু আছে। কিছুটা ভিটামিন আছে (যদিও তা চোখে দেখা যায় না), খানিকটা ননী বা মাখন আছে, চিনি আছে, লবণ জাতীয় জিনিষ আছে, আর আছে দুধের সাদা অংশ—যাকে আমরা বলি ছানা। এই সাদা অংশই হচ্ছে "কেসিন"-রাজ্য।

দুধের মধ্যে খানিকটা লেবুর রস ফেলে দিলে কি হয় তোমরা সবাই দেখেছ। দুধ ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগে থাকে ঈষৎ সবুজ-আভা-যুক্ত জল, আর এক ভাগে দুধের সাদা অংশ অর্থাৎ 'কেসিন' জমাট বেঁধে ভেসে ওঠে। চলতি কথায় ব্যাপারটাকে আমরা বলি দুধের ছানা কাটা। ক্যাল্‌সিয়ামের নাম তোমরা শুনে থাকবে। চূণ, হাড়, চূণা পাথর ইত্যাদি নানা জিনিষে ক্যাল্‌সিয়াম্ প্রচুর পরিমাণে থাকে। দুধেও থাকে, আর দুধের মধ্যে কেসিন থাকে এই ক্যাল্‌সিয়ামের সঙ্গে মিশে। দুধে লেবুর রস দিলে লেবুর রসের ভিতরকার এসিড গিয়ে ক্যাল্‌সিয়ামের সঙ্গে মিলিত হয়, আর কেসিনকে দেয় ঠেলে বার করে। বেশী পরিমাণে কেসিন তৈরী করতে হ'লে বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ এই প্রণালীরই সাহায্য নেন। তবে লেবুর রস নয়, তাঁরা ব্যবহার করেন পাৎলা সালফিউরিক্, হাইড্রোক্লোরিক্ প্রভৃতি অন্য ধরণের এসিড। মাখন-তোলা দুধের মধ্যে এসিড ফেলে প্রথমে কেসিনকে আলাদা করে নেওয়া হয়। তার পর তাকে ঠাণ্ডা জলে বেশ করে ধুয়ে যন্ত্রের সাহায্যে ছেঁকে ছোট ছোট টুক্‌রো করে ফেলা হয়। তার পর সেই টুক্‌রোগুলোকে গরম বাতাসে ভাল করে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিলেই হ'ল। বাজারে এই জিনিষই কেসিন বলে বিক্রী হয়।

এ ছাড়াও কেসিন তৈরীর আর কয়েক রকম প্রণালী আছে। কেউ কেউ এসিড আদৌ ব্যবহার করেন না। দুধকে ফেলে রাখলে বাসি দুধে নানা রকম জীবাণু জন্মায়, এবং তাদেরই সাহায্যে দুধের কেসিন অংশ দই হয়ে ভেসে ওঠে। তখন তাকে আলাদা করে ফেলা হয়। মাখন-তোলা দুধ থেকে চেষ্টা করলে শত করা ৩—৩½ ভাগ কেসিন পাওয়া যেতে পারে।

খাদ্য হিসাবে কেসিনের বেশ আদর আছে। রাসায়নিকদের মতে ডিমের

সাদা অংশ আর আমাদের এই কেসিন একই ধরণের জিনিষ। মাংসের মধ্যে যেমন প্রোটিন আছে কেসিনের মধ্যেও তেমনি আছে। প্রোটিনের উপাদানকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এমাইনো-এসিড। কেসিনে প্রায় ১৫ রকম এমাইনো-এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা ছাড়া ভিটামিনও কিছু আছে। কাজেই কেসিনের খাদ্যগুণ অবহেলা করবার মত নয় নিশ্চয়ই। সাহেবরা যে 'চীজ্' বা পনীরের নাম করতে রসনা জলসিক্ত করে ফেলেন তাও আসলে এই কেসিন ছাড়া আর কিছু নয়। নানা রকম বিলাতী মিষ্টিতে (কন্‌ফেক্‌শনারী) কেসিন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, ওষুধ-বিষুধের সঙ্গেও কম ব্যবহার করা হয় না।

শুধু খাদ্য হিসাবে নয়, আরও অনেক ব্যবসায়ে কেসিনের কদর আছে। কাগজের ব্যবসায়ে কাগজের মণ্ডকে মসৃণ চেহারা দেবার জন্য কেসিন দরকার হয়। রংএর ব্যবসায়ে, চীনমাটী, কাচ ইত্যাদি যুড়বার কাজে, বই বাঁধাইএর কাজে এবং, শুনলে আশ্চর্য্য লাগবে, এরোপ্লেনের মত মজবুত যন্ত্র তৈরীর কাজেও এই কেসিন আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিন্তু কেসিনের যেটা আসল এবং সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যবহার এবার সেটার কথা বলি। কেসিনের এই অদ্ভুত গুণ আবিষ্কারের মূলে রয়েছে একটি বিড়াল। তবে শোন গল্পটা :

একদিন এক বৈজ্ঞানিক তাঁর ল্যাবরেটরীতে বসে কাজ করছেন, হঠাৎ কোত্থেকে এক বিড়াল এসে হাজির। টেবিলের ওপর নানা রকম ওষুধপত্র, রাসায়নিক মশলা ছড়ান রয়েছে, এখনই না জানি কোন্‌টা নষ্ট করে দেয়! বৈজ্ঞানিক মশাই তাড়াতাড়ি বিড়ালটাকে তাড়াতে গেলেন। তাড়া খেয়ে বিড়ালটা যেই পালাতে যাবে অমনি তার গায়ে লেগে একটা বোতল উল্টে পড়ল, আর পড়বি তো পড় একটা পনীরের (চীজ্) পাত্রে। বিড়াল চলে যাবার কিছু পরে পনীরের পাত্রের খোঁজ পড়ল—কিন্তু তুলে দেখা গেল তার মধ্যে পনীর কই, রয়েছে চক্‌চকে, প্রায় হাতীর দাঁতের মত শক্ত একটা জিনিষ! বৈজ্ঞানিক মশাই তো অবাক্। তখন পরীক্ষা করে দেখেন, যে বোতলটা বিড়ালের ধাক্কায় উল্টে গিয়েছিল তার মধ্যে ছিল 'ফর্ম্মালডিহাইড্' নামে এক রকম তরল রাসায়নিক পদার্থ, আর

সেটাই পনীরের সঙ্গে মিশে তাকে ঐ রকম অদ্ভুত চেহারায় পরিবর্ত্তিত করেছে। বৈজ্ঞানিক মশাইএর তখন মনে হ'ল এ তো মজা মন্দ নয়, এইভাবে তো পনীরকে শক্ত ক'রে নানা কাজে লাগান যেতে পারে। তিনি তখন ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণায় লেগে গেলেন, ফলে কেসিনের একটা নতুন ব্যবসা গড়ে উঠল। পনীর যে আসলে কেসিন ছাড়া আর কিছু নয় তা তো আগেই বলেছি।

এই শক্ত কেসিন দিয়ে আজকাল নানা ধরণের জিনিষ তৈরী হচ্ছে। সেলুলয়েড, ব্যাকেলাইট্ ইত্যাদির মত কেসিনের তৈরী জিনিষও আজকাল বাজার ছেয়ে ফেলছে। কেসিনের একটা গুণ জিনিষটা যেমন শক্ত তেমনি চক্‌চকে, আর সেই চক্‌চকে ভাবটা বহু দিন পর্য্যন্ত থাকে। তা ছাড়া কেসিনে সহজে আগুন ধরার ভয় নেই,—আর সেলুলয়েডের মত কেসিনের মধ্যেও যে কোন রং মিশিয়ে তাকে ভারী লোভনীয় চেহারা দেওয়া যায়। ছাতার বাঁট, য়্যাশ্-ট্রে, চায়ের পেয়ালা, বাসনপত্র, ফাউন্‌টেন পেনের খোল, কাগজ-চাপা, চিরুণী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য হরেক রকম জিনিষ আজকাল কেসিন দিয়ে তৈরী হচ্ছে। তোমার টেবিলের ওপরেই হয়তো এই রকম কয়েকটা জিনিষ রয়েছে—তাদের ইতিহাস হয়তো তোমার জানা নেই।

এই রকম শক্ত কেসিনের জিনিষ কি ভাবে তৈরী করা হয় তা জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছা হচ্ছে? কয়েক রকম উপায় আছে, একটার কথা বলি, অবশ্য খুব সংক্ষেপে। এই প্রণালীতে এসিডের সাহায্যে দুধ থেকে কেসিন্ বার করে নিয়ে তাকে আবার ক্ষার-জলে গুলে ফেলা হয়। তার পর তার মধ্যে ইচ্ছামত রং ও প্রয়োজন মত অন্যান্য রাসায়নিক মশলা মিশিয়ে আবার এসিড দিয়ে জমিয়ে পৃথক্ করে ফেলা হয়। তার পর ভাল করে ধুয়ে, যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়ে জল বার করে ফেলে, ধাতুর তৈরী বড় বড় মজবুত ছাঁচের মধ্যে ঢেলে ইচ্ছা মত জিনিষ গড়া যায়। ছাঁচ থেকে বার করার পরেও কিছু কাজ বাকী থাকে। এইবার জিনিষটাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ফর্ম্মাল্‌ডিহাইডে ভিজান হয়। তার পর দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে শুকিয়ে নিতে হয়। এর মধ্যে অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপার আরও অনেক আছে, আমি শুধু মোটামুটি নিয়মটা বল্‌লাম।

পৃথিবীর নানা জায়গায় আজকাল প্রচুর কেসিন তৈরী হচ্ছে। আমেরিকাই বোধ হয় সকলের ওপর টেক্কা দিয়েছে। কয়েক বছর আগের একটা হিসাবে দেখেছিলাম সেখানে বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ মণ কেসিন তৈরী হচ্ছে। আজকাল হয়তো আরও বেড়েছে।

আমাদের ভারতবর্ষেও চেষ্টা করলে কেসিনের ব্যবসা চলতে পারে। তবে কথা হচ্ছে, কেসিন তৈরীর 'কাঁচা মাল' হচ্ছে দুধ, আর যে দেশে লোকে খাবার জন্যই পরিমিত রকম দুধ পায় না সে দেশে দুধ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরীর বিলাসিতা ঠিক হবে কিনা!

নরহরির প্রতিশোধ

(শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ)

নরহরি পেয়ারা গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছে, এমন সময় তলায় দাঁড়িয়ে গোব্‌রা তার কোমর থেকে বেল্টটা টেনে নিল। গোব্‌রার এ হেন ব্যবহারে নরহরির রাগ হ'ল; বিষম রাগ হ'ল; রাগের চোটে চোখ লাল হ'য়ে গেল, দাঁত কিড়মিড় হ'য়ে গেল, হাতের মুঠো বন্ধ হ'তে আর খুল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু মুখে নরহরি কিচ্ছুই বল্‌ল না, কারণ সে জান্‌ত যে গোব্‌রার মাথাভর্ত্তি গোবর থাক্‌লেও তার গায়ে ভয়ঙ্কর জোর। নরহরি কিন্তু তাই ব'লে গোব্‌রাকে ক্ষমাও করল না; নরহরি কখনও কাউকে ক্ষমা করে না। অনেক সময় রাগ হ'লেও তখন অসুবিধা বুঝে হয় ত' চেপে যায় বটে, কিন্তু পরে কেউ যখন কিছু আশঙ্কা করছে না, সবাই যখন সব কথা ভুলে গেছে তখন দেয় ক'ষে আচ্ছা ক'রে।

নরহরি এক হাতে প্যান্টটাকে খাম্‌চে ধ'রে, আর এক হাতে আঁক্‌ড়ে-মাক্‌ড়ে পেয়ারা গাছ থেকে নেমে এল। গোব্‌রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনও মজা দেখ্‌ছে। নরহরি ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌ল, "এর জন্যে যদি পরে কষ্ট পাও তখন আমার কোন দোষ নেই বলে রাখ্‌লাম।" গোব্‌রা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে কি একটা বল্‌বার জন্য হাঁ করেছে, কিন্তু নরহরি তা না শুনেই বেল্টটা হাতে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা মেজদা' একটা অদ্ভুত কথা বল্‌ল। নাকি নরহরিদের ঐ বাড়ীটা পুরোনো মুসলমান আমলের, আর নাকি ঐ বাড়ীতে মাঝে মাঝে ভূত দেখা যায়। সবাই দেখ্‌তে পায় না, আবার সব সময়ও দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু তবু ভূত দেখা যায়। গোব্‌রা এক গাল হেসে নাকের পাশটা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বল্‌লে—"যাঃ!" মেজদা রেগে বল্‌ল—"যার যত কম বুদ্ধি তার তত কম বিশ্বাস। তোদের মতন অঘামারাদের কিছু বলাই হচ্ছে বেনাবনে মুক্তো ছড়ান।" গোব্‌রা ব্যগ্র হ'য়ে বল্‌ল—"কি? কি? কিসের কিসে কি ছড়ান?" মেজদা' সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্‌ল—"যে বিষয় জান না সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ ক'র না।"

নরহরি কিছুই বল্‌ল না, কিন্তু সব কথা মন দিয়ে শুন্‌ল। এ ব্যাপারের পর তিন চারদিন চলে গেছে; এর মধ্যে নরহরি গোব্‌রাকে কিছু বলেও নি, কিংবা খারাপ ব্যবহারও করে নি। কিন্তু ভুল্‌তেও দেয় নি। কারণ রোজ রাত্রে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বার আগে গোব্‌রার কাণের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলেছে—"নরহরি ভোলে না।" আর গলার স্বর শুনে রোজ রাত্রে গোব্‌রার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবার জোগাড় করেছে!

তার পর দিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ীশুদ্ধ সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেছে, খালি গোব্‌রা যায় নি। শরীরটাও ভালো ছিল না, আবার মেজদা'র সেই লোমহর্ষণ ডিটেক্‌টিভ্‌ বই সরাবার এমন সুযোগ হয় ত' এ জন্মে আর হবে না। তাই গোব্‌রা গেল না। সন্ধ্যের মধ্যেই বাড়ী খালি; গোব্‌রা স্বচক্ষে দেখ্‌ল নরহরি গলাবন্ধ গোলাপী পাঞ্জাবী প'রে, খাটো ক'রে ধুতী পরে, অক্সফোর্ড সু পায়ে দিয়ে সকলের আগে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চাপ্‌ল। পাছে পরে কেউ নরহরিকে দোষ দেয় তাই এ কথাটা আগে ব'লে রাখা ভালো। গোব্‌রা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা গেল নরহরির মাথাটার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখ্‌ল মাথার পেছনের চুলগুলো কাঁকড়াবিছের দাড়ার মতন উঁচিয়ে রয়েছে, আর সামনের চুলগুলো কপালের দু' পাশ দিয়ে দিব্যি তেলজল দিয়ে পেটি পেড়ে আঁচড়ানো, তার উপর ভিজে হাত দিয়ে প্লেন করা। নরহরি ছাড়া গাড়ীতে যে আর কেউ আছে গোব্‌রার সে খেয়াল নেই। যাবার আগে নরহরির মা, গোব্‌রার মামিমা, বল্‌লেন—"দেখিস বাবা, ডাকাতেপনা করিস্‌ না, আর তাড়াতাড়ি খেয়ে চাকরদের অবসর ক'রে দিস্‌।"

শেষটা যখন গাড়ীটা রাস্তার বাঁক ঘুরে গেল, আর দেখা গেল না, গোব্‌রা একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। সত্যি সত্যি যে নরহরিকে একটানা তিনচার ঘণ্টা দেখ্‌তে হ'বে না এ সৌভাগ্য যেন গোব্‌রার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কি জানি নরহরি কাছে থাক্‌লে কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ হয়; আজকাল গোব্‌রার ঐ নরহরির জন্যই খেয়ে সুখ নেই, খেলে সুখ নেই, চেঁচিয়ে সুখ নেই, শুয়ে অবধি সুখ নেই। কারণ গোব্‌রা জানে যে সারাদিন নরহরি কিছু বল্‌বে না খালি

এমন ক'রে চেয়ে থাক্‌বে তার ঐ ফ্যাক্‌সা সবুজ রংএর চোখ দিয়ে যে তার মনের মধ্যে কি আছে ভাব্‌তেও ভয় হ'বে, আর রাত্রে গোব্‌রা চোখ বুঁজলেই নরহরি চাপা গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌বে, "নরহরি ভোলে নি।"…আর গোব্‌রার সমস্ত গা ছম্‌ ছম্‌ ক'রে উঠবে আর মনে হ'বে বুঝি পিঠ বেয়ে একটা ঠাণ্ডা সাপ সড় সড় ক'রে নেমে গেল!

যাক্‌, নরহরি আজ তিন চার ঘণ্টার মতন বাড়ীতে নেই; সেই তিন চার ঘণ্টার মতন গোব্‌রা নিশ্চিন্ত। এ কথা মনে হ'তেই হঠাৎ গোব্‌রার এমন একটা বিষম ফূর্ত্তি লাগ্‌ল যে সে এক ছুটে সেই বিখ্যাত পেয়ারা গাছটার আগ্‌ডালে চড়ে বস্‌ল।

কোথা দিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল গোব্‌রার খেয়াল নেই। পেয়ারা গাছটার ছায়াটা লম্বিয়ে লম্বিয়ে শেষটা ফিকে হ'য়ে মিলিয়ে গেল, গোব্‌রা তখনও গাছে বসে পা ঝুলিয়ে—"সাঁইয়া—য়া" বলে গান গাচ্ছে। তার পর চারিদিকে কি রকম অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ হ'য়ে যাওয়াতে গোব্‌রার চমক্‌ ভাঙ্গল। চারিদিক্‌ চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই, খালি ঝিঁঝিঁ পোকারা ডাকছে। গোব্‌রা আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল। ভর সন্ধ্যেবেলা ওসব ছায়া মায়াতে না থাকাই ভালো। তাই সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে এগিয়ে এলো, কিন্তু বেল গাছের কাছাকাছি আসতেই সেই যারা নীচের দিকে মাথা ক'রে চুল ঝুলিয়ে গাছের ডালে পা লট্‌কে থাকে, সন্ধ্যেবেলা যাদের নাম করতে নেই, তাদের কথা মনে হ'ল। তাদের ছায়া মাড়ালেও মানুষ বিগ্‌ড়ে যায়। মুচীদের ছোট বৌয়ের গায়ে তাদের আঁচল ছোঁয়া লেগেছিল, অম্‌নি নাকি সে হাতের বাসন মাটিতে ফেলে, মোটা দেখে চেলা কাঠ বেছে নিয়ে ভাসুরকে বেদম ঠেঙ্গিয়েছিল।

গোব্‌রা অনেকটা ঘুরে, বেলগাছ এড়িয়ে, হঠাৎ বাড়ীটার দিকে চেয়ে চম্‌কে গেল। সন্ধ্যের আব্‌ছায়াতে পুরোনো ফাটল-ধরা ছাই রংএর বাড়ীটা যেন কার জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে। এতখানি দূর থেকেও কেমন একটা থম্‌থমে ভাব গোব্‌রা স্পষ্ট টের পেল। তার ঘাড়ের কাছের খোঁচা খোঁচা বেঁটে বেঁটে চুলগুলো শিরশিরিয়ে উঠ্‌ল। কি আশ্চয্যি! বাড়ীটা আজ এ রকম বদ্‌লে গেল কেন? কোথাও কেউ নেই, কোন ঘরে আলো নেই, খালি বারাণ্ডাতে টিম্‌টিম্‌ করে একটা লণ্ঠন জ্বল্‌ছে। চাকরগুলো সব কোথায়, বাড়ীর পিছনে উঠোনের ওপারে রান্নাঘরে ডুব মেরেছে, না পালিয়েছে, না মরে গেছে কে জানে! তা যাক্‌, তবু যে বুদ্ধি ক'রে আলোটা জ্বেলে রেখেছে সেই ভাগ্যি। হঠাৎ গোব্‌রার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে এলো। আলোর পাশে ওটা কি? কালো চাদরে ঢাকা লম্বা হ'য়ে পড়ে রয়েছে ওটা কি রে বাবা? বেয়ারার মতন লম্বাও নয়, মালীর মতন বেঁটেও নয়, লখিয়ার মতন মোটাও নয়, শিবপ্রসাদের মতন রোগাও নয়। গোব্‌রার চেনা কোন জ্যান্ত মানুষের মতনই নয়।

গোব্‌রা কোথায় যাবে? পিছনে গাছে ঝোলে যারা তারা, আর সাম্‌নে কালো কাপড়ে ঢাকা কে জানে কবেকার কোন্‌ সেকালের কিসের মড়া! গোব্‌রার কি আর পালাবার পথ আছে গো? যে নরহরি রোজ অন্ততঃ ৫টা অন্যায় কাজ করে, সে দিব্যি কাদের বাড়ী কুশাসনে বসে লুচী কোর্ম্মা খাচ্ছে। আর গোব্‌রা, যে জীবনে মোটে একবার নরহরির বেন্টটা নিয়ে ছোট একটা অন্যায় করেছিল, কি বড় জোর তা ছাড়া আর দু'তিনটে অন্যায় করেছে—সেই গোব্‌রা, যাকে ঠাকুমা "নাড়ুদাদা" বলে ডাকেন, আর পিসিমা দু'বেলা ভাত মেখে খাইয়ে দেন, আর মোটা পাঁজরার উপর রোগা আঙ্গুল বুলিয়ে বলেন—"আহা, আমাদের শুব্‌রে যেন দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে গো! শরীলে আর কিছু রইল না!"—সেই এত আদরের গোব্‌রাকে কি না শেষে মামাবাড়ীর এঁরা একেবারে তিন শ' বছরের ভূতের খপ্পরে ঠেলে দিয়ে নিজেরা দিব্যি ভোজ মারতে চলে গেলেন!

গোব্‌রা দু' তিনটা ঢোঁক গিলে গলাটাকে ভিজিয়ে নিলে। এমন সময় সেই কালো লম্বাটা নড়ে চড়ে উঠ্‌ল। গোব্‌রার জিভ, তালু সব জড়িয়ে গেল। মাগো, কি এমন সে করেছিল যে পৃথিবীর সব বীভৎস দৃশ্য তাকে এক সন্ধ্যেতেই দেখে নিতে হ'বে! গোব্‌রার নড়বার ক্ষমতা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগ্‌ল আর আস্তে আস্তে পিঠ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মতন ঘামের ধারা নাম্‌তে লাগ্‌ল।

কালো মূর্ত্তিটা উঠে বসবার আগেই মাথার তলা থেকে চক্‌চকে কি একটা ছুরীর মতন বের করল। তবে কি মামিমা বেচারাকে গোব্‌রার কাটা মুণ্ড দেখে আঁৎকে উঠ্‌তে হ'বে? গোব্‌রা এক দৌড় দিল; গেটের বাইরেও বিশ্বাস নেই; গোব্‌রা রাস্তা দিয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। নেমন্তন্ন-ফেরতারা তাকে সেই অবস্থাতে গাড়ীতে তুলে নিল। তার কথা অর্দ্ধেক বোঝা গেল না। তবু মামিমা কর্ত্তার দিকে চেয়ে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"ও মাগো, ভাগ্যে কোন অঘটন ঘটে নি, তা হ'লে ঠাকুরঝির কাছে কি ক'রে মুখ দেখাতাম! সব তোমার দোষ! পই পই ক'রে বলি ও সব পাহাড়ীমাহাড়ী রেখো না। যারা নিজের বুড়ো বাপমাকে রেঁধে খায় তাদের কি আর অসাধ্যি কিছু আছে?" কর্ত্তা ধম্‌কে বল্‌লেন—"থামো!" আর নরহরি কোন কথা না ব'লে একমনে পান চিবুতে লাগ্‌ল। গোব্‌রা গাড়ীর মধ্যেই হিম্‌সিম্‌ খেয়ে গেল।

গাড়ী গেটে ঢুকতেই মালী এক গাল হেসে এসে বল্‌ল—"সেই দর্জ্জি বেটা কাঁচি-টাঁচি নিয়ে কখন থেকে বসে রয়েছে মা; এক ঘুম দিয়ে উঠ্‌ল।" আর কি আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি এক সত্যিকারের কুর্ত্তোপরা দর্জ্জি, কালো পুঁট্‌লি বগলে, সেলাম ক'রে দাঁড়াল!

সবাই গোব্‌রার দিকে তাকাল। আর গোব্‌রাও অবাক্‌ হ'য়ে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল। এ যেন ঘুমভাঙ্গা বাড়ী। ঘরে ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, অন্ততঃ চারটে চাকর ছুটোছুটি

করছে,—সাদাসিধে এক অতি সাধারণ বাড়ী। গোব্‌রার আর কোন কিছুর উপর বিশ্বাস রইল না। না খেয়ে-দেয়ে চুপ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমে যখন চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে, নরহরি কাণের কাছে মুখ নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্রভাবে বল্‌লে—"নরহরি ভোলে না।"

এক মুহূর্ত্তে গোব্‌রার ঘুম ছুটে গেল, বল্‌ল, "আর কেন নরহরি, যথেষ্ট হয় নি কি?" নরহরি কোন উত্তর না দিয়ে নিজের ঠ্যাংটা নিজের মুখের কাছে তুলে দাঁত দিয়ে ফিতের গিঁট খুল্‌তে লাগ্‌ল। কোন কথা বল্‌ল না।

আর গোব্‌রা শুয়ে শুয়ে তার পরের রাত্রের, ও তার পরের রাত্রের, ও তার পরের রাত্রের, যত দিন না পূজোর ছুটি শেষ হয়—একটার পর একটা রাত্রি ও নরহরির কথা ভেবে শিউরে উঠ্‌ল।

বর্ষার জল

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌. এ, বি. এস্‌-সি)

এবারে নানা জায়গায় খুব প্রবল বর্ষা দেখা দিয়াছে। উড়িষ্যা প্রভৃতি কোন কোন জায়গায় তো প্রচণ্ড বন্যাই হইয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে খাল-বিল-পুকুর নতুন জলে থৈ থৈ করিতেছে। সে জল স্নানের সময়ে লোভনীয় হইলেও ঋতু হিসাবে বর্ষাকে কোন রকমেই প্রশংসা করা যায় না। বর্ষার জলের দোষে নানা রকম ব্যারাম-পীড়া দেখা দেয়—বিশেষতঃ খাবার জলে। এজন্য এ সময়ে জল পান বিষয়ে একটু সাবধান হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আজ কয়েকটা কথা বলিব।

জল ফুটাইয়া খাওয়া ভাল। ফুটাইয়া লইলে জলের দোষ নষ্ট হয়, কিন্তু ফুটান জল বেশী দিন রাখা ভাল নহে। কারণ অনেক ব্যাক্‌টিরিয়া, স্পোর (বীজ) অল্প ফুটান'য় মরে না, তাহারা পরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে।

যাহাদের ফুটান জল ব্যবহার করা কোন কারণে সম্ভব হয় না তাহাদের

পক্ষে জল পিতলের ঘড়ায় রাখিয়া চার পাঁচ ঘণ্টার পর ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্। পিতলের ভিতরকার তামার সংস্পর্শে অনেক জীবিত ব্যাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়।

খালি পেটে বা খাবারের সঙ্গে জল খাইলে যতটা অসুখ হইবার সম্ভাবনা, সেই জলই খাদ্য গ্রহণের ২।১ ঘণ্টা বাদে পান করিলে অসুখের সম্ভাবনা তাহার চেয়ে অনেক কম। আহারের দুই তিন ঘণ্টা পর পেটের ভিতর পাচক রসের সহিত হাইড্রোক্লোরিক অম্ল বাহির হইয়া থাকে। ঐ অম্লের ব্যাক্‌টিরিয়া নাশ করিবার শক্তি আছে। জন্তুরা মানুষের মত জলের তত বিচার করে না। তাহারা আগে খাবার খায়, তাহার পর জলের খোঁজে বাহির হয়। এজন্য তাহাদের খাদ্য ও জল গ্রহণের মধ্যে খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়। ঐ প্রথাই সম্ভবতঃ তাহাদের রক্ষার একটা উপায়। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে পেটে কিছু পরিমাণ অম্ল সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বর্ষার সুখের একটু নমুনা

শরীরের জলের অভাব শুধু যে পানীয় জলের দ্বারাই পূর্ণ হয় তাহা নহে, খাদ্য-দ্রব্যের জলের দ্বারাও তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব বর্ষায় ডাল ও ঝোলে জলের মাত্রা বাড়াইয়া পানীয় জলের মাত্রা কমাইয়া দিলে বিপদের আশঙ্কা অনেকটা কমে।

সংক্ষেপে নিয়মগুলি বলিতেছি :—

(১) অজানা জল খাইবে না। (২) যে পাত্রে অন্যে চুমুক দিয়া জল খাইয়াছে তাহাতে জল খাইবে না। (৩) বর্ষার সময় জলীয় খাদ্য বেশী খাইবে, যাহাতে কম জল পান করিয়াই শরীরের জলের অভাব পূর্ণ হয়। (৪) আহারের সময় বেশী জল খাইবে না, খানিক পরে খাইবে, এমন কি দশ পনের মিনিট পরে খাওয়াও ভাল।

এই নিয়মগুলি মানিলে আমাশয়, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমিবে। এঁটো পাত্রে জল না খাওয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা ও সর্দ্দী-কাশি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী থাকিবে না।

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

আট

সন্ধ্যাবেলা—অজয়কে ঘিরে বসেছে সকলে। অজয় সুরু করল তার গল্প রণজিতেরই ভাষায়: "ঐ লোকটী আমাদের নিয়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে লাগল—যেদিক্ থেকে তা'র সঙ্গীর কাতর আর্ত্তনাদ এসে পৌঁছেছিল আমাদের কাণে সেই দিক্ লক্ষ্য ক'রে।

"অল্প কিছু অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ইরা বল্‌ল—'ছোড়দা, একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর্‌ছ ?'

"আমি একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কি ব্যাপার ?'

"ইরা বল্‌লে—'লক্ষ্য কর্‌ছ না যে বনের এই জায়গাটায় একটা কি রকম থম্‌থমে ভাব—যেন কোন এক মায়াবীর যাদুমন্ত্রে সব কিছু একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে! এতক্ষণ বনের মধ্যে কত

বন্যজন্তু ছুটোছুটি করছিল, কত পাখী কিচির-মিচির করছিল অথচ এই জায়গাটায় একটা প্রাণীর দেখা নেই! যেন কোন এক মহা বিপদের হাত থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সব সভয়ে দূরে পালিয়েছে এই স্থানের ত্রিসীমানা ছেড়ে!' ইরার কথা সত্যিই। বনের এই জায়গাটায় এলে সত্যিই মনে হয় যে অতি নিকটেই যেন কোনও এক মহা বিপদ্ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে কা'কেও না কা'কেও গ্রাস করবার জন্য।

"যাই হোক, আরও একটু অগ্রসর হ'লাম আমরা বা হ'তে হ'ল আমাদের। কিন্তু, এই একটু অগ্রসর হ'তেই যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল তা'তে খানিকক্ষণের জন্য আমরা শুধু বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে রইলাম সে দিকে। আমাদের সঙ্গের ঐ লোকটার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ও যেন ওর সামনে ভূত দেখেছে। মুখ ওর যেন একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে, সমস্ত শরীর ওর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে কি এক নিদারুণ ভয়ে।……আমরা দেখলাম, আমাদের সামনে খানিকটা দূরে বটগাছ-জাতীয় প্রকাণ্ড কি একটা গাছ, যদিও সে গাছের উচ্চতা আমাদের দেশের বটগাছগুলির চেয়ে ঢের বেশী। সেই গাছের নীচে চতুর্দ্দিকে বহু জীবজন্তুর কঙ্কাল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। দেখ্‌লে মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য বন-দানবের পূজা হয় এখানে, বনের পশুরা এখানে আত্মবলি দিতে আসে সেই দানবের উদ্দেশ্যে; স্বেচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক—আসে! হয়ত বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন তা'রা আসে, তাইতে তা'দের দেহের কঙ্কাল সঞ্চিত হয়ে হয়ে আজ ঐ গাছের নীচেটা কঙ্কালেরই ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শুধু এই দৃশ্যই সব নয়। আমরা দেখলাম সেই গাছটার নীচে একজায়গায় সেই স্তূপীকৃত হাড়ের উপর ঐ আগেকার লোকটার বিকৃত বিবর্ণ দেহ নিশ্চল হয়ে পড়ে। জীবনের কোন স্পন্দনই নেই ওর দেহে।

"আমাদের সঙ্গের লোকটা অতি সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল সেইদিকে।

"ইরা হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌ল, নানা রকম ইঙ্গিত করে নিষেধ কর্‌ল ঐ লোকটাকে ওদিকে যেতে। লোকটা একবার মাত্র ইরার দিকে তাকিয়ে আবার চল্‌ল সেই গাছের দিকে তা'র সঙ্গীর দেহ লক্ষ্য ক'রে।

"ইরার এই আকস্মিক ব্যাকুলতা দেখে আমি বেশ একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। ইরাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কি হ'ল ইরা?'

"ইরা ব্যাকুলভাবে বল্‌লে—'ছোড়দা, ঐ হতভাগ্য লোকটাও এখুনই তার জীবন দেবে—ঐ দানবের পায়ের তলায়। ওর দেহও আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐ মৃতস্তূপের অঙ্গীভূত হ'বে।'

"আমি কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না—কাকে ও দানব বল্‌ছে; আমি তো আমাদের এই তিনটী মানুষ আর ঐ গাছটা ছাড়া কোন কিছুই দেখ্‌ছি না! জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'দানব, কই, দানব কোথায়?'

"ইরা তখন এক দৃষ্টে চেয়ে আছে ঐ লোকটার দিকে—ঐ লোকটা তখন সেই গাছটার নীচে পৌঁছেছে; পৌঁছে দেখ্‌ছে নেড়ে চেড়ে তার সঙ্গীর দেহটাকে। ইরার চোখে মুখে তখন একটা উদ্বেগ—একটা মহা আশঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে সেই লোকটার দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বল্‌ল—'দানব? দানব ঐ গাছটা। হ্যাঁ নিশ্চয়, ও সেই দানব-বৃক্ষ। ঐ যে দেখ্‌ছ, ঐ গাছটা থেকে বটের ঝুড়ির মত লম্বা লম্বা দড়ার মত কি সব ঝুল্‌ছে, ঐগুলি দিয়েই ও জন্তুদের করে আক্রমণ—একবার যাকে ও ওর কবলের মধ্যে পায় তাকে নাগপাশে বেঁধে ফেলে ঐ লম্বা দড়ি দিয়ে, তার পর তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে—' বল্‌তে বল্‌তে ইরা চীৎকার করে উঠ্‌ল, 'ঐ দেখ, ঐ দেখ—উঃ!'

"ইরার চীৎকারে সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঐ লম্বা লম্বা দড়ার মত সেইগুলি থর থর করে কাঁপ্‌ছে! তাদের চঞ্চলতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগ্‌ল। তাদের মধ্যে একটা একবার একটু বেশী জোরেই দুলে উঠ্‌ল যেন বাতাসের ছোঁয়াচ লাগার জন্যই; পরের মুহূর্ত্তেই সেটা গিয়ে পড়ল ঐ লোকটার পিঠের উপর—ঠিক যেমন ক'রে চাবুক গিয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠের উপর। লোকটা তখনও নীচু হয়ে দেখ্‌ছিল পরীক্ষা ক'রে তার সঙ্গীর দেহটাকে। অতর্কিতে আক্রান্ত হ'তেই সে চমকে উঠ্‌ল—পরের মুহূর্ত্তে সে এক বিকট আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল। ততক্ষণ তা'র ঐ লোহার মত কঠিন দেহ একেবারে নাগপাশে আবদ্ধ, মাটী থেকে তা'র দেহ তখন প্রায় বিশ পঁচিশ ফুট উপরে উঠে গেছে। দড়ার মত সেই আকর্ষীটা তার দেহের চারিদিকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধরেছে জড়িয়ে—তা'র নিষ্পেষণে ঐ লোকটার মুখে অসহ্য যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠেছে। কয়েকটী মুহূর্ত্ত মাত্র—সামান্য কয়েকটী অস্ফুট কাতর শব্দ, তার পর সব শেষ। বুঝলাম, এখন আর ওর দেহে প্রাণ নেই—ওর প্রাণহীন দেহটাকেই শুধু এখন ঐ দানবটা তার কঠোর নিষ্পীড়নে চূর্ণ করবার চেষ্টা করছে। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল; এ দৃশ্য দেখে আমাদের দেহেও যেন আর জীবনের কোন স্পন্দন ছিল না—আমরাও যেন নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সংজ্ঞা ফিরে এল হঠাৎ একটা শব্দ শুনে। তাকিয়ে দেখি, ঐ লোকটার প্রাণহীন, বিকৃত, পাণ্ডুর দেহ তার সঙ্গীটীর দেহের পাশে পড়ে—ঐ দানব তা'র করালগ্রাস থেকে ওর দেহকে দিয়েছে মুক্ত করে।

"ইরা অতি আস্তেই বল্‌লে—'বেচারা! কত ক'রে বারণ কর্‌লাম—কিছুতেই শুন্‌ল না। বুঝ্‌তেই পার্‌ল না হয়ত আমি কি বল্‌ছিলাম!'

"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'তুই কি করে জান্‌লি ঐ গাছের কথা?'

"ইরা বল্‌লে—'আমি ঠিক জানতাম না তবে ঐ গাছের চেহারা দেখে, ওর ঐ সর্ব্বনেশে দড়ার মত আকর্ষীগুলি দেখে আর ওর নীচে কঙ্কালের স্তূপ দেখে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল

যে এ সেই গাছ যে গাছের কথা আমি পড়েছিলাম একবার এক 'উদ্ভিদ্-বৈজ্ঞানিকের লেখা একটী বইএ। তিনি লিখেছিলেন—কেউ কেউ বলেন এই রকম দানব-বৃক্ষের দেখা কচিৎ কখনও মেলে গভীর অরণ্যের মাঝে। অদ্ভুত এদের প্রবৃত্তি। আমাদের সাধারণ উদ্ভিদ্-জগতে কয়েকটা ছোটখাট গাছ দেখা যায় যেমন 'পিচার প্ল্যাণ্ট' বা 'কলস-বৃক্ষ', 'ড্রসেরা' বা 'রৌদ্রশিশির', ঝাঁঝি—যারা তাদের জীবন-ধারণের জন্য ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরে খায়। কিন্তু এই দানবীয় গাছের ক্ষমতা অসীম—এমন কোনও শক্তিশালী জন্তু নেই এ জগতে যে একবার এর কবলে পড়লে আর মুক্তি লাভ করতে পারে! অক্টোপাসের মত শিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের সমস্ত রক্ত ও রস এরা নির্ব্বিবাদে শুষে নেয়; তার পর বিকৃত দেহটা দেয় ফেলে। ও বেচারা কিংবা ওর দলের কেউ নিশ্চয় কখনই আসে নি এদিকে, নইলে ওদের দু'জনকে আজ এমন দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝে প্রাণ দিতে হ'ত না।'

"ইরা কথা বল্‌ছিল আমার সঙ্গে কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ঐ মৃত লোক দুটীর দিকে। ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি ওর চোখের কোণে জল। আশ্চর্য্য! ঐ লোক দুটো একটু আগে নিয়ে চলেছিল আমাদের মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করতে আর এখন ওদেরই এই আকস্মিক মৃত্যুতে ইরার চোখে এসেছে জল! মনটা এক মহা তৃপ্তিতে ভরে গেল এই ভেবে যে নারী যতই শিক্ষিতা হোক্, মোটার চালাক, এরোপ্লেন চালাক না কেন তার অন্তরে যে স্নেহময়ী নারী বাস করে তার কখনও মৃত্যু ঘটে না।

"যাই হোক্, একটু প্রকৃতিস্থ হ'তেই মনে হ'ল যে এখন ও-সব ভাবালুতার সময় নয়, এখন আমাদের বাঁচতে হবে। ঐ দানব-বৃক্ষটা হয়ত জন্তু-জগতের মহা শত্রু হ'তে পারে কিন্তু ও আজ আমাদের পরম মিত্রের কাজ করেছে ঐ বুনো দুটোকে নিপাত ক'রে।···অনেক কষ্টে আমাদের হাতের বাঁধনটা খুলে ফেললাম। তার পর আমি ইরাকে নিয়ে ছুটলাম সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে। ইচ্ছাটা আমাদের সমুদ্রতীরের দিকে পৌঁছানো—যদি সেই সাহেবটীর নৌকাটীর দেখা মেলে তা হ'লে এই বুনোদের হাত থেকে রক্ষা পেতেও পারি।

"সেই গভীর অরণ্য ভেদ করে বহুক্ষণ এদিক ওদিক্ ছোটার পর শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছুলাম কোনও রকমে—তখন বোধ হয় বৈকাল হয়ে গেছে। সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সেই নৌকাটীর আশায়, কিন্তু কোথাও তা'র দেখা মিল্‌ল না। সন্ধ্যা হয়ে এল—অন্ধকার আমাদের নিশ্চল করে দিল। দু'জনে সেই সমুদ্রের তীরেই এক জায়গায় শুয়ে পড়লাম রাত্রিটা কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করছিলাম যে হয়ত ওদের কেউ মশাল হাতে ক'রে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়বে—আবার আমরা ওদের করায়ত্ত হ'ব। কিন্তু যে কারণেই হোক্—ওদের কেউ আর এল না সারারাত্রির মধ্যে। ভোর

হ'ল ক্রমশঃ। আমরা আবার নৌকাটীকে খুঁজতে সুরু করলাম। আশ্চর্য্য, একটু অগ্রসর হ'তেই দেখি এক জায়গায় সাহেবের সেই নৌকাটা কাৎ হয়ে পড়ে। বুকটা আনন্দে ভরে উঠ্‌ল—ভাবলাম, হয়ত রক্ষা পাব—যদি হঠাৎ কোনও দ্বীপ কিংবা কোনও যাত্রী-জাহাজের দেখা মেলে। ঐ নৌকায় ক'রে ভাসতে ভাসতে চলি তো আপাততঃ! ভাস্‌লাম অনির্দ্দিষ্টভাবে আবার।"

এই পর্য্যন্ত বলে অজয় থামল। তার পর একটু থেমে বল্‌ল—"নিশ্চয় তারা কোনও দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছে, নয়তো কোনও যাত্রী-জাহাজ তাদের উদ্ধার করেছে এত দিনে।"

সকলে নিস্তব্ধ। রণজিতের বাবা আর মা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন শুতে। যাওয়ার সময় রণজিতের বাবা শুধু আস্তে আস্তে বল্‌লেন—"হয়তো তা'রা বেঁচে আছে, হয়তো একদিন তা'রা আবার ফিরে আসবে।"

রণজিতের বাবা এবং মা চলে যাওয়ার পর মীরা অতি আস্তে আস্তেই বল্‌লে—"অজয়দা', একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অজয় তেমনি আস্তেই উত্তর দিলে—"নিশ্চয়ই।"

মীরা বল্‌লে—"তুমি বল্‌লে যে রণজিতদা'র ডায়েরীতে যা লেখা ছিল তাই তুমি বলছ। বেশ, কিন্তু যখন ওদের বুনোরা ধরে নিয়ে গেল তখন থেকে আর ওদের শেষে সমুদ্রে ভাসা পর্য্যন্ত ব্যাপারটা রণজিৎদা' ডায়েরীতে লিখ্‌ল কি করে? ও তো আর ওদের এরোপ্লেনের কাছে ফিরে আসে নি!"

অজয় একটু ম্লান হেসে বল্‌লে—"ঠিক ধরেছ মীরা। শুধু সন্তান-হারা বাপ-মা ছাড়া এ ত্রুটী এবং আরও অনেক ছোটখাট ত্রুটী সকলের চোখেই ধরা পড়া উচিত। কিন্তু কি করব ঠিক করতে না পেরে ডায়েরীর আশ্রয়ই নিয়েছিলাম।" একটু চুপ করে বল্‌ল ও—"ডায়েরীর কথা সত্যি নয়।"

অস্ফুটস্বরে ললিতা বল্‌লেন—"তবে যা বল্‌লে তাও সত্যি নয় কিছুই?"

অজয় বল্‌লে—"যা বল্‌লাম তা সব সত্যি। তবে আমি সে দ্বীপে কোনও দিন যাই নি।"

মীরা বল্‌লে—"তবে জান্‌লে কি করে?"

অজয় বল্‌লে—"রণজিতের নিজের মুখ থেকেই শুনেছি।"

সকলে এক সঙ্গে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মীরা বল্‌লে—"রণজিৎদা'র সঙ্গে তোমার কোথায় কি ভাবে দেখা হ'ল?"

অজয় বল্‌লে—"সেই কথাই বল্‌ছি এবার। সে কথা সন্তান-হারা মা-বাপের সামনে বলা অসম্ভব বলেই বল্‌তে পারি নি।"

(ক্রমশঃ)

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[উত্তর আগামী সংখ্যায় দেওয়া হবে]

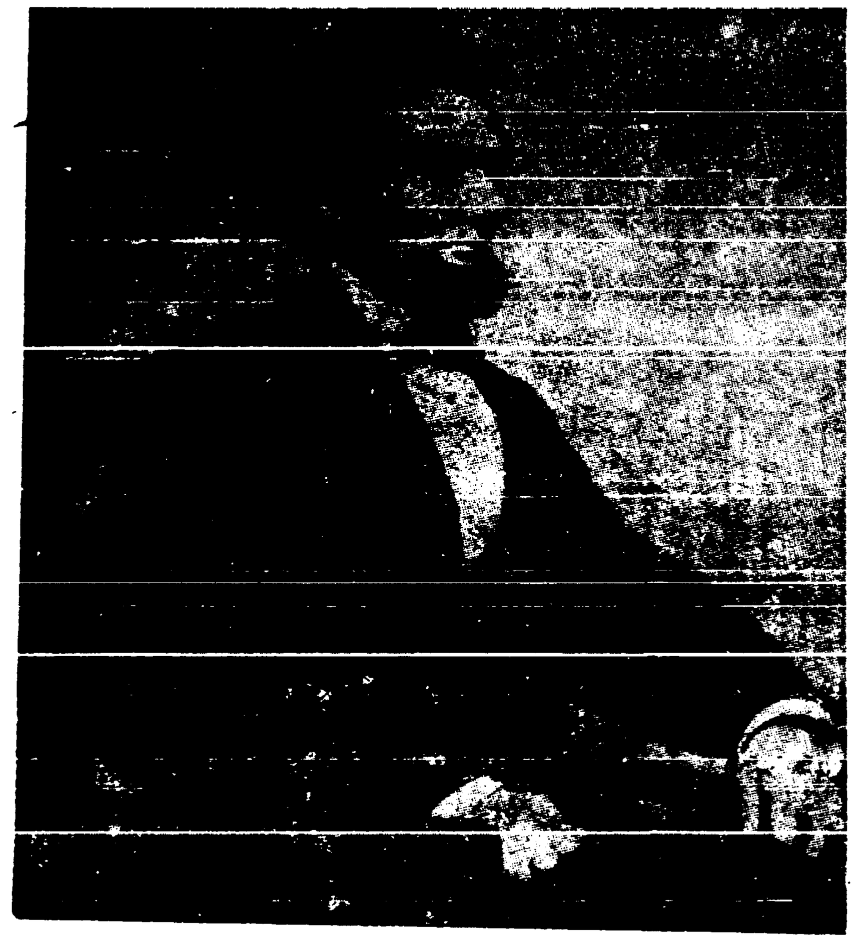

১। পাশের ছবির ভদ্রলোককে চিনতে পার? ইনি কোন্ দেশের লোক?

২। এই জিনিষগুলি কিসের থেকে পাওয়া যায়:—কুইনাইন, মুন, স্যাকারিন, এলুমিনিয়াম, পোস্ত-দানা।

৩। নিম্নলিখিত খৃষ্টাব্দগুলি কি জন্য বিখ্যাত?—

১৮৫৬, ১৮১৫, ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬), ১৭৫৭।

অমৃত-দ্বীপ

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

যে দল এগিয়ে আসছে তার ভিতরকার প্রত্যেক মূর্ত্তিটাই যেন মানুষের-মতন-দেখতে কলের পুতুলের মতন। কেবল চলছে তাদের পাগুলো, কিন্তু দেহের উপর-অংশ একেবারেই

কাঠের মত আড়ষ্ট! তাদের হাত দুলছে না, মাথাগুলোও এদিকে-ওদিকে কোনদিকেই ফিরছে না! আশ্চর্য্য!

দূর থেকে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল, আর দেখা গেল খালি শত শত চোখে স্থির-আগুনের মতন উজ্জ্বল দৃষ্টি!

কিন্তু অগ্নি-উজ্জ্বল এই-সব দৃষ্টি এবং এই-সব আড়ষ্ট দেহের চলন্ত পদের চেয়েও অস্বাভাবিক কেমন-একটা অজানা অজানা ভাব মূর্ত্তিগুলোর চারিদিকে কি যেন এক ভূতুড়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে!

কুমার শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুক তুল্‌লে।

বিমল বল্‌লে, "বন্ধু, অকারণে নরহত্যা ক'রে লাভ নেই।"

কুমার বল্‌লে, "নরহত্যা নয় বিমল, আমি প্রেতহত্যা করব। রামহরি ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে পিশাচদের দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না।"

—"কুমার, পাগ্‌লামি কোরো না।"

—"পাগ্‌লামি? ওরা কারা? এই মাত্র দেখে এলুম নদীর ধারে জনপ্রাণী নেই, তবু ওরা কোত্থেকে আবির্ভূত হ'ল? ওরা মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল, না আকাশ থেকে খ'সে পড়ল? ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, বন্দুক ছোঁড়ো বিমল, বন্দুক ছোঁড়ো!"

বিমল ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "কি হবে বন্দুক ছুঁড়ে? ওরা যদি একসঙ্গে আক্রমণ করে তা হ'লে বন্দুক ছুঁড়েও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না, উল্টে বন্দুকের শব্দে সজাগ হয়ে দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা এদিকে ছুটে আসতে পারে।"

জয়ন্ত চমৎকৃত স্বরে বল্‌লে, "বিমলবাবু, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় পাঁচ শ' লোক মাটির উপরে একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, তবু কোন রকম পায়ের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না? এও কি সম্ভব? না, আমরা কি কালা হয়ে গেছি?"

কুমার বল্‌লে, "বিমল, বিমল! তবে কি বিনা বাধায় আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? না বন্ধু, এতে আমি রাজি নই।"

বিমল বল্‌লে, "না, আত্মসমর্পণ করব কেন? আমরা ছুটে ঐ বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকব।"

—"তবে ছোটো। ওরা যে এসে পড়ল!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "কিন্তু যারা গান গাইছে তারা ঐ বনের ভিতরেই আছে। শেষ-কালে যদি আমরা দু'দিক্ থেকে আক্রান্ত হই?"

বিমল চট্‌পট্ চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "মূর্ত্তিগুলো আসছে পশ্চিম দিক্ থেকে,

আর গানের আওয়াজ আসছে পূর্ব্বদিক্ থেকে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণেও রয়েছে বন। চলুন, আমরা ঐদিকেই দৌড় দি।"

পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য ক'রে তিনজনেই বেগে দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বন ও মাঠের সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়ে প'ড়ে তারা আর একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

সেই বিচিত্র মূর্ত্তির বৃহৎ দল দ্রুতবেগে তাদের অনুসরণ করে নি, তাদের গতি একটুও বাড়ে নি! তারা যেমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এখনো ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে আসছে—যেন তাদের কোনই তাড়া নেই! তফাতের মধ্যে খালি এই, এখন তারাও আসছে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে।

বিমল আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "ওরা যে আমাদের পিছনে পিছনে আসছে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখি কুমার? ওরা তো একটুও তাড়াহুড়ো করছে না,—রাহু যেমন নিশ্চয়ই চাঁদকে গ্রাস করতে পারবে জেনে এগুতে থাকে ধীরে ধীরে, ওরাও অগ্রসর হচ্ছে সেই ভাবেই! যেন ওরা জানে, যত জোরেই পা চালাই ওদের কবল থেকে কিছুতেই আমরা পালাতে পারব না!"

কুমার বল্লে, "ওদের ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিন্ত মৃত্যুর দল মূর্ত্তি ধারণ ক'রে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!"

জয়ন্ত বল্লে, "ওরা কারা তা জানি না, কিন্তু আমাদের আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।"

বিমল বল্লে, "এখন দেখছি, সঙ্গীদের জাহাজে রেখে এসে ভালো কাজ করি নি। এই রহস্যময় দ্বীপে অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু চলুন, আমরা বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি।

আর এক দৌড়ে তারা মাঠ ছেড়ে বনের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

বন সেখানে খুব ঘন নয়, গাছগুলোর তলায় তলায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে খানিক কালো আর খানিক আলোর খেলা। ঝোপঝাপের মাঝখান দিয়েও ফুটে উঠেছে আলো-কালো মাখা পথের রেখা।

এবং দূর থেকে তখনো ভেসে আসছিল সেই বিচিত্র সঙ্গীতের তান।

কুমার বল্লে, "এখন আমরা কোন্ দিকে যাব?"

বিমল বল্লে, "পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে আরো খানিক এগিয়ে তার পর আবার আমরা নদীর দিকে ফেরবার চেষ্টা করব।"

বিমলের মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই সারা অরণ্য যেন চম্‌কে উঠল কি এক পৈশাচিক হো-হো অট্টহাস্যে! তাদের আশ-পাশ, সুমুখ-পিছন থেকে ছুটল হাসির হর্‌রার পর হাসির হর্‌রা! সে বিকট হাসির স্রোত বইছে যেন পায়ের তলা দিয়ে, সে হাসি যেন ঝ'রে ঝ'রে

পড়ছে শূন্যতল থেকে, সে হাসির ধাক্কায় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল বনব্যাপী আলোর লেখা, কালোর রেখা!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত বিভ্রান্তের মত চতুর্দ্দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাতে লাগল, কিন্তু কোনদিকেই দেখা গেল না জনপ্রাণীকে।

জয়ন্ত বল্লে, "কারা হাসে? কোথা থেকে হাসে? কেন হাসে?"

কুমার ও বিমল কখনো পাগলের মত এ-গাছের ও-গাছের দিকে ছুটে যায়—কখনো ডাইনের কখনো বাঁয়ের ঝোপঝাপের উপরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বারবার আঘাত করে, কিন্তু কোথাও কেউ নেই,—অথচ অট্ট-অট্ট হাসির তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে প্রতি ঝোপের ভিতর, প্রতি গাছের আড়াল থেকে! এ অদ্ভুত হাসির জন্ম যেন সর্ব্বত্রই।

যেমন আচম্বিতে জেগেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেল হাসির হুল্লোড়! কেবল শোনা যেতে লাগল সুদূরের সঙ্গীত-লহরী।

বিমল কাণ পেতে শুনে বল্লে, "জয়ন্তবাবু, এবারে কেবল গান নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?"

জয়ন্ত বল্লে, "হুঁ। বনময় ছড়ানো শুক্‌নো পাতার উপরে পড়ছে যেন তালে তালে শত শত পা! বোধ হয় মাঠের বন্ধুরা বনে ঢুকেছে, কিন্তু এবারে তারা আর নিঃশব্দে আসছে না।"

বিমল বল্লে, "ছোটো কুমার, যত জোরে পারো ছোটো।"

আবার জাগ্রত হ'ল বহুকণ্ঠে সেই ভীষণ অট্টহাস্য!

কুমার বল্লে, "কিন্তু কোন্ দিকে ছুটব বিমল? দূরে শত্রুদের পদশব্দ, আশেপাশে শত্রুদের পাগ্‌লা হাসির ধূম! চারিদিকে অদৃশ্য শত্রু, কোন্ দিকে যাব ভাই?"

—"সাম্‌নের দিকে—সাম্‌নের দিকে। শত্রুরা দৃশ্যমান্ হ'লেই বন্দুক ছুঁড়বে।"

তিন জনে আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে লাগল যেন সেই বেয়াড়া হাসির আওয়াজ! এইটুকুই কেবল বোঝা গেল যে, তাদের এপাশে ওপাশে পিছনে জাগ্রত অট্টহাসি থাকলেও সামনের দিকে হাসি এখন একেবারেই নীরব। যেন সেই অপার্থিব হাসি তাদের সুমুখের পথ রোধ করতে চায় না! যেন কারা তাদের ঐদিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়!

প্রায় বারো-তেরো মিনিট ধ'রে তারা ছুটে চল্‌ল এই ভাবেই এবং এর মধ্যে সেই হাসির স্রোত বন্ধ হ'ল না একবারও।

তার পরেই থেমে গেল হাসি, শেষ হয়ে গেল বনের পথ, এবং সামনেই দেখা গেল পথ যুড়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব-উঁচু একটা প্রাচীর।

কুমার হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বল্লে, "সামনের পথ বন্ধ। এখন আমরা কি করব ?"

বিমল ও জয়ন্তও উপায়হীনের মতন এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

হঠাৎ বনের ভিতরে জাগল আবার শত শত পায়ের আঘাতে শুক্‌নো পাতার আর্ত্তনাদ !

জয়ন্ত বল্লে, "এবারে পায়ের শব্দ আসছে আমাদের দু'-পাশ আর পিছন থেকে। আমাদের সুমুখে রয়েছে খাড়া দেওয়াল। আর আমাদের পালাবার উপায় নেই।"

বিমল ম্লান হাসি হেসে বল্লে, "আমরা পালাচ্ছি না—রিট্রিট্ করছি।"

জয়ন্তও হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্লে, "বেশ, মানলুম এ-সব হচ্ছে আমাদের ট্যাক্‌টিক্যাল্ মুভ্‌মেণ্ট্‌স্ ; কিন্তু এবারে আমরা কোন্ দিকে যাত্রা করব ?"

বিমল বল্লে, "সামনের দিকেই ভালো ক'রে চেয়ে দেখুন, আমাদের সুমুখের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা ছোট দরজা। ওর পাল্লাও বন্ধ নেই।"

জয়ন্ত দু' পা এগিয়ে ভালো ক'রে দেখে বুঝলে, বিমলের কথা সত্য। তার পর বল্লে, "দেখছি, অন্ধকারে আপনার চোখ আমাদের চেয়ে ভালো চলে। কিন্তু ওর ভেতরে ঢুকলে কি আর আমরা বেরিয়ে আসতে পারব ? বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুই পাশের আর পিছনের অদৃশ্য শত্রুরা অট্টহাস্য আর পায়ের শব্দ ক'রে আমাদের এইদিকেই তাড়িয়ে আনতে চায়। শিকারীরা বাঘ-সিংহকে যেমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা ক'রে ফাঁদে ফেলে, শত্রুরাও সেই কৌশল অবলম্বন করেছে।"

বিমল বল্লে, "ঠিক। তাদের উদ্দেশ্য আমিও বুঝতে পেরেছি। আর আমাদের ঢোকবার সুবিধা হবে ব'লে দয়া ক'রে তারা দরজার পাল্লা-দু'খানাও খুলে রেখেছে। অতএব তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের এখন দরজার ফাঁকেই মাথা গলাতে হবে, কারণ পায়ের শব্দ আর দূরে নেই।"

কুমার বল্লে, "দরজার ওপাশে যদি নতুন বিপদ্ থাকে ?"

—"অকুতোভয়ে সেই বিপদ্‌কে আমরা বরণ করব"—ব'লেই বিমল বন্দুক উদ্যত ক'রে সর্ব্বাগ্রে দরজার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পিছনে পিছনে গেল কুমার ও জয়ন্ত।

ভিতরে ঢুকে তারা অবাক্ হয়ে দেখলে, একটা বৃক্ষহীন, তৃণহীন ছোটখাটো ময়দানের মতন জায়গা এবং তার চারিদিকেই প্রায় চার-তালার সমান উঁচু প্রাচীর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন সর্ব্বহারা মরুভূমির খাঁ-খাঁ-করা ভয়াল স্তব্ধতাকে সেখানে কেউ প্রাচীর তুলে কয়েদ ক'রে রেখেছে !

জয়ন্ত বল্লে, "এর মানে কি ? একটা মাঠকে এমন উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন ?"

কুমার বল্লে, "এরা কি এখানে আমাদের বন্দী ক'রে রাখতে চায় ?"

যেন তার জিজ্ঞাসার উত্তরেই তাদের পিছনকার দরজার পাল্লা-দু'খানা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিমল দৌড়ে গিয়ে দরজা ধ'রে টানাটানি ক'রে বল্লে, "হ্যাঁ কুমার, অমৃত-দ্বীপে এসে আমাদের ভাগ্যে উঠবে বোধ হয় নিছক গরলই। এ দরজা এমন মজবুৎ যে মত্ত হস্তীও এর কিছুই করতে পারবে না ! এতক্ষণ লক্ষ্য ক'রে দেখি নি, কিন্তু এ হচ্ছে পুরু লোহার দরজা ; আর এই পাঁচীল হচ্ছে পাথরের। এই দরজা আর পাঁচীল ভাঙতে হ'লে কামানের দরকার।"

অকস্মাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল ভয়াবহ গর্জ্জনের পর গর্জ্জনে ; সে যে কী বিকট, কী বীভৎস, কী ভৈরব হুঙ্কার, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃথিবীর মাটি, আকাশের চাঁদ-তারা, নিশীথ-রাতের বুক সে হুঙ্কার শুনে যেন কেঁপে কেঁপে কেঁপে উঠল ! যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বহু দিনের উপবাসী কোন অতিকায় দানব হিংস্র, বিষাক্ত চীৎকারের পর চীৎকার ক'রে হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল !

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল।

সর্ব্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত ; কম্পিতস্বরে সে বল্লে, "এ কোন্ জীবের গর্জ্জন বিমলবাবু ? চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিংহও যে একসঙ্গে এত জোরে গর্জ্জন করতে পারে না ! এ-রকম ভয়ানক গর্জ্জন করবার শক্তি কি পৃথিবীর কোন জীবের আছে ?"

বিমল অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "অনেক দিন আগে আমরা গিয়েছিলুম ময়নামতীর মায়াকাননে। কুমার, আজকে এই গর্জ্জন শুনে কি সেখানকার কোন কোন জীবের কথা মনে পড়ে না ?"*

কুমার বল্লে, "মনে মনে আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম।"

বিমল বল্লে, "কিন্তু আন্দাজ করতে পারছ কি এ-জীবটা কোত্থেকে গর্জ্জন করছে ? মনে হচ্ছে যেন সে আছে আমাদের খুব কাছেই। অথচ এই পাঁচীল-ঘেরা জায়গাটার মধ্যে চাঁদের আলোয় কোন জীবের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না !"

জয়ন্ত বল্লে, "কিন্তু পূর্ব্বদিকে খানিক দূরে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে চাঁদের আলোয় জলের মতন কি চক্‌চক্ করছে না ?"

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লে, "হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, ওখানে একটা জলাশয়ের মতন কিছু আছে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

কুমার বল্লে, "একটু এগিয়ে দেখব নাকি ?"

* আমার লেখা "মায়াকানন" উপন্যাস দ্রষ্টব্য।—ইতি লেখক।

বিমল খপ্ ক'রে কুমারের হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "খবর্দ্দার কুমার, ওদিকে যাবার নামও কোরো না।"

—"কেন বিমল, ওদিকে তো কেউ নেই ?"

—"হ্যাঁ, চোখে কারুকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আগে এখানকার ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে দেখ। প্রথমে ধর, রীতিমত মাঠের মতন এমন একটা জায়গা অকারণে কেউ এত-উঁচু পাথরের পাঁচীল দিয়ে ঘিরে রাখে না। এখানটা ঘিরে রাখবার কারণ কি ? দ্বিতীয়তঃ, পাঁচীলের ঐ দরজা পুরু লোহা দিয়ে তৈরি কেন ? এই ফর্দ্দা জায়গায় এমন কি বিভীষিকা আছে যাকে এখানে ধ'রে রাখবার জন্যে অমন মজ্‌বুৎ দরজার দরকার হয় ? তৃতীয়তঃ, পাঁচীল-ঘেরা এতখানি জায়গার ভিতরে দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই—না গাছপালা, না ঘর-বাড়ী, না জীবনের চিহ্ন ! আছে কেবল একটা জলাশয় ! কেন ওখানে জলাশয় খোঁড়া হয়েছে, ওর ভিতরে কি আছে ? আমাদের খুব-কাছে এখনি যে দানব-জানোয়ারটা বিষম গর্জ্জন করলে, কে বলতে পারে সে ঐ জলাশয়ে বাস করে কিনা ? হয়তো সে উভচর—জলে-স্থলে তার অবাধ গতি ! ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয় কুমার, ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

জয়ন্ত শিউরে উঠে বল্‌লে, "তবে কি ঐ দানবের খোরাক হবার জন্যেই আমাদের তাড়িয়ে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে ?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

কুমার বল্‌লে, "ঐ বিভীষিকা যদি স্থলচর হয়, তা হ'লে আমরা তো এখানে থেকেও বাঁচতে পারব না ! সে তো আমাদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে ! তখন কি হবে ?"

—"তখন ভরসা আমাদের এই তিনটে 'অটোমেটিক' বন্দুক ! কিন্তু এই বন্দুক তিনটে যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না ! ময়নামতীর মায়াকাননে আমরা এমন সব জীবও স্বচক্ষে দেখেছি যাদের কাছে বন্দুকও হচ্ছে তুচ্ছ অস্ত্র।"

জয়ন্ত কিছু না ব'লে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "দেখছি পাঁচীলের গা তেলা নয়, রীতিমত এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো। ভালো লক্ষণ।"

বিমল বল্‌লে, "পাঁচীলের গা অসমতল হ'লে আমাদের কি সুবিধা হবে জয়ন্তবাবু ?"

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বল্‌লে, "বিমলবাবু, যদি একগাছা হাত চল্লিশ-পঞ্চাশ লম্বা দড়ী পেতুম, তা হ'লে আমাদের আর কোনই ভাবনা ছিল না।"

বিমল বিস্মিতস্বরে বল্‌লে, "দড়ী ? দড়ী নিয়ে কি করবেন ? দড়ী তো আমার কাছেই আছে ! জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার হচ্ছি পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, পথে পা বাড়ালেই সব-কিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। আমাদের দু'জনের পাশে ঝুলছে এই যে দু'টো ব্যাগ, এর মধ্যে

আছে দস্তুরমত সংসারের এক-একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার ব্যাগে আছে ষাট হাত ম্যানিলা দড়ী। জানেন তো, দেখতে সরু হ'লেও তা দিয়ে সিংহকেও বেঁধে রাখা যায় ?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "উত্তম্ ! আর চাই একটা হাতুড়ী আর একগাছা হুক্।"

—"ও দু'টি জিনিষ আছে কুমারের ব্যাগে।"

—"চমৎকার ! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন। আমি এই চার পাঁচীলের একটা কোণ বেছে নিতে চাই, যেখানে গেলে পাব দু'দিকের দেওয়াল।"

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগুলো। কিছুই বুঝতে না পেরে বিমল ও কুমার চল্‌ল তার পিছনে পিছনে।

প্রাচীরের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বল্‌লে, "এইবারে দড়ী আর হুক্ আর হাতুড়ী নিয়ে আমি উঠব পাঁচীলের উপরে। তার পর টঙে গিয়ে দু'খানা পাথরের যোড়ের মুখে হুক্ বসিয়ে তার সঙ্গে দড়ী বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেব। তার পর আপনারা দু'জনেও একে একে দড়ী ধ'রে উপরে গিয়ে উঠবেন। তার পর সেই দড়ী বে'য়েই পাঁচীলের ওপারে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হ'তে বেশীক্ষণ লাগবে না।"

বিমল বল্‌লে, "সবই তো জলের মতন বেশ বোঝা গেল। কিন্তু জয়ন্তবাবু, প্রথমেই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ? অর্থাৎ পাঁচীলের টঙে গিয়ে চড়বে কে ? আপনি, না আমি, না কুমার ? দুঃখের বিষয় আমরা কেউই টিক্‌টিকির মূর্ত্তি ধারণ করতে পারি না !"

জয়ন্ত বল্‌লে, "বিমলবাবু, আমি ঠাট্টা বা আকাশ-কুসুম চয়ন করছি না। কিছুকাল আগে "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে" আমি কারাগার থেকে পলায়নের এক আশ্চর্য্য খবর বা গল্প প'ড়েছিলুম। কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য কাহিনী। আমেরিকার এক নামজাদা খুনে ডাকাতকে সেখানকার সব-চেয়ে সুরক্ষিত জেলখানায় বন্দী ক'রে রাখা হয়। সে জেল ভেঙে কোন বন্দী কখনো পালাতে পারে নি, তার চারিদিকে ছিল অত্যন্ত উঁচু পাঁচীল। কিন্তু ঐ ডাকাতটা এক অদ্ভুত উপায়ে সেই পাঁচীলও পার হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপায়টা যে কি, মুখে বল্‌লে আপনারা তা অসম্ভব ব'লে মনে করবেন—আর খবরটা প্রথম প'ড়ে আমিও অসম্ভব ব'লেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন ধ'রে অভ্যাস করবার পর আমিও দেখলুম, উপায়টা দুঃসাধ্য হ'লেও অসম্ভব নয়। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ উপায়টা চিরদিনই অসম্ভব হয়ে থাকবে বটে, কারণ এ উপায় যে অবলম্বন করবে তার পক্ষে দরকার কেবল হাত-পায়ের কৌশল নয়—অসাধারণ দেহের শক্তিও।"

বিমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু, শীগ্‌গির বলুন, সে উপায়টা কি ?"

জয়ন্ত বললে, "উপায়টা এমন ধারণাতীত যে মুখে বল্‌লে আপনারা বিশ্বাস করবেন না।

তার চেয়ে এই দেখুন, আপনাদের চোখের সুমুখে আমি নিজেই সেই উপায়টা অবলম্বন করছি"—ব'লেই সে দুই দিকের প্রাচীর যেখানে মিলেছে সেই কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

তার পর বিমল ও কুমার যে-ব্যাপারটা দেখলে কোনদিনই সেটা তারা সম্ভবপর ব'লে মনে করে নি। জয়ন্ত কোণে গিয়ে দুই দিকের প্রাচীরে দুই হাত ও দুই পা রেখে কেবল হাত ও পায়ের উপরে প্রবল চাপ দিয়ে উপর দিকে উঠে যেতে লাগল, প্রায় অনায়াসেই! বিপুল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে তারা বিস্ফারিত চোখে উপর-পানে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্ত যখন প্রাচীরের উপর পর্য্যন্ত পৌঁছলো, বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারিফ ক'রে বল্লে, "সাধু জয়ন্তবাবু, সাধু! আপনি আজ সত্য ক'রে তুল্লেন ধারণাতীত স্বপ্নকে!"

ঠিক সেই সময়েই জাগল আবার চারিদিক্ কাঁপিয়ে ও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ক'রে কোন্ অজ্ঞাত দানবের বিভীষণ হুহুঙ্কার! সে যেন সমস্ত জীবজগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ—সে যেন বিরাট বিশ্বের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধিত যুদ্ধ ঘোষণা!

জয়ন্ত তখন প্রাচীরের উপরে উঠে ব'সে হাঁপ নিচ্ছে, কিন্তু এমন ভয়ানক সেই চীৎকার যে, চম্‌কে উঠে সে আর-একটু হ'লেই ট'লে নীচে প'ড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি দুই হাতে পাঁচীল চেপে ধ'রে সরোবরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখলে।... ... ... হ্যাঁ, বিমলের অনুমানই ঠিক। একটু আগে যারা আজ্‌গুবি হাসি হাসছিল তারা দেখা দেয় নি বটে, কিন্তু এখন যে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছাড়ছে সে আর অদৃশ্য হয়ে নেই!

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। এবং পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীরের কালো ছায়া এসে প'ড়ে সরোবরের আধাআধি অংশ ক'রে তুলেছে অন্ধকারময়। এবং সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে অন্ধকারেরই একটা জীবন্ত অংশের মত কী যে সে কিম্ভূতকিমাকার বিপুল মূর্ত্তির খানিকটা আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, দূর হ'তে স্পষ্ট ক'রে তা বোঝা গেল না। কিন্তু তার প্রকাণ্ড দেহটা সরোবরের জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল অংশের উপরে ক্রমেই আরো-প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে লাগল! ... ... তবে কি সে তাদের দেখতে পেয়েছে? সে কি এগিয়ে আসছে জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠবার জন্যে?

জয়ন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে প্রাচীরের পাথরের ফাঁকে হুক্ বসিয়ে হাতুড়ীর ঘা মারতে লাগল।

নীচে থেকে বিমল চীৎকার ক'রে বল্লে, "ও আমাদের দেখতে পেয়েছে—ও আমাদের দেখতে পেয়েছে! জয়ন্তবাবু, দড়ী—দড়ী!"

কুমার ফিরে সচকিত চোখে দেখলে, প্রায় আশী ফুট লম্বা ও পঁইত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু একটা বিরাট কালি-কালো দেহ মূর্ত্তিমান্ দুঃস্বপ্নের মত সরোবরের তীরে উঠে ব'সে সশব্দে প্রচণ্ড গা-ঝাড়া দিচ্ছে!

উপর থেকে ঝপাং ক'রে একগাছা দড়ী নীচে এসে পড়ল।

কুমার ত্রস্ত স্বরে বল্লে, "লাউ-ৎজুর ভক্তরা কি একেই ড্রাগন ব'লে ডাকে?"

বিমল দড়ী চেপে ধ'রে বল্লে, "চুলোয় যাক্ লাউ-ৎজুর ভক্তরা! এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গেই দড়ী ধ'রে উপরে উঠে এস।"

... ...

... ...

তারা একে একে প্রাচীরের ওপারে মাটির উপরে গিয়ে নেমে আড়ষ্ট ভাবে শুনলে, ওধার থেকে ঘন ঘন জাগছে মহাক্রুদ্ধ দানবের হতাশ হুহুঙ্কার! সে নিশ্চয়ই চারিদিকে মুখের গ্রাস খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেননা তার বিপুল দেহের বিষম দাপাদাপির চোটে প্রাচীরের এ পাশের মাটিও কেঁপে উঠছে থর্-থর্ ক'রে।

কুমার শ্রান্তের মতন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বল্লে, "উঃ, দানবটা আর এক মিনিট আগে আমাদের দেখতে পেলে আমরা আর বাঁচতুম না!"

বিমল গম্ভীর স্বরে বল্লে, "এখনো আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই কুমার! ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে চেয়ে দেখ!"

সর্ব্বনাশ! আবার সেই অপার্থিব দৃশ্য! তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরের মতন একটা স্থানে এবং সেই প্রান্তরের যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকেই চোখে পড়ে, কলে-চলা পুতুলের মতন দলে দলে মানুষ-মূর্ত্তি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, এগিয়ে আসছে! নীরব, নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সব মূর্ত্তি!

পিছনে প্রাচীর এবং সামনে ও দুই পাশে রয়েছে এই অমানুষিক মানুষের দল। এবারে আর পালাবার কোন পথই খোলা নেই।

জয়ন্ত অবসন্নের মত ব'সে প'ড়ে বল্লে, "আর কোন চেষ্টা করা বৃথা।" (ক্রমশঃ)

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

কামানের মুখে নানকিন—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। প্রকাশক এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

চীন-জাপান-যুদ্ধ নিয়ে লেখা ছোটদের উপন্যাস। এ ধরণের গল্প লিখতে ধীরেন বাবুর

অসাধারণ হাত সে কথা তোমরা সবাই জান। এ বইখানিও তিনি তেমনি নিপুণতার সঙ্গে লিখেছেন। বইখানা হাতে পেলে তোমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়বে, তার পর শেষ হ'লে অস্ফুট কণ্ঠে বলবে—"চমৎকার"।

ফুটবলের দৌড়—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

শিবরাম বাবুর নূতনতম গল্পের বই। তিনটি গল্প। তিনটিতেই আছে অফুরন্ত হাসি। শেষ গল্প দু'টিকে এক কথায় 'অনবদ্য' বলা যেতে পারে।

কলকাতার 'ফুটবল্ সীজন্' এ বছরকার মত শেষ হয়েছে। প্রথম বিভাগে এবারেও লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে মহামেডান্ স্পোর্টিং। এবার নিয়ে তারা ৬ বার এ সম্মানের অধিকারী হ'ল। গত বছরের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ মোহনবাগান রানার্স্ আপ্ হয়েছে। সব চেয়ে নীচে হয়েছে ক্যাল্কাটা। ক্লাব উঠিয়ে না দিলে আসছে বার তাদের দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে। দ্বিতীয় বিভাগে 'ডালহৌসী' দল চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। আসছে বার তারা আবার প্রথম বিভাগে খেলবে। ডালহৌসীর মত সুবিখ্যাত দল (যারা বহুবার লীগ্ ও শীল্ড জয় করেছে) আবার প্রথম বিভাগে ফিরে আসায় সকলেই আনন্দিত হয়েছে।

লীগের পরেই আই. এফ্.এ শীল্ডের খেলা। এবার যুদ্ধের জন্য কোন মিলিটারী দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে নি। আই. এফ্-এ'র ইতিহাসে এটা নতুন। তবে ভারতের নানা জায়গা থেকে অনেক নাম-করা দল এবার এই খেলায় যোগ দিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বাঙ্গালোর মোস্লেম্স্, দিল্লী ফুটবল্ এসোসিয়েশন, ঝান্স ইলেভেন, পেশোয়ারের দল ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু বাইরের কোন দলই শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকতে

পারে নি। গৌহাটীর মহারাণা ক্লাব্ মহামেডান্ স্পোর্টিংএর সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকলকে অবাক্ করে দিয়েছে। মহামেডান্ স্পোর্টিংকে পরাজিত করে রেঞ্জার্স্ দল—চতুর্থ রাউণ্ডে। রেঞ্জার্স্ পরাজিত হয় এরিয়ান্সের কাছে। ফাইনাল হয় মোহনবাগানের সঙ্গে এরিয়ান্স দলের। এই খেলায় এরিয়ান্স মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়। ফাইনাল খেলা দেখতে যে ভীড় হয়েছিল কলকাতার কোন ফুটবল্ ম্যাচে নাকি এ পর্য্যন্ত সে রকমটা হয় নি। মোহনবাগান চিরকালই বাঙ্গালীর বড় আদরের টিম্। তা ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে তারাই সর্ব্বপ্রথম শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করেছিল। গেল বারে তারা লীগ্ বিজয়ী হয়েছিল, এবারেও অল্পের জন্য লীগে প্রথম হ'তে পারে নি। কাজেই মোহনবাগান ফাইনালে যাওয়ায় সকলেই তাদের ওপর খুব আশা রেখেছিল। তারা যে শেষ খেলায় ওভাবে হারবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। লীগ ও শীল্ড—দু'টোতেই তারা এবার রানার্স্ আপ্ হ'ল। লীগ গিরই তারা বোম্বাই যাবে রোভার্স্ কাপে খেলতে।

এরিয়ান্সের এই মহাসম্মান লাভে আমরা আন্তরিক আনন্দিত হয়েছি। এরিয়ান্স আর মোহনবাগান এ দু'টিই হচ্ছে সব চেয়ে প্রাচীন নাম-করা ভারতীয় দল। এরিয়ান্স ক্লাব্ আজ ৫৩ বছর ধরে খেলে আসছে। যদিও ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তারা এত বড় কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি, এবং এবারেও লীগে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি—কিন্তু শীল্ডে তারা প্রত্যেকটি খেলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে জয়লাভ করেছে। এত দিন লোকের ধারণা ছিল মোহনবাগান আর মহামেডান্ স্পোর্টিং—ভারতীয় দলের মধ্যে নাম করবার মত দল এই দু'টিই। কারণ শীল্ড বা লীগ্ পাবার সম্মান এরা ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। কিন্তু এরিয়ান্স আই-এফ-এ শীল্ড জিতে দেখিয়ে দিল যে ভারতীয়দের মধ্যে আরও এমন দল আছে যারা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল্ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দখল করতে পারে। এরিয়ান্সের কৃতিত্বে আজ প্রত্যেক বাঙ্গালী গর্ব্ব অনুভবু করবে।

* * *

মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় "ডক্টর অব্ লিটারেচার" উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববাসীর কাছে যে সমাদর পেয়ে আসছেন তার তুলনায় এই বৃদ্ধ বয়সে এই উপাধি লাভ কিছুই নয়—বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথকে উপাধি দিতে

পেরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সম্মানিত হয়েছেন বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বর্ত্তমানে অক্সফোর্ড যাওয়া সম্ভব নয়, তাই শান্তিনিকেতনেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস্ গয়ার ও স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে উপাধি দান করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় হেণ্ডারসন্ সাহেব ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিশিষ্ট গ্র্যাজুয়েট উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উৎসবে যোগদান করেন। বৈদিক মন্ত্র পাঠের পর স্যর মরিস গয়ার লাটিন ভাষায় বক্তৃতা দেন; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ গাউন ও হুড-পরিহিত রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় ছোট একটি বক্তৃতায় তার জবাব দেন।

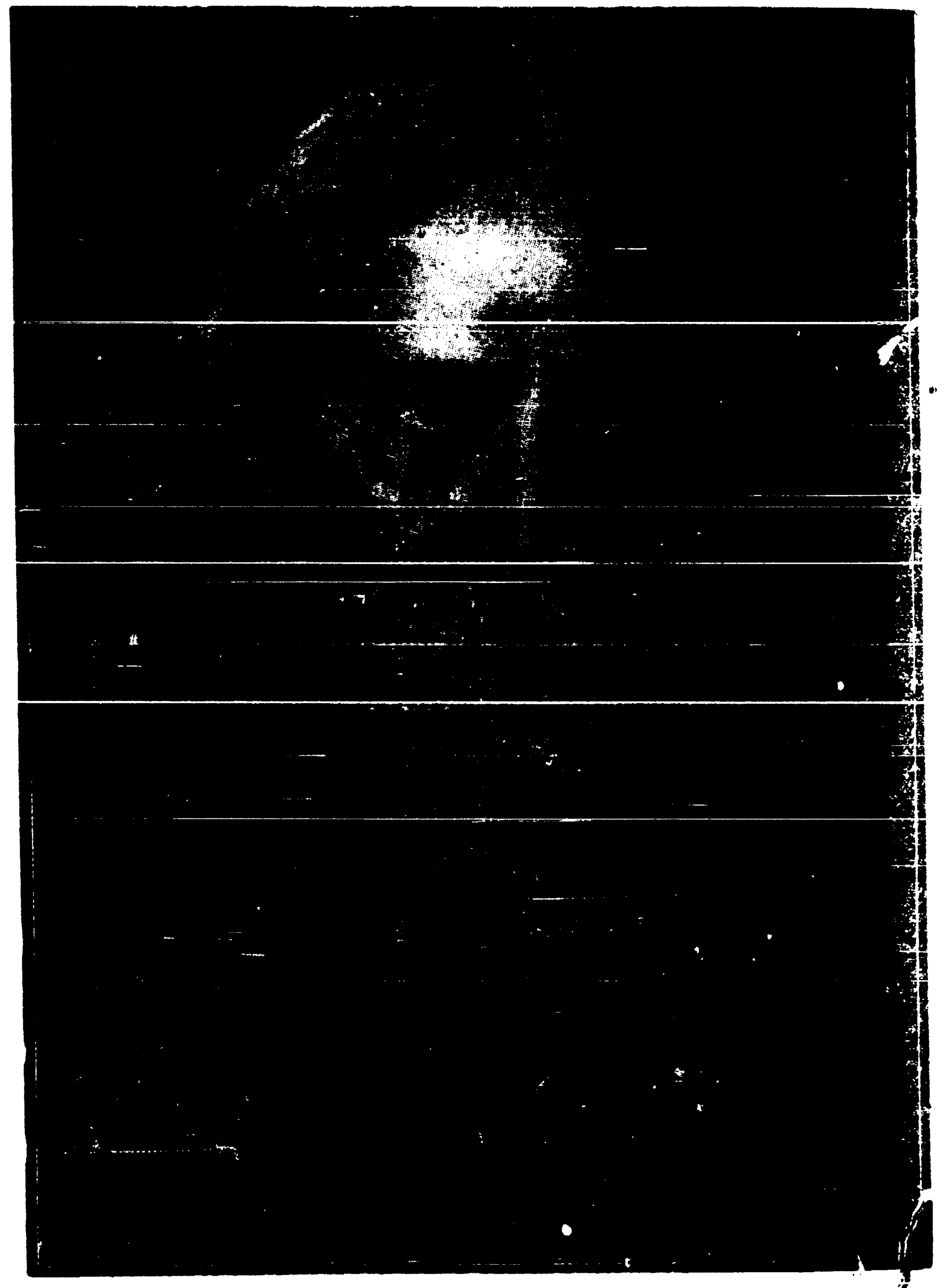

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি. লিট্ (অক্সন্)

পণ্ডিত চাণক্যের সেই শ্লোকটা আজ বার বার মনে পড়ছে—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,
বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

* * *

সম্প্রতি ই. বি. আর লাইনে ঢাকা মেলে আবার এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। গভীর রাত্রে অন্ধকার ঠেলে ডাউন ঢাকা মেল ছুটে আসছিল, কলকাতা থেকে আশী মাইল দূরে জয়রামপুরের কাছে হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়ে এঞ্জিন ও কয়েকখানি বগী নীচে গড়িয়ে পড়ে। কয়েকখানি গাড়ী একেবারে চুরমার হয়ে যায়। ফলে বহু লোক নিহত হয়েছে, বহু লোক ভীষণ ভাবে আহত হয়েছে। বেশী দিন নয়, অল্প কিছুদিন আগে মাজদিয়ায় এই ঢাকা মেলেই আর একবার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটেছিল. সে নিদারুণ ঘটনা এখনও লোকে ভুলতে পারে নি। আশা করি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ভাল করে তদন্ত করবেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

অক্ষরগুলি এই রকম ভাবে বদলা-বদলি করা হয়েছে—

ক = চ, ম = ত, অ = ই, উ = এ, ল = শ, ব = ন, প = র।

পাঠোদ্ধার করলে এই রকম দাঁড়াবে—

কলিকাতায় এবার ভীষণ গরম। ঢাকাও তথৈবচ। চল, পুরী বা শিলং যাই; নচেৎ এখানে মারা পড়িব। বর্ষাকাল পড়িতে চলিল, এতটুকু জল হইল না। এ ভাবে কি মানুষ টিকিতে পারে?

উত্তরদাতাদের নাম

রত্না দেবী (পাটনা); সতী, লক্ষ্মী, করুণা, রেণুকা মৈত্র (রাজসাহী); সৌরেন ঘোষ (খুলনা); ডলি বসু (কলিকাতা); সুনন্দা সেন (বরিশাল); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); অরুণা সেন (কলিকাতা); তৃপ্তি সেন (মজঃফরপুর); দীপালি রায় ও মানসরঞ্জন গুপ্ত (জলপাইগুড়ি); সীতা বসু (কলিকাতা); ছবি রায় (নিউ দিল্লী); চণ্ডী, জবা, কুন্দ (দানাপুর); রীণা রায় (টালীগঞ্জ); শক্তিরাম মুখোপাধ্যায় (নসিগ্রাম); বাণী, কিকি, খোকা, উমা, বুলি, বাবলু ও অধীরদা (চাইবাসা); গুরুদাস, শীতল, সুজাতা (শ্রীরামপুর); রামেন্দু

দাশগুপ্ত ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (কলিকাতা); কালিদাস ২ (বালুভরা); সত্যনারায়ণ ও লীলা লাহিড়ী (ময়মনসিংহ); হিমাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমসেদপুর); মীরা ও শান্তি চ্যাটার্জ্জী (খড়দা); লীলা দাশ (কুমিল্লা); অঞ্জলি, তুলু, মিঠু, শ্যামল, বাচ্চু, নীলা মাসী, হেলা মাসী, খেলা মাসী, দিলু মাসী ও ন' মাসী (কলিকাতা); লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি (পাটনা); কুট্টু, বাচ্চু (ধুবড়ী), অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর); আব্দুর রশিদ মোল্লা ও আতাউর রহমান (লাকপুর সিমুলিয়া); গৌরাঙ্গ-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); দেবশরণ, অনিলশরণ, সত্যশরণ, উমা দেবী, মায়া দেবী ও আশুতোষ চৌধুরী (কদমকুঁয়া); রতন, ছুটু, তুপু, বোম্বা, খুকু (ভবানীপুর); বড়দি, মেজদি সেজদি, চাঁদু ও দীপা (পাটনা); মালবিকা, মাধবিকা, মণিলাল ও মুকুলিকা দত্ত (চাটগাঁ্দিল); ইন্দ্রাণী রায় (পাটনা); শুভাশীষ সরকার (বরিষা); শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য (মথুরা); প্রণিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); পীণ্ট, উষা, উমা, আভা, সমর, সুবীর, রুবি, রেখা ও ডলি; কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); সবিতা, মাধুরী, বিজু, সুজাতা (রমনা); রামপ্রসাদ কুশারী (ভক্ত) (কুমিল্লা); সুবীর বসু ও সুপ্রিয়া বসু (ছাপরা); কমলা দেবী (বিহট, মুঙ্গের); শ্যামসুন্দর মাইতি (কোলাঘাট); ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ (দিনাজপুর); চিত্রলেখা নিয়োগী (কুদ, কাশ্মীর); কল্যাণব্রত, পুণ্যব্রত, প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত (বর্দ্ধমান); মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); নূরজাহান বেগম (ঢাকা)।

নূতন ধাঁধা

নীচে যে শব্দগুলি রয়েছে সেগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে তাদের জায়গায় ঠিকমত এক-একটি প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসাতে পারলেই কতকগুলি ঐতিহাসিক নাম পাবে।

(১) বর্ণ বিশেষ বর্ণ অরি

(২) রত্নাকর অপ্রকাশিত

(৩) অথবা শ্রেষ্ঠ

(৪) শান্তি নিক্ষেপ কর

(৫) ক্ষতি শক্তি

(৬) আমার মুকুট তালুক

(৭) যুদ্ধ জয় পদবী বিশেষ

(৮) স্ত্রী

[সবগুলির উত্তর পাঠাতে হবে।]

শক্তি

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

সি. এইচ্, আরাণ এণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বের ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৭ { ৯ম সংখ্যা

বিস্কুটের দেশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাকীস্থান কি শিখিস্থান কি টিকিস্থান এ নয়,
বিস্কুটের এ বসতভূমি, রাষ্ট্র জগৎময়।
সেথায় থাকে মধুর প্রিয় বন্ধুরা আমার—
জেকব, লিলি, বৃটানিয়া, হাণ্টলী পামার।
সে দেশে যে ফেল্‌বে বোমা রক্ষা নাহি তার,
ষ্টেলিন, রেনোঁ, মুসোলিনী, হ'ক না সে হিটলার।
সে দেশে যে বাসের আরাম বল্‌বো কি ফুটে!
ইট, টালি সব সারকাস্ এবং ন'ইস্ বিস্কুটে।

শক্তি

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

সি. এইচ্. আরাণ এণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৭ | ৯ম সংখ্যা

বিস্কুটের দেশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাকীস্থান কি শিখিস্থান কি টিকিস্থান এ নয়,
বিস্কুটের এ বসতভূমি, রাষ্ট্র জগৎময়।
সেথায় থাকে মধুর প্রিয় বন্ধুরা আমার—
জেকব, লিলি, বৃটানিয়া, হাণ্টলী পামার।
সে দেশে যে ফেল্‌বে বোমা রক্ষা নাহি তার,
ষ্টেলিন, রের্নো, মুসোলিনী, হ'ক না সে হিটলার।
সে দেশে যে বাসের আরাম বল্‌বো কি ফুটে!
ইট, টালি সব সারকাস্ এবং নাইস্ বিস্কুটে।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

ঘরে থেকে কোন ক্রমে একটু হলে বা'র
দু' ধারেতে ডাক্‌বে খেতে টাট্‌কা ক্রীম ক্র্যাকার।
বহে সেথা ক্ষীরের নদী, পড়্‌লে পরে হিম
জমে আহা হয়ে ওঠে তোফা আইস্‌ক্রীম !
মিষ্টি লজেঞ্চুষের মত ঘুটিং সেখানকার,
কেক্‌, পুডিংএর উপদ্রবে টিকে থাকাই ভার।
নিত্য সেথায় চকোলেটের নূতন নূতন ভেট,
প্রবেশ নিষেধ বিঁড়ি, চুরুট কিংবা সিগারেট।
ঝগড়া-ঝাঁটি নাই সেথা, নাই দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার রাজ্য নিরামিষ।
জাপান সেথা চা পানেতে চীনকেও দেয় ডাক
নেচে বৃটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স দেয় লাগিয়ে তাক্‌।
দেশটী বড়ই সুখের সত্য আনন্দেরি ধাম—
জিহ্বা এবং দন্ত শুধু পায় না ক' বিরাম।

কবিকিশোর

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্‌.এ

সাপ, বান, পুকুর আর ইস্কুল

আমার শৈশবের বিচিত্র দিনগুলি আমি আমার ছোট গ্রামে কাটিয়েছি। আমাদের গ্রামটি দরিদ্র কৃষিপ্রধান গ্রাম। বেশীর ভাগই চাষাভুষো। তা'দেরই ছোট ছেলেরা ছিল আমার সঙ্গী। বিকালের দিকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার খেলাধূলা হ'ত। বাবার একটা সুন্দর সাদা ঘোড়া ছিল। তা'রই পিঠে আমাকে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত। বনে বনে, মাঠে মাঠে খানিকক্ষণ ঘু[illegible] আসা হ'ত। অনেক দিন অভ্যেস করার পরও ভালো ঘোড়ায় চড়া আমার দ্বারা

সম্ভব হ'ল না। সুতরাং খালি পায়েই বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। গ্রামের চারিদিকেই বন। সাপের ভয় খুবই ছিল।

মাঝে মাঝে বেদেরা এসে মাটীর বাড়ী খুঁড়ে খুঁড়ে সাপ বা'র কর্‌ত। বেশীর ভাগই গোখ্‌রো সাপ। আমাদের দেশে গোখ্‌রোকে গোখ্‌রো না ব'লে বলে 'খরিস'। 'খরিস' শব্দটা শুনেই আমার ভয় হ'ত। মনে হ'ত চোখের সাম্‌নে প্রকাণ্ড ফণা বা'র ক'রে খরিস তুল্‌ছেন। বেদেরা সুর ক'রে ক'রে মন্ত্র পড়্‌ত, মাঝে মাঝে বাঁশী বাজ্‌ত; আমরা মুগ্ধ হ'য়ে দেখ্‌তাম। আরও নানান্ ধরণের সাপ আমাদের দেশে—গোসাপ, সোনা গোসাপ, ঢোঁড়া, জলঢোঁড়া, আল্‌কেউটে, উদ্‌[illegible]কাল, লাউডগা, ঢেঁড়স—এমনি নানান্ ধরণের সাপ। আমাদের বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে একটা অতিপ্রাচীন গোসাপ আছে। তা'কে ছোট বয়সেও দেখেছি, এখনো মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই। সকালবেলায় সে মাছের আঁশ, এঁটো পাতার নানা রকম ফেলে দেওয়া খাবার খেতে আসে। প্রকাণ্ড গোসাপ,—সে যদি জঙ্গলে প'ড়ে থাকে, মনে হ'বে একটা ছোটখাটো কাঠ বা গুঁড়ি প'ড়ে আছে।

বর্ষার বানের জলে মাঠের যত সাপ সব গ্রামে চ'লে আস্‌ত। গ্রামটা একটু উঁচু জায়গায়। সেইজন্যেই সাপগুলো উঠে আস্‌ত ডাঙায়। আর, আহারও জুটত বেশ। বর্ষার অসংখ্য ব্যাঙ, ইঁদুর, পোকামাকড়, মাছ ইত্যাদি—এই ত' তা'দের আহার। খুব ভয়ে ভয়েই থাক্‌তে হ'ত। একদিন শুন্‌লাম ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে, খরিস বা গোখ্‌রো সাপ বেরিয়েছে। বেদেরা এসেছে সাপ ধর্‌তে। আমরা ক'জনে ছুট্‌লাম সাপ-ধরা দেখ্‌তে। ছুটে ছুটে এসে দেখি, লোকে লোকারণ্য। ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে বেদে সাপ ধর্‌ছে। সমস্ত পিঁড়ে (চাতাল বা দালান) তা'রা শাবল দিয়ে খুঁড়ে ফেলেছে। ঘরের দেওয়াল তা'রা খুঁড়ে ফেলেছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তখনো খুঁড়্‌ছে দেখ্‌লাম। উঠোনে তা'দের বড় বড় সাপবোঝাই ঝুড়ি [illegible]ামানো আছে। ছেলেয় বুড়োয় উঠোন ভর্‌তি। এমন সময় সবাই চেঁচিয়ে উঠে বল্‌ল, 'সরো সরো সব, সাপ ধরেছে রে, ঐ দেখো।'

আমরা তাড়াতাড়ি পাঁচীলের দিকে স'রে এলাম। এসে দেখি তা'রা একটা

ঢাকনি-দেওয়া কলসী নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেল, 'সাপ ধরেছে, সাপ ধরেছে।'

* * তা'রা খানিকটা বিশ্রাম কর্‌ল। তার পর দুপুরের চড়া রোদে তা'রা অনেক অসম্মতি জানিয়েও সেই নতুন সাপ খেলা'তে আরম্ভ কর্‌ল। কলসী থেকে প্রকাণ্ড ফণা বা'র ক'রে সেই সাদা খরিস গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। তা'র রাগ আর কোঁস্‌ফোঁসানি দেখে সবাই ভয় পেয়ে বল্‌ল, 'ও সাপ ঢেকে ফেলো'। কিন্তু বেদে সহজে দম্‌বার পাত্র নয়। হাত মুঠো ক'রে সে যত মন্ত্র জান্‌ত সব আউড়ে সাপ খেলা'তে লাগ্‌ল। চক্ষের পলকে কি যে ঘটে গেল আমরা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। চেয়ে দেখি বেদের হাঁটু দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সাপ তাড়াতাড়ি সে কলসীতে ঢেকে ফেল্‌ল। চড়া দুপুর রোদে তা'র হাঁটুর সেই রক্ত এখনো আমার মনে আছে। তার পরে শুন্‌লাম, সেই বেদে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে মারা গেছে মাঠে। কিছুদিন পরে শুন্‌লাম বেদেরা তা'কে মাঠের মধ্যে ফেলে তা'র হাঁটুর উপরে তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে অনেক মন্ত্র আউড়ে সারিয়ে তুলেছে।

এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘট্‌ত আমাদের দেশে। প্রায় প্রত্যেক বছরেই দুটো একটা লোক মারা যেত আমাদের গ্রামে সাপের কামড়ে। সাপের কামড়ের কোনো ওষুধ নেই—এটা ভেবে মনটা দুঃখিত হ'ত সেই বয়সে, এবং এখনো হয়, কারণ সাপের কামড়ের ওষুধ বোধ হয় এখনো নেই!

*

একদিন সন্ধ্যের দিকে আমরা কয় ভাইবোনে কড়ো কড়ো ভাত খাচ্ছি। এমন সময় একটি লোক ছুটে এসে বল্‌ল, 'ভাই, দেখ্‌বে এস, বান আস্‌ছে।' বান যে কি জানোয়ার, তা' আমরা বুঝি না, কখনো দেখি নি বান এর আগে। তবু, ভাত ফেলে রেখে আমরা ছুট্‌লাম সেই লোকটির পিছু পিছু; গিয়ে দেখি গাঁয়ের উত্তর সীমায় যে বড় পুকুর, কলু-গর্ত্ত তা'র নাম, তা'র পশ্চিম দিকে সে এক ভীষণ ব্যাপার! উঁচু মাঠ ছাপিয়ে জলস্রোত নেমে আস্‌ছে পুকুরে, পশ্চিম আকাশের অল্প লাল আভা সেই জলস্রোতের উপর এসে পড়েছে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগ্‌লাম—মনে হ'ল যেন প্রকাণ্ড একটা অদৃশ্য পিপে থেকে তেলের মত ক্রমাগত

কি যেন গড়িয়ে পড়্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কলু গর্ত্ত ভ'রে এল ঘোলা জলে। সেই লোকটি বল্‌ল, 'এক্ষুণি রাস্তাঘাট সব ডুবে যা'বে, চলো পালিয়ে বাড়ী যাই।'

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাস্তাঘাট সব ডুবে গেল। বানের জল সমস্ত মাঠ ভাসিয়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে এসে একটা বড় নালি দিয়ে সবেগে আমাদের পুকুরে এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমরা বল্‌লাম, 'সব গঙ্গা হ'য়ে যাচ্ছে রে!' আর সত্য সত্যই তাই। ডোবা-পুকুর-খাল-বিল—সব তখন গঙ্গা হ'য়ে গেছে। সাদা ঘোলা জল চারিদিকে থৈ-থৈ কর্‌ছে। নৌকো চল্‌তে লাগ্‌ল।

* * কোথা থেকে জানি না, সব বড় বড় রুই কাৎলা পুকুরে এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল লাফিয়ে। আমরা অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। আর আমাদের চোখের সাম্‌নে অসংখ্য মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে এসে পুকুরে পড়্‌ল। তা'দের পিছল সাদা দেহগুলি মুহূর্ত্তের জন্য শূন্যে একবার লাফিয়ে উঠেই পরক্ষণেই খানিকটা জল আবর্ত্তিত ক'রে পড়্‌ল পুকুরে। আর, বড় বড় লম্বা লম্বা ঘাস, উলুখড়, কাশের বন—তা'দের উপর নত হ'য়ে পড়েছে কলার পাতাগুলি—এ সবের পিছনে নারকেলের বাগান, আর তা'র পিছনে সমস্ত মাঠময় বান।

আমাদের সারা দিনরাত বাড়ীতেই থাক্‌তে হ'ত। বন্দী দশায় মন কেমন কর্‌ত। শুধু খেলা হ'ত, মাছ ধরা ধরা খেলা—মেজদি'তে আমাতে। পুকুরে স্নান কর্‌বার সময়ে আমরা দু'জনে মাছ ধর্‌তাম—কুচো ছোট ছোট মাছ—গামছা দিয়ে। এই ছিল একমাত্র খেলা। একদিন দেখি রণী দা' (রণীদা' আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌ত) এক গাদা পুঁটি, মৌরলা, ছোট ছোট চিংড়ী বানের জল থেকে ধ'রে নিয়ে এসেছে। মা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'মা, এত মাছ কি হ'বে?'

মা কি উত্তর দিয়েছিলেন, মনে নেই। কিন্তু এখন আমার একটি বারিসিক্ত, সজলগন্ধভারাতুর স্নিগ্ধ মেঘল দিনের কথা মনে পড়ে। আর, সে সব দিনগুলিকে স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। কোথাও ছিল না কোনো অভাব! প্রচুর মাছ, প্রচুর দুধ, আর প্রচুর আউস ধানের মোটা মোটা লাল চালের ভাত।

* * রণীদা' আর একদিন একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ ধ'রে নিয়ে এল পুকুর থেকে। সমস্ত শরীরটা তা'র লাল হ'য়ে গেছে—মুখের পাশ থেকে খানিকটা রক্ত

বা'র ক'রে মাছটা উঠোনে প'ড়ে লাফাতে লাগ্‌ল। বাবা বাড়ীতে ছিলেন। বাবার গলার সাড়া পেয়ে রণীদা ভয়ে মাঠের দিকে দিল দৌড়। বাবা বক্‌তে বক্‌তে বাইরে বেরিয়ে এসে মাছটা পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এলেন। পুকুরের মাছগুলো তাঁ'র অত্যন্ত প্রিয়। কাউকে ধর্‌তে দিতেন না তিনি সে সব মাছ।

* * এই সময়টায় বোধ হয় গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি হ'লাম। ক্রোশ খানেক পথ হেঁটে ইস্কুল যেতে হ'ত। মেজদি' পড়াশুনো ছেড়ে দিল। তা'র বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল পাকাপাকি রকম। আমাদের পাঠশালায় বেঞ্চি ছিল না। পাত্‌তাড়ি বগলে ক'রে, হাতে দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলিয়ে যেতে হ'ত পাঠশালায়। ছোট ছোট চাটাইএর আসন—তা'রি উপর বস্‌তে হ'ত। পাঠশালায় সুর ক'রে নাম্‌তা পড়তাম। আর সকালবেলায় যেতে হ'ত সেখানে, আস্‌তে হ'ত দুপুরে। দুপুরে রোদে পথ হাঁটতে কষ্ট হ'ত। মা আমাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে নিলেন।

* * তার পরে, আবার একটা মুক্তির হাওয়া। মেজদি'র তখন বিয়ে হ'য়ে গেছে। সে অত ছোট বয়সে এক গা গয়না প'রে তা'র শ্বশুরবাড়ীর কথা সালঙ্কারে এক ঘর লোকের সাম্‌নে ব'লে যেত। খানিকটা আব্‌ছা অন্ধকার। যাঁরা তা'র কথা শুন্‌তেন সাগ্রহে তাঁদের অস্পষ্ট মূর্ত্তিগুলি মনে পড়ে। মেজদি'র চালচলন দেখে তা'র কথাবার্ত্তা শুনে মনে হ'ত, ও তা'র এক গা গয়না নিয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অন্য মানুষ হ'য়ে গিয়েছে; ওর সঙ্গে আর আমার জম্‌বে না।

* * আবার আমি একা পড়লাম। ভেতরে ভেতরে শুন্‌তে পেলাম আমার ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় হ'য়েছে। আমাকে নবদ্বীপ যেতে হ'বে। এ ব্যাপারটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কি ক'রে বাগান, পুকুর, মাঠ, বাড়ী ছেড়ে যা'ব—এই কথা ভাব্‌তেই মনে কষ্ট হ'ল, চোখে জল এল। মনে আছে, আমাদের পুকুরের ধারে দু'টো কামিনীফুলের গাছ ছিল। সেখানে চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক্‌তাম। টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে ফুলগুলো খ'সে খ'সে পড়্‌ত। আর সেই শান্ত তপোবনশ্রীর দিকে চেয়ে আমার মন কেমন কর্‌ত। পুকুরের জলের উপর হাওয়া ব'য়ে যেত, তা'র সেই স্নিগ্ধ রূপটির দিকে চেয়ে মনে হ'ত, তোমাকে দূরে রেখে আমি থাক্‌ব কি ক'রে? একটা আসন্ন বিরহ অনুভব করতাম। আমার প্রায় নিঃসঙ্গ শৈশব

এদের সান্নিধ্য অনুভব ক'রে আনন্দ পেত সন্দেহ নেই। বোধ হয় কষ্টটাও সেইজন্যে; আত্মীয় বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব কর্‌তাম। সে সময়ে কোন্‌ বইতে বোধ হয় প'ড়েছিলাম কবি হেমচন্দ্রের 'সরোবর' ব'লে একটি কবিতা—

"কত মনোহর ছিলি সরোবর
যবে হৃদি 'পরে তোর,
আলো করি' জল ফুটিত কমল
কিরণে রাঙিতে তোর।"

পুকুরের ধারে ব'সে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতাম মনে মনে। আর সেই অচেনা নবদ্বীপের ইস্কুলের কথা মনে ক'রে আসন্ন বিদায়-দুঃখে মন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ত।

প্রথম পর্ব্ব

দ্বিতীয় পর্ব্ব

তৃতীয় পর্ব্ব

টৌট্‌কা বনাম টিক্‌টিকি

শ্রীকুঞ্জনাথ

ভুতো বল্‌লে, 'নাঃ! এ অপমান অসহ্য। এর শোধ আমি নেব নেব নেব। বুঝলি ট্যাংরা? হ্যাঁ—তবে আমার নাম ভূতনাথ। কালই হতভাগার টেকো মাথার চাঁদিতে য়্যায়সা পাটকেল ঝাড়ব যে তিনটি দিন বাছাধনকে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে হবে, বুঝলি?'

ট্যাংরা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। মস্ত একটা নিঃশ্বাস্ ফেলে শুধু বল্‌লে, 'কাঁকড়া-বিছের লেজ কোথায় পাওয়া যায় রে?'

পায়ের কাছে বোমা ফাটিয়ে দিলেও ভূতো হয়ত এমন চমকে উঠত না; অবাক্ হয়ে বল্‌লে, 'কি বল্‌লি? কাঁকড়া-বিছে? কি হবে?'

ট্যাংরা গম্ভীর চালে বল্‌লে, 'লেজটা নেংটে-ইঁদুরের লোমের সঙ্গে পুড়িয়ে সেই ছাই যার চোখে ছিটিয়ে দিবি সে আর কথাটি কইবে না।'

শুনে ভূতো দুই চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, 'একদম অক্কা?'

ট্যাংরা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, 'ধ্যেৎ! তা নয়। হাজার শত্রুতা থাকলেও রাগ একেবারে জল হ'য়ে যাবে। আশ্চর্য্য ওষুধ। করিম মিঞা আমাকে নিজে বলেছে।'

কিন্তু এ-সব ওষুধ-বিষুধের ওপর ভূতনাথের বড় একটা বিশ্বাস ছিল না; বল্‌লে, 'কিন্তু যাই বলিস ট্যাংরা, টেকোর ওষুধই হচ্ছে পাটকেল। কিচ্ছু না, সন্ধ্যেবেলা রাস্তার ধারের নিমগাছটার ওপর হুতুম-থুমো হ'য়ে ঘাপটি মেরে থাকো, ও-ব্যাটা ডাবা হুঁকোয় তামাকটি চড়িয়ে বারান্দায় এসে বসুক,—অমনি আর কি, মা কালীর নাম নিয়ে টাক তাগ্ ক'রে—ব্যস।'

ভূতনাথের এমন জমকালো বর্ণনাটা শেষ হ'ল না; ভয়ানক বিরক্ত হ'য়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ট্যাংরা ধমকে উঠল, 'অমনি ব্যস্! তোর মুণ্ডু! বেশী বকিস নে, যাঃ।'

গোবর্দ্ধন বাগচী মোক্তার। লোকে বলত সাক্ষী ঘামাতে তাঁর জোড়া নেই, বাড়ীর কাক-চিলগুলো ভাবত—হ্যাঃ, গলা বটে! মোট কথা গোবর্দ্ধনের একমাত্র জোরই ছিল এই গলার জোর,—তা সে ঘরেই হোক, আর বাইরেই হোক। দেখতে দেখতে ছেলে-মহলে তাঁর নতুন ক'রে নাম-করণ হ'ল—গর্জ্জন বাগচী। বেঁটে, মোটা; গলায় কণ্ঠি, মাথায় টাক, মুখে খ্যাংরার মত গোঁফ—গোবর্দ্ধন বাগচী হ'য়ে উঠলেন ছেলেদের যম। ছেলেরাও মজা পেয়ে গেল।

কারণে অকারণে এই বদ্-মেজাজী লোকটাকে চটিয়ে তারা আমোদ করতে লাগল। ক্রমে একদিন ব্যাপারটা হ'য়ে উঠল গুরুতর। গোবর্দ্ধনের বাড়ীর পাশেই ছোট্ট একফালি মাঠ,—ছেলেদের খেলার মাঠ। সেদিন গোবর্দ্ধনের মেয়ের পাকা দেখা। ভেতরের বারান্দায় পরিপাটি ক'রে জায়গা ক'রে ভাবী বেয়াই আর জামাইকে খেতে বসানো হয়েছে, মেয়ে চিংড়ি ওরফে লীনা বাগচী নিজের হাতে পরিবেশন ক'রে খাওয়াচ্ছে, গোবর্দ্ধন দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন,—এ হেন সময় ঘটল বিপর্য্যয় কাণ্ড। গোবর্দ্ধনের স্ত্রী গোবর্দ্ধনের ডবল মোটা; তাড়াতাড়িতে সময় পান নি ব'লে বারান্দার এক কোণে একটু আড়ালে ব'সে আধ্-কোটা রুই মাছটা কেটে শেষ করছিলেন, হঠাৎ কোত্থেকে এক ফুটবল্ এসে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর। আন্নাকালী লাফিয়ে উঠলেন। একটা বেড়াল অনেকক্ষণ থেকেই ওৎ পেতে ছিল, মাছের লেজটা মুখে তুলেই সে পথ খুঁজতে লাগল। আন্নাকালী 'হিস্' ক'রে পায়ের লাথি দিয়ে তাকে তাড়াতে গেলেন, কিন্তু বেড়াল তখন স'রে পড়েছে, লাথিটা পড়ল ফুটবলের ওপরেই। তার পরেই আন্নাকালী চিৎপাৎ হ'য়ে সদরে আত্মপ্রকাশ করলেন। এদিকে ফুটবল্‌টা আন্নাকালীর কিক্ খেয়ে একেবারে বেয়াইয়ের মাথার ওপরেই পড়ে আর কি! ভাবী জামাই রাইট্-আউটের বাঘা খেলোয়াড়, বরাবর কর্ণার কিক্-এ হেড্ ক'রে গোল দেয়; চট্ ক'রে সে ছোকরা উঠে দাঁড়িয়ে বাতাসে একবার মাথা ঠুকে দিলে। তৎক্ষণাৎ বল্‌টা ঘুরে গিয়ে চিংড়ির পিঠের ওপর দুম্ ক'রে পড়তেই চিংড়ি হঠাৎ খ্যাক্ ক'রে একটা আওয়াজ ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল; গড়াতে গড়াতে বল্ এসে পড়ল গোবর্দ্ধনের পায়ের গোড়ায়।

গোবর্দ্ধন এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে এই ঘোরতর অসামাজিক ফুটবল্ ম্যাচ্ দেখছিলেন আর কারণটা ঠিক অনুমান করতে না পেরে একবার স্ত্রীর দিকে, একবার হবু-জামাইয়ের দিকে আর একবার মেয়ের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চাইছিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ এমন ক'রে থাকতে হ'ল না; হঠাৎ একপাল ছেলের হট্টগোল শুনে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ছেলের দল দেখে গোবর্দ্ধনের মেজাজ টঙ্কার দিয়ে উঠল; দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি চাই?'

ট্যাংরা এগিয়ে এসে বল্‌লে, 'আমাদের বল্‌টা স্যর, হঠাৎ পাঁচীল ডিঙিয়ে—' গোবর্দ্ধন গর্জ্জে উঠলেন, 'বটে? ভজা!'

ভজহরি নিশ্চিন্ত মনে পাশে দাঁড়িয়ে কলকেয় ফুঁ দিচ্ছিল, হঠাৎ কানের কাছে মাইন ফাটার শব্দে চম্‌কে উঠতেই কলকেটা শূন্যের ওপর একটা ডিগবাজী খেয়েই মাটি নিলে; টিকের আগুন ছিটকে পড়ল গোবর্দ্ধনের টাকে। ব্যস্—আর যায় কোথায়! এক হাতে ট্যাংরার আর এক হাতে ভজহরির কান ধ'রে গোবর্দ্ধন দু'জনের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করতে লাগলেন। গোবর্দ্ধনের গর্জ্জন শুনে ভেতর থেকে হবু-বেয়াই ছুটে এলেন; কিন্তু ছাড়ানো কি যায়!

টৌট্‌কা বনাম টিক্‌টিকি

শ্রীকুঞ্জনাথ

ভূতো বল্‌লে, 'নাঃ! এ অপমান অসহ্য। এর শোধ আমি নেব নেব নেব। বুঝলি ট্যাংরা? হঁ্যা—তবে আমার নাম ভূতনাথ। কালই হতভাগার টেকো মাথার চাঁদিতে য়্যায়সা পাটকেল ঝাড়ব যে তিনটি দিন বাছাধনকে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে হবে, বুঝলি?'

ট্যাংরা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। মস্ত একটা নিঃশ্বাস্ ফেলে শুধু বল্‌লে, 'কাঁকড়া-বিছের লেজ কোথায় পাওয়া যায় রে?'

পায়ের কাছে বোমা ফাটিয়ে দিলেও ভূতো হয়ত এমন চমকে উঠত না; অবাক্ হয়ে বল্‌লে, 'কি বল্‌লি? কাঁকড়া-বিছে? কি হবে?'

ট্যাংরা গম্ভীর চালে বল্‌লে, 'লেজটা নেংটে-ইঁদুরের লোমের সঙ্গে পুড়িয়ে সেই ছাই যার চোখে ছিটিয়ে দিবি সে আর কথাটি কইবে না।'

শুনে ভূতো দুই চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, 'একদম অক্কা?'

ট্যাংরা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, 'ধ্যেৎ! তা নয়। হাজার শত্রুতা থাকলেও রাগ একেবারে জল হ'য়ে যাবে। আশ্চর্য্য ওষুধ। করিম মিঞা আমাকে নিজে বলেছে।'

কিন্তু এ-সব ওষুধ-বিষুধের ওপর ভূতনাথের বড় একটা বিশ্বাস ছিল না; বল্‌লে, 'কিন্তু যাই বলিস ট্যাংরা, টেকোর ওষুধই হচ্ছে পাটকেল। কিচ্ছু না, সন্ধ্যেবেলা রাস্তার ধারের নিমগাছটার ওপর হুতুম-থুমো হ'য়ে ঘাপটি মেরে থাকো, ও-ব্যাটা ডাবা হুঁকোয় তামাকটি চড়িয়ে বারান্দায় এসে বসুক,—অমনি আর কি, মা কালীর নাম নিয়ে টাক তাগ্ ক'রে—ব্যস।'

ভূতনাথের এমন জমকালো বর্ণনাটা শেষ হ'ল না; ভয়ানক বিরক্ত হ'য়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ট্যাংরা ধমকে উঠল, 'অমনি ব্যস্! তোর মুণ্ডু! বেশী বকিস নে, যাঃ।'

গোবর্দ্ধন বাগচী মোক্তার। লোকে বল্‌ত সাক্ষী ঘামাতে তাঁর জোড়া নেই, বাড়ীর কাক-চিলগুলো ভাবত—হঁ্যাঃ, গলা বটে! মোট কথা গোবর্দ্ধনের একমাত্র জোরই ছিল এই গলার জোর,—তা সে ঘরেই হোক, আর বাইরেই হোক। দেখতে দেখতে ছেলে-মহলে তাঁর নতুন ক'রে নাম-করণ হ'ল—গর্জ্জন বাগচী। বেঁটে, মোটা; গলায় কণ্ঠি, মাথায় টাক, মুখে খ্যাংরার মত গোঁফ—গোবর্দ্ধন বাগচী হ'য়ে উঠলেন ছেলেদের যম। ছেলেরাও মজা পেয়ে গেল।

কারণে অকারণে এই বদ্-মেজাজী লোকটাকে চটিয়ে তারা আমোদ করতে লাগল। ক্রমে একদিন ব্যাপারটা হ'য়ে উঠল গুরুতর। গোবর্দ্ধনের বাড়ীর পাশেই ছোট্ট একফালি মাঠ,—ছেলেদের খেলার মাঠ। সেদিন গোবর্দ্ধনের মেয়ের পাকা দেখা। ভেতরের বারান্দায় পরিপাটি ক'রে জায়গা ক'রে ভাবী বেয়াই আর জামাইকে খেতে বসানো হয়েছে, মেয়ে চিংড়ি ওরফে লীনা বাগচী নিজের হাতে পরিবেশন ক'রে খাওয়াচ্ছে, গোবর্দ্ধন দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন,—এ হেন সময় ঘটল বিপর্য্যয় কাণ্ড। গোবর্দ্ধনের স্ত্রী গোবর্দ্ধনের ডবল মোটা; তাড়াতাড়িতে সময় পান নি ব'লে বারান্দার এক কোণে একটু আড়ালে ব'সে আধ্-কোটা রুই মাছটা কেটে শেষ করছিলেন, হঠাৎ কোত্থেকে এক ফুটবল্ এসে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর। আন্নাকালী লাফিয়ে উঠলেন। একটা বেড়াল অনেকক্ষণ থেকেই ওৎ পেতে ছিল, মাছের লেজটা মুখে তুলেই সে পথ খুঁজতে লাগল। আন্নাকালী 'হিস্' ক'রে পায়ের লাথি দিয়ে তাকে তাড়াতে গেলেন, কিন্তু বেড়াল তখন স'রে পড়েছে, লাথিটা পড়ল ফুটবলের ওপরেই। তার পরেই আন্নাকালী চিৎপাৎ হ'য়ে সদরে আত্মপ্রকাশ করলেন। এদিকে ফুটবল্‌টা আন্নাকালীর কিক্ খেয়ে একেবারে বেয়াইয়ের মাথার ওপরেই পড়ে আর কি! ভাবী জামাই রাইট্-আউটের বাঘা খেলোয়াড়, বরাবর কর্ণার কিক্-এ হেড্ ক'রে গোল দেয়; চট্ ক'রে সে ছোকরা উঠে দাঁড়িয়ে বাতাসে একবার মাথা ঠুকে দিলে। তৎক্ষণাৎ বল্‌টা ঘুরে গিয়ে চিংড়ির পিঠের ওপর দুম্ ক'রে পড়তেই চিংড়ি হঠাৎ খ্যাক্ ক'রে একটা আওয়াজ ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল; গড়াতে গড়াতে বল্ এসে পড়ল গোবর্দ্ধনের পায়ের গোড়ায়।

গোবর্দ্ধন এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে এই ঘোরতর অসামাজিক ফুটবল্ ম্যাচ্ দেখছিলেন আর কারণটা ঠিক অনুমান করতে না পেরে একবার স্ত্রীর দিকে, একবার হবু-জামাইয়ের দিকে আর একবার মেয়ের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চাইছিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ এমন ক'রে থাকতে হ'ল না; হঠাৎ একপাল ছেলের হট্টগোল শুনে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ছেলের দল দেখে গোবর্দ্ধনের মেজাজ টঙ্কার দিয়ে উঠল; দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি চাই?'

ট্যাংরা এগিয়ে এসে বল্‌লে, 'আমাদের বল্‌টা স্যর, হঠাৎ পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে—' গোবর্দ্ধন গর্জ্জে উঠলেন, 'বটে? ভজা!'

ভজহরি নিশ্চিন্ত মনে পাশে দাঁড়িয়ে কলকেয় ফুঁ দিচ্ছিল, হঠাৎ কানের কাছে মাইন ফাটার শব্দে চম্‌কে উঠতেই কলকেটা শূন্যের ওপর একটা ডিগবাজী খেয়েই মাটি নিলে; টিকের আগুন ছিটকে পড়ল গোবর্দ্ধনের টাকে। ব্যস্—আর যায় কোথায়! এক হাতে ট্যাংরার আর এক হাতে ভজহরির কান ধ'রে গোবর্দ্ধন দু'জনের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করতে লাগলেন। গোবর্দ্ধনের গর্জ্জন শুনে ভেতর থেকে হবু-বেয়াই ছুটে এলেন। কিন্তু ছাড়ানো কি যায়!

টানাটানিতে ট্যাংরা হঠাৎ ভুল ক'রে বেয়াইয়ের হাতেই দিলে এক কামড়। গোবর্দ্ধনের রাগ তাতে আরো চড়ে গেল; দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ট্যাংরার মাথায় বসালেন এক পেল্লায় চাঁটি। কিন্তু ট্যাংরা তখন পিছলে পড়েছে, গোবর্দ্ধনের চাঁটি পড়ল হবু-বেয়াইয়ের চাঁদিতে। তার পর কি যে হ'ল তা গোবর্দ্ধনও জানেন না। বিকেলে শুনলেন বিয়ে ভেঙ্গে গেছে।

গোড়ায় ট্যাংরা আর ভূতনাথের গোপন বৈঠক এই উপলক্ষ্যেই।

পর দিন আবার দুই বন্ধুর বৈঠক। অনেকক্ষণ ধ'রে চুপটি ক'রে ব'সে থেকে থেকে শেষে মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে ট্যাংরা বল্‌লে, 'তা হ'লে পারবি নে দিতে, কেমন?'

ভূতনাথ বল্‌লে, 'তুই অবাক্ করলি ট্যাংরা। শেষটা টোট্‌কা দিয়ে গর্জ্জনের তর্জ্জন বন্ধ করতে হবে? সেরা দাওয়াই পাট্‌কেল থাকতে ও-সব টোট্‌কা-ফোট্‌কা কেন বাবা?'

ট্যাংরা বল্‌লে, 'কারণ আছে।'

ভূতনাথ একটু রাগ দেখিয়েই বল্‌লে, 'কারণটা কি, তা বল্‌লে তোমার মহাভারত কি অশুদ্ধ হবে? ভারি মুরুব্বি হয়েছিস যে?'

দস্তুরমত খিঁচিয়ে উঠে ট্যাংরা জবাব দিলে, 'মেলা বকিস নে। গর্জ্জনের বাঘের মত বিলিতী কুকুরটার দুটো জাঁদরেল বাচ্চা হয়েছে, খবর রাখিস?'

ভূতনাথ উৎসাহে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, 'বলিস কি রে?'

ট্যাংরা বল্‌লে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। এর পর যাও না, চটাও গে না গর্জ্জনকে। তিনকড়ি মাষ্টার ওৎ পেতে রয়েছে বাচ্চা দুটোর জন্যে। তার সঙ্গে গর্জ্জনের কি রকম গলায়-গলায় ভাব খবর রাখো?'

শুনে ভূতনাথ ব'সে পড়ল। নাঃ—টোট্‌কা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মুস্কিলে ফেলেছে ওই কাঁকড়া বিছের লেজ।

ভেবে ভেবে ভূতনাথ বল্‌লে, 'আচ্ছা, শুধু কাঁকড়ার হ'লে হয় না?'

ট্যাংরা বল্‌লে, 'ধ্যেৎ; কাঁকড়ার কখনো লেজ হয়?'

ভূতনাথ তবু দমবার নয়, বল্‌লে, 'কিংবা কেঁচো-টেঁচো?'

ট্যাংরা জানালে, 'নাঃ, একেবারে খাঁটি কাঁকড়া বিছেই হওয়া চাই।'

ভূতনাথ আবার ভাবতে বসল। অন্ধকার হয়ে গেছে, বাড়ী ফিরতে হবে। অথচ সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে না পেয়ে হতাশ হ'য়ে ট্যাংরা উঠে পড়ছিল, হঠাৎ ভূতনাথ উৎসাহে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, 'হয়েছে।'

ট্যাংরা আগ্রহে আকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, 'বিন্দী-বুড়ীর গোবর গাদায়, নয়?'

ভূতনাথ বল্‌লে, 'উঁহু।'

ট্যাংরার ভুরু দুটো কুঁচকিয়ে এল; বল্‌লে, 'তবে? ভটচায্‌দের ইটের পাঁজায় তো?'

ভূতনাথ বল্‌লে, 'উঁহু, তাও না। কদমতলার ঘাটে।'

ট্যাংরার উৎসাহে কে যেন জল ঢেলে দিলে; 'বল্‌লে, যাঃ! অত পরিষ্কার জায়গায় কখনো থাকে?'

হাঁটুর ওপর জোরে একটা থাবড়া মেরে ভূতনাথ বল্‌লে, 'থাকতেই হবে। কদমতলায় একটা লোক কাল থেকে ব'সে কি-সব বেচে দেখিস নি? ধনেশ পাখীর ঠোঁট, গো-সাপের পাঁজরার হাড়, তিব্বতী চামচিকের তেল,—দেখিস নি? ওর কাছে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

যুক্তিটা ফেলবার নয়। ট্যাংরা তবু একটুখানি নৈরাশ্য দেখিয়ে বল্‌লে, 'যদি না থাকে?'

ভূতনাথ উত্তর দিলে, 'না থাকে, বল্‌লেই যোগাড় ক'রে এনে দেবে। ওরা ওই সবই তো করে। কিন্তু আমি ভাবছি, ছাইটা গর্জ্জনের চোখে ছিটিয়ে দিতে হবে তো? দেবে কে?'

ট্যাংরা বল্‌লে, 'ও নিয়ে তুই ভাবিস নে ভূতো। তুই কেবল লেজটা এনে দিবি, তার পর আমি দেখে নেব।' একটু থেমে বল্‌লে, 'হুকা-কাশির গল্প পড়েছিস?'

অবাক হয়ে ভূতনাথ বল্‌লে, 'জাপানী ডিটেক্‌টিভ? পড়েছি বৈ কি!'

ট্যাংরা বল্‌লে, 'ব্যস্, তবে আর কি!'

বিরক্ত হয়ে ভূতনাথ বল্‌লে, 'তবে তোর মাথা। সত্যি-সত্যিই তো আর ওই নামে অমনধারা লোক কেউ নেই যে তাকে ধরবি। ও তো গল্প!'

ভারিক্কি চালে ট্যাংরা জবাব দিলে, 'আসলে ও লোকটার কেরামতি আমি সব ধ'রে ফেলেছি, বুঝলি ভূতো! কিচ্ছু না, স্রেফ মাথা খাটানো। দেখবি এখন কাণ্ডটা।'

শনিবার; অমাবস্যা। রাত্তির আটটা বাজতে সতেরো মিনিট বাকি। গোবর্দ্ধন বাগচী বৈঠকখানায় ব'সে তামাক টানছেন, পাশে ব'সে পান চিবোতে চিবোতে হারাধন মুখুজ্যে দুঃখ করছেন, 'ছেলেটাকে তো আর কোন রকমেই এঁটে উঠছি নে দাদা। বাঁদরটা কায়দাতেই আসছে না। কি করা যায় বল তো?'

গোবর্দ্ধন সংক্ষেপে মনের আক্রোশ জানালেন, 'হুঁ!'

হারাধন ব'লে চল্‌লেন, 'আসলে ছেলেটা মন্দ না, বুঝলে দাদা? কিন্তু ওই দক্ষিণপাড়ার ভূতো হতচ্ছাড়াই ওকে ডোবালে। সেদিন তোমার এখানেও কি একটা কাণ্ড ক'রে গেছে শুনলাম?'

গোবর্দ্ধন জবাব না দিয়ে গর্জ্জে উঠলেন, 'ভজা!'

বিরাট্ এক পাগড়ীর মত ব্যাণ্ডেজে মাথা, মুখ, গলা জড়িয়ে ভজহরি প্রবেশ করলে।

গোবর্দ্ধন খিচিয়ে উঠলেন, 'কল্কেটা কি মুখ লাগিয়ে টানতে হবে? আর একটা গড়গড়া কই?' তার পর ভজহরির দিকে তাকিয়ে, 'মাথায় অমন বিটকেল পগ্‌গো বেঁধেছিস যে হতভাগা? হয়েছে কি?'

ভজহরি দু'বার হেঁচে বার তিনেক নাক ঝেড়ে ধরা গলায় বল্‌লে, 'সর্দ্দি লেগেছে।'

গোবর্দ্ধন গলাটা আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন, 'বেশ করেছে। তা লেগেছে কি কানে? সেই থেকে চেঁচাচ্ছি আর এক কল্কে তামাকের জন্যে তা বেটা কান দুটোকে ক'রে তুলেছে যেন ম্যাজিনো লাইন! ঢুকবে কোথা?'

ভজহরি তৎক্ষণাৎ তামাক সাজতে ব'সে গেল।

দু'মিনিটের মধ্যে টিকেয় আগুন দিয়ে গোবর্দ্ধনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে ভজহরি কিন্তু এক কাণ্ড ক'রে বসল। কেউ দেখতে না পায় এমনি কায়দায় ট্যাঁক থেকে একটা সরু ছোট্ট নল সে বের ক'রে নিলে। তার পর কল্কেটা গড়গড়ায় বসাবার জন্যে নীচু হ'য়ে নলটা মুখে দিয়ে হঠাৎ ধাঁ ক'রে মাথা তুলে গোবর্দ্ধনের চোখের কাছে দিলে এক ফুঁ। ফুস্ ক'রে খানিকটে কালো রঙের গুঁড়ো নল থেকে বেরিয়ে গোবর্দ্ধনের মুখ-চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ব্যস্; আর যায় কোথায়! 'শূয়োর, গাধা, পাজী বেটা, ডাকাত বেটা—' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে গোবর্দ্ধন বাহু তুলে নৃত্য সুরু করলেন। ভজহরি গভীর আগ্রহে গোবর্দ্ধনের এই ভোঁদড়-নাচন লক্ষ্য করতে করতে অবাক্ হয়ে গেল। মনে হ'ল এ ব্যাপারটার জন্যে সে একটুও প্রস্তুত ছিল না, কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব তার কপালের ওপরকার ভ্রূ দু'টোকে ক্রমেই কুঁচিয়ে আনতে লাগল। হাতের নলটা মুখের কাছে তুলে সে যেই আর একটা ফুঁ দিতে যাবে অমনি গোবর্দ্ধন দুই হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাকড়ো, পাকড়ো হতভাগা খুনে ডাকাতকে।'

সুতরাং আর থাকা নিরাপদ নয়। ভজহরি তাই তাড়াতাড়িতে সদরের পথ ভুলে সোজা অন্দরে ঢুকে খিড়কির দরজা পানে ছুটল। তারপরেই আর এক কাণ্ড। গোবর্দ্ধনের হাঁক-ডাক শুনে কে-একটা লোক ছোট্ট একটা বাক্স মাথায় নিয়ে খিড়কির দিকেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছিল, ভজহরি পড়ল গিয়ে তারই ওপর। ধাক্কা লেগে বাক্সটা গেল তার মাথা থেকে পড়ে, আর ঝন্ ঝন্ ক'রে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খান কতক সোনার গয়না। মুহূর্ত্তের জন্যে ভজহরি থমকে দাঁড়াল। তারপরই লোকটাকে ঝাপটে ধ'রে মাটিতে গড়াতে সুরু করলে।

ততক্ষণে গোবর্দ্ধন হারাধনকে সঙ্গে ক'রে আলো নিয়ে লাঠি হাতে খিড়কিতে এসে উঠেছেন। গোবর্দ্ধন ভজহরির পাগড়ী-বাঁধা মাথায় এক লাঠি বসাতে গিয়ে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন। ভজহরি মাথা থেকে পাগড়ীর কাপড় খুলে যে লোকটাকে পিঠ-মোড়া ক'রে বাঁধছে আসলে সে-ই ভজহরি, আর পাগড়ী-বাঁধা ছোকরা—

হারাধন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ট্যাংরা, তুই এখানে!'

সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধনও আঁৎকে উঠ্‌লেন, 'য়্যাঁ, এ যে গিন্নীর গয়নার বাক্স!'

ভজহরিকে পিঠ-মোড়া ক'রে বেঁধে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে ট্যাংরা বল্‌লে, 'উঃ! আর একটু হ'লেই ফাঁকি দিয়েছিল আর কি!'

গোবর্দ্ধন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ট্যাংরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'তুমি জানলে কি ক'রে?'

ট্যাংরা বিজ্ঞের মত মুচকি হেসে বল্‌লে, 'হুঁঃ, হুকা-কাশির নাম শুনেছেন?'

গোবর্দ্ধন মক্কেল ঠকিয়ে খান, হুকা-কাশির ধার ধারেন না। বল্‌লেন, 'হুকোর কাশি? কিন্তু তার সঙ্গে ভজার—'

বাধা দিয়ে ট্যাংরা বল্‌লে, 'তা নয়; জাপানী টিক্‌টিকি।'

গভীর সন্দেহে ভুরু কুঁচকে গোবর্দ্ধন বল্‌লেন, 'বটে? তা সেগুলো আমাদের দেশের-গুলোর মত ঠিক ঠিক ক'রেই সারে, না একেবারে কথা বলে? তাজ্জব বটে!'

ট্যাংরা জানালে, কথাই বলে, একেবারে নির্জ্জলা বাংলা কথা। একটু মাথা খাটালেই হ'ল আর কি। ভজাটা যে চোর তা আমি ওর হাঁচি শুনেই বুঝে ফেলেছিলাম কিনা; তাই ওরই ছদ্মবেশ ধ'রে ওর কাজকর্ম্ম ক'রে দিয়ে ওকে চুরি করবার সুযোগ দিচ্ছিলাম। ওর ওপরে আমার নজর কিন্তু ছিলই।'

হারাধন চ'টে উঠে বল্‌লেন, 'তাই তুই গোবর্দ্ধন-দা'র চোখে ধূলো দিয়েছিলি, নয়?'

ট্যাংরা বল্‌লে, 'ধূলো নয় বাবা, ওটা কাঁকড়া বিছ্—' ব'লেই সামলে নিয়ে দু'বার ঢোক গিলে জানালে, 'মানে, কল্কের ছাই ফুঁ লেগে উড়ে প'ড়েছিল আর কি!'

হাঁউ-মাউ ক'রে উঠে ভজহরি বল্‌লে, 'মিছে কথা কর্ত্তা। ওই ছাই ওড়ানোর জন্যেই বাবু আমার কাপড়-চোপড় প'রে তামাক সাজছিল। আসলে আমার কোন দোষই নেই কর্ত্তা! দোহাই কর্ত্তা, আমাকে পুলিশে দেবেন না।'

গোবর্দ্ধন গর্জ্জে উঠলেন, 'চোপরও উল্লুক। গয়নার বাক্সটা উড়ে এল, কেমন? আবার ভদ্দর লোকের ছেলের নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে! বাবু তামাক সাজছিলেন আর তুমি বেটা সেই সুযোগে আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গছিলে, নয়? তুমি কিচ্ছু মনে ক'র না বাবা ব্রজ-গোপাল; ছুঁচোটাকে আমি পাক্কা দশটি বছর ঘানি টানাবো, তবে আমার নাম গোবর্দ্ধন বাগচী। হ্যাঁ?'

ব্রজগোপাল ওরফে ট্যাংরার চোখের ওপর তখন প্রকাণ্ড একটা কাঁকড়া-বিছে লেজ তুলে কেবলই ডিগবাজী খাচ্ছে।

এ যুগের আকাশ-যুদ্ধ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি

যুদ্ধ-বিগ্রহ সেই আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে চলে আসছে, তবে তার কায়দা-কানুন বদলাচ্ছে প্রত্যেক যুগেই। সেকালকার সেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বা ইলিয়াড-যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এ যুগের যুদ্ধের কোন তুলনাই চলে না। তখন নাকি সারা দিনমান যুদ্ধ হ'ত, রাত্রি হ'লেই সকলের বিশ্রাম—নিজের নিজের শিবিরে বসে স্ফূর্ত্তি করলেও কোন আপত্তি ছিল না। সময় বিশেষে আবার শুধু দু'জন যোদ্ধা যুদ্ধ করত, আর কেউ তার মধ্যে যোগ দিতে পারত না। যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার খুব বেশী ছিল।

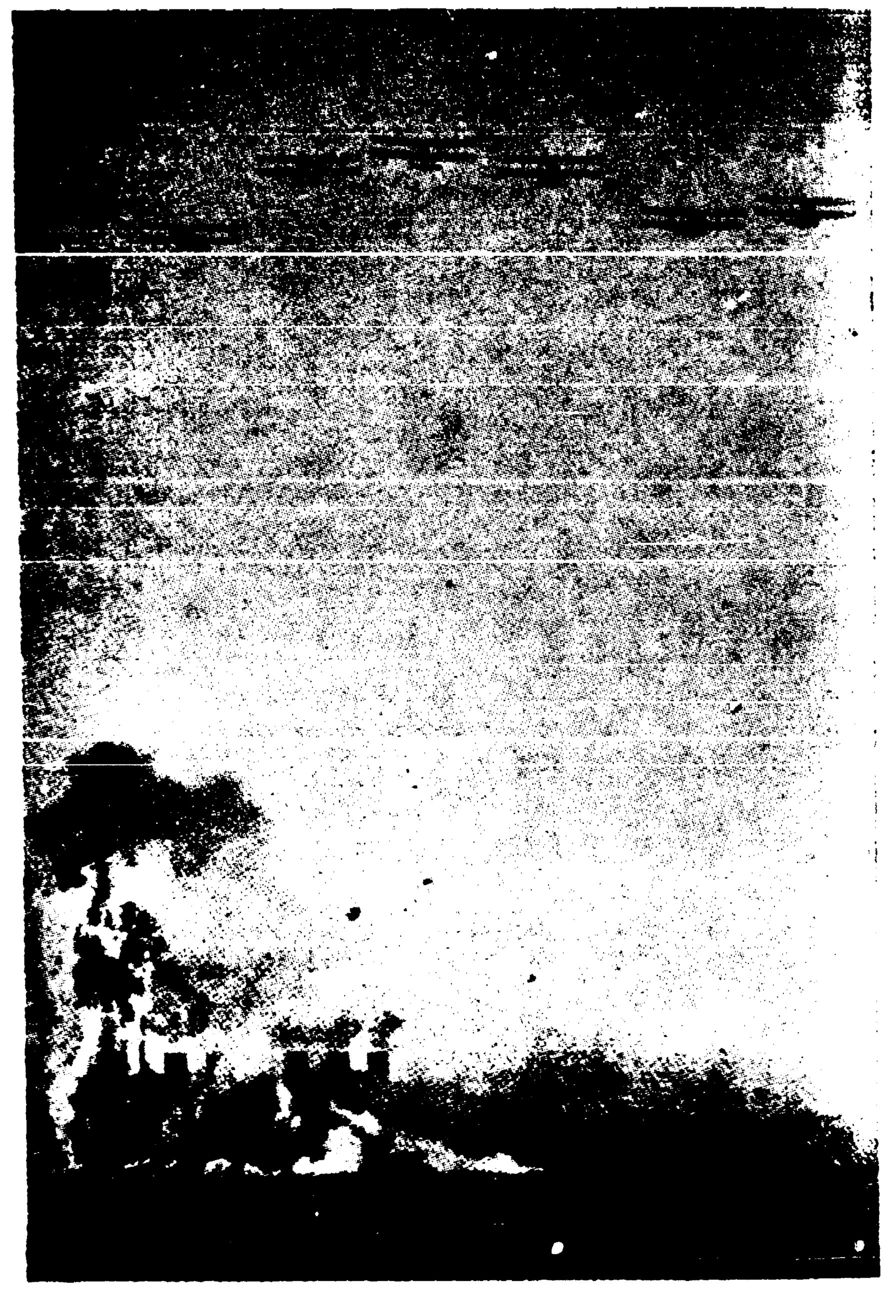

আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু প্লেন দলবদ্ধ ভাবে বোমা ফেলছে। নীচে বোমার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড।

পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক যুগের কথা ধরলেও দেখা যায় তখনকার দিনে যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও এখনকার মত এত বেশী মারাত্মক ছিল না। যারা যোদ্ধা বা সৈনিক তারাই ছিল যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বলি। শত্রু দেশ জয় ক'রে না নেওয়া পর্য্যন্ত বেসামরিক অধিবাসীদের উপর বিশেষ অত্যাচার হ'ত না। হাতাহাতি যুদ্ধই ছিল প্রবল, যাদের শারীরিক শক্তি বেশী তাদেরই হ'ত সুবিধা।

কিন্তু এখনকার দিনে সে সব ধারণাই বদলে গেছে। যোদ্ধাদের শারীরিক শক্তির দরকার অবশ্য আছেই—কারণ যুদ্ধের প্রচণ্ড পরিশ্রম যে-সে লোকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, কিন্তু তারও ওপর দরকার মগজের শক্তি। এ যুগের যুদ্ধকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ বলা যেতে পারে।

একটা সাধারণ ছোট জাহাজের ওপর বোমা পড়েছে; ভাঙ্গা জাহাজের টুক্‌রোগুলি ছিটকে বহু ওপরে উঠে গেছে।

এ যুগের যুদ্ধের কথা উঠতে আকাশ-যুদ্ধের কথাই আগে মনে পড়ে। স্থল-যুদ্ধ এবং জল-যুদ্ধ যে উঠে গেছে তা নয়—কিন্তু আকাশ-যুদ্ধের প্রাধান্য ক্রমেই দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে, এবং যে দলের বিমানবাহিনীর শক্তি বেশী জয়লাভের আশাও যে

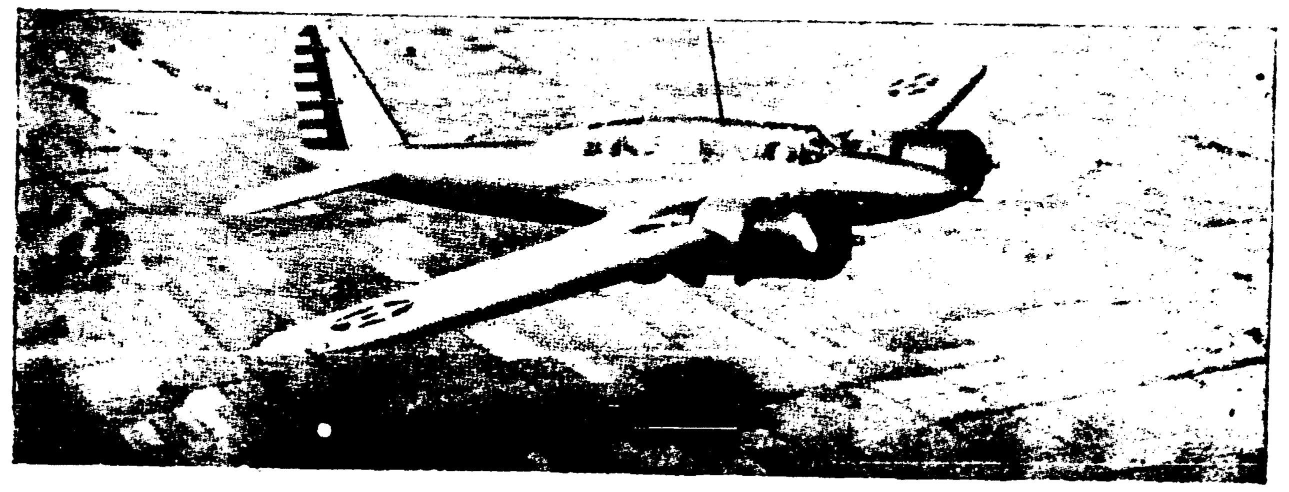

একটি আধুনিকতম বোমারু এরোপ্লেন

তাদেরই বেশী এ কথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। আকাশ-যুদ্ধের সুরু কিন্তু বেশী দিনের কথা নয়। যত দূর জানা গেছে ১৯১১—১২ সনে

প্রথম ইটালিয়ান্‌রা তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিমান-আক্রমণ সুরু করে। তার পর গত মহাযুদ্ধে অর্থাৎ ১৯১৪ সন থেকে বিমান-যুদ্ধের প্রসার বাড়তে থাকে, কিন্তু তখনও লোকে এ বিষয়ে তত পাকা হয়ে উঠতে পারে নি। ১৯১৬ সনের পর থেকে এ বিষয়ে নানা রকম উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হচ্ছে, এবং এবারকার মহাযুদ্ধে এটিই নিয়েছে প্রধান স্থান।

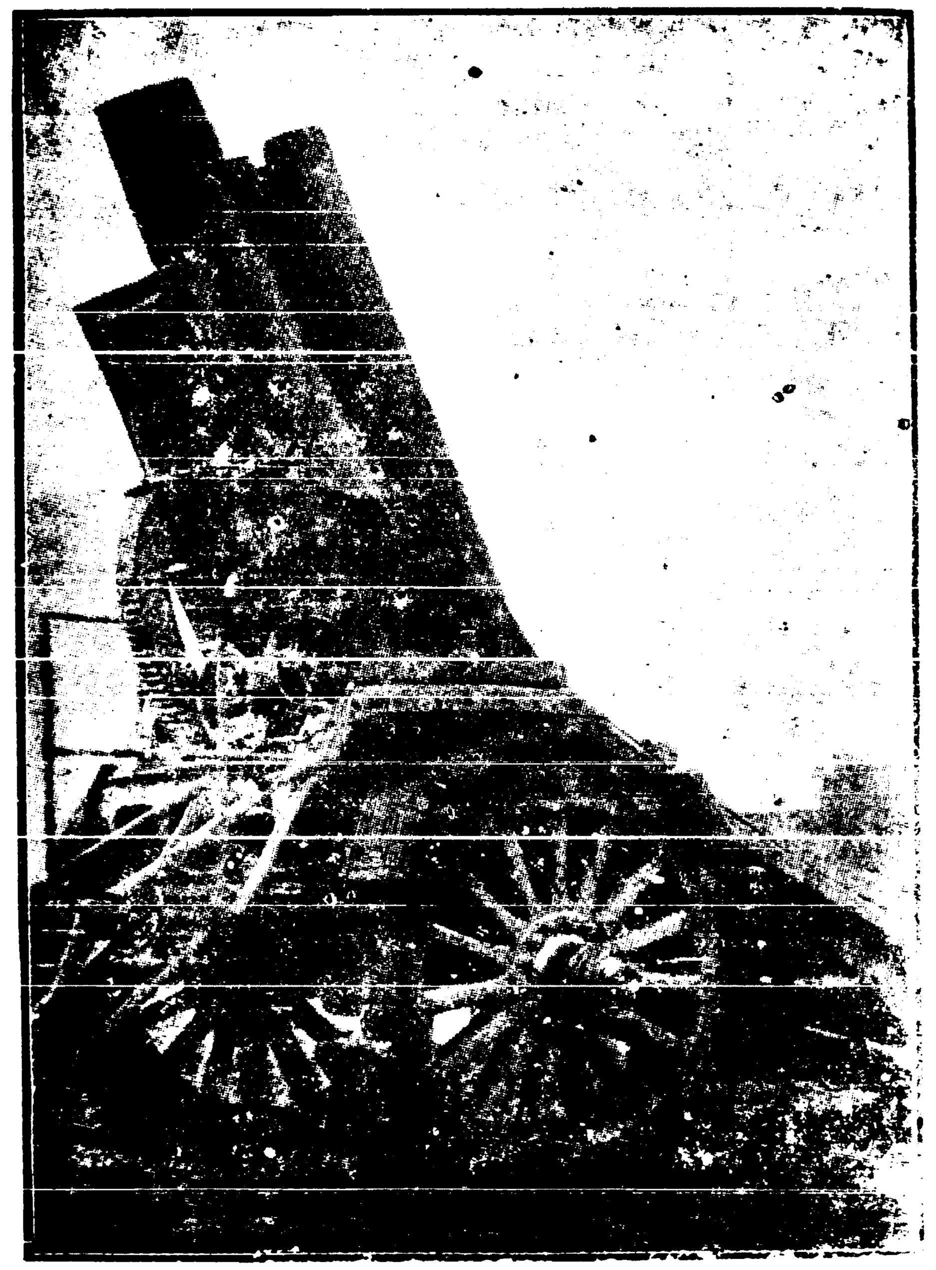

একটি বিরাট্‌ কামান। এর সামনে পড়লে আক্রমণকারী এরোপ্লেনের রক্ষা নেই।

স্থল-যুদ্ধ আর জল-যুদ্ধের অসুবিধা—দুই পক্ষকেই অনেক বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পড়তে হয়, চুপি চুপি এসে গোপনে কার্য্যোদ্ধার করবার উপায় নেই। স্থল-যুদ্ধে তো আবার সৈন্য-পরিচালনার জন্য ভাল পথঘাট তৈরীর হাঙ্গামাও আছে। কিন্তু আকাশ-যুদ্ধে এ সব মেহানৎ নেই। এরোপ্লেনে ক'রে অতর্কিতে এসে বোমা ফেলে শত্রুরাজ্য—অরক্ষিত শত্রুসহর ছারখার করে দেওয়া চলে, এবং তার ফলে শত্রুপক্ষের সশস্ত্র সৈন্যদলের চাইতে নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদেরই বেশী ভুগতে হয়। এই সব বিমান-আক্রমণে শুধু লোকের ঘরবাড়ী ধ্বংস ক'রে আর লোকজন হত্যা ক'রেই থামা হয় না, শত্রুপক্ষের যা কিছু সম্পদ্‌ তছ্‌নছ্‌ করে ফেলা হয়। কলকারখানার ওপর বোমা ফেলে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ তৈরীর পথ বন্ধ করা হয়; এরোড্রোম, তেলের ট্যাঙ্ক (যার ওপর আজকালকার এরোপ্লেন, মোটর

ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়) জ্বালিয়ে, খাবার জলের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে, বিদ্যুৎ-কারখানা উড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের পথ বন্ধ করে সর্ব্বপ্রকারে শত্রুপক্ষকে অকর্ম্মণ্য করবার চেষ্টা করা হয়। তা ছাড়া দেশের বড় বড় শিল্পকেন্দ্র—শত শত বছর ধরে কত মনীষীর সম্মিলিত চেষ্টায় যা গড়ে উঠেছে, নিষ্ঠুর ভাবে তাও ধ্বংস করে ফেলতে কসুর করা হয় না। সভ্যতার এত বড় শত্রুতা আর কি হ'তে পারে? অবশ্য এ সবই করা হয় শত্রুপক্ষ যাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় তারই জন্য।

যুদ্ধে যে সব বোমা ব্যবহার করা হয় তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক নম্বর—বিস্ফোরক বোমা। এর এক-একটা ওজনে ২।৩ সের থেকে আরম্ভ করে ৩০।৪০ মণ পর্য্যন্ত হ'তে শোনা গেছে। দেখতে এগুলি অনেকটা টর্পেডো গোছের—অর্থাৎ মাঝখানটা গোল, মুখটা সুচাল। বোমার খোল ইস্পাতের তৈরী, ভেতরে থাকে নানা রকম প্রচণ্ড শক্তিশালী রাসায়নিক বিস্ফোরক মশলা। এরোপ্লেন থেকে মাটীতে পড়ে এগুলো যায় ফেটে, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরকার রাসায়নিক পদার্থ গ্যাসের আকারে বিরাট্‌ আয়তন নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কী ভীষণ যে তার চাপ তা কল্পনা করাও কঠিন। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব ক'রে বলেছেন তেমন তেমন এক-একটা বোমা ফাটবার সময় আশ-পাশের বাতাসের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত জায়গায় কম করে ২।৩ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের চাপ দেয়—এবং এ ব্যাপারটা ঘটে সম্পূর্ণ অতর্কিতে—হঠাৎ। ফলে আশ-পাশের বাতাসে যে কী ভীষণ রকমের আলোড়ন উপস্থিত হয় তা বুঝতেই পারছ। পৃথিবীতে এমন জিনিষ অল্পই আছে যা বাতাসের সে প্রচণ্ড আলোড়ন সহ্য করতে পারে। ফলে বোমা যেখানে ফাটে তার আশ-পাশের যাবতীয় জিনিষ ভেঙ্গে চূরে দূর-দূরান্তরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। বোমা যেখানটায় পড়ে সেখানে মাটীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গভীর গর্ত্ত হয়ে যায়। ৪।৫ তলা বাড়ীর ছাদ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি তলার মেঝে ভেদ করে বোমা নীচের তলায় গিয়ে গভীর গর্ত্ত করে ফেলেছে এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। বোমা ফাটবার আওয়াজটাও কানের পক্ষে খুব উপাদেয় হয় না।

দু' নম্বর বোমাকে 'আগুনে-বোমা' বলা যেতে পারে। এগুলোর ভেতরে তো

বিস্ফোরক থাকেই, আর থাকে এমন কতকগুলি জিনিষ যা খুব সহজেই জ্বলে উঠতে পারে। ফলে বোমা যখন কোন সহরের ওপর পড়ে তখন ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই চার ধারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়। সে আগুন নিভানো নেহাৎ সহজ নয়। বোমার ঘায়ে যা ক্ষতি হ'ল, আগুনে ক্ষতি হয় তার চতুর্গুণ।

আর এক রকম বোমা আছে—এগুলোর মধ্যে থাকে নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস। বোমা ফাটবার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্যাস ছাড়া পেয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং যার নাকে-মুখে একবার ঢুকতে পায় তার আর রক্ষা নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্লোরিন গ্যাস, মাষ্টার্ড্ গ্যাস ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

শুধু বোমা-বর্ষণ ক'রে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করাই আজকালকার বিমান-বাহিনীর একমাত্র কাজ নয়। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় এরোপ্লেন দিয়ে আরও অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। এক ধরণের এরোপ্লেন আছে তাদের কাজ হচ্ছে পর্য্যবেক্ষণ করা। শত্রুসৈন্যের গতিবিধি, তাদের সৈন্য-সমাবেশ এবং আরও অনেক গোপনীয় তথ্য আকাশে উঠে যেমনটা দেখা যায় অন্য ভাবে তা সম্ভব নয়। আজকালকার পর্য্যবেক্ষক এরোপ্লেনগুলোতে খুব শক্তিশালী ক্যামেরা বসান থাকে। এগুলো এমন ভাবে তৈরী যে এরোপ্লেন চলতে চলতে ফটো নিতে কোন অসুবিধা হয় না এবং ফটো আপনা আপনি উঠে যায়। এ সব ক্যামেরার লেন্স হচ্ছে দূরবীণ-লেন্স। উঁচু আকাশে বসে শত্রুদলের খবর সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নিজেদের দলে খবর দেওয়ার জন্য রেডিয়ো-টেলিফোনেরও বন্দোবস্ত থাকে। আজকাল আবার কোন কোন এরোপ্লেনে এক ধরণের টেলিভিশন-ক্যামেরা রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। দূর আকাশ থেকে শক্তিশালী দূরবীণ-লেন্স বসান ক্যামেরায় ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে সে ছবি নিজেদের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত গোপনীয় খবর যোগাড় করে সেনাপতি যথোচিত ব্যবস্থা করতে পারেন। যদি শত্রুর পাল্লায় পড়ে এরোপ্লেন মারাও যায় তা' হলেও তার তোলা ছবি সে দলের লোকেদের হাতে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারে।

জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জাহাজ আক্রান্ত হ'লে তাকে সাহায্য করা, সমুদ্রের মধ্যে টর্পেডো ফেলা, মাইন পাতা—এ সব কাজও আজকালকার এরোপ্লেনকে

হামেশাই করতে হচ্ছে। আর আকাশের গায়ে এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে মেশিনগান্ বা কামান নিয়ে যুদ্ধ—এ তো লেগেই আছে।

আজকাল আবার এরোপ্লেনকে এক নতুন কাজে লাগান হচ্ছে। এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে অলক্ষিতে পদাতিক সৈন্য নামিয়ে দিয়ে পেছন থেকে আক্রমণের কথা বলছি। এবারকার যুদ্ধে জার্ম্মান্‌রা এই উপায়ে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ এবং ফ্রান্সে বহু সৈন্য নামিয়েছিল। অবশ্য এ প্রথাটি তাদের আবিষ্কার নয়, সোভিয়েট রাশিয়ান্‌রা সর্ব্বপ্রথম মাথা খাটিয়ে এই উপায় বার করে।

সব জিনিবেরই প্রতিবেধক আছে, এরোপ্লেনের আক্রমণ থেকেও আত্মরক্ষার নানা উপায় বার করতে আধুনিক মানুষ কসুর করে নি। প্রথমেই ধর বিমান-ধ্বংসী কামান। বড় বড় সহরে অত্যন্ত শক্তিশালী বিমানধ্বংসী কামান সর্ব্বদাই 'তৈরী' অবস্থায় রাখা হয়, আকাশে শত্রুপক্ষীয় বিমানের দেখা পেলেই হ'ল। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজেও এই রকম কামান বসান থাকে। এমন অনেক কামান আছে যা থেকে প্রতি মিনিটে ১০।১২টা করে বড় বড় গোলা (ওজনে ১২।১৪ সের) ৩০।৪০ হাজার ফুট ওপরে নিয়ে ফেলা যায়। এর সামনে পড়লে কোন বিমানের রক্ষা পাওয়া কঠিন। তাই বোমারু এরোপ্লেনদের গোপনে আসবার চেষ্টা করতে হয়। দিনের বেলা থেকে রাত্রে আসাই তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। রাত্রে যাতে তারা লক্ষ্য ঠিক করতে না পারে সেজন্য আক্রান্ত সহর নিষ্প্রদীপ (ব্ল্যাক্ আউট্) করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর মহড়া কলকাতায়ও হয়ে গেছে। চারদিক্ অন্ধকারে ঘেরা থাকলে এরোপ্লেনের পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে কাজ হাসিল করা খুবই কষ্টকর। তা ছাড়া আজকাল আবার খুব সূক্ষ্ম শব্দগ্রাহী যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বোমারু বিমান অনেক দূরে থাকতে থাকতেই এই যন্ত্রে তাদের খবর পাওয়া যায়, এবং শব্দ কোন্ দিক্ থেকে আসছে, ঠিক করে নিয়ে সেদিকে ফেলা হয় প্রচণ্ড শক্তিশালী সার্চ্চলাইট্। এই সার্চ্চলাইটের তীব্রতা অনেক সময় ২০।২৫ কোটি 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' হ'তেও শোনা গেছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ৬ মাইল দূরেও তার আলো পৌঁছায়। তার পাল্লায় পড়লে বোমারুর পক্ষে বেশীক্ষণ লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, তার পর দূর পাল্লার বিমানধ্বংসী কামান তো আছেই। সার্চ্চলাইটে বোমারু

বিমানচালকের চোখ ধেঁধে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কোন কোন সার্চ্চলাইটের সঙ্গে আবার অটোমেটিক্ টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকে।

অপর পক্ষে শুধু সহর নিষ্প্রদীপ করে সব সময় আত্মরক্ষা করা যায় না। আজকাল এক রকম বোমা বেরিয়েছে—তাকে বলা হয় 'আলোক-বোমা'। এই বোমার সঙ্গে প্যারাশুট্ লাগান থাকে। এরোপ্লেন থেকে এই বোমা ফেল্‌লে খানিক দূর গিয়ে প্যারাশুট্ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বোমা ফেটে যায় আর প্রচণ্ড তীব্র আলোকে সমস্ত নিম্নভূমি আলোকিত হয়ে নিষ্প্রদীপ সহরকে চোখের সামনে উজ্জ্বল করে তোলে; বিমান থেকে লক্ষ্য ঠিক করতে আর কষ্ট হয় না। এরোপ্লেন থেকে রাত্রে ফটো নেবার পক্ষেও এই আলোক-বোমা প্রচুর সাহায্য করে।

বোমারু এরোপ্লেনকে জব্দ করবার আরও ২।১ রকম উপায় বেরিয়েছে। যেমন ধর ব্যারেজ বেলুন। এই হাল্কা বেলুনগুলোর মধ্যে থাকে সাংঘাতিক বিস্ফোরক পোরা। তারের সাহায্যে সহরের ওপরকার আকাশে ৩০।৪০ হাজার ফুট উঁচুতে এদের ভাসিয়ে রাখা যায়। বোমারু-বিমান বোমা ফেলবার জন্য নীচে নামবার সময় যদি এদের সঙ্গে তার সামান্য ধাক্কাও লাগে তা হ'লেই এই বেলুন সশব্দে ফেটে যাবে, আর সেই বিস্ফোরকের ঘায়ে বোমারু এরোপ্লেনের দফা হবে সারা। এগুলোকে আকাশের 'মাইন' বলা যেতে পারে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক নাকি চেষ্টা করছেন বড় বড় সহরের ওপরকার আকাশের ওপর এমন একটা বৈদ্যুতিক পর্দ্দা বসাবেন যাতে ওপর থেকে কোন বিমান নেমে এলেই এই পর্দ্দার সঙ্গে তার লাগবে ধাক্কা—সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে। অবশ্য এ জিনিষটা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

বিমান অক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার জন্য মাটীর তলায় নিরাপদ্ ঘর, বিষাক্ত গ্যাস-বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্যাস-মুখোস এ সবের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এ সব কি ক'রে চট্‌পট্ ব্যবহার করতে হয় প্রত্যেক নাগরিককে তা শেখাবার ব্যবস্থাও ওদেশে হয়েছে।

সব কাজের জন্য কিন্তু এক রকম এরোপ্লেন ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য

আকাশ-যুদ্ধের প্রথম যুগে এ সব ব্যবস্থা ছিল না—একই রকম সাধারণ এরোপ্লেন নিয়ে তখন সব কাজ করতে হ'ত; কিন্তু আজকাল বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী ও বিশেষ ভাবে সজ্জিত এরোপ্লেন ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ যুদ্ধের জন্য তিন রকম এরোপ্লেনের চলন আছে। পর্য্যবেক্ষক প্লেন, বোমারু প্লেন আর জঙ্গী বা ফাইটার প্লেন্ (আমেরিকায় বলে 'পারস্যুট্ প্লেন', ফ্রান্সে 'Avions de Chasse')। পর্য্যবেক্ষক বিমানের কথা আগেই বলেছি। এরাও সশস্ত্র থাকে। এদের প্রধান কাজ শত্রুদলের ওপর নজর রাখা, নানা তথ্য সংগ্রহ করা। বোমারু এরোপ্লেন সাধারণতঃ একটু বড় হয়। অবশ্য তার মধ্যে আবার রকম ফের আছে। আগে বোমারু প্লেনের সঙ্গে সব সময় একটি করে রক্ষী জঙ্গী প্লেন থাকত, এখন বোমারু প্লেনের মধ্যেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণতঃ এগুলোতে দুই বা তিন জন আরোহী থাকে। একজন চালক, একজন বোমা-নিক্ষেপকারী, এবং একজন গোলন্দাজ। কোন কোনটিতে চার জনও থাকে। প্লেনের পেছন দিকে থাকে কামান—যা দিয়ে জঙ্গী বিমানের সঙ্গে যুদ্ধ চালান যায়। তা ছাড়া মেশিন্‌গান্‌ও থাকে। বোমারু বিমান কত জোরে যেতে পারবে, কতক্ষণ উড়তে পারবে ইত্যাদি অনেকটা নির্ভর করে তার ভিতরকার রসদপত্রের ওজন আর তেলের পরিমাণের ওপর। আজকাল অবশ্য তেলবাহী বিমানের সাহায্যে উড়ন্ত অবস্থায়ই পাইপ দিয়ে তেল নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বোমারু-বিমান সাধারণতঃ দলবদ্ধ ভাবে (এক-এক দলে ১৫টি পর্য্যন্ত) চলে; আবার কতকগুলি দল এক সঙ্গে মিলেও আক্রমণ চালায়। সাধারণতঃ এরা ইংরেজী 'V' অক্ষরের আকারে সজ্জিত হয়ে অগ্রসর হয়। এতে সুবিধা অনেক.—দলপতিকে সব সময়ে দেখা যায়, তা ছাড়া নিজেদের গুলিতে নিজেদের জখম হবারও ভয় থাকে না।

জঙ্গী প্লেন বা ফাইটারের কাজ হচ্ছে বিপক্ষের বোমারু বিমানকে আক্রমণ করা আর স্বপক্ষের বিমানকে রক্ষা করা। এরা আকারে অনেকটা হাল্কা, এবং বোমারু বিমানের চাইতে অনেক সহজ ভাবে ওঠা-নামা করতে পারে। বোমারু বিমান বোমা ফেলবার সময় চিলের মত ডাইভ্ দিয়ে নেমে আসে। তাকে আক্রমণ

করতে হলে ওপরে উঠে পেছন থেকে আক্রমণ করাই সুবিধাজনক। এরোপ্লেনের পক্ষে নামা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওঠা ততটা নয়—তাতে সময় অনেক বেশী লাগে। কাজেই দুই প্লেনে যুদ্ধের সময় যে ওপরে থাকবে তারই সুবিধা হয় বেশী। এরোপ্লেনের গতিবেগের জন্য সামনাসামনি বা পাশাপাশি আক্রমণ করা সম্ভব নয়, কাজেই এই পেছন থেকে তাড়া করার ব্যবস্থা। জঙ্গী বিমানগুলিতে অনেকগুলো করে মেশিন্‌গান্ বসান থাকে, এবং গোলন্দাজ বোতাম টিপে ছর্‌রার মত এক সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে পারে। 'স্পিটফায়ার' নামে ইংরেজদের এক রকম ফাইটার আছে। এদের দুই পাখায় থাকে ৪টি ক'রে মোট ৮টি মেশিন্‌গান্—তা থেকে প্রতি মিনিটে প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি গোলা বর্ষণ করা যায়। গতিবেগও এদের ঘণ্টায় ৩৫০ মাইলের কম নয়, আর চট্‌ ক'রে ওপরে উঠতেও নাকি এরা ভীষণ রকম পটু! তবে ফাইটারকে জব্দ করার জন্য আজকাল বোমারু-বিমানে খুব শক্ত বর্ম্ম আঁটবার ব্যবস্থা হয়েছে—যাতে তার গায়ে লেগে ছোট মেশিন্‌গানের গুলি ঠিকরে আসতে পারে। ফলে ফাইটারগুলিতেও মেশিন্‌গানের সঙ্গে বড় কামান বসাবার রেওয়াজ হয়েছে।

শিকার

[সত্য ঘটনা]

শ্রীমিহির রায়

ঘাটশিলার নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শুনেছ। স্বাস্থ্য-নিবাস হিসাবে ঘাটশিলার নাম বি-এন্-রেলওয়ের মধ্যে সুপরিচিত। এই ঘাটশিলারই দুটো ষ্টেশন আগে গিধনী নামে ছোট্ট একটা ষ্টেশন আছে। তোমরা যদি কেউ বি-এন্-রেলওয়ের এই লাইনের ওপর দিয়ে গিয়ে থাক তা হ'লে ষ্টেশনটিকে দেখে থাকবে হয় তো। ছোট্ট একটি ষ্টেশন। রাত্রি বেলায় দু'ধারে দুটো কেরোসিনের আলো শুধু জ্বলে।

জায়গাটি সাঁওতালদের দেশ। ভদ্র বাঙালীর মুখ প্রায়ই দেখা যায় না। বছর কয়েক হ'ল মাত্র কিছু কিছু পেন্সনপ্রাপ্ত ভদ্রলোক ওখানে নিজেদের বাঙ্‌লো করেছেন।

ওই গিধনীতে যাবার সুযোগ আমি একবার পেয়েছিলাম।

গেরুয়া রঙের শক্ত মাটী, শালের পর শালের গাছ, গভীর কালো সাঁওতালের মুখ—এ ছাড়া দেখবার আর ওখানে কিছু নেই। তবে উপভোগ করবার অনেক কিছুই আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুন্দর সে দৃশ্য।

শালের পর শাল গাছের শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। খাড়া লম্বা গাছ। শুধু শাল আর শাল। ওখানে পাখীর ঝাঁক অনেক। নানা রকমের পাখী আছে। তবে ঘুঘুটারই যেন সংখ্যাধিক্য কিছু বেশী।

বন্দুকটা নিয়ে সেদিন বেরোলাম। জীবনে এই প্রথম আমি নিজের হাতে শিকার করতে চলেছি। মনে মনে একটু উত্তেজিতই হয়েছিলাম।

বন্দুক কাঁধে আমি শালের শ্রেণীর ভেতর ঢুকলাম। পৃথিবীর ঘুমের ভাব তখনও সম্পূর্ণ যায় নি, শিশিরবিন্দু তখনও টুপটাপ্ করে করে পড়ছিল গাছের পাতা বেয়ে।

বড় একটা পাথরের ওপর আমি বস্‌লাম। এই অনুপম প্রভাতে ভগবানের সৃষ্টি যে কোন প্রাণীকেই হত্যা করতে সহসা বিবেক যেন আমাকে বাধা দিল।

চুপচাপই কিছুক্ষণ কেটে গেল। বাড়ীর পথেই আবার ফিরব কিনা ভাবছি—অন্যমনস্কভাবে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েওছিলাম, হঠাৎ কাছেই শোনা গেল ঘুঘুর একটা ডাক। ফিরে দেখি, শালগাছের অন্ধকারে একটা বাব্‌লা গাছের ডালে দুটো ঘুঘু বসে আছে। দুটোরই পেছন দিক্ ছিল আমার দিকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঘুঘু আর ঘুঘুর সঙ্গিনী স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। শিকার করবার যে প্রবৃত্তি প্রকৃতির রূপের মোহে মন থেকে আমার লোপ পেয়ে আসছিল ঘুঘু দুটোকে দেখেই সেটা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এত সুন্দর আর সহজ ভাবে শিকার পাওয়া সব সময়ে ঘটে ওঠে না।

ঘাড়ের ওপর থেকে বন্দুকটা নামালাম। টোটা আগেই ভরা ছিল। ছোট

মত একটা ঝোপের পেছনে গুঁড়ি দিয়ে বসলাম। এই দিক্ দিয়েই ঘুঘু দু'টোর ওপর নিশানা নেওয়ার সুবিধা হবে। দক্ষিণ বাহুর ওপর বন্দুকের গুঁড়িটা জোরে চেপে ধরে ঘুঘু দুটোর একটির দিকে তাক করলাম।

সমস্তই ঠিকঠাক, ট্রিগারটা শুধু টিপলেই হয়, হঠাৎ পাখী দু'টোর মধ্যে একটি, বিপদের আভাস বুঝেই হয়তো, ডানা দুটো ছড়িয়ে ডালটির থেকে উড়ে গেল। দ্বিতীয়টিও উড়বার জন্য প্রস্তুত কিন্তু প্রথমটির উড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রিগারটা আমি টিপে ধরেছিলাম এবং সুখের বিষয় দ্বিতীয় ঘুঘুটাই ছিল আমার লক্ষ্যস্থল।

জীবনে এটা আমার প্রথম শিকার হ'লেও নিশানা আমার ঠিকই হয়েছিল। চোখের সম্মুখ থেকে বারুদের ধোঁয়াগুলো সরে যাবার মধ্যেই দেখলাম ঘুঘুটা কিছুটা দূর উড়ে যাবার চেষ্টা করে অবশেষে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

দৌড়ে আমি ঘুঘুটার কাছে গেলাম। ছর্‌রাগুলো বোধ হয় ভালো ভাবে তার শরীরে লাগে নি। ঘাসের ওপর পড়ে তখনও হাঁফাচ্ছিল ঘুঘুটা। আশে-পাশের খানিকটা জায়গা রক্তে ভিজে গিয়েছিল একদম।

এ দৃশ্যে আমি যেন কেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। এতখানি নিষ্ঠুর দৃশ্যের কল্পনা আমি করতে পারি নি। ঘুঘুটার ওপর ঝুঁকে আমি বসে পড়লাম, তার পর ওর আহত ডানায় আর শরীরে হাত বুলাতে সুরু করলাম।

নিজের ওপর আমার আরও রাগ হ'ল যখন আর একটি ঘুঘুর কাতর আর্ত্তনাদে আহত ঘুঘুটার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আমি বাধ্য হলাম। গুলি করবার সময় যেটা উড়ে গিয়েছিল সেটাই আবার ফিরে এসেছে। আমার আশেপাশেই ওটা চক্রাকারে উড়ছিল আর অতি করুণ ভাবে চীৎকার করে যাচ্ছিল—অবিশ্রান্ত। ঘুঘুটার চীৎকারে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তার চাইতেও অসহায় হয়ে পড়লাম আমার হাতের ওপরকার আহত ঘুঘু-সঙ্গিনীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। উড়বার জন্য ওর কি কাতর ব্যর্থ চেষ্টা! ডানা দুটো ফাঁক করে আমার হাতের ওপরেই বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। ওর সঙ্গী ঘুঘুটার প্রত্যেকটি ডাকে ও যেন সাড়া দিতে চাচ্ছিল। সঙ্গীটির কাছে উড়ে যাবার জন্য

ওর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝাঁকুনী আমার প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরাকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করে তুলছিল।

কিন্তু আর বেশীক্ষণ আমাকে এই মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হ'ল না। আরো দু'-একবার সর্ব্বদেহে ঝাঁকুনী দেবার পর রক্তাক্ত ঘুঘুটির মৃত্যু হ'ল। মৃতদেহটাকে হাত থেকে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। শরীর তখন আমার একটু বেশী রকমই ক্লান্ত লাগছিল। বাসায় গিয়ে স্নান-টান সেরে কোন রকমে শুয়ে পড়বার জন্য তখন আমি মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলাম।

ঝোপ-জঙ্গল ভেঙ্গে কিছুটা দূরে আমি চলে এলাম, কিন্তু আরো কিছুটা দূরে এসে বাধ্য হয়েই আমাকে থামতে হ'ল। সেই জীবিত ঘুঘুটার অস্বাভাবিক চীৎকারই আমার থামবার কারণ। এত বিশ্রী ভাবে সেটা চেঁচাচ্ছিল যে একটা কিছু ঘটেছে বলে আমার মনে হ'ল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি আবার ফিরে এলাম; গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম সেটা বাস্তবিকই করুণ।

মৃত সঙ্গিনীর দেহটির কাছাকাছিই গাছগুলোর এ-ডালে ও-ডালে ডানা ঝটপট করে ঘুঘুটা উড়ে বেড়াচ্ছিল, এবং দেখে আমি বিস্মিত হ'লাম মাঝে মাঝে উড়ে এসে সেটা সঙ্গিনীর কাছে বসে ঠোঁট দিয়ে তার শরীরটাকে বার বার ঝাঁকুনী দিচ্ছিল।

তার পর? হ্যা, তার পর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করলাম। বন্দুকটা হাতেই ছিল; ঘুঘুটা যখন একবার শ্রান্ত হয়ে গাছের একটা ডালে এসে বসল তখন তাকে লক্ষ্য করে ট্রিগারটা টিপে দিলাম। এ ছাড়া অন্য কিছুই আমার করবার ছিল না।

এবারকার হত্যায় উত্তেজনা আমার কিছুমাত্র হয় নি। বন্দুকটা গাছের একটা গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে রেখে ঘুঘু দুটোকে আমি এক জায়গায় রাখলাম। যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তবু একটা কাজ না করে আমি থাকতে পারলাম না। গাছ থেকে পড়া শুকনো ঝরাপাতাগুলো সরিয়ে মাটীতে একটা গর্ত্ত খুঁড়লাম। তার পর দু'টি ঘুঘুকে একসঙ্গে গর্ত্তের মধ্যে রেখে মাটী দিয়ে গর্ত্তটা চাপা দিলাম। তার পর কাঁধের ওপর বন্দুকটা চড়িয়ে নিতান্ত অবসন্ন মনে বাড়ীর পথে ফিরলাম।

এখনও মাঝে মাঝে ভোরের আগে আগে আমার ঘুম যখন ভেঙে যায়, আমি আমাদের মাটীর ঘরের জানালার পাশে শুয়ে সাঁওতাল-দেশের সেই করুণ দৃশ্যটি যেন স্পষ্টই দেখতে পাই। ছবির মত আমার চোখে পড়ে ঘুঘু সঙ্গী তার সঙ্গিনীকে ডাকছে ঘু-ঘু!

বই ধার দিয়ো না

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আমি, নবা, পিণ্টু আর ভোঁসলা—এই চার জন মিলে একটা কেলাব করেছিলুম। তাসের না, ফুটবলের না, সাইকেলের না, চানাচুর-গরম-চায়েরও না,—বই পড়ার কেলাব। দুর্ব্বুদ্ধিটা আমার মগজেই গজায়—আমারই দোষ।

দোষ এই যে বই পড়তে আমি খুব ভালোবাসি। এটা, ভেবে দেখতে গেলে, খুব দোষের কথা নয়, কিন্তু এর ফলে এমন একটি কাজ আমি করতুম বাংলাদেশে যার তুল্য দোষ আর নেই—কিছু কিছু বই কিনতুমও। বোকারা বই কেনে, আর চালাক লোকরা পরের বই প'ড়ে জীবন কাটায়—এমন-কি ধার-করা বই জমিয়ে-জমিয়ে তারা অনেকে ঘর পর্য্যন্ত সাজায়। এই সরল সত্যটি আমি ঠেকে শিখেছি, তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কাজে লাগবে।

এখন হ'লো কী, বই তো কতই পড়তে ইচ্ছে করে, কিন্তু কত আর কেনা যায়! তাই আমি একদিন নবা আর পিণ্টুকে ডেকে ভোঁসলাদের বাড়ির গ্যারেজের পাশে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললুম—এসো আমরা একটা কেলাব করি।

—বেশ, বেশ! কিসের কেলাব? মহা উৎসাহিত ওরা।

ঠিক এই সময়ে ভোঁসলা এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পরনে ঢিলে রংদার পাৎলুন, আর গায়ে সেই নক্সারই একটা কুর্ত্তা, উসকো খুসকো চুল, চোখ ফোলা-ফোলা, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলো। ন'টার আগে কোনোদিন ওর ঘুম ভাঙে না।

আমাদের দেখেই হাঁক দিলে—কী হে, কী জটলা হচ্ছে তোমাদের?

আমি বললুম—খানসামার মতো পোষাক করেছিস্ কেন?

—বাজে বকিস নে। জানিস নে, এটা সায়েবদের শোবার পোষাক। তুই দেখছি একেবারেই বাঙাল!

অত্যন্ত লজ্জিত হলুম। ভোঁসলা বড়োলোকের ছেলে, কত রকম ওর কাপড়চোপড়, ওর এক-একখানা ধুতির দামই নাকি দশ-বারো টাকা! আর আমি যে হাফ-প্যাণ্টের বয়স পার হ'য়ে ধুতির বয়সে পৌঁছেছি তাতেই আমার বাবা মনে-মনে বেশি খুসি নন।

ভোঁসলা রাস্তায় নেমে এসে এক হাত আমার কাঁধে, আর-এক হাত নবার কাঁধে রেখে বললে—তার পর, কী কথা হচ্ছিলো তোমাদের?

আমি বললুম—একটা বই পড়ার কেলাব করলে কেমন হয়?

—ওঃ, ফাইন্! ভোঁসলা আমার কাঁধে বেশ জোরেই একটা চাপড় মেরে বসলো। ঠিক এই আইডিয়াটা আমার মাথায় কিছুদিন ধ'রেই ঘোরাঘুরি করছে। চল্ শ্রী হলিউড কাফেতে গিয়ে বসি, চা না হ'লে কি মাথা খোলে?

বই পড়ার কেলাব শুনে পিণ্টু আর নবার মনটা যেন একটু দ'মে গেলো। পিণ্টু বল্লে—বই তো আমরা ইস্কুলেই পড়ি, তার আবার কেলাব কী!

ভোঁসলা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে—ওঃ, পিণ্টুটা এখনো একেবারে ছেলে-মানুষ আছে!

রাস্তা পার হ'য়ে আমরা হলিউড কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। ভোঁসলা জাঁকিয়ে ব'সে ফরমাস দিলে—চার পেয়ালা চা, চারটে টোষ্ট, চারটে অমলেট।

চা খেতে-খেতে কেলাবের প্ল্যান করা হ'লো। আমরা প্রত্যেকে মাসে দু' টাকার বই কিনবো, আর সে-সব বই মেম্বররা সকলেই পড়তে পাবে, কিন্তু মেম্বর যারা নয়, তারা পাবে না। আর সকলের পড়া হ'য়ে গেলে বইগুলো এক জায়গায় জমা থাকবে, যখন যার দরকার তাকেই আবার দেয়া হবে। এইভাবে সকলেরই অনেক বই পড়া হবে, আর আস্তে-আস্তে মেম্বর যদি বাড়ে—

এখানে ভোঁসলা ব'লে উঠলো—চ্ছোঃ! মাসে দু' টাকা মাত্র! দু' টাকায় তো সিলানাপ্পার আধখানা বইও হবে না।

—সিলানাপ্পা কী জিনিস ভাই? পিণ্টু জিজ্ঞেস করলে।

চা মুখে নিয়ে হাসতে গিয়ে ভোঁসলা দম আটকে ম'রে যায় আর কি! আহা—তখন যদি ভালোমন্দ কিছু হ'য়ে যেতো!

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বল্লে—ইস্, তোরা দেখছি একেবারে আকাট-মূর্খ! সিলানাপ্পার নাম শুনিস নি? মস্ত বড়ো লেখক—এবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছে!

নবা বল্‌লে—ও-সব বিদ্ঘুটে বই না-ই বা থাকলো। কত সব ভালো-ভালো বই বেরুচ্ছে আজকাল—প্রেমেন বাবুর, শিবরাম বাবুর—

ভোঁসলা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বল্‌লে—তোরা শুধু বাংলা বই কিনবি? তা হ'লে আমি এর মধ্যে নেই।

রাগ ক'রে সে প্রায় উঠে যায় আর কি! আমরা বললুম, আচ্ছা, কিছু-কিছু ইংরেজি বইও রাখা যাবে, কিন্তু ও-সব শিলিনপাপা-টাপা নয়। বেশ মজার-মজার গল্পের বই—ভূতের গল্প, জাহাজডুবির গল্প—ও-রকম তো অনেক বই আছে ইংরেজিতে।

—কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের কমপ্লীট্ সেট্ রাখতেই হবে, নয়তো আমি তোদের মেম্বরই থাকবো না।

আমি বললুম—আচ্ছা, আচ্ছা। ভয়ে-ভয়ে আর-কিছু বললুম না। মুহূর্তে ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় মনটা হাবুডুবু খেতে লাগলো। বাস্‌রে—ভোঁসলা তো আমাদেরই বয়সি, অথচ পড়েছে কত! আমরা নেহাৎই মুখ্যু।

—হ্যাঁ, যা বলছিলুম। মাসে দু' টাকা চাঁদায় কিছুই হবে না, অন্ততঃ পাঁচ টাকা কর্।

পিণ্টু ব'লে উঠলো—ওরে বাপরে, অত টাকা কোথায় পাবো!

নবা বল্‌লে—তুই দশ টাকা ক'রে দে না, তবেই তো হ'য়ে যায়। তোর বাপ তো সবজজ্।

ভোঁসলা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—সামনের মাসেই আমার দু'শো টাকার বই আসছে বিলেত থেকে। পিরানদেল্লোর বই কত খুঁজলুম এ-দেশে—কোথাও পেলুম না।

—ও-সব বই আমাদের কেলাবে দিয়ে দে না।

—তা তো দেবোই। আরো ঢের দেবো, দেখিস। আমার জন্যে ভাবিস নে, তোরা ঠিক থাকিস্। প্রথম মাসটায় অন্ততঃ পাঁচ টাকা ক'রে দে।

ভোঁসলা যেখানে এক সঙ্গেই দু'শো টাকার বই দিচ্ছে, সেখানে আমার না বলতে ভারি লজ্জা করলো। কিন্তু নবাটা কিছুতেই রাজি হয় না। বলে—ভোঁসলার বাপ বড়োলোক, ও সবই পারে। আমি কোত্থেকে দেবো! পিণ্টুও সঙ্গে-সঙ্গে পোঁ ধরলো।

যা-ই হোক্, অনেক বকাবকি ঝকাঝকি ক'রে ওদের তো রাজি করানো গেলো। ততক্ষণে চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো, ভোঁসলা হাই তুলতে-তুলতে উঠে দাঁড়িয়ে আমার পিঠে একটা টোকা দিয়ে বল্‌লে—দামটা দিয়ে দে। ব'লেই একেবারে রাস্তায়।

বলতে লজ্জা করলো, কিন্তু আমি ভেবেছিলুম ভোঁসলাই দামটা দেবে। মা একটা টাকা দিয়েছিলেন কাপড়-কাচা সাবান কিনতে, ভাগ্যিস সেটা পকেটে ছিলো!

তার পর?

তার পর সত্যি-সত্যি আমি একদিন পাঁচ টাকা দিয়ে চারখানা বই কিনে নিয়ে এলুম। টাকা কোথায় পেলুম তা আর না-ই শুনলে।

ভোঁসলা এসে বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখলো। নাক শিঁটকিয়ে বল্‌লে—কী সব বাজে বই এনেছিস! নিয়ে যাই এগুলো। দুপুরবেলা প'ড়ে দেখবো।

আমি বলুলুম—আমি এখনো—

—আরে তুই তো পড়বিই, তোরই তো বই। আর যা-সব বই, ছুঁতেও ঘেন্না করে আমার! মুখে ও-কথা বল্‌লে বটে, কিন্তু দিব্যি হাতে ক'রে নিয়ে চলে গেলো।

বিকেলে পিণ্টু আর নবা আসতেই বললুম—কী রে, বই কিনেছিস?

নবা বল্‌লে—কিনেছি। ভোঁসলা এসে তো বই নিয়ে গেছে। তোকে দেখায় নি?

পিণ্টু ব'লে উঠলো—সে কী! তোর কাছ থেকেও নিয়েছে! আমাকে বল্‌লে ওর বাড়িতেই সব বই থাকবে, তাই—

ও, তাই! ভোঁসলার উৎসাহে মনটা বেশ খুসি হ'য়ে উঠলো। আমাদের চার জনের মধ্যে ওর বাড়িই সব চেয়ে বড়, বাড়িতে আসবাবপত্রও সব চেয়ে বেশি; ওর বাড়িতেই বইগুলো যত্নে থাকবে। সেইজন্যেই নিয়ে গেছে।

বললুম—চল্ একবার ভোঁসলার বাড়ি, দেখে আসি বইগুলো।

গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি! একতলার যে ঘরে ভোঁসলা থাকে, সেখানে একটি ঝক্‌ঝকে কাচের আলমারিতে আমাদের তিনজনের বইগুলো সাজানো। আহা—তক্‌তকে নতুন বইগুলো কী সুন্দর দেখাচ্ছিলো! ভোঁসলাকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম—ভোঁসলা, তুই-ই গ্রেট!

ভোঁসলা মৃদুমধুর হেসে বললে—আমার এই ঘরটাকেই আমাদের ক্লাব ক'রে দেবো! আমিই হ'বো ক্লাবের সেক্রেটারি—বইয়ের ক্যাটলগ করবো, যখন যে বই দরকার, চেয়ে পাঠালে তক্ষুণি পাবি। আর এখানে ব'সে তো সব সময়েই পড়তে পাবি।

আমি, পিণ্টু আর নবা একসঙ্গে ব'লে উঠলুম—বাঃ, চমৎকার হ'লো!

ভোঁসলা বলতে লাগলো—আমাদের ক্লাবের নাম হবে রীডার্স ক্লাব। একটা রবার-ষ্ট্যাম্প করাতে দিতে হবে। আর খানকয়েক ইজি চেয়ার। আরাম ক'রে না বসলে কি আর পড়া হয়!

পিণ্টু বললে—হ্যাঁ, সে বেশ হবে। ইজি চেয়ারে আরাম্ ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে—

ভোঁসলা ওর কথার মাঝখানেই ব'লে উঠলো—পাশেই একটা ছোট ঘর আছে, সেখানে আমরা চায়ের ব্যবস্থাও রাখবো।

—ওঃ চমৎকার! চমৎকার! নবাটা ফুর্তির চোটে লাফাতে লাগলো।

কেলাবে আরো কী কী করা হবে তা নিয়ে আরো অনেকক্ষণ গুলজার গল্প হ'লো। চ'লে অসবার সময় আমি বললুম—আমার বইগুলো তা হ'লে এখন নিয়ে যাই।

ভোঁসলা বললে—এত ব্যস্ত কেন? তোর বই তো আর আমি খেয়ে ফেলবো না। দাঁড়া, আগে রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিয়ে নিই।

পরের দিন ভোঁসলা এসে বললে—দ্যাখ্, ভাই, আলমারিটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা দেখাচ্ছে, মোটে ও-ক'খানা বই! যদ্দিন আমার বইগুলো না আসে, তোর আরো কিছু বই দে, সাজিয়ে রাখি। তুই তো বইয়ের যত্ন জানিস নে, আমার কাছে ভালোও থাকবে।

আমি বললুম—কী-ই বা বই আছে আমার! এই তো দ্যাখ, মোটে এক আলমারি।

ভোঁসলা আলমারি ঘেঁটে ঘেঁটে খান কুড়ি বই বার করলে। 'পৃথিবীর সেরা গল্প', 'ছোটোদের মহাভারত,' রবিঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ,' জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্র'—এমনি সব বই। এ ছাড়া আলমারিতে একটা ইংরিজী বই ছিলো, মোটা-মোটা চার ভল্যুম, অনেক ছবিওলা, জীবজন্তু সম্বন্ধে। ভোঁসলা বললে—বাঃ, এ-বইটা তো বেশ!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম—ও-বইটা কিন্তু নিস নে, বাবা জানতে পেলে রাগ করবেন। অনেক দাম বইটার—তিনি সখ ক'রে কিনেছিলেন।

ভোঁসলা ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে—কত দাম?

—শ'খানেক টাকা।

—ওঃ, মোটে? আমি ভেবেছিলুম না জানি কী! এটাও নিয়ে যাই, বেশ মানাবে আমার আলমারিতে। বই তো তোরই রইলো—তোর ভাবনা কী? যক্ষুণি দরকার চেয়ে পাঠাবি।......তোদের চাকরকে বল্ তো বইগুলো পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুক।

আমার কথা শুনলে না, অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে পশুপাখীর বইটাও নিয়ে গেলো। আমাদের চাকরই পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো।

তার পর?

তার পর এখন কপাল চাপড়াচ্ছি।

তিন মাস হ'য়ে গেলো, ভোঁসলার পাত্তাই নেই। ওর বাড়িতে কম-সে-কম পঞ্চাশবার গিয়েছি, নীচের সেই ঘর তালা বন্ধ, দিনের বেলায় চাকররা বলে বাড়ি নেই, সকাল বেলায় বলে তেতলার ঘরে ঘুমুচ্ছে, রাত্তির ন'টার পরে হ'লেও তা-ই বলে। চিঠি লিখে অনেকগুলো ডাক-টিকিট খরচ করলাম, কোনো জবাব নেই। এদিকে বাবা রোজই শাসান, সেই জানোয়ারের

বইটা পাওয়া না গেলে আমার পিঠের চামড়া আস্ত রাখবেন না। আর পিণ্টু আর নবার টিটকিরির জ্বালায় প্রায় পাগল হবার জোগাড়। পিণ্টু বলে, ধরমতলার মোড়ে এক পুরোনো বইয়ের দোকানে ও নাকি বাবার সেই চার ভল্যুম বই দেখে এসেছে। নবা বলে, আমার নাম লেখা কয়েকটা বই ও ওর ক্লাশের এক ছেলের কাছে দেখেছে—সে নাকি ফুটপাথ থেকে এক টাকায় ছ'খানা বই কিনেছে। ওদের কথা শুনে গুম্ হ'য়ে থাকি, আর আমার ফাঁক-করা আলমারির দিকে তাকিয়ে আমার মন থেকে-থেকে হু-হু ক'রে ওঠে।

তোমাদের সকলকেই ব'লে রাখি—কাউকেই বই ধার দিয়ো না। মনের ভুলে অন্য কাউকে যদি বা দাও, ভোঁসলাকে কক্ষণো দিয়ো না। ভোঁসলা দেখতে কেমন, তাও তোমাদের ব'লে দিচ্ছি। রং ফর্সা, চোখ কটা, কোঁকড়া ব্যাক্-ব্রাশ-করা, খাটো চুল, গোলগাল মুখ, বেঁটে, বেশ মোটা-সোটা। চেহারা ও চালচলন দেখলে বাচ্চা নবাব মনে হয়। কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয় হাজার টাকার নোট দিয়ে ও ঘুড়ি ওড়ায়। আর যাই করো, এই ভোঁসলাকে কক্ষণো বই ধার দিয়ো না—সাবধান!

"হরিচরণের জন্মান্তর"

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি

নাঃ, হরিচরণের আর বাঁচা চলে না। যে কোনও একটা ভদ্র উপায়ে হোক তাকে মরতেই হবে, না মরলে তার পিসীমাই তাকে পিষে মেরে ফেলে দেবেন গালাগালি দিয়ে। সত্যিই, প্রত্যহ সকালে গালাগালি খেতে খেতে যদি মানুষের ঘুম ভাঙ্গে তা হ'লে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

সেদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন তার কাণে এল পিসীমার সুমধুর কণ্ঠস্বর—"হোরে! ওঠ শীগ্‌গির, অপদার্থ কোথাকার—"

সমস্ত দিনটা ও ভাবলে—দারুণ রকম ভাবলে। পিসীমা গুরুজন, তার ওপর তার বাপ-মা মারা যাওয়ার পর এই পিসীমাই তাকে মানুষ করেছেন কিংবা অমানুষ করেছেন—যাই হোক খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছেন তো! তাঁকে সে অবিচার করবে না। ও ভাবতে লাগল—পিসীমা যা বলেছেন আজ তা সত্যি কিনা। ওকি সত্যিই অপদার্থ? বিজ্ঞানশাস্ত্রের দিক্ দিয়ে দেখতে

গেলে কথাটা ভুল,—মারাত্মক ভুল। ওর বেশ মনে আছে—যদিও সে এক যুগ আগের কথা—স্কুলে বিজ্ঞান পড়াবার সময় মাষ্টার মশায় বলতেন,—"যার ওজন আছে তাকেই পণ্ডিতেরা পদার্থ বলেন। অবশ্য পাণ্ডিত্যের সীমা পিসীমার যে কতটুকু তা সে জানে। কাজেই পিসীমার এ অজ্ঞতাকে সে ক্ষমাই করে ফেলে। পরমুহূর্ত্তেই ওর মনে হয় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্যও ত' রয়েছে এবং সেই সাহিত্যের দিক্ দিয়ে পিসীমা কথাটা বলেন নি ত'! হুঁ, পিসীমা সাহিত্যের দিক্ দিয়েই বলেছেন তাকে—অপদার্থ। পদার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় 'পদ' এবং 'অর্থ'। যদিও এ দুটোর মধ্যে যা সন্ধি তা বিচ্ছেদ করা খুবই শক্ত, কারণ পদ এবং অর্থ সর্ব্বদাই অতি ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বিরাজ ক'রে থাকে সে শুনেছে। পদস্থ হ'লেই অর্থ আসে, আর অর্থ এলেই মানুষ পদস্থ হয়—মানে, অর্থাভাবে মানুষ পদহীন, কিংবা সংস্কৃত করে বললে—বিপদেই পড়ে থাকে চিরকাল। ওর ত' পদও নেই, অর্থও নেই, কাজেই পিসীমা ওকে অপদার্থ বলে কিছু অন্যায় করেন নি। সত্যকথনে দোষ নেই—কিন্তু তবুও কথাটা অপ্রিয় ত'। অপ্রিয় সত্য বলতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এমন কি—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "দ্বিতীয় ভাগেই" আছে—"কাণাকে কাণা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।" পিসীমা বিদ্যাসাগর মশায়ের 'উপক্রমণিকা' পড়েছেন নিশ্চয়—পদার্থের সন্ধি বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত করে ফেল্‌লেন যখন, অথচ তিনি কি ওঁর লেখা দ্বিতীয় ভাগটা পড়েন নি?—হবেও বা, সীমা ছাড়িয়ে অসীমা হওয়াই পিসীমাদের ধর্ম্ম হয়তো।

যাই হোক, কথাটা যখন সত্যি, তখন হরিচরণ মনের সঙ্গে আপোষ করে ফেলে এবং নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় আশ্রয় নেয়—সেদিন রাত্রের মত।

কিন্তু না, পরদিন যা ঘটল তাতে হরিচরণের বাঁচা একেবারেই অসম্ভব দেখা গেল। পরদিন যখন ওর ঘুম ভাঙ্গল তখন সামান্য একটু বেলা হ'য়ে গেছে—মানে মাত্র সাড়ে দশটা। কাণে গেল তার পিসীমা তাঁর কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে তাকে উদ্দেশ করেই বলছেন—"তুই মর্, তুই দেশত্যাগী হ'।"

হরিচরণের মন আজ আর কিছুতেই প্রবোধ মানল না। পিসীমা তাকে আর যাই বলে গালাগালি দিন না কেন, এরকম কথা কোনও দিন বলেন নি। ও ঠিক করলে—বেশ, পিসীমা যা বল্‌লেন অক্ষরে অক্ষরে ও তাই করবে। ও মর্‌বে, ও দেশত্যাগী হবে। কিন্তু, একটু পরেই ওর খেয়াল হ'ল, ঠিক পিসীমার কথামত কাজ করা মুস্কিল—মরেই যদি গেল তা হ'লে আর দেশত্যাগ কর্‌বে কি করে? বরং দেশত্যাগটাই আগে করলে পরে মরতে পারে—মরতে পারে কি মরবেই; না খেতে পেয়েই মরবে সে। মনটা তার অভিমানে ভরে উঠ্‌ল। এই পিসীমার জন্যে সে কি না করেছে! কতদিন রাত জেগে জেগে ও পিসীমার পায়ে বাতের তেল মালিস করেছে। তবে ত' পিসীমা ঘুমুতে পেরেছেন। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর—তার মধ্যে

সেই ছয় ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে চৌধুরীদের হাট থেকে পিসীমা ভালবাসেন বলে ভাল সজনের ডাঁটা কিনে এনেছে সে কত বার, এমন কি পিসীমার টাকার সুদ দিচ্ছিল না বলে হীরু গয়লার সঙ্গে সেবার সে কি মারামারিটাই না করল? হীরু গয়লার বাঁকের দাগ এখনও তার পিঠে জ্বল্ জ্বল্ করছে।······পিসীমা এ সব ভুলে গেলেন! নাঃ, এ সংসার অসার। ও ঠিক করলে, শুধু দেশত্যাগ কেন এ সংসারই সে ত্যাগ করবে। হরিচরণের হরির চরণ ছাড়া আর কোনও ভরসা নেই। দারুণ বৈরাগ্য মনের মাঝে নিয়ে সেই দিনই রাত্রে হরিচরণ চরণ বাড়িয়ে দিল অজানা দেশের উদ্দেশে।

অজানা হোক্ আর জানাই হোক্ যে কোনও দেশে যেতে হ'লে ষ্টেশনে যেতেই হবে তাকে। পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন চলা হরিচরণের কাছে স্বপ্নের অতীত। যেখানেই যাক্ ঐ বাষ্পীয় যানটীর আশ্রয় ওকে নিতেই হবে নইলে ওর 'ত্রাণ' থাকবে না কিছুতেই। কিন্তু সে শুনেছে ঐ রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ত্তারা নাকি বড় অভদ্র; গাড়ীতে চড়লেই পয়সা নেয়। কত খালি কামরা নিয়ে গাড়ী এমনি ছুটছে তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু, ঐ সব খালি কামরার এক কোণে ও যদি উঠে বসে, অমনি নাকি তাকে পয়সা দিতে হবে। কতটুকু জায়গাই বা সে নেবে—আর কতটুকু ওজনই বা বাড়বে ঐ প্রকাণ্ড লম্বা গাড়ীখানার! অঙ্কশাস্ত্র—যার হিসাবে পৃথিবী চল্‌ছে—পৃথিবী কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চল্‌ছে—সেই অঙ্কশাস্ত্রেও, ওর বেশ মনে আছে, ওদের মাষ্টার মশাই সেই অঙ্কশাস্ত্রে কত কি ছোট্টখাট অংশ বাদ দিতেন, বল্‌তেন "এ সব—।" কি একটা বলতেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, "নেগ্‌লিজিব্‌ল্।" তবে গাড়ীর স্থান আর ওজনের দিক্ দিয়ে তার ওজন ও স্থানও ত' নেহাৎই নেগ্‌লিজিব্‌ল্। অত বড় অঙ্কশাস্ত্রের নেগ্‌লিজিব্‌ল্ আছে আর এই সামান্য গাড়ীর নেগ্‌লিজিব্‌ল্ থাকতে পারে না? সব বদ্—এ সংসারে সবাই তার পিসীমা—মানে পিসীমার মত।

যাই হোক, যখন মাত্র কয়েক আনা পয়সা তার সম্বল অথচ যেতে তাকে হবেই কোথাও একটা, তখন ও একবার একটা 'চান্স' নিয়ে দেখবে।

কাজেই হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে সে ষ্টেশনে পৌছুল—রাত তখন প্রায় বারোটা। ঘণ্টাখানেক পরেই একখানা ট্রেন এসে থাম্‌ল ষ্টেশনে—চলেছে কলকাতা। ও একটা কামরায় উঠে পড়ল। উঠে ওর চেয়ে সামান্য একটু বেশী বয়সের এক ভদ্রলোকের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। একটু পরেই গাড়ী দিল ছেড়ে।

অন্ধকার ভেদ করে হু-হু শব্দে গাড়ী ছুটেছে। ধরা পড়ার ভয়ে টিকিটহীন হরিচরণের ভয়ে মুখ আম্‌সী হয়ে যাচ্ছিল প্রতি মুহূর্ত্তে। যাই হোক্, ধরা না পড়েই হরিচরণের অনেকক্ষণ কেটে গেল। ক্রমশঃ যেন আস্তে আস্তে ওর সাহসটা ফিরে আসতে লাগল। পাশের ভদ্রলোকটি

এতক্ষণ তাঁর অপর দিকে যে তুটি ছোট ছেলেমেয়ে বসে ছিল তাদের সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলেন। তিনি এবার অতি মিষ্ট ভাষায় সুরু করলেন হরিচরণের সঙ্গে গল্প করতে। এত চমৎকার তাঁর ব্যবহার আর কথাবার্ত্তা যে হরিচরণ গলে গেল একেবারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তাঁর কাছে ওর যা কিছু তুঃখের কাহিনী সব উজাড় করে দিল। ভদ্রলোক সব শুনে বললেন, "আপনার নামটা আর ঠিকানাটা আমায় দিন; আমার মামার একটা কারখানা আছে সাবানের—চেষ্টা করব যদি আপনাকে কোনও রকমে শিক্ষানবীশ হিসাবে ঢুকিয়ে নেওয়া যায় মামাকে বলে; একবার ঢুকতে পারলেই—"বলে ভদ্রলোক বললেন, "কই আপনার নাম আর ঠিকানাটা?"

হরিচরণ সামনের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটু কাগজ যোগাড় ক'রে তাতে এই ভদ্রলোকের ফাউন্‌টেন্ পেন্‌টা দিয়ে নিজের নাম ও ঠিকানাটা লিখে দিল। এই ভদ্রলোকটী ঐ ঠিকানা আর নাম লেখা কাগজটী তাঁর মানিব্যাগে সযত্নে পূরে মানিব্যাগ্‌টা পকেটে রেখে বল্‌লেন—"দেশে ফিরে যান, ছেলেমানুষী করবেন না। এই রকম রাগ করে গৃহত্যাগ বা দেশত্যাগ করা কি ভাল? আর আপনি যদি দেশেই না থাকেন তা হ'লে আপনাকে খবর দেবই বা কোথায়? কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মামা আমার অনুরোধ রাখবেন নিশ্চয়।"

গাড়ী একটা ষ্টেশনে এসে থাম্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের মত টিকিট-চেকারের আবির্ভাব। প্রায় সকলের টিকিট চেক্ করার পর চেকার ভদ্রলোক অবশেষে এসে হরিচরণের টিকিট্ দেখ্‌তে চাইলেন। হরিচরণ প্রায় কেঁদে ফেল্‌ল—চেকারের চরণ ধরেই প্রায় কেঁদে ফেল্‌ল। তবুও চেকার ওকে গম্ভীর স্বরেই বল্‌লেন—"চল, নেমে চল।"

ঐ ভদ্রলোকটী অতি বিনীতভাবেই বললেন চেকারকে—"ছেড়ে দিন মশাই, ওঁর মা নেই, বাপ নেই—তার ওপর ওঁর পিসীমা বাড়ী থেকে তাড়িয়েই দিয়েছেন এক রকম—"

ওঁর কথায় বাধা দিয়ে চেকার বল্‌লেন—"চুপ করুন মশায়। জানেন না ত' এ রকম বাপ-মা-হারা বহু ধনুর্দ্ধরের সঙ্গেই আমাদের প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয়; কাজেই—" বল্‌তে বল্‌তে হরিচরণকে নিয়ে চেকার ভদ্রলোক নেমে গেলেন। হরিচরণকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে তিনি আবার উঠে পড়লেন ট্রেনটায়।

হরিচরণের তখন কি দারুণ অবস্থা! অন্ধকার রাত্রে কোথায় যে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল! কোন্ জায়গা এটা তাও সে জানে না; কোন্ দিকে যে কলকাতা আর কোন্ দিকে তার নিজের গ্রাম তাও তার কোনও ধারণা নেই। সে শুধু ভাব্‌তে লাগল—ওটা চেকার নয়, ওটা যমদূত, ঐ যমদূতটা তাকে টেনে মরণের মুখে ফেলে দিয়ে গেল। কিন্তু তার সে ধারণা বদ্‌লে গেল পরের দিন সকালে, যখন শুন্‌ল যে যে ট্রেনটায় ও যাচ্ছিল সেই ট্রেনটা আরও গোটা কতক ষ্টেশন যাওয়ার পরেই মাঝপথে লাইন ভেঙ্গে উল্‌টে পড়েছে পাশের এক বিলের মধ্যে;

অনেকগুলো কামরাই একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে; অসংখ্য লোক মরেছে এবং অসংখ্য লোক আহত হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। সে তখন ভাব্‌লে, 'চেকার'টী দূত বটে, তবে যমের নয়, দেবতার। হাত ধরে যদি তিনি নামিয়ে না দিতেন তা হ'লে ত' ওর আজই শেষ হয়ে যেত, নিশ্চয়।

নিজে বেঁচে যাওয়াতে অবশ্য প্রথমটায় ওর দারুণ স্ফূর্ত্তি হ'ল কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল সেই ভদ্রলোক মারা যায় নি ত! আহা বড় ভাল লোক, আর তা ছাড়া ভদ্রলোকটী তাকে কাজ যোগাড় ক'রে দেবে বলেছে যে! সর্ব্বনাশ! নিশ্চয় সে গেছে শেষ হয়ে। ...নাঃ, বাড়ী ফেরা আর হ'ল না। ও ভদ্রলোকই যদি বেঁচে না থাকে তা হ'লে বাড়ী ফিরে গিয়ে আর লাভ কি? ওর চিঠি ত' আর আস্‌বে না! মাঝ থেকে পিসীমার আবার সেই গালাগালি! না, কিছুতেই বাড়ী ফির্‌বে না হরিচরণ। ওর সমস্ত রক্ত তখনও মাথায় চড়ে রয়েছে। ও ঠিক কর্‌লে, কলকাতাতেই যাবে এবং শেষ পর্য্যন্ত একদিন গিয়ে পৌঁছুলও কলকাতায়—অবশ্য বহু কষ্ট ক'রে এবং বহুদিন পরে।

অজানা দেশের উদ্দেশে সে বার হয়েছিল—হয়ত সত্যিকারের এক অজানা দেশের উদ্দেশেই তাকে পাড়ি দিতে হ'ত যদি থাকৃত সে সেই ট্রেনে শেষ পর্য্যন্ত। সে অজানা দেশে না গেলেও যে দেশে সে এল, মানে,—কলকাতায়, সেটাও কম অজানা নয়। প্রথমটায় হরিচরণ অকূল পাথারে হাবু-ডুবু খেতে লাগল; কিছুদিন পরে অবশ্য সে কোনও রকমে থই পেয়ে গেল। এর অল্প কিছুদিন পরেই সে দেখ্‌ল যে এই অজানা দেশকে 'অজানাং দেশ' মানে 'অজ্ঞেদের' দেশও বলা চলে, কারণ, এখানে 'অজ্ঞ' লোকের অভাব নেই। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে মানুষের বুদ্ধি খোলে। হরিচরণের বুদ্ধিও খুলে গেল শেষ পর্য্যন্ত। বুদ্ধির জোরে বিনা মূলধনেই ঐ 'অজ্ঞ' জাতীয় লোকগুলির মাথায় হাত বুলিয়েই খেতে লাগল হরিচরণ।

পাকা তু'টী বৎসর কেটে গেল এমনি করে। হরিচরণের আর ভাল লাগছিল না কলকাতাটা। কলকাতার মেসের রান্না—ধ্যুৎ। আহা, পিসীমার হাতের রান্না সেই ঝাল ঝাল সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি, সরষে দিয়ে মাছের ঝাল—আমড়ার চাট্‌নি—কত দিন যে সে খায় নি! মনটা তার পাগল হয়ে উঠ্‌ল দেশে ফিরবার জন্য। পিসীমাকে সে মনে মনে এত দিনে ক্ষমা করে ফেলেছে। এখন সে ভাবে, পিসীমা তাকে যাই বলুন মুখে, মনে মনে হরিচরণ বল্‌তে অজ্ঞান।

নইলে, সেবার একসঙ্গে চার পয়সার ছোলা ভাজা খেয়ে রাত্রে ওর যখন ভেদ-বমি সুরু হয় তখন সেই রাত্রেই ত' পিসীমা ছোটেন এক ক্রোশ দূরে মা ওলা বিবিকে পূজো দিতে। তা না হ'লে কি আর ও বাঁচত? ওলা বিবির দয়াতেই ত' প্রায় এক বস্তা ছোলা খেয়েও সেবারে সে বেঁচে গেল। না, পিসীমার কাছে ও ফিরে যাবে—তাঁকে ও আর কষ্ট দেবে না।

ফিরল হরিচরণ, শেষ পর্য্যন্ত এক শীতের দিনে ফিরল দেশে। ষ্টেশনে এসে যখন সে নামল তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে সে তার গ্রামের দিকে পা বাড়াল। কিছুক্ষণ মাঠের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার পথে চলার পর ওর চোখে পড়ল একটু দূরে একটা দোকান—পানের দোকান। হ্যাঁ, ঐ ত' শম্ভুর পানের দোকান ওটা। মনটা ওর খুসীতে ভরে উঠল। আবার সেই নিজের গ্রাম—সেই সব পরিচিত লোক—সেই নিজের পিসীমা। সে চল্‌ল এগিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে; রাস্তার দু'পাশে টিম্ টিম্ করে কেরোসিন আলো জ্বল্‌ছে। পথে জনপ্রাণীর দেখা নেই, শীতের ভয়ে সবাই বোধ হয় দরজা দিয়েছে। কিছু দূর আরও এগিয়ে চৌমাথা রাস্তায় এসে পৌঁছে ও দেখ্‌ল সেই চৌমাথার মাঝখানে অল্প একটু জায়গা ঘিরে তার মধ্যে একটা ছোট থামের মত কি গাঁথা রয়েছে। হরিচরণ ভাবলে এটা এল কোথা থেকে—এটা ত আগে এখানে ছিল না। সে এগিয়ে গেল—ঐ থামটার খুব কাছেই এগিয়ে গেল। রাস্তার একটা ল্যাম্প্-পোষ্ট থেকে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছিল সেই থামটার উপর। সেই অল্প আলোতে ও পড়লে—ঐ থামটার গায়ে লেখা রয়েছে, পড়লে—"হরিচরণ স্মৃতি-স্তম্ভ"। ব্যাপারটা বুঝতে পারল না ও। ও ছাড়া এ গাঁয়ে হরিচরণ ত' আর কেউ ছিল না! এর মধ্যে আবার নতুন হরিচরণ কেই বা এল; মরলই বা কবে, আর এমন কি মহৎ কার্য্য করেই বা মরল সে যা'র জন্য গ্রামের লোকে এত ঘটা ক'রে তার স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করেছে!

সে আরও এগুলো, আরও এগুতে সে দেখল তাদের যে ছোট লাইব্রেরীটা ছিল তার দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা সাদা পাথর এঁটে দেওয়া হয়েছে, আর সেই পাথরে লেখা রয়েছে—"হরিচরণ পাঠাগার"।—এ লেখাটা জ্বল্ জ্বল্ করছে, কারণ ঐ জায়গাটাতেই রয়েছে একটা ল্যাম্প্-পোষ্ট—তার সমস্ত আলোটা ওর উপরে এসে পড়েছে।

ওর মনের মধ্যেটা বিরক্তিতে ভরে গেল—ভাবলে, আবার সেই হরিচরণ—

শেষ পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছুল ও। ডাকল—"পিসীমা, ও পিসীমা!"—বেশ জোরেই ডাকল। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সে ভাবলে—পিসীমা মারা যান নি ত' হঠাৎ কোনও কিছু হয়ে? হতেও পারে, এ রকম ত' কতই হয়! মারা যেতে মানুষের দেরী লাগে নাকি?

কিন্তু, না, পিসীমা ত' বেঁচে আছেন, ঐ ত' পিসীমা দরজা খুললেন!

ও ভেবেছিল—পিসীমা দরজা খুলে ওকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু ও কি! পিসীমা যে থর থর করে কাঁপছেন! মুখ ছাইএর মত সাদা হয়ে গেছে! পিসীমা এত ভয় পেলেন কেন হরিচরণকে দেখে তা' হরিচরণ কিছুতেই বুঝতে পারল না।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্‌ল—"পিসীমা, ব্যাপার কি?"

পিসীমা তখনও কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতেই জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি বাবা, হরিচরণের প্রেতাত্মা? আমাকে কিছু ব'ল না বাবা। আমি ত' তোমাকে কিছু—"

হরিচরণ তাঁর কথায় বাধা দিয়ে একটু বিস্মিতভাবেই বল্‌লে—"ভূত হ'তে যাব কেন? মানুষ না মরলে কি ভূত হয়? আমি ত' খাস জলজ্যান্ত হরিচরণ!"

পিসীমা এতক্ষণে একটু যেন ধাতস্থ হয়েছেন ব'লে মনে হ'ল।......আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে হরিচরণের পাশে তাঁর হাতের আলোটা ধরলেন; হরিচরণের যে ছায়াটা পড়ল তার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার পর হরিচরণের পা দুটো বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখলেন। এইবার একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়লেন সজোরে। আস্তে আস্তে নিজে নিজেই বল্‌লেন—"ছায়া পড়ছে, পা দুটোও উল্টো নয়—সোজাই আছে, তা হ'লে ভয় নেই।" এতক্ষণে সত্যিই তিনি আশ্বস্ত হ'লেন।

হরিচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সত্যিই তুই বেঁচে আছিস বাবা! আমি কি করব? শুন্‌লাম, বহু লোক মারা গেছে রেল গাড়ী উল্টে গিয়ে। যারা মারা গিয়েছিল তা'দের মধ্যে তোর নামও ছিল যে ওরা বল্‌লে। তোর চেহারা থেঁৎলে এমন হয়ে গিয়েছিল যে কিছু আর চেনবার জো ছিল না; শুনলাম নাকি দুটো ছোট ছেলেমেয়েকে বাঁচাতে গিয়েই তুই নিজে আর গাড়ী থেকে লাফাতে পারিস নি। তোদের কামরায় আর যে ক'জন ছিল তারা সকলেই লাফিয়ে পড়ে বেঁচে গিয়েছিল, ছেলেমেয়ে দুটোও বেঁচে গিয়েছিল তুই ছুঁড়ে দিয়েছিলি ব'লে। কেবল পরের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তুই-ই মারা গেলি।"

হরিচরণ এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে নিজেরই মৃত্যু-কাহিনী শুনছিল। এর আগে বোধ হয় কারো জীবনে এ রকম ঘটে নি। এইবার সে শুধু বল্‌লে, "সে লোকটা যে আমি তা জানল কি ক'রে লোকে?" পিসীমা বল্‌লেন, "তোর থেঁৎলান চেহারা দেখে ত' বল্‌লাম, তোকে চেনবার উপায় ছিল না; খালি একটা শবের জামার পকেটে একটা ব্যাগের ভিতর নাকি তোর নাম, ঠিকানা সব লেখা ছিল—তাতেই তোর শব বলেই লোকে ঠিক ক'রে সেটাকে।" পিসীমা একটু থেমেই আবার বল্‌লেন—"আহা, তোর শবটাকে কি সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে সেটা নিয়ে ছেলেরা যে কি 'অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা করেছিল—যদি দেখতিস তুই—" বলে পিসীমা চোখ বুঁজলেন—চোখ বুঁজে একবার সেই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রার কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন, বোধ হয়।

হরিচরণ এবার বেশ বিরক্ত হয়েই বল্‌লে—"আমার শব মানে?"

পিসীমা চোখ তাকিয়ে বল্‌লেন—"তোর শব মানে—যে শবটাকে ওরা তোর শব বলে

মনে করেছিল—সেইটা ; যাক্, তার পর তোর নামে গাঁয়ের ছেলেরা সভা কর্‌ল, গান বা'র কর্‌ল। তার পর চৌরাস্তার মোড়ে একটা স্তম্ভ তুল্‌ল, লাইব্রেরীটার নাম রাখল তোর নামে।"

হরিচরণের এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

পিসীমা বল্‌লেন—"ওরা সকলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—হরিচরণবাবু কলকাতায় যাচ্ছিলেন কেন হঠাৎ ?......"

হরিচরণ মনে মনে এবার বেশ একটু আনন্দ অনুভব করলে। এর আগে কেউ কখনও তাকে 'বাবু' বলে নি ত'—এই চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

পিসীমা বল্‌তে লাগলেন—"আমি আর কি বলি তখন ? বল্‌তে ত' পারি নে যে হরি রাগ ক'রে চলে গিয়েছে—আমারই উপর রাগ ক'রে। তাই বল্‌লাম—'বড় অর্থকষ্ট যাচ্ছিল আমার, হরিচরণ তাই টাকা রোজগারের চেষ্টায় কলকাতা যাচ্ছিল।' শুনে তক্ষুণি ওরা সকলে মিলে গ্রামের জমিদারকে ধরে আমাকে—হরিচরণের পিসীমাকে ত্রিশ টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিল।" বল্‌তে বল্‌তে পিসীমা হঠাৎ হরিচরণের হাত দু'টো চেপে ধরলেন। ধরে' অতি কাতরভাবে বল্‌লেন. "তুই বাবা, এ গাঁয়ের লোকেদের আর দেখা দিস্ নে। তা হ'লে তোর এত সম্মান সব নষ্ট হ'বে—আর আমার এ মাসোহারাটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুই বরং একটু দূরে অন্য কোথাও গিয়ে ওদের চোখের আড়ালে থাক্। আমি বরং আমার মাসোহারার অর্দ্ধেক করে দেব তোকে প্রতি মাসে।"

হরিচরণ বল্‌লে—"পিসীমা, জীবনের মত এ গ্রাম ছেড়ে যাব—তা কি করে হয় ? তা ছাড়া তোমার হাতের রান্না না খেলে আমি বাঁচব না।"

হরিচরণের কথা শুনে পিসীমা কি একটু ভাবলেন ; "দেখ্, তুই তা হ'লে আর এক কাজ কর। বছরখানেক কোথাও গা ঢাকা দে, আর ঐ ফাঁকে দাড়ি রাখ্—তা হ'লে তোকে আর ওরা চিন্‌তে পারবে না। আমি বলব—তুই হরিচরণের মাসতুতো ভাই।"

হরিচরণ বল্‌লে, বেশ একটু আশ্চর্য্য বোধ করেই—"এক বছরে কি এমন দাড়ি— ?"

পিসীমা বাধা দিয়ে বল্‌লেন,—"জঙ্গল হয়ে যাবে রে, জঙ্গল হয়ে যাবে। আমাদের বংশে সকলেরই যা দাড়ির বহর—তুই ত' জানিস্ নে তা' !"

বংশের দাড়ির বহরের কথা শুনে হরিচরণ অনুসন্ধিৎসু নেত্রে তাকায় পিসীমার গালের দিকে। অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ ওর খেয়াল হয়—আ-রে, পিসীমা যে মেয়ে মানুষ ! লজ্জিত হয়ে পড়ে ও।

যাই হোক, পিসীমার কথা মত হরিচরণ গা ঢাকা দিল এক দূর দেশে আর সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি রাখ্‌তে সুরু কর্‌লে। একটী বৎসরের মধ্যে হরিচরণের মুখে সত্যিই এইসা দাড়ি গজিয়ে গেল যে হরিচরণকে দেখে তা'র পিসীমাই আর চিন্‌তে পারেন না প্রায়—সব জেনেশুনেও।

গ্রামের লোকের পক্ষে ঐ দাড়ি ভেদ করে হরিচরণের মুখটুকু আবিষ্কার করা যে বেশ দুঃসাধ্য তা বোঝা গেল সহজেই।

হরিচরণ সেই থেকে গ্রামেই বাস করতে লাগ্‌ল নিশ্চিন্ত মনে হরিচরণের মাসতুতো ভাই হয়ে। পিসীমার কাছে হরিচরণের আর আদরের সীমা রইল না ; আর এ দিকে বাঁচা হরিচরণ প্রতি বৎসর মরা হরিচরণের স্মৃতি-বার্ষিকীতে সমানে যোগ দিতে লাগ্‌ল। এক কথায় হরিচরণ বেঁচে থেকেই মরে গেল এবং মরে গিয়েই বেঁচে গেল।

শরৎ ও হেমন্তে বাঙ্গালীর খাদ্য

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

বাঙ্গালা দেশের সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর সময় বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে শ্রাবণের মাঝামাঝি। এই সময় বাঙ্গালাদেশে মৃত্যুর হার সব চেয়ে কম। আর একটা ভাল সময় পৌষের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত।

শ্রাবণের শেষার্দ্ধ হইতে পৌষের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর কাল। এ সময় ম্যালেরিয়ায় অনেক লোক মরে ; আমাশয়, সর্দ্দি-কাসি এবং টাইফয়েড জ্বরেও অনেকে ভোগে। ফাল্গুনের শেষার্দ্ধ হইতে বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত দেশে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ বেশী হয়।

আশ্চর্য্য এই যে, যে দুই সময় স্বাস্থ্যকর বেশী সেই সময়ে দেশে খাবারের প্রাচুর্য্যও বেশী। বৈশাখ মাস হইতে আম আরম্ভ হয়। বাঙ্গালার উহা প্রধান ফল, সকল বাঙ্গালীই উহা অল্পাধিক ভোগ করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠের শেষে যখন দেশে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তখন আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল প্রভৃতি সকল ফলই বেশ রসাল হইয়া উঠে। নতুন বৃষ্টিতে ঘাস বাড়িয়া যাওয়ায় গরুদের খাবারেরও সুবিধা হয় ; আষাঢ় মাসে বাংলায় দুধ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। পান এই সময়ে অসম্ভব সস্তা হয়, অন্য শাকপাতাও তাই। দুধ, শাকপাতা ও ফল—এ সবই যে শরীরের রক্ষী খাদ্য (ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'প্রটেক্‌টিভ্ ফুড্') তাহা আগেও কয়েকবার বলিয়াছি !

অগ্রহায়ণ মাস হইতে বাজালায় মাছ প্রচুর সস্তা হইতে আরম্ভ করে। ঐ সময়ের পর মাঠ খালি হওয়াতে মাঠে গরু চরিবার সুবিধা হয়। তখনও মাঠ সরস থাকাতে মাঠে যথেষ্ট ঘাস জন্মে। গরুদের খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে দুধও সস্তা হইতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ বাজারে নানা রকম আনাজ দেখা দেয়। শীতের আনাজ অতি প্রসিদ্ধ। নূতন আলু, মূলা, কপি, শালগম ইত্যাদি এবং নানা জাতীয় শাক এই সময়ে প্রচুর পাওয়া যায়। এ সময়েও দেখি দেশে রক্ষী খাদ্যের প্রাচুর্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের আবির্ভাব।

মাঘ মাসে মূলা বন্ধ হয়, তবে আলু বেশ সস্তা থাকে। ফাল্গুন হইতে কপি কড়াই-সুঁটী, পালং শাকের কমতি পড়িতে থাকে। মাছ কম পড়ে; মাঠে ঘাস কম পড়ে—গরু দুধ দেয় কম। ফলে খাদ্যে ভিটামিনের অভাব পড়ে। জলের অভাবও অনেক জায়গায়ই দেখা দেয়। দেশের স্বাস্থ্যও অনেকটা খারাপ হইয়া পড়ে।

শ্রাবণ পর্য্যন্ত জমি জলে ভিজিতে থাকে। ঘাস ও উদ্ভিদ্ প্রথম প্রথম অসাধারণভাবে বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহার পরেই যখন খুব বড় চাপা বৃষ্টি হইয়া দেশ প্লাবিত হয় তখন অধিকাংশ উদ্ভিদের তলায় জল জমিয়া সেগুলি মরিতে আরম্ভ করে। পটল, ঝিঙে, বেগুন ক্রমশঃ দুর্ল্লভ হইতে থাকে। আলুর দাম বেশ চড়িয়া যায়। শাক গাছেরও তলা পচিয়া উহারা মরিয়া যাইতে থাকে। আম তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, গরুরও খাইবার অসুবিধা হয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীগ্রামে এই সময়ে দুধের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। পুকুর, নদী, নালা জলে ভাসিয়া যাওয়ায় মাছ ধরা খুব দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, এজন্য মাছেরও দাম বাড়িয়া যায়। কাজেই এই সময়ে দেশের স্বাস্থ্যেরও সর্ব্বাপেক্ষা অবনতি হয়।

খাদ্যের সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অন্য দেশেও লক্ষিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নাম করা যাইতে পারে। সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সেখানে খাদ্যে ভিটামিন 'সি' কম পড়াতে সংক্রামক ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছে। আবার এক জাহাজ ফলের আমদানী হওয়ার পরই ঐ সকল ব্যাধি শীঘ্র তিরোহিত হইয়াছে। বিলাতেরও অনেক বোর্ডিং স্কুলে সংক্রামক রোগের

আধিক্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে ছেলেদের খাদ্যে ফল কম পড়িয়াছিল। ফলের মাত্রা বাড়াইয়া দিবার পরই সত্বর রোগ সারিয়া যায়।*

এখন আমাদের কথা। সামনে শরৎ ও হেমন্ত আসিতেছে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে খাদ্যদ্রব্য 'তুলিত' বা 'সামঞ্জস্যপূর্ণ' (Balanced) হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ শুধু ভাত ডাল খাইয়াই স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; ঐ সঙ্গে কিছু জান্তব প্রোটীন খাদ্য (যাহা মাছ দুধ, মাংস ও ডিমে আছে) থাকা আবশ্যক, কিছু ফল বা কাঁচা খাদ্য থাকা আবশ্যক, কিছু শাক পাতা আবশ্যক। বাংলাদেশে—বিশেষ পল্লীগ্রামে ফলের বা অন্য কাঁচা খাদ্যের এ সময়ে বিশেষ সদ্ভাব নাই, সুতরাং যা পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করিতে হইবে। লেবু এ সময় পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই অন্ততঃ যাহাতে দিন আধখানা পাতি বা কাগজি লেবু খায় তা দেখিতে হইবে। অভাবে অন্ততঃ তেঁতুল, চালতা বা আমড়ার অম্বল। শশা ও নারিকেল এ সময় পাওয়া যায়, ওগুলিও যথাসম্ভব ব্যবহার করিতে হইবে। কাঁচা আদা, কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রসুন বা ছোলাভিজা হইতে কতক পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। আর ছেলেদের চুনা মাছ খাওয়া অভ্যাস করিতে হইবে। অনেক ছেলে বড় মাছ না পাইলে ছোট মাছ খায়ই না। কাজেই তাদের পুষ্টির ক্ষতি হয়। অনেক স্থানে লোককে বর্ষায় ডালই বেশী ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে বেশী রকমারি ডাল ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে, কারণ এমন কোনও ডাল নাই যাহার দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধিত হইতে পারে। বর্ষার সময়ে ঘিয়েরও দাম বাড়িয়া যায়, এ জন্য উহা পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

আর একটা উপায়ে শরৎ-হেমন্তে বাঙ্গালীর রক্ষক খাদ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আর কিছু নয়, কতকগুলি চাষের প্রথা পরিবর্ত্তিত এবং নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া। যেমন বাঙ্গালা দেশে যদি নেপিয়ার ঘাসের চাষ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে গরুর খাদ্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। বর্ষাকালে ঐ

* Needham & Green: Perspectives in Biochemistry (Cambridge University Press, 1937) নামক গ্রন্থ হইতে।

ঘাস বেশ জোরে বর্দ্ধিত হয়। আমার সামান্য একটু জায়গায় যে ঘাস জন্মে তাতে দু' তিনটা গরুর প্রত্যেকে দিন প্রায় আধ ঝুড়ি ঘাস পায়।

অন্য উপায় হইতেছে চাতাল বাগান (Terrace gardening) করিয়া বিবিধ ফসল জন্মান। কলিকাতায় দশ বার বৎসর আগে বর্ষায় বড় বেগুন পাওয়া প্রায় দুর্লভ ছিল। এখন কিন্তু উহা যথেষ্ট পাওয়া যায়। গড়িয়া গ্রামের কাছে ঐ বেগুনের চাষ দেখিয়াছি। চাষারা একটা জমির চারিধারে খানা কাটিয়া জমিটাকে উঁচু করে। বর্ষার জল ঐ খানায় গিয়া জমে, ক্ষেতে জমিতে পারে না। তা ছাড়া তারা বেগুন গাছের বেশ বড় বড় আল (দাঁড়া) করিয়া দেয়। ইহাতে বেগুন গাছের গোড়ায় জল বসিতে পারে না। আমি কলমী, শুষুনি, কুলেখাড়া প্রভৃতি শাক সাধারণ বাগান-জমিতে বসাইয়া দেখিয়াছি উহারা বর্ষার জলে বেশ বৃদ্ধি পায় এবং যথেষ্ট শাক দেয়।

আর একটা উপায় হইতেছে লোকেদের শাক পাতা খাওয়াইবার নূতন রুচি প্রস্তুত করিতে হইবে। সজনেপাতা, আম, জাম, বট. অশ্বত্থের কচিপাতা, কুলেখাড়া, হিঞ্চা, শালুক, শুষুনি, সালিঞ্চ ইত্যাদি শাক খাইবার প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন ভাদ্র সংখ্যায় দেখ।]

১। আব্রাহাম্ লিঙ্কন্, আমেরিকার।

২। সিঙ্কোনা জাতীয় গাছের ছালে; সমুদ্রের জলে বা খনিতে; আলকাৎরা থেকে; বক্সাইট্, ক্রায়োলাইট্ প্রভৃতি খনিজ পদার্থে, আফিম ফল থেকে।

৩। ক্রিমিয়া যুদ্ধের আরম্ভ, ওয়াটালুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পলাশীর যুদ্ধ।

বিচিত্র ভারত

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের দু'টি পীঠস্থান

কোণারকের সূর্য্য-মন্দির (ভগ্নাবশেষ)

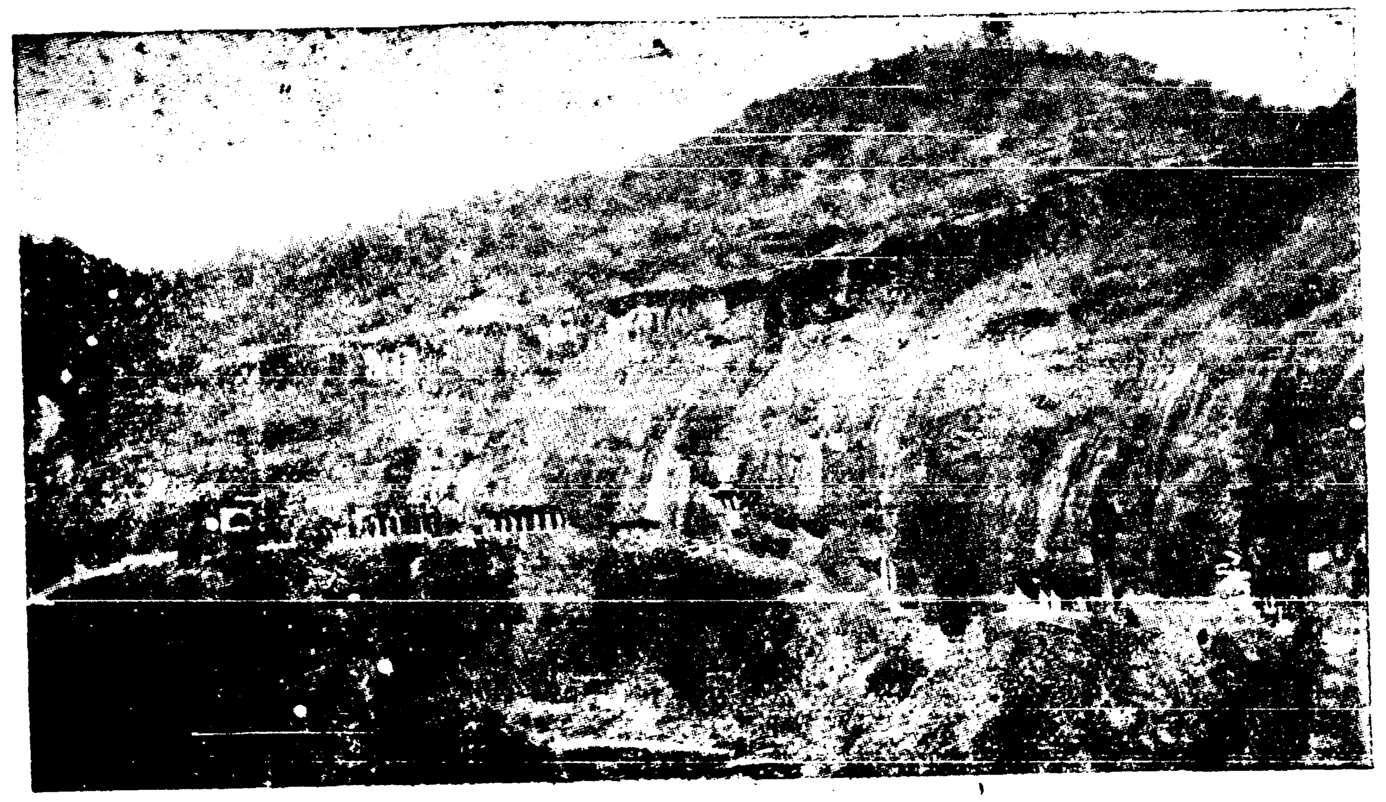

অজন্তা গুহার দৃশ্য (দূর থেকে তোলা ছবি)

রামধনুর দু'জন তরুণ লেখক

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

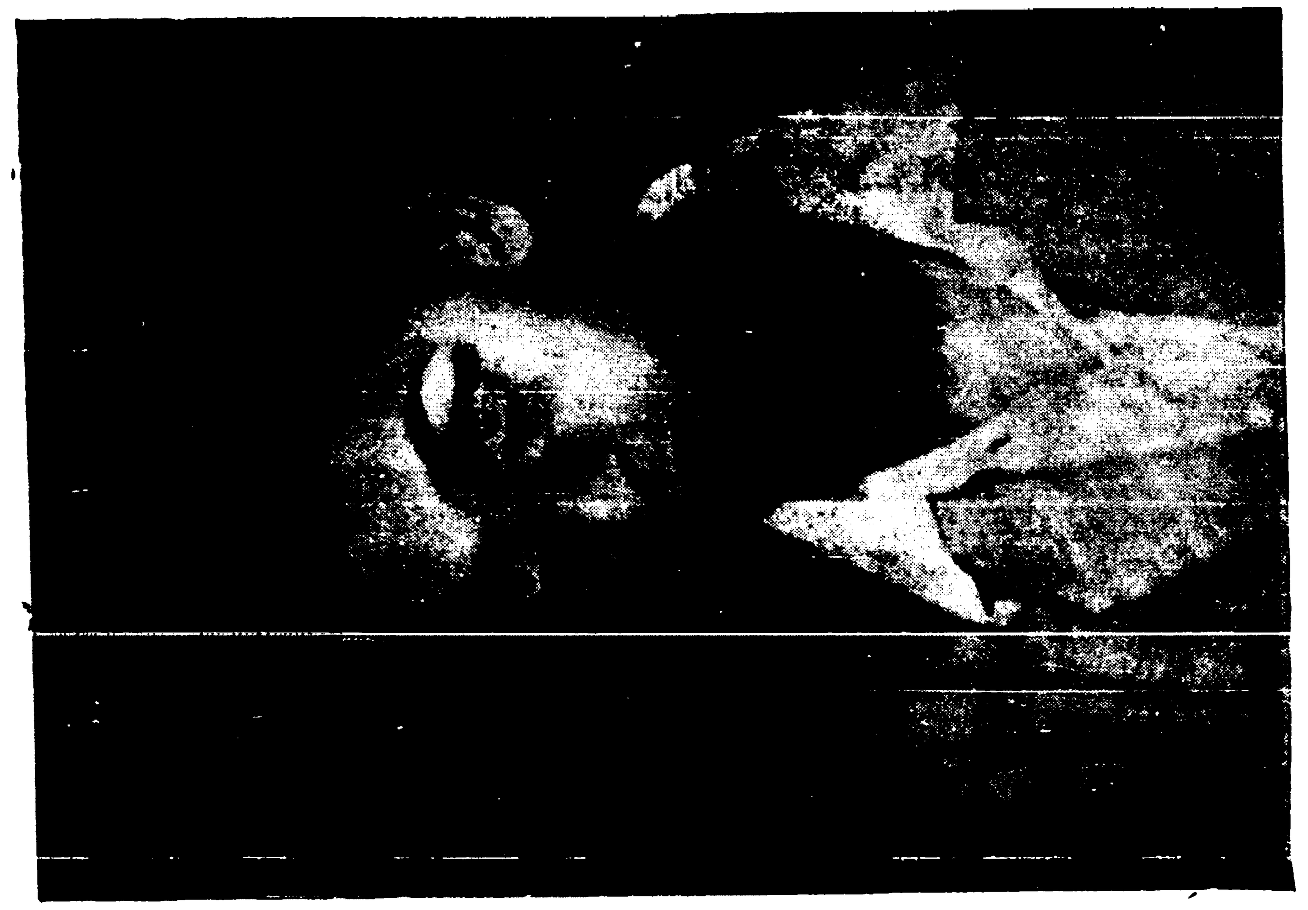

শ্রীফাল্গুনী রায়

অমৃত-দ্বীপ

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বীপের নিরুদ্দেশ যাত্রা

সেই ভয়ানক অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহ এমন ভাবে তিন দিক্ আগ্‌লে এগিয়ে আসছে যে, মুক্তিলাভের কোন পথই আর খোলা রইল না।

ব্যূহ যারা গঠন করেছে তাদের দিকে তাকালেও বুক করতে থাকে ছাঁৎ-ছাঁৎ! তারা মানুষ, না অমানুষ? তারা যখন মাটির উপরে পদ সঞ্চালন ক'রে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাদের জ্যান্তো মানুষ ব'লেই না মেনে উপায় নেই, কিন্তু দেখলে মনে হয়, যেন দলে দলে কবরের মড়া হঠাৎ কোন মোহিনী-মন্ত্রে পদচালনা করবার শক্তি অর্জ্জন করেছে! এবং এবারেও সবাই লক্ষ্য করলে যে, কেবল দুই পা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক যেন মৃত্যু-আড়ষ্ট হয়ে আছে!

অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহের দুই প্রান্ত বিমলদের পিছনকার প্রাচীরের দুই দিকে সংলগ্ন হ'ল, মাঝে থাকল একটুখানি মাত্র ফাঁক, যেখানে অবাক্ ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা তিন জনে।

এদের উদ্দেশ্য কি? এরা তাদের বন্দী করতে, না বধ করতে চায়? ওদের মুখ দেখে কিছু বোঝা অসম্ভব, কারণ মড়ার মুখের মতন কোন মুখই কোন ভাব প্রকাশ করছে না—কেবল তাদের অপলক চোখে চোখে জ্বলছে যেন নিষ্কম্প অগ্নিশিখা, যা দেখলে হয় হৃৎকম্প!

কুমার মরিয়ার মতন চীৎকার ক'রে বললে, "কপালে যা আছে বুঝতেই পারছি, আমি কিন্তু পোকার মতন ওদের পায়ের তলায় প'ড়ে প্রাণ দিতে রাজি নই—যতক্ষণ শক্তি আছে বিমল, বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো!"

সঙ্গে সঙ্গে শত শত কণ্ঠে আবার জাগল অট্টহাস্যের পর অট্টহাস্যের উচ্ছ্বাস!

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের ওপার থেকেও ভীষণ হুঙ্কার ক'রে সাড়া দিতে লাগল সেই শিকার-বঞ্চিত হতাশ দানব-জন্তুটা!

সেই সমান-ভয়াবহ হাস্য ও গর্জ্জনের প্রচণ্ডতায় চতুর্দ্দিক হয়ে উঠল যেন বিষাক্ত!

ও-দানবটা যেন চ্যাচাচ্ছে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে, কিন্তু এই মূর্ত্তিমান্ প্রেতগুলো এত হাসে কেন ?

বিমল বল্‌লে, "জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে যে মূর্ত্তিটা ভেসে আসছিল, তাকেও দেখতে ঠিক এদেরই মত। সেও হয়তো এই দলেই আছে!"

কুমার তখন তার বন্দুক তুলেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে বন্দুক নামিয়ে বল্‌লে, "বিমল, বিমল, একটা কথা মনে হচ্ছে!"

—"কি কথা ?"

—"লাউ-ৎজুর মূর্ত্তিটা আমার সঙ্গেই আছে। জানো তো, 'তাও'-সাধুরা বলে সে মূর্ত্তি মন্ত্রপূত আর তাকে সঙ্গে না আনলে এ দ্বীপে আসা যায় না ?"

বিমল কতকটা আশ্বস্ত স্বরে বল্‌লে, "ঠিক বলেছ কুমার, এতক্ষণ ও-কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। ঐ মূর্ত্তির লোভে কলকাতায় মানুষের পর মানুষ খুন হয়েছে! তার এত মহিমা কিসের, এইবারে হয়তো বুঝতে পারা যাবে! বার কর তো একবার মূর্ত্তিটাকে, দেখি সেটা দেখে এই ভূতগুলো কি করে ?"

কুমার তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর থেকে জেড্-পাথরে গড়া, রামছাগলে চড়া সাধক লাউ-ৎজুর সেই অর্দ্ধ-তপ্ত অর্দ্ধ-শীতল মূর্ত্তিটা বার ক'রে ফেললে এবং ডান হাতে ক'রে এমন ভাবে তাকে মাথার উপরে তুলে ধরলে যে, সকলেই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে।

ফল হ'ল কল্পনাতীত!

মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল অট্টহাস্য এবং আচম্বিতে যেন কোন অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা খেয়ে সেই শত শত আড়ষ্ট মূর্ত্তি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে যেতে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার—তিনজনেই অত্যন্ত বিস্মিতের মত একবার এ-ওর মুখের দিকে এবং একবার সেই পশ্চাৎপদ বীভৎস মূর্ত্তিগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল বারংবার।

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে জয়ন্ত বল্‌লে, "এতটুকু মূর্ত্তির এত-বড় গুণ এ-কথা যে বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না!"

বিমল বল্‌লে, "এতক্ষণে বোঝা গেল, এই দ্বীপে ঐ পবিত্র মূর্ত্তিই হবে আমাদের রক্ষাকবচের মত। ওকে সঙ্গে ক'রে এখন আমরা যেখানে খুসি যেতে পারি।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "না বিমলবাবু, না। এই সৃষ্টি-ছাড়া দ্বীপ আমাদের মতন মানুষের জন্যে তৈরি হয় নি। এখানে পদে পদে যত-সব অস্বাভাবিক বিপদ্ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে,

এর পর হয়তো লাউ-ৎজুর মূর্ত্তিও আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না! আমি চাই নদীর ধারে যেতে—যেখানে বাঁধা আছে আমাদের নৌকো।"

কুমার বল্‌লে, "আপাততঃ আমিও জয়ন্তবাবুর কথায় সায় দি। আবার যদি এখানে আসি, দলে ভারি হয়েই আসব। কিন্তু নদী কোন্ দিকে ?"

বিমল বল্‌লে, "নিশ্চয়ই পশ্চিম দিকে। ঐ দেখ, চাঁদের আলো নিবে আসছে, পূর্ব্বের আকাশ ফর্সা হচ্ছে!"

যেন সমুজ্জ্বল স্বপ্নের মত স্নিগ্ধতার মধ্যে দেখা গেল, প্রান্তরের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তালজাতীয় তরুকুঞ্জ ও ছোট ছোট বন। এতক্ষণ যারা এসে এখানে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল সেই অপার্থিব মূর্ত্তিগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে চোখের আড়ালে কোথায়!

বিমল সব দিকে চোখ বুলিয়ে বল্‌লে, "আর বোধ হয় ওরা আমাদের ভয় দেখাতে আসবে না। চল কুমার, আমরা ঐ বনের দিকে যাই। খুব সম্ভব, ঐ বনের পরেই পাব নদী।"

তারা বন লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'ল এবং চলতে চলতে বারবার শুনতে লাগল, সেই অজানা অতিকায় জানোয়ারটা তখনো আকাশ কাঁপিয়ে দারুণ ক্রোধে চীৎকার করছে ক্রমাগত!

প্রায় সিকি মাইল পথ চলবার পর বনের কাছে এসে তারা শুনতে পেলে, গাছে গাছে জেগে উঠে ভোরের পাখীরা গাইছে নূতন উষার প্রথম জয়গীতি। আঁধার তখন নিঃশেষে পালিয়ে গেছে কোথায় কোন্ দুঃস্বপ্নলোকের অন্তঃপুরে।

দানবের চীৎকারও থেমে গেল। হয়তো সেও ফিরে গেল হতাশ হয়ে তার পাতালপুরে। হয়তো রাত্রির জীব সে, সূর্য্যালোক তার চোখের বালি।

বাতাসও এতক্ষণ ছিল যেন শ্বাস রোধ ক'রে, এখন ফিরে এল নিয়ে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ, বনে বনে সবুজ গাছের পাতায় পাতায় জাগল নির্ভীক আনন্দের বিচিত্র শিহরণ।

জয়ন্ত বল্‌লে, "এই তো আমার চির-পরিচিত প্রিয় পৃথিবী! জানি এর আলো-ছায়ার মিলন-লীলাকে, এর শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মাধুর্য্যকে, এর ফুল-ফোটানো শ্যামলতাকে; আমি বাঁচতে চাই এদেরই মাঝখানে। কাল্‌কের মত যুক্তিহীন আজগুবি রাত আর আমার জীবনে কখনো যেন না আসে। এ রাতের কাহিনী কারুর কাছে মুখ ফুটে বল্‌লেও সে আমাকে পাগল ব'লে মনে করবে।"

ঠিক সেই সময়ে কী এক অভাবনীয় ভাবে সকলের মন অভিভূত হয়ে গেল!

প্রথমটা সবিস্ময়ে কারণ বোঝবার চেষ্টা ক'রেও কেউ কিছুই বুঝতে পারলে না।

তার পরেই কুমার বল্‌লে, "একি বিমল, একি! ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি ?"

চারিদিকে একবার চেয়ে বিমল বল্‌লে, "এ তো ঠিক ভূমিকম্পের মতন মনে হচ্ছে না কুমার! মনে হচ্ছে, আমরা আছি টলমলে জলে নৌকোর ওপরে! এ কি আশ্চর্য্য!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "দেখুন দেখুন, ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন! যে-মাঠ দিয়ে আমরা এসেছি, সেখানে হঠাৎ এক নদীর সৃষ্টি হয়েছে! য়্যাঁঃ, এও কি সম্ভব?"

বিপরীত দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, "ওদিকেও যে ঐ ব্যাপার! আমরা যে জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছি তার দুই দিকেই নদীর আবির্ভাব হয়েছে!"

দুই হাতে চোখ কচলে চমৎকৃত কণ্ঠে বিমল বললে, "এ তো দৃষ্টি-বিভ্রম নয়! কুমার, আমাদের সামনের দিকেও খানিক তফাতে চেয়ে দেখ। ওখানেও জল! পিছন দিকে বন ভেদ ক'রে চোখ চলছে না, খুব সম্ভব ওদিকেও আছে জল! কারণ এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি এখন দ্বীপের মতন একটা জমির উপরে, আর এই দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে ঠিক নৌকোর মতই! না, এইবারে আমি হার মানলুম! দ্বীপ হ'ল নৌকো! না এটাকে বলব ভাসন্ত দ্বীপ?"

সত্য! জলের ওপারে প্রান্তরের বন-জঙ্গল দেখতে দেখতে পিছনে স'রে যাচ্ছে—যেমন স'রে যেতে দেখা যায় রেলগাড়ীর ভিতরে বা নৌকো-জাহাজের উপরে গিয়ে বসলে! ডাঙা সাঁতার কাটছে জলে!

বিমল অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনি হ্যামার্টনের 'ইউনিভার্সেল্ হিষ্ট্রি অফ্ দি ওয়ার্ল্ড্' পড়েছেন?"

—"রেখে দিন মশাই, হিষ্ট্রি-ফিষ্ট্রি! আমার এমন মাথা বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছে! নিজেকে আর জয়ন্ত ব'লেই মনে হচ্ছে না।"

—"শুনুন। ঐ হিষ্ট্রির ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৫২২ পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখবেন। চার-পাঁচ শ' বছর আগে চীনদেশে মিং-রাজবংশের সময়ে একজন চীনা পটুয়া অমৃত-দ্বীপের যে চিত্র এঁকে-ছিলেন, ওখানি হচ্ছে তারই প্রতিলিপি। তাতে দেখা যায়, জন-কয় তাও-ধর্ম্মাবলম্বী লোক একটি ভাসন্ত দ্বীপে ব'সে পান-ভোজন আমোদ-আহ্লাদ করছে, আর একটি মেয়ে হাল ধ'রে দ্বীপটিকে করছে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা!"

—"আরে মশাই, কবি আর চিত্রকররা উদ্ভট কল্পনায় যা দেখে তাই কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?"

—"জয়ন্তবাবু, সময়-বিশেষে কল্পনাও যে হয় সত্যের মত, আর সত্যও হয় কল্পনার মত, আজ স্বচক্ষেও তা দেখে আপনি তাকে স্বীকার করবেন না?"

—"পাগলের কাছে সবই সত্য হ'তে পারে। আমাদের সকলেরই মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।"

—"না জয়ন্তবাবু, শিশুরও কাছে সবই সত্য হ'তে পারে। এই লক্ষ-কোটি বৎসরের অতি-বৃদ্ধ পৃথিবীর কোলে ক্ষুদ্র মানুষ হচ্ছে শিশুর চেয়েও শিশু। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও যে অসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থাকতে পারে, ভালো ক'রে তা জানতে পারবার আগেই ক্ষণজীবী মানুষের মৃত্যু হয়। আজ লোহা জলে ভাসে, ধাতু আকাশে ওড়ে, বন্দী বিদ্যুৎ গোলামী করে, শূন্য দিয়ে সাত সাগর পেরিয়ে বেতারে মানুষের চেহারা আর কণ্ঠস্বর ছোটাছুটি করে, ছবি জ্যান্তো হয়ে কথা কয়, রসায়নাগারে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, কিছুকাল আগেও এ-সব ছিল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, আজগুবি কল্পনার মত। তবু আমরা কতটুকুই বা দেখতে কি জানতে পেরেছি? পৃথিবীতে যা-কিছু আমরা দেখিনি-শুনিনি তাই-ই অসম্ভব না হ'তেও পারে!"

—"আপনার বক্তৃতাটি যে খুবই শিক্ষাপ্রদ, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপাততঃ বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমার নেই। এখন আমরা কি করব সেইটেই ভাবা উচিত। এ দ্বীপ আমাদের নিয়ে জলপথে হয়তো নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে চায়, এখন আমাদের কি করা উচিত?"

কুমার বললে, "আমাদের উচিত জলে ঝাঁপ দেওয়া।"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তরল জল আবার কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তা হ'লেও আমি আর অবাক্ হব না।"

বিমল বললে, "কিংবা জলের ভিতরে আবার দেখা দিতে পারে দলে দলে জ্যান্তো মড়া!"

কুমার শিউরে উঠে ব্যাগটা টিপে-টুপে অনুভব ক'রে দেখলে, লাউ-ৎজুর মূর্ত্তিটা যথাস্থানে আছে কি না।

তার পর এগিয়ে ধারে গিয়ে তারা দেখল, দ্বীপ তখন ছুটে চলেছে রীতিমত বেগে এবং তটের তলায় উচ্ছল স্রোত ডাকছে কল্-কল্ ক'রে। নদীর আকার তখন চওড়া হয়ে উঠেছে এবং খণ্ডদ্বীপের দুই দিকে দুই তীর স'রে গেছে অনেক দূরে।

জয়ন্ত আবার বল্‌লে, "এখন উপায় কি বিমলবাবু, কী আমরা করব?"

বিমল বল্‌লে, "এখানে জল-স্থল দুই-ই বিপদ্জনক। বাকি আছে শূন্য পথ, কিন্তু আমাদের ডানা নেই।"

কুমার বল্‌লে, "নদীর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। হয়তো অমৃত-দ্বীপের বাসিন্দারা আমাদের মত অনাহূত অতিথিদের বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিতে চায়!"

জয়ন্ত আশান্বিত হয়ে বল্‌লে, "তা হ'লে তো সেটা হবে আমাদের পক্ষে শাপে বর! নদীর মুখেই আছে আমাদের জাহাজ!

বিমল বল্‌লে, "কিন্তু জাহাজ-শুদ্ধ লোক আমাদের এই অতুলনীয় দ্বীপ-নৌকো দেখে কি মনে করবে, সেটা ভেবে এখন থেকেই আমার হাসি পাচ্ছে!"

কিন্তু বিমলের মুখে হাসির আভাস ফোটবার আগেই হাসি ফুটল আর এক নতুন কণ্ঠে; দস্তুর মত কৌতুক-হাসি!

সকলে চম্‌কে পিছন ফিরে অবাক্ হয়ে দেখলে, একটু তফাতে বনের সামনে গাছতলায় ব'সে আছে আবার এক অমানুষিক মূর্ত্তি! কিন্তু এবারে তার মুখ আর ভাবহীন নয়, কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জল!

জয়ন্ত বল্‌লে, "এ মূর্ত্তি আবার কোথা থেকে এল?"

বিমল বল্‌লে, "যেখান থেকেই আসুক, এর চোখে-মুখে বিভীষিকার চিহ্ন নেই, এ হয়তো আমাদের ভয় দেখাতে আসে নি।"

মূর্ত্তি পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় বল্‌লে, "কে তোমরা? পরেছ ইংরেজী পোষাক, কিন্তু দেখছি তোমরা ইংরেজ নও!"

বিমল দুই পা এগিয়ে বল্‌লে, "তুমি যেমন চীনা হয়েও ইংরেজী বলছ, আমরাও তেমনি ইংরেজী পোষাক প'রেও জাতে ভারতীয়।"

—"ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউ-ৎজুর দেশে এসেছ কেন? তোমরা কি জান না, এ দেশ হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ; এখানে বাস করে আমার মতন অমররা—জলে স্থলে-শূন্যে যাদের অবাধ গতি? এখানে নশ্বর মানুষের প্রবেশ নিষেধ।"

বিমল হেসে বল্‌লে, "অমর হ'লে চেহারা যদি তোমাদের মত হয়, তা হ'লে অমর হবার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই।"

মূর্ত্তি উপেক্ষার হাসি হেসে বল্‌লে, "মূর্খ! আমাদের দেহের মর্য্যাদা তোমরা বুঝবে না। দেহ তো একটা তুচ্ছ খোলস মাত্র, মানুষ বলতে আসলে বোঝায় মানুষের মনকে। আমাদের দেহ নামে মাত্র আছে, কিন্তু আমরা করি কেবল মনের সাধনা, আমাদের আড়ষ্ট দেহে কর্ম্মশীল কেবল আমাদের মন। কিন্তু থাক্ ও-সব কথা। কে তোমরা? কেন এখানে এসেছ? 'সিয়েন্ হ'তে?"

—"না। তোমাদের দেখবার পর আর অমর হবার সাধ নেই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।"

—"বেড়াতে! এটা নশ্বর মানুষের বেড়াবার জায়গা নয়। জানো, তোমাদের মত আরো কত কৌতূহলী এখানে বেড়াতে এসে মারা পড়েছে আমাদের হাতে?"

—"সেটা তোমাদের অভ্যর্থনার পদ্ধতি দেখেই বুঝতে পেরেছি। কেবল আমাদের মারতে পারো নি, কারণ সে-শক্তি তোমাদের নেই!"

—"মূর্খ! তোমাদের বধ করতে পারি এই মুহূর্ত্তেই। কেবল প্রভু লাউ-ৎজুর পবিত্র মূর্ত্তি তোমাদের সঙ্গে আছে ব'লেই এখনো তোমরা বেঁচে আছ। ও-মূর্ত্তি কোথায় পেলে?"

—"সে খবর তোমাকে দেব না।"

—"তোমরা কি তাও-ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছ?"

—"না। আমরা হিন্দু। তবে সাধক ব'লে লাউ-ৎজুকে আমরা শ্রদ্ধা করি।"

—"কেবল মুখের শ্রদ্ধা ব্যর্থ, তোমাদের মন অপবিত্র। প্রভু লাউ-ৎজুর মূর্ত্তির মহিমায় তোমাদের প্রাণ রক্ষা হ'ল বটে, কিন্তু এখানে আর তোমাদের ঠাঁই নেই। শীঘ্র চ'লে যাও এখান থেকে।"

—"খুব লম্বা হুকুম তো দিলে, এই জ্যান্তো মড়ার মুলুক থেকে চ'লেও তো যেতে চাই, কিন্তু যাই কেমন ক'রে?"

—"কেন?"

—"আগে ছিলুম মাঠে। তার পর মাঠ হ'ল জলে-ঘেরা দ্বীপ। তার পর দ্বীপ হ'ল আশ্চর্য্য এক নৌকো! খুব মজার মজার ম্যাজিক দেখিয়ে আরব্য উপন্যাসকেও তো লজ্জা দিলে বাবা, এখন দয়া ক'রে দ্বীপ-নৌকোকে আবার স্থলের সঙ্গে যুড়ে দাও দেখি, আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

—"তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুসি হলুম। দ্বীপের পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখ।"

সকলে বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখলে, ইতিমধ্যে কখন্ যে দ্বীপের পূর্ব্ব-প্রান্ত আবার মাঠের সঙ্গে যুড়ে এক হয়ে গেছে তারা কেউ জানতেও পারে নি! স্থির মাটি, পায়ের তলায় আর টল্‌মল্ করছে না।

এতক্ষণ পরে বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।"

—"এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে গেলেই দেখবে, নদীর ধারে তোমাদের নৌকো বাঁধা আছে। যাও।"

পর-মুহূর্ত্তেই আর এক অদ্ভুত দৃশ্য! সেই উপবিষ্ট মূর্ত্তি আচম্বিতে বিনা অবলম্বনেই শূন্যে ঊর্দ্ধদিকে উঠল এবং তার পর ধনুক-থেকে-ছোঁড়া তীরের মতন বেগে বনের উপর দিয়ে কোথায় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল!

কুমার হতভম্বের মতন বল্‌লে, "এ কি দেখলুম বিমল, এ কি দেখলুম!"

বিমল বল্‌লে, "আমি কিন্তু এই শেষ ম্যাজিকটা দেখে আশ্চর্য্য ব'লে মনে করছি না।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "বিমলবাবু, তা হ'লে আপনার কাছে আশ্চর্য্য ব'লে কোন-কিছুই নেই!"

—"জয়ন্তবাবু, আপনি কি সেই অদ্ভুত-ইংরেজের কথা শোনেন নি—টলষ্টয়, থ্যাকারের

সঙ্গে আরো অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোক স্বচক্ষে দেখে যাঁর বর্ণনা ক'রে গেছেন? তিনি সাধুও নন, যাদুকরও নন, আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর দেহ শূন্যে উঠে এক জান্‌লা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, আর এক জান্‌লা দিয়ে শূন্যে-পথেই আবার ঘরের ভিতরে ফিরে আসত!"

—"দোহাই মশায়, দোহাই! আর নতুন নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে অসম্ভবের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করবেন না। আপনাদের 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার' আমার ধারণার বাইরে! এখানকার মাটিতে আর পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেও আমার হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাঠ আবার দ্বীপ হবার আগেই ছুটে চলুন নৌকোর খোঁজে।"

সকলে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হ'ল। পূর্ব্বাকাশের রংমহলে প্রবেশ করেছে তখন নবীন সূর্য্য। নদীর জল যেন গলানো সোনার ধারা। নৌকা যথাস্থানেই বাঁধা আছে।

অমৃত-দ্বীপের আরো কত রহস্য অমৃত-দ্বীপের ভিতরেই রেখে তারা খুলে দিলে নৌকার বাঁধন!

—ইতি—

পূজার ম্যাজিক

শ্রীদেবকুমার ঘোষাল (বালক যাদুকর)

[তোমরা বিখ্যাত বালক যাদুকর শ্রীমান্ দেবকুমার ঘোষালের নাম অনেকেই শুনে থাকবে। ইনি সুবিখ্যাত যাদুকর "গণপতি"র শিষ্য। মাত্র বারো বছর বয়স থেকে দেবকুমার ম্যাজিক দেখিয়ে অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। বাংলার বহু গণ্যমান্য লোক তাঁর ম্যাজিক্ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অসংখ্য পুরস্কার, পদক এবং প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

দেবকুমার সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর যাদুবিদ্যা দেখাবার জন্য বেরিয়েছেন। ইচ্ছা আছে এর পর আমেরিকায় যাবেন।

দেবকুমারের বয়স এখন মাত্র ষোল বছর। এই সঙ্গে তাঁর লেখা একটি ম্যাজিকের কৌশল তোমাদের উপহার দেওয়া গেল। তোমাদের ভাল লাগলে তিনি ভবিষ্যতে আরও এ রকম লিখবার চেষ্টা করবেন। —রাঃ সঃ]

রামধনুর পাঠক-পাঠিকা ভাইবোনেরা, আজ তোমাদের একটা মজার ম্যাজিকের কথা বলিব। পূজার ছুটিতে তা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে দেখাইয়া প্রচুর আনন্দ পাইবে। ম্যাজিকটি এই রকম: একটী কাচের গ্লাস মুড়িতে পরিপূর্ণ করিয়া দর্শকদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গ্লাসটী হাতে করিয়া বলিবে, "আপনারা কি

দেখ্‌ছেন?" সকলেই বলিবে "মুড়ি"। তখন দু'টি মুড়ি লইয়া একজনের হাতে দিয়া বলিবে, "সত্যি মুড়ি কি না ভাল ক'রে পরীক্ষা করুন।" তখন মুড়ির গ্লাসটী টেবিলের উপর রাখিয়া একখানি রুমাল চাপা দিবে। তার পর ওয়ান, টু, থ্রী বলিয়া সকলের সাম্‌নেই একবার ম্যাজিক ওয়াণ্ডটী গ্লাসের চারিপাশে ঘুরাইয়া আনিবে। এইবার রুমালখানি তুলিয়া ফেলিলেই সকলে অবাক্ হইয়া দেখিবে গ্লাসে আর একটীও মুড়ি নাই—সমস্তই বুঁদেতে পরিণত হইয়াছে। তখন কাহারও কোন সন্দেহ না থাকে এ জন্য একজনকে দু'টী খাইতে দিবে। দর্শক খাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাইবেন।

বালক যাদুকর দেবকুমার

আমি যখন বছর বারো বয়সে ম্যাজিক শিখিতে আরম্ভ করি তখন আমার স্বর্গীয় গুরু গণপতি চক্রবর্ত্তী (আজ ১০ মাস হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন) এই সব ছোটখাট অথচ অদ্ভুত ও অত্যন্ত আমোদজনক ম্যাজিক আমাকে শেখান। আমি তখন বাড়ীতে, স্কুলে—নানা স্থানে এই জাতীয় ম্যাজিক দেখাইয়া কত আনন্দ ও প্রশংসা লাভ করিয়াছি। এই প্রকারের বহু ম্যাজিক আছে যাহা শুনিতে ও দেখিতে অতিমাত্র বিস্ময়কর অথচ এগুলির মধ্যে এমন ফাঁকি এবং দেখান এত সহজ যে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। এইজন্য এক হিসাবে এই সব ম্যাজিক মূল্যবান্। ইহাদিগকে বলে "পেটি ইলিউশান" (Petty Illusions)।

যাক্, এখন এই অদ্ভুত ম্যাজিকটী কি করিয়া সম্ভব হয় বলি। একটী মোটা কাচের গ্লাস লইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার ভিতরে উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত ঠিক মধ্যস্থান দিয়া একটী পার্টিশান করিতে হইবে। অর্থাৎ গ্লাসের মাপে একখণ্ড পেষ্টবোর্ড্ কাটিয়া ঐ পেষ্টবোর্ড্‌খানি গ্লাসের মাঝামাঝি উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত ফিট্ করিয়া দিলেই প্রয়োজনীয় পার্টিশান তৈরী হইবে।

তার পর যে দু'টী অংশ হইল উহার একপার্শ্বে মুড়ি রাখিয়া গ্লাসটী মুড়িতে

পূর্ণ করিবে, এবং অপর পার্শ্বে বুঁদে রাখিয়া উহা বুঁদে দ্বারা পূর্ণ করিবে। খেলাটী দেখাইবার সময় দর্শকগণকে 'ম্যাজিকে চোখের সাম্‌নে অসম্ভব সম্ভব হয়—অদ্ভুত দ্রব্যগুণ যা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না"—ইত্যাদি বক্তৃতা দিয়া বলিবে, "এই দেখুন আমার সাম্‌নে টেবিলের উপর এক গ্লাস মুড়ি রয়েছে। আপনাদের চোখের উপরই দেখুন এগুলি কি ভাবে এক সেকেণ্ডের মধ্যে বুঁদেতে পরিণত হয়।" এই বলিয়া গ্লাসে রুমাল চাপা দিয়া ম্যাজিক ওয়াণ্ডটী ঘুরাইয়া, ওয়ান, টু, থ্রী বলিয়াই গ্লাসটীর যে দিকে বুঁদে আছে ঐ দিক্‌টী ঘুরাইয়া বসাইবে। এইজন্য টেবিল হইতে গ্লাসটী বাঁ হাতের তালুতে রাখিয়া ডান হাত দিয়া ধরিয়া টেবিলের উপর বসাইতে হইবে—তাহা হইলে আর দর্শকগণ কোন সন্দেহের অবসর পাইবে না।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে সব ম্যাজিকেরই মূলমন্ত্র—গভীর একাগ্রতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও সাবধানতা। শুধু চতুর বুদ্ধি হইলেই ম্যাজিক দেখান যায় না; কেননা অনেক বিজ্ঞ, চতুর ম্যাজিসিয়ান্‌কেও অনেক সময় ধরা পড়িতে ও হাস্যাস্পদ হইতে দেখা যায়।

নানা প্রসঙ্গ

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

টুঁটির উৎপত্তি

গলার সামনের দিক্‌টা এক জায়গায় একটু উঁচু, তাহা সকলেই দেখিয়াছ। এই উঁচু জায়গাটাকে টুঁটি বলা হয়। প্রবাদ আছে যে ভগবান্ যখন প্রথম মানুষ আদম ও প্রথম স্ত্রীলোক ঈভ্‌কে সৃষ্টি করিয়া নন্দনকাননে বাস করিতে দেন তখন তাহাদের ঐ বাগানের আপেল গাছের ফল খাইতে নিষেধ করেন। ইহাতে ঈভ্‌এর মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হয় এবং তিনি আদমকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া আপেল খাইতে রাজী করেন। তুইজনে যখন আপেল পাড়িয়া খাইতেছেন তখন ঈভ্ ঠিক্‌ভাবেই আপেল গিলিয়া ফেলেন কিন্তু আদমের মনে এত ভয় যে আধখানা আপেল তাঁহার গলায় আটকাইয়া যায়। ঐ জায়গাটী চিরদিনের জন্য ফুলিয়া রহিয়াছে। ইহাকেই টুঁটি বলে।

ভগবান্ কিন্তু সহজেই টের পাইয়া যা'ন যে এই মানুষ তুইটী তাঁহার নিষেধ অবহেলা করিয়াছে। তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বর্গরাজ্যের সুখভোগের অনুপযুক্ত মনে করিয়া তুঃখময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। এইভাবে মানুষের পতন হয়।

মজার ভুল

যীশুখ্রীষ্ট মারা যাওয়ার অনেক বৎসর পরে তাঁহার নামে খ্রীষ্টাব্দ প্রচলিত হয়। তখন হিসাব করিয়া দেখা হয় যে যীশুখ্রীষ্ট ৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অনুযায়ী যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-বৎসরকে ১ খ্রীষ্টাব্দ এবং সেই বৎসরকে ৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া খ্রীষ্টাব্দ গণনা চলিতে থাকে। অনেক কাল পরে আবার হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ঐ গণনায় ভুল হইয়াছিল, যীশুখ্রীষ্ট আসলে ১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মান নাই, তাহার ৪ বৎসর আগে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর খ্রীষ্টাব্দ বদ্‌লান যায় না, তাই ভুল হিসাবই চলিতেছে। ফলে, এখন যীশুখৃষ্টের জন্ম-বৎসর বলিতে হইলে বলিতে হয় তিনি ৪ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের ৪ বৎসর পূর্ব্বে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।

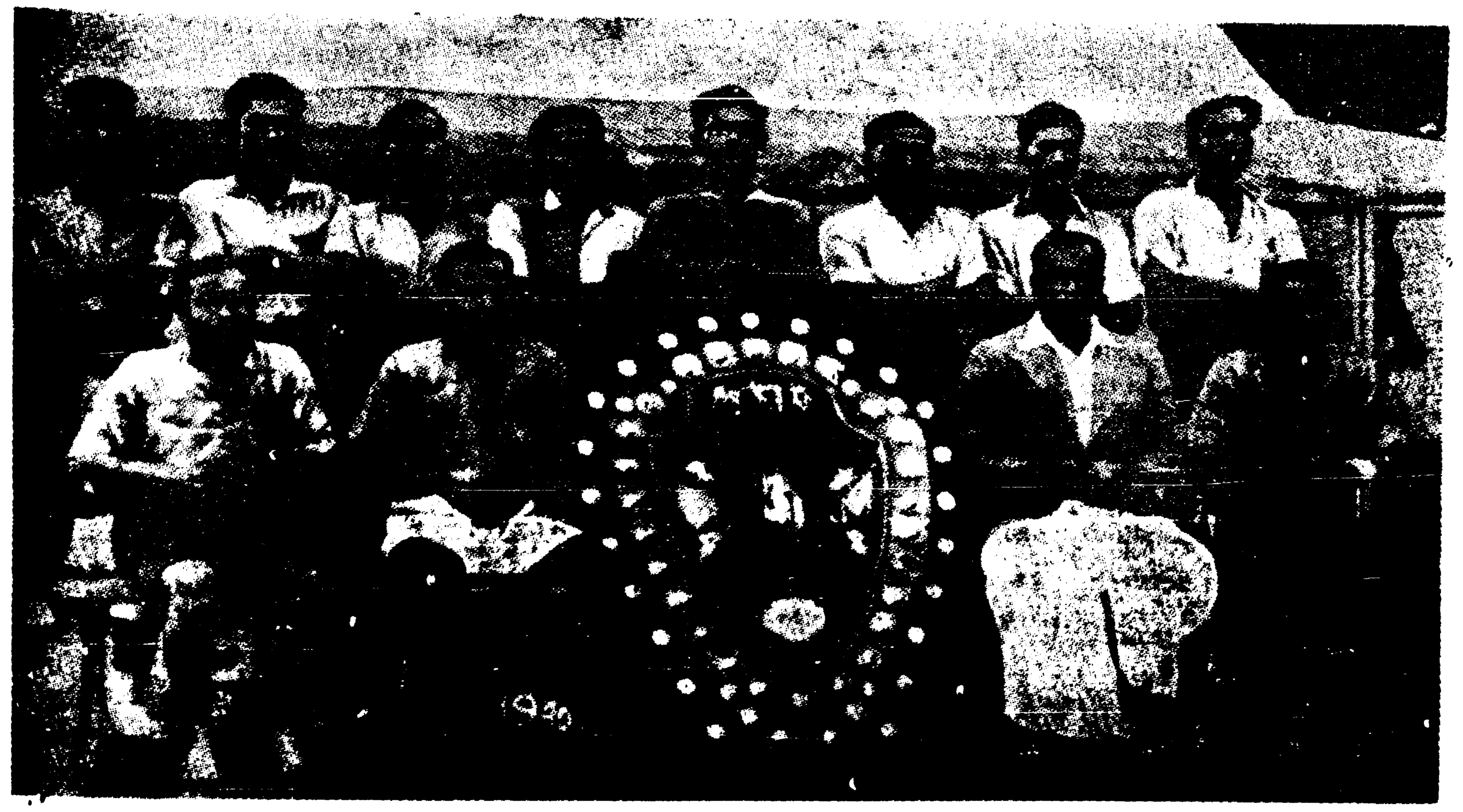

এ বছরের আই. এফ্.এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স ক্লাব্

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ

তোমরা লিলি বিস্কুটের সঙ্গে সকলেই বেশ পরিচিত, এবং, বলতে লজ্জা নেই, তাকে একটু বেশী রকমই পছন্দ কর। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ হচ্ছেন এই লিলি বিস্কুট কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। এঁরই কর্ম্মদক্ষতায় আজ এই কোম্পানী বাঙ্গালীর একটি গৌরবময় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চুরি করা রসিকতা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

"দাও তো দেখি ভালো দেখে—
বড় দেখে—লম্বা দেখে—
শক্ত দেখে—সস্তা দেখে
ইঁদুর-ধরা কল,
দাও না ভায়া, তাড়াতাড়ি,—
ধরতে হবে রেলের গাড়ী—
যাচ্ছি যে হে মামার বাড়ি—
সুদূরে কনখল।"

"দোহাই বাবু, এ সব কলে
ছলে, বলে কি কৌশলে
ইঁদুর বটে ধরা চলে—
নেংটি এবং ধাড়ি,

কিন্তু এ কল বড় হ'লেও—
শক্ত হ'লেও—লম্বা হ'লেও—
ধরতে কভু পারবে না ও
তোমার রেলের গাড়ী।"

নবীন সাহিত্যিকের গুরু

শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী

তোমরা শুনে সুখী হবে, আমার ছোট মামা সম্প্রতি একটা ছোটদের কাগজ বের করবেন ঠিক করেছেন। কথাটা শুনে অবধি এত আনন্দ পাচ্ছি যে ডাক ছেড়ে হাসতে ইচ্ছে করছে থেকে থেকে। যাক্, এত দিনে আমার গল্পগুলির একটা হিল্লে হবে আশা করা যাচ্ছে। গল্প আমি লিখি, কবিতা লেখারও বদ্ অভ্যাস আছে, কিন্তু কথাটা জান কি—সত্যি কথা বলতে আর ভয় কি বল—তোমরা যা ভেবেছ ঠিক তাই-ই, কোন কাগজে এ পর্য্যন্ত ছাপায় নি! প্রত্যেক কাগজের অফিস খুঁজলে আমার খান কতক লেখা পাবেই, আর যেগুলির সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া ছিল সেগুলি আপাততঃ আমার দেরাজেই বন্দী হয়ে আছে। প্রচুর ভরসা হচ্ছে এবার ওদের একটা গতি হবেই। ছোট মামা কখনও ওগুলি না ছাপিয়ে পারেন না—অন্ততঃ নিজের ছোট বেলার কথা স্মরণ করেও ছাপিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মামা, কাকা পেছনে না থাকলে কেমন করে নাম করি বল ত'? এখন প্রথম কাজ হচ্ছে আমার, বাতিল লেখাগুলির পুনরুদ্ধার করা—সেগুলিই ত' ঘষে-মেজে দিতে হবে মামার কাগজে।

আমার ছোট মামা বিস্তর পয়সার মালিক। আমার দাদু তাঁর চার ছেলেকে এত দিয়ে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে একজন যদি মাসিক পত্রিকা বের না করে নোটের উপর ছোট্ট ছোট্ট কবিতা লেখা অভ্যাস করতেন তবুও ভাতের টান পড়ত না কখনই। এ হেন কতিপয় মামার একজন যদি কাগজ বের করার দুঃসাহস না করেন, তবে আর কে করবে? আমরা? আশঙ্কা হচ্ছে মামার কাগজে একটা ভারিক্কী গোছের 'পোষ্ট' না পেয়ে যাই শেষকালে—মামা আমার ভারী 'ভাগ্নে-বৎসল'।

যথা সময়ে মামার কাগজ বের হ'ল বাজারে। আমি দেখেছি—পয়সা না থাকলে মানুষের কি হয়! আর পয়সা থাকলে কোনটাই বা না হয় বলতে পার? মামার কথাই ধর না কেন? শুধু ত' পয়সার জোরেই কাগজটা দাঁড় করিয়ে দিলেন এই বাজারে! লেখ আর মানিব্যাগ ভর্ত্তি কর—মামার এই সরল নীতি। কথাটা হু-হু করে রাষ্ট্র হয়ে গেল সাহিত্যিক-মহলে। আর যাবে কোথায়? লিখিয়েদের ভীড়ে আর মামার ঘরে ঢোকা যায় না আজকাল।

এই সাহিত্যিকদের ভীড়েই আমার নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সেদিনের ঘটনাটাই শোন তা হ'লে। দুপুর বেলা কলেজ পালিয়ে মামা-বাড়ীতে এসেছি। ভারী পর্দ্দাটা সরিয়ে একটু উঁকি মেরে দেখলুম মামা টেবিলের উপর হুমড়ী খেয়ে পড়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। সাহস পেয়ে ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই মামা বল্লেন, 'এই যে চৈতন্য এসেছিস। এঁকে চিনিস্ নিশ্চয়ই?'—ঘাড় নেড়ে বল্লাম 'উঁহু—।'

'আশ্চর্য্য, এঁকে চিনিস্ না তুই! অথচ এঁর লেখাই গত মাসের 'ফুলঝুরি'তে পড়ে চীৎকার করে হাসলি কতক্ষণ! হ্যাঁ, ইনিই সেই নীলকণ্ঠ চট্টোরাজ।' আর এটি আমার ভাগ্নে চৈতন্য, খাসা লেখে এখন থেকেই। আমার 'ফুলঝুরি'তে 'রেগুলার' ছাপাই আমি।' নিজেদের প্রশংসায় সঙ্কুচিত হয়ে আমরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করি।

এই হ'ল আমাদের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত। প্রথম থেকেই ভদ্রলোককে আমার ভারী ভাল লেগে গেল কেন জানি—ওঁরও আমাকে বোধ হয় খুবই ভাল লাগত, তা না হ'লে বয়সের এত ব্যবধান থাকলেও এ রকম করে মিশতে পারে না কেউ। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে ওঁর কি রকম মনের মিল হয়ে গেছে তা না দেখলে বোঝা যায় না। যেখানেই আমি সেখানেই উনি এবং 'ভাইসে ভার্সা'। আমি আজকাল সব বিষয়েই ওঁর শিষ্যত্ব নিয়েছি। পোষাকে-আষাকে, এমন কি চুল ছাঁটবার কায়দাটিতে পর্য্যন্ত।

দ্বারিক ঘোষের দোকানের কোণে আমাদের কথা হচ্ছিল সেদিন।

নীলকণ্ঠবাবুই কথা আরম্ভ করলেন। শোনপাপড়ি ভেঙ্গে মুখে দিয়ে বল্লেন, 'আচ্ছা চৈতন্য, তুমি তোমার মামার কাগজে ছাড়া লেখ না কেন?'

সম্পূর্ণ অজানতে নীলকণ্ঠবাবু আমার ক্ষতে আঘাত দিয়ে ফেলেন। নত নেত্রে বলি—'তা কি আর লিখি না? কিন্তু না ছাপলে আর কি করি বলুন। আমার কি হাত এর উপর?' উনিও ভারী মর্ম্মাহত হলেন বোঝা গেল। তার পর হঠাৎ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বলে ফেললেন, 'লেখা ছাপে না তোমার? আচ্ছা, কিছু ভেব না, আমার হাতে তোমার লেখা দিয়ে দিও, আমিই বরং সম্পাদকের হাতে দিয়ে দেব। আমি দিলে আর ছাপিয়ে কূল পাবে না। কত যা-তা গল্প এ রকম করে চালিয়ে দি আর তোমারটা পারব না? কি যে বল তুমি!'

বলা বাহুল্য সেই রাত্রেই আমার যাবতীয় লেখা নীলকণ্ঠবাবুকে হস্তান্তরিত করে দিলাম।

তার পর আমার কথা আর বল কেন? ছ' মাস পরের ঘটনা মাত্র। এরই মধ্যে আমার বেশ কয়েকটা লেখা কাগজে বেরিয়ে গেছে—সব ক'টাই নাম-করা কাগজে। তৃতীয় পক্ষের কাছে শুনেছি নীলকণ্ঠবাবুকে এর জন্য কম পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় নি। হেঁটে হেঁটে তাঁর পায়েই নাকি বাত ধ'রে গেছে—ডাক্তার উমেশ সেনের আড্ডায় শুনলাম এ খবর। একেই তো বলে শিষ্যবৎসল গুরু।

কিন্তু আমার বরাতে সুখ আছে নাকি? বিপদ্ হ'ল আমার বন্ধুদের নিয়ে। তারা কিছুতেই আমার গুণ স্বীকার করবে না।

বিশেষতঃ মুস্কিলে পড়েছি আমাদের হরিকে নিয়ে। ও-ও আবার আজকাল মাসিকের পাতায় উৎপাত করে কি না। হিংসার চশমা এঁটে হরি আমার লেখাগুলি পড়ে আর বলে: 'ও গল্প তুই লিখিস নি কক্ষনো। এ রকম গল্প যেদিন লিখবি সেদিন ত' কাণ্ডই করে ফেলবি। —যে সব কথা লিখেছিস ওর মানে দূরে থাক্ বানানই তো তুই জানিস না!'

অগত্যা ফের নীলকণ্ঠবাবুর স্মরণ নিলাম। নানা কথার ফাঁকে বল্লাম, 'আচ্ছা নীলকণ্ঠ দা', এত লিখলুম কিন্তু নাম হ'ল না কেন বলুন ত'?'

'শুধু গোটাকতক মাসিকে লিখলেই কি নাম হয় চৈতন্য?" নীলকণ্ঠবাবু বল্লেন, "হৈ-হৈ করে লিখতে সুরু করে দাও। বার্ষিকে—মাসিকে—সাপ্তাহিকে। দৈনিকেও দুটো চারটে ছাড়তে পার। প্লট্ না পাও একটা গল্পকে ভাঙ্গিয়ে তিনটা কর, তিনটাকে জুড়িয়ে একটায় আন। দোষ কি তাতে? অনেকেই করছে এমন। হু-হু করে নাম ছড়িয়ে যাবে তা হ'লে। নামের আবার অভাব আজকালকার বাজারে! তবে হ্যাঁ, গোড়ায় একটু চেষ্টা করতে হয়। আর যদি—"

'আর যদি কি.?' আমি একটা লোভনীয় সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

'আর যদি একটা বই বার করে ফেলতে পার।'

'বই? কিন্তু পাব্লিশার পাব কোথায়? আর পেলেই কি বিকোবে আমার বই?'

নীলকণ্ঠবাবু একটু থেমে বল্লেন, 'যদি সে সব ব্যবস্থা আমিই করে দিই। ধর, এই আমারই তো কত বাতিল লেখা আছে—সেগুলো তোমার নামে—কিংবা ধর, দু'জনে মিলেই যদি একখানা বই লিখি? কিংবা—যদি একটা বার্ষিকী বা 'য়্যান্থলজি' গোছের কিছু বার করা যায় তোমার নামে? না না, তোমায় কিছু করতে হবে না। বড় বড় সাহিত্যিকরা সবাই আমার খাতিরের লোক—লেখা চাইলেই আমি পাব—তোমার নাম থাকবে সম্পাদক হিসাবে। ইচ্ছে করে তো লেখকদের পরিচয় সম্বন্ধে একটু সম্পাদকীয় নোট দিয়ে দিও। চালাবার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না।'

আমার মানসিক অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। পাছে আবার নীলকণ্ঠবাবুর মত বদলায় তাই প্রস্তাবটা শীল মোহর করবার জন্য বল্লাম—'আগে চলুন ঐ মোড়ের রেষ্টুরেন্টটায় একটু খেয়ে আসা যাক্—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।' বলে পকেটের বাইরে থেকেই আলগোছে মানিব্যাগ্টা একবার বাজিয়ে নিলাম। নীলকণ্ঠবাবু এ সব দুর্ব্বল স্থানে আঘাত বেশীক্ষণ সইতে পারেন না। সৌজন্যের হাসি হেসে বল্লেন,—'না না, আপত্তি আর কি? চল বসন্তের দোকানেই যাওয়া যাক্—দু' পয়সার মটন্ চপ্ যা বানায় ওরা, ফাষ্টক্লাশ্—'

আমরা হৈ-হৈ করে মেস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় যেতে যেতে নীলকণ্ঠবাবুই আবার বল্লেন, "তুমি কিছু ভাববে না চৈতনা, তোমায় আমি সাহিত্যিক বানিয়ে তবে ছাড়ব। লেখা আমার পেশা বটে তবে লেখক বানানো আমার 'সাইড্ বিজনেস' বলতে পার। লিখে আর কত পাই বল ত'? শাঁসালো যা আসে তা তো লেখকদের কাছ থেকে।' আমি আচম্কা হোঁচট খেলাম। নীলকণ্ঠবাবু সমানে বলে যেতে লাগ্লেন—'কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করে দেখ, যেখানে যত বাচ্চা সাহিত্যিক—সব এই আমার হাতে তৈরী। আর আমার 'ফি'ও এমন কিছু বেশী নয়।'

বিস্ময়ে আমার কথা বেরুল না খানিকক্ষণ। তার পর একটু দম নিয়ে বল্লাম, 'আমাকেও 'ফি' দিতে হবে নাকি তা হলে?' নীলকণ্ঠবাবু অবাক্ হয়ে চোখ বড় বড় করে বল্লেন, 'বাঃ, দিতে হবে না মানে? তুমি কি বিনি পয়সায় নাম কিনতে চাও নাকি এই বাজারে? তাতে আমার স্বার্থ?'

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'কিন্তু আমি অত টাকা পাব কোত্থেকে?'

'তার জন্য ভাবনা কি? উপায়ও বাৎলে দিচ্ছি'—নীলকণ্ঠবাবু আমার কানে কানে উপায় জানিয়ে দিলেন। বল্লেন, 'সব ছোকরাই প্রথমটা ঘাবড়ায়, শেষে সব ঠিক হয়ে যায়। আর একজনের কাছেও তো টোপ ফেলেছি, এখন গিললে হয়।' এতক্ষণে আবার আমার মুখে হাসি ফুটল।

তার পর ভরা পেটে, রাত বারোটা পর্য্যন্ত পুরানো বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ালাম আমি আর নীলকণ্ঠ দা'। সত্যিই ত' গত বছরের বইগুলি জঞ্জাল ছাড়া আর কি! তোমরা শুনে সুখী হবে, টাকার যোগাড় হতে বেশী দেরী হ'ল না। গুরুদেবের হাতে তা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

নীলকণ্ঠবাবুও ইতিমধ্যে পাব্লিশার বাগিয়ে ফেলেছেন—হাজার হোক বাজারে নাম-ডাক আছে ত'!

বই আমার ছাপা হতে লাগল পুরো দমে।

তার পর? তার পর আবার কি, ছাপিয়ে এক দিন বের হ'ল বাজারে।

তোমরা জেনে নিশ্চয়ই খুসী হবে, বই আমার এর মধ্যেই দারুণ বিক্রী হচ্ছে—নীলকণ্ঠদা'র কাছেই খবর পাচ্ছি রোজ। বইএর নাম? তা তো বিজ্ঞাপনেই দেখ্‌ছ—রোজ রোজ।

আর আমার নাম? সেটা তোমরাই বল।

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ডেভিড্ কপারফিল্ড্

[এ উপন্যাসখানি লিখেছেন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক (এবং অনেকের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক) চার্লস্ ডিকেন্স্। এঁর আর কয়েকখানা উপন্যাসের নাম 'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্', 'অলিভার টুইষ্ট', 'নিকোলাস্ নিকোলবি', 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ্', 'পিক্উইক্ পেপারস্' ইত্যাদি।]

ডেভিড্ কপারফিল্ড্ পৃথিবীতে আসার আগেই ওর বাবার মৃত্যু হ'ল। আর ডেভিডের জন্মদিনে এলেন ওর এক ঠাকুরমা। তিনি ডেভিডের মা ক্লারার ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না বলে এতদিন কোন সম্পর্ক রাখেন নি। যা হোক্, অকস্মাৎ তিনি কোথা থেকে এসে হাজির হলেন, এবং ক্লারার মেয়ে হবে এই ধারণা মনে নিয়ে রইলেন। কিন্তু ছেলে হয়েছে সংবাদ পাওয়া মাত্রই বিরক্ত হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

মা আর পুরানো ঝি পেগটীর যত্নে ডেভিড্ বড় হতে লাগল। কয়েক বছর কেটে গেল। হঠাৎ ক্লারা মার্ডষ্টোন নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন। এই লোকটি কিন্তু মোটেই ভদ্র নন, অত্যন্ত অসৎ। ক্লারার সম্পত্তির দিকেই তাঁর চোখ ছিল এবং এই জন্যই তিনি ওঁকে বিয়ে করেছিলেন। কিছুদিন পর মার্ডষ্টোনের বোন জেন এসে হাজির হলেন। এই দুই ভাইবোনে অমানুষিক অত্যাচারে ডেভিড্দের জীবন দুর্ব্বহ করে তুললেন।

ডেভিড্কে পাঠান হ'ল হষ্টেলে। আর ইতিমধ্যে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটল ডেভিডের জীবনে। তার মা'র মৃত্যু হ'ল।

এইবার মার্ডষ্টোন্ ডেভিড্‌কে পাঠালেন কারখানায় কাজ শিখতে। মিকবাবু ব'লে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও থাকতে লাগল। এই লোকটি অত্যন্ত চমৎকার কিন্তু ভয়ানক খরচে।

মিকবারের কথা যাক্। কারখানা ডেভিডের একটুও ভাল লাগল না। তাই সে একদিন যাত্রা করল সেই ঠাকুরমার উদ্দেশ্যে।

অনেক কষ্টে ডেভিড্ যখন ঠাকুরমার বাড়ী খুঁজে পেল তখন পথ চলার ক্লান্তিতে সে মৃতপ্রায়। কোন রকমে ঠাকুরমাকে সে শুধু নামটা বলতে পারল।

ঠাকুরমা ডেভিড্‌কে সাদরে গ্রহণ করলেন, ও নিশ্চিন্ত হ'ল। ডেভিডের লেখা-পড়ার সুবিধার জন্য ওকে রাখা হ'ল উকীল উইক্‌ফিল্ডের বাড়ীতে। তার পর কোন য়্যাটর্ণীর কাছে ডেভিড্ কাজ শিখতে লাগল। এই য়্যাটর্ণীর মেয়ের নাম ডোরা।

হঠাৎ ঠাকুরমার উকীল উইকফিল্ড দেউলে হ'লেন। ঠাকুরমার সমস্ত টাকা থাকত তাঁর কাছে। দেউলে হবার কারণ ছিল একটা। তাঁর কর্ম্মচারী হীপ্ চুরি করেছিল বহু টাকা।

ডেভিড্ অনেক কষ্টে অবশেষে কিছু টাকা আদায় করল হীপের কাছ থেকে সেই 'খরচে' মিকবারের সাহায্যে।

ওদিকে য়্যাটর্ণী মারা যাওয়াতে তার ফার্ম্ম গেল উঠে। ডেভিড্ বেচারা পড়ল মহা বিপদে। কেননা হীপ্‌কে শাস্তি দিতে তার বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছিল।

এর পর ডেভিড্ গল্প লেখা সুরু করল এবং খুব অল্পদিনের মধ্যে ভাল লেখক বলে তার নাম হ'ল। এইবার যশের সঙ্গে প্রচুর টাকা আসতে লাগল। ডেভিডের দুঃখ দূর হ'ল।

প্রথমে ডেভিড্ বিয়ে করেছিল ডোরাকে। কিন্তু সে মারা যাওয়াতে আবার বিয়ে করল উইক্‌ফিল্ডের মেয়ে য়্যাগনেসকে। তার পর তাদের জীবন বেশ সুখেই কাটতে লাগল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

পথের রাত্রি—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস; ১৫, কলেজ স্কোয়ার। ৷৷০

ছোটদের উপযোগী কয়েকটি অতিসুন্দর গল্প-সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পই সরস, এবং নিপুণ হাতে লেখা।

কোন্ পথে—শ্রীঅরুণা দাস প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ; ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। ৷৷৵০

বড়দের উপযোগী এই ছোট উপন্যাসখানি লেখিকার প্রথম বই, কিন্তু এতেই তিনি খুব পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন। বইখানির গল্পাংশ যেমন সুন্দর, লেখিকার ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গীও তেমনি সরস। তোমাদের দাদা-দিদিদের আজই পড়ে দেখতে ব'ল।

আঙ্কল্ টম্‌স কেবিন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইউ, এন্, ধর এণ্ড কোং; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৲। মিসেস্ হ্যারিয়েট বীচারের অমর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। ইতিপূর্ব্বে খগেন বাবু এই ধরণের আরও কয়েকখানি বিখ্যাত বইএর তর্জ্জমা করে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। এ বইখানিও বাংলা শিশুসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য দান।

লা' মিজারেব্‌ল্—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ইউ, এন্, ধর এণ্ড কোং; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৸০

ভিক্টর হিউগোর বিখ্যাত গল্প অল্প কথায় ছোটদের উপযোগী করে নৃপেন্দ্র বাবু বাংলা সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন। এ বইএর আদর হবেই।

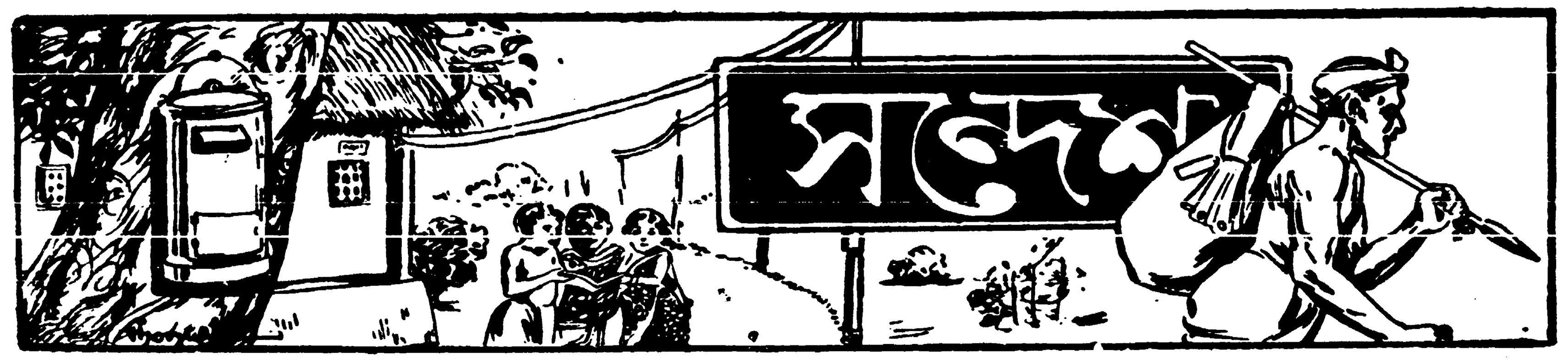

দেখতে দেখতে ইয়োরোপের দ্বিতীয় মহাসমরের এক বছর পূর্ণ হ'য়ে গেল। রণ-দানবের তাণ্ডবলীলা কমা দূরে থাক ক্রমেই বাড়তির দিকে চলেছে। এই এক বছরে কত কাণ্ডই না ঘটে গেল! ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মেনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল, ৩রা বৃটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তার পর সোভিয়েট বাহিনী পোল্যাণ্ডে ঢুকল; ২৮শে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ভারসাউ (ওয়ারশ') সহরের পতন হ'ল—জার্ম্মেনী আর সোভিয়েট পোল্যাণ্ড ভাগ ক'রে নিল।

তার পর ৩০শে নভেম্বর লাগল রাশিয়ার সঙ্গে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সংঘর্ষ। ফিন্‌ল্যাণ্ড কিছুদিন বীরত্বের সঙ্গে লড়ে মার্চ্চ মাসে সন্ধি করল—রাশিয়া পেল ফিন্‌ল্যাণ্ডের কিছু অংশ আর ফিন্‌ল্যাণ্ডে ঘাঁটী বসাবার জায়গা।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে দালাদিয়ের বদলে রেনোঁ হ'লেন প্রধান মন্ত্রী। ৯ই এপ্রিল জার্ম্মেনী নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করল। ডেনমার্ক আত্মসমর্পণ করল, নরওয়ে করল যুদ্ধঘোষণা। চেম্বারলেনের বদলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হ'লেন চার্চ্চিল।

জার্ম্মেনীর আক্রমণ-স্পৃহা বেড়েই চল্‌ল। মে মাসে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ আর লুক্সেমবুর্গ আক্রান্ত হ'ল। হল্যাণ্ড আর বেলজিয়াম্ যুদ্ধে নামল। হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেল্‌মিনা চলে

এলেন ইংলণ্ডে। ২৮শে মে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড যুদ্ধত্যাগ করলেন।

এর পরের ঘটনা—ফ্ল্যাণ্ডার্সের প্রচণ্ড যুদ্ধ, ইটালির যুদ্ধঘোষণা, নরওয়েতে যুদ্ধ বিরতি, আর ফ্রান্সের রাজধানী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্যারিস নগরীর পতন। ফ্রান্সে পেতঁ্যার অধীনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। ফ্রান্স জার্ম্মেনীর কাছে কার্য্যতঃ আত্মসমর্পণ করল। এবারকার যুদ্ধের এটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় ঘটনা। ফলে ইটালির সঙ্গেও ফ্রান্সের যুদ্ধ বন্ধ হ'ল।

এদিকে সোভিয়েট্ বিনা যুদ্ধে রুমানিয়ার বেসারবিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দখল করল।

তার পরের ঘটনা হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে ইটালিয়ান্‌দের ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে সংঘর্ষ আর ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনীর মধ্যে প্রচণ্ড বিমান-যুদ্ধ। সে খবর তো এখন প্রায় রোজই খবরের কাগজে বেরুচ্ছে। জার্ম্মান্ বিমান প্রায় প্রত্যহই এসে ইংলণ্ডের নানা স্থানে বোমাবর্ষণ করছে, বৃটীশের কামানশ্রেণী আর বিমানবহর প্রচণ্ড বিক্রমে দিচ্ছে বাধা। আবার বৃটীশ বিমান-বহরও গিয়ে জার্ম্মেনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। আকাশে অশান্তির মেঘ তেমনি ছড়ান রয়েছে।

এদিকে এশিয়ায় চীন-জাপান যুদ্ধেরও বিরতি নেই। সম্প্রতি জাপান আবার ইন্দোচীন, শ্যাম (থেই) প্রভৃতি রাজ্যেও গোলযোগ সুরু করেছে!

* * *

যুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা মনে পড়তেই আজ ১৯১৪-১৮ সনের প্রথম মহাসমরের কথা মনে পড়ছে। সেবারকার যুদ্ধে কি রকম লোকক্ষয় হয়েছিল তার একটু হিসাব দিচ্ছি :—

যুদ্ধে হত হয়েছিল মোট ১০২৩২৪০৯ জন, আহত হয়েছিল মোট ২০৭৪৩৫০০ জন। তা ছাড়া প্রায় ১২০০০ লোকের কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি।

এক রাশিয়া থেকেই ২৭ লক্ষের উপর লোক মারা গিয়েছিল। জার্ম্মেনীর ১৬ লক্ষ, ফ্রান্সের ১৪ লক্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ৮ লক্ষ লোক হত হয়েছিল। তা ছাড়া অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, ইটালি, তুরস্ক, রুমানিয়া, বেলজিয়াম্, আমেরিকা, বুলগেরিয়া, গ্রীস, পর্ত্তুগাল, জাপান, ভারতবর্ষ, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ছোটখাট আরও অনেক দেশেরও অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল।

যুদ্ধের পর খরচের যে হিসাব করা হয় তাতে দেখা যায় মোট প্রায় ৬৯৫৩ কোটি পাউণ্ড এই যুদ্ধের জন্য খরচ হয়েছিল।

* * *

বোম্বাইএ রোভার্স্ কাপ্ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বাংলা থেকে মহামেডান স্পোর্টিং আর মোহনবাগান দল এবারে এ প্রতি-যোগিতায় যোগ দিয়েছিল। মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে ছু'দিন ড্র রেখে বোম্বাই ওয়াই-এম্-সি-এ'র কাছে হেরে গেছে। ফাইনাল হয়েছিল মহামেডান্ স্পোর্টিংএর সঙ্গে বাঙ্গালোর মোসলেম্‌স দলের। মহামেডান্ স্পোর্টিং বাঙ্গালোর দলকে ১ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। মহামেডান্ স্পোর্টিংএর এই সাফল্যে আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

সম্প্রতি মেক্সিকোতে গুপ্ত ঘাতকের হাতে রুশ-বিপ্লবের অন্যতম নেতা ট্রট্স্কি নিহত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। ট্রট্স্কির নাম তোমরা শুনে থাকবে।

রাশিয়ার বিপ্লবনেতা লেনিনের তিনি ছিলেন ডান হাত। এক সময়ে তাঁরই রাশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা হবার সম্ভাবনা ছিল। ট্রট্স্কির জীবন খুব বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ। রাজনৈতিক ব্যাপারে বর্ত্তমান রুশ নেতা ষ্ট্যালিনের (যিনি এক সময়ে ট্রট্স্কির সহকর্ম্মী ছিলেন) সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ ঘটে, এবং ট্রট্স্কিকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। শেষ জীবনে তিনি মেক্সিকোতে নির্ব্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন, জীবন অবশ্য তাঁর সুখের ছিল না—সর্ব্বদাই গুপ্ত শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হ'ত।

লেখক হিসাবে ট্রট্স্কির সুনাম ছিল। তাঁর লেখা রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস ও আত্মজীবনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

* * *

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর অলিভার লজ্ সম্প্রতি ৮৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অলিভার লজের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়, তিনি ধর্ম্ম আর ঈশ্বরকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করে গেছেন। শেষ বয়সে তিনি পরলোকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছিলেন—বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এ বিদ্যার চর্চ্চায় তিনিই বোধ হয় পথপ্রদর্শক।

শ্রাবণ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার পাবেন—শ্রীবারীন্দ্রকুমার দাস (সালকিয়া, হাওড়া);

দ্বিতীয় পুরস্কার পাবেন—শ্রীমতী মালবিকা চট্টোপাধ্যায় (দিল্লী)।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস (বালিঘাই), শ্রীপূর্ণিমা ভৌমিক (পাটনা) ও শ্রীঅরুণিমা রায় (বারাকপুর)—এঁদের লেখাও বেশ ভাল হয়েছে।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

আশ্বিন সংখ্যা 'রামধনু'র একটা নিরপেক্ষ সমালোচনা (যতটা সম্ভব যুক্তি দিয়ে) করে পাঠাতে হবে। ১ম, ২য় ও ৩য়—৩টি পুরস্কার দেওয়া হবে। **সঙ্গের কুপনে** নাম ও ঠিকানা লিখে সঙ্গে গেঁথে দিতে হবে—সঙ্গে কুপন না থাকলে তা গ্রাহ্য হবে না (কুপনের বদলে কুপন নকল করে দিলে চলবে না)। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। **১লা কার্ত্তিকের মধ্যে** লেখা রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

.... এইখানে কাট

রামধনু
আ ৪৭

নাম..
ঠিকানা..
....

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) অজাতশত্রু (২) সমুদ্রগুপ্ত (৩) বাবর (৪) সাজাহান (৫) হানিফ (৬) মমতাজমহল (৭) রণজিৎ সিংহ (৮) দারা।

উত্তরদাতাদের নাম স্থানাভাবে এ মাসে দেওয়া হইল না। আগামী বারে বাহির হইবে।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এক-একটা ভৌগোলিক নাম দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে :—

ক— খুলে বেশ —মে পা—দিয়ে —দাসী মহা— নিয়ে বসেছ, আজ—র ছেলেদের কথা —। — পরশু —এর নি—ত বললাম, এই কুকুর দিচ্ছি, — গিয়ে, তা ভাব দেখাল যেন আর লোক —! এই তো—াই চেয়ে নিল। ভাল কথা, —াদের একটা নতুন বাড়ী —বাড়ীতে নাকি বি—গোল হচ্ছে।

(কেবল নির্ভুল উত্তরদাতাদের নামই প্রকাশ করা হবে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। সেজন্য কার্ত্তিকের 'রামধনু' ১লা কার্ত্তিক বাহির না হইয়া কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে।—রাঃ কাঃ

রামধনু—

শিল্পী—শ্রী[illegible] পাল চৌধুরী

খালের ধারে

দক্ষিণ কলিকাতা চিত্রপ্রদর্শনীতে (...) প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

১৩শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৭ | ১০ম সংখ্যা

বেড়াল-ছানা ও আমি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

আমি যেমন এ, বি, সি, ডি পড়তে পারি,
নতুন দাদার সাইকেলেতে চড়্‌তে পারি,
বেড়াল-ছানা তেমন কি আর পারে ?

বেড়াল-ছানা নেংটি ইঁদুর ধরতে পারে,
মাঁছের কাঁটা পেটের ভেতর ভরতে পারে,
আমি তেমন মোটেই পারি না রে !

আমি কেমন সেলেটেতে লিখতে পারি,
স্যারের কাছে নামতা পড়া শিখতে পারি,
বেড়াল-ছানা করুক দেখি এ সব !

বেড়াল-ছানা আল্‌সে দিয়ে চলতে পারে,
ল্যাজ ফুলিয়ে 'মিঁয়াও মিঁয়াও' বলতে পারে,
আমি কিন্তু পারি নে ভাই, সে সব ।

বন্ধু

শ্রীবিমল দত্ত, এম্‌-এ

কথাটা হচ্ছিল পুকুরের ধারে, যেখানে বাঁশঝাড় নুয়ে পড়ে জলের ওপর প্রায় একটা সাঁকো তৈরী করে এনেছে। বুড়ো বকই কথাটা পাড়ল, বল্‌ল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি সংসারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের চেয়ে যে বড় বা মহৎ কিছু আছে তা আমি স্বীকারই করি না।"

বুনো হাঁস জিজ্ঞাসা করলে, "তা' হ'লে তোমার মতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কর্ত্তব্য কি ?"

কথার মাঝখানে খরগোস বল্‌লে, "ঠিক, আমিও ঐ কথাই জান্‌তে চাই।"

বক বল্‌লে, "কি বোকার মত কথা কও যে তোমরা! ঘনিষ্ঠ বন্ধু সব সময়ে আমাদের প্রতি অনুরক্ত থাক্‌বে এই চাই।"

হাঁস ঘাড় বেঁকিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলে, "আর তার প্রতিদানে তুমি তার কি করবে ?"

বক বল্‌লে, "তোমার কথা বাপু, ঠিক বুঝ্‌লাম না।"

হাঁস বল্‌লে, "আচ্ছা এ বিষয়ে একটা গল্প বলি, শোন"—

বক জিজ্ঞাসা করলে, "গল্পটা কি আমার সম্বন্ধে ? তা' হলে অবশ্যি আমি শুনতে রাজী আছি। আমি উপন্যাসের ভারি ভক্ত।"

হাঁস বল্‌লে, "হ্যাঁ ও গল্পটা তোমার সম্বন্ধেও খাটে বটে। আচ্ছা, শোন তবে বলছি।"

সে বলতে সুরু করল: "নদী ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ে ঘেরা যে দেশ সেইখানে থাকত একজন ভারী সৎ লোক।"

বক জিজ্ঞাসা করলে, "সে কি খুব বিখ্যাত লোক ছিল নাকি ?"

হাঁস বল্‌লে, "না, সে বিখ্যাত ছিল বলে আমার ত' বোধ হয় না—তবে সে খুব দয়ালু ছিল আর খুব আমুদে। একটা ছোট কুটীরে সে একাকী থাকৃত—আর তার বাগানের কাজকর্ম করত। আশ-পাশে গ্রামে কোথাও তার বাগানের মত সুন্দর বাগান ছিল না। কত রকম ফুলের গাছই না সেই বাগানে ছিল! একটার পর একটা গাছ জন্মাত, কাজেই সুব সময়েই সুন্দর সুন্দর ফুল লোকের চোখ জুড়িয়ে দিত এবং সুন্দর গন্ধে আকাশ বাতাস ভরপূর থাকত।

"ফুলওয়ালার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল কিন্তু সব চেয়ে অনুরক্ত বন্ধু ছিল এক জন মহাজন। সে ফুলওয়ালার এতই অনুরক্ত ছিল যে যখনই সে তার বাগানের ধার দিয়ে যেত তখনই দেওয়ালে ঝুঁকে প্রকাণ্ড এক তোড়া ফুল, কিংবা এক মুঠো গন্ধওয়ালা গাছ তুলে নিত কিংবা যদি সেটা ফলের সময় হ'ত ত' এক পকেট্‌ ভর্ত্তি করে নিত নানা রকম ফল।

"মহাজন সব সময়ে বল্‌ত—'সত্যিকারের বন্ধুদের সব জিনিষই পরস্পরের জন্য রাখা উচিত।' এ কথা শুনে ফুলওয়ালা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়্‌ত আর তার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠ্‌ত। এ রকম উদার মতের একজন লোক যে তার বন্ধু এ কথা ভেবে গর্ব্বে তার বুক ফুলে উঠ্‌ত।

"কখনো কখনো প্রতিবেশীরা ভাব্‌ত, তাই ত' ধনী মহাজন ত' কোন দিন ফুলওয়ালাকে কিচ্ছু দেয় না! এটা তাদের কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকত কেননা মহাজনের কিছুরই অভাব ছিল না।

"এই রকম ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। বসন্তকাল, গ্রীষ্মকাল আর শরৎকাল ফুলওয়ালার ভালই কাটত কিন্তু যখন শীতকাল আসত তখন তার বাগানে ফুলও ফুট্‌ত না ফলও ফল্‌ত না। হাটে বাজারে কিছুই সে নিয়ে যেতে পারত না—কাজেই শীতে আর ক্ষুধায় সে সময়টা সে বড় কষ্ট পেত। এই সময়ে প্রায়ই অনাহারে—কেবল কতকগুলো শুকনো নেসপাতি আর শক্ত বাদাম খেয়েই তাকে রাত কাটাতে হ'ত। শীতকালটা তার বড় নির্জ্জন ঠেকত, কারণ এ সময়ে তার মহাজন বন্ধু একদম আসত না।

"মহাজন তার স্ত্রীকে বল্‌ত, 'যত দিন বরফ পড়া বন্ধ না হয় তত দিন বন্ধুর কাছে গিয়ে লাভ নেই। লোকে যখন কষ্টে পড়ে তখন তাদের একাকী থাক্‌তে দিতে হয়—সে সময় তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বিরক্ত করা উচিত নয়। অবশ্য বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণা ঐ রকম

এবং আমার মনে হয় কথাটা সত্যি। কাজেই আমাকে বসন্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তার পর ওর সঙ্গে দেখা করব। তখন সে আমাকে দেখে কত খুসী হ'বে।'

"জলন্ত উনুনের কাছে আরাম ক'রে বসে মহাজনের স্ত্রী বল্‌লে, 'তুমি পরের কথা বড্ড ভাবো। তুমি যখন বন্ধুত্বের সম্বন্ধে কিছু বল তখন তা' শুন্‌তে বড্ড ভাল লাগে। আমি জানি স্বয়ং ও পাড়ার পাদ্‌রী সাহেবও তোমার মত এমন সুন্দর সুন্দর কথা বল্‌তে পারেন না—যদিও তিনি তিনতলা বাড়ীতে থাকেন, কড়ে আঙ্‌লে সোনার আংটি পরেন।'

"মহাজনের ছোট ছেলে বল্‌লে, 'কিন্তু বাবা, আমরা ত' তোমার বন্ধুকে এখানে ডাক্‌তে পারি। যদি বেচারা কষ্টে পড়ে থাকে আমি আমার খাবারের অর্দ্ধেকটা তাকে দিয়ে দিতে পারি।'

"মহাজন বলে উঠ্‌ল—'আহা, কি তোমার বুদ্ধি! বলিহারি যাই! তোমার মত গণ্ডমূর্খকে স্কুলে দিয়ে যে কি লাভ জানি না। ঐ বুঝি বিদ্যে হচ্ছে! ও যদি এখানে আসে আর আমাদের ঘর-দোর দেখে এবং আমাদের খাওয়া-দাওয়ার স্বাদ পায় তা হ'লে তার হিংসা হ'তে পারে। আর হিংসার মত ভয়ানক জিনিষ কি আর আছে? হিংসায় লোকের প্রকৃতি বিগ্‌ড়ে যায়। বন্ধু হয়ে বন্ধুর প্রকৃতিকে আমি কিছুতেই বিগড়ে যেতে দেব না। আমি তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—আমি সব সময় লক্ষ্য রাখ্‌ব যাতে তার লোভ না হয়। তা ছাড়া ও এখানে এলে হয়ত' বিনা সুদে কিছু টাকা ধার চাইবে—আর ওভাবে ধার আমি দিতে পারব না। টাকা হ'ল এক জিনিষ আর বন্ধুত্ব হ'ল আর এক জিনিষ—ওদের গোলমাল করে ফেল্‌লে চলবে না।' দেখ না, ওদের বানানই সম্পূর্ণ আলাদা! আর দুটো জিনিষ একদম আলাদা—সকলেই ত' জানে!'

"মহাজনের স্ত্রী খেতে খেতে বল্‌লে, 'কি সুন্দর কথাই না তুমি বল! আমার ওসব কথা শুনতে শুনতে ঘুম পায়। মনে হয় যেন বসে বসে ও পাড়ার পাদ্‌রী সাহেবের বক্তৃতা শুন্‌ছি।'

"মহাজন আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—'ভাল কাজ করবার লোক গণ্ডা গণ্ডা আছে—কিন্তু ভাল ভাবে কথা কইতে জানে ক'জন? তাই থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কথা বলাই হচ্ছে শক্ত কাজ আর ভাল কাজ।' সে তার ছোট ছেলের দিকে চাইলে। ছেলেটা এই সব কথা শুনে এত লজ্জিত হয়ে পড়েছিল যে সে শুধু ঘাড় হেঁট করে বসে রইল, লজ্জায় একটা কথাও বলতে পারল না।" হাঁস একটু থাম্‌ল।

বক জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ কি তোমার গল্পের শেষ নাকি?"

হাঁস বল্‌লে, "দূর্,—এই ত' সবে আরম্ভ—"

বক বল্‌লে, "তা' হ'লে বাপু, তুমি বড্ড সেকেলে। আজকালকার সব ভাল ভাল গল্প-লিখিয়ে শেষ থেকে সুরু করে, তার পর যায় গোড়ায় এবং মাঝখানে শেষ করে। ঐ হচ্ছে

আধুনিক ষ্টাইল। সেদিন দু' জন ভদ্রলোক কথা কইতে কইতে পুকুর-ধার দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কাছে আমি শুনেছি। একজন অনেকক্ষণ এ বিষয়ে বক্তৃতা দিলে এবং আমার মনে হয় তার কথাই ঠিক। কেন জান? তার চোখে ইয়া বড় চশমা—আর তার বন্ধু যেই কিছু বলে অমনি সে বলে ওঠে—'ধ্যেৎ!' সে যাই হোক্, গল্পটা চলুক। মহাজনটিকে আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে।"

বুনো হাঁস একবার দম নিয়ে বল্‌ল, "হ্যাঁ, শোন।" *

(ক্রমশঃ)

মিশরে সাম্রাজ্যের যুগ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ

এর আগের বারে তোমাদের মিশরের পিরামিড-যুগের কথা বলেছি।

প্রাচীন মিশরের ফ্যারাওরা যে সময় পিরামিড তৈরী করছিলেন তখন তাঁদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁদের রাজত্ব মিশরের বাইরে বিস্তৃত হয় নি। খুফু, খাফরা ও মেনকরার মৃত্যুর পর মিশর পর পর কয়েক শতাব্দী ধরে দুর্ব্বল রাজার শাসনাধীন থাকবার ফলে দেশে অরাজকতা এসেছিল। সুযোগ বুঝে জমিদাররা নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। রাজার প্রাধান্য তাঁরা নামে মাত্র মানতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জমিদার নিজ নিজ জমিদারীতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।

* একটি বিদেশী গল্পের ছাঁয়া নিয়ে।

কিন্তু এই সময় কেন্দ্রীয় শাসনের প্রাধান্য লোপ পেলেও দেশে শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। মিশরের ইতিহাসের এই সময়কে মোগল আমলের শেষের দিক্‌কার ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জমিদাররা তাঁদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করতেন বটে কিন্তু দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিস্তারের দিকেও তাঁদের নজর ছিল। তাঁরা প্রতিভার কদর বুঝতেন ও প্রতিভাবান্ লোকদের যোগ্য আদর করতেন। এই সময়কার মিশরের জমিদারদের কবরে পৃথিবীর সব চাইতে পুরানো পুস্তকাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

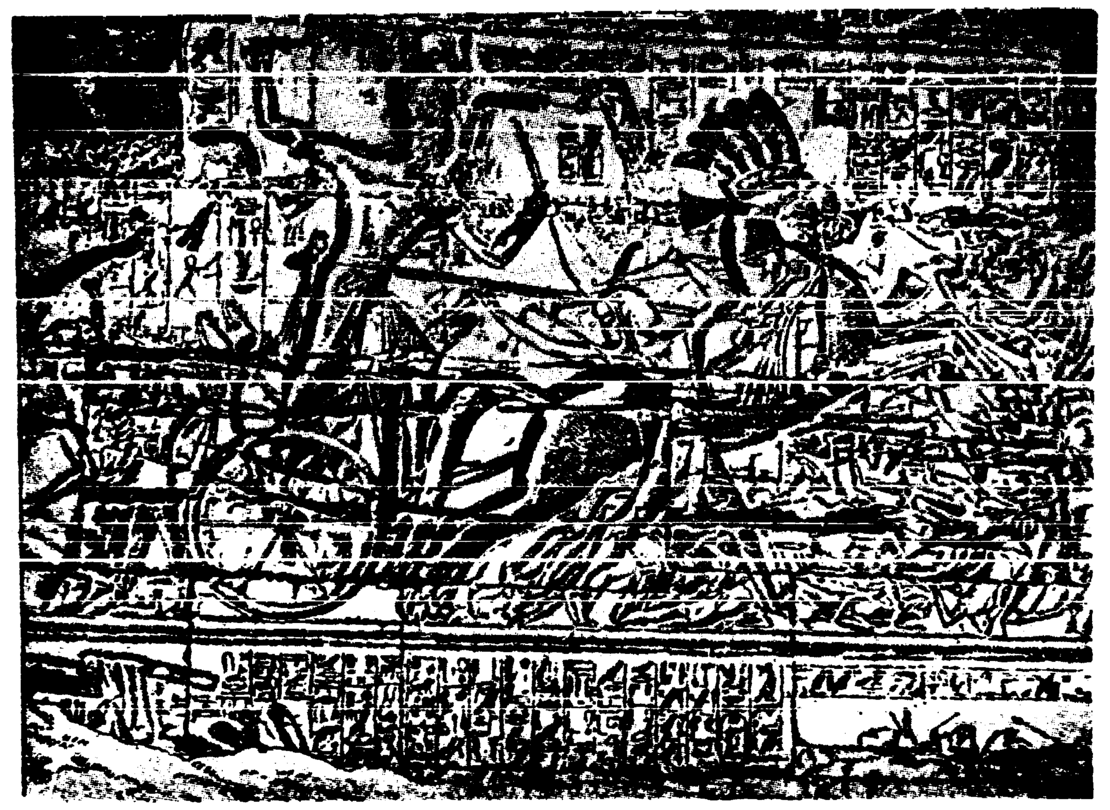

সাম্রাজ্যের যুগের একজন ফ্যারাও রথে চেপে যুদ্ধ করছেন। তাঁর বিক্রমে পরাজিত শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কার্ণাকের মন্দির-গাত্রে খোদাই করা এই রকমের বহু দেয়াল-চিত্র হ'তে প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের মালমসলা সংগৃহীত হয়েছে।

তখন পর্য্যন্ত কাগজের আবিষ্কার হয় নি। তখন বই লেখা হ'ত বটে কিন্তু সেই সব বইএর আকার ছিল আমাদের দেশের কোষ্ঠী-ঠিকুজির মত। পর পর প্যাপিরাসের খণ্ডের ওপর লিখে একটার পর একটা যুড়ে দিয়ে এক প্রকাণ্ড প্যাপিরাসের সৃষ্টি করা হ'ত। লেখা শেষ হ'লে প্যাপিরাসকে ভালভাবে গুটিয়ে রাখা হ'ত যেমন ক'রে আজকাল ঠিকুজিকে গুটিয়ে রাখা হয়। তার পর সমস্যা হ'ল কি করে পোকা, জল প্রভৃতি থেকে এই বইগুলিকে রক্ষা করা চলে। এর জন্যও মিশরীয় গ্রন্থকাররা এক মজার উপায় বার করেছিলেন। ছোট ছোট মাটির পাত্র—ভালভাবে পুড়িয়ে শক্ত করে নিয়ে তার ভেতর এক রকম মশলা ফেলে দেওয়া হ'ত।

এই মশলা থাকবার জন্য পোকা এই সব পাত্রে ঢুকতে পেত না। তার পর প্যাপিরাসের বই এই পাত্রে রেখে পাত্রের মুখ ভাল করে ঢেকে দেওয়া হ'ত যেন জল ঢুকতে না পারে। জমিদাররা এই রকম করে বই সংগ্রহ করতেন ও তাঁদের মৃত্যুর পর সংগৃহীত সব বই তাঁদের কবরে রেখে আসা হ'ত। এই ভাবে প্রত্যেকটি জমিদারের কবরে গড়ে উঠেছিল এক একটি বিশাল পুস্তকাগার। প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টার ফলে এই সব পুস্তকাগার আমাদের নজরে এসেছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বছর আগে এই জমিদারদের প্রাধান্যের যুগ আরম্ভ হয় এবং কয়েক শত বৎসর ধ'রে তাঁদের প্রাধান্য তাঁরা রক্ষা করেছিলেন। এই সময় মিশরীয়রা কি বিষয়ে বই লিখত তা জানবার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সব পুস্তকাগারে ভ্রমণ-কাহিনী, বীরত্বের গল্প, নাটক, রাজনীতি, ধর্ম্ম পুস্তক সবই পাওয়া গিয়েছে। এই সব বইগুলির মধ্যে কোনটা বা কয়েক ফুট লম্বা আবার কোনটা বা কয়েক হাজার ফুটেও শেষ হয় নি। ওসিরিস ছিলেন মিশরীয়দের প্রধান দেবতা। এই ওসিরিসের জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত একটি নাটক পাওয়া গিয়েছে। আবার এক নাবিকের আত্মকাহিনীও এই সব বইএর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এই নাবিক লোহিত-সাগর দিয়ে ভারত-মহাসাগরে আসছিলেন। এডেনের কাছে তাঁর জাহাজ ভেঙ্গে যায়। জাহাজ-ডুবির পর তিনি কি রকম ভাবে নানা দেশ দেখে নানা বিপদ্ হতে রক্ষা পেয়ে কি করে মিশরে ফিরে এসেছিলেন

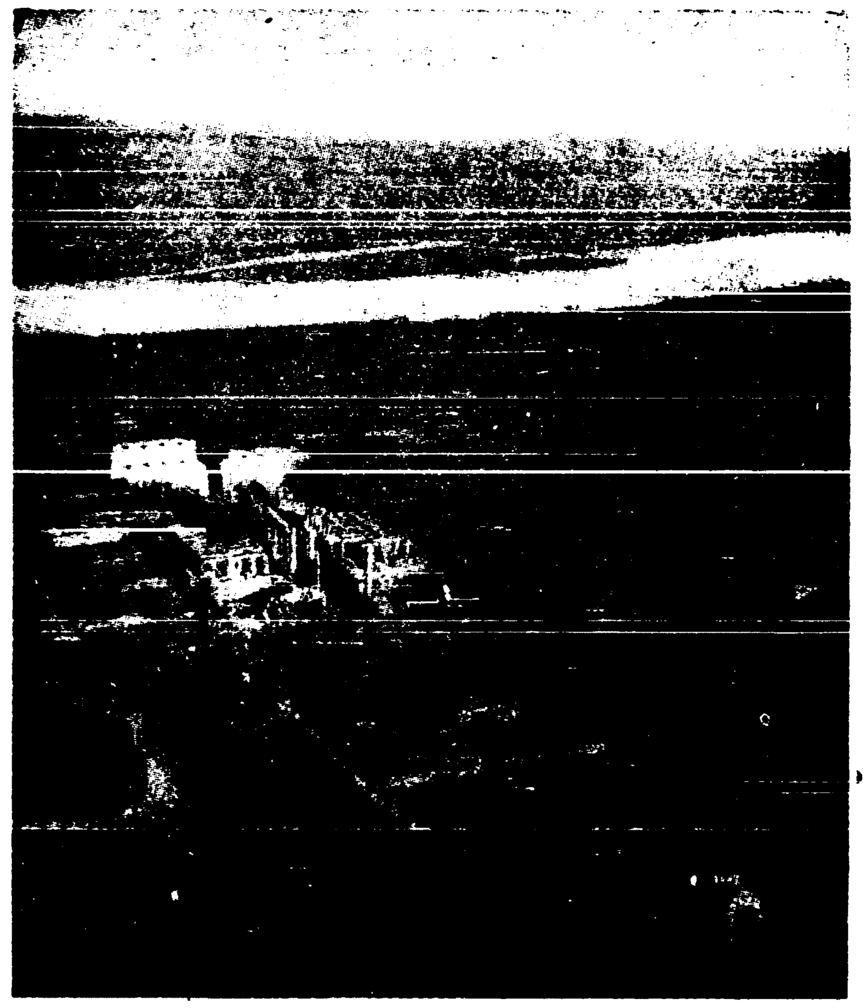

থিবিসের কার্ণাক মন্দির

তার বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। সিন্দুবাদ নাবিকের গল্প তোমরা পড়েছ। এই নাবিকের কাহিনীকে সিন্দুবাদের গল্পের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অনেক গান ও কবিতাও এই সব কবরে পাওয়া গিয়েছে।

এই জমিদারদের শাসনে মিশরের লোকেরা সুখেই ছিল বলতে হবে। ফ্যারাওদের অনুকরণে জমিদাররা জীবিত থাকতেই নিজ নিজ কবর তৈরী করে রাখতেন। এক জমিদার তাঁর কবরের দেয়ালে খোদাই করে গিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন নি। তাঁর শাসনে তাঁর প্রজারা সুখে ও শান্তিতে থাকত। তাদের মধ্যে কোনও দুঃখ অথবা অভাব ছিল না। এই লিখনের সবটা সত্যি না হলেও খানিকটাও যদি সত্যি হয় তা হলেও বুঝতে হবে যে তাঁর শাসনে তাঁর প্রজারা সুখেই ছিল। জমিদাররা খাল ও নালা কেটে চাষের সুবন্দোবস্ত করতেন। তাঁদের আমলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করেছিল। জাহাজে করে বণিকরা মিশরে উৎপন্ন জিনিষ নিয়ে বিদেশে যেতেন ও সেখান থেকে বিদেশী জিনিষ নিয়ে এসে দেশে বিক্রী করতেন। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলির সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যের আদান-প্রদান ছিল।

নিউবিয়ার অন্তর্গত আবু সিম্বেলের পর্ব্বতগাত্রে খোদাই করা সম্রাট্ দ্বিতীয় রামেসেসের মূর্ত্তি

কিন্তু এই জমিদারদের ক্ষমতা খুব বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। এই যুগের শেষের দিকে ফ্যারাওরা ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হচ্ছিলেন ও জমিদারদের প্রতাপ কমে আসছিল। দেশের লোকেরা কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজন বুঝতে

পারছিল। প্রায় ২০০ বৎসর জমিদারদের শাসনের পর খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৮০০ বৎসর আগে ফ্যারাওরা তাদের দমন করে মিশরের একচ্ছত্র সম্রাট্ হতে পেরেছিলেন। এই সময় তাঁদের সৈন্যবাহিনীও বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল। জমিদারদের দমন করবার পর তাঁরা নজর দিলেন রাজ্য বিস্তারের দিকে এবং দক্ষিণ দিকে কয়েক শত মাইল তাঁরা কয়েক বৎসরের মধ্যেই দখল করে নিলেন। এই সময় থেকে মিশরে সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হ'ল। মিশরের ইতিহাসে এই সাম্রাজ্যের যুগই সব চাইতে গৌরবময় যুগ।

এই যুগের ফ্যারাওদের আমলে রাজ্যশাসন ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই সময় প্রথম সালতামামির প্রবর্ত্তন হয় এবং এর ফলে সাম্রাজ্যের আয় কত ছিল এবং কোন কোন উপায়ে রাজকোষ পূর্ণ হ'ত তার হিসাব পাওয়া গিয়েছে। কয়েক বৎসরের সালতামামির হিসাব মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। চাষীদের সুবিধার জন্য প্রতি বৎসর নীল নদের জল মাপা হ'ত এবং প্রতি বৎসর বন্যার জল কতখানি উঠত তা জেনে রাখবার জন্য নদীর ধারের পাহাড়ের উপর দাগ কাটা হ'ত। এই সব দাগ আজও দেখতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের নদীর জল মাপবার পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাবে যে প্রাচীন মিশরের লোকেরা নীল নদের জল যে ভাবে মাপত আজকালও অনেকটা সেইভাবেই জল মাপা হয়। কয়েক মাস আগে উড়িষ্যায় খুব বন্যা হয়েছিল। নদীর জল রোজ কতখানি করে বাড়ছিল তার খবর তোমরা খবরের কাগজে দেখেছ। মিশরেও অনেকটা এক ভাবেই নীল নদের বন্যার সময় রোজ জল কতখানি বাড়ত দাগ কেটে কেটে তার মাপ রাখা হ'ত। অতএব দেখতে পাচ্ছ আজকাল চাষীদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেন্ট যা করেছেন প্রায় চার হাজার বৎসর আগেও মিশরের সম্রাট্রা তাই করে গিয়েছেন।

সাম্রাজ্যের যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিশরের প্রধান রাজধানী ছিল উত্তর মিশরে হেলিওপলিস নামে এক নগরে। আজকাল অবশ্য সে নগরের চিহ্ন মাত্রও নেই। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জায়গায় রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তাই মধ্য মিশরে থিবিস নামে এক নগরের পত্তন হ'ল ও সেখানে

সম্রাট্ তাঁর পাত্রমিত্র ও কর্ম্মচারী নিয়ে উঠে গেলেন। সম্রাটের প্রাসাদ ঘিরে ক্রমশঃ এক বিরাট সহর গড়ে উঠল। থিবিস ছিল নীল নদের ধারে। নদীর ধারে সহরের পত্তন করলে যে সেই সহর কত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে তার প্রধান প্রমাণ পাবে আমাদের কলকাতার কথা মনে করলে। আড়াই শত বৎসর আগেও কলকাতা ছিল কয়েকটি গণ্ডগ্রামের সমষ্টি—আজ সেই কয়েকটি গণ্ডগ্রাম হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর। থিবিসও কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই মিশরের প্রধান সহরে পরিণত হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বণিক্, ভাগ্যান্বেষী প্রভৃতি এসে নগরের জনসংখ্যা ও সমৃদ্ধি বাড়িয়েছিল। আদিম থিবিসে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে অবশেষে নদীর অপর ধারেও আর একটি সহর গড়ে ওঠে—এই সহরটি ছিল থিবিসেরই আর একটি অংশ। এদিকে সাম্রাজ্য ক্রমশঃই বিস্তৃত হচ্ছিল। নীল নদের উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত সম্রাটেরা জয় করেছিলেন—আবার পূবদিকে এসিয়া মাইনর, ব্যাবিলন প্রভৃতিও মিশরের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল।

পিরামিড যুগের ইতিহাসের মালমসলার প্রধান উপাদান যেমন আমরা পেয়েছি পিরামিডগুলির ভেতর আবিষ্কৃত লিখন প্রভৃতি হতে, সে রকম সাম্রাজ্যের যুগের ইতিহাসের প্রধান মালমসলা যুগিয়েছে থিবিসের কার্ণাকের মন্দির। এই বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা চিত্র ও লিখন থেকে এসিয়াতে রাজ্য জয় থেকে আরম্ভ করে রাজ্যশাসনের ইতিবৃত্ত পর্য্যন্ত আমরা পেয়েছি।

এই সময় পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা মানুষের প্রয়োজনের জন্য ঘোড়ার ব্যবহার। বাষ্পকে মানুষ নিজের কাজে ব্যবহার করার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে যতখানি বিপ্লব এসেছে বন্য ঘোড়াকে সায়েস্তা করে মানুষের ব্যবহারে নিয়োগ করার ফল তার চাইতে কোনও ক্রমেই কম নয়। ঘোড়ার ব্যবহারের সঙ্গে এল রথের ব্যবহার—মানুষ পেল গতির স্বাদ এবং বুঝতে পেল দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা। যে জাতি ঘোড়াকে নিজের কাজে লাগাতে পেরেছিল সে জাতি যে সমসাময়িক সমস্ত জাতির উপর প্রাধান্য করবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? মিশরের অশ্বারোহী ও রথী সৈন্যবাহিনীর কাছে

চারিদিকের পদাতিকবাহিনী অতি সহজে পরাজিত হয়ে মিশরের সম্রাটের প্রাধান্য মেনে নিল। এইভাবে ঘোড়ার ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্যের পত্তন হ'ল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চার শত বৎসর মিশরের ফ্যারাওরা একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন।

সাম্রাজ্যের যুগের ফ্যারাওরা প্রত্যেকেই ছিলেন সমরনায়ক। কার্ণাকের মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা এক ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় যে ফ্যারাও তাঁর রথে চেপে যুদ্ধ করছেন—আর তাঁর বিক্রমে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। এই সময় আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। বহু বৎসর ধরে মিশর রাণী হাটসেপসাট্ নামে এক স্ত্রীলোকের অধীনে শাসিত হয়েছিল। ইনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম সম্রাজ্ঞী—যাঁকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হাট্সেপসাট্ যে কেবলমাত্র রাজ্য শাসন করেছিলেন তাই নয়—তিনি সাম্রাজ্যের বহুল বিস্তার করেছিলেন, জাহাজ পাঠিয়ে দেশ-বিদেশ হ'তে ভাল ভাল জিনিষ এনে কার্ণাকের মন্দির সাজিয়েছিলেন এবং দক্ষিণ মিশর হতে প্রকাণ্ড দুটি প্রস্তর-স্তম্ভ আনিয়ে কার্ণাকের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা না থাকলে এই বহুব্যয়সাধ্য ও বহুবর্ষব্যাপী কীর্ত্তি স্থাপন করা সম্ভব হ'ত না। হাটসেপসাটের পরবর্ত্তী শাসক তৃতীয় থোথমেস্‌ও নানা কারণে স্মরণীয়। ইনি হাটসেপসাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও স্বামী ছিলেন।

তৃতীয় থোথমেস ছিলেন পৃথিবীর প্রথম প্রধান সমরনায়ক এবং তাঁর সঙ্গে আলেক্‌জান্দার অথবা নেপোলিয়নের তুলনা করা চলে। তিনি অর্দ্ধশতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছিলেন ও এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কুড়ি বৎসর তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল চারিদিকের রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য মিশরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে। তাঁর আমলেই মিশরের সাম্রাজ্য সব চাইতে বেশী বিস্তার পায়। সমগ্র পশ্চিম এসিয়া তিনি জয় করেন। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলি মিশরের সেনানায়করা অধিকার করেন ও এই সব সেনানায়কদের তিনি বিভিন্ন দ্বীপের শাসনকর্ত্তা রূপে নিয়োগ করেন।

তৃতীয় থোথমেসের পরই ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের নাম করা যেতে

পারে। ইনি ছিলেন সব চাইতে আরামপ্রিয় সম্রাট্। পূর্ব্বতন সম্রাট্রা নিজেদের শরীরের রক্তপাত করে যে সাম্রাজ্যের পত্তন করে গিয়েছিলেন আমেনহোটেপ সেই সাম্রাজ্য যত দিন বেঁচে ছিলেন তত দিন ভোগ করে গিয়েছিলেন। জীবন যত রকম ভাবে উপভোগ করা যেতে পারে ইনি তার কিছুরই কসুর করেন নি। থিবিসের রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই তিনি একটি প্রকাণ্ড হ্রদ তৈরী করালেন। যুদ্ধবিগ্রহ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কেবলমাত্র সুডানের এক বিদ্রোহ দমন করা ভিন্ন তিনি আর কোনও অভিযান করেন নি।

এই সময় মিশরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও মন্দির তৈরী হয়। এই সময়ে আবার দেশে এক ধর্ম্মবিপ্লব হয়। মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন আমেন এবং এই দেবতার নাম অনুসারে ফ্যারাওদের নামকরণ হ'ত। কিন্তু আমেন ভিন্নও মিশরীয়রা অনেক দেবতার পূজা করতেন। তৃতীয় আমেনহোটেপের ছেলে চতুর্থ আমেনহোটেপ এক ভগবানে বিশ্বাস করতেন। এই দেবতার নাম হ'ল আটন। আটন ছিলেন একমাত্র দেবতা এবং তাঁর রশ্মি ছিল জীবনের মূল শক্তি। চতুর্থ আমেন-হোটেপ তাঁর নিজের নাম বদলে আটনদেবের নাম অনুসারে রাখলেন ইখ্নাটন। এই সম্রাট্ চিররুগ্ন ছিলেন ও মৃগী রোগে ভুগতেন কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল অসীম।

এদিকে দেশের বেশীর ভাগ লোক ছিল আমেন দেবের পূজারী ও পুরোহিতদের ক্ষমতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল। ইখ্নাটন বুঝলেন যে থিবিসে বসে তিনি পুরোহিতদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে হেরে যাবেন। তাই তিনি রাজধানী টেল-এল-আমারনা নামে উত্তর দিকে অন্য এক সহরে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে তিনি তাঁর ধর্ম্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তিনি অহিংসায় বিশ্বাস করতেন ও প্রচারক পাঠিয়ে তাঁর প্রজাদের হিংসা ত্যাগ করতে ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হ'তে উপদেশ দিতেন। এমন কি নিজের সাম্রাজ্যের কোনও অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি। ইখ্নাটন নিজে কবি ছিলেন ও আটনদেবের নামে তিনি অনেক গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। এই আদর্শবাদী সম্রাটের রাজত্বকালে মিশরের সাম্রাজ্যের পরিমাণ অনেক কমে এসেছিল। ইখ্নাটন ছিলেন পৃথিবীর প্রথম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করবার মত অবস্থায় আসে নি। ইখ্নাটন পুরোহিতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও আটনদেব ভিন্ন অন্য সব দেবতার মন্দির বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিল। আবার অহিংসাবাদী সম্রাট্ সৈন্যদের সুখ-সুবিধার দিকে মোটেই নজর দিতেন না—ফলে তারাও অসন্তুষ্ট হয়ে ছিল। সাম্রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। এসিয়ার সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এই অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মধ্যে চিররুগ্ন সম্রাট্ ইখ্নাটন মারা গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর আদর্শ ও একেশ্বরবাদও লোপ পেল।

ইখ্নাটনের ছেলে ছিল না, ফলে মিশরের সিংহাসন অন্য এক রাজবংশের হাতে চলে গেল। এই বংশের সম্রাট্দের মধ্যে প্রথম সেটি ও তাঁর ছেলে দ্বিতীয় রামেশেষের নাম করা যেতে পারে। মিশরের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু নষ্ট জিনিষ আবার তৈরী করা সহজ নয়। এই নূতন বংশের সম্রাট্রা অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রায় চার শত বৎসর রাজত্ব করেও তাঁরা মিশরের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। মিশরীয়দের শৌর্য্যও ক্রমশঃই কমে আসছিল—তারা আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং ধ্বংসের বীজ ভালভাবেই জাতির মধ্যে ঢুকেছিল। এমন কি যে মিশরীয় সেনাবাহিনী চারিদিকের ত্রাসের বিষয় ছিল তাও লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের যুগের শেষ ভাগে আমরা দেখতে পাই যে মিশরের সেনাবাহিনীর বেশীর ভাগ ছিল মাইনে করা বিদেশী সৈন্য। সাম্রাজ্য ক্রমশঃই আকারে ছোট এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিল। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদেশী সৈন্যের আক্রমণে মিশরের সাম্রাজ্যের চিরকালের জন্য পতন হ'ল। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে মিশরের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লেও মিশরের সংস্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার তুলনা অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে বিরল। ইয়োরোপের সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার কাছে নানাভাবে ঋণী।

শরৎ তুমি এলে

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

শরৎ, তুমি এলে, তুমি এলে !
আকাশে আর মাঠে তোমার অগাধ স্নেহ মেলে,
তুমি এলে !
ভরা নদীর তীরে তীরে, কাশের বনে বনে
রূপ দিলে কি কোন কবির মনের সু-স্বপনে ?
দীঘির পাড়ে ধানের ক্ষেতে আলোর প্রদীপ জ্বেলে,
তুমি এলে !

তুমি এলে, ধরণী তাই হেসে হেসেই সারা—
আলোয় গানে প্রাণে তাহার কি আনন্দ-ধারা !
অমনি ক'রে আমার প্রাণে আসবে তুমি কবে ?
রূপে, রসে, গন্ধে জীবন ভরিবে বৈভবে !

এস তুমি, যেমন ক'রে এলে ধরার পরে,
এস, আকুল তোমায় ডাকি আমারই অন্তরে।
আমার প্রাণের সমস্ত মাঠ উষর হয়ে আছে,
শ্যামলিমা, বন্ধু, আজি যাচি তোমার কাছে।
মনের বনে ফোটে নি ফুল—শিউলি-মালতীরা,
আমার নদী শীর্ণা অতি, অচঞ্চলা, ধীরা।
সেই নদীটির তীরে তীরে নেইকো কাশের হাসি,
আমার বটের তলে রাখাল বাজায় নিকো বাঁশী।
আমার চিত্ত-আকাশ আজো মেঘেই আছে ছেয়ে,
তোমার কাছে সুনীলতা নেব গো আজ চেয়ে।

আমিষে-নিরামিষে

[প্রবন্ধ]

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

গুটিপোকা বল্‌ল, "বাঁচা গেল ! এবার থেকে রেশম তৈয়ারী কর্‌তে হ'লে আর আমাদের সিদ্ধ ক'রে মার্‌তে হবে না। কাঠ, পাতা, এ সব থেকে নাকি মানুষেরা নকল রেশম তৈয়ারী ক'রেছে ;—দামেও খুব সস্তা সে রেশম। অবিশ্যি, এখনও আসল রেশম তৈয়ারীর বেলা আমাদের না হ'লে চল্‌বে না। সে আর কত দিন ? সস্তা এবং সুবিধা হ'লে লোকে আসল ছেড়ে নকলই চাইবে—কি বল ?"

ভেড়া বল্‌ল, "পশমের বেলাও তো তাই ! যাই বলিস্ ভাই, মানুষগুলোর বুদ্ধি কিন্তু খুব পাকা ! দুধ থেকে,—থুড়ি, দুধের ছানা থেকে নকল পশম তৈয়ারী কর্‌ছে ! নকল রেশমের সূতোকে পাকিয়েও নাকি পশমের নকল তৈয়ারী কর্‌ছে ! অবিশ্যি, আমাদের লোম কাট্‌লে আমরা মরি না। কিন্তু ভাই, আমাদের মাংস খাবার সখ তো যাচ্ছে না এই মানুষগুলোর ; তা'র বেলা কি করা যায় বল্ তো ?"

মন্টু সেখানে ছিল ; সে ব'লে উঠ্‌ল, "আহা ! তা' বুঝি শোন নি ? মানুষ পিছ্‌পাও হবার নয়। সে নকল মাংস তৈয়ারী করেছে ; তা'র মানে, মাংসের যে সার জিনিষ—যা'র নাম প্রোটীন—সেই জিনিষ তৈয়ারী ক'রেছে মানুষ। সে নাকি আবার নিরামিষ জিনিষ থেকে !"

কুকুর বল্‌ল, "প্রোটীনই বল, আর যা'ই বল—মাংস খায় শুধু তার গন্ধ আর স্বাদের জন্য। প্রোটীন কি জিনিষ তা' জানিও না, চিনিও না, বুঝিও না। মাংসের গন্ধ আর স্বাদ বের ক'রে নিলে হাজার প্রোটীন দিলেও সেটা খাব না।"

মন্টু বল্‌ল, "কে বল্‌ল মানুষ মাংসের স্বাদ, গন্ধ নকল কর্‌তে পার্‌বে না ? আলবাৎ পার্‌বে ;—তখন ?"

ভেড়া বল্‌ল, "তখন আর কি ?—গিজ্‌দাগিজুম্ ! তাক্‌ধিনাধিন্ ! কেয়াবাৎ ! কেয়াবাৎ !"

গরু এতক্ষণ শুন্‌ছিল কথাবার্ত্তা। নকল মাংসের কথা শুনে বল্‌ল, "তবে তো আর কথাই নাই! আমাদের চামড়া মোটর-গাড়ী, বাস্‌, আরাম-কেদারা, আপিস-চেয়ার এ সবের জন্য কত যে লাগে তা'র ঠিক নেই। হাড় কাজে লাগে, শিং কাজে লাগে, ক্ষুর কাজে লাগে। চামড়ার নকল তো মানুষে বানিয়েছেই,—আমাদের চামড়া থেকে সস্তাও। শিং থেকে যে সব জিনিষ তৈয়ারী হয়, নকল শিং থেকে তা'র চেয়ে ভাল বৈ খারাপ হয় না। ক্ষুর থেকে সিরিষ তৈয়ারী হয়। আজকাল তো তা'র চেয়ে ভাল নিরামিষ সিরিষ তৈয়ারী হয়েছে। আমাদের শিংএর সিরিষে বদ্‌ গন্ধ :—নিরামিষ সিরিষের গন্ধটি খাসা! কাজেই দেখ্‌ছি, আমাদেরও খুব ফূর্ত্তির দিন আস্‌ছে। একজন বলেছেন নকল দুধও নাকি তৈয়ারী হবে; তখন আমাদের বাচ্চারা পেট ভ'রে দুধ খেতে পা'বে।"

মণ্টু বল্‌ল, "দূর বোকা! নকল দুধ আবার কেউ খাবে নাকি? তা'তে মোটেই ভিটামিন—যাকে বলে 'খাদ্যপ্রাণ'—সেটা থাক্‌বে না।"

গরু বল্‌ল, "তোমারও যেমন কথা! 'ভিটামিন' না আরো কিছু! মানুষ তো ভারি কেয়ার করে তার জন্য! নকল দুধে একটু সুগন্ধি, একটু চিনির মত জিনিষ, একটু ঘন করার মত জিনিষ মিশিয়ে দিলে তখন আর মানুষগুলোর খেয়ালই থাক্‌বে না ভিটামিন আছে কি নাই;—চোঁ চোঁ ক'রে সে দুধ খেয়ে শেষ কর্‌বে। চালের ভিটামিন যে পালিশ ক'রে শেষ ক'রে দাও তা'র বেলা বুঝি কিছু বল্‌বার থাকে না?—বেরিবেরি যখন হয় তখন শুধু মাথা চুল্‌কিয়ে বল, 'বোধ হয় মাজা চাল খেয়ে হয়েছে';—সব জানি গো, সব জানি।"

মণ্টু বেচারা এবার আর কিছু বল্‌তে পার্‌ল না।

হঠাৎ একটা ছাগল এগিয়ে এসে বল্‌ল, "আচ্ছা, পাঁঠার মাংসের নকল না হয় হবে ব'লেই ধর্‌লাম; কিন্তু, জ্যান্ত পাঁঠার কি নকল হবে? শেষটায় আবার বল্‌বে না তো, 'বলির জন্য নকল পাঁঠা দাও—নইলে আসল পাঁঠাই কাট্‌ব';—তখন এক ফ্যাসাদ বাধ্‌বে।"

ভেড়া বল্‌ল, "সে বালাই আমাদের নাই।"

ছাগল অম্‌নি শিং নেড়ে বল্‌ল, "নাই বল্‌লেই হ'ল? বলির ভেড়া তো

কোনদিনই কেউ চায় না; কিন্তু, 'বলি' ছাড়াও তো কাটার রকমফের আছে;—সে সব ব'লে আর মনকে কষ্ট দেওয়া কেন? নকল মাংস তো আর সে-ভাবে-কাটা জন্তু থেকে আস্‌বে না;—কারখানায় তৈরী হবে। তখন এক দল লোকে বল্‌বে, 'এ রকম মাংস খাওয়া যায় না,—দস্তুর-মাফিক কাটো ভেড়া, দাও মাংস—তবে খাব।'—তখন?"

মণ্টু এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। সে দু'জনের মধ্যস্থ হ'য়ে বল্‌ল, "ও সব তর্ক দিয়ে এখন কোন দরকার নাই। যখন নকল মাংস সস্তায় বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যাবে—তা'তে হাড্ডি নাই, ছিব্‌ড়া নাই,—তখন সকলেই চাইবে 'নকল পাঁঠা', 'নকল মাটন', 'নকল মুর্গী'। ওজন দরে কিন্‌বে, রাঁধ্‌বে, খাবে। আসল পাঁঠা, ভেড়ার এক নিয়ম, নকলের অন্য নিয়ম;—এ অতি সহজ কথা।"

ছাগল, ভেড়া, দু'জনেই বেজায় খুসী হ'য়ে মুণ্ডু নাড়্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে গরুও ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেল্‌ল।

মণ্টু বল্‌ল, "শুধু তোমরা কেন, আরো অনেক জন্তুরা বাঁচ্‌বে। কচ্ছপ বেচারাদের খোলা দিয়ে কত রকমের দামী জিনিষ—সিগারেট খাবার 'পাইপ', নানা রকমের বাক্স, কৌটা, গহনা, এ সব তৈয়ারী হয়। মানুষ এখন নকল কচ্ছপ-খোলা দিয়ে সে সব বানাচ্ছে;—দামেও ঢের সস্তা, আর দেখ্‌তেও আসল জিনিষটিরই মত। কচ্ছপের মাংসেরও নকল কর্‌বে। তখন কচ্ছপ ভায়াদেরও মজা হবে।"

একটা কচ্ছপ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে এ কথা শুনে বল্‌ল, "মানুষগুলোর কথা আর বল্‌বেন না! নকল পাওয়া সত্ত্বেও তা'রা চায় আসল জিনিষটি। কাগজে আবার বিজ্ঞাপন দেয়—'আসল কচ্ছপ-খোলার পাইপ'! বল তো এদের নিয়ে করা যায় কি?"

গরু বল্‌ল, "সে আর কত দিন? মণ্টু তো বলেছেই, সস্তা পেলে মানুষ আসল-নকল সব ভুল্‌বে। দু'দিন যাক্‌ না।"

মণ্টু বল্‌ল, "নকল বের হওয়ায় অনেক পোকারাও বেঁচেছে, তা' জান কি? 'কোচিনীল' ব'লে এক জাতের পোকা দিয়ে লাল রং তৈয়ারী করা হ'ত—এখনও

গরু এতক্ষণ শুন্‌ছিল কথাবার্ত্তা। নকল মাংসের কথা শুনে বল্‌ল, "তবে তো আর কথাই নাই! আমাদের চামড়া মোটর-গাড়ী, বাস্‌, আরাম-কেদারা, আপিস-চেয়ার এ সবের জন্য কত যে লাগে তা'র ঠিক নেই। হাড় কাজে লাগে, শিং কাজে লাগে, ক্ষুর কাজে লাগে। চামড়ার নকল তো মানুষে বানিয়েছেই,—আমাদের চামড়া থেকে সস্তাও। শিং থেকে যে সব জিনিষ তৈয়ারী হয়, নকল শিং থেকে তা'র চেয়ে ভাল বৈ খারাপ হয় না। ক্ষুর থেকে সিরিষ তৈয়ারী হয়। আজকাল তো তা'র চেয়ে ভাল নিরামিষ সিরিষ তৈয়ারী হয়েছে। আমাদের শিংএর সিরিষে বদ্‌ গন্ধ;—নিরামিষ সিরিষের গন্ধটি খাসা! কাজেই দেখ্‌ছি, আমাদেরও খুব ফূর্ত্তির দিন আস্‌ছে। একজন বলেছেন নকল দুধও নাকি তৈয়ারী হবে! তখন আমাদের বাচ্চারা পেট ভ'রে দুধ খেতে পা'বে।"

মণ্টু বল্‌ল, "দূর বোকা! নকল দুধ আবার কেউ খাবে নাকি? তা'তে মোটেই ভিটামিন—যাকে বলে 'খাদ্যপ্রাণ'—সেটা থাক্‌বে না।"

গরু বল্‌ল, "তোমারও যেমন কথা! 'ভিটামিন' না আরো কিছু! মানুষ তো ভারি কেয়ার করে তার জন্য! নকল দুধে একটু সুগন্ধি, একটু চিনির মত জিনিষ, একটু ঘন করার মত জিনিষ মিশিয়ে দিলে তখন আর মানুষগুলোর খেয়ালই থাক্‌বে না ভিটামিন আছে কি নাই;—চোঁ চোঁ ক'রে সে দুধ খেয়ে শেষ কর্‌বে। চালের ভিটামিন যে পালিশ ক'রে শেষ ক'রে দাও তা'র বেলা বুঝি কিছু বল্‌বার থাকে না?—বেরিবেরি যখন হয় তখন শুধু মাথা চুল্‌কিয়ে বল, 'বোধ হয় মাজা চাল খেয়ে হয়েছে';—সব জানি গো, সব জানি।"

মণ্টু বেচারা এবার আর কিছু বল্‌তে পার্‌ল না।

হঠাৎ একটা ছাগল এগিয়ে এসে বল্‌ল, "আচ্ছা, পাঁঠার মাংসের নকল না হয় হবে ব'লেই ধর্‌লাম; কিন্তু, জ্যান্ত পাঁঠার কি নকল হবে? শেষটায় আবার বল্‌বে না তো, 'বলির জন্য নকল পাঁঠা দাও—নইলে আসল পাঁঠাই কাট্‌ব';—তখন এক ফ্যাসাদ বাধ্‌বে।"

ভেড়া বল্‌ল, "সে বালাই আমাদের নাই।"

ছাগল অম্‌নি শিং নেড়ে বল্‌ল, "নাই বল্‌লেই হ'ল? বলির ভেড়া তো কোনদিনই কেউ চায় না; কিন্তু, 'বলি' ছাড়াও তো কাটার রকমফের আছে;—সে সব ব'লে আর মনকে কষ্ট দেওয়া কেন? নকল মাংস তো আর সে-ভাবে-কাটা জন্তু থেকে আস্‌বে না;—কারখানায় তৈরী হবে। তখন এক দল লোকে বল্‌বে, 'এ রকম মাংস খাওয়া যায় না,—দস্তুর-মাফিক কাটো ভেড়া, দাও মাংস—তবে খাব।'—তখন?"

মণ্টু এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। সে দু'জনের মধ্যস্থ হ'য়ে বল্‌ল, "ও সব তর্ক দিয়ে এখন কোন দরকার নাই। যখন নকল মাংস সস্তায় বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যাবে—তা'তে হাড্ডি নাই, ছিব্‌ড়া নাই,—তখন সকলেই চাইবে 'নকল পাঁঠা', 'নকল মাটন', 'নকল মুর্গী'। ওজন দরে কিন্‌বে, রাঁধ্‌বে, খাবে। আসল পাঁঠা, ভেড়ার এক নিয়ম, নকলের অন্য নিয়ম;—এ অতি সহজ কথা।"

ছাগল, ভেড়া, দু'জনেই বেজায় খুসী হ'য়ে মুণ্ডু নাড়্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে গরুও ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেল্‌ল।

মণ্টু বল্‌ল, "শুধু তোমরা কেন, আরো অনেক জন্তুরা বাঁচ্‌বে। কচ্ছপ বেচারাদের খোলা দিয়ে কত রকমের দামী জিনিষ—সিগারেট খাবার 'পাইপ', নানা রকমের বাক্স, কৌটা, গহনা, এ সব তৈয়ারী হয়। মানুষ এখন নকল কচ্ছপ-খোলা দিয়ে সে সব বানাচ্ছে;—দামেও ঢের সস্তা, আর দেখ্‌তেও আসল জিনিষটিরই মত। কচ্ছপের মাংসেরও নকল কর্‌বে। তখন কচ্ছপ ভায়াদেরও মজা হবে।"

একটা কচ্ছপ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে এ কথা শুনে বল্‌ল, "মানুষগুলোর কথা আর বল্‌বেন না! নকল পাওয়া সত্ত্বেও তা'রা চায় আসল জিনিষটি। কাগজে আবার বিজ্ঞাপন দেয়—'আসল কচ্ছপ-খোলার পাইপ'! বল তো এদের নিয়ে করা যায় কি?"

গরু বল্‌ল, "সে আর কত দিন? মণ্টু তো বলেছেই, সস্তা পেলে মানুষ আসল-নকল সব ভুল্‌বে। দু'দিন যাক্‌ না।"

মণ্টু বল্‌ল, "নকল বের হওয়ায় অনেক পোকারাও বেঁচেছে, তা' জান কি? 'কোচিনীল' ব'লে এক জাতের পোকা দিয়ে লাল রং তৈয়ারী করা হ'ত—এখনও

হয়। কিন্তু, তা'র বদলে নিরামিষ রং তৈয়ারী করা হচ্ছে, যা' দামেও সস্তা, কাজেও ভাল। কোচিনীল- রং আমিষ, কিন্তু নিরামিষ খাবারে যখন সে রং ব্যবহার করা হয় তখন নিরামিষ-খোর ভদ্রলোকেরাও সে রং খেয়ে ফেলেন;—যাক্ গে, অনেকে হয়তো জানেনও না সে কথা।"

হাঁস এতক্ষণ এক কোণে দাঁড়িয়ে চুপটি ক'রে কথা শুন্‌ছিল; সে ব'লে উঠ্‌ল, "কিন্তু, যতক্ষণ না মানুষগুলোর শিকারের বাতিক ঘুচাতে পার, ততক্ষণ নকল মাংস থাক্‌লেও তারা শিকার ক'রে মাংস খাবেই। আমাদের যে তা'রা শিকার করে তা' কি এমন কিছু ভাল তাক্ ক'রে গুলি মেরে?—ভিড়ের মধ্যে এলোধাবাড়ি ছর্‌রা মেরে যতগুলোকে পারে মেরে শেষ করে—মরাদের অনেকে আবার জলেই প'ড়ে থাকে; তাদের উদ্ধার কর্‌তেও পারে না। মানুষগুলো লড়াইএর সময়ও নাকি আজকাল ঐ রকম করে। আকাশ থেকে উড়ো-কলে ব'সে বোমা ছেড়ে দিলাম;—জানিও না কা'র দিকে,—এখন যতগুলো লোক মরে!"

একটা বনমানুষ এতক্ষণ গাছে ঝুল্‌ছিল আর কথাবার্ত্তা শুনে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছিল। সে আর থাক্‌তে পার্‌ল না; বলে উঠ্‌ল, "মানুষের কথা আর ব'লো না! অম্‌নিতে যা'রা ন্যাকামি ক'রে 'জীবহত্যা হবে' ব'লে নিরামিষ খায় তারাই আবার যুদ্ধ বাধ্‌লে বন্দুক হা'তে ক'রে মানুষ শিকার করে, কামান মেরে মানুষ শিকার করে, জলে জাহাজ ডুবিয়ে মানুষ শিকার করে, উড়ো-জাহাজ থেকে বোমা ফেলে আর গুলি মেরে মানুষ শিকার করে। তা' ছাড়া, বিষের ধোঁয়া ছেড়ে মানুষ শিকার করে; এমন কি, জিনিষ কেড়ে নেবার জন্যেও ছোরা-ছুরি মেরে মানুষ শিকার করে! ভেবে দেখ, একটা মানুষকেও খাবে না, তবু দলে দলে মানুষকে মেরে রেখে দেবে;—যেমন পিঁপড়েরা জাতভায়েদের সঙ্গে লড়াই ক'রে মরে। তবু, পিঁপড়েদের একটা হাতাহাতি লড়্‌বার দস্তুর আছে, মানুষগুলোর তো তা'ও নাই! এরা পিঁপড়েরও অধম। এরা আবার নিরামিষ খেয়ে তোমাদের বাঁচাবে?—প্‌-ফুঃ!"

মণ্টু বল্‌ল, "সব মানুষ ভবিষ্যতে নিরামিষ খাবে, এমন আশা করা যায় না। তবে, এ কথা শুনেছি যে, ভবিষ্যতে নাকি মুর্গী, হাঁস, ছাগল, ভেড়া এরা সবই

প্রকাণ্ড বড় বড় হবে; কাজেই এদের মাংসের দরকার হ'লে দু' চারটে জন্তু কাট্‌লেই চল্‌বে;—অর্থাৎ, অনেকের প্রাণ বাঁচ্‌বে।"

বনমানুষ বল্‌ল, "তোমারও যেমন কথা! মানুষও কি সঙ্গে সঙ্গে বড় হ'তে থাক্‌বে না? তা' হ'লে, তাদের পেটও বেড়ে যাবে আর ক্ষিদেও বেড়ে গিয়ে 'হরে-দরে হাঁটু জল' হবে।"

মণ্টু এবার আর কিছু বল্‌তে পার্‌ল না। গরু, ছাগল, ভেড়া, এরা সব যেন একটু দ'মে গেল। তখন বনমানুষ ভায়া তা'দের উৎসাহ দেবার জন্য বল্‌ল, "ভয় পেও না তোমরা! মানুষগুলো যদি মাংস খাওয়া নাও ছাড়ে, তবুও তত ভাবনা নেই। লড়াই অর্থাৎ যুদ্ধ যে ভাবে চ'লেছে, এ ভাবে বেশী দিন চল্‌লে মাংস খাবার লোক আপনা থেকেই অনেক ক'মে যাবে। মানুষদের যে রকম নতুন নতুন ব্যামো সব হচ্ছে আর দাঁত যেমনভাবে খারাপ হচ্ছে তা'তে মাংস খাবার লোভও ক'মে যাবে, ক্ষমতাও ক'মে যাবে, ইচ্ছাও ক'মে যাবে। লোক কম্‌ল, লোভ কম্‌ল, খাবার ক্ষমতা কম্‌ল, ইচ্ছাও কম্‌ল—রইল কি তবে?"

সবাই তখন এক সঙ্গে হেসে বল্‌ল, "চলুক না যুদ্ধু; আমাদের তো তা'তে কাঁচকলা ব'য়ে গেল! ওরা যদি আমাদের বাঁচা'তে না চায়, আমরাই বা কেন যুদ্ধু থামাবার জন্যে ব্যস্ত হ'ব?"

মণ্টু মনে মনে বল্‌ল, "তোমাদের কাঁচকলাও ক্ষেমতা নেই যুদ্ধু থামা'বার।" আবার ভাব্‌ল, "ক্ষেমতা থাক্‌লেই কি এরা থামাবার চেষ্টা কর্‌ত?—অন্ততঃ আমি যদি 'এরা' হ'তাম তা' হ'লে তো চেষ্টা কর্‌তাম না;—অবিশ্যি, যদি মানুষরা নিরামিষী হ'য়ে যেত তো সে অন্য কথা।"

সাব্‌মেরিন্ কমান্‌ডার

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শান্ত সুনীল জলরাশি জ্যোৎস্নায় টলটল করছে। আকাশের একটি চাঁদ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়েছে জলের ঝিলিমিলিতে। যত দূর চোখ যায় শুধুই শূন্যতা, কোথাও এতটুকু জীবনের পরশ লাগে নি—শুধু বাতাসের চঞ্চলতা আর ঢেউয়ের উচ্ছলতা।

সহসা জলের বুকে একটি গতিশীল তীরের ফলক ভেসে উঠ্‌ল, বর্ষার ঘন মেঘের কোলে একফালি রূপালী রোদের মত।

—পেরিস্‌কোপের চোঙ্!

কনট্রোল্-রূমে পেরিস্‌কোপের মুখোসটা চোখে লাগিয়ে আয়নার উপর প্রতিফলিত ছায়াটির পানে কমান্‌ডার স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেটুকু দেখা যায়, চাঁদের আলোয় নীল জল পালিশ করা তলোয়ারের মত স্বচ্ছ। চারিপাশে শুধু জল ও আকাশের মিশে-যাওয়া একটা কালো রেখা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সাব্‌মেরিন্ সমভাবেই এগিয়ে চল্‌ল।

এইটাই শত্রুপক্ষের 'লাইনার' যাবার পথ। এই পথেই জাহাজ বোঝাই হয়ে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র আসছে। তাদের রুখতে হ'লে এই পথটাই আগে রোধ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই সাব্‌মেরিন্‌খানি আজ আটচল্লিশ ঘণ্টা এই পথে প্রতীক্ষমান।

দূরে দিগ্বলয়ের কোলে একটি ধূমল মেঘ এবার কমান্‌ডারের নজরে এল। কালো একটা ধোঁয়ার রেখা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হচ্ছে। কমান্‌ডার উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে রইল। তিল তিল করে চোখের সামনে শান্ত সুনিবিড় দিগ্বলয়ের রেখা ভেদ করে ভেসে উঠ্‌ল একখানি জাহাজ। কমান্‌ডারের ধারাল দৃষ্টি এক নজরেই চিনল, পেরিস্‌কোপ্ থেকে মুখ না তুলেই সে বলে উঠল—'ডেষ্ট্রয়ার!'

তার পরেই বাকনলের মধ্যে দিয়ে চালকের কানের পাশে তার আদেশ শোনা গেল—'বিশ ফুট নীচে দিয়ে···বাঁ-দিকে···হাজার গজ'—

জলভারের বেগটা সামলে সাব্‌মেরিন্ বিশ ফুটে এসে থমকে দাঁড়াল, তার পর বাঁ-দিকে একটা মোড় ফিরেই কুল কুল করে ছুটে চল্‌ল ডেষ্ট্রয়ারখানির দিকে।

তিন মিনিট পরে সাবমেরিন্ মোটার বন্ধ করল। কমান্‌ডার আদেশ দিলেন—'জলের সমান্তরালে—'

তার পরেই সামনের বো-টিউব থেকে বাতাসের চাপে টর্পেডো ছিট্‌কে বেরুল—যেন ঝিক্‌মিকে তীব্রবেগী গ্যাসে-ভরা টিনের মাছ জল কেটে ছুটে চল্‌ল তীরের বেগে।

কমান্‌ডার আই-পীসের উপর ঝুঁকে পড়ল, টর্পেডোর বিস্ফোরণটা ভাল ভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য। আর সেই শব্দ শোনার জন্য নাবিকেরা স্তব্ধ হয়ে সেকেণ্ড গুণতে লাগ্‌ল—পাঁচ ·· দশ···পনেরো···

চল্লিশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল।

একটি টর্পেডোর আট শ' গজ যেতে এর চেয়ে বেশী সময় তো লাগে না! তবে?

এই ফাটে, এইবার বুঝি ফাটল—এই কথা ভাবতে ভাবতে আরো বিশ সেকেণ্ড—ত্রিশ সেকেণ্ড,—এক মিনিট—দেড় মিনিট কেটে গেল।

সহসা কমান্‌ডার যেন চমকে উঠল; কন্‌ট্রোল-রূমের মধ্যে তার গলা ধ্বনিত হয়ে উঠল—'নাবো, নাবো, নাবো।'

ব্যালাষ্ট্-ট্যাংকের সব ক'টি ভাল্‌ব্ তৎক্ষণাৎ খুলে দেওয়া হ'ল, কল কল করে জল ভরে উঠল, ইন্‌ডিকেটারে দেখা গেল সাব্‌মেরিন্ নামছে।

—বুম্‌ম্!

এক প্রচণ্ড সংঘাতে সাব্‌মেরিন্‌টি চমকে উঠল। পেরিস্‌কোপটি ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। নিমেষে আলোগুলি সব নিভে গেল, থর থর করে কেঁপে উঠে ডুবো-জাহাজটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখনই হাতে হাতে কয়েকটি টর্চ্চ্-লাইট্ জ্বলে উঠল, পরীক্ষা করে দেখা গেল আলোর ডুমগুলি চূর্ণ হয়ে গেছে, ইনডিকেটার, স্পেরি-জাইরস-কম্পাস্ এবং কনট্রোল-রূমে ছোটখাটো আর যে সব প্রয়োজনীয় যন্ত্র ছিল সব বিগড়েছে, একটি পেরিস্‌কোপের চোঙ্ ভেঙে গেছে। এখনই এ সব না সারালে কাজ চালানো যাবে না। কমান্‌ডার অন্যান্য নাবিকদের সাহায্যে তখনই মেরামতির কাজে লেগে গেলেন।

—বুম্-বুম্-বুম্‌ম্!

ডেষ্ট্রয়ারখানি থেকে অবিরাম ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ এসে ফাটতে লাগল মাথার উপর, জলতরঙ্গের চাপ ধাক্কা মারতে লাগল ডুবো-জাহাজখানিকে।

ডুবো-জাহাজখানি তখন ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামছে। এন্‌জিনের শব্দ হচ্ছিল, কমান্‌ডার আদেশ দিলেন—'এন্‌জিন্ থামাও!'

এন্‌জিন্ থেমে গেল, যথাস্থানে জলের মধ্যে সাবমেরিন্‌টী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ;—উপরের ডেপ্‌থ্‌চার্জ্জে উচ্ছ্বসিত জলের পীড়নে থর থর ক'রে কেঁপে উঠতে লাগল বারে বারে।

বুম্ বুম্ করে আরো কয়েকটি ডেপ্‌থ্‌চার্জ্জ ছুঁড়ে ডেষ্ট্রয়ার থেকে শব্দ-ধারক যন্ত্র নামিয়ে দেওয়া হ'ল জলের মধ্যে এন্‌জিনের শব্দ শুনে সাব্‌মেরিন্‌টীর স্থান নির্দ্দেশ করার জন্ত। কিন্তু জলের মধ্যে কোন শব্দ পাওয়া গেল না, অনর্থক আর শক্তির অপব্যয় না করে ডেষ্ট্রয়ার থেকে ডেপ্‌থ্‌চার্জ্জ বন্ধ করে দিলে।

জলগর্ভে ডুবো-জাহাজখানির মধ্যে এন্‌জিনীয়ার তখন অনেকক্ষণ চেষ্টা করে আলোগুলি জ্বেলেছে।

কমান্‌ডার বল্‌লে—'এবার একটি কম্‌পাস্ ঠিক করে ফেল দেখি—'

এন্‌জিনীয়ার কতক্ষণ চেষ্টা করে হতাশভাবে বল্‌লে—'আশা নেই।'

—'একটাও ঠিক করতে পারবে না?'

—'অসম্ভব।'

কমান্‌ডারের কপালে চিন্তার রেখা পড়লেও নাবিকেরা তবু কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল—আলোটা তবু তো জ্বলেছে! অন্ধকার থেকে মৃত্যুর অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চেয়ে, আলোর মাঝে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে মরা অধিকতর সহনীয়। তবু দেখা যায়, একা মরছি না, আরো অনেক আছে আমার সহযাত্রী, মৃত্যুর অজানা অন্ধকারের পানে সকলে এক সঙ্গে চলেছি।

স্তব্ধ হয়ে সকলে কমান্‌ডারের আদেশের প্রতীক্ষা করতে থাকে। বদ্ধ বাতাস এতক্ষণে সবাই স্পষ্ট অনুভব কর্‌তে পারে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। এয়ার-পিউরিফায়ারের বায়ু সংশোধন-শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে বলে মনে হয়। অত্যধিক কার্য্যকরিতার জন্য ব্যাটারী উত্তপ্ত হয়ে উঠে কন্‌ট্রোল-রুমের বাতাসকে আরো যেন দুঃসহ করে তুলছে! প্রশ্বাস টানতে বোঝা যায় কোথায় যেন কিসের অভাব পড়ছে। কলের মাঝে ইঁদুর যেমন ছট্‌ফট্ করতে থাকে তাদের ফুসফুসটা যেন ক্রমশঃ সেই অবস্থায় এসে পৌঁছচ্ছে।

তথাপি নাবিকদের মুখে এতটুকু বৈলক্ষণ্যের ছায়া পড়ে নি;—ডুবো-জাহাজী জীবনে এ দৈনিক অতি সাধারণ ঘটনা। তার উপর আছে আদর্শের কথা,—শত্রু জয় করলে জাতি বাঁচবে।

এক এক করে মিনিটগুলি কাটতে থাকে। কারুরই কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। মাঝে মাঝে কমান্‌ডারের ছোটখাটো দু' একটি আদেশ...

ব্যস্ত নাবিকদের দ্রুত পদক্ষেপ...

রেন্‌জ্ ও প্লায়ার্সের স্বল্প শব্দ...

হাতুড়ির ঠুং ঠাং...

দিগ্বিজয়ী মানুষ ডুবো-জাহাজের দশ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্ম্ম পরে দুর্য্যোধনের জলস্তম্ভ ব্যূহ করে জলের মধ্যে শত্রুকে প্রতিহত করার অপেক্ষা করছে, রাক্ষসের প্রাণ-সন্ধানী রূপকথার রাজপুত্রের মত।

কতক্ষণ পরে কমান্‌ডার আদেশ দেন—'ওপরে ওঠ।'

ডেষ্ট্রয়ারখানি শান্তভাবে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল, সুযোগের প্রতীক্ষায়। দ্বিতীয় পেরিস্‌কোপটি জলের উপর মাথা তোলা মাত্রই 'ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ' নিক্ষিপ্ত হ'ল—বুম্‌ম্!

এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সেই সংঘাতে দ্বিতীয় পেরিস্‌কোপটি কোথায় উবে গেল। কনিং-টাওয়ার তুব্‌ড়ে হুড় হুড় করে ভিতরে জল এসে ঢুকল। এয়ারটাইট্ ছাদে কোথায় যেন ফুটো হয়ে কন্‌ট্রোল্-রুমে ঝিরঝির করে নাবিকদের মাথায় জল পড়তে লাগল। আলো নিভে গেল। কলকব্জা সামান্য যেটুকু সারানো হয়েছিল সব বিকল হয়ে গেল।

বুম্‌ম্!

আবার আর এক ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ।

কনিং টাওয়ার আরও তুবড়ে গেল, তার একটা অংশ দুমড়ে একেবারে ভেঙে পড়ল কমান্‌ডারের মাথার উপর। সে আঘাতে ছিটকে পড়ে তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির হয়ে গেলেন। কন্‌ট্রোল-রুমের ছাদ থেকে এতক্ষণ ঝিরঝির করে জল পড়ছিল, এবার ঝর্ঝর করে পড়তে লাগল।

বাকনলে শোনা গেল—'হাইড্রো বিগড়েছে!'

—'এয়ার পিউরিফায়ার অচল!'

—'ইনডিকেটারে কোথায় যেন গোলযোগ বেধেছে!'

—'লাইট্ ছাড়া বেশীক্ষণ কাজ চালানো যাবে না!'

কিন্তু উপর থেকে কমান্‌ডারের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ব্যাপার কি?

এন্‌জিনীয়ার টর্চ্চ-লাইটটী হাতে নিয়ে সরু লোহার সিঁড়িটী বেয়ে উপরে উঠল। ওয়াটার-টাইট দরজা খুলে কনিং-টাওয়ারের ভিতরে ঢুকতেই একটা জলের ঝাপটা তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিলে, কিছুই সে ঠাহর করতে পারলে না। তার পর ডাকলে—'কমান্‌ডার, কমান্‌ডার!'

কোন সাড়া নেই।

এন্‌জিনীয়ার অন্ধকারে হাতড়াতে সুরু করলে। কনিং-টাওয়ারের পরিসর কম। তারই মাঝে জলের ঝাপটায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু এদিক্-ওদিক্ করতেই পায়ে কি যেন ঠেকল, তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে কমান্‌ডারের দেহটি তুলে নিয়ে জল-রোধক দরজা খুলে তর তর

করে সে নীচে নেমে এল। নামতে নামতে সিঁড়ির উপর থেকেই সে উচ্চ স্বরে বলে উঠল—'আমাদের কমান্‌ডার সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন—অচেতন—'

—'কার আদেশে আমরা এখন চলব? কে আমাদের এখন চালাবে?'—সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন উঠল। যে বিপদ্‌টা তারা এতক্ষণ বোঝে নি, বুঝতে চায় নি, কমান্‌ডারের অভাবে সেইটাই এখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ওদিক্ থেকে কে একজন বলে উঠল, 'এন্‌জিনীয়ারই আমাদের সেকেণ্ড-অফিসার, তিনিই এখন আমাদের চালাবেন—'

—'আমি?'—এন্‌জিনীয়ার বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি।'—এবার অনেকের গলা শোনা গেল।

—'কিন্তু আমি যে একজন বিদেশী ভারতীয়!'

—'সেজন্য কিছু যায় আসে না, সাবমেরিন্ পরিচালনা তুমি আমাদের চেয়ে বেশী বোঝ, সেই জন্যই এখনকার এই দুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে আমরা তোমাকেই আমাদের কমান্‌ডার নির্ব্বাচিত করলাম।'

—'আমাকে?'

—'হ্যাঁ, তোমাকে—'

এই কথার পর ভারতীয় এন্‌জিনীয়ার আর কিছুই বলতে পারে না, সহকর্ম্মীদের নির্ব্বাচন মাথা পেতে নিতে হয়। এক সাব্‌মেরিনে নায়কত্ব করা যে-কোন ভারতীয়ের পক্ষে অভাবিত গৌরবের কথা,—তার উপর এ আবার বিদেশীর সাবমেরিন্। সে গর্ব্ব বোধ করলে। তা গর্ব্ব হবারই কথা। অতি সাধারণ একজন এন্‌জিনীয়ার হয়ে স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লিখিয়ে যখন সে স্পেনে আসে তখন সে কল্পনাও করে নি যে তার মত পরাধীন দেশের এক যুবকের উপর কোন দিন কোন স্প্যানিশ সাব্‌মেরিন্ পরিচালনার ভার পড়বে। সামান্য দু'-একটা লড়াই করবে—ওই পর্য্যন্তই। কিন্তু যা ভাবা যায় না তাই সত্য হয়ে অনেক সময় মানুষের জীবনে রূপ গ্রহণ করে। তার জীবনেও আজ তাই যখন ঘটল তখন দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।

—'হাইড্রো বিগ্‌ড়েছে!...'

—'এয়ার পিউরিফায়ার অচল!...'

—'ইনডিকেটারে গোলযোগ বেধেছে!...'

—'লাইট্ না হ'লে কিছু করা যাচ্ছে না!...'

পর পর দুর্ঘটনার পরিচয় আবার একে একে পুনরাবৃত্তি করে।

'অল রাইট্।' বলে তাড়াতাড়ি নেমে এসে কমান্‌ডারের অচেতন দেহটি একটি বিছানার উপর নামিয়ে রেখে এন্‌জিনীয়ার জোর গলায় প্রশ্ন করলে—'আমাদের মধ্যে কেউ মরতে ভয় পাও?'

—'না না।'—অন্ধকারে সমস্বরে উত্তর এল।

—'এখন আমাদের যা অবস্থা, এ অবস্থায় সাব্‌মেরিন্ আর সারানো যাবে না। এখন হয় এইভাবে ভীরুর মত জলে ডুবে মরতে হবে, না হয় উপরে উঠে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরের মত লড়তে হবে—তোমরা কি চাও?'

—'বীরের মত লড়তে।'

—'আদর্শের সম্মান রাখার জন্য প্রত্যেকে প্রাণ দিতে পারবে?'

—'নিশ্চয়!'

—'অল রাইট্।' এন্‌জিনীয়ার আদেশ করলে—'সারফেস্ ষ্টেশন—উপরে ওঠ।'

সাব্‌মেরিন্ উপরে উঠতে সুরু করে। ছরছর করে জল এসে গায় লাগে। আনন্দে ও গর্ব্বে এন্‌জিনীয়ারের বুক দুর্‌দুর্ করতে থাকে। বাবর, শেরশাহ, প্রতাপ ও শিবাজীর দুরন্ত অভিযানের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নেল্‌সনের সঙ্গে সে নিজের তুলনা করে দেখে। আজ সে সত্যই এমন কিছু করতে যাচ্ছে যা দেখে জগৎ যেন ভারতবাসীকে চিনবে, ভারতকে শ্রদ্ধা করবে। আজ সমগ্র ভারতের সম্মান ওতপ্রোতভাবে তার সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেছে!

সহসা নীল জলরাশি ঠেলে কালো দৈত্যের মত ডুবো-জাহাজখানি মাথা তোলে,—তার কালো দেহের ধাক্কা লেগে দু' পাশে পিছলে পড়ে জ্যোৎস্না-প্লাবিত জল।

তর তর করে সিঁড়ি-বেয়ে কন্‌ট্রোল-রুমের ঢাক্‌না খুলে এন্‌জিনীয়ার কনিং টাওয়ারের ডেকের উপর এসে দাঁড়ায়;—হাতে একখানি শাদা রুমাল নিয়ে নাড়তে থাকে।

ডেষ্ট্রয়ারখানি কাছেই ছিল, তার ক্যাপ্‌টেন দেখতে পায়, মৃদু হেসে কি যেন আদেশ দেয়,—হেলে দুলে ডেষ্ট্রয়ারখানি সাব্‌মেরিন্‌টির কাছে এগিয়ে আসে জয়ের উৎসাহে। এন্‌জিনীয়ারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে, তার পর হাতের রুমালখানি ছেড়ে দেয়। বাতাসের ঝাপ্‌টায় রুমালখানি উড়ে গিয়ে পড়ে সাগরের জলে।

কাউকে কোন কথা বলতে হয় না। এই সামান্য সঙ্কেতটুকুর জন্যই ভিতরে নাবিকগুলি অপেক্ষা করছিল, তৎক্ষণাৎ ওয়াটার-টাইট্ পোর্টহোলের মুখ খুলে গেল,—গুম্ গুম্ করে দু'টি তিন ইঞ্চি কামান গর্জ্জে উঠল।

গোলা দু'টি ডেষ্ট্রয়ারের উপর গিয়ে পড়ল; একটা ধূম-নির্গামী চিম্‌নী এবং মার্কনি ডেকের

খানিকটা চকিতে ছিটকে গিয়ে পড়ল আকাশের গায়। নাবিকেরা রেলিং ধরে বাইরে ঝুঁকে পড়েছিল, চমকে উঠল। ক্যাপ্‌টেন্ আদেশ দিলে—'চার্জ্জ!'

ডেষ্ট্রয়ারের গোলন্দাজ কামান দাগ্‌ল।

সাব্‌মেরিন্ তার প্রত্যুত্তর দিলে। তবে এবার আর শুধু কামানই নয়, দু'টি টর্পেডো এসে লাগ্‌ল ডেষ্ট্রয়ারের গায়। একটিও কিন্তু ফাট্‌ল না। মাইন-রক্ষক তারের জাল ডেষ্ট্রয়ারের চারিপাশ ঘিরে ছিল, তাতে বেধে গেল। সাব্‌মেরিনের নাবিকেরা কিন্তু সেজন্য এতটুকু নিরুৎসাহ হ'ল না,—তাদের কামান দু'টি সমানে গোলা উদ্গীরণ করে চল্‌ল—বুম বুম্ বুম্‌ম্!

কতক্ষণ বুম বুম্ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। দিগন্ত-বিস্তারী নীলিমার মাঝে শুধু কামান-গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি আর গতিশীল অগ্নিগোলকের বিপরীতমুখী অভিযান!

সাব্‌মেরিন্ কোন দিনই জলের উপর ভাল করে লড়াই করার জন্য তৈরী হয় না। সাব্‌মেরিনের যত নৈপুণ্য জলের নীচে। তার উপর একখানি আহত সাবমেরিনের পক্ষে দু'টি কামান নিয়ে দশ বারোটি কামানের বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ লড়াই চালানও চলে না, বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে ভেঙে-চুরে সাব্‌মেরিন্‌টি জলে জলময় হয়ে উঠল।

একটা স্রাপ্‌নেলের টুকরো এসে এন্‌জিনীয়ারকে আহত করে কোন এক সময় ঠিকরে জলে ফেলে দিয়েছে, গোলযোগের মধ্যে তখন কেউ তা লক্ষ্য করে নি।

মজ্জমান ডুবো-জাহাজটী অগ্নিময় হয়ে উঠল। ডেষ্ট্রয়ার থেকে কামান দাগা বন্ধ হ'ল। একপাশে হেলে পড়ে সাব্‌মেরিন্‌টি ধীরে ধীরে জলে ডুবে গেল, কিন্তু তার মধ্যে থেকে একজন নাবিকও জলে লাফিয়ে পড়ল না। ডেষ্ট্রয়ারের ক্যাপটেন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, চোখে শ্রদ্ধার আভাস জাগল, মাথার টুপি খুলে ফেল্‌লে ডুবন্ত সাব্‌মেরিনের মৃত্যু-যাত্রীদের উদ্দেশ্যে। তার দেখা-দেখি ডেষ্ট্রয়ারের অন্যান্য নাবিকেরাও মাথা থেকে টুপি খুলে ফেল্‌লে। এই একটু আগে যাদের বুকের উপর কামান দাগা হয়েছিল, মৃত্যুর পর তাদের শৌর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার এই উৎকট আগ্রহ দেখে যেন ডুবন্ত সাব্‌মেরিন্‌টির স্থানে খানিকটা তেল আর খানিকটা বুদ্‌বুদ্ ভেসে উঠল। তাদের ফুট্ ফুট্ করে ফেটে যাওয়া দেখে মনে হয় মানুষের স্বভাবের এই অপরূপ নমুনা দেখে জলরাশি যেন উপহাস ভরে হাসছে, সেই হাসি ফুটে উঠেছে ভাসমান তেলের রামধনু রঙে।

কোন এক সময়ে ক্যাপ্‌টেনের নজরে পড়ল কালো জলের বুকে কি যেন একটা ভাসছে! তখনই লাইফ বোট্ জলে নামানো হ'ল। নাবিকেরা কাছে গিয়ে দেখলে—সাব্‌মেরিনের একজন নাবিক। জল থেকে তাকে তারা টেনে তুললে। বেচারীর একখানা পা একেবারে উড়ে গেছে, রক্তের অপচয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তবে তখনও ধুক্ ধুক্ করে নাড়ী চলছে।

ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধার উপক্রম করছে এমন সময় নাবিক চোখ চাইলে, শ্রান্তস্বরে বল্‌লে—'আমায় শান্তিতে মরতে দাও—'

স্প্যানিয়ার্ডরা বাংলা কথা বুঝল না, ফরাসী ভাষায় ক্যাপ্‌টেন জিজ্ঞেস করল—'তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলছ?'

এবার নাবিক ফরাসী ভাষাতেই বল্‌লে—'আমি বাঙালী,—ভারতীয়, কমারেদ্ ইনদিয়ানো সাব্‌মেরিন্-কমান্‌ডার।'

—'ভারতীয় কমান্‌ডার।'—সকলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

—'হ্যাঁ, আমি ভারতীয়। ভারতীয়রা ভীরু নয়'—বলে এন্‌জিনীয়ার চোখ মুদ্‌ল, মুখে ফুটে উঠল মৃদু গর্ব্বিত হাসি।

ক্যাপ্‌টেন্ জিজ্ঞেস করলে—'তোমরা ডুবো-জাহাজে কত জন ছিলে?'

—'ক'জনকে তোমরা উদ্ধার করেছ?'

—'একজনকেও দেখতে পাই নি!'

—'প্রাণের চেয়ে তারা আদর্শকে বেশী ভালবাসে',—ম্লান হাসি হেসে এন্‌জিনীয়ার চোখ বুঁজল, বল্‌লে—'আমাকেও শান্তিতে তাদের অনুসরণ করতে দাও।'

ক্যাপ্‌টেন্ বল্‌লে—'ব্যাণ্ডেজ বাঁধ।'

ডাক্তার হতাশভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লে—'প্রয়োজন নেই।'

এন্‌জিনীয়ারের পা চুইয়ে চুইয়ে খানিকটা রক্ত ষ্ট্রেচারের ক্যান্‌ভাসের উপর জমে কালো হয়ে উঠল। একটা সহাস্যভাব ফুটে উঠল তার মুখে।

পূর্ব্ব আকাশ থেকে তখন উষার অরুণালোক সমগ্র জলরাশিকে রক্তাক্ত করে তুলছে।

শীত ও শীতের শেষে ইউরোপ

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

শীতের ইউরোপ। সাদায় সাদায় ভরে গিয়েছে মাটি, জল ও পাহাড়। ঝির ঝির করে বরফ পড়ে চলেছে অবিরাম। কোন কোন গাছে তখনও পাতা ধরে আছে, তাতে ঝুলছে যেন বরফের ফল! আর নেড়া-নেড়া গাছগুলির পায়ের আনাচে-কানাচেয় লেগে রয়েছে বরফের গুঁড়ো। দেখে মনে হয় যেন কোন নিপুণ

শিল্পী সাদা রংএর তূলি দিয়ে গাছের উপর এঁকে রেখেছে বে-খেয়ালী সব ছবি! ধূসর বর্ণের গাছের ডালের উপর সাদা-সাদা সব চিত্র রংএ রংএ মানিয়েছে অপূর্ব্ব!

এমনি সময়ে পাখীরা ডাকে কম। দু' চারটে পাখীকে দেখা যায় বরফের গুঁড়ো মেখে এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে গিয়ে বসছে—কিন্তু সে ওড়া যেন প্রাণহীন, আড়ষ্ট। ইউরোপের ছেলেমেয়েদের সব চাইতে আনন্দ দেখা যায় এমনি সময়ে পাহাড়ের উপর। দলে দলে ছেলেমেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে নীচুতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পায়ের সঙ্গে 'স্কি'-এর সরঞ্জাম বেঁধে নিয়ে, দুর্দ্দান্ত গতিতে ছুটে চলেছে এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায়। এতে ওদের ভয় তো দূরের কথা, আনন্দ দেখে কে? ওরা প্রতি বছর বহুদিন থেকে অপেক্ষা করে থাকে এই প্রচণ্ড শীতের জন্য। শনিবারের বিকেলে দেখা যায় বড় বড় ষ্টেশনে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর কি ভীড়! সব চলেছে 'স্কি'-এর সরঞ্জাম নিয়ে, আর পিঠে কাপড়ের ব্যাগে খাবার নিয়ে। শনিবারের রাতটা কোন হোটেলে কাটিয়ে রবিবার ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'স্কি' করার উৎসবে মাতোয়ারা হ'য়ে থাকবে। যারা একেবারে ছেলে-মানুষ তাদের বাপ-মায়েরা সহরের বাইরে যেতে দেয় না। তারা সহরের ভিতরেই বরফের পার্ক্‌গুলিতে অথবা জলশূন্য, বরফে-ঢাকা সিমেণ্টের রাস্তাতেই স্কেট্ করে।

কোন কোন গ্রামে দেখেছি বড় বড় পুষ্করিণী জমে গেছে, তার উপরে চলেছে স্কেট্ করা। লোক হয় সেখানে বহু,—শুধু কিশোর-কিশোরী নয়, অনেক প্রৌঢ় বয়স্ক লোকও মহানন্দে তার উপরে স্কেট্ করছে। যারা নতুন শিখছে তারা হরদম পড়ছে। আবার উঠ্‌ছে,—আবার স্কেট্ করছে।

এমনি একদিনে ইংলণ্ডে এক গ্রামে গিয়ে দেখি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিগন্তবিস্তৃত উঁচুনীচু শুভ্র ভূমি। এক সময়ে সেখানে ছিল সবুজ শস্যক্ষেত্র, কিন্তু আজ তার লেশমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না। সব ছেয়ে গেছে বরফের শ্বেত বর্ণে! এখানে সেখানে উঁচু উঁচু গাছ শীতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চল। সেইখানে আগে একটা পুকুর ছিল, এখন বরফ জমে গিয়েছে। সেই জমাট পুকুরের উপর মাতামাতি করছে ছেলেমেয়ের দল।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গিয়ে দেখি সেখানে আর এক নতুন ধরণের সৌন্দর্য্য। সেখানে সমতলভূমি কম। আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি সব যেন শাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। সেই কাপড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে সবুজে শাদায় মেশানো গাছের সারি। পাহাড়ের কোন জনশূন্য স্থানে দাঁড়ালে মন বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে। নির্জ্জনতা যে এত সুন্দর, স্তব্ধতা যে এত মধুর এটা প্রথম এমনি এক স্থানে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম।

সুইডেনের উত্তরে শুনেছি দুই-তিন হাজার হরিণ ও কয়েকটা কুকুর সঙ্গে নিয়ে এক শ্রেণীর ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডবাসী এমনি সব জনশূন্য পাহাড়ের কোলে ভ্রমণে বেরোয়। লোকালয় থেকে অনেক দূরে গেলে দেখতে পাওয়া যায় দলে দলে সাদা ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

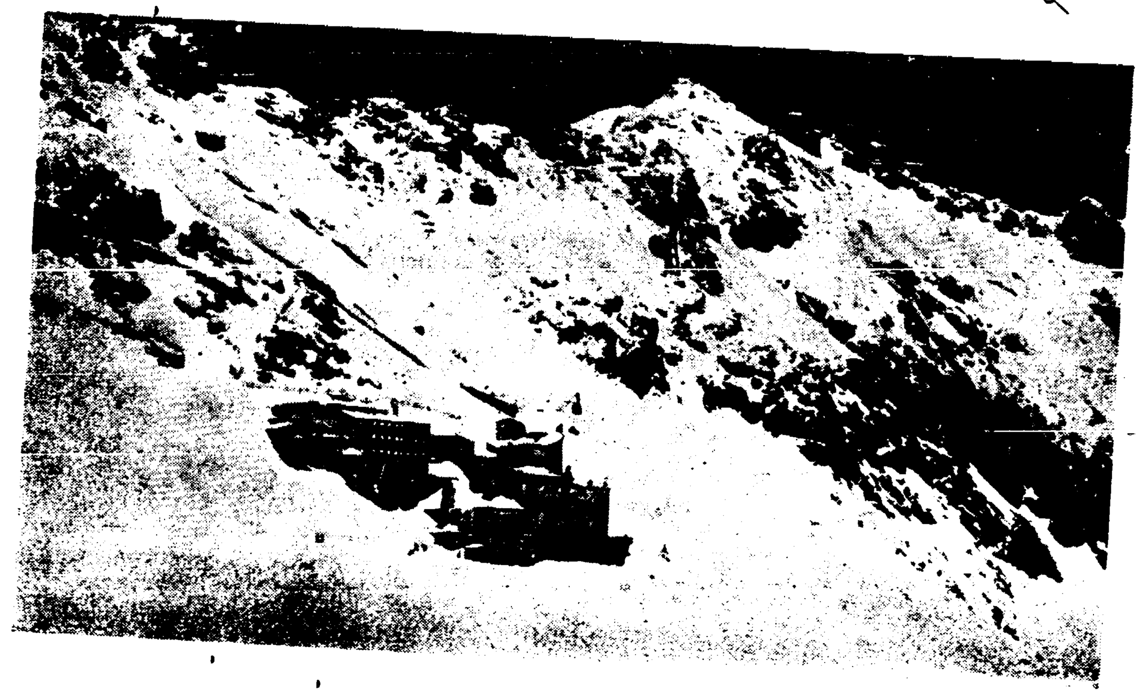

জার্ম্মেনীর গিরিশিখর জুগস্পিৎসে

ইউরোপে যে 'স্কেট্' বা 'স্কি' করে না সে স্মার্ট্ই নয়। এই খেলা তাদের শরীরে দেয় শক্তি, মনে দেয় আনন্দ।

আমাকে অনেক ছোট ছেলে জিজ্ঞাসা করেছে, শীতকালে কল্‌কাতায় বরফ পড়ে কিনা! যখন শুনল—'না', হাঁ করে চোখ বড় বড় করে বল্‌লে, 'আপনারা স্কি না করে থাকেন কি করে? এমন একটা আনন্দ থেকে আপনারা বঞ্চিত?' যে ভাল স্কেট বা স্কি করে তার নাম কত!

অলিম্পিয়ার প্রতিযোগিতায় স্কি করা একটা বিশেষ খেলা বলে পরিগণিত হয়। উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে শীত পড়ে বেশী ও তাই তাদের দেশ থেকে প্রায় প্রতি বছরেই 'স্কি' প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। ফিন্‌ল্যাণ্ড এদের মধ্যে

সব চাইতে বেশী পারদর্শী বলে বিখ্যাত। আজকাল খুব ভাল স্কি যারা করে আমেরিকার ফিল্ম কোম্পানী মহা সমাদরে তাদের ফিল্মে নামবার জন্য আমন্ত্রণ করে। সম্প্রতি নরওয়ের অভিনেত্রী সোনিয়া হেনী (Sonia Henie) ফিল্মে স্কি করে জগৎ-বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।

যাদের হকি খেলার সখ তারা আবার বরফের ওপর হকি খেলা (আইস্ হকি) নিয়ে বিভোর হয়ে যায়। আজকাল ইউরোপের সব বড় বড় সহরেই বহু টাকা খরচ করে 'আইস্ হকি'র ষ্টেডিয়াম্ তৈরী করা হচ্ছে। তার উপর স্কেটিংও চলে, 'আইস্ হকি' খেলাও চলে।

মিউনিক থেকে কিছু দূরে জুগস্পিৎসে নামে আল্প্সের এক শিখরে ট্রেনে করে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন ভারতীয় মিলে। পাহাড়ের উপরে উঠে মনে হ'ল আমরা যেন এক শ্বেতরাজ্যে এসেছি। যে দিকে তাকাই সবই শাদা দেখি, মনে হ'ল এ রাজ্যে অপর কোন রঙের স্থান একান্ত অপরিসর। শাদা ভিন্ন যে অন্য কোন রংয়ের মাটি বা গাছপালা থাক্‌তে পারে তা যেন আমরা ভুলেই গেলাম! সেই শ্বেতভূমির উপর তৈরী করা হয়েছে এক কাঠের বাড়ী। সে বাড়ীতে বাইরের লোকজনদের থাক্‌তে দেওয়া হয় না। বাড়ী পাহারা দেবার জন্য কয়েকজন চৌকীদার সেখানে থাকে মাত্র। ভিতরে একটা রেস্তোরাঁ আছে। রেস্তোরাঁর ঘরটী ছোট কিন্তু তাতে গাদা করে লোক ব'সে আছে। ঘরের এক পাশে একটী মেয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। আর 'স্কি' করার পোষাক পরে তরুণ-তরুণীর দল সঙ্গে সঙ্গে তাল দিচ্ছিল ও সুর ধরেছিল। ইউরোপের লোকেরা সাধারণতঃ আস্তে আস্তে কথা বলে, কিন্তু সেখানে লোকগুলি এমন চেঁচিয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল যে আমাদের সত্যই আশ্চর্য্য বোধ হ'লে লাগল। পরে দেখলাম জার্ম্মান্‌রা আমোদ-প্রমোদের স্থানে সাধারণতঃ ঐ ভাবে চেঁচিয়ে কথা বলে ও আমোদ-উৎসব করে। কিছুক্ষণ পরে যখন বাইরে এলাম, দেখি কুয়াসায় চারিদিক্ ভরে গেছে; এমন কি এক ফুট দূরে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখলুম কতকগুলি লোক পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামতে লাগল। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম। খানিক দূরে গিয়ে দেখি আমরা একটা

অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির সামনে এসে পড়েছি। আমরা সেখান থেকে কোন্ দিকে যাব ঠিক করছি হঠাৎ দেখি আমাদের দু'পাশ দিয়ে জনকতক লোক বিদ্যুৎ-বেগে 'স্কি' করে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে এল। তাদের চোখে মুখে একটা তীব্র উত্তেজনার রেশ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমনি করে নেমে এসেছিল ঠিক তেমনি করে তারা ছুটে চলে গেল। যত দূর দৃষ্টি গেল আমরা হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। তার পর তারা দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি না কি মনোরম শ্বেতোদ্যানের মোহে তারা ঐ ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করে অদৃশ্যে মিশে গেল! চেয়ে দেখি যাদের সঙ্গে নেমে এসেছিলাম তারাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও আমরা খানিক এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ালাম। শীতে আমাদের কান দু'টো ও নাকটা জ্বালা করতে লাগল। সুতরাং বেশীক্ষণ সেখানে আমাদের থাকা হ'ল না।

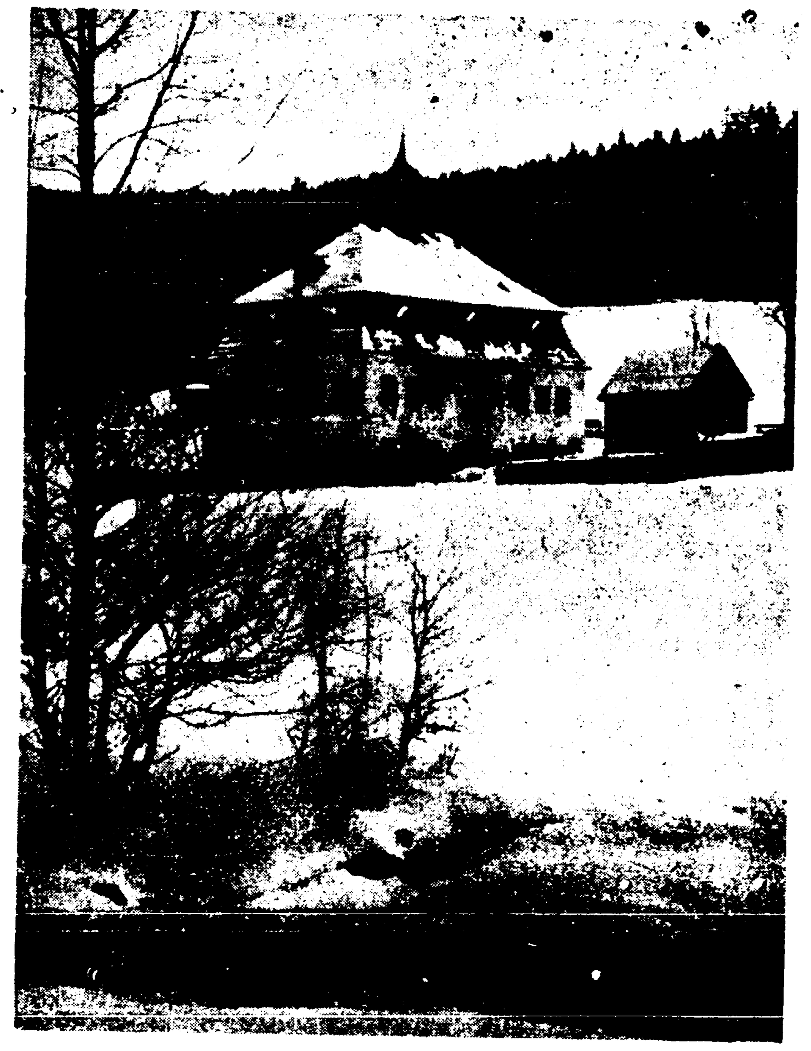

মাঠ-ঘাট বরফে ঢেকে গেছে।

শীত চলে গেলে প্রকৃতির রূপ যায় বদলে। তখন ন্যাড়া ন্যাড়া গাছগুলিতে ছোট ছোট সবুজ পাতা ধরেছে। মাটী তখনও একটু ভিজে। প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় সদ্য একটা বড় ঝড় তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তাই এখন সে স্তব্ধ, নির্জীব, অথচ মধুর। শীতে গাছপালাগুলি যেন কাঁদতে থাকে। এত শীত, বরফের চাপ, তারা যেন সহ্য করতে পারে না। অথচ এ ছাড়া তো উপায় নেই, নীরবে সহ্য করতেই হয়। তাই এ শীত চলে গেলে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠে। এক হংসরাজ কবি লিখেছেন, "মেয়েদের কান্নার পরে তাদের বড়

সুন্দর দেখায়।” এ যেন ঠিক তাই। বহু কষ্টের পর প্রকৃতির নিজ রূপ আবার ফিরে এসেছে। তাই ছুটে চলেছে তার উদ্দেশ্যে দলে দলে লোক—বনে বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনের গায়ে গায়ে লাগান হ্রদগুলিতে, ছোট ছোট নদীতে। তারা বলছে প্রকৃতির এ রূপ কত দিন যে দেখি নাই!

সহরের বাইরে এক মাঠে গিয়ে দেখি সবুজের মেলা বসেছে। চারিদিকে খালি সবুজ আর সবুজ। উঁচু-নীচু প্রান্তরে কচি কচি সবুজ কলাই, যব প্রভৃতির চারাগুলি নাচ্‌ছে হেলে-দুলে মৃদুমন্দ বাতাসের কোমল আঘাতে।

উপরে আকাশ প্রায়ই থাকে পরিষ্কার। ইংলণ্ডের আবহাওয়া থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের আবাওয়া একটু ভিন্ন রকমের। বিশেষ করে এক বিষয়ে এটা প্রকৃষ্টভাবে দেখা যায়। জলে ঘেরা ইংলণ্ডের প্রকৃতি ঘন ঘন তার মত বদলায়। এই রৌদ্র, কোথা থেকে হঠাৎ মেঘ এসে পড়ল। তার পর হয়তো ঝুপ ঝুপ ক’রে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে গেল, আবার তখনই হয়তো আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, নীল আকাশে রৌদ্রের খেলা সুরু হয়ে গেল। ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতির প্রকৃতিকে এদিক্ দিয়ে বরং বিশ্বাস করা যায়।

ভেড়াকান্ত

মবিনউদ্-দীন আহমদ্

আমরা তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি। নতুন একটি ছেলে আসিয়া ক্লাসে ভর্ত্তি হইল, নাম আজ্জিজ। হাবা-হাবা চেহারা; বয়সের অনুপাতে শরীরটা একটু বেশী মোটা। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। কথা বলে খুব কম, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উদাস উদাস। মনে হয় অত্যন্ত দূরে কিছুর দিকে সে চাহিয়া আছে—কাছের জিনিষ তাই নজরেই আসিতেছে না।

মাস খানেক পরে শুনিলাম মাছুম আর সুশীল তাহার নতুন নামকরণ করিয়াছে—“ভেড়াকান্ত”। নাম সুশীল আর মাছুম হইলে কি হইবে, দুষ্টামিতে এ দু’টি ছেলের যোড়া

সারা ইস্কুলে ছিল না। ভাল মানুষ আজ্জিজকে ভাজাইয়া উহারা সারা ক্লাসে হাসির খোরাক যোগাইতে সুরু করিল। আমরাও যে মাঝে মাঝে তাহার মধ্যে যোগ দিতাম না এমন নয়। সত্যিই তো, হাবাগোবা মানুষকে ক্ষেপাইবার মত মজা আর কিসে?

ঢাকা ছোট সহর; তবুও বাঙলা দেশে কলিকাতার পরেই ঢাকার স্থান। গাড়ী-ঘোড়া, মোটর-বাস, ধুলি-ধোঁয়া সমস্ত মিলিয়া কেমন যেন একটা অস্বস্তি সর্ব্বদাই মনের উপর চাপিয়া থাকে। এখানে আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠে কিন্তু মনে তেমন আনন্দ দেয় না। মুখ তার রোগীর মুখের মত ফ্যাকাশে। ঘোলাটে মলিন জ্যোৎস্না কাহারো চোখেই পড়ে না। অন্ধকারেরও এখানে কোন রূপ নাই।

তার উপর আবার সহরের আবহাওয়া কিছুদিন যাবৎ কেমন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। একটা না একটা ডাকাতি প্রায়ই লাগিয়া আছে। আজ অমুক আফিসে ডাকাতি হইয়া গেল, কাল অমুক জমিদারের বাড়ী লুট হইল—ইত্যাদি খবর প্রায় প্রত্যহই কানে আসিতেছে। যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহারা সর্ব্বদাই তটস্থ।

গ্রীষ্মের বন্ধের আর বেশীদিন বাকি নাই। ছুটীর মুখে ক্লাসে বসিয়া দেশের আম-বাগানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দপ্তরী আসিয়া কহিল, ‘সঞ্জয় বাবু, সুশীল বাবু, মাছুম সাহেব, আজ্জিজ সাহেব, হেড্ মাষ্টার মশাই আপনাদের ডেকেছেন।’

আমরা তাঁহার খাস-কামরায় আসিলে তিনি কহিলেন, ‘দেখ, স্কুলের অনেকগুলি টাকা আজ ব্যাঙ্কে পাঠাব। সহরের আবহাওয়া যা খারাপ, শুধু দরওয়ানকে দিয়ে অতগুলি টাকা পাঠাতে ভরসা পাচ্ছি না। তোমরা যে ক’জন এখনও বাড়ী যাও নি একবার ওর সঙ্গে যাবে। বেশী লোক থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়।’

হেড্ মাষ্টার মহাশয় যেন না শুনিতে পান এমনি চুপি চুপি মাছুম কহিল, ‘ভেড়াকান্ত আবার গিয়ে কি করবে! শেষটায় রণে ক্ষান্ত দিলে আমাদেব প্রাণ তো যাবেই, দরওয়ানকেও সান্ত্বনা দেবার কেউ থাকবে না।’ বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিল।

পল্টন মাঠের গা ঘেঁষিয়া যে পথটি সোজা জন্‌সন্ রোডে গিয়া মিশিয়াছে, সেই রাস্তা বাহিয়া আমাদের ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিয়াছে।

পিছনের সিটে টাকার থলি হাতে মাঝখানে দরওয়ান; তার এক দিকে আমি, অন্য দিকে আজ্জিজ। ড্রাইভারের সঙ্গে বসিয়াছে মাছুম আর সুশীল।

কিছু দূরে দেখিলাম গাছের ছায়ায় একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরা সেটাকে পিছনে ফেলিয়া দশ গজ গিয়াছি কি না গিয়াছি, হঠাৎ পিছন হইতে পর পর দুইটি পিস্তলের

শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্যাক্সির পিছনের টায়ার দুইটি ফাটিয়া ট্যাক্সি অচল হইয়া গেল।

তিন-চার জন ভীষণাকৃতি লোক ছুটিয়া আসিয়া পিস্তল দেখাইয়া কহিল, 'চ্যাচালেই গুলি করব। ভালয় ভালয় টাকার থলিটা ছেড়ে দাও।'

ড্রাইভার মোটর পরিত্যাগ করিয়া সোজা দৌড় দিল; মাছুম আর সুশীল গোঁ গোঁ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। দরওয়ান ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যেমন টাকার থলিটি তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতে যাইবে—হঠাৎ আজিজ লোকগুলির উপর লাফাইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে তিন চারিটি পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল; আমি সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেলাম।

জ্ঞান ফিরিলে দেখিলাম, মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে শুইয়া আছি। চারিদিকে স্কুলের মাষ্টার, পুলিশের লোক এবং ডাক্তারেরা ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজিজ? আজিজ কেমন আছ স্যর? আর আমাদের স্কুলের টাকাগুলি ডাকাতেরা নিয়ে গেছে?'

সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'না, টাকা নিতে পারে নি, তবে আজিজকে নিয়ে গেছে। দু'জন ডাকাত ধরা পড়েছে, বাকি সকলে পালিয়েছে। কিন্তু আজিজকেও জীবন্ত রেখে যায় নি। সে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু স্কুলের টাকা দেয় নি।'

* * * *

স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ আজিজের বীরত্বের যতটুকু সাধ্য মর্য্যাদা দিয়াছেন। স্কুলের ফটকে ঢুকিতেই ডানদিকে তাহার মর্ম্মর-মূর্ত্তি—সেই হাবাগোবা, নাদুস-নুদুস চেহারা। কিন্তু এখন আর তাকে দেখিলে ভেড়াকান্ত বলিয়া মনে হয় না—তার চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টির ভিতর হইতে যেন এক অপার্থিব মহিমা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! মূর্ত্তি যেন বলিতেছে—'বড় যে ঠাট্টা করিতে! দেখ, মানুষের বাহিরটাই সব নয়। যাকে হঠাৎ দেখিলে সামান্য মনে হয়, তার মধ্যেও কত বড় মহাপ্রাণ লুকাইয়া থাকিতে পারে!'

আজিজের কথা উঠিলে সুশীল ও মাছুমের চোখ এখনও জলে ভরিয়া উঠে।

বিচিত্র ভারত

মোরাবাদী পাহাড়ে উপাসনাগার
রাঁচী

ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জার
ভিতরের দৃশ্য

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ

বাংলার পল্লীদৃশ্য

শরতের ভরা নদী

'মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে—

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস

নয়

ব্যাকুল আগ্রহে সকলে চেয়ে রইল অজয়ের মুখের দিকে। অজয়ের কিন্তু সেদিকে কোনও লক্ষ্যই ছিল না। তার দৃষ্টি যেন কোথায় কোন মহাশূন্যে নিবদ্ধ; মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন আত্মহারা হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ তার জ্ঞান ফিরে এল মীরার ছোট্ট একটী ডাকে—"অজয়দা'—"

অজয় চম্‌কে উঠে তাকাল সকলের মুখের দিকে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক থেকে বা'র হয়ে এল। মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"হ্যাঁ, বলি।" ব'লে আস্তে আস্তে স্থুরু কর্‌লে সে আবার—

"…গভীর রাত্রি; সমুদ্রের বুকে নেমেছে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে চলেছিল আমাদের জাহাজখানি। একটু আগে তাকে নোঙর করা হয়েছে। কোথা দিয়ে চলেছি তাও জানি না, আর কোথায় যাব তাও জানি না। গভীর নৈরাশ্যে সমস্ত মন ছেয়ে আছে। রণুর কোন খবরই পেলাম না—এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল!—

"ডেকের উপর একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলাম; পাশে এসে দাঁড়াল আস্তে আস্তে আমার এই অভিযানের সঙ্গী নির্ম্মল। আশ্চর্য্য বন্ধু সে আমার। আমার এই ঘোরার পিছনে আছে নিজের পরম প্রিয় বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার এক আকুল বাসনা, এই ঘোরার পিছনে আছে দুর্ব্বার নিয়তিকে জয় করবার আমার তীব্র এক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নির্ম্মলের? ওর কোন উদ্দেশ্যই ত' নেই, বল্‌তে গেলে, তার নিজের দিক্ থেকে। শুধু আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানে আমাকে তার সাহচর্য্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই সে ছেড়েছে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমন কি তার নিজের জীবনের মায়া পর্য্যন্ত।

"নির্ম্মল এসে পাশে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে,—'অজয়, অনেক রাত হয়েছে, কেবিনে চল, শুয়ে পড়বে।'

"ব্যথায় যখন মানুষের বুকটা ভরে থাকে তখন একটু স্নেহের স্পর্শে—মিষ্টি দুটো কথায় মনটা যেন গুমরে কেঁদে ওঠে। মানুষের লৌহ-কঠিন হৃদয়ও কত দূর কোমল হয়ে উঠ্‌তে পারে শুধু ব্যর্থতার আঘাতের ফলে—তা বুঝলাম সে দিন। নির্ম্মলের মাত্র ঐ স্নেহশীতল দুটী কথায় আমার মত ছেলের চোখে এসে গেল জল। যেন একটা রুদ্ধ আবেগ আমার বুক ফেটে বাইরে এসে হাহাকার শব্দে ছড়িয়ে পড়তে চাইল সেই অন্ধকারের বুকে।

"কোন কথা না বলে ফির্‌ছি ডেকের থেকে কেবিনের দিকে—হঠাৎ একটা চীৎকার-ধ্বনি ভেসে এল সেই গভীর অন্ধকার ভেদ ক'রে। দু'জনেই ফিরে দাঁড়ালাম।

"হ্যাঁ, আবার সেই স্বর ভেসে এল কাণে। কে যেন ডাক্‌ছে, অতি কাতরস্বরে চীৎকার করে ডাক্‌ছে—'জাহাজে কে আছ, ওগো, জাহাজে কে আছ ?"

"নির্ম্মল এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি রেলিংএর ধারে, তার পিছু পিছু অগ্রসর হ'লাম আমি। নির্ম্মল চীৎকার করে উত্তর দিলে—'কে ডাকে ?'

"আবার সেই স্বর—'জাহাজে কে আছ ?'

"নির্ম্মল আবার উত্তর দিলে—'আছি, আমরা আছি। তুমি কে ?'

"আর কোনও সাড়া নেই; সে স্বর যেন সমুদ্র-গর্ভ থেকে উঠে বাতাসে মিশিয়ে গেল। কিন্তু, না; কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না বটে, কিন্তু, শোনা গেল আর একটা অস্পষ্ট শব্দ—দাঁড়ের শব্দ। মনে হ'ল কে যেন দাঁড় বেয়ে নৌকা করে আস্‌ছে আমাদেরই দিকে।

"নির্ম্মল ছুটে গিয়ে তার কেবিন থেকে টর্চ্চ্‌টা নিয়ে এল। টর্চ্চের আলো সমুদ্রের উপর এক জায়গায় গিয়ে পড়্‌তেই শোনা গেল কে যেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে দাঁড় টেনে চলে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে। বুঝ্‌লাম আমরা, যে আস্‌ছিল আমাদের দিকে এগিয়ে সে চলে গেল, দূরে চলে গেল ঐ আলো ফেলার জন্যই, বোধ হয়।

"টর্চ্চের আলোটা ঘুরিয়ে আনবার সময় তার আলো গিয়ে পড়্‌ল দূরে কালো মত কি একটা বস্তুর উপর। জলের উপর দিয়ে সেটা চলেছে—নৌকাই বোধ হ'ল। একটু পরেই সেটা টর্চ্চের আলোর সীমার বাইরে চলে গেল।

"নির্ম্মল চীৎকার করে বল্‌লে,—'এই, নৌকায় কে আছ ? উত্তর দাও—কে আছ ?'

"অস্পষ্ট দাঁড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

"নির্ম্মল চীৎকার করে বল্‌লে আবার—'এই নৌকায় কে আছ ? দরকার আছে কিছু আমাদের কাছে ? চলে গেলে কেন ?—এগিয়ে এস না কাছে !'

"এবার দূর থেকে অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল—'আলো নিভিয়ে ফেল। আলো জ্বাল্‌লে আমি যেতে পার্‌ব না।'

"নির্ম্মল টর্চ্চ্‌টা নিভিয়ে ফেল্‌ল। বল্‌লে,—'এস এইবার এগিয়ে।'

"আবার দাঁড়ের শব্দ দূর থেকে কাছে আসতে লাগল—বেশ স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম এবার আমাদের জাহাজের কিছু দূরে শব্দ হচ্ছে—ছপ্‌, ছপ্‌, ছপ্‌—

"শব্দটা থাম্‌ল একটুখানির জন্য। সেই স্বর এবার বল্‌লে—'শপথ কর, আলো জ্বাল্‌বে না, তবেই আমি আর অগ্রসর হ'ব।'

"নির্ম্মল যেন হঠাৎ রুখে উঠ্‌ল—টর্চ্চ্‌টা উঁচু করে ধরে জ্বাল্‌তে গেল। আমি ওর হাতটা চেপে ধর্‌লাম। শুধু বল্‌লাম—'থাক্‌, জ্বেল না—যখন বল্‌ছে ও।'

"নির্ম্মল একটু বিরক্তভাবেই বল্‌লে—'ও বল্‌লেই হ'বে ? কেন, আলো না জ্বালার কারণ কি ? ওর নিশ্চয় কোনও মতলব আছে—'

"আমার তখন মনটা এতই ভারাক্রান্ত যে কোন কথাই বল্‌তে ইচ্ছা করছিল না। তবু নির্ম্মলকে শান্ত করার জন্য বল্‌লাম—'বদ্‌ উদ্দেশ্য ওর কিছুই নেই, নিশ্চয়। বোধ হয় ওদের জাহাজ গেছে সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে—কোন এক অজানা জায়গায় একাকী হয়ত কাটিয়েছে কত দিন কিংবা হয়ত ও ছাড়া ওর আর সবাই জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের তলে সমাধি লাভ করেছে—তাইতে পাগল হয়ে গেছে বেচারা—'

"নির্ম্মল আমার কথা শুনে চীৎকার করে বল্‌লে—'শপথ করছি আলো জ্বাল্‌ব না। তুমি এগিয়ে এস।'

"আশ্চর্য্য! কথাটা এতক্ষণ ত' আমার মনে আসে নি! একটা অসম্ভব আশা জেগে উঠ্‌ল মনের মাঝে। যদি রণজিৎ হয়। যদি রণজিৎ হয়!

"নৌকাটা এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম—দূরের ঐ স্বরকে নিকটে পাবার জন্য।

"কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। নৌকাটা আমাদের জাহাজের অল্প কিছু দূরে এসে থাম্‌ল। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'কে তুমি ?'

"উত্তর এল সে নৌকা থেকে—'ভয় নেই, আমি একজন মানুষ—এক হতভাগ্য বৃদ্ধ।' এবার এত নিকটে তাই এত স্পষ্ট শুন্‌লাম সে স্বর! অদ্ভুত সে স্বর, মানুষের স্বর বলে মনে হয় না! কি রকম খস্‌খসে আওয়াজ,—অমানুষিক সত্যিই।

"আমার মনের মধ্যে চকিতে যে আশা দেখা দিয়েছিল—মুহূর্ত্তে সে আশা বিলীন হয়ে

গেল—ঐ কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ; শুধু স্বর কেন—ঐ স্বর ত' বল্লেই ও একজন বৃদ্ধ হতভাগ্য লোক। 'রণজিৎ'এর দেখা মিল্‌বে না আর কোনও দিন!

"নির্ম্মলই ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। ও বল্লে, 'বেশ ত,' মানুষ যদি হও, তা হ'লে আলো জাল্‌তে বারণ কর্‌ছ কেন?'

"সেই স্বর উত্তর দিলে—'আলো জ্বাল্‌তে বারণ করছি—তার কারণ—তার কারণ—' সে যেন আর বল্‌তে পার্‌ল না ; মনে হ'ল সে যেন ভেঙ্গে পড়ল একেবারে।

"নির্ম্মল বল্লে—'আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রথমতঃ আলো জ্বাল্‌তে কর্‌লে বারণ ; তার পর কেন বারণ কর্‌লে তাও বল্‌বে না? এই অন্ধকার রাত্রি, হঠাৎ কোথা থেকে তুমি এলে তাও জানি না ; তোমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা তাই বা জান্‌ব কি করে? তুমি ত' বল্লে যে নৌকায় তুমি মাত্র একজন আছ—কি করে বুঝ্‌ব আমরা যে তোমার সে কথা সত্যি কিনা যদি না দেখ্‌তে পাই তোমাকে—আর এই গাঢ় অন্ধকারে আলো না ফেল্‌লেই বা দেখ্‌ব কি ক'রে তোমাকে?'

"আবার ছপ্‌-ছপ্‌-ছপ্‌ শব্দ শোনা গেল জলের মাঝে। দূরে চলে যাচ্ছে সে তার নৌকা নিয়ে। একটু পরেই শোনা গেল সে স্বর বল্‌ছে—'বড় দুঃখিত আমি, সত্যিই বড় দুঃখিত। তোমাদের কোনও অসুবিধা বা অসন্তোষের কারণ হওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল না। কেবল দুর্দ্দান্ত ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণায় এসেছিলাম তোমাদের কাছে—বিশেষতঃ আর একজন নারী—'

"কি করুণ নৈরাশ্যপূর্ণ সে স্বর!—ব্যথায় আর যন্ত্রণায় যেন ফেটে পড়ছে মনে হ'ল।

"নির্ম্মলের মনও এবার সহানুভূতিতে ভরে উঠেছে। সে চেঁচিয়ে বল্লে,—'এই, শোন। তোমাকে তাড়িয়ে দিতে আমি চাই নি। আলো আমরা জ্বাল্‌ব না—তুমি কাছে এস, তোমার যা দরকার তা নিয়ে যাও।'

"আবার ধীরে ধীরে নৌকাটা ফিরে এল—বুঝলাম ফিরে এসে এবারও জাহাজটা থেকে সে বেশ খানিকটা দূরে থাম্‌ল।

"নির্ম্মল বল্লে—'তুমি আরও কাছে আস্‌ছ না কেন? জাহাজের একেবারে ধারে এস, তোমার দরকার মত খাবার নিয়ে যাও।'

"সেই স্বর অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত ভাবেই বল্লে, 'কাছে যাওয়ার আমার উপায় নেই, সাহস হয় না আমার—'

"নির্ম্মল হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'একজন নারীর কথা বল্‌ছিলে—তিনি কি তোমার ঐ নৌকোতেই—?'

"সে উত্তর দিলে—'না, তাকে দ্বীপে রেখে এসেছি।'

"নির্ম্মল বল্লে—'কোথায় সে দ্বীপ? কি নাম তার?'

'সে দ্বীপের নাম জানি নে' —উত্তর দিল সে স্বর।

নির্ম্মল বল্লে—'তাঁকে কি এখানে আনা যায় না?'

"সেই স্বর এবার বেশ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ভাবেই উত্তর দিলে—'না, তাকে আনা যায় না। আনা সম্ভব নয়। তাকে এখানে নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করতে তোমাদের কাছে আমি আসি নি—এসেছিলাম কিছু খাদ্য সংগ্রহের জন্য। একটী নারী ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় আর এই সময়—'

"নির্ম্মল তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে,—'সত্যিই আমি পশু'—বলে সে ছুট্‌ল জাহাজের ভিতরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ফিরে এল—হাতে তার নানা প্রকারের আহার্য্য-বস্তু।

"সে এবার অতি মিষ্ট করেই বল্লে—'জাহাজের পাশে না এলে কি করে দিই এ সব? একবারটী কাছে এস—একবারটী।'

"সে অতি কাতরস্বরে বল্লে,—'উপায় নেই, উপায় নেই।'

"আমার মনে হ'ল লোকটীর মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কি একটা বিশেষ ভীতিপ্রদ কারণে সে জাহাজের কাছে আসতে পারছে না। যে খাবারের অভাবে সে এত কাতর আর তারই কোন আত্মীয়া নারী মৃতপ্রায় হয়ে ধুঁকছে নিকটেই কোন একটা দ্বীপে সেই খাবার নেওয়ার জন্য সে কাছে আসতে পারছে না! আমার মধ্যে থেকে কে যেন বলে দিল—পাগল ও নয়। সত্যিই কোন দুর্ভাগা ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে এসেছে—কিন্তু সে ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণার চেয়েও ওর জীবনে চলেছে আর এক ভীষণতর বিভীষিকার নিষ্ঠুর পরিহাস। যার ভয়ে সে এই অসহ্য ক্ষুধার মুখে আহার্য্য বস্তুর সন্ধান পেয়েও তা নেওয়ার জন্য জাহাজের কাছে আস্‌তে সাহস করছে না। আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম। এবার শুধু অতি আস্তেই নির্ম্মলকে বল্লাম—'একটা বাক্স নিয়ে এস চট্ করে, তার পর ঐ লম্বা 'রড্'টার মাথায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নামিয়ে দাও।' নির্ম্মল আমার কথামত কাজ করলে। একটা বাক্স যোগাড় করে তার মধ্যে সমস্ত খাবার জিনিষগুলি ভর্ত্তি করলে, তার পর ঐ 'রডে'র মাথায় দড়ি দিয়ে বাক্সটা বেঁধে অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে নামিয়ে দিল। বল্লে শুধু—'ধর, নামিয়ে দিয়েছি বাক্স করে।'

"অল্পক্ষণ পরেই বুঝ্‌লাম—সে পেয়েছে সেটা। কারণ অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্ফুট হর্ষসূচক শব্দ শোনা গেল সেই নৌকা থেকে।

"কয়েকটী মুহূর্ত্ত মাত্র। আবার ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ শোনা গেল জলের মধ্যে। নৌকা বয়ে চলে গেল সে ক্ষিপ্র বেগে। যাওয়ার সময় শুধু বল্লে—'কি বল্‌ব? ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।'

"নির্ম্মল একটু হেসে বল্লে—'প্রয়োজন মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স'রে পড়ল, মজা দেখেছ?'

আমি বল্‌লাম—'ভুলে যাচ্ছ কেন নির্ম্মল, যে আর একজন ওর পথ চেয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ক'টা গুণছে; ও নিশ্চয় আবার আস্‌বে ফিরে, দেখো।'

"বুকটা আমার মুষড়ে উঠল। ইরা—বাপ-মায়ের অত আদরিণী মেয়ে ইরা—সেও হয়ত এমনি করে অনাহারের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিল তিল করে মরেছে—রণুও গেছে তার সঙ্গে নিশ্চয় মরণের সাথী হয়ে।

"এক ঘণ্টা কেটে গেছে, দু' ঘণ্টা গেছে, বোধ হয় তিন ঘণ্টাও কাটে—কে জানে?

"নির্ম্মল সমানে দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটা ওর মনটাকে বেশ নাড়া দিয়েছে—মনে হ'ল।

"দুজনে নীরবে দাঁড়িয়ে আছি—অন্ধকার সমুদ্রের বুকে দৃষ্টি ফেলে। হঠাৎ দূরে শব্দ শোনা গেল—'ছপ্, ছপ্, ছপ্।"

"নির্ম্মল বল্‌লে,—'অজয়, সত্যিই সে আস্‌ছে।'

"অল্পক্ষণ পরেই শুনলাম সেই স্বর বল্‌ছে—'আলো জ্বালা নেই ত'?'

"নির্ম্মল বল্‌লে—'না।'

"সে এবার আগের মত কাছে এসে অল্প দূরে থাম্‌ল। তার পর বল্‌লে, 'কি উপকার যে কর্‌লে আমাদের তোমরা আজ—'

"নির্ম্মল তার এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধা দিতে গেল। সে সেই বাধা না মেনে বল্‌লে—'তোমরা কল্পনাই করতে পার না যে কি যন্ত্রণা পাচ্ছিল সে খেতে না পেয়ে। তোমাদের দেওয়া খাবার পেয়ে ক্ষুধার সেই দারুণ যন্ত্রণা থেকে সে পেয়েছে নিষ্কৃতি।'

"সে বল্‌লে—'আজ যখন এই রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা পেয়েছি মানুষের, তখন তাদের শুনিয়ে দেওয়া উচিত আমাদের এই অভাবনীয় দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত কোনও দিন তোমাদের কাছ থেকে সে কথা শুন্‌তে পারে তা'রা যা'রা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। তাই তোমাদের বল্‌তে এলাম আমাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী।'

"নির্ম্মল বল্‌লে—'তারা কারা?'

"সেই স্বর বল্‌লে—'সেই কথাই বল্‌ছি এবার, শোন।' সুরু করলে সে—

"'কলকাতা থেকে এরোপ্লেনে চড়ে বার হই—অষ্ট্রেলিয়া অভিযানে; সঙ্গে আমার একমাত্র আদরের ছোট বোন—ইরা!'

"কে যেন আমার কানের মাঝে তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিল। চীৎকার করে উঠলাম—'রণজিৎ—রণু, তুমি—!'

"অস্ফুট এক আর্ত্তনাদ ভেসে এল সেই নৌকার মাঝে থেকে—'অ-জ-য়!!'

মুহূর্ত্তের জন্ত আমার বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন্ বুঝলাম সে অনেকখানি দূরে চলে গেছে।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তারি প্রহসন

[সত্য ঘটনা]

শ্রীরেণুকণা শূর

বড়দিনের ছুটী, উত্তর বিহারে একটী ছোট সহরে বেড়াইতে আসিয়াছি। আমার ছোট কাকাবাবু এখানে ডাক্তারি করেন। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, পড়াশুনার বালাই নাই; কাজের মধ্যে বেড়ানো ও ডাক্তারখানায় বসিয়া জটলা করা।

সকালের দিকে ডাক্তারখানায় বড় ভিড়। ভিন্ গাঁ হইতে নানা রকমের রোগী আসিয়া জড় হয়—রোগী, রোগীর আত্মীয়। সেদিন একটী ছোট ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া কাকাবাবু ছেলেটির বাপের হাতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌খানি দিয়া বলিলেন, "এই ওষুধ তোমার ছেলেকে দিনে তিনবার খাওয়াবে। সকালে একবার, দুপুরে একবার আর সন্ধ্যায় একবার।" পরদিন সকালে লোকটি আসিয়া সংবাদ দিল যে তার ছেলের অসুখের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। কাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল যে ওষুধ দিয়েছিলাম তা ঠিকমত খাইয়েছ কি?" সে উত্তর দিল, "হাঁ হুজুর, আপনি কাল যেমন বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেই মতই খাইয়েছি। আপনার লেখা কাগজখানি সমান তিন টুক্‌রো ক'রে কেটে সকালে এক টুক্‌রো, দুপুরে এক টুক্‌রো আর সন্ধ্যায় এক টুক্‌রো তাকে খাইয়েছি। কিন্তু দুপুরে আর সন্ধ্যায় ওষুধ রোগীর পেটে যায় নি, বমির সঙ্গে উঠে এসেছে।"

* * *

আর একদিনের কথা। একটি ছেলের টাইফয়েড্ হইয়াছে। কাকাবাবু তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ছেলের বাপকে বলিলেন, "তোমার ছেলেকে কেবলমাত্র ছানার জল খাইয়ে রাখবে, অন্য কিছু খেতে দিও না।" লোকটি ছানার

জল তৈয়ারী করিতে জানে না; কাকাবাবু লেবুর রস দিয়া কি ভাবে ছানার জল করিতে হইবে তাহা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এবং জল ছাড়া আর কিছু যেন না দেওয়া হয় সাবধান করিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে লোকটি একটু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাকাবাবুকে খবর দিল যে কাল রাত্রি হইতে তাহার পুত্রের পেটের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সে একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াই কাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রোগীকে কি খেতে দিয়েছিলে?" সে জানাইল, হুজুর যেমন বলিয়াছিলেন তেমনি করিয়া "সের ভর" দুধ সে লেবুর রস দিয়া ফাটাইয়াছিল, তাহার জলটুকু লইয়া দেখা গেল স্রেফ্ জল, খাদ্যের চিহ্নমাত্র নাই। সেইজন্য তাহার মনে হইল যে ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই বলিতে ভুল করিয়াছেন, কারণ শুধু জল খাইয়া কোনও মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাই জলটুকু ফেলিয়া দিয়া ছানাটুকু তাহাকে খাওয়ান হইয়াছে। কাকাবাবুর অবস্থা তো বুঝিতেই পার। তখনই ছুটিয়া বাহির হইলেন রোগীর বাড়ী। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটী শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গিয়াছে।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর বাহির হয়; মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী ন'ন।]

শ্রাবণ মাসের ১নং প্রশ্নের উত্তর

লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন সাধারণতঃ এই এই কারণে :—

(১) লেখক নিজের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ন'ন।

(২) লজ্জা বশতঃ নাম গোপন করতে চান।

(৩) লেখায় অপরকে আক্রমণ করতে চান—নিজেকে লুকিয়ে।

(৪) লেখকের এটি একটি খেয়াল।

(৫) হাস্যরস সৃষ্টির জন্য লেখকের নামও হস্যোদ্দীপক করবার জন্য।

(৬) নিজের নামে অন্য কোনও নাম-করা লেখক থাকলে তফাৎ বুঝাবার জন্য।

(৭) পাঠককে নিরপেক্ষ সমালোচনার সুযোগ দেবার জন্য।

(৮) নিজে বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য। ইত্যাদি।

—শ্রীঅশোকচন্দ্র গুহ, শ্রীরামপ্রসাদ কুশারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জি, শ্রীশুক্লা মজুমদার।

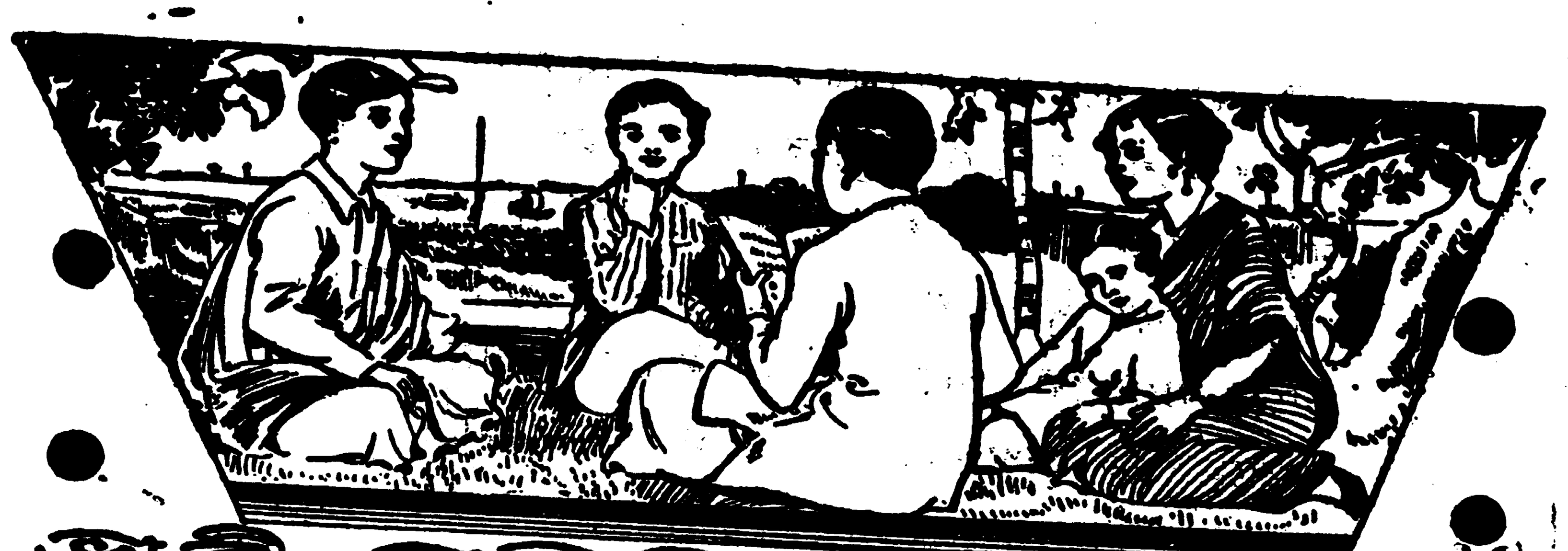

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

খোকার কল্পনা

শ্রীমতী কণা চক্রবর্ত্তী

মাগো! ঐ যে তারা আকাশ 'পরে
যায় না কেন গণা?
মিটি মিটি জ্বলছে যেন
হীরার ক'টি কণা!
কোথায় ওদের বাড়ী মাগো,
কোন্ দেশেতে থাকে?
দিনের বেলায় যায় না দেখা
পালায় যে কোন্ ফাঁকে!

মাগো, আমায় দে না কেন
ছোট্ট দু'টী ডানা—
উড়ে যাব ওদের দেশে;
করিস নে মা, মানা।
তারার দেশের রাজার মেয়ে
দেবে আমায় মালা,
তোমার কোলে আসব আবার
চড়ে চাঁদের ভেলা।

আজিকার ছড়া

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

শিউলী-মালা গন্ধ-ঢালা শরৎরাণীর গলায় দোলে,
ধানের ক্ষেতে বাতাস মাতে,—ঢেউ দিয়ে যায় পাতার কোলে।
পদ্মকলি চক্ষু মেলি হাল্‌কা হাসে রঙীন্ হাসি,
চন্দনা কার বন্দনা গায়, বাজ্‌ছে কোথায় মোহন-বাঁশী?

নদীর ধারে থরে থরে কাশের দলে দোলায় মাথা,
কাজল জলে দলে দলে ঢেউয়ের নাচন,—ছন্দে গাঁথা।
নতুন আলো আজ্ কে এল,—উথ্ লে প'ল আকাশ ছেপে,
পাতার 'পরে শিশির ঝরে,—ঝিলিক্ মেরে উঠ্ ছে কেঁপে।
মাঠের ধারে নদীর পারে উড়িয়ে রঙীন্ ওড় নাখানি
এসেছে আজ এসেছে রে সোনারপ্রান্তে শরৎরাণী।

গৃহহীন

শ্রীদীপালী রায়

বড় আদরের গ্রামখানি ছেড়ে চলেছি অজানা পথে,
রিক্ত হস্ত, শীর্ণ শরীর—স্মৃতিটুকু আছে সাথে।
ছল ছল রবে নদী ছুটে চলে, ঢেউগুলি করে খেলা,
রবি উঠি' পাটে লুকোচুরি খেলে শেষ হ'লে পরে বেলা।
মৃদু সমীরণে দোলে কাশবন—পাতাগুলি পড়ে ঝ'রে,
ছায়া-ঢাকা, মোর স্নিগ্ধমধুর, ভালবাসি গ্রামটিরে।
এই গ্রাম ছাড়ি মেঠোপথ ধরি' চলেছি অজানা পথে,
নাই কেহ মোর, রিক্ত আমি যে, স্মৃতিটুকু আছে সাথে।

ভোর হ'লে পরে আকাশ-কিনারে ভানু দেয় আসি দেখা,
ছেলেদের দল ছোটে মাঠপানে, আমি শুধু চলি একা।
কিচিমিচি রবে ডালে বসি পাখী গাহে অবিরত গান,
শুনি সেই ধ্বনি বেদনায় রণি' উঠে শুধু মোর প্রাণ।
গ্রামখানি ছাড়ি শূন্যে মাঠ ধরি অচেনা অজানা পথে,
রিক্ত আমি যে, স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছু নাই সাথে।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছি। বিজয়ার শুভেচ্ছা বহন করে তোমাদের কাছ থেকেও অসংখ্য চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। রামধনু মারফৎ সেগুলি তোমাদের পরস্পরের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। পূজার ছুটীতে তোমাদের দিনগুলি বেশ ভালই কেটেছে আশা করি। খেলাধূলা, বেড়ান, আমোদ-প্রমোদ এবং সেই ফাঁকে বেশ কিছু দুষ্টুমীও নিশ্চয়ই করে নিয়েছ? অবশ্য সেই সঙ্গে সত্যিকারের ভাল কাজও যে সবাই কিছু কিছু করেছ এ আশা আমরা রাখি।

মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এক-একটা নতুন ধরণের" চিঠি আসে। এবার তার খান চারেক থেকে খানিকটা ক'রে অংশ তুলে দিলাম।

(১) একজন তরুণ কবি একটি কবিতা পাঠিয়ে সেটা ছাপাবার জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। চিঠির চার কোণায় বড় বড় অক্ষরে কাৎ করে লেখা—"ছাপাবেন", "ছাপাবেন", "দয়া করবেন", "দয়া করবেন"। এই চিঠির সঙ্গে আর একখানা ছোট চিঠি, কবির ছোট ভাইয়ের লেখা—

"সম্পাদক মশাই, দাদার কবিতাটা যেন ছাপাবেন, না হ'লে দাদা পাগল হয়ে যাবে। আমি কি ভাবে দাদার চিঠিটা দেখলুম শুনবেন? মাষ্টার মশাই দাদাকে পড়াচ্ছিলেন, দাদা আমাকে তখন এটা ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়াস্তে বল্লে, আর বল্লে 'দেখিস নি'। আমি কিন্তু লুকিয়ে সবটা পড়ে নিলাম। আপনি ওটা নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় ছাপাবেন। ওটা কিন্তু দাদার টোকা নয়। ও লুকিয়ে ছাদে বসে বসে লিখেছে, আমি জানি।" তার পর চিঠির শেষে চার ইঞ্চি লম্বা অক্ষরে বড় বড় করে আবার লেখা "ছাপাবেন।"

(২) একজন অবাঙ্গালী কবির চিঠি :—

"আমি ওল্প দিবস গত হইল বাংলা শিখিয়া ফেলিয়াছি, লেকিন আমার বড়ো ইচ্ছা' এ বিষয় ২।৪ কোলাম কবিতা লেখে লিই। আপনার মেহেরবাণী হইলে যোগ্য সেবা করিতে পারি। চিঠির জওয়াব পাইলে হর্ষিত হইব। ইতি...

(৩) একজন অবাঙ্গালী গ্রাহিকার চিঠি :—

"প্রিয় মহাশয়, কৃপয়া আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইলে তৃপ্ত হইব। আমি শুনিয়াছি আপনার মুলুক্তে আপনার কাগজের বহুৎ পসার আছে। নমস্তে। ইতি..."

(৪) একজন গ্রাহক সময় মত রামধনু না পাওয়ায় অনুযোগ করেছেন :—

"রামধনু গো, তুমি এখনো কেন দেখা দিলে না ভাই? তোমার জন্য ডাক-বাক্স হাতড়ে হাতড়ে হাতে যে কড়া পড়ে গেল! ইস্কুলে শুধু পড়া ভুল হচ্ছে, বকুনি খাচ্ছি। ও বাড়ীর লীলাদি'র রামধনু কবে এসে গেছে, আমাকে কেন তুমি ভুলে রইলে, কি অপরাধ করেছি আমি, নিষ্ঠুর রামধনু? যদি শনিবারের মধ্যে তোমাকে না পাই তা হ'লে আর তোমাকে পড়ব না, এই বলে রাখলুম, বলে রাখলুম, বলে রাখলুম।" ইতি তোমার হতভাগা—বন্ধু..."

আরও একখানি চিঠি এই সঙ্গে দিলাম—

"পূর্ণিয়ার বালিকা-সঙ্ঘের দেখাদেখি আমরাও একটা সঙ্ঘ করেছি। উদ্দেশ্য—সভ্যদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে ভাব করিয়ে দেওয়া। এই সঙ্ঘ কেবল মাত্র গ্রাহকদের জন্য, গ্রাহিকাদের সভ্য হবার নিয়ম নেই। সভ্যদের কোনও চাঁদা নেই। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাকটিকেট বা টিকেটযুক্ত ঠিকানা লেখা খাম নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে—A. Ghosh & N. Rao. C/o Brotherhood, Bhasakosh Lane, P.O. Chandni Chawk, Cuttuck (Orissa)।"

—রাঃ সঃ

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

পাগলা দাশু—৺সুকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০

সন্দেশ-সম্পাদক সুবিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় চৌধুরীর ইতস্ততঃ ছড়ানো গল্পগুলি একত্রিত ক'রে এই মূল্যবান্, অতি-সরস বইখানি বার করা হয়েছে। সুকুমার বাবুর রস-রচনার কথা কে না জানে? তাঁর মত শক্তিশালী লেখক বাংলা শিশুসাহিত্যে খুব বেশী হয় নি। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "আবোল তাবোল" ও "হ য ব র ল" তাঁর নাম অমর করে রেখেছে। "পাগলা দাশু"র নামও সেই সঙ্গে যুক্ত হ'ল। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বইখানি এত দিন বার করা হয় নি কেন ভাবলে বিস্ময় লাগে।

বার্ষিক শিশুসাথী—১৩৪৭। শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১॥০

প্রতিবারের মত অজস্র ছবি ও উল্লেখযোগ্য গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সমারোহ নিয়ে এবারেও এই বইখানি যথা সময়ে শিশুদের পূজার আসর জাঁকিয়ে তুলেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারেও এমন অঙ্গসৌষ্ঠবপূর্ণ—এক কথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপহার-পুস্তক প্রকাশ করা প্রকাশকদের কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই।

আমেরিকার তরুণ টেনিস্ খেলোয়াড় ডন্ ম্যাক্নীল আমেরিকান্ চ্যাম্পিয়ান্শিপের ফাইনালে পৃথিবীর এক নম্বর খেলোয়াড় ববি রীগসকে হারিয়ে দিয়েছেন। রীগস হচ্ছেন উইম্ব্লডন্-বিজয়ী, কাজেই ম্যাক্নীলের পক্ষে এই জয়লাভ বড় কম সম্মানের নয়! তোমাদের মধ্যে যারা টেনিস্ সম্বন্ধে একটু আধটু খবর রাখ তারা নিশ্চয়ই জান এই ম্যাক্নীল কিছুদিন আগে আমাদের দেশে খেলতে এসেছিলেন এবং তখন তাঁর এত বেশী নাম না থাকা সত্ত্বেও এখানে তিনি প্রত্যেকটি খেলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

* * *

প্রবীণ কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী আর ইহলোকে নেই। ভুজঙ্গধরের ছোট কবিতা তোমরা বোধ হয় সকলেই পড়েছ। এ ছাড়াও তাঁর লেখা উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ (কবিতায়) তোমরা বড় হয়ে পড়বে, এবং পড়লে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাবে।

* * *

আর একটা খুব নিদারুণ দুঃসংবাদ তোমাদের দিতে হচ্ছে। সুলেখক জগৎমোহন সেন আর ইহলোকে নেই। মাত্র ৬৫ বছর বয়সে অকালে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। জগৎমোহন 'রামধনু'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই দু' মাস আগেও তাঁর লেখা উই-ফা-এন্-নীল" তোমরা কত আগ্রহ করে পড়েছ! বাস্তবিক কি চমৎকার ছিল তাঁর ছোটদের জন্য লিখবার হাত! কে জান্ত এত শীগ্‌গির তাঁর ডাক পড়বে?

জগৎমোহনের অনেক রকম গুণ ছিল। তিনি শুধু বাংলা ভাষায়ই সুলেখক ছিলেন না, উড়িয়া ভাষায়ও তাঁর অসামান্য দখল ছিল এবং নানা উড়িয়া সাময়িক পত্রে তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন। তা ছাড়া ছবি আঁকায়, খেলা-ধূলায় এবং গান-বাজনায়ও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। সুকবি কবিশেখর কালিদাস রায়ের তিনি জামাতা ছিলেন। তাঁর অকালবিয়োগে আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

* * *

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নও আর ইহলোকে নেই। তাঁর অভাবে বাংলা একজন ভারতবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে হারাল।

* * *

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জন্য শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর নানা জায়গায় উদ্বেগ দেখা গিয়েছিল। ভগবানের দয়ায় কবি এখন আরোগ্যের পথে।

* * *

রুমানিয়ার রাজা ক্যারল রাজ্য ও সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর

ছেলে মাইকেল নামে রাজা হয়েছেন বটে কিন্তু রাজার ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। 'আয়রন্ গার্ড' দলের নেতা আর্ণেস্থু হয়েছেন সেখানকার প্রধান মন্ত্রী এবং ডিক্টেটর।

*　　*　　*

মেক্সিকোর ডুরাঙ্কো বলে এক জায়গায় একটা ছোট্ট পাহাড় আছে, তার শতকরা ৬০ ভাগই নাকি লোহা।

*　　*　　*

সম্প্রতি আমেরিকায় একটি অতিকায় যাত্রী-বাহী এরোপ্লেন তৈরী হয়েছে। এই এরোপ্লেনের মাঝখানটা তিন তলা। ওপরের তলায় থাকে চালক ও কর্ম্মচারীরা, মাঝের তলায় যাত্রীরা, আর নীচের তলায় থাকে মালপত্র। এরোপ্লেন খানির ওজন ৮৫ হাজার পাউণ্ড। এরোপ্লেনটি নাকি ঘণ্টায় ১৫০ থেকে ২০০ মাইল বেগে এক দমে না থেমে ৫ হাজার মাইল পর্য্যন্ত উড়ে যেতে পারবে!

*　　*　　*

সম্প্রতি বোম্বাই সহরের উপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত চলে গিয়েছে। বৃদ্ধেরা বলছেন তাঁদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা কখনও এ রকম ঝড় দেখেন নি। বহু লোক মারা গিয়েছে, আহত হয়েছে অসংখ্য। সমুদ্রের ধারে একটা নরউইজান্ জাহাজ ডুবে গেছে, ছোট লাঞ্চও গেছে—আর নৌকো যে কত ধ্বংস হয়েছে তার আর হিসাব নেই। বহু জেলে ঝড়ের সময় সমুদ্রে মাছ ধরতে ব্যস্ত ছিল, তাদের অনেকেই আর ফিরে আসে নি।

*　　*　　*

যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার সুরু হয় গত মহাযুদ্ধে—১৯১৫ সন থেকে। ঐ বছর জার্ম্মানরা ফরাসী সীমান্তে প্রথম ঐ গ্যাস প্রয়োগ করে।

*　　*　　*

ভিক্টোরিয়া ক্রসের নাম তোমরা বোধ হয় সবাই শুনেছ। বীরত্বের জন্ত এই মহামূল্যবান্ পদক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া ক্রস্ যিনি পান বলা বাহুল্য তাঁর ভারী সম্মান।

প্রথম যিনি এই পদক পুরস্কার পান তাঁর নাম ডেভিস্ লুকাস্। ইনি ছিলেন এক জাহাজের নাবিক। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধে একবার একটা শেল্ এসে তাঁদের জাহাজে পড়ে, কিন্তু শেল্‌টি সঙ্গে সঙ্গে না ফাটায় জাহাজ শুদ্ধ নাবিক ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে—এখনই না জানি কি ঘটবে! সেই সময়ে লুকাস ছুটে এসে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে হাত দিয়ে শেল্‌টা তুলে সমুদ্রে ফেলে দেন—আর তার পর মুহূর্ত্তেই সেটা ফেটে যায়। লুকাসের এই বীরত্বের জন্যই তাঁকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়।

*　　*　　*

একটা সুখবর দিচ্ছি। কয়েক মাস আগে তোমাদের পোল্যাণ্ড-প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিরন্ময় ঘোষালের কথা বলেছিলাম। পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় তিনিই ছিলেন সেখানকার একমাত্র ভারতীয় অধিবাসী। ডক্টর ঘোষাল সম্প্রতি নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন, এবং শুনে সুখী হবে, আসছে মাসেই তিনি তাঁর লেখা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ভৌগোলিক নাম বসাইলে চিঠিখানি এইরূপ হইবে :—

ক'পাট না' খুলে বেশ 'আরা'মে গা 'ঢাকা' দিয়ে 'কাশী'দাসী মহা'ভারত' নিয়ে বসেছ, আজ'কালকা'র ছেলেদের কথা 'শোন'। 'কাল না' পরশু 'বৈদ্যনাথ'-এর নি'কট ক'ত বললাম, এই কুকুর দিচ্ছি, 'নে পাল' গিয়ে, তা ভাব দেখাল যেন আর লোক 'পাব না!' এই তো 'আজ মীর'ই চেয়ে নিল। ভাল কথা, 'বিহার'ীদের একটা নতুন বাড়ী 'চাই বাসা' বাড়ীতে নাকি বি'শ্রী হট্ট'গোল হচ্ছে।

উত্তরদাতাদের নাম

ভাদ্র মাসের :—

নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

প্রসূন, বীরেন, তরুণ (গুপ্তপাড়া, রংপুর); যতীশচন্দ্র, বিকাশচন্দ্র, বিজনচন্দ্র ও অশোক চন্দ্র নাথ (কাষ্ঠঘর, শ্রীহট্ট); মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); রীণা রায় (টালিগঞ্জ); রত্না দেবী পাটনা); ডলি, গদামামা, বাবু ও ছবি ভৌমিক (নিউদিল্লী); কল্যাণব্রত, পুণ্যব্রত ও প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত (বর্দ্ধমান); বাবু, জেবউন্নিসা (কলিকাতা); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমশেদপুর); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); মিহির, অজিত, কল্যাণী, বাচ্চু, মীরা (পাবনা); অনিমা পাল (শিলং); হিমাংশু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); রেবেকা সুলতানা (আহুলিয়া); প্রফুল্ল, জ্ঞান, জগৎ, পতিত, রণ (মুড়াগাছা); বিজু, টুকু, টুনু, মিঠু, বাচ্চু, শ্যামল, আশীষ (কলিকাতা); মালবিকা, মাধবিকা, মণিলাল, মুকুলিকা দত্ত (চাটখিল); বারদ্রোণ ষ্টুডেন্ট্‌স্ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (বারদ্রোণ); মীরাজিত, কল্যাণ, মণি, বেবি, পুতুল, কুমুদ, ফিসি, কুশল বাগচী (বালীগঞ্জ); নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (পাটনা); আপ্পা, আম্মা ও দীপা (পাটনা); বাণী, কিকি, খোকা, অধীরদা (চাইবাসা); ছবি রায় (নিউদিল্লী); শক্তিরাম মুখোপাধ্যায় (নসিগ্রাম); শৈলেশ, অনিল, নিখিল, নিরু, প্রভা, বিভা, গায়ত্রী (জলপাইগুড়ি); সলিল-কুমার বসু (হাজারিবাগ); শৈলেশকুমার, গুরুদাস ও নীলরতন চট্টোপাধ্যায় (চক্রধরপুর); শেফালি, বীরেন, সমর, শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রীতি, বিনয়, অনাথ ও প্রতাপ বসু (কানপুর); দীপক, বিশু, বুবুল, পাঁচু, গীতা, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (মথুরা); চণ্ডী, জবা, কুন্দ (দানাপুর);

শঙ্কর, চিত্রা ও রমা (কানপুর) ; নচিকেতা, শচীদুলাল, বোধিসত্ত্ব, দেবব্রত, অনিকেতন, হীরালাল, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, আরতি (ভাগলপুর) ; শান্তি ও কান্তি চাটার্জ্জি (চাঁদপুর) ; মনীষা সেন, নান্নু, নিপু, শেফু (গৌহাটী)।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে :—

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (কালীঘাট) ; কালিদাস পাল (বালুভরা) ; রবেশচন্দ্র পট্টনায়ক (ভিরিজি) ; যজ্ঞেশ্বর, খোকা, গঙ্গা (রাইপুর) ; মণ্টু, বিলু ও শান্তি চ্যাটার্জ্জি (খড়দা) ; ফাল্গুনী দাস (কাটিহার) ; শোভনা দেবী (মধুবনী) ; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া) ; প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা) ; তরুণ, হাপী, অশোক, বেলা, বেবী মজুমদার (পাতিহাল) ; উষা, উমা, মণ্টু গুঞ্জন, সুবু, রেবা, রেখা, ডলি, পিণ্টু, জয়ন্ত (কলিকাতা) ; আবদুর রশিদ, আতাউর রহমান, পণ্ডিত মশাই (শিমুলিয়া) ; ইন্দ্রাণী রায় (পাটনা) ; শচীন্দ্র সাহা (সন্তোষ) ; দীপেন্দ্র দত্ত (ধুবড়ী)।

আশ্বিন মাসের :—নির্ভুল উত্তর কেউই দিতে পারেন নি।

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালি

৬টি নাম-করা জায়গা দেখতে চাও তো

(১) স্বরবর্ণের সঙ্গে শব্দ যোগ কর,

(২) তীরের আগে ইংরেজীতে আমাকে বসাও,

(৩) ফসলের আগা বাদ দিয়ে পারে বসাও,

(৪) চক্ষুহীনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় অক্ষর যুড়ে নাও,

(৫) ভাল পরিমাণ দ্বীপ কোন্‌টা ভেবে দেখ,

(৬) পূর্ব্ববঙ্গীয় ছেলের সঙ্গে ডিম যুড়ে দাও।

রামধনু—

আঃ!

(শিল্পী মুরিলোর আঁকা একখানি বিশ্ববিখ্যাত ছবি)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ { ১১শ সংখ্যা

নদের চাঁদ কুমীর হয়ে যায়—

বন্দে আলি মিয়া

বারো বৎসর পরে
নদীয়াচন্দ্র কি মনে করিয়া
ফিরিয়া এসেছে ঘরে।
তারে হারাইয়া সারা দিনরাত
কেঁদেছে জননী তার,
একটি পুত্র—তাহার বিহনে
জগৎ অন্ধকার।

সেই নদে আজ ফিরিয়া এসেছে
অভাগী মায়ের বুকে,
তাহারে পাইয়া চোখে বহে বারি
পরম গভীর সুখে।

এলো আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন
তাহারে দেখার তরে,
সুধায় কুশল—গায়ে দেয় হাত—
হাসি কৌতুক করে।
বন্ধুজনেরা জিজ্ঞাসে তারে :
'কোথা ছিলে এত কাল ?
বেঁচে আছো কিবা আছিলে কেমন—
জানাও নাই তো হাল !'
নদে হেসে বলে : 'বাড়ী ছেড়ে গিয়ে
ঘুরিয়াছি পথে পথে,
শেষে গিয়েছিনু কামরূপে চলি—
আসিতেছি সেথা হ'তে।

আঃ !

(শিল্পী মুরিলোর আঁকা একখানি বিশ্ববিখ্যাত ছবি)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ { ১১শ সংখ্যা

নদের চাঁদ কুমীর হয়ে যায়—

বন্দে আলি মিয়া

বারো বৎসর পরে
নদীয়াচন্দ্র কি মনে করিয়া
ফিরিয়া এসেছে ঘরে।
তারে হারাইয়া সারা দিনরাত
কেঁদেছে জননী তার,
একটি পুত্র—তাহার বিহনে
জগৎ অন্ধকার।

সেই নদে আজ ফিরিয়া এসেছে
অভাগী মায়ের বুকে,
তাহারে পাইয়া চোখে বহে বারি
পরম গভীর সুখে।

এলো আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন
তাহারে দেখার তরে,
সুধায় কুশল—গায়ে দেয় হাত—
হাসি কৌতুক করে।
বন্ধুজনেরা জিজ্ঞাসে তারে :
'কোথা ছিলে এত কাল ?
বেঁচে আছো কিবা আছিলে কেমন—
জানাও নাই তো হাল !'
নদে হেসে বলে : 'বাড়ী ছেড়ে গিয়ে
ঘুরিয়াছি পথে পথে,
শেষে গিয়েছিনু কামরূপে চলি—
আসিতেছি সেথা হ'তে।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

কামরূপে আছে কামাখ্যা দেবী
তাঁর কথা জানো কিছু ?
তাঁরি সেবাইত খুব গুণীজন—
ছিনু তাঁর পিছু পিছু।
অনেক সাধন মন্ত্র-তন্ত্র
জানে সেই মহাজন,
তাঁর কাছে থেকে কিছুটা বিদ্যা
করেছি উপার্জ্জন।'
বন্ধু জনের কুতূহলী মন—
খুসী হয়ে ওঠে সবে,
বলে : 'কি মন্ত্র শিখেছ নদেই,
বলো কিছু শুনি তবে ?'
নদে বলে : 'শোন, বুঝিবারে পারি
পশু ও পাখীর ভাষা,
জলের মাছেরা কি কথা কহে যে
বলিবারে পারি খাসা।
আরো পারি শোন—কুমীরের মতো
ধারণ করিতে রূপ ;'
কথা শুনে তার বন্ধুজনেরা
একেবারে সবে চুপ।
একজন বলে : 'কি যে বলো নদে,
আজগুবি কথা সব,
কুমীর না হাতী—পারো না কিছুই—
মিছে করো কলরব।'
নদে হেসে বলে : 'সত্য মিথ্যা
প্রমাণ কি চাও বলো ?
তবে মোর সনে, সবাই মিলিয়া
দীঘির পারেতে চলো।
একটী কলসী জল মোরে দাও—
রাখি তা' মন্ত্র প'ড়ে,
কুমীরের রূপ ধরিব যখন
ঢেলে দিয়ো মোর 'পরে।'

জননী তাহারে করেন নিষেধ—
বাহাদুরী ভালো নয় ;
কাজ নাই বাপু, কী হতে কী হবে—
মনে জাগে শুধু ভয়।
নদে বলে : 'মাগো, মিছে এ শঙ্কা—
দেখ কী করিতে পারি,
পুনরায় দেখো হইব মানুষ
কুমীরের রূপ ছাড়ি।'
এত বলি নদে মন্ত্রসিদ্ধ
করিল কলসী-জল,
তার পর ধূলি ছিটাতে লাগিল
দেহে তার অবিরল।
বিড় বিড় ক'রে পড়ে মন্তর—
ফুঁক দেয় সারা গায়,
দেখিতে দেখিতে হইল কুমীর
যেন যমদূত প্রায়।
ভীষণ সে রূপ দেখিয়া সবাই
কেঁপে ওঠে বারে বারে,
সকলে মিলিয়া ভয়ে ভয়ে খুব
সরে গেল একধারে।
তাদের বন্ধু নদের চাঁদ সে
কুমীর হয়েছে ঠিক,
দূর হ'তে সবে দারুণ ত্রাসে
চেয়ে থাকে অনিমিখ।
বন্ধু হ'লেও কুমীর বটে সে—
হিংস্র হয়েছে তায়,
জল ঢালিবারে কাছে যেতে তার
কেহ না সাহস পায়।

রোদ বেড়ে ওঠে, মাথা পুড়ে যায়—
কমে আসে কুতুহল,

ভীড় ভেঙে যায়—সরে একে একে—
থেমে আসে কোলাহল।
নদে দেখে বড় গতিক খারাপ,
জল চাই এইবার,
এগিয়ে চলে সে তাহাদের পানে
যেথা বন্ধুরা তার।
কুমীরের রূপে নদেকে দেখিয়া
সব লোকে ভয় পায়,
পালাবার লাগি তাহাদের মাঝে
হুটোপুটি পড়ে যায়।
ঠেলাঠেলি ক'রে যাবার বেলায়
কলসীটা হেলে পড়ে
যত জল ছিলো ঢেলে পড়ে গেল
দীঘির পাড়ের 'পরে।
বন্ধুরা সব করে হায় হায়—
উপায় কেমন হবে,
জল না দিলে যে নদে চিরকাল
কুমীর হইয়া রবে!
মানুষের দেহ ধারণ করার
উপায় নাহিক আর,
এমন বিপদ্—পথ নাহি তার
জীবনে শোধ্‌রাবার।
খবর শুনিয়া জননী তাহার
ঘর হতে ছুটে আসে,

আছাড়িয়া পড়ি কাঁদে বিনাইয়া—
দুটি চোখ জলে ভাসে।
'তখনি যে তোরে করেছিনু মানা
শুনিলি না কেন হায়,
কি যে এ মন্ত্র শিখেছিলি তুই,
তাতে আজ প্রাণ যায়!
তোরে ছেড়ে আজ ফিরিব ঘরেতে
বল্ না কিসের সুখে!
এত কাল পরে কেন এসেছিলি,
অভাগী মায়ের বুকে!
সাথে ক'রে মোরে নিয়ে যা রে বাপ্,
ফেটে যায় হিয়া মোর—'
বিনাইয়া কাঁদে জননী তাহার—
বুকে ভাসে আঁখিলোর।

কুমীরের মুখে ভাষা নাই তো যে
সান্ত্বনা দেবে মায়,
হাত উঠাইয়া ললাটে দেখায়
অকথিত বেদনায়।
ছল ছল চোখে চাহিয়া সে রয়
অভাগী মায়ের মুখে,
তার পরে গিয়ে ডুব দিলো ধীরে
কাজল দীঘির বুকে।

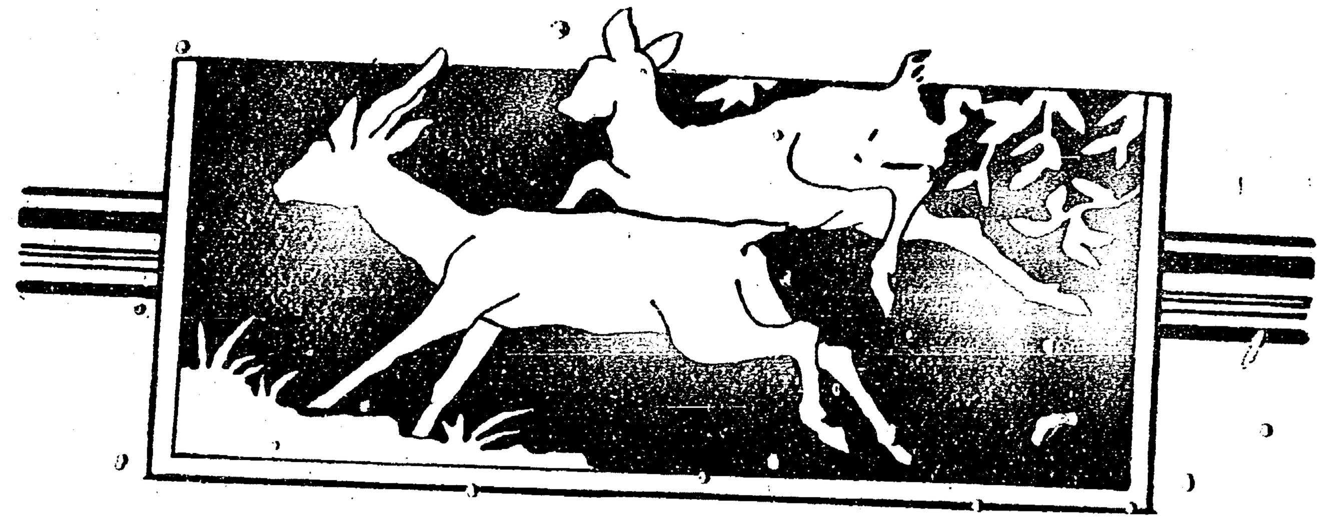

হিমালয় অভিযান

[প্রবন্ধ]

শ্রীনিখিলেশ সেন

যাদের মনে সত্যিকার সাহস আছে প্রকৃতির বাধার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার আহ্বান তারা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাই সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই মানুষ করে আসছে দুঃসাহসিক কাজ। তাই মানুষ আজ উড়ছে আকাশে, নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের তলায়; দুরন্ত সমুদ্র—দুর্গম পথের ওপর দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, উঠছে উঁচু পাহাড়ের শিখরে। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন একটা জায়গাও আজ নেই যেখানে মানুষ যায় নি বা যেতে চেষ্টা করে নি।

হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাহাড়; দুর্গমও বটে। সুতরাং সেখানে যে একদল মানুষ ওঠবার জন্য অনবরত চেষ্টা করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! হিমালয়ের প্রধান তিনটি শৃঙ্গ—এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নাঙ্গায় ওঠবার জন্য যে সব অভিযান হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে দেব।

এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯২৫০ ফুট। এই এভারেষ্টে ওঠবার জন্য প্রথম অভিযান হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। এর আগে এখানে ওঠবার চেষ্টা না করবার কারণ ইংরেজ জাতির উদ্যম বা কৌতূহলের অভাব নয়, এর কারণ এই যে এভারেষ্ট শৃঙ্গটি তিব্বতে অবস্থিত, এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তিব্বত গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক সম্বন্ধটা তেমন অন্তরঙ্গ ছিল না। এ ছাড়া আরও অন্যান্য কতকগুলো কারণ ছিল।

মহাযুদ্ধের আগে অনেক বার স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড ও জেনারেল সি. জি. ব্রুশ এভারেষ্টে ওঠবার মতলব করেছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সম্মতি পেতে অসুবিধা হয়। মহাযুদ্ধের পর এভারেষ্টে অভিযান করবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল। আলপাইন ক্লাব এবং রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি নামে দুটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান অনেক অর্থ সংগ্রহ করলেন, এবং হিমালয়ে ওঠবার অনুমতি নেবার জন্য কর্ণেল

হাওয়ার্ড বেরী নিজের খরচায় ভারতবর্ষে এলেন। তিব্বত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তিব্বতে ঢোকবার অনুমতিও পাওয়া গেল। অভিযানের নেতা হ'লেন ইয়ংহাজব্যাণ্ড ও ব্রুশ। অনেক বিখ্যাত পর্ব্বতারোহী এই দলে যোগ দিলেন।

যথা সময়ে যাত্রা করা হ'ল। কিন্তু যাত্রা শুভ হ'ল না। পথে নানা রকম বিপদ্ ঘটতে লাগল, এবং তিব্বতে দলের অনেকেই আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই যে একজন অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী ডাক্তার কেলাস হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন। যাই হোক, দলের অন্যান্য লোকেরা পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু পাহাড়ী ঝড়, কুয়াসা এবং বরফ পড়ার

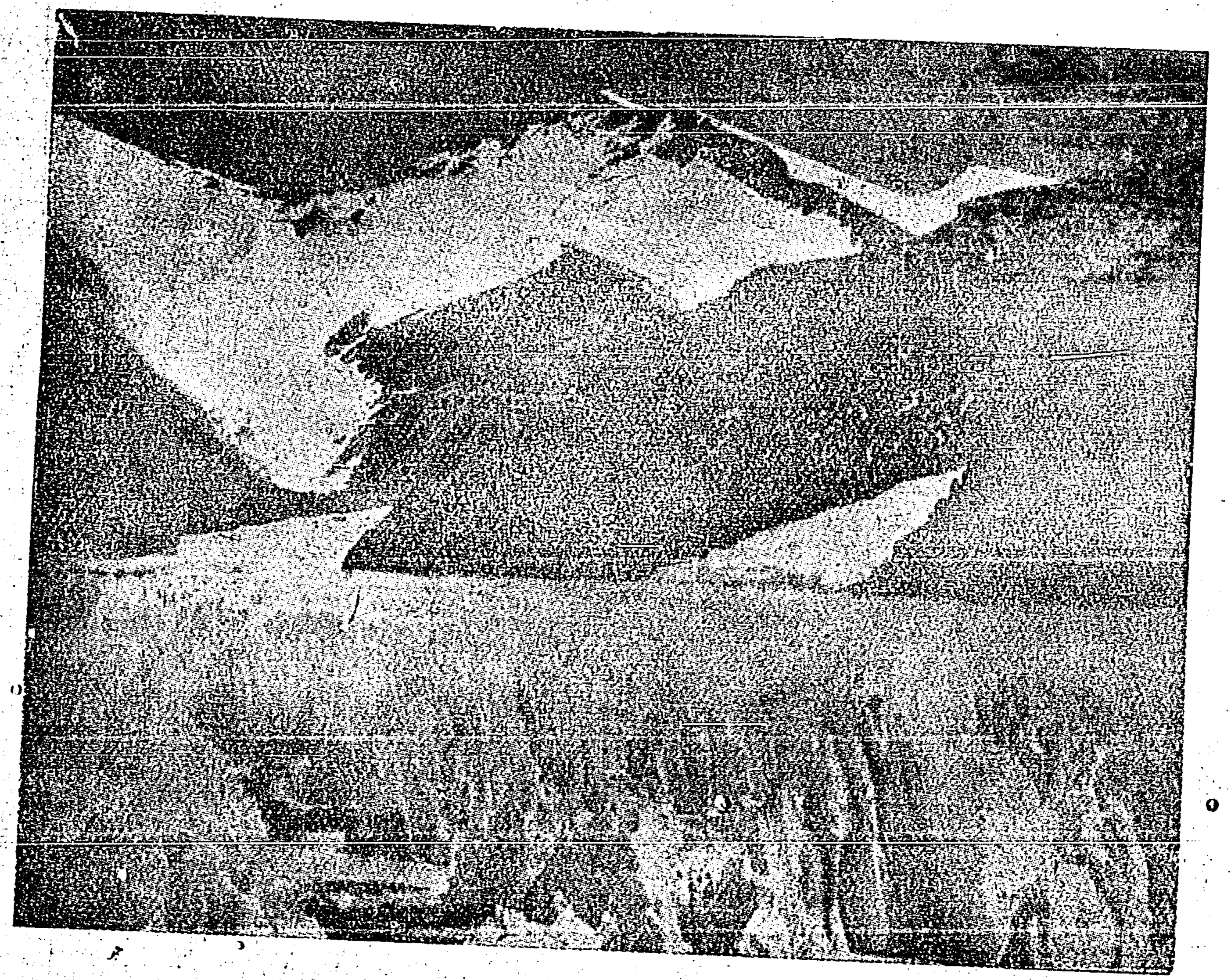

এভারেষ্টের পথে রংবাক্ তুষার-উপত্যকা

জন্য, ২৩,০০০ ফুটের বেশী কেউ উঠতে পারলেন না। তা' ছাড়া, তাঁরা যে পথে এভারেষ্টে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন সে পথটাও মোটেই সুবিধাজনক ছিল না।

দ্বিতীয় বার এভারেষ্টে ওঠবার চেষ্টা হ'ল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। এবার দলের নেতা হ'লেন ব্রুশ। ম্যালোরি, নর্টন, সমারভেল প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত পর্ব্বতারোহী

এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ

পায়ে হেঁটে মানুষ আজও এভারেষ্টের চূড়ায় উঠতে পারে নি। ১৯৩৩ সনে ফেলোজ ও লর্ড ক্লাইডসডেল এরোপ্লেনে এভারেষ্টের চূড়া পার হয়েছিলেন। ছবিতে তাঁদেরই অভিযান-পথ দেখান হয়েছে।

এবারের দলে যোগ দিলেন। পাহাড়ের ওপরে বেশী উঁচুতে বাতাস অত্যন্ত পাতলা, তাই নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর। তাই এবারে অভিযানকারীরা সঙ্গে অক্সিজেনের টিউব নিলেন। ম্যালোরি, নর্টন ও সমারভেল অক্সিজেনের সাহায্য না নিয়েই ২৬৯৮৫ ফুট উঠলেন। ক্রশ এবং আর কয়েকজন অক্সিজেন নিয়ে ২৭৩০০ ফুট উঠলেন। হয়ত তাঁরা আরও অনেক ওপরে উঠতে পারতেন, কিন্তু প্রকৃতিদেবী মানুষের পেছনে লাগলেন। এই সময়ে অক্সিজেনের টিউব হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। তা' ছাড়া বরফের চাঁই পড়তে আরম্ভ কর্‌ল। সুতরাং অভিযানকারীদের বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হ'ল।

তৃতীয় অভিযান হ'ল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। নেতা হ'লেন ক্রশ। এবারের অক্সিজেন টিউবগুলো ভাল ভাবে তৈরী করা হ'ল—যাতে খারাপ হয়ে যেতে না পারে। পুরোনো দলের ম্যালোরি, নর্টন, সমারভেল প্রভৃতি প্রায় সকলেই এবারেও যোগ দিলেন। তা ছাড়া, আরও কয়েকজন নতুন সুদক্ষ অভিযানকারী, বীথাম, হ্যাজার্ড, ওডেল ও আর্ভিন প্রভৃতি, এবারে এঁদের সঙ্গে রইলেন।

কিন্তু তিব্বতের সীমা পার হ'তে না হ'তেই দলের নেতা ক্রশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নর্টনকে নেতা করে নিয়ে দল এগিয়ে যেতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে বীথামও অসুস্থ হয়ে পড়লেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এগোতে লাগলেন। ২৮০০০ ফুট ওপরে উঠে সমারভেল হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এবং ঠিক কোন্ জায়গায় এসেছেন তা ভাল করে দেখবার জন্যে চোখের ঢাকা খোলাতে নর্টনের চোখ খারাপ হয়ে গেল। ২৮১০০ ফুট উঠে তিনি আর উঠতে পারলেন না। কিন্তু ম্যালোরি এবং আর্ভিন আরও ওপরে উঠতে লাগলেন। ২৬৮০০ ফুট ওপরে ষষ্ঠ শিবিরে ওডেল তাঁদের জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা আর ফিরে আসেন নি।

চতুর্থ অভিযান হ'ল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। দলের নেতা ছিলেন হিউ রাটলেজ। এবার অভিযানকারীদের সঙ্গে বেতারের যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত চল্‌ল। ২৭৪০০ ফুট ওপরে ষষ্ঠ শিবির তৈরী হ'ল। এর কিছু নীচেই ১৯২৪ সনের ষষ্ঠ শিবির

আবিষ্কৃত হ'ল। ষষ্ঠ শিবির থেকে উইন হ্যারিস্ ও ওয়েগার ওপরে উঠতে লাগলেন, কিন্তু তাঁরা ২৮১০০ ফুটের বেশী উঠতে পারলেন না। তাঁরা ফিরে এলেন। এবার স্মাইদ ও শিপটন চূড়ায় ওঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছু দূর উঠেই শিপটনের ভয়ানক পেটের যন্ত্রণা হ'তে লাগল। সুতরাং তিনি ফিরে এলেন। তখন স্মাইদ একলাই ওপরে উঠতে লাগলেন। কিন্তু তুষারপাতের জন্য তিনি উইন হ্যরিস ও ওয়েগারের চেয়ে বেশী উঠতে পারলেন না।

১৯৩৮ সনে পঞ্চম অভিযান হ'ল। এবারের নেতার নাম টিলম্যান। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্য এঁরা বেশী দূর উঠতেই পারলেন না। সুতরাং এভারেষ্ট আজও অপরাজিত রয়ে গেছে।

* * *

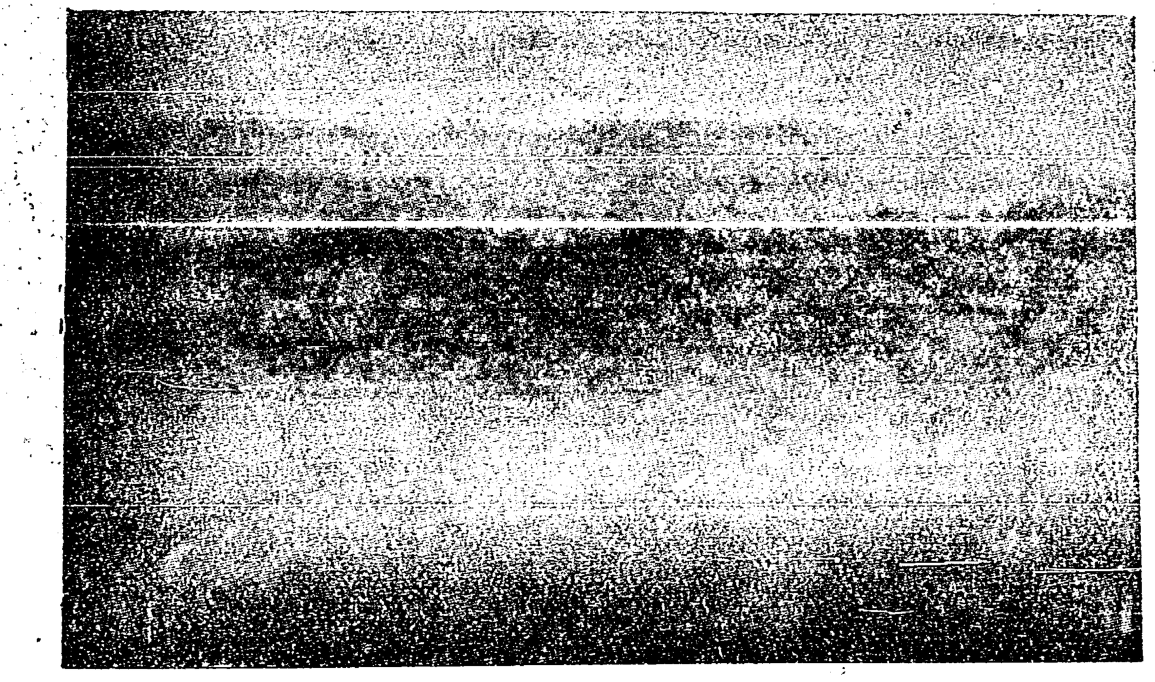

কাঞ্চনজঙ্ঘা

দার্জ্জিলিং থেকে তোলা ছবি। উচ্চতায় কাঞ্চনজঙ্ঘার আসন এভারেষ্টের পরেই।

কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উচ্চতা ২৮২২৫ ফুট। হিমালয় পর্ব্বতমালার শৃঙ্গগুলির মধ্যে উচ্চতায় এর স্থান এভারেষ্টের ঠিক পরেই।

কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে ওঠবার জন্য প্রথম অভিযান হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। অভিযানকারীরা ছিলেন সকলেই সুইট্জারল্যাণ্ডের লোক। এই দলের নেতা হয়েছিলেন য়্যালিষ্টার ক্রাউলি। তাঁরা দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ দিয়ে পাহাড়ের ওপর ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন,—অনেকখানি উঠেও ছিলেন। ২০০০০ ফুট ওপরে তাঁরা তাঁবু ফেলেন। কিন্তু আর বেশীদূর তাঁরা উঠতে পারলেন না, কারণ কাঞ্চনজঙ্ঘায় ওঠবার পথ সম্বন্ধে দলের কারুরই বিশেষ ধারণা ছিল না; তার ওপর অনবরত বরফের চাঁই ধ্বসে পড়ছিল। এ সময়ে পথ তৈরী করে নিয়ে ওপরে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না, তাই তাঁরা নামতে লাগলেন। কিন্তু দলের দুর্ভাগ্য যে তাঁরা

নিরাপদে নেমেও আসতে পারলেন না। বরফের চাঁই ধ্বসে পড়ার ফলে একজন পর্ব্বতারোহী এবং তিনজন কুলি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল।

দ্বিতীয় অভিযান হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকার নিউ ইয়র্কের একজন পর্ব্বতারোহী এবার চেষ্টা করেন। তাঁর নাম ছিল ফার্ম্মার। কাঞ্চনজঙ্ঘায় ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে সব ভারতীয় কুলি গিয়েছিল তারা নিরাপদে ফিরে এসেছিল।

তৃতীয় অভিযান হয় ১৯২৯ সনেই, শরৎকালে। এবারে এ দলে ছিলেন অনেক বিখ্যাত অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী। দলের নেতা হলেন ডাক্তার পল বয়ার। প্রথমটা তাঁরা একটু একটু করে অনেকটা ওপরে উঠলেন। কিন্তু ২৪০০০ ফুট ওপরে ওঠার পর আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ল। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁদের নেমে আসতে হ'ল।

চতুর্থ অভিযান হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। দলের নেতা ছিলেন প্রোফেসার ডাইরেনফার্থ। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইট্জারল্যাণ্ড এবং গ্রেট ব্রিটেনের অনেক বিখ্যাত পর্ব্বতারোহী এই দলে যোগ দেন। দলটি ৭ই এপ্রিল তারিখে দার্জ্জিলিং থেকে যাত্রা করে, এবং সিংলা বাজারে নেমে আসে। সেখান থেকে ওঠে রঙ্গীৎ উপত্যকায়, এবং সেখান থেকে যাত্রা ক'রে সিকিমের অন্তর্গত চাকুঙে পৌঁছোয়। সেখান থেকে কাং লা গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সকলে নেপাল রাজ্যের মধ্যে উপস্থিত হন। নেপালেরই একটি জায়গাতে ১৭০০০ ফুট উঁচুতে তাঁদের মূল তাঁবু স্থাপিত হয়। এখান থেকে তাঁরা ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেন। ২০০০০ ফুট ওঠবার পর একটি বরফ-চাঁই ধ্বসে পড়ার জন্য তাঁদের নেমে আসতে হয়। এই দুর্ঘটনার সময় দলের অধিকাংশ লোকই বরাতক্রমে বেঁচে যান, কেবল একজন কুলি মারা পড়ে। অন্য একটা পথ দিয়ে তাঁরা আবার ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দু'বার চেষ্টা করার পর দেখেন যে তা অসম্ভব। সুতরাং কাঞ্চনজঙ্ঘায় ওঠবার আশা তাঁরা ছেড়ে দেন।

* * * *

নাঙ্গা পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ২৬৬২০ ফুট। হিমালয়ের পর্ব্বতশৃঙ্গগুলির মধ্যে

উচ্চতায় এটি চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে, এবং হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গগুলির মধ্যে এটি সকলের চেয়ে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

হিমালয়ের ওপর মানুষ প্রথম অভিযান করে এই নাঙ্গা পর্ব্বতশৃঙ্গেই। প্রথম অভিযান হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। দলের নেতা ছিলেন একজন ইংরেজ। নাম তাঁর মামারি। তাঁর সঙ্গী ছিলেন আর দু'জন ইংরেজ—কোলি ও হেষ্টিংস। দু'জন ভারতীয় পাহাড়ী—গুমন সিং এবং রঘুবীর সিং এঁদের সঙ্গে ছিলেন। এঁরা উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়ে নাঙ্গা পর্ব্বতের ওপর ওঠবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু ওপরে উঠে তাঁরা দেখলেন যে নাঙ্গা পর্ব্বতশিখরের কিছু নীচেই এক তুষার-প্রান্তর, এবং সেখানে অনবরত বরফের ধ্বস নেমে আসছে। সুতরাং এখান দিয়ে আর ওপরে ওঠবার চেষ্টা করা বৃথা। তখন মামারি গুমন সিং এবং রঘুবীর সিংকে নিয়ে পূর্ব্ব দিক্ দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় অভিযান হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। এবার চেষ্টা করেন একদল জার্ম্মান্। এই দলের নেতা ছিলেন উইলি মার্কল। এঁরা উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করলেন। অনেক কষ্টের পর এঁরা ২৩০০০ ফুট ওপরে উঠলেন। এই সময় ভীষণভাবে তুষার পড়্তে আরম্ভ কর্‌ল। দলের লোকেরা অপেক্ষা করতে লাগলেন যে তুষারপাত কমলে পরে তাঁরা ওপরে উঠবেন। কিন্তু তুষারপাত না কমে ক্রমশঃ বাড়তে লাগ্‌ল। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁদের নেমে যেতে হ'ল। এই অভিযানে ন'জন লোক মারা পড়লেন। এঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ইউরোপীয়, বাকি ছ'জন ভারতবাসী।

অকৃতকার্য্য হয়েও মার্কল আশা ছাড়লেন না। তিনি নাঙ্গা পর্ব্বতে ওঠবার জন্য আবার আয়োজন করতে লাগলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে নাঙ্গা পর্ব্বতে ওঠবার জন্য তৃতীয় অভিযান হ'ল। এবারে মার্কলের সঙ্গে চল্‌লেন ১৮ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন ভারতীয় পাহাড়ী। ওপরে ওঠবার সময় সঙ্গীদের মধ্যে একজন নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন। এর জন্য পথে একদিন দেরী হয়ে গেল। যাই হোক, মার্কল ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ২৪৯৩৫ ফুট ওপরে উঠে তাঁবু খাটালেন। তখনও আকাশ পরিষ্কার।

সকলে ভাবছেন যে শীঘ্রই তাঁরা শিখরে পৌঁছুতে পারবেন। হঠাৎ ভীষণভাবে ঝড় এল। পরের দিনও ঝড় কমল না। তখন সকলে নামতে আরম্ভ করলেন। দু'দলে ভাগ হয়ে তাঁরা নামতে লাগলেন। বরফের আঘাতে মার্কলের একখানা হাত অকর্ম্মণ্য হয়ে গেল। একজনের পর একজন করে তাঁর সঙ্গীরা মারা যেতে লাগলেন। দলের মাত্র দু'জন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন—আংরেষ্টিং এবং গেলে। গেলে একজন পাহাড়ী। তাঁরা একটা বরফের গুহায় আশ্রয় নিলেন। মার্কলের তখন আর হাঁটবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তাঁকে ফেলে আংরেষ্টিং নীচে নামতে লাগলেন। কিন্তু গেলে মার্কলকে একলা ওই অবস্থায় ফেলে আংরেষ্টিংএর সঙ্গে নীচে নেমে গেলেন না। আহার এবং আশ্রয়হীন অবস্থায় এক সপ্তাহ ঝড়ের ভেতর দিয়ে চলার পর আংরেষ্টিং বেঁচে গেলেন, কিন্তু মার্কল ও গেলের আর কোন খবরই পাওয়া গেল না।

চতুর্থ অভিযান হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, এবং এবারের ফলই হয় সব চেয়ে শোচনীয়। এবারকার দলও ছিল প্রধানতঃ জার্ম্মান্‌দের। এই দলে ছিলেন ৭ জন অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী এবং দু'জন বৈজ্ঞানিক। এ ছাড়া ১২ জন সুদক্ষ ভারতীয় পাহাড়ী এবং মোট বইবার জন্য কয়েকজন কুলিও ছিল। এই দলের লোকেরাও উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করেন। ২০০৯০ ফুট ওপরে উঠে তাঁরা তাঁবু খাটালেন। কিন্তু আবহাওয়া ভয়ানক খারাপ যাচ্ছিল, এবং তুষার পড়ছিল বলে এ তাঁবুতে কেউ রইলেন না। কিছু দূর নেমে এসে ১৮৬০০ ফুট উঁচুতে সকলে তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিলেন। আরও কিছু নীচে ছিলেন ডাক্তার উলরিক লুফ্‌ট্। ওপরের তাঁবু থেকে তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল যে তিনি যেন ওপরে চলে আসেন। ডাক্তার লুফ্‌ট্ ওপরে এসে দেখলেন যে সেখানে তাঁবু বা লোকজনের কোন চিহ্ন নেই, শুধু রয়েছে একটা প্রকাণ্ড বরফের চাঁই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কয়েক জনের জিনিষপত্তর কিছু কিছু পাওয়া গেল, কিন্তু মৃতদেহের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। সাতজন ইউরোপীয় এবং ন'জন ভারতীয় পাহাড়ী এই অভিযানে মারা যান।

ছন্দের খেলা

[প্রবন্ধ]

শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা বিশেষ বয়সে কবিতা লিখ্‌বার কোন রকম প্রেরণা অনুভব করেন নি এমন শিক্ষিত লোক বিরল। "রামধনুর" গ্রাহক-গ্রাহিকা, তোমাদের সম্ভবতঃ অনেকেরই এই কবিত্বজনক বয়সটা চল্‌ছে। তোমাদের, তাই, আজ একটা খেলার কথা বলি। তোমাদের মধ্যে যা'রা অল্প-বিস্তর কবিতা লিখ্‌তে পার তা'দের এ খেলায় আর কোন "প্রবেশ মূল্য" লাগ্‌বে না।

যে কোন একটা 'আইডিয়া' নাও,—কোন ঘটনা বা বর্ণনার একটু টুক্‌রো। তা'র পরে সেটাকে বিভিন্ন ছন্দের কবিতায় ব্যক্ত ক'র্‌বার চেষ্টা কর। যেমন ধর, এই রকম একটা 'আইডিয়া' নিচ্ছি :—মাধবপুর ব'লে যে গ্রাম আর তা'র পাশে যে খাল তা'তে অসংখ্য মাছ; আর এই খালের মাছ ধ'রতে মাধবপুরের লোকেরা বড্ড ভালবাসে। এবার এই 'আইডিয়া'টাকে বিভিন্ন ছন্দের কবিতায় প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

খুব সোজা একটা ছন্দে প্রথমে হাত দেওয়া যাক্‌। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রধানতঃ যে ছন্দে লেখা, অথবা যে ছন্দে বাংলায় সনেট্‌ লেখার পদ্ধতি প্রচলিত, সেটা সরল ভাব, সোজাসুজি ভাব প্রকাশ ক'র্‌বার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ছন্দটা এই রকম :—

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান,
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্‌।"

এই ছন্দে ফেলে আমাদের 'আইডিয়া'টাকে এই রকম ভাবে রূপ দিতে পারি :—

রুই-কাতলের মেলা দেখিবারে চাও?
মাধবপুরের খালে সোজা চ'লে যাও।
কাতারে কাতারে লোক, এপারে ওপারে,
দিন রাত নাই কাজ, খালি মাছ মারে।

অথবা, কথাগুলো পরিবর্ত্তিত ক'রে ঐ ছন্দেই এ রকমও লেখা যেতে পারে :—

রুই-কাতলের বাসা দেখিয়াছ কি হে?
মাধবপুরের খালে দেখে এসো গিয়ে।
ছিপ্‌ ফেলে, জাল ফেলে, গাম্‌ছা কাপড়ে
জল ছেঁকে, দিন-রাত লোকে মাছ ধরে।

ছন্দটা অপরিবর্ত্তিত রেখে পংক্তি রচনা আরও কঠিন করা যেতে পারে, যদি প্রতি পংক্তিকে দু'ভাগ ক'রে তা'দের পরস্পরের ভেতরও মিল যোগান'র চেষ্টা করি। উদাহরণ স্বরূপ একটি বিখ্যাত বাংলা কবিতার কিছুটা উদ্ধৃত কর্‌তে পারি,—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল ল'য়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

এই ছন্দে আমাদের 'আইডিয়া'টা এইভাবে লেখা উচিত,—

রুই পুঁটি ছুটাছুটি করে সারাদিন,
মাধবপুরের খালে বিরামবিহীন।
রাশি রাশি গ্রামবাসী এপারে ওপারে,
'কোনো কাজ নাই আজ' ব'লি মাছ মারে।

এই পংক্তি রচনার উদাহরণটা প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণ দুটোর থেকে কিছুটা কঠিন, কেন না এতে পংক্তির শেষের মিল ছাড়াও পংক্তির ভেতরে 'পুঁটির' সঙ্গে 'ছুটি'র, 'রাশি'র সঙ্গে 'বাসী'র, 'কাজ'এর সঙ্গে 'আজ'এর মিল যোগাতে হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণটাকে আর একটু পরিবর্দ্ধিত ক'রে আর এক রকম ছন্দের অবতারণা করা যেতে পারে। এই ছন্দে বহু বৈষ্ণব কবিতা ইত্যাদি লেখা হ'য়েছে। যেমন,—

বরষার ঘোলা জলে, মাধবপুরের খালে
চিতল, বোয়াল, পুঁটি খেলে;

মাধবপুরের লোকে সব কাজ ফেলে রেখে
রাতদিন খালি ছিপ ফেলে।

ওপরের উদাহরণগুলোয় সহজেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হ'চ্ছে ছন্দের সাদাসিধে ভাব। কবিতায় কোন ভাব মোটামুটিভাবে প্রকাশ কর্‌বার পক্ষে হয়ত এগুলি যথেষ্ট, কিন্তু ছোটদের উপযোগী কবিতার ছন্দে যতটা গতি থাকা দরকার ততটা গতি সৃষ্টি কর্‌তে যেন এ সব ছন্দ পারে না। ছন্দের কিছুটা স্ফূর্ত্তি বিধান ক'রে ও কয়েকটা অলঙ্কার প্রয়োগ ক'রে আমরা আমাদের 'আইডিয়া'টাকে এইভাবেও প্রকাশ কর্‌তে পারি,—

মাধবপুরের খালে যবে
বরষা বিপুল গৌরবে
ভরি' দেয় কূলে কূলে জল,
কাতল, বোয়াল, পুঁটি, রুই,
জল কিছু বাড়া মাত্রই
কোথা হ'তে আসে দলে দল।
মাধবপুরের অধিবাসী
মুখে আর ধরে নাক' হাসি,
ছিপ আর চার হাতে নিয়ে;
মনে জানে আর সব মিছে,
কে বা আগে কে বা পড়ে পিছে,
দু'কূলে হাজির হয় গিয়ে।

এই উদাহরণটায় "বরষা বিপুল গৌরবে" বা "মনে জানে আর সব মিছে" প্রভৃতি যে সব অলঙ্কার প্রয়োগ করা হ'য়েছে তা' শিশু-কবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। নিছক গতিশীল ছন্দ আর বর্ণনায়, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় "য়্যাকৃশন্", তারই প্রাধান্য শিশু-কবিতায় বিশেষ উপযোগী। যেমন,—

মাধবপুরের ছোট্ট খালে সন্ধ্যা-সকাল বেলা,
রুই, মির্‌গেল, কাতল, বোয়াল নিত্য করে খেলা।

সে অঞ্চলে এবম্বিধ জনশ্রুতি আছে,
মাধবপুরের লোকের নাকি বড্ড রুচি মাছে।
লোভ না থাকুক্ এই বিষয়ে নেই কো কোনই ভুল,
মাছ শিকারের নামে তা'দের হাত করে চুল্‌বুল্।

এই রকম চঞ্চল ছন্দ ছোটদের অনুভূতিতে সহজেই আন্দোলন তোলে, ছন্দের ওঠাপড়ায় তা'দের মন ওঠে দুলে। শিশুকাব্যে এইজন্য "য়্যাক্‌সন"-রঞ্জিত, গতিশীল ছন্দের প্রয়োগ সব চেয়ে ফলপ্রদ।

ওপরের উদাহরণটার পংক্তিবিন্যাসকে সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে, পর্য্যায়ক্রমে একটা দীর্ঘ পংক্তির সঙ্গে একটা হ্রস্ব পংক্তি বসিয়ে আর এক রকম নতুন ছন্দ পেতে পারি। যেমন,—

মাধবপুরের ছোট্ট খালে সন্ধ্যা-সকাল বেলা
মাছের বসে মেলা।
মাধবপুরের লোকের মত মাছ ধরিবার বাই
সে অঞ্চলে নাই।

অথবা উল্টোভাবে, একটা হ্রস্ব পংক্তির সঙ্গে একটা দীর্ঘ পংক্তি পর্য্যায়ক্রমে সাজিয়ে এ রকমও হ'তে পারে,—

মাধবপুরের খালে
মাছ নেইকো,—কেউ শোনে নি বাপ্‌দাদাদের কালে।
মাধবপুরের লোকে
মাছ ধরে না,—অদ্যাবধি কেউ দেখে নি চোখে।

উদাহরণ অনায়াসেই আরও বাড়ান যেত, কিন্তু ছন্দের খেলাটা, আশা করি, ওপরের সাত আট রকম ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের ভেতর দিয়ে তোমাদের পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি। এবার ছোট ছোট 'আইডিয়া' নিয়ে তোমরাও চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারো।

রকমারি ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে তোমরা বিভিন্ন শিশু-মাসিকে প্রকাশিত শ্রীযুত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সুনির্ম্মল বসুর কবিতা,

শেষোক্ত লেখকের “ছন্দের টুং টাং” ও অন্যান্য কবিতার বই, ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “খাপছাড়া” ও বাংলা শিশুসাহিত্যের অতুলনীয় বই ৺সুকুমার রায় চৌধুরীর “আবোল-তাবোল” পড়্‌তে পারো। যা’রা ছন্দের ঝঙ্কার ছাড়া ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জান্‌তে চাও, তা’রা রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ” বইখানা যোগাড় ক’রে প’ড়্‌বে।

সমস্যার সমাধান

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্‌-সি

হরিহরবাবু কাজ করেন কলকাতার এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে। কাজ করেন বল্‌লে বোধ হয় ভুল বলা হয়, বলা উচিত—কলম চষেন,—মানে, পাড়াগাঁয়ে ব্যক্তিবিশেষে যেমন সারাদিন দারুণ রোদ-বৃষ্টি মাথায় ক’রে মাঠে লাঙ্গল চষে, হরিহরবাবুও ঠিক তেমনি করেন। তবে তফাৎ এইটুকু—তাঁর ভাগ্যে মাঠের বদলে জুটেছে খাতা, আর লাঙ্গলের বদলে কলম।

হরিহরবাবু সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে বা’র হয়ে যান আর বাড়ী ফেরেন যখন তখন রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটা। এই বারোটা ঘণ্টা পরিশ্রমের পর যখন ভদ্রলোক টল্‌তে টল্‌তে ডালহাউসী স্কোয়ার থেকে টালিগঞ্জে তাঁর আস্তানায় কোনও রকমে ফিরে আসেন তখন তাঁর দিকে তাকালে মনে হয় কে যেন তাঁর দেহটাকে নিংড়ে তার থেকে সব রস-কষ বার করে নিয়ে স্রেফ্‌ ছিব্‌ড়ে ক’রে ছেড়ে দিয়েছে। অফিস থেকে ফিরে এসেই রোজ দুটী খেয়ে নিয়েই তিনি শুয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরু করেন মড়ার মত ঘুমুতে। সারারাত্রির মধ্যে একবারও ওঠেন না, একবারও জাগেন না, এমন কি একটীবারও বোধ হয় পাশও ফেরেন না। কি অঘোরে যে তিনি ঘুমোন সমস্ত রাত্রি সে বোঝা গিয়েছিল সেইবার যেবার তাঁর বাড়ীতে একদিন রাত্রে হঠাৎ কি ক’রে আগুন লেগে যায়। বাড়ীশুদ্ধ লোক কি প্রাণপণ চেষ্টাই না করল তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে, কিন্তু ঘুম তাঁর কিছুতেই ভাঙ্গল না! অগত্যা, শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ছোট ভাই বিশ্বেশ্বর আর তাঁদের চাকর রঘুয়া তাঁকে তুলে এক রকম কাঁধে করেই বাইরে নিয়ে আসে—ঘুমন্ত অবস্থাতেই!

যাই হোক, এ হেন হরিহরবাবু, সমস্ত দিন যাঁর শরীরের উপর দিয়ে চলে এই রকম অমানুষিক অত্যাচার, যার ফলে তাঁকে রাত্রিটা এক রকম অজ্ঞান হয়েই কাটিয়ে দিতে হয়—তাঁর জীবনটা

তা হ’লে কি নীরসভাবেই না কাটে! একটা মানুষের জীবনে কোন আনন্দ নেই, সারা জীবনটা শুধু হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেই কি কেটে যাবে? মানুষ হয়ে জন্মে তাঁর লাভটা কি হ’ল তা হ’লে? তা’র চেয়ে বরং গরু কিংবা ঘোড়া হয়ে জন্মালেই পারতেন; এমন কি তাল গাছ বা ইটের পাঁজা হ’লেও তাঁর এর চেয়ে ক্ষতি হ’ত না, নিশ্চয়ই। এ সব কথা যে কোন লোকেরই মনে হ’তে পারে—আর হওয়া অন্যায়ও নয়। কিন্তু, হরিহরবাবুর জীবনটা ঠিক নীরসভাবেই কাটে না। তিনি চতুর লোক। সপ্তাহের ছয়টা দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের শোধ তোলেন তিনি একটা দিনে, মানে,—রবিবারে। তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটীতে প্রতি রবিবারে এক বিরাট জমাটী আড্ডা বসে। কখনও চলে গান-বাজনা, কখনও বসে তাসের আড্ডা, কখনও বা সব কিছু ফেলে সুরু হয় প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ—এ সবের সঙ্গে সঙ্গে পান-সিগারেট, চা-বিস্কুট্‌ চলে মাঝে মাঝেই। এক কথায়, রবিবারের সারাটা দিন হরিহরবাবুর বাড়ীতে চলে এক তাণ্ডব লীলা আর সেই লীলায় তাঁর যে সব বন্ধু যোগ দেন তাঁরা সব কলকাতার এক এক প্রান্ত থেকে এসে হাজির হন; কেউ বাগবাজার, কেউ শ্যামবাজার, কেউ এণ্টালি,—এমন কি বরাহনগর থেকেও আসেন নাকি দু’ একজন। ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ; এ সব জায়গা থেকে ত’ আসেন অনেকেই। রবিবারের দিনটা এমনি হুল্লোড় ক’রে কাটান ব’লেই সপ্তাহের ছয়টা দিন তিনি তাঁর দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধটা বজায় রেখে চল্‌তে পারেন কোনও রকমে।

সেদিন মঙ্গলবার। হরিহরবাবু রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় বাড়ী ফিরলেন অফিস থেকে যেমন অন্যান্য দিন ফেরেন; তবে অন্যান্য দিন এ সময় তাঁর দেহ থাকে ক্লান্তিতে ভ’রে, আজ কিন্তু তাঁ’র মুখে কি যেন একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

হরিহরবাবু হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস্‌লেন। কিন্তু কি একটা ভাবনায় তাঁর ভাল ক’রে খাওয়াই হ’ল না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন—“কি রে হরি, কিছুই খেলি নে যে? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি?”

—“না মা, রান্না খারাপ হয় নি ত’, রান্না ত’ বেশ ভালই হয়েছে।”—বলে হরিহরবাবু উঠে পড়লেন। আঁচিয়ে নিয়ে অন্য দিনের মত তখনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। অন্যদিন বিছানার সঙ্গে তাঁর পিঠ ঠেকাতে না ঠেকাতে তিনি ঘুমিয়ে পাথর হয়ে যান। আজ কিন্তু বিছানায় শোয়ার পর প্রায় ঘণ্টা-খানেক পর্য্যন্ত তিনি এ পাশ ও পাশ করতে লাগলেন। এ পাশ ফিরে কি একটা ভাবেন খানিকক্ষণ তার পর ও পাশ ফেরেন; ও পাশ ফিরে আবার কি ভাবেন খানিকক্ষণ, আবার এ পাশ ফেরেন।

তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁর বিধবা বোন বিজলী আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লেন—বসে জিজ্ঞাসা করলেন—“দাদা, তোমার কি কোনও রকম শরীর খারাপ বোধ হ’চ্ছে?”

হরিহরবাবু শুধু বললেন—"না,"—বলেই আবার তাঁর বোনের দিকে পিছন ক'রে পাশ ফিরে শুলেন।

বিজলী আস্তে আস্তে উঠে গেলেন একটু বেশ চিন্তিত ভাবেই। তাঁর দাদাকে বিছানায় শোয়ার পর এ রকম জেগে কাটাতে ত' তিনি কোনও দিন দেখেন নি। অসুখও ত' করে নি কোনও রকম—তবে?

যাই হোক, হরিহরবাবু খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লেন অবশ্য সেদিনকার মত। পরদিন সকালে উঠে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে অফিস চলে গেলেন। তখনও, কিন্তু তাঁর মুখে একটা চিন্তার ছাপ লেগে রয়েছে।

অফিস গিয়েও, কিন্তু, তাঁর সে ভাব কাটল না। কাজ করতে করতে মনটা তাঁর মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে উঠছে। অফিসের লোকেরাও একটু বেশ আশ্চর্য্য হ'ল বৈ কি আজ। হরিহরবাবুর এক মনে কাজ করাটা অফিসে একটা গল্প-কথা হ'য়ে উঠেছে। আজ সেই হরিহরবাবুই কাজ করতে করতে কত বার যে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছেন তা'র ঠিক নেই। একজন ত' একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেললেন—"হরিবাবু, আপনার বাড়ীতে কি কিছু—?"

হরিবাবু বাধা দিয়ে বললেন,—"না, না, কিছু হয় নি,"—ব'লেই আবার কাজ করতে সুরু করে দিলেন।

আজ যখন বাড়ী ফিরলেন হরিহরবাবু তখন তাঁর মনের মাঝে যেন কালকের চেয়েও আরো বেশী অস্বস্তি বিরাজ করছে মনে হ'ল। কাল খেতে বসে তবু কিছু খেয়েছিলেন, আজ আর কিছু খেতেই পারলেন না। খেয়ে উঠে আজ চিরদিনের অভ্যাসমত বিছানাতে গিয়েও শুলেন না; ছাদে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন।

হরিহরবাবু যখন ছাদে গিয়ে অস্থির ভাবে পায়চারী করছিলেন তখন নীচে তাঁর মা, বোন, ছোট ভাই, সকলের মধ্যে মহা এক আলোচনা চলেছে তাঁর এই মানসিক চাঞ্চল্যের বিষয় নিয়ে। এঁদের সকলেরই দৃঢ় ধারণা যে তাঁর অফিসে নিশ্চয়ই একটা কিছু মারাত্মক রকমের গণ্ডগোল হয়েছে।

পরদিন; অফিসে গিয়ে হরিবাবু স্থির হয়ে কাজ করতে পারলেন না কিছুতেই। এমন কি, বড়বাবু হরিবাবুকে ডেকে একটু ঠাট্টা করেই বললেন—"হরিবাবু, আপনার এই হিসাবটার এইখানে যে একটু ভুল করেছেন, দেখছি! আজ পনেরো বছরের মধ্যে এ রকম সামান্য ভুলও ত' কখনও হয় নি! আজ যে চাঁদে কলঙ্ক হয়ে গেল; ব্যাপার কি হরিবাবু?"

হরিহরবাবু মহা লজ্জিত হয়েই ফিরে এলেন বড়বাবুর ঘর থেকে।

সেদিন যখন বাড়ী ফিরলেন তখন, তাঁর মুখচোখের অবস্থা দেখে তাঁর মা একরকম কেঁদেই ফেললেন। হরিবাবুকে কোনও কথা বলতে তাঁর আর সাহস হ'ল না। তাঁর মেজ ছেলে বিশ্বেশ্বরকে ডেকে বললেন, "বাবা বিশু, তোর দাদার কি হ'ল—কিছুই যে বুঝতে পারছি নে! তোর কাকাবাবুকে কি একবার আসতে লিখে দিবি? যা ভাল হয় কর্ বাবা!" বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল।

খানিক পরে হরিবাবু নিজেই তাঁর মার কাছে এলেন। তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম তিনি নিজে থেকে কথা বললেন। তাঁর মার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, তোমার বিপিনকে মনে আছে?"

তাঁর মা বুঝতে পারলেন না ঠিক—জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোন্ বিপিন, বাবা?"

হরিবাবু বললেন, "আমার বন্ধু সুবোধের খুড়তুতো ভাই বিপিন। সুবোধের সঙ্গে এসেছে কত দিন আমাদের এখানে—তাস খেলতে। তোমাকে এসে একদিন প্রণাম করল।"

হরিবাবুর মা বললেন,—"ঠিক মনে করতে পারছি নে ত' বাবা। নামটা যেন একটু একটু মনে পড়ছে, কিন্তু, তা'র চেহারাটা ত' একেবারেই মনে আসছে না!"

হরিবাবু আস্তে আস্তে উঠে গেলেন সেখান থেকে। তাঁর ঘরে যাওয়ার পথে বারান্দায় দেখা হ'ল তাঁর বোনের সঙ্গে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজু, বিপিনকে জানিস্ ত'?"

বিজলী একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ বিপিন, দাদা?"

হরিবাবু বললেন, "সুবোধের খুড়তুতো ভাই—"

বিজলী ওঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—"ও, সেই বিপিনবাবু—তুমি একদিন যাকে চা ক'রে দিতে বললে আমাকে?"

হরিবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বিপিন, তাকে দেখেছিস্ তুই কোনও দিন?"

বিজলী প্রথমে অবাক্ হ'য়ে গেলেন তাঁর দাদার কথা শুনে। বললেন, "তাঁকে দেখব কি ক'রে। আমি কি তোমার কোনও বন্ধুর সামনে বা'র হই?"

হরিবাবু হতাশ হয়ে চলে গেলেন।

একটু পরে তিনি বিশ্বেশ্বরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। বিশ্বেশ্বর গিয়ে দেখল যে হরিবাবু তাঁর ঘরে অতি অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন, দৃষ্টি তাঁর মাটির দিকে নিবদ্ধ। আস্তে আস্তে সে বলল, "আমাকে ডেকেছ, দাদা?"

হরিবাবু মুখ তুলে বললেন, "হ্যাঁ, শোন্—তুই বিপিনকে দেখেছিস?"

বিশ্বেশ্বর প্রথমটা তার মার এবং দিদির মতই মুস্কিলে পড়ল—তার দাদা কোন্ বিপিনের কথা জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে না পেরে।

অবশেষে তার দাদা যখন তাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে বিপিন কে, তখন সে বল্লে শুধু—"কি জানি, দাদা! তোমার কত বন্ধুই ত' রবিবারে আসেন, আমি অত লক্ষ্য করি নি। আর, তা ছাড়া, আমি ত' বেশীর ভাগ রবিবারে বালিগঞ্জে মাসীমার বাড়ীতেই কাটাই।"

হরিবাবু নিরাশভাবেই বল্লেন, "আচ্ছা, যা, খোকাকে একবার পাঠিয়ে দিস।"—ব'লে আবার তেমনি অস্থিরভাবেই পায়চারী করতে লাগলেন।

বিশ্বেশ্বর চলে গেলে একটু পরেই প্রবেশ করল হরিবাবুর ছোট ভাই খোকা—বয়স বোধ হয় নয় কি দশ বৎসর হবে। খোকা ঘরে ঢুকতেই হরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, বিপিনবাবুকে দেখেছিস্ ত'? সেই সেদিন—তোকে যিনি কাছে ডাকলেন—"

খোকা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই খুব মোটা—"

হরিবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বল্লেন,—"দূর্, সে ত' দিব্যেন্দু, সেই রোগা মত—"

খোকা এবার খুব আশান্বিত হয়ে বল্লে, "ওহো, বুঝ্তে পেরেছি; খুব রোগা, মাথায় টাক ত'?"

হরিবাবু এবার বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বল্লেন, "না, সে নয়,—সে যতীন।"

খোকা এবার একেবারে যেন অকূল সাগরে পড়ে গেল, বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বল্লে—"তবে কে?"

হরিবাবু কষে এক ধমক দিয়ে বল্লেন,—"কেউ নয়, বেরো এখান থেকে।"

খোকা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালাল সেখান থেকে—একেবারে তার মার কাছে। মার কাছে গিয়েই সে কেঁদে ফেল্ল।

হরিহরবাবুর অস্থিরতা ক্রমশঃই বাড়তে লাগ্‌ল। তাঁর মা তাঁকে অনেক বলে কয়ে একটু শোয়ালেন।...শুলে কি হবে? একটু পরেই আবার উঠে বস্লেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে অনেকক্ষণ কি ভাবলেন, তার পর আবার শুয়ে পড়্লেন। এমনি করতে করতে রাত প্রায় বারোটা বাজ্‌ল। খোকা বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদ্তে কাঁদ্তে। তার বড়দা'র কাছে কোনওদিন যে সে একটুও তাড়া খায় নি। বিশ্বেশ্বরও ঘুমিয়েছে। বিজলী তাঁর দাদাকে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাক্তে দেখে একটু আগে শুতে গেছেন। কেবল হরিবাবুর মায়ের চোখেই ঘুম নেই। তাঁর আর হরির ঘর পাশাপাশি; মাঝখানের দরজাটা খোলা রয়েছে।

রাত্রি তখন একটা; হরিবাবু যেন উন্মাদ হয়ে উঠ্‌লেন—একবার ওঠেন, একবার বসেন, একবার পায়চারী করেন, আবার হয়তো শুয়ে পড়েন।

হরিবাবুর মা কি করবেন ভেবে পান না।

হরিবাবু গিয়ে হঠাৎ তাঁর মাকে বল্লেন, "মা, দশটা টাকা দাও ত'।" হরিবাবুর সমস্ত টাকাকড়ি সব তাঁর মার কাছেই থাকৃত।

তাঁর মা অত্যন্ত ভয় পান—টাকা বার করতে করতে বলেন, "টাকা কি হবে, বাবা?" হরিবাবু শুধু বল্লেন, "দাও ত', দরকার আছে।"

তাঁর মা দশটা টাকা হরিবাবুর হাতে দিয়ে বল্লেন,—"বিশুকে একবার ডাকব?" তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ভরা।

হরিবাবু বল্লেন, "না না, বিশুকে ডাকতে হবে না।"—ব'লেই একটা জামা গায়ে দিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে রাস্তায় বার হ'য়ে পড়লেন।

হরিবাবুর মা জানালা দিয়ে আকুলভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি দেখলেন, রাস্তা দিয়ে একখানা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, সেটাকে থামিয়ে হরিহরবাবু তা'তে উঠে পড়লেন। তারপরেই ট্যাক্সি ছুটল বিদ্যুৎ-বেগে।

হরিবাবুর মা বিশ্বেশ্বর ও বিজলীকে ডেকে তুল্লেন। মায়ের মুখে সব কথা শুনে ওরাও মহা চিন্তিত হয়ে পড়্‌ল। তাদের দাদাকে তারা কখনও ত' এ রকম চঞ্চল হ'তে দেখে নি! আজ ত' তিনি প্রায় উন্মাদই হ'য়ে উঠেছেন।...বিপিনবাবুর কথা তিনি সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছেন একে একে। এই বিপিনবাবুকে নিয়েই নিশ্চয় ঘটেছে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড। ওদের মহা দুশ্চিন্তায় সময় কাটতে লাগ্‌ল।

...এত রাত্রে হঠাৎ ট্যাক্সি করে বার হ'য়ে গেলেন পাগলের মত! কোনও খুন-খারাবি কিছু হবে না ত'?"

ওদিকে হরিবাবু ট্যাক্সিওয়ালাকে বল্লেন—"বরানগর।"

ট্যাক্সি, রসা রোড দিয়ে চল্ল নক্ষত্রবেগে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ট্যাক্সি এসে থামল সুবোধবাবুদের বাড়ীর সামনে।

সমস্ত পাড়া নিঝুম—নিস্তব্ধ। হরিবাবু ট্যাক্সি থেকে নেমে সজোরে দরজায় কড়া নাড়লেন। সুবোধবাবুর বুড়ো বাপ নীচের একটা ঘরেই শুতেন। তিনি কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। এত রাত্রে হরিবাবুকে দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন প্রথমটায়। তার পর একটু ধাতস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এত রাত্রে যে বাবা, কি দরকার? সুবোধকে ডাকৃব?"

হরিহরবাবু শুধু বল্লেন—"না, সুবোধকে দরকার নেই, বিপিনকে যদি একটু কষ্ট করে ডেকে দেন।" সুবোধবাবুর বাবা বল্লেন,—"বস, বাবা! আমি ডেকে দিচ্ছি বিপিনকে।"

হরিহরবাবু বল্লেন,—"বসবার দরকার নেই, আপনি শুধু একবার বিপিনকে ডেকে দিন।"

সুবোধবাবুর বাবা চলে গেলেন ডাকতে বিপিনবাবুকে। একটু পরেই বিপিনবাবু নেমে এলেন। বিপিনবাবু এসে হরিবাবুর চেহারা দেখে একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লেন। চোখ দুটো তাঁর লাল টক্ টক্ করছে তিন দিন না ঘুমিয়ে, চুলগুলি উস্কো-খুস্কো। অত্যন্ত অভিভূতভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাত্রে কি খবর, হরিদা'?"

হরিবাবু বিপিনের মুখের দিকে অল্প খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "হয়ে গেছে,—আচ্ছা।"—ব'লেই ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠ্‌লেন। ট্যাক্সি আবার ছুট্‌ল কলকাতার দিকে।

বিপিনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে খানিকক্ষণ।

ঘণ্টাখানেক বাদে হরিবাবু বাড়ী ফিরে এলেন। রাত তখন প্রায় তিনটে। হরিবাবুর মা, বোন, ভাই সকলেই দেখলেন যে হরিবাবুর মুখ থেকে সে দুশ্চিন্তার রেখা একেবারে মুছে গেছে—সে জায়গায় একটা পরম শান্তি বিরাজ করছে।

জামাটি খুলেই তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল বাবা? কোথায় গিয়েছিলি?"

হরিবাবুর চোখে তখন সারারাজ্যের ঘুম নেমেছে। তিনি চোখ বুঁজেই একটু মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন অতি জড়িতভাবেই—"জান, মা, বিপিনের গোঁফ আছে। আমার এক মহাসমস্যা বেধেছিল—" বল্‌তে বল্‌তে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, কথা আর শেষ হ'ল না।

বিপিনের গোঁফ আছে কি নেই—এই যে মহা সমস্যা হরিহরবাবুর জীবনে বেধেছিল তার অবশ্য সমাধান হ'ল কিন্তু আমার জীবনের সমস্যা কিন্তু এখনও সমাধান হয় নি। পাটনায় আমার যে মেজমামা থাকেন তাঁর গোঁফ আছে কি না তা আমি আজ পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারি নি। আমারও দিন বড় অস্বস্তিতে কাট্‌ছে। আমার এ সমস্যার যেদিন সমাধান হ'বে তোমাদের জানাব সেদিন। তোমাদের কারও এ রকম সমস্যা বেধেছে নাকি?

"মেস্‌মেরিজ্‌ম্"

[প্রবন্ধ]

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি. এস্-সি

"মেস্‌মেরিজ্‌ম্" কথাটা জার্ম্মান্ পণ্ডিত মেস্‌মারের (জন্ম ১৭৩৩, মৃত্যু—১৮১৫) নামানুসারে হইয়াছে। কথাটার বাঙ্গালা কেহ কেহ করিয়াছেন

'সম্মোহন বিদ্যা' বা 'সম্মোহন-তত্ত্ব'। কিন্তু 'মেস্‌মেরিজ্‌ম্' কথাটাই এখন অনেকটা বাঙ্গালার মত হইয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া 'সম্মোহন' কথাটা সাধারণতঃ একটু খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মেস্‌মেরিজ্‌ম্ দ্বারা কিন্তু ভাল মন্দ দুই-ই করা যাইতে পারে।

মেস্‌মার মেস্‌মেরিজ্‌মের আবিষ্কর্ত্তা না বলিয়া পুনরাবিষ্কর্ত্তা এরূপ বলাই উচিত। অনেক আবিষ্কারই ধরিতে গেলে এই রকম পুনরাবিষ্কার,—অথবা আবিষ্কৃত সত্যকে জগতের কাছে সুপ্রচারিত করা।

আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশে এমন ঘটনা ঘটিত বা ঘটে যাহার পূর্ব্বে কোনও সঙ্গত স্বাভাবিক কারণ দেওয়া যাইত না। আমাদের দেশে তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া অনেকে ঔষধ পাইয়া আরোগ্য হইয়াছে। রোগী বা তাহার কোন নিকট আত্মীয় উপবাস করিয়া মন্দিরের আঙ্গিনায় শুইয়া থাকে। দুই একদিন পরে তাহারা স্বপ্ন দেখে যেন কেহ বলিতেছে—সকালে পুকুরের দক্ষিণ কোণে যে গাছটি দেখিতে পাইবে তাহার এক টুক্‌রা শিকড় বাটিয়া খাইলেই রোগ আরোগ্য হইবে।

তোমরা ভাবিতেছ, আমাদের দেশ কুসংস্কারাপন্ন, এখানেই ঐরূপ সম্ভব। কিন্তু এরূপ সংস্কার সব দেশেই অল্প-বিস্তর আছে। ফ্রান্সে লুর্দে নগরীতে এক গীর্জ্জা আছে, সেখানেও বিস্তর লোক আসিয়া নিজেদের বা আত্মীয়দের রোগের ঔষধ বা অন্য বিপত্তি মুক্তির আশায় হত্যা দিয়া থাকে।

বিশ্বাসের দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার আমাদের দেশে আরও অনেক প্রণালী আছে। মাদুলী ব্যবহার করিয়া অনেক রোগমুক্তির কথা শুনা যায়। হাঁপানি ও অম্লশূলে নাকি অনেকের উপকার হয়,—অনেক বন্ধ্যার সন্তান হয়। কাহারও কাহারও জলপড়া খাইয়া অনেকের রোগ আরোগ্য হইয়াছে শুনা যায়। লোকে খানিকটা জল লইয়া গুণীর কাছে যায়, তিনি তাহার উপর মন্ত্র পড়িয়া দেন। রোগী সেই জল সেবন করে। এইরূপ অনেক গুণী নাকি ফুঁ দিয়াও রোগ আরোগ্য করেন।

শুনা যায় মেস্‌মার এক অল্পবয়স্কা দাসীর ছেলে ঘুম পাড়ান দেখিয়া নিজের

প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে দাসী ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইবার সময় 'খোকা ঘুমুলো—খোকা ঘুমুলো' এই কথা বার বার বলিতে থাকে আর তাহাকে কখনও বা দোল দিতে থাকে, কখনও চাপড়াইতে থাকে। ফলে খোকা ঘুমাইয়া পড়ে। এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে সেই দাসী না থাকিলে খোকাকে ঘুম পাড়ান শক্ত হইত।

মেস্‌মার তাঁহার রোগীদিগকে অন্ধকারময় গৃহে ইজিচেয়ারে বসাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'ঘুমাইয়া পড়, ঘুমাইয়া পড়'—এক কথা বার বার বলিতেন এবং নিজের হাত রোগীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত গাত্র স্পর্শ না করিয়া টানিয়া যাইতেন। তিনি রোগীদের বুঝাইতেন (এবং নিজেও ঐরূপ বুঝিতেন)—প্রচুর 'য়্যানিমাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্' (Animal magnetism) আছে; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হাত নাড়িয়া 'পাস' (pass) দিবার সময় ঐ চুম্বক-শক্তি রোগীর দেহে সংক্রমিত হইয়া তাহাকে নিদ্রাতুর করে।

প্রথম প্রথম এক-একটি রোগীকে ঘুম পাড়াইতে যথেষ্ট সময় লাগিত। কোন কোন লোকে একবারেই উক্তরূপে নিদ্রাবিষ্ট হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার নিদ্রাবিষ্ট হয় তাহাকে দ্বিতীয় বার অতি সহজেই মেস্‌মেরাইজ্‌ করা যায়। এবং পরবর্ত্তী কালে দুই একটা পাসের দ্বারাই সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

এই মেস্‌মেরিক নিদ্রা সাধারণ নিদ্রা হইতে পৃথক্। এইরূপ নিদ্রা মেস্‌মেরাইজার ছাড়া অন্য কেহ সহজে ভাঙ্গাইতে পারে না। আর এই নিদ্রার সময়ে রোগীকে যদি কয়েকবার বলা যায় 'তোমার রোগ ভাল হইতেছে,—রোগ ভাল হইতেছে' তাহা হইলে অনেক পীড়ার অদ্ভুত আরোগ্যলাভ দেখা যায়।

মেস্‌মার শেষ জীবনে পারী নগরে বাস করিয়া মেস্‌মেরিজ্‌ম্ দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতেন। সন্ধ্যার সময় ঈষৎ আলোকিত একটি শান্ত-সুন্দর 'হলে' তাঁহার রোগীরা সমবেত হইয়া নিজের নিজের আসনে বসিয়া থাকিতেন। মেস্‌মারের এই সময় খুব পশার হইয়াছিল। রোগীদের ধারণা ছিল তাঁহার দেখা পাইলেই রোগ আরোগ্য হইবে। লোকের এইরূপ মনের অবস্থা তাঁহার কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। তিনি আসিয়া দুটি-একটি 'পাস' দিয়া 'ঘুমাইয়া পড়ুন'

বলিতেই অধিকাংশ রোগী মেস্‌মেরিক্ নিদ্রায় অভিভূত হইত। তখন তিনি তাহাদের নিকটে গিয়া যাহার যে রোগ হইয়াছে তাহার সেই সেই রোগ সারিয়া যাইতেছে এইরূপ ধারণা করাইতেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'সাজেশ্চন্' দেওয়া। এইরূপ ভাবে তাহারা খানিকক্ষণ নিদ্রাগত থাকিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইত। বহু লোকের ইহাতে উপকার হইত—অনেকের রোগ অদ্ভুত রকমে সারিয়া যাইত।

মেস্‌মেরিজ্‌ম্ ঐ ভাবে আবিষ্কারের পর হইতে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে এবং জার্ম্মানীতে মেস্‌মারের অনেক শিষ্য হয়। তাঁহারা নানা পদ্ধতিতে লোককে মেস্‌মেরাইজ্‌ড্‌ করিয়া তাহাদের রোগ আরোগ্য করিতে লাগিলেন। দু'-একজন সার্জ্জন্ রোগীকে ঐ ভাবে নিদ্রিত করিয়া বলিতেন, 'তোমাদের দেহে অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেছি, কিন্তু তোমাদের কিছুই লাগিতেছে না।' বহু অস্ত্র-চিকিৎসাও ঐ ভাবে নিষ্পাদিত হইত। ঐ সময়ে ক্লোরোফর্‌মের বেদনা-অনুভূতি লোপ করিবার শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় মেস্‌মেরিজ্‌ম্ ঐ ভাবে ব্যবহার হওয়া ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায়।

কতক লোকে ক্রমশঃ মেস্‌মারের বিপক্ষ দলভুক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা তাঁহার কার্য্যকে বুজরুকী বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। আবার অনেক ধার্ম্মিক খৃষ্টান তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলিতে থাকেন যীশুখ্রীষ্ট যে অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিয়াছিলেন, পঙ্গুকে সুস্থপদ করিয়াছিলেন—সে ঐরূপ মেস্‌মেরিক্ শক্তির প্রভাবে।

পরবর্ত্তীকালে শারীর বিধানবিদ্‌গণ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নানা রকম গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মেসমেরিক্ শক্তি বলিয়া কোনও শক্তি মেস্‌মেরাইজারের নাই। সে কেবল রোগীর কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত করিবার উপযুক্ত কথাবার্ত্তার (বাঙ্ময় আভাস) সাহায্য নেয়। সেই আভাস (Suggestion) যদি রোগীর মনের কল্পনাশক্তি উদ্রিক্ত করিয়া তাহার মনে রোগ সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মাইয়া দেয় তবে ঐ সংস্কারই সকল কার্য্য করে। তবে যে মেস্‌মেরাইজারের 'পাস' দেওয়া, ঘর অন্ধকার করা, নানা বক্তৃতা করিয়া নিজের শক্তির কথা জাহির করা—এ সব কি? ঐ সব শুধু ভড়ং মাত্র।

কোন্ 'তড়ং-কার' চিত্তকে কিরূপ অভিভূত করে তাহা বলা যায় না। গেরুয়া-বসন, লম্বা লম্বা ধর্ম্ম কথা কাহারও চিত্তকে জয় করে, সে ভাবে লোকটি কি ধার্ম্মিক! আবার অন্যে ভাবে লোকটা কি ভণ্ড!

কথা কাহারও মনকে কিরূপ অভিভূত করে তাহা বুঝাইবার জন্য নীচের দৃষ্টান্তটি লওয়া যাইতে পারে। একজন প্রবীণ লোক, ধর তাঁহার নাম রামবাবু, বৈঠকখানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। এমন সময় হরি আসিয়া বলিল, "চাটুয্যে মশাই, শুনেছেন কি বিষম ব্যাপার! হেরিং ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে!" হরি জ্যেঠা ছোকর্রা; এমন অনেক আজগুবি কথা প্রচার করিয়া বেড়ায়। রামবাবু তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। "হ্যাঁ।" এই মাত্র বলিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। এমন সময় নটবর দত্ত মশাই (তিনি বয়সে প্রবীণ) মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "চাটুয্যে মশাই, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, হেরিং ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।" এবারে চাটুয্যে মশায়ের ভীষণ পরিবর্ত্তন হইল। হেরিং ব্যাঙ্কে তাঁহারও পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা ছিল। তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, নাড়ী জোরে বহিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—তিনি শোকার্ত্তের মত বুকে ও গালে চড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হরির কথার কোনও শক্তি নাই, কিন্তু নটবরের সেই কথারই শক্তি এমন যে চাটুয্যের শারীরিক ও মানসিক বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল।

শারীর বিধান বিদ্যা (Physiology) বলে যে আমাদের হৃদয়-যন্ত্র, আমাদের রক্ত-নলগুলি, আমাদের পাকযন্ত্রাবলী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তির (Will) অধীন। ইচ্ছা যদি কল্পনার সাহায্য পায় তাহা হইলে ঐ সকল স্বাধীন যন্ত্রকে স্বায়ত্বাধীন করিতে পারে। একটি মেয়েকে বল তাহার গালের রক্ত-নলগুলিতে অতিরক্ত সঞ্চার করিয়া উহাকে আরক্ত করিতে। সে তাহা পারিবে না। কিন্তু যে তাহাকে জানে সে এমন একটি তাহার অতিপ্রশংসার কথা কহিবে যে লজ্জায় তাহার গাল আরক্ত হইয়া পড়িবে। তেমনি মেস্‌মেরাইজার যখন রোগীকে বলে তোমার বেদনা সারিয়া যাইতেছে, রোগীর তাহাতে আনন্দ হয়, আশা হয়—তাহার হৃদ্‌যন্ত্র বেগে বহিতে থাকে; বেদনাগ্রস্ত অঙ্গে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চার হইয়া তাহার

পীড়ার উপশম হইতে থাকে। তেমনি পাকযন্ত্র বা অন্যান্য অনেক যন্ত্র মেস্‌মেরাইজারের কথাবার্ত্তার শক্তিতে (Suggestionএ) ক্রমশঃ ভাল রক্ত পাইয়া রোগীর মঙ্গল সাধন করে।

মেস্‌মেরিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অন্য প্রয়োজনীয় কথাগুলি আর একদিন বলিব।

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

দশ

অজয় বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমি পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম, 'রণু, আমি সত্যিই অজয়—রাতদিন ধরে ঘুরছি তোমারই সন্ধানে! আজ এত আকস্মিকভাবে দেখা পেলাম তোমার অথচ তোমাকে কাছে পাব না? ফিরে এস, ফিরে এস রণু!' দূর, অতি দূর থেকে স্বর্ণজিতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কান্নার সুরে ভরা সে স্বর—সে বল্‌লে, 'অজয়, উপায় নেই, উপায় নেই তোমাদের কাছে যাওয়ার। যে দুর্ভাগ্য আজ ঘিরেছে আমাকে আর তোমাদের সকলের অত আদরের ইরাকে—সে দুর্ভাগ্য পাছে তোমাদের আবার ঘিরে ধরে সেই ভয়ে তোমাদের অতি কাছে যেতে সাহস পাচ্ছি না। তা ছাড়া আমার চেহারা যদি তুমি দেখ তা হ'লে, তা হ'লে—'

"বাধা দিয়ে বল্‌লাম—'কাছে এস রণু—যেমন আগে এসেছিলে।'

"রণু বল্‌লে—'কথা দাও, আগে কথা দাও—কিছুতেই আলো জ্বাল্‌বে না কিংবা আমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা কর্‌বে না—'

"চোখ আমার জলে ভরে এল; বাধ্য হয়ে বল্‌লাম, 'কথা দিচ্ছি—'

"দাঁড়ের শব্দে বুঝলাম, রণু তার নৌকা নিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে আমাদের দিকে। নির্ম্মল

মূর্চ্ছিত হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার পাশে। ক্রমশঃ রণুর নৌকা এসে আগেকার মত আমাদের জাহাজের থেকে অল্প দূরে থাম্‌ল।

"নৌকা থেকে রণু ডাক্‌লে—'অজয়!'

"অতি আস্তেই তা'কে উত্তর দিলাম।' রণু বল্‌লে—'অজয়, আজ আর আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। কেন, সেই কথাই বল্‌ছি। তোমাদের সকলেরই ধারণা আমরা হয়ত আর বেঁচে নেই। সে ধারণা তোমাদের ভুল, তা' ত' দেখ্‌ছই। কিন্তু এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ছিল আমাদের কাছে শতগুণ শ্রেয়ঃ। মৃত্যুর সামনা-সামনি বার কয়েক আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যু গ্রাস করে নি তখন আমাদের। কেন তা করবে? মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর যে রয়েছে আমাদের অদৃষ্টে লেখা!—যাই হোক, শোন—'।"

অজয় একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "এর পর রণু বলে গেল তাদের অভিযানের সবিস্তৃত কাহিনী যা আমি এতক্ষণ ডায়েরীর লেখা ব'লে ব'লে এসেছি; তার পর থেকে ও যা বল্‌ল সেইটুকুই বল্‌ছি—

"'রণু বল্‌তে লাগ্‌ল—'সেই ছোট নৌকাখানি করে ভাস্‌লাম আমি আর ইরা। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দাঁড় চালাতে লাগলাম। ক্রমশঃ দিনের আলো নিভে এল, সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে। হঠাৎ কুয়াসা ছেয়ে ফেল্‌ল চতুর্দ্দিক্‌। রাত্রির অন্ধকার গেল কেটে কিন্তু দৃষ্টি আমাদের পথ খুঁজে পেল না কোনও দিকে। দৃষ্টির পথরোধ করে রয়েছে কুয়াসা—একটুও কমে নি। দু'দিন—তিন দিন চল্‌লাম কুয়াসার মাঝেই। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে। ইরা ত' নৌকার একদিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে ও বুঝি মরে গেছে।

"'যাক্‌, চতুর্থ দিন, রাত্রি তখন গভীর, শুনলাম সমুদ্রের ঢেউ যেন আছড়ে গিয়ে পড়্‌ছে সমুদ্রের তটের উপর। অভূতপূর্ব্ব আনন্দে বুকটা ভরে গেল—তা হ'লে তীরে পৌঁছেছি, হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই কোন লোকালয়ের দেখা মিল্‌বে; সেখানকার লোকেদের কাছে আহার্য্য পাব, পাব তৃষ্ণার জল; বোধ হয় বেঁচে গেলাম—ইরাকে বোধ হয় বাঁচাতে পার্‌ব।

"'রাত্রির অন্ধকারে দেখ্‌তে পেলাম না কিছু; তবে দেখলাম আমাদের নৌকাখানা বার কয়েক ওঠা-নামা কর্‌ল ঢেউ-এর ধাক্কায়—তার পর ভাস্‌তে লাগ্‌ল স্থির জলরাশির বুকে।

"'ভোর হ'ল,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার লোকালয়ের দেখা পাওয়ার আশাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যখন দেখলাম কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নেই, শুধু এক বিরাট্‌ অরণ্যভূমি সামনে রয়েছে বিস্তৃত। যাক্‌, নিশ্চিন্ত হ'লাম—মৃত্যু সম্বন্ধে। অনাহারে মৃত্যুই হ'ল তা হ'লে আমাদের শেষ পরিণতি—

"'কিন্তু না, মুহূর্ত্ত কয়েক মাত্র। মরতে বোধ হয় হ'ল না। দূরে একটা জাহাজের অংশ

দেখা যাচ্ছে বোধ হ'ল। একটু এগুতেই দেখি সত্যিই একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ। আশ্চর্য্য মানুষের আশা—আবার, আবার বাঁচবার আশা জেগে উঠল মনের মাঝে।

"'নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেলাম জাহাজটার কাছে। চীৎকার করে ডাকলাম জাহাজের লোকেদের, কত অনুরোধ কর্‌লাম আমাদের জাহাজে তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু, কোন উত্তরই দিল না কেউ জাহাজ থাকে। নৌকাটা এবার নিয়ে এসে একেবারে জাহাজের গায়ে লাগালাম। একটা দড়ি ঝুল্‌ছিল জাহাজ থেকে, সেইটা ধরে উঠ্‌লাম জাহাজের উপরে। উঠলাম মানে অতিকষ্টে উঠলাম,—কারণ ঐ দড়িটাতে এক রকম ধূসর রংএর 'ফাঙ্গাস্‌'—বাংলায় যাকে বলে 'ছত্রাক'—সেই ফাঙ্গাস গজিয়েছে; শুধু দড়িটা কেন—জাহাজের সমস্ত গা'টাই ভরে গেছে ঐ ফাঙ্গাসে। যাক্‌, কোনও রকমে জাহাজের রেলিং টপ্‌কে ত' জাহাজের ডেকের উপর এসে উপস্থিত হ'লাম।...আশ্চর্য্য, জাহাজের ডেকগুলিরও জায়গায় জায়গায় ঐ রকম ফাঙ্গাসে ভর্ত্তি হয়ে আছে—ঠিক শ্যাওলা ধরার মত। কোনও কোনও জায়গায় আবার বেশ কয়েক ফুট উঁচু পর্য্যন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, তখন সেদিকে লক্ষ্য করবার আমার সময় ছিল না, আমি শুধু ভাব্‌ছি, জাহাজে কোনও লোক আছে কি না! চীৎকার করে ডাক্‌লাম—একবার, দু'বার, তিনবার। কোনও উত্তর নেই। "পুপ্‌ ডেক"এর নীচে যে একটা দরজা ছিল সেইটার কাছে গিয়ে সেটা খুলে ফেল্‌লাম—ফেলে, মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা কর্‌লাম। একটা সোঁদা, ভ্যাপ্‌সা গন্ধ এসে লাগল নাকে। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম। ভাবলাম, কোনও মানুষ, মানুষ কেন, কোনও প্রাণীই থাকা সম্ভব নয় এর মধ্যে। বুঝলাম—কেউ নেই এই জাহাজে। হঠাৎ কি রকম একটা শিহরণ খেলে গেল আমার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে। আমার হঠাৎ মনে হ'ল আমি একা—ভীষণ রকমের একা!...যেখান দিয়ে উঠেছিলাম ছুটে গেলাম সেই জায়গাটায়।... দেখলাম, আমার আদরের বোন্‌টী তখনও বসে আছে চুপটী করে নৌকার একপাশে। আমি তাকাতেই, সে বল্‌লে শুধু অতি আস্তে—কারো দেখা পেলে, ছোড়দা', জাহাজে?

"'আমি বল্‌লাম না রে, জাহাজে কেউ নেই—মনে হচ্ছে অনেক দিন এ জাহাজে কোনও লোকজনের বসবাস নেই।...যাই হোক, তুই আর একটু অপেক্ষা কর—আমি একবার দেখে আসি মই-টই ধরণের কিছু পাই কিনা, যা'তে করে তুই উপরে উঠে আস্‌তে পারিস। তুই উঠে এলে, দু'জনে মিলে আর একবার সমস্ত জাহাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ্‌ব সত্যি সত্যিই এ জাহাজ একেবারে জনশূন্য কি না।

"'একটু খুঁজতেই জাহাজের একপাশে একটা দড়ির মই পড়ে রয়েছে দেখলাম। সেইটা নিয়ে এসে ঝুলিয়ে দিলাম নৌকা পর্য্যন্ত। ইরা উঠে এল সেই দড়ির মইএ চড়ে। ইরা বলেই পার্‌ল। অত ক্লান্ত—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট ওর শরীর, তবুও উঠে এল ও সোজা ডেকের উপরে।

"'দু'জনে মিলে নতুন করে সমস্ত খুঁজতে সুরু করলাম—প্রত্যেক কেবিন—প্রত্যেক জায়গায়। কারো দেখা মিল্‌ল না, শুধু দেখা মিল্‌ল ঐ 'ফাঙ্গাস্'এর—ঐ অদ্ভুত 'ফাঙ্গাস্'এর যা সমস্ত কেবিন ও অন্যান্য কামরার দেওয়াল ও মেঝের জায়গায় জায়গায় ছেয়ে ধরেছে।

"'আমার কি রকম করতে লাগ্‌ল গায়ের মধ্যে ঐগুলো দেখে। ইরাকে বল্‌লাম, দেখেছিস্ ইরা, কি বিশ্রী এইগুলো!

"'ইরা একটু হেসে বল্‌ল—'ওদের উপর অত বিরক্তির কারণ কি? কি শত্রুতা করল ওগুলো তোমার সঙ্গে? ওগুলো ত' আর আমাদের কোনও অনিষ্ট কর্‌ছে না। পরিষ্কার করে ফেল্‌লেই হবে পরে ওগুলিকে।

"'যাই হোক—জাহাজের এদিক্ ওদিক্ সবদিক্ দেখে যখন শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চিত হ'লাম আমরা যে জাহাজে কেউ নেই তখন নিজেদের বাস এবং আহারের চেষ্টায় নিযুক্ত হ'লাম দু'জনে। দুটো কেবিন্ পরিষ্কার করে নিলাম প্রথমে, তার পর সুরু করলাম খাদ্যান্বেষণ। ঈশ্বরকে বহু ধন্যবাদ—খাবার মিলে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার পানীয় জলও—যদিও একটু বিস্বাদ হয়ে গেছে সে জল।

"'একটা দিন একটু বিশ্রাম ক'রে পরের দিন লেগে গেলাম সমস্ত জাহাজ পরিষ্কার করতে যা'তে সেটা বাসযোগ্য করে তোলা যায়। কিন্তু পরিষ্কার করা যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ নয় দেখলাম। সেই অদ্ভুত 'ফাঙ্গাস্'গুলোকে ত' প্রথম দিন বেশ করে চেঁচে পরিষ্কার করে দিলাম—কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে নি বোধ হয়, সেইগুলি ঠিক আগেকার মত ছেয়ে ফেলেছে সেই জায়গাগুলি। আবার পরিষ্কার করলাম—পরের দিন আবার ঠিক যেমন ছিল তেমনি। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এ যে!—ভৌতিক ব্যাপার না কি কিছু! ইরার মুখও শুকিয়ে গেছে; সামান্য 'ফাঙ্গাস্' বলে সেও আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না এখন আর!

"'তবুও দম্‌লাম না। জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ল এক জায়গায় একটা কার্ব্বলিক য়্যাসিডের টিন—একেবারে য়্যাসিড ভর্ত্তিই রয়েছে। সেইটা নিয়ে এসে ইরাকে দেখিয়ে বল্‌লাম—ইরা, ঈশ্বর মিলিয়ে দিয়েছেন ঐ হতভাগা 'ফাঙ্গাস্'গুলো মারবার উপায়।

"'ইরা জিজ্ঞাসা করলে—কি আছে ওতে?

"'উত্তর দিলাম,—কার্ব্বলিক য়্যাসিড। তার পর লেগে গেলাম আবার সেগুলোকে চেঁচে পরিষ্কার করতে। পরিষ্কার কর্‌বার পর যে জায়গায় ওগুলো জন্মেছিল সেই জায়গাগুলোয় বেশ করে কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড ছড়িয়ে দিলাম।

"'একদিন যায়, দু'দিন যায়—ভাবলাম, না, এবার শেষ হয়ে গেছে ওদের। কিন্তু, সপ্তাহখানেকের মধ্যে আবার দেখা দিল তা'রা পূর্ণোদ্যমে—শুধু তাই নয়, এবার আবার যে জায়গায়

'ফাঙ্গাস্' ছিল না সে জায়গাগুলোও ছেয়ে ফেলেছে! আমরাই বোধ হয় ওদের গায়ে হাত দিয়ে জাহাজের সর্ব্বত্র সংক্রামিত করলাম ঐ অদ্ভুত 'ফাঙ্গাস্'গুলিকে!

"'দিন যায়। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম ওদের বিনাশসাধন সম্বন্ধে। ঠিক করলাম—যত দিন না উদ্ধারের কোনও উপায় মেলে তত দিন কাটাতে হ'বে কোনও রকমে এই 'ফাঙ্গাস্'এর—মাঝেই—এই জাহাজেতে। হয়ত তাই কাটাতাম যদি না ঘট্‌ত অকস্মাৎ এক প্রমাদ—

"'সে দিন তখন সবে ভোর হয়েছে। ইরার কেবিন থেকে শুন্‌লাম এক আকুল আর্ত্তনাদ—ছোড়দা'!

"'সে ডাক শুনে ছুটে গেলাম ইরার কেবিনে। গিয়ে দেখি, ইরা তা'র বিছানা ছেড়ে উঠে সরে এসে দাঁড়িয়েছে আর কি এক মহাভয়ে মুখ তার পাংশু হয়ে গেছে।

"'আমি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে, ইরা?

"'ইরা কোনও কথা বল্‌লে না—শুধু তা'র বিছানার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল'।"

(ক্রমশঃ)

নানা প্রসঙ্গ

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

টাওয়ার অফ্ সাইলেন্স্

মানুষ মরিয়া গেলে মৃতদেহের জন্য এক এক দেশে এক এক রকম বন্দোবস্ত হয়। কেহ বা উহা পোড়াইয়া ফেলে, কেহ বা উহা মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখে। প্রাচীন মিশরে এবং অন্য দুই এক জায়গায় মৃতদেহে মশলা মাখাইয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ মৃতদেহকে "মামী" বলে। মশলা মাখাইয়া রাখায় উহা সহজে পচিয়া যাইত না। আবার পার্শীদের মধ্যে একটী অন্য রকম প্রথা আছে। তাঁহারা মৃতদেহ পোড়াইয়াও ফেলেন না, পুঁতিয়াও রাখেন না। খুব উঁচু একটা থামের মত বাড়ীর ছাদের উপর ঐ মৃতদেহ ফেলিয়া রাখা হয়, আর শকুনি ইত্যাদি মাংসাশী পাখীরা আসিয়া মৃতদেহটী ছিঁড়িয়া ফেলে। এই রকম বাড়ীকে বলে 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্স্'।

বড় বড় চাকুরী

পৃথিবীতে বোধ হয় সব চেয়ে বেশী বেতন পা'ন ভারতবর্ষের বড়লাট, বছরে আড়াই লক্ষ টাকা। লাটেরাও বেশ মোটা মাহিনা পা'ন; বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের লাট প্রত্যেকে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পা'ন। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন উহার কিছু বেশী, প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। জাপানের প্রধান মন্ত্রী নাকি মাসে পা'ন মোটে ৫৫০ টাকা।

বন্ধু

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিমল দত্ত, এম্.এ

শীতকাল ফুরিয়ে গেল। আবার হরেক রকম ফুলের কুঁড়ি আস্তে আস্তে ফুটে উঠে তাদের ভিতরকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফুলগুলিকে প্রকাশ ক'রে দিতে লাগ্‌ল। মহাজনের প্রাণ তার বন্ধু ফুলওয়ালার জন্য হঠাৎ আবার বড্ড ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে তার মোটা মোটা খাতাপত্তর মুড়ে দপ্তর বেঁধে, লোহার সিন্ধুকে চাবি লাগিয়ে ঝুড়ি হাতে বার হ'ল।

ফুলওয়ালা তার বাগানে মাটী কোপাচ্ছিল। মহাজন হেসে বল্‌লে, "সুপ্রভাত বন্ধু! শীতকালটা কেমন ছিলে?"

ফুলওয়ালা কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে বল্‌লে, "সুপ্রভাত! আমি ভেবেছিলাম তোমরা আমায় বুঝি ভুলেই গেছ!"

মহাজন জিভ কেটে বলে উঠ্‌ল, "তাও কি হয়! বন্ধু কখনো বন্ধুকে ভুলে যেতে পারে? ধরতে গেলে সারা শীতকালে প্রত্যহই আমরা তোমার কথা ভাবতুম। সে যা হোক্, তোমার বাগানের ফুলগুলো কিন্তু ভা—রী চমৎকার!"

ফুলওয়ালা তার আদরের ফুলগুলির দিকে চেয়ে বল্‌লে, "সত্যিই চমৎকার। আর আমার ভাগ্য ভাল বলেই অত ফুল শুধু আমারই বাগানে ফুটেছে। ওগুলো বাজারে নিয়ে গেলে বড়

ঘরের মেয়েরা নিশ্চয়ই কাড়াকাড়ি ক'রে কিনে নেবে। যা দাম পাব তা'তে আমি একটা এক চাকার হাত-গাড়ী কিন্‌ব।"

মহাজন বল্‌লে, "তোমার ত' একটা হাত-গাড়ী ছিল। সেটা তা' হ'লে বেচে ফেলেছ?"

ফুলওয়ালা বল্‌লে, "আর কি করি, শীতের সময়ে অভাবে পড়ে সেটা বেচে ফেলেছি। আমার রূপোর বোতামগুলো, রূপোর ঘড়ির চেন—এ সবও বন্ধক দিয়েছি; শেষটা যখন আর উপায় নেই তখন এক চাকার হাত-গাড়ীটাও বেচ্‌লুম। সে যা' হোক্, ফুল বিক্রী করে আবার আমি সব ছাড়িয়ে আন্‌ব।"

মহাজন বল্‌লে, "আহা! চু-চু—আমি কি আর অত-শত জানি? আচ্ছা, কোন ভাবনা কোরো না, আমি আমার হাত-গাড়ীটা তোমায় দিয়ে দেব। অনেক দিন সারানো হয় নি—এক-ধারের কাঠ নেই, চাকার কাঠের শলাগুলো পচে নষ্ট হ'য়ে গেছে—কিন্তু সারিয়ে নিলে একদম নতুন গাড়ী হ'য়ে যাবে। জানি আমার পক্ষে এমন একটা গাড়ী তোমাকে দিয়ে দেওয়া মানেই বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করা—তা'তে কি! বন্ধুর জন্য আমি ওটুকু ক্ষতি স্বীকার করতে পার্‌ব না? তা' ছাড়া আমার জন্যে যখন আমি একটা নতুন গাড়ী কিনে ফেলেছি তখন তোমার উপকার আমি কর্‌বই।"

ফুলওয়ালা খুসী হ'য়ে বল্‌লে, "তুমি অত্যন্ত দয়ালু। আমার পক্ষে ভাঙ্গা গাড়ীটা মেরামত ক'রে নেওয়া শক্ত হ'বে না। আমার কাছে একটা বড় তক্তা আছে।"

ফুলওয়ালার কথাগুলো লুফে নিয়ে মহাজন বলে উঠ্‌ল, "তক্তা? ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ বন্ধু। আমার বাড়ীর পূবের ঘরের ছাদটা ফুটো হ'য়ে গেছে, সেজন্য একখানা তক্তার আমার বিশেষ দরকার। আর দেখ ভাই, কি আশ্চর্য্যের কথা—একটা ভাল কাজ কেউ করলেই সেটা দেখে অন্য লোক অন্য একটা ভাল কাজ ক'রে ফেলে। আমি যেই তোমাকে হাত-গাড়ীটা দেব বল্‌লুম আর ঠিক তক্ষুণি তুমি তক্তাটার কথা বল্‌লে। ওটা নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দিয়ে দেবে। আমি জানি তুমি দিয়ে দেবে। হাত-গাড়ীর দামের সঙ্গে একখানা তক্তার দামের তুলনাই হয় না—তা' আমি জানি। তবু সত্যিকারের বন্ধু ও সব তুলনা করে না। দিয়েই তার সুখ। তা' হ'লে আর দেরী না ক'রে তক্তাটা দিয়ে দাও, ভাই।"

ফুলওয়ালা তক্তাটা বার ক'রে নিয়ে এল। মহাজন সেটা দেখে বল্‌লে, "ওঃ, ছোট্ট তক্তা। এর সঙ্গে হাত-গাড়ীটার তুলনাই চলে না। যা'ক্, যখন দেব বলেছি দেবই। তবে তুমি আমায় কিছু ফুল দাও। এই নাও ঝুড়ি—ভর্ত্তি করে দিও কিন্তু—"

ফুলওয়ালা ঝুড়ির দিকে চেয়ে হতাশ হ'য়ে পড়ল। অত বড় ঝুড়ি ভর্ত্তি ক'রে ফুল দিলে তা'র বাগান উজাড় হ'য়ে যাবে। তা' হ'লে সে আর ক'টা ফুল বেচ্‌তে পারবে! আর

বেচ্‌তে না পারলে সে তার জিনিস ছাড়াবে কি দিয়ে! রূপোর বোতামগুলো আর রূপোর চেন্‌টার জন্য তার মন কেমন করছিল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "ভর্ত্তি করে দিতে হ'বে?"

মহাজন বল্‌লে, "নিশ্চয়ই। আমি আমার হাত-গাড়ীটা ত' তোমাকে দিয়েই দিয়েছি—স্রেফ্‌ বন্ধুত্বের খাতিরে, আর তুমি সামান্য ক'টা ফুল দিতে ইতস্ততঃ কর্‌ছ! সত্যিকারের বন্ধু কি অত শত হিসাব-নিকাশ করে?"

বগলে তক্তাটা আর পিঠে ফুলের ঝুড়ি নিয়ে মহাজন বিদায় নিলে।

পরদিন খুব ভোরে মহাজন এসে ডাক্‌লে, "কি হে বন্ধু, এখনো ঘুমুচ্ছো যে বড়! নাঃ, তুমি কিন্তু অত্যন্ত অলস হ'য়ে পড়্‌ছ। তোমার আরো পরিশ্রমী হওয়া দরকার। বন্ধু-বান্ধব কুঁড়েমি করে এ আমি সহ্য করতে পারি না। বেশ দু' কথা শোনাই। এই তোমার কথাই ধর। আমার অত দামী হাত-গাড়ী তোমায় দিয়ে দিলুম—কোথায় তুমি পরিশ্রমী হ'বে, না এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছো! রাগ কোরো না, কথাগুলো তিরস্কারের মত শোনালেও হিতকারী কথা। মিষ্টি মিষ্টি মন-ভোলানো কথা অনেকেই বল্‌তে পারে কিন্তু প্রকৃত বন্ধু শুধু কষ্ট দেয়—কটু কথা বলে। সে জানে যে কষ্ট দেওয়া মানেই বন্ধুর উপকার করা।"

ফুলওয়ালা লজ্জিত হ'য়ে বল্‌ল, "না—না, আমি আজ থেকে পরিশ্রমী হ'ব।"

মহাজন বল্‌লে, "এই ত' চাই—আচ্ছা, আমিও দেখ্‌তে চাই তোমার সঙ্কল্প দৃঢ় কিনা। আজ আমার পূবের ঘরের ছাদটা তোমায় মেরামত ক'রে দিতে হ'বে। অবশ্য এর জন্যে আমি ত' ইতিপূর্ব্বেই আমার হাত-গাড়ীটা তোমায় দিয়ে দেব বলেছি।"

ফুলওয়ালা বড় ভাবনায় পড়্‌ল। কাল সে বাগানে হাত দিতে পারে নি। আজ সমস্ত দিনও হাত দিতে পারবে না। সে মৃদু আপত্তির সুরে বল্‌লে, "আজ না ক'রে যদি কাল কর্‌ব বলি তা' হ'লে কি বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা করা হ'বে?"

মহাজন বলে উঠ্‌ল, "নিশ্চয়ই! বন্ধু, তুমি নিজের কাজ করবার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছ। কিন্তু আজ নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য একটা কাজ করে দেখ দেখি তাতে কত আনন্দ পাওয়া যায়!"

ফুলওয়ালার মনে কথাগুলো বড় ভাল লাগল। সে যন্ত্রপাতি নিয়ে মহাজনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌ল। সন্ধ্যার সময় অভুক্ত অবস্থায় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বাড়ী ফিরল।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন ফুলওয়ালা আর মহাজনের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় বন্ধুত্ব জমে উঠতে লাগল। তার ফলে মহাজন ফুলওয়ালাকে দিয়ে নিজের সহস্র কাজ করিয়ে নিতে লাগল এবং তার প্রতিদান স্বরূপ বন্ধুত্ব-সম্বন্ধে খুব দামী দামী আর সারগর্ভ কথা তাকে শুনিয়ে যেতে লাগল। ফুলওয়ালা একটা নোট্‌-বুকে মহাজনের সেই সব কথা টুকে রাখত আর রাত্রে সেগুলো

প'ড়ে প'ড়ে মুখস্থ করে রাখত। কারণ, একজন প্রকৃত বন্ধু হ'বার জন্য সে যথাসর্ব্বস্ব পণ করেছিল।

ক্রমে ফুলওয়ালার অমন সুন্দর ফুলের বাগান দেখা-শোনা না করায় একটা জঙ্গলে পরিণত হ'য়ে পড়্‌ল। বাগান দেখবার সময় কোথায় তা'র? মহাজনের মত অমন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই তার সব সময় কেটে যেত।

এম্‌নি ক'রে দিন যায়।

একদিন সন্ধ্যায় ফুলওয়ালা উনুনের ধারে ব'সে আগুন পোহাচ্ছে। বাইরে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি। বাতাস গর্জ্জন ক'রে একটা মহাপ্রলয় বাধাবে ব'লে শাসাচ্ছে। গাছপালা ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে; আর মুষলধারে ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে।

হঠাৎ ফুলওয়ালার মনে হ'ল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ঝড়ের কাণে-তালা-লাগানো হুঙ্কারের শব্দে বাইরের শব্দ কাণে যায় না। সে ভাবলে বোধ হয় বাতাসের শব্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার শব্দ হ'ল। ফুলওয়ালা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

দরজা দিয়ে যে ঘরে ঢুকল সে আর কেউ নয় স্বয়ং মহাজন—ফুলওয়ালার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বৃষ্টিতে ভিজে সে একসা হ'য়ে গেছে। তা'র এক হাতে একটা মোটা লাঠি আর অন্য হাতে একটা লণ্ঠন।

মহাজন বল্‌লে, "বন্ধু, আমার বড় বিপদ্‌। এক্ষুণি সহরে গিয়ে এ চিঠিটা না দিয়ে এলেই নয়, তুমি যদি এ কাজটা করে দাও ভাই—"

ফুলওয়ালা একবার বাইরের দুর্য্যোগের দিকে তাকাল। তার পর সহজভাবে বল্‌লে, "আচ্ছা, তোমার লণ্ঠনটা দাও।"

মহাজন বল্‌লে, "এই ত' মুস্কিলে ফেল্‌লে, লণ্ঠনটা আমি দিই কি ক'রে—আমার নতুন লণ্ঠন—যদি ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙেচুরে যায় বা কল বিগড়ে যায়—তা' হলে আমারই ত' ক্ষতি! তুমি বন্ধু হ'য়ে বন্ধুর এমন্‌ একটা ক্ষতি করতে চাইবে এ ভাই, আমি আশা করি নি।"

ফুলওয়ালা বল্‌লে, "থাক্‌, লণ্ঠনে দরকার নেই। আমি অন্ধকারেই যাচ্ছি।"

মহাজন তার নতুন লণ্ঠন নিয়ে সাবধানে বাড়ী ফিরে গেল। ফুলওয়ালা পথে বেরিয়ে পড়ল।

উঃ, কী ভয়ঙ্কর রাত্রি! এত অন্ধকার যে ফুলওয়ালা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তার উপর ঝড়ের এত প্রচণ্ড বেগ যে পথ হাঁটা ত' দূরের কথা, শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব।

তার পরেই নামল মুষলধারে বৃষ্টি। সূচীভেদ্য অন্ধকারে ফুলওয়ালা পথ হারাল। সে একটা জলার উপর এসে আর কিছুই ঠিক করতে না পেরে ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগল। সেখানে

ছিল কতকগুলি বঁড় বড় গর্ত্ত। চল্‌তে চল্‌তে ফুলওয়ালা হঠাৎ একটা গর্ত্তে পড়ে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে গেল তলিয়ে। পরদিন কতকগুলো রাখাল তার মৃতদেহটাকে ভাস্‌তে দেখে গ্রামে খবর দিলে।

ফুলওয়ালার শব নিয়ে যে শোভা-যাত্রা বার হ'ল তা'তে সকলের আগে রইল মহাজন। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে সে বল্‌তে লাগল, "আমিই ছিলাম তার ব্যথার ব্যথী অন্তরঙ্গ বন্ধু—কাজেই আমার দুঃখটা সব চেয়ে বেশী। আমার হাত-গাড়ীটা ওকে দিয়ে দেব বলেছিলাম। কিন্তু ও তঁ দিব্যি ফাঁকি দিয়ে পালাল। আমাকে দান করার ফরসৎ পর্য্যন্ত দিলে না। নাঃ, বদান্যতা করতে গেলেই ভুগতে হয় দেখছি!"

* * * *

খরগোস এতক্ষণ কাণ খাড়া ক'রে শুন্‌ছিল। হাঁস থাম্‌তে সে বল্‌লে, "তার পর?"

হাঁস বল্‌লে, "তার পর আবার কি? গল্প ত' শেষ হ'য়ে গেছে!"

খরগোস বল্‌লে, "কিন্তু মহাজনটার কি হ'ল তা' ত' কই বল্‌লে না বাপু?"

হাঁস বল্‌লে, "তা' আমি জানি না। জানতে ইচ্ছাও নেই।"

খরগোস বল্‌লে, "ঐ জন্যই তোমাদের বুনো হাঁস বলে।"

বক গম্ভীরভাবে এক পা থেকে আর এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গলাটা কঁক্ কঁক্ ক'রে পরিষ্কার করে বল্‌লে, "অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে বুনো হাঁসদের প্রকৃতিতে সমবেদনা নেই।"

বুনো হাঁস বল্‌লে, "তা' কেন! তুমি বাপু, গল্পটার উপদেশটুকু ধরতে পার নি।"

বক ঘাড় উঁচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি? কি? উপদেশ? তুমি বল্‌তে চাও এটা একটা নীতি-গল্প?"

হাঁস বল্‌লে, "নিশ্চয়ই।"

বক ভীষণ রেগে কপ্ ক'রে একটা পুঁটি মাছ ধ'রে গিলে ফেলে বোঁজা গলায় বল্‌লে, "এ কথা তোমার বাপু, আগে বলা উচিত ছিল। যদি আগে বল্‌তে তা' হ'লে আমিও সেই চশমাওলা লোকটার মত বল্‌তে পারতুম 'ধ্যেৎ।' যাই হোক্, এখন আমি সে-কথা বল্‌তে পারি" —এই বলে বকটা উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লে, "ধ্যেৎ!" ব'লেই শোঁ-শোঁ ক'রে কোথায় জানি উড়ে গেল।

বুনো হাঁস জিজ্ঞাসা করলে, "খরগোস্ ভায়া, বককে কেমন লাগল?"

খরগোস বল্‌লে, "আহা বেচারা, অমন ধৈর্য্য কি দেখা যায়!"

বুনো হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ ক'রে হেসে বলে উঠ্‌ল, "ওকে কিন্তু ভা-রী জ্বালাতন করেছি—গল্প শোনাতে গিয়ে ভুলিয়ে উপদেশ শুনিয়ে দিয়েছি।"

বিচিত্র ভারত

প্রাচীন ভারতের ধ্বংসাবশেষ

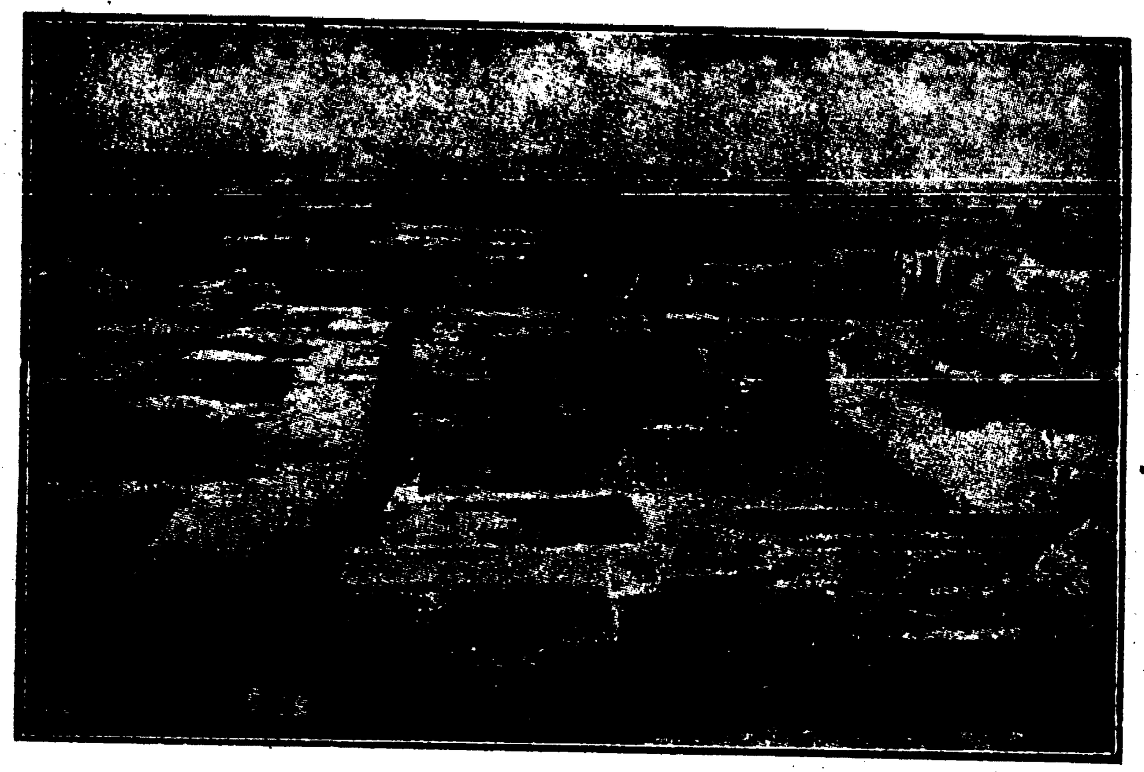

মহেঞ্জদাড়োয় প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

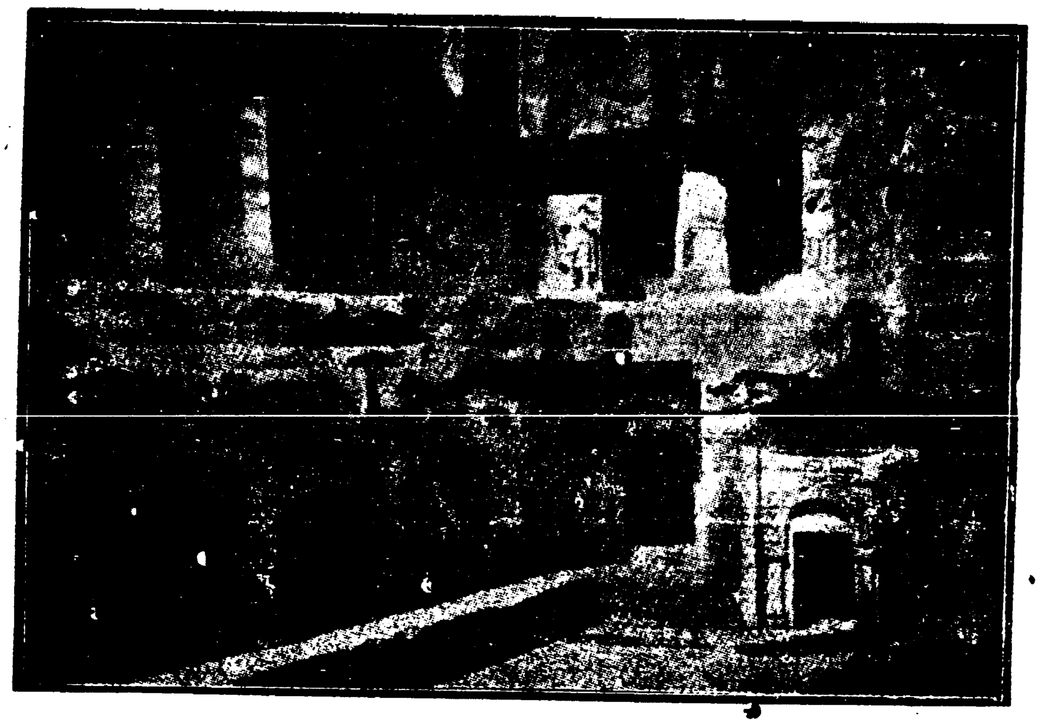

উড়িষ্যার খণ্ডগিরির গায়ে বৌদ্ধ আমলের গুহা-প্রাসাদ

বিলাতী শিক্ষার প্রথম যুগে*

[কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "আমরা বিলাত ফেরতা ক' ভাই"এর অনুসরণে]

শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক

আমরা বিলাতী ধরণে
হাসি—

আমরা ফরাসী ধরণে
হাটি—

* সুখের বিষয় বাংলার সে যুগ প্রায় লোপ পাইয়াছে।

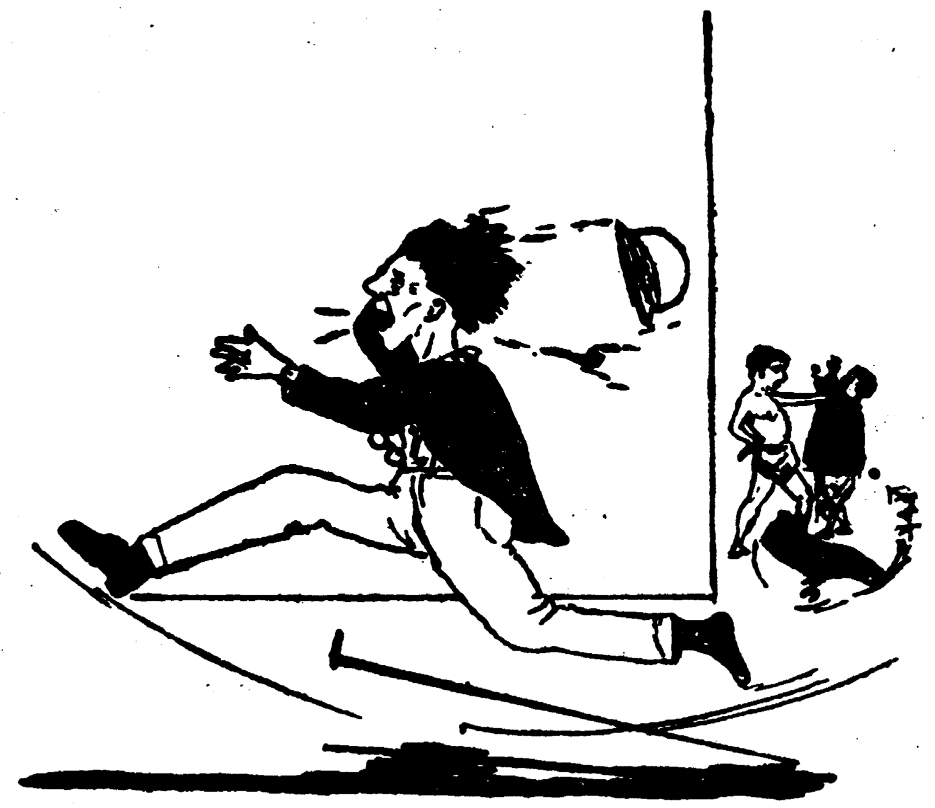

'(কিন্তু) বিপদেতে দেই 'নেটিভেরি' মত
চম্পট পরিপাটী।'

প্যারিস্ ও ভার্সাইয়ের কিছু

[প্রবন্ধ]

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

প্যারিস্ সহরটি যেন আনন্দের মালা দিয়ে গাঁথা। সর্ব্বত্রই সেখানে, আনন্দ, উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেস্তোরাঁ ও কাফে সহরটাকে ছেয়ে ফেলেছে; এ সব জায়গায় খাওয়া-দাওয়া, বাজনা শোনা ও বসে "গল্প" করা হচ্ছে। রাস্তার ওপরেই খানিকটা জায়গা জুড়ে একপাশে কতকগুলি চেয়ার টেবিল পাতা

রয়েছে। উপরে একটি চাঁদোয়া খাটান। আর তার পাশেই ঘরের ভিতর রয়েছে একটি রেস্তোরাঁ। কেউ বাইরে বসছে, কেউ ভিতরে। বিকেলে একটি চেয়ারও খালি থাকে না। তা ছাড়া সমস্ত দিনই লোকজন আসছে, বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করছে ও এক কাপ্ চা অথবা কফি খাচ্ছে, আবার তার কাজে যাচ্ছে। রাত্রি যত বেশী হয় প্যারিসের আনন্দও তত বাড়ে। লণ্ডনে সব উৎসবই রাত বারোটার সময় বন্ধ হয়, প্যারিসে রাত বারোটায় পুরোদমে আমোদ-উৎসব চলে। বার্লিনের লোকেরাও ফরাসীদের মত অত্যন্ত আনন্দপ্রিয়। সেখানেও আমোদ-উৎসবের ব্যবস্থা প্রচুর করা হয়।

কোন বড় রাস্তা দিয়ে গেলে চোখে পড়ে দুই ধারে খালি ফরাসী দেশের বিখ্যাত লোকদের মর্ম্মর মূর্ত্তি। আর পার্ক্ তো সহরময় ছড়ান। প্যারিস সহরটি যেন আগাগোড়া সুন্দর কারুকার্য্যে সাজান। মিউজিয়ম্ই হোক্, আর কলেজই হোক্, আর গীর্জ্জাই হোক্, সর্ব্বত্রই হাত পড়েছে কারুশিল্পীর। সহরের প্রায় প্রতিটি অংশ ইতিহাসবিখ্যাত। ইতিহাস যার ভাল লাগে প্যারিস্ সহরটি তার কাছে একটি পুঁথি। বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের স্মৃতি সহরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটিই দেখতে ভাল লাগে। নোতার্ দেম্এর গীর্জ্জা, নেপোলিয়নের কবর, পাথেয়োঁ (যেখানে ভোলটেয়ার, হুগো, ডুমা প্রভৃতি সাহিত্যিকদের কবর আছে), আইফেল টাওয়ার—প্রতিটি দেখবার জন্য বিদ্যার্থীর ইচ্ছা হয়।

ফ্রান্স্ বহু দিনের সভ্য জাতি। ইউরোপের সভ্যতায় তার দান প্রচুর। কত রকম রাজনৈতিক পরীক্ষাই না তারা তাদের দেশে করেছে! তার সে সব পরীক্ষার তথ্য নিয়ে আজ বহু জাতি নিজের দেশে ব্যবহার করছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান ইংলণ্ড, রাশিয়া ও জার্ম্মানী তার কাছে যথেষ্ট ঋণী। ফ্রান্সের রুশো, জোলা, বালজাক্, মোপাসাঁ, ভোল্টেয়ার, আনাতোল ফ্রাঁস, ভিক্তর হুগো আজও জগৎ-বরেণ্য। পাস্তুর, আমপেয়ার, লাভয়সিয়ের, কুরীকেও জগৎ কখনো ভুলবে না। শুধু কি পূর্ব্বের স্মৃতি নিয়েই ফ্রান্স বেঁচে আছে? আজও তার গুণী সন্তান রোমা রোলাঁ, কনিষ্ঠা মাদাম কুরী, লিয়োঁ ব্লুম, আঁদ্রে জিদ্ প্রভৃতি পৃথিবীকে নিত্য নতুন

চিন্তা ও গবেষণার খোরাক যোগাচ্ছেন। যে সব ফরাসী কোন বিখ্যাত কাজ করে অমর হয়ে আছেন প্যারিসে তাঁদের নিয়ে একটি সমিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেদিন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিত লেখক আঁদ্রে মরুয়াও সেই সমিতির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

প্যারিসের ছোট ছোট রেস্তোরাঁগুলি একটু নোংরা, রাস্তাগুলিও খুব পরিষ্কার নয়। সহরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী। সেই নদীতে বাঁধা আছে কতকগুলি বড় বড় নৌকা। সহরের এক অংশ থেকে আর এক অংশে বড় বড় মাল নৌকাতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নদী চওড়া নয়। নদীর দুই পাশে নোতার্ দেম এর গীর্জ্জা, লুভর্ মিউজিয়ম্ প্রভৃতি বিখ্যাত সব বাড়ী।

এমন একদিন ছিল যেদিন প্যারিসকে চিনলেই ফ্রান্সকে চেনা যেত। ফরাসীর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারুশিল্প দিয়ে প্যারিসকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ফরাসী সভ্যতার দানকে যেমন মানুষ ভুলতে পারে না, প্যারিসকেও তেমনি স্মৃতির আড়াল থেকে মানুষ সরাতে পারে না। কোন একজন লেখক বলেছেন জন-সমাজের উপর এথেন্স ও রোমের পরেই শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করেছে প্যারিস। কিন্তু বীর নেপোলিয়ন যোদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে কখনো প্যারিসের দিকে চাইতেন না, বরং তাকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে রেখে দূর থেকে দেখতে ভালবাসতেন।

ফরাসীরা চিরদিনই প্যারিসকে তাদের রাজধানী তৈরী করে রাখতে গর্ব্ব বোধ করেছে। ফরাসীর প্রাচীন সভ্যতা ও নতুন সভ্যতা দুই-ই গড়ে উঠেছে এই প্যারিস সহর থেকে। প্যারিসের তুলনায় বার্লিন নতুন সহর। বার্লিন ১৮৭০ সালের যুদ্ধের সময় থেকে জার্ম্মানীর রাজধানী বলে পরিগণিত হয়েছে। বার্লিন নিতান্ত তরুণ সহর—পিটার্সবুর্গ ও ওয়াশিংটনের চেয়েও তরুণ।

খেলা-ধূলায় কিন্তু ফরাসীরা ইংরাজদের মত অথবা জার্ম্মান্দের মত উদ্যোগী নয়। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় ইংরাজেরা যেন মাতোয়ারা, কিন্তু এমন কোন খেলা ফরাসীদের নেই যেটাতে দেশশুদ্ধ লোক মাতোয়ারা হচ্ছে। শনিবারের বিকেলে লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কে অথবা ভিক্টোরিয়া পার্কে চলেছে ক্রিকেট খেলা। সহর-শুদ্ধ লোক ঝুঁকে পড়েছে ঐ খেলা দেখতে। প্যারিসে গেলে এমন দৃশ্য চোখে

পড়ে না। শনিবারের বিকেলে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপ-মায়েরা বসেছে কিংবা পায়চারী করছে। ছোট ছেলেমেয়েরা হয়ত বল্ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে, কিন্তু সে খেলাতে যেন তেমন আগ্রহ নেই। ফরাসীরা কিন্তু ইংরেজ ও জার্ম্মান্‌দের মত খুব সাইকেল চড়ে।

কোন ইংরেজ লেখক বলেছেন, ফরাসীরা দিন দিন খেলা-ধূলায় ইংরেজদের অনুকরণ করে চলেছে। তাই আজকাল তারা গল্‌ফ্ ও টেনিস্ খেলায় একটু ঝুঁকেছে। কিন্তু এখনও সাধারণ লোক ঐ সব খেলায় যোগদান করতে পারে না। প্যারিসে মাত্র কয়েকটি টেনিস্ ও গল্‌ফ্ ক্লাব আছে, তাও প্রায় শুধু বড়লোকদের জন্য।

স্কেটিংএ ফরাসীদের খুব উৎসাহ। এ ছাড়া তাদের উৎসাহ দেখা যায় তলোয়ার বা ছোরা খেলায়। এ খেলাকে তারা শুধু খেলা হিসেবে ধরে না, ব্যায়াম হিসেবেও ধরে। আর এতে শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও যোগদান করে।

সম্প্রতি জিম্‌নাষ্টিকে (Gymnastic) তারা মন দিয়েছে খুব। শুনেছি জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী-জার্ম্মান্ যুদ্ধের পর থেকে ঐ ব্যায়াম ফরাসীতে প্রচলিত হয়েছে। এখন ফরাসী দেশের প্রতি সহরেই একটা 'জিম্‌নাষ্টিক ক্লাব' খোলা হয়েছে।

ফরাসীদেশের খেলা-ধূলার কথা উঠতে মন পড়ল বার্লিনের একটি স্মৃতি। অলিম্পিক্ খেলা। হকি ষ্টেডিয়মে খেলা হচ্ছিল ফরাসীদের সঙ্গে ভারতবাসীদের। এক একটি করে আটটি কি দশটি গোল (আমার ঠিক মনে নেই) অক্লেশে ভারতবাসীরা দিয়ে দিল ফরাসীদের। দর্শকদের গ্যালারীতে তিল ধারণের জায়গা নেই। এক একটি গোল ভারতবাসীরা দিচ্ছে আর চারিদিক্ থেকে হাততালি পড়ছে অবিশ্রান্ত। গর্ব্বে আমাদের বুক ভরে উঠছিল। আমার সেদিন এত আনন্দ হয়েছিল যে মনে পড়ে আনন্দে দু'ফোঁটা জলও চোখে এসেছিল। মনে হচ্ছিল আমাদের মত হতভাগ্য জাতিরও আনন্দের একটা হেতু আছে তা' হলে।

তার বোধ হয় দিন দুই পরেই ফাইনাল খেলা, ভারতীয় দল বনাম জার্ম্মান্

দল। বহুদিন আগের থেকেই সব টিকেট বিক্রী হয়ে গেছে। কিন্তু কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের সাহায্যে একটি পাশ যোগাড় করলাম। ভারতীয় দল যে জিতবে তা সকলেই অনুমান করেছিলাম, কিন্তু খেলার প্রথম অংশে ভারতীয়েরা তেমন ভাল খেলতে পারছিল না। দুশ্চিন্তায় আমাদের মুখ শুকিয়ে উঠছিল। কিন্তু শেষের অংশে ভারতীয়েরা এ খেলাতেও প্রায় আট গোল (আমার ঠিক মনে নেই) জার্ম্মান্‌দের দিয়েছিল। কিন্তু সে বছর সে পর্য্যন্ত কোন জাতের কাছ থেকেই তারা একটি গোলও খায় নি, প্রথম একটি গোল খেল জার্ম্মান্‌দের কাছে। "ওলিম্পিয়া ৎসাইটুং" নামে একটি সংবাদপত্রে ছবি দেখলাম 'Dhyan Chand' ধ্যানচাঁদ ও 'Roop Singh der Hockey-Fakir' (হকি-ফকির রূপ সিং) এর।

অলিম্পিয়ার খেলার সময় অনেক ভারতীয় বার্লিনে গিয়েছিলেন। বার্লিনবাসী যত ভারতীয় সকলে মিলে চাঁদা করে টাকা উঠিয়ে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মেডেল দেওয়া হ'ল ও সেই উৎসবে একটি ভোজেরও আয়োজন করা হ'ল।

ফাইনাল খেলার পরদিন রাস্তায় বের হওয়া এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে উঠল। রাস্তায় কত ছেলেমেয়ে যে ঘিরে দাঁড়াল তার ঠিক নেই। সকলের মুখে শুধু এক কথা—"আপনি কি ধ্যানচাঁদ রূপসিংয়ের দেশের লোক? দয়া করে আপনার দেশী অক্ষরে একটি 'অটোগ্রাফ্' লিখে দিন।" শেষে এমন হ'ল পালিয়ে পালিয়ে জনশূন্য রাস্তায় অথবা পার্কে বেড়াতে পারলে যেন বাঁচি। দিন কয়েক ধরে সে ঝোঁক বার্লিনে ছিল; তার পর গুণে দেখলাম ষাটটি অটোগ্রাফ সবশুদ্ধ দিয়েছি। অলিম্পিয়ার সময় ভারতীয়দের গৌরব যেন বার্লিন সহরময় ছড়িয়ে পড়ল। একে হকি খেলার গৌরব, তার পর মেনকার ভারতীয় নৃত্য। এর মাস কয়েক আগে নেচে গিয়েছে উদয়শঙ্করের দল। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী তো এক রকম তাদের কাছে আটপৌরে নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ দিন কয়েক ধরে ভারতবর্ষ ইউরোপে যতটা গৌরবময় দেশ বলে পরিগণিত হয়েছিল অতটা আমার চার বছর ইউরোপে অবস্থান কালে কখনও হ'তে দেখি নি।

ভার্সাই সহর প্যারিস্ থেকে মাত্র বার মাইল দূরে। ভার্সাইএর সব

চাইতে বড় আকর্ষণ হচ্ছে চতুর্দ্দশ লুইএর প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন একটি সুন্দর আর্ট গ্যালারী। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ বাগান। ভার্সাইএ কত যে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে তার শেষ নেই। সব চেয়ে আধুনিক যেটা সেটা ১৯১৪—১৮ সালের মহাযুদ্ধের অবসানের পরে। এই ভার্সাইএ বসে ১৯১৪—১৮ সনের মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানী ইংলণ্ড, ফরাসী ও তাদের মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধির খসড়া সই করে।

ভার্সাইএ ফরাসী ভাষা না জানার দরুণ একবার একটু মুস্কিলে পড়েছিলাম। সেদিন সমস্ত সকাল ধরে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত ক্ষিধে পেয়েছিল। নিকটে কয়েকটি রেস্তোরাঁ ছিল, কিন্তু সেগুলি বন্ধ করে ভিতরে পরিষ্কার করা হচ্ছিল। একটি দোকানে ঢুকলাম, বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ল সেটি রেস্তোরাঁ। আমরা দুইজন ভারতীয়, কিন্তু কেউই দু'চারটে কথা ছাড়া ফরাসী ভাষার কিছু জানি না। আমাদের দেখে দোকানের মালিক শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল। আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম তারা কেউ ইংরাজী বা জার্ম্মান্ জানে কি না। সে দুঃখের সঙ্গে বল্‌ল, 'না'। তখন আমরা হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে জানালাম আমরা কিছু খেতে চাই। দোকানদার খুব আনন্দিত হয়ে এক বোতল মদ আমাদের টেবিলে এনে রাখলে। বল্‌লাম, 'এ নয়।' দু'হাত প্রসারিত করে ইঙ্গিতে তাকে জানাতে চেষ্টা করলাম, আমরা রুটি চাই। কিন্তু সে মুখ ভার করে মদের বোতলটা উঠিয়ে নিয়ে গেল ও তার বদলে এনে হাজির করল দুটো বড় বড় কলা। মহা মুস্কিলে পড়লাম। আর একজন দোকানদার ভাবল সেই ঠিক ধরেছে আমরা কি চাই। খুব বিজ্ঞের মত আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে গিয়ে নিয়ে এল মস্ত এক শশা। হঠাৎ মনে পড়ল, পকেটে আছে ছোট এক ডিক্‌সনারী। সেটা বের করে তার থেকে রুটিকে ফরাসী ভাষায় কি বলে বের করে তাদের দেখালাম। সমস্বরে দু'জনে "আ—" বলে চেঁচিয়ে উঠল। অর্থাৎ তারা বুঝেছে আমরা কি চাই। তাদের ভেতর একজন ফরাসী ভাষায় কি বল্‌লে বুঝতে পারলাম না। ডিক্‌সনারী খুঁজে কয়েকটি শব্দ যোগ করে আমাদের দেখাল—যার বাংলা মানে হচ্ছে 'আমরা রুটি বিক্রি করি না'। আর একজন আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে

চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে দেখি খুব লম্বা এক রুটি এনে হাজির করেছে। বোধ করি তাদের নিজেদের খাওয়ার জন্য ঐ রুটি ছিল। যাক্, সে বেলা রুটি চিবিয়ে এবং শশা ও কলা দিয়ে কোন রকমে পেট ভরাতে হ'ল। কিন্তু তাদের আতিথ্য আমাদের ভারী ভাল লাগল। আজও ভার্সাইএর কথা মনে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই মধুর আতিথ্যটুকু মনকে স্পর্শ করে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাউল

শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত

বল্ রে বাউল, কোথায় পেলি
এমন উদাস মন?
দুঃখ-ভরা বিশ্ব মাঝে
হাসিস্ অনুক্ষণ!
গ্রামের শেষে নদীর ধারে
ভাঙ্গা মাটির ঘর,
তারই মাঝে তোমার বাসা
নাই কো আপন-পর।

সূর্য্যি যখন ঝিলিক উঠায়
পূব্-আকাশের পারে—
ঘুরে বেড়াস তখন হ'তে
পথের ধারে ধারে।
আধেক-ছেঁড়া গেরুয়া তোর,
এলোমেলো চুল,
গলায় দোলে রুদ্রাক্ষ,
কানে বুনো ফুল।

হাতে নিয়ে একতারাটি
বেসুরে গাস্ গান,
ভরা আছে সেই গানেতে
তৃপ্তি অফুরান্।
আঁধার যবে ঘনিয়ে আসে
হৃদয়-গহন মাঝে—
আমার মনের রাগ-রাগিনী
বেসুর হ'য়ে বাজে,

সব-ভোলানো তানে রে তোর
কি আছে না জানি।
সব ভুলিয়ে দেয় গো মোরে—
সুরের ঝর্ণা আনি।
ওরে বাউল, ও ঘর-ছাড়া,
তোরেই ভালবাসি ;
ইচ্ছে করে তোরই মত
পথে পথে ভাসি।

অঙ্কের খেলা

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

নীচের অঙ্কটি একটা কাগজে লিখিয়া নাও—

০৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭

লিখিয়াছ? বেশ, এইবার অঙ্কটিকে ১ হইতে ৯ এর মধ্যে যে কোন সংখ্যা দিয়া গুণ কর। এবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ তোমার গুণফলের মধ্যে উপরের অঙ্কটিই রহিয়া গিয়াছে—গুণফলের কোন না কোন জায়গা হইতে পর পর সমস্ত অঙ্কটি পাইবে। যেমন ধর, ৪ দিয়া গুণ করা যাক্। উত্তর হইল ২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭০৫৮৮। বাঁ দিক্ হইতে ত্রয়োদশ (ডান দিক্ হইতে ৪র্থ) সংখ্যা হইতে দেখিয়া যাও। ৪টি রাশি পর পর তোমার অঙ্কের গোড়ার সহিত মিলিতেছে তো? বাকীটা? বাঁ দিকের গোড়া হইতে সুরু করিলেই পাইবে।

৪ ছাড়া অন্যান্য সংখ্যা দিয়াও গুণ করিয়া দেখ কি হয়। কেমন, বন্ধু-বান্ধবদের তাক্ লাগাইয়া দেওয়া যায় না কি?

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম পুরস্কার পাবেন—শ্রীদেবব্রত রায় (কলিকাতা),
২য় পুরস্কার পাবেন—শ্রীমতী শ্রীলেখা দেবী (এলাহাবাদ),
৩য় পুরস্কার পাবেন—কুমারী নূরজাহান বেগম (ঢাকা)।

এ ছাড়া শ্রীসত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ), মমিনুর রহমান (বরিশাল), শ্রীবাসুদেব বসু (ঢাকা), শ্রীরঘুনাথ দাশগুপ্ত (ভাগলপুর)—এঁদের লেখাও বেশ ভাল হয়েছে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

শ্রীগৌরী দেবী

বদ্যিনাথের বড়ি—শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ, প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০

বাংলা ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা বই কিছু দিন যাবৎ বন্যাস্রোতের মতই প্রবল বেগে বেরুচ্ছে। কিন্তু পড়ে মনে হয় ছেলেদের জন্য লেখা হ'লেও তাদের অনেকগুলিই ছেলেদের হাতে না পড়াই মঙ্গলজনক। কোন কোনটা তো ছেলেদের দিক দিয়ে রীতিমত আপত্তিকর। এ হেন সময়ে শ্রীযুক্তা লীলা দেবীর 'বদ্যিনাথের বড়ি' পড়ে মনে হ'ল বহুদিন পরে ছেলেমেয়েরা একখানি সত্যিকারের ভাল বই—হাসির বই—মজার বই পড়তে পেল। বছর কয়েক আগে অধুনালুপ্ত 'সন্দেশ' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় লীলা দেবীর (তখন তিনি ছিলেন কুমারী লীলা রায়) কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিল, এবং মনে পড়ে সেই প্রথম আবির্ভাবের সময়েই অনেক কড়া সমালোচক পর্য্যন্ত সপ্রশংস বিস্ময়ে এই প্রতিভাশালিনী লেখিকার অপূর্ব্ব রস-সৃষ্টির ক্ষমতার উল্লেখ করেছিলেন। তার পর ইদানীং কিছুদিন লেখিকার লেখা ক্বচিৎ কোথাও দেখতে পাই, সেটা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এত দিন পরে এই অনবদ্য গল্পগুলি পুস্তকাকারে দেখে আশ্বস্ত হলাম। প্রকাশককে অজস্র ধন্যবাদ।

এই গল্পগুলির মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর লেখিকার অদ্ভুত নিজস্ব রসঘন রচনাভঙ্গী,—আর পরিস্থিতি-সৃষ্টির কৌশল। ছেলে-বুড়ো সমান কৌতূহলে এ বই পড়বে এবং পড়ে মুগ্ধ হবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে আমরা বইখানা পড়ে দেখতে বলি।

বইএর ভিতরকার ছবিগুলি সব লেখিকার নিজের হাতে আঁকা। সামান্য ২।১টি রেখার টান, কিন্তু সেগুলি লেখার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছে। শ্রীযুক্ত শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা মলাটের তিন রঙা ছবিখানাও হয়েছে অনবদ্য।

পত্রপাঠ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

পিতা দিলেন পত্র অনেক দিনের পরে,
পড়ে দু'চার ছত্র দুই চোখে জল ঝরে।
"মা মারা গিয়েছে তোর—" রয়েছে লেখা,
কেঁদেই আকুল আমি—যেমনি দেখা।

কান্নাকাটি জবর চল্‌ল ক'দিন ধ'রে,
আর আছে কি খবর দেখতে গেলাম পড়ে।
"মামারা গিয়েছে তোর—" তার পরেতে,
"রাতের ট্রেনেতে চলে দেওঘরেতে।"

"রুল্ অফ থ্রী"

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

প্রশ্ন—ছ' দিনে ন' বেঙ যদি
দু' বেঙাচি খায়,
ন' চীনে ছ'দিনে তবে
ক' বেঙ্ উড়ায়?

উত্তর—বেঙ্ খায় কাদাঘাঁটা—
বেঙাচি সে খায় না,
চীনে খায় তেলা-জজু,
বেঙ্ টেঙ্ চায় না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন হয়ে গেছে। এই পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন দু'জন,—বিদায়ী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, আর মিঃ উইল্‌কি। উইল্‌কির জীবনের ইতিহাস খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে তাঁকে বড় হ'তে হয়েছে। এক সময় নাকি তিনি আলুর দোকানেও চাকরী করেছেন। সেই লোকই এত শীগ্‌গির আমেরিকার মত এত বড় দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবেন এ কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এমন কি ভোট নেবার আগে পর্য্যন্ত কে জয়ী হবেন সে বিষয়েও লোকে নিশ্চিত

হ'তে পারে নি। অবশ্য ভোট গণনার পর দেখা গেল রুজভেল্ট সাহেবই অনেক বেশী ভোটে জয়ী হয়েছেন। রুজভেল্টই এই নিয়ে পর পর তৃতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হলেন। আমেরিকার ইতিহাসে এটাও বোধ হয় নতুন। এর থেকেই, তাঁর স্বদেশে তিনি কি রকম জনপ্রিয়, তা আন্দাজ করা যায়।

* * *

ইয়োরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ইটালি আক্রমণ করেছে গ্রীস্‌কে। কিন্তু গ্রীস্ সে আক্রমণে বিচলিত হয় নি,—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপুল বীরত্বে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, গ্রীক্ আর রোমান্ এই দুই প্রাচীন সভ্যতা—পৃথিবীর ইতিহাসে যাদের তুলনা কমই আছে, তারাই আজ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে! যদিও বর্ত্তমান ইটালিয়ান্ শক্তির তুলনায় বর্ত্তমান গ্রীসের শক্তি কিছুই নয়, তবু গ্রীক্‌দের হাতেই ইটালিয়ান্‌দের দস্তুরমত নাস্তানাবুদ হ'তে হচ্ছে। গ্রীক্ সৈন্য আল-বেনিয়ার নানা স্থানে জয়লাভ করছে,—ইটালিয়ান্‌দের রণসম্ভার দখল করছে, সৈন্যদের বন্দী করছে। তাদের অদ্ভুত বীরত্ব দেখে জগৎ বিস্মিত হয়েছে। ইংরেজরাও গ্রীক্‌দের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছে।

ওদিকে বিমান-যুদ্ধ, জাহাজ-ডুবি সমানে চলেছে। উত্তর-আফ্রিকার নানা জায়গায় অবিরত সংগ্রাম হচ্ছে। কোথায় এর শেষ কে জানে?

* * *

ইতিমধ্যে কল্‌কাতায় আর একবার বিমান-আক্রমণের মহড়া হয়ে গেল। রাত্রে এক ঘণ্টার জন্য সমস্ত শহরের আলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল—শুধু যেখানে আলো না রাখলে নয় সেখানে এমন ভাবে রাখা হয়েছিল যাতে বাইরে থেকে তা দেখা না যায়। কর্ত্তৃপক্ষ এরোপ্লেনে চড়ে সহরের উপর ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেছেন নিষ্প্রদীপ অবস্থায় আকাশ থেকে কল্‌কাতার বিশেষ বিশেষ জায়গা চেনা যায় কি না।

* * *

সম্প্রতি নেভিল চেম্বারলেন্ সাহেবের মৃত্যু হয়েছে। এই অল্প কিছুদিন আগেও ইনিই ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। যুদ্ধ বন্ধ রাখবার জন্য ইনি প্রথমটা অনেক চেষ্টা করেছিলেন—"মিউনিক্ চুক্তির" কথা তোমাদের বোধ হয় মনে আছে। যুদ্ধ সুরু হবার পরও ইনি কিছুদিন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তার পর জার্ম্মেনীর নরওয়ে আক্রমণের পর ইনি পদত্যাগ করেন এবং চার্চ্চিল সাহেব হ'ন প্রধান মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেও চেম্বারলেন সাহেব কিছুদিন মন্ত্রিসভায় ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ ব'লে অবসর নিতে বাধ্য হন।

প্রথম জীবনে চেম্বারলেন ছিলেন ব্যবসায়ী। ১৯২৩ সনে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হ'ন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই যশের উচ্চশিখরে উঠতে সমর্থ হন। শেষে বল্‌ডুইন্ সাহেব অবসর নিলে তিনিই হ'ন প্রধান মন্ত্রী।

* * *

শীগ্‌গিরই কল্‌কাতায় একটা নতুন ধরণের ফুটবল-প্রতিযোগিতা হবে। এর নাম "কোয়াড্রাঙ্গুলার" ফুটবল্-প্রতিযোগিতা। হিন্দু, মুসলিম্, ইয়োরোপীয়ান্ ও য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ এই চার দলের বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে। ক্রিকেটে এই ধরণের খেলা হয়ে থাকে কিন্তু ফুটবলে এ ধরণের

প্রতিযোগিতা এদেশে ইতিপূর্ব্বে হয় নি। যুদ্ধ-ভাণ্ডারে চাঁদা তুলবার জন্যই এই অসময়ে তা ছাড়া এই সময়টাও ফুটবলের মরসুম নয়। এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে।

রামধনুর বেশীর ভাগ পাঠক-পাঠিকাই বোধ হয় এখন বাৎসরিক পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত; তাই এবারে আর লম্বা চিঠি দেব না। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল তোমাদের জন্য লেখা পাঠিয়েছেন—একটু দেরীতে; কাজেই সেটা আসছে বার তোমাদের উপহার দেব। তোমাদের যে সব চিঠি আমাদের কাছে জমেছে তারও ব্যবস্থা হবে পরের বারে।

আর একটা কথা, তোমাদের কেউ কেউ ঠিকানা বদলালে সময় মত আমাদের জানাও না, তার পর পত্রিকা না পেলে আবার আর একখানা নতুন ক'রে নতুন ঠিকানায় পাঠাতে বল। আমাদের কার্য্যালয় থেকে প্রত্যেকটি ঠিকানা পরীক্ষা ক'রে তার পর কাগজ পাঠান হয়—কাজেই এখান থেকে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সময় মত ঠিকানা না জানালে পত্রিকা আগের ঠিকানায় গিয়ে হারাতে পারে এ আশঙ্কা তো খুবই স্বাভাবিক। আশা করি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে তোমরা আরও সতর্ক হবে।

—রাঃ সঃ

বড়দের ছোট খবর

[সংবাদ]

শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা অমর হয়ে আছেন এমন কয়েক জন মনীষীর কতকগুলো অদ্ভুত খেয়ালের কথা আজ তোমাদের বলব। এঁরা সকলেই অবশ্যি পাশ্চাত্য দেশবাসী। আমাদের

দেশের বড় বড় লোকদের সম্বন্ধেও এ রকম কাহিনী অনেক শোনা যায়। সে সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

জার্ম্মানীর বিখ্যাত সাহিত্যিক শীলারের একটা ভারী অদ্ভুত খেয়াল ছিল। লিখবার সময় তিনি নাকি পায়ের তলায় বরফের চাঁই চেপে রাখতেন, আর মুহুর্মুহুঃ পচা আপেলের গন্ধ শুঁকতেন। এর থেকেই নাকি তাঁর ভয়ানক 'ইন্স্পিরেশন্' বা অনুপ্রেরণা আসত। তাঁর চাকরদের একটা কাজই ছিল মনিবের জন্য সব সময় বরফের চাঁই আর পচা আপেল যোগাড় করে রাখা।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের সময়ে তাঁর মত অঙ্কে মাথা আর কারও ছিল না। কিন্তু কিছু কিনে, ভাঙ্গান পয়সা হাতে পেয়ে এই বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ নাকি বড়ই মুস্কিলে পড়তেন! কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারতেন না। পয়সাগুলো বারে বারে গুণতেন আর ভাবতেন, ঠকলেন কি-না।

ফ্রেড্রিক্ দি গ্রেটের নাম, যারা একটু-আধটু নানা দেশের ইতিহাস চর্চ্চা কর তারাই, হয়তো শুনেছ। প্রাশিয়ার এই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা নাকি জীবনে দু'টি তিনটির বেশী কোট গায়ে দেন্ নি। জামা বদলান তিনি ভয়ানক অপছন্দ করতেন। মাসের পর মাস তিনি একই জামা পরে কাটিয়ে দিতেন।

ব্রিটীশ সমর-বিভাগের লর্ড্ রবার্টস বীরত্বের জন্য 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্' পেয়েছিলেন। কিন্তু বেড়াল দেখ্লেই এই সাহসী বীরপুরুষটি ভয়ে লাফাতে সুরু করতেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেন্রী সম্বন্ধেও ওই রকম কথা শোনা যায়।

ডক্টর জন্সন্ ছিলেন ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। রাস্তায় হাঁটবার সময় তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল—রাস্তার রেলিঙের প্রত্যেকটী ডাণ্ডা তিনি ছড়ি দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে চল্তেন। যদি কোন একটি হঠাৎ বাদ পড়ে যেত তা' হ'লে ফিরে এসে সেটাকে ছুঁয়ে আবার চলতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে এই করলে হয়তো সমস্ত দিনটা তাঁর ভালো যাবে।

বিখ্যাত সুরস্রষ্টা বীঠোফেন্ অতি শীতের সময়ও মুখে বরফ-জল ছিটাতে ভালোবাসতেন; আর সেই সময় চীৎকার ক'রে বকাবকি করতেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) আরব (২) মিশর (৩) পারস্য (৪) কানাডা বা অন্ধ্র (৫) সুমাত্রা (৬) পোলাণ্ড।

উত্তরদাতাদের নাম

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ; মল্লিমামুকুল দত্ত (মেদিনীপুর) ; প্রফুল্ল, জগৎ, কৃষ্ণবরণ, পূত, জ্ঞান (বাণীমন্দির—মুড়াগাছা) ; লীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর) ; অঞ্জলি চৌধুরী, বিজু, তুলু, টুকু, মিঠু বাচ্চ, শ্যামল, মিত্রা (কলিকাতা) ; গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (ন.কড়াকোন্দা) ; ফুলদা, মামু, সবিতা, মাধুরী, বিজু (ঢাকা) ; নন্দলাল ভট্টাচার্য্য ও কেষ্টদা (পাটনা) ; পীণ্টু, উষা, উমা, আভা, সমর, সুধীর, রুচি, রেখা, তপু, ডলি, মঞ্জু (কলিকাতা) ; দীপালি, সাধনা, দীপক রায় (জলপাইগুড়ি) ; বাবু, জেবউন্নিসা (পার্ক সার্কাস) ; সন্তু, বুলু, বীরেন, অমর, সৌরীন্দ্র তালুকদার (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ; অশোক, কালু, খুকু দি, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না, ঝরণা, তূলিকা, পূর্ণেন্দু, কাকা ও কাকীমা (বহরমপুর) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; কালিদাস পাল (বালুভরা) ; রমেশচন্দ্র পট্টনায়ক (রামচন্দ্রপুর) ; অরুণা সেন (কলিকাতা) ; সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা) ; রুণা সিংহ (কটক) ; অজয়কুমার (ইয়ারপুর, পাটনা), মায়া, গীতা, ধীরা, লক্ষ্মী (ধারা রোড) ; রেবা সেন (নয়া দিল্লী) ; সুনন্দা সেন (বরিশাল) ; বিমলেন্দু ভট্টাচার্য্য (কক্সবাজার) ; ছোড়দি, বাবা, খুকু, বেণু, চন্দন, রজত, রাজা, বাবলা, শিউলি, ফুলু, নেলু, জহর (করিমগঞ্জ) ; দেবব্রত সেন ও দশম মানের বন্ধুবৃন্দ (বেঙ্গলী-স্কুল, ইম্ফাল) ; তৃপ্তি সেন (কালীঘাট) ; দেবব্রত, অনিকেতা, মৈত্রেয়ী, গার্গী ব্যানার্জ্জী ('খেলাঘর'---ভাগলপুর) ; শ্যাম, অমিয়, মানু, মিণ্টা (রাউতাড়া)।

যাঁদের উত্তর কতক শুদ্ধ হয়েছে :—

প্রকাশ, অনিরুদ্ধ, মণিকা ও তরুণকুমার রায় (রাঁচী) ; যজ্ঞেশ্বর, গঙ্গা, খোকা, দুর্গা, অনিল, সুকুমার, প্রশান্ত, যমুনা, অজয়, বিজয়, জ্যোৎস্না, (রাইপুর) ; মদনলাল সরাওগী (গোপালগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

(১) শরীরের কোন্ ২টি অংশ বেছে যুড়ে নিলে দেখা যাবে সেটা মস্ত উঁচু হয়ে গেছে ?

(২) গলার নীচে যা আছে তাকে ঠোঁটের নীচে নেওয়া যায়, কি ক'রে ?

(৩) শরীরের কোন্ জায়গায় চীৎকার যুড়ে দিলে নতুন ক'রে গোলমাল সুরু হবে ?

(৪) তোমার এখানে কি আছে, যার সঙ্গে সুবিধামত শব্দ, অক্ষর বা ফলা, যুড়ে নিয়ে তুমি (ক) রান্নায় লাগাতে পার, (খ) পিঠে চড়তে পার, (গ) চেয়ারে লাগাতে পার, এমন কি (ঘ) চোর-ডাকাতকেও উপহার দিতে পার ?

(৫) বিয়ের সঙ্গে কি তুললে একজন মানী কুটুম্ব এসে হাজির হবেন ?

সুরের সৃষ্টি

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী কারপ্যাচিও
কর্তৃক অঙ্কিত

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৭ {১২শ সংখ্যা

রুগ্ন শিশু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শীর্ণ শরীর, রুগ্ন বালক
দেখিলে পথে কি ঘরে,
সহসা এ মন হয় উচাটন
নয়ন সজল করে।

ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষীণ গোপালের দেহ
টেনে আনে গোটা জগতের স্নেহ,
সাজানো অবনী, ক্ষীর ও নবনী
সবই যে তাহারি তরে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৩শ বর্ষ　　পৌষ, ১৩৪৭　　১২শ সংখ্যা

রুগ্ন শিশু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শীর্ণ শরীর, রুগ্ন বালক
　　দেখিলে পথে কি ঘরে,
সহসা এ মন হয় উচাটন
　　নয়ন সজল করে।

ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষীণ গোপালের দেহ
টেনে আনে গোটা জগতের স্নেহ,
সাজানো অবনী, ক্ষীর ও নবনী
　　সবই যে তাহারি তরে।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

নন্দ হউক অন্ধ তাহাতে
দুঃখ অধিক নাহি,
কানু, বলরাম নাচিয়া বেড়াক
আমরা দেখিতে চাহি।

খেয়াল নাহিক শিব যেথা থাক,
কুমার সবার নয়ন জুড়াক,
তাহার বদনে যেন বিষাদের
রেখাটিও নাহি পড়ে।

ব্যথিত শিশুরে বাঁচাতে, দেবতা,
সব সুধা কর দান,
বালকে না দিলে সে সুধা যে বিষ—
কেমনে করিবে পান ?

যে মহামন্ত্র জানা আছে যার,
কর দেহে নব প্রাণ সঞ্চার।
সবার আশীষ এক সাথে যেন
ও শিশুর শিরে ঝরে।

মাষ্টারী

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

আমার সেজ বোন বিনু, মানুষের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, হাসি, কাসি, হাঁচি, চলা-ফেরা এবং নানা মুদ্রাদোষের নকল করতে ওস্তাদ্। পূর্ণ এগারো বছর পরে আবার যখন হাওড়া ষ্টেশনে পদার্পণ করলাম তখন কাকে কী ভাবে সম্ভাষণ করেছিলাম তার চিত্রটা, বিনু বলে, নাকি এই রকম—

"বুল্লু, তোর চুল ছাঁটা হয় নি কত দিন! ট্রাউজারের 'ক্রিস্'টার দিকে নজর নেই ? দেখ, আমি আমার দীর্ঘ ছ'বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, যে ছাত্রের ট্রাউজারের ক্রিসের দিকে খেয়াল নেই তার জীবনে উন্নতি হয় নি। ইউরোপের সভ্যতার চারটে বীজমন্ত্র—পরিষ্কার কলার, ট্রাউজারের ক্রিস্, ঝক্‌ঝকে জুতো এবং ক্ষৌরকার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। টাটুর চেহারাটা মন্দ হয় নি, কিন্তু ও ধুতি পরা চল্‌বে না হে! ধুতির মায়া ছাড়ো। ধুতির রেওয়াজ আমাদের ভদ্রসমাজে ছিলই না। ও বেশী দিনের জিনিষ নয়, ষাট সত্তর বছরের বেশী হবে না। পাঞ্জাবীর এমন কি একটা বাংলা নাম পর্য্যন্ত নেই, আর ঐ ধুতি পাঞ্জাবীকেই তোমরা বাংলার জাতীয় পোষাক বলে চালাচ্ছ! যেমন এই বর্দ্ধমানে রাদিওতে শুনে এলাম তুর্কী আর আরবী সুরকে বাঙ্গালী। বাংলার নানা নতুন ঢঙের সুর বলে চালাচ্ছে। ফাঁকী দিলেই হ'লো ? ইস্তাম্বুলে, বোঘ্দাদে, বস্‌রায় যে সব সুর শুনে এলাম এ দেশে এসে শুনি সেই সবই সুর, শুধু তাতে এক লোটা, আধ লোটা বাউল আর ভাটিয়ালী মেশানো। জ্যোতির্ম্ময়,

দেখ তুমি একটু বেশী মোটা হয়ে পড়েছ। তোমার খাওয়া কমাও, এবং সকাল বিকেল মুগুর ভাঁজো; আর না হয়, পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে এসো টালিগঞ্জ থেকে ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত। মিনা, তোর এমন হাত সরু সরু, পা নেলুয়া মূর্ত্তি হয়েছে কেন ? টেনিস খেলিস না বুঝি ? শুধু ফিলজফিতে এম্.এ পড়্‌লেই হ'লো রে! যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এই যে কাগজপত্রে কত রকম খবর পড়্‌তাম, বাংলার মেয়েরা আজকাল ঘোড়-সওয়ারী করছে, সাড়ীর তলায় কৃপাণ নিয়ে পথে বেরোয়, হাণ্টার দিয়ে বেয়াদবদের পিঠের ছাল তোলে, এ সব একেবারে বাজে কথা দেখ্‌ছি। চিনু, ডাক্তারী পড়্‌ছিস, একটু সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখিস নি ? আর পেন্নাম করতে হবে না। তোদের ঐ যাকে তাকে যেখানে সেখানে পেন্নাম ক'রে ক'রেই শির-দাঁড়াটা দুম্‌ড়ে গেছে। বিনু একেবারে জবাকুসুম তেলের অজন্তা-মার্কা ছবি হয়ে গেছে। টুনু, তোর— চিঠিতে এত বানান ভুল থাকে কেন ? রুণু, তুই বড্ডো তাড়াতাড়ি কথা বলিস। তোদের ইস্কুলে বাংলা ভাষায় উচ্চারণ শেখানো হয় না ? ইংলণ্ডে প্রায় প্রতি ইস্কুলে ইংরেজীর শুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর উচ্চারণ শেখাবার ক্লাস আছে। এ দেশে দেখ্‌ছি কিছুই নেই! মণ্টু, তুমি আধা পাৎলুন চড়িয়েছ, আর সার্টটা যে পাৎলুনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হয় তা তোমার জানা নেই ? ও দু'য়ের বার হয়েছে যে! না হয়েছে শর্ট্‌স্ এণ্ড্ সার্ট্, আর না হয়েছে ধুতি পাঞ্জাবী। সার্টটা হচ্ছে 'আণ্ডারওয়্যার', তাকে বাইরে পরা বেয়াদবী; ছি, ছি, দাও ওটাকে ভেতরে পূরে।........."

বিনুর একটু বাড়িয়ে বলা অভ্যেস, ও নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প লেখে। যাই হোক, সকাল সন্ধ্যায় খাবার ঘরে যখন ঢুকি তখন ভাইবোনেরা গা টেপাটিপি করে। একবার একটা ফিস্‌ফিসিনি কথা কাণে এসেছিল, "মাষ্টার মশাই ক্লাসে এলেন, সবাই উঠে দাঁড়াও।" সকাল বিকেল চা খাওয়ার সময় আমি নাকি অনর্গল বক্তৃতা দিই। কথাটা তারই ওপর ঠেস দেওয়া।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে বহুদিন বাক্যালাপ নেই। যাদের সঙ্গে একটু-আধটু খোস-গল্প চল্‌তো, আট, দশ, বারো বছর আগে, তাদের বয়স "আ'নি"র কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। তাদের, থুড়ি—তাঁদের অনেকেই আজ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করছেন সুতরাং তাঁদের ওপর মাষ্টারী করতে গেলে হয়তো কেউ ব'লে বস্‌বেন, "দেখুন, আপনাদের যুগে যা চলেছিল—" আড়ালে বল্‌বেন, "বুড়োগুলোর ভারী বকা অভ্যেস।" অথচ দেশে ফিরে অবধি এত বেখাপ্পা, বেয়াড়া জিনিষ আখছার চোখে পড়ছে যে না বকে পারি না। তাই সম্পাদক মশাইয়ের অনুমতিক্রমে আমার চায়ের টেবিলের বক-বকানিটা (বিনু বলে বক্-বকুমকুমানি) এবার রামধনুর আড্ডা-ঘরে এনে হাজির করি। বড়রা যাক্ হাওয়া খাবার নাম ক'রে কলকাতার

দুর্গ-পল্লীর মুক্ত বায়ুকে চুরুটের ধোঁয়ায় কলুষিত করতে। থাক্ ছোটরা ষষ্টিবুড়োর চারপাশ ঘিরে। ওদের ওপরই কিছুক্ষণ মাষ্টারী করা যাক্।

এইবার "তুমি"ই বলি। দু' দিন পরে তোমাদের কিছু কিছু বানানো গল্প শোনাবো। এখন দু' একটা সত্যি গল্প শোন। ক'লকাতার সহর যেখানে আমার জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই, সে সহরের সাক্ষাৎ পেলাম আজ পূর্ণ এগারো বছর পরে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত যেটুকু পথ তারই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। এ "বিলাতী ডাক" নয়, একেবারে "স্বদেশী ডাক।"

হাওড়া ষ্টেশনে রেলের ফটক পার হয়ে বেশ একটু হতভম্ব হ'য়ে পড়লাম। বহুকাল আগে দেখা যাত্রার আসরের কথা মনে আছে। হেঁট হ'য়ে, পরিবেশন করার ভঙ্গীতে নিম্নবাহু হ'লেই মানুষে হাঁটু ও উরুর একটু তুলে পথ ছেড়ে দিত। কিন্তু ষ্টেশন যুড়ে যারা বসে আছে তাদের সে কায়দাটুকু জানা নেই। চোখের সামনে অনেকগুলো পথ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু গোলক-ধাঁধার অসংখ্য পথের মতই সেগুলো দিয়ে বেরুনো অসম্ভব। পথগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে হয় কারো বিছানা, নয় কোনো পশ্চিমীর চৌকাতে, আর না হয় এমন জায়গায় যেখানে অনেকগুলি অন্ত প্রদেশীয় মেয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে বসে আছে, যেন গোলা-গুলির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে বালির বস্তা। অথচ আমার ভাইবোনগুলো কেমন নির্ব্বিবাদে সে জনসমুদ্র পায়ে হেঁটে পার হয়ে গেল, যেন এক একটি সাক্ষাৎ শঙ্করাচার্য্য! তাদেরই অনুসরণ করে অনেকটা এগিয়েছি, এমন সময় পা ঠেকে গেল কার এক সরা চিঁড়েয়। চিঁড়ের ওপর সযত্নে রাখা ভেলি গুড়ের ডেলাটি পড়ে গেল মাটিতে। কুণ্ঠিত হয়ে বল্লাম, "ও পারদঁ, সরি, মুয়াফ্ কিজিয়ে।" তাকে যে মাফ্ করবার অধিকারটি দেওয়া হ'লো তাতেই গেল তার মেজাজ চড়ে। চেঁচিয়ে উঠলো, "ক্যা তু অন্ধা হৈ?" তার পরই তার নজরে পড়লো আমার সবুট চরণ দু'খানি এবং তারই ওপর ইস্ত্রি-করা ক্রিস্-ওয়ালা ট্রাউজারের গজ খানেক। সেলাম করে বল্লে, "হুজুর, মুয়াফ্ কিজিয়ে, মৈঁ সোচা কি কোই দুস্রা আদমী হোগা। অগর জান্তা কি সরকার হৈঁ তো হুজুরকী-জূতী মৈঁ অপ্না সির পর রখ্তা।" কাছেই এক পুলিস কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে ছিল—বোধ করি ষ্টেশনে শান্তি ও সুব্যবস্থা রক্ষা করবার জন্যে। এগিয়ে এসে লোকটিকে এক ধমক দিয়ে বল্লে—"আরে তূ হট্ যা সসুরা। জ্যায়দা বক্ বক্ করব ত হাম সব চূরা নর্দ্দমামে ফেক্ দেইব।—হট্ যা, এই হট্ যা, অবে পান্ওয়ালা, হট্ যা, সড়ক পর বৈঠ বৈঠ কব দুকানদারী করত হ্যায়! আইয়ে সাহাব, ইধারসে।" বৈতরণী পার করে দিয়ে কনেষ্টবলটি একটি কুর্ণিশ ক'রে আমরা মোটরে না ওঠা পর্য্যন্ত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মোটর চল্লো হাওড়ার পুল পার হয়ে। চিন্তে পারছি, সামনে বড় বাজার, বাঁ দিকে পোস্তার বাজার এবং আহেরীটোলা যাবার পথ, ডান দিকে ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড দিয়ে কলকাতার দক্ষিণ

অঞ্চলের পথ। বড় বাজারের মোড়। সারি দিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে চলেছে কলকাত্তা থেকে গ্রামবাসী বাঙ্গালী কেরাণীর দল। প্রায় সবার হাতেই একটি করে ছোট পুঁটুলি, শাকসব্জী বোধ হয় গুগুলো, বেগুনের বোঁটা দেখা যাচ্ছে, হাতে গোটা পান। এগারো বছর আগে কেরাণীদের যে চেহারা দেখে গিয়েছিলাম তার একটুও বদল হয় নি। বাংলার গ্রামের অবস্থাও বোধ করি চরমে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে সহর থেকে আজকাল বোধ হয় শাক-সব্জীও চালান করতে হয়। বড় বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখ্লাম। মনে পড়লো ইউরোপে ভারত-প্রবাসী এক কন্সাল-পত্নীর সঙ্গে একবার কী ঝগড়াই না করেছিলাম এই বড় বাজারের ফিল্ম্ দেখিয়েছিলেন ব'লে। চার, পাঁচ, ছ'তলা বাড়ীর বারান্দায় সারি সারি শাড়ী শুকোচ্ছে, ভুঁড়ি বার-করা মিঠাই-ওয়ালা জিলেপী ভাজ্তে ভাজ্তে নাক ঝাড়লে, পথে একটা ধর্ম্মের ষাঁড় একটা সব্জীর দোকান থেকে একটা ফুলকপি তুলে নিলে। সব্জী-ওয়ালা পশ্চিমী, কপালে তিলক-কাটা, গলায় মোটা পৈতে, দোকান থেকে লাফিয়ে পড়ে খড়ম দিয়ে ষাঁড়টার মাথায় প্রাণপণ-শক্তিতে প্রহার সুরু করলে। তার চোখে হিংসার অগ্নিশিখা। গান্ধীজী প্রচারিত অহিংসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে দৃশ্যে হল্শুদ্ধ লোক হো হো করে হাস্তে লাগ্লো। ফিল্ম্ দেখানো শেষ হ'লে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে জোর গলায় ফিল্মের প্রতিবাদ করলাম। অনেক বাক্যাড়ম্বর দিয়ে প্রমাণ করা গেল উক্ত কন্সাল-পত্নী ভারত-বিদ্বেষী। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী আমার সঙ্গে একমত হ'লেন। সত্যিই ত' এও কি সম্ভব? ভারতবর্ষে? যে দেশের মানুষ বেদ-উপনিষদ্

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল

বানিয়েছেন? এই রকম কী গোটা কয়েক যুক্তি দিলেন একটি ভদ্রলোক জোর গলায় [illegible]িয়ে উঠে।

বেদ-উপনিষদের দেশ। পথের এক ধারে ভিড় জমেছে। মোটরের গতি রুদ্ধ হ'লো। ভিড়ের ফাঁকে দেখা গেল একখানা রিক্শা। তার ওপর বিপুলকায় মারোয়াড়ী দম্পতি, দু'জনের ওজন ৫৷৷০৷৬ মণের কম হবে না, শূন্যে পা তুলে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে, এবং রোগা টিংটিঙে চেহারার রিক্শা-ওয়ালা গাড়ীর ধুরা আঁকড়ে ধ'রে ঝুল্‌ছে, যেন প্যারালেল্‌-বারের ওপর কী একটা কসরৎ দেখাচ্ছে। বেচারা রিক্শা-ওয়ালা প্রাণপণ-শক্তিতে গাড়ীর ধুরাশুদ্ধ মাটিতে নামতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ৬ মণ ওজনের সওয়ারী দু'টিকে মাটি থেকে তোল্‌বার মত তার ডাল-রুটি খাওয়া হিম্মৎ নেই। পথের লোকে এ অভাবনীয় দৃশ্যে চীৎকার ক'রে হাস্‌ছে, কেউ কেউ রিক্শা-ওয়ালাকে "আন্তর থোড়া, হেঁইও" বলে উৎসাহ দিচ্ছে।

মোটর ডাল্‌হাউসী-স্কোয়ারে এসে ঢুক্‌লো। এ জায়গাটাকে একেবারে ইউরোপ ব'লে ভ্রম হয়। ডাল্‌হাউসী-স্কোয়ার থেকে গ্রেট্‌ ইষ্টার্ণের বাড়ী ছাড়িয়ে, ধর্ম্মতলা পার হ'য়ে চৌরঙ্গীতে এসে পড়লাম। এগারো বছরে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি, শুধু চিত্তরঞ্জন য়্যাভেনিউর দিক্‌টা একেবারেই চেনা যায় না। "চিত্তরঞ্জন য়্যাভেনিউ" শব্দটা কাণে লাগে। বাংলাদেশের সহর কলকাতা, তার রাস্তাঘাটের নাম আজও বাংলা ভাষায় হয় নি, ভারী আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। বহুকাল আগে মনে আছে কী কাগজে অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাস্তা-ঘাটের বাংলা নামকরণ সম্বন্ধে একটা রচনা লিখেছিলেন, তবে সে কা কস্য পরিবেদনা। রাস্তা-ঘাটের নাম দেখ্‌লাম সেই যা ছিল তাই—রোড, ষ্ট্রীট্‌, য়্যাভেনিউ, লেন, রো ইত্যাদি। তবে বাংলা হরফে ইংরেজী নাম স্থানে স্থানে নজরে পড়্‌লো বটে। সে যেন আরো বিসদৃশ। চৌরঙ্গী দিয়ে চলেছি। বাঁ দিকে ইমারতের সারি, ডান দিকে খোলা ময়দান। কী সবুজ! ক'লকাতার মত এমন সুন্দর সহর ইউরোপে আখছার দেখি নি। আজকাল ট্রামগুলিও ভারী সুন্দর হয়েছে। ইউরোপে এক ইতালী ছাড়া এমন সুন্দর ট্রাম আমি দেখি নি। ইতালীতেও বোধ করি গাড়ীগুলো এত সুন্দর নয়। একটি ভদ্রলোক ট্রামের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভেঁপুর মত শব্দ ক'রে নাক ঝাড়্‌লেন। ভেঁপুর শব্দে সুরের তারতম্যও আছে। কাণে এলো "রে" আর "পা"।

বিরজীতলার ফাঁড়ি ঠিক সেই রকমই আছে, তার পেছনে তলাও, কাচের মত পরিষ্কার তার জল। জলে সবুজ পাড়'এর ছায়া পড়েছে। বাঁ দিকে একটা পানের দোকানে পাড়ার খান্‌সামাগুলো জটলা করছে, আর চৌরঙ্গীর ঝক্‌-ঝকে রাস্তার ওপর নিঃসঙ্কোচে পানের পিক ফেল্‌ছে। বহুদিন অনভ্যস্ত চোখে মনে হয় যেন যক্ষ্মা রুগীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে ঝলকে ঝলকে।

একটু দূরে চলেছে এক ঝাঁকা-মুটে, মাথায় তার কুণ্ডলী-পাকানো একটি জীবন্ত গো-বৎস। বোঝা গেল এইবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করছি। পোড়া বাজারের কাছে এসে পথ চিন্‌তে একটু ইতস্ততঃ হয়। সমস্ত পাড়াটা একেবারে বদ্‌লে গেছে। ঐখানে ছিল মস্ত পোড়া বাজারের মাঠ। প্রায়ই সেখানে মস্ত মস্ত প্রদর্শনী হ'তো। একবার একটা প্রদর্শনী পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মনে আছে। এখন সেখানে বড় বড় বাড়ী হয়েছে। আধুনিক কায়দায় ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়াও হয়, চোখে পড়লো। মোটরের গতি রোধ হ'লো। একটা প্রকাণ্ড বলদ পথ জুড়ে শুয়ে শুয়ে জাবর কাট্‌ছে। মোটরের ভেঁপুকে গ্রাহ্য করা তার অভ্যেস নেই। বড় বড় কাণ কয়েক বার নেড়ে বোধ করি জানিয়ে দিলে, "যাও না বাবা, পাশ কাটিয়ে, কেন দিক্‌ করো?" তার গোঁ-ই বজায় রইল। গাড়ী পেছু হটিয়ে পাশ কাটিয়েই যেতে হ'লো অবশেষে। জগুবাবুর বাজার চেনা যায় না। পথে কী অসম্ভব ভিড়! ধুতি-পাঞ্জাবী পরা কোল-কুঁজো, কোটর-চোখো, কোমর-ভাঙা "বাঙ্গালীর" দল। পুরুষ মানুষের পৌরুষ নেই, আছে শুধু কোঁচার বহর। পোষাক-পরিচ্ছদে শাদা রংটার বেশ প্রচলন হয়েছে। দেখে আনন্দ হ'লো আগেকার মত বেগুনি ফুলুরী রঙের পাঞ্জাবী পরা রেওয়াজ নেই; কাপড়ের ওপর শার্ট্‌ বা বিলেতী ঢঙের গলা-খোলা কোট পরাও কমেছে। তবে আবার বলি, ধুতি পাঞ্জাবীকে কুলোর বাতাস দিয়ে না তাড়ালে আমাদের দেশে লক্ষ্মী আসবেন না। বাংলার সত্যিকার জাতীয় পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তোমরা, ছোটরা, মাথা ঘামাও। বড়দের দ্বারা ও কাজটা হবে না। ইউরোপের হুবহু নকলের বাপু আমি পক্ষপাতী নই। তবে আমাদের দেশের জলবায়ুর অবস্থা মাফিক্‌ একটা কিছু বানিয়ে নেওয়া উচিৎ, যত শীঘ্র পারি। পথে পথে খুলুক দর্জ্জীর দোকান, বাঙ্গালী জাত আপন পরিচ্ছদের সুষ্ঠুতা সম্বন্ধে সচেতন হোক। খুলুক গণ্ডায় গণ্ডায় পোষাক বানাবার মোটা মজবুত কাপড়ের কল। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদরকে কাণ মলে দিয়ে এস দেশ পার ক'রে।*

গাড়ী হাজরা রোডের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে দুই কনেষ্টবল চৌমাথার ওপর, এক অপরের অন্ততঃ ১৫৷২০ গজ দূরে। হয়ত এক গাঁয়ের বা এক জিলার লোক, যানবাহনের গতিবিধি নির্ণয় করতে করতে তারা দিব্যি মুক্তকণ্ঠে কিসের আলোচনা করছে। মনে পড়লো লণ্ডনের পুলিসের ছবি। তার সুমিষ্ট ব্যবহার, তার গতি নির্ণয়ের কায়দা। ছোট্ট ছেলে একটি রাস্তা পার হচ্ছে। কনেষ্টবলের অঙ্গুলীসঙ্কেতে [illegible] গেল সমস্ত গাড়ী-ঘোড়া, তা হোক্‌ না কেন স্বয়ং রাজার গাড়ী। কনেষ্টবল ছেলেটির হাত ধরে রাস্তা পার করে দিল। দেখেছিলাম পোলদেশের ভারশৌ সহরে একবার একটি কনেষ্টবলের গতি

* সম্পাদক মশাইয়ের কাছে দু'একটা বেফাঁস কথা বলবার অনুমতি নিয়ে নিয়েছি।

নির্দ্বয়ের কায়দা। আর কাজে কী উৎসাহ! সে এমন মনোযোগ দিয়ে আপন কর্ত্তব্য পালন করছে—এমন ভঙ্গী করে যে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলাম। পরে খবর পেয়েছিলাম লোকটি লেখা-পড়া জানা ভদ্র ঘরের। বাংলায় নাকি লেখা-পড়া জানা ভদ্র ঘরের ছেলে পাওয়া যায় না পুলিসি করবার জন্যে।

কালীঘাটের মোড়ের কাছে এসে আবার গাড়ী থামলো। পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে। পেট্রোল ভরা হ'চ্ছে। জবা ফুলের মালা গলায় একটি লোক এসে ব'ললে, "মা দর্শন করবেন নাকি আপনারা? বেশ ভালো ক'রে দর্শন করিয়ে দোবো মশাই। একেবারে মায়ের 'পাদপদ্মে' নিয়ে যাবো মশাই। আসুন না।" জবা-ফুলের মালা গলায় লোকটিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি লম্বা-চুলো লোক লগ্-বগ্গাবং বাজিয়ে গান জুড়ে দিলে আমাদের কাণের কাছে। দেখতে দেখতে মোটরের জানালা দিয়ে পিল্ পিল্ করে দশ-পনেরোখানা হাত ঢুকে পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে রব উঠলো, "অ মা, অ মা বাবা, অ বাবা, দয়া হোক মা, দয়া করো জননী!" অ-বাঙ্গালী গলায় অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ। ভিখ্ না পেয়ে একটি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী এমন ভাবটা দেখালে যে একটা পয়সা না পেলে সে দেখিয়ে দেবে মজা, তার ঐ ব্যাধিগ্রস্ত হাতখানার শক্তি কম নয়!

গাড়ী চলছে টালিগঞ্জের দিকে। এ পাড়াটা আমার একেবারে জানা নেই। কত নতুন বাড়ী উঠেছে রাস্তার দু'পাশে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে সুন্দর ট্রাম-গাড়ীগুলি। ক'লকাতার পথে ঘাটে সভ্যতা ও বর্ব্বরতার কোলাকুলি চলেছে দিনরাত। ভাবছি এই হয়তো সংস্কৃতির চরম রূপ। সুন্দর ও কদর্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা, দর্শন ও বুজরুকীর পাল্লা এ দেশে সমান সমান, নিক্তির ওজনে মাপা। হয়তো ভবিষ্যতে এমন কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে এ দেশে, যিনি নীলকণ্ঠের মত আমাদের সমাজের সমস্ত গরলটুকু হজম করে ফেলবেন।—সুরু হবে জগতে বাঙ্গালী-সভ্যতার যুগ। ভেঁপু বাজিয়ে গাড়ী থামলো। বাড়ী এসে পড়লাম বুঝি।

বিনু বলে, "দাদা বাড়ী ঢুকে কোথায় গুরুজনদের সবাইকে পেন্নাম করবে, এই এত দিন পরে দেশে ফিরল, না বলে বাড়ীর ঝুল ঝাড়া হয় নি কত দিন?"

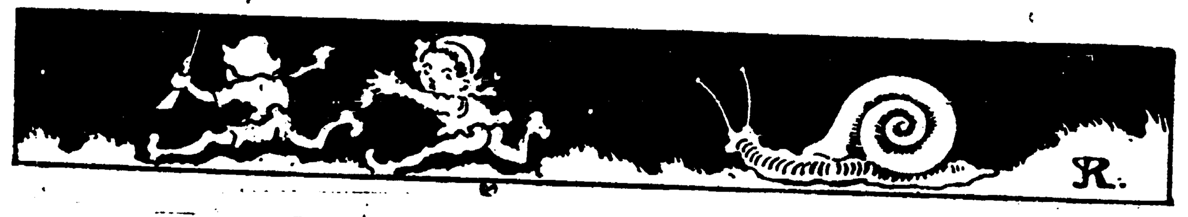

সমস্যা

সমাধান

কবিকিশোর

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্.এ

"ট্রেণ, বিদ্যাধরী আর নেপোলিয়ান"

সত্য সত্যই একদিন চ'লে যেতে হ'ল গ্রামের বাড়ী ছেড়ে। চ'লে যা'বার আগে মূক, স্নেহময়, শান্তিময় পল্লীপ্রকৃতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম।

স্পষ্টই তা'দের উদ্দেশ ক'রে বল্‌লাম, 'বিদায়, বিদায়! আবার ঘুরে এলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'বে।' নিজের মন দিয়ে অনুভব করলাম তা'দের ভাষাহীন শান্তি।

তার পর বড় হ'য়ে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' পড়েছি। তপোবন থেকে শকুন্তলা বিদায় নিয়ে চলেছেন তাঁ'র স্বামী-গৃহে। তাঁ'র বিদায়কালে আশ্রমতরুলতাকুঞ্জগুলি যেন তাঁ'র বিদায়ের সমর্থন কর্‌ছে—"বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ"। অর্থাৎ বাতাসে গাছের পাতারা নড়্‌ছে। তা'রা যেন তা'দের পাতা নেড়ে নেড়ে শকুন্তলার বিদায়ে অনুমতি দিচ্ছে। তখন—অর্থাৎ সেই বড় হ'য়ে 'শকুন্তলা' পড়ার সময়ে এই বিস্মৃতপ্রায় শৈশব মনে পড়েছে। মনে পড়েছে যে আপনার অজ্ঞাতসারেই এই মহামৌন প্রকৃতির সান্নিধ্যলাভ করেছিলাম। তখন সাহিত্য পড়া ছিল না, সাহিত্য যে বিশাল মানব-মহামনের বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি-মনের যোগস্থাপন করে, তা'র পরিচয় জানা ছিল না, জানা ছিল না যে প্রকৃতির স্থান কত বড় সাহিত্যে! কিন্তু আপনা থেকেই এই সাহিত্যের মন আমার সেই ছায়া-প্রচ্ছন্ন পল্লীকুটীরে লালিত হ'য়ে উঠেছিল।

এই ইস্কুলে পড়্‌তে যাওয়ার আগে আরও কোনো কোনো কথা মনে পড়্‌ছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্রেণ দেখেছি কবে, ট্রেণে উঠেছি কবে, সেই কথা। বাড়ীতে পড়াশুনা ভালো হচ্ছে না দেখে বাবা আমাকে সঙ্গে ক'রে যেখানে তিনি থাক্‌তেন সেখানে নিয়ে চল্‌লেন। ট্রেণে যেতে হ'বে অনেক দূর। রাত্রে ষ্টেশনে আসা গেল। বাবা বল্‌লেন, 'খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। ট্রেণ আসার এখনো অনেক দেরী আছে।'...ঘুমিয়ে ছিলাম। একটা গোলমালে ঘুম গেল ভেঙে। বাবা আমার হাত ধ'রে প্রায় টান্‌তে টান্‌তে ট্রেণে নিয়ে এসে তুল্‌লেন। ট্রেণ এসে গেছে। ট্রেণে উঠে দেখি প্রকাণ্ড একটা কামরা। তা'তে যারা বসেছিল তারা সব খোট্টা—হিন্দুস্থানী। একজনও বাঙালী ছিল না। তাদের কালো কালো চেহারা, মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী। কখনো বাড়ীর বাইরে যাই নি। বড় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। ট্রেণ ছেড়ে দিল। খোট্টাদের মধ্যে অনেকেই শুয়ে ছিল, কেউ কেউ বা ব'সে। চলমান ট্রেণে ব'সে সেই রাত্রে আমার মনে হ'ল—এদের কখনো দেখি নি, চিনি না, জানি না। এরা যেন সব ভীষণাকার শত্রু। আর

আমি যেন একজন পৌরাণিক বীর। এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এদের পরাস্ত করতে হ'বে।

...এ কথা কেন মনে হ'য়েছিল জানি নে, বোধ হয় কোনো চমকপ্রদ বর্ণনা পড়েছিলাম কোনো বই-এ। আর তা'দের অচেনা পাগ্‌ড়ী-পরা চেহারাগুলো দেখে তা'দের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ এসেছিল। যাই হোক্, এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভোরের দিকে কল্‌কাতা সহরে এসে পৌঁছানো গেল। কল্‌কাতার কথা বাবার কাছে শুনেছি কত বার। যত বারই শুন্‌তাম, মনে হ'ত একটা অতি ভীষণ কালো জায়গা। মনে মনে কল্‌কাতার যে মূর্ত্তি গ'ড়ে তুলেছিলাম, প্রত্যক্ষ কল্‌কাতা দেখে সে মূর্ত্তির কোনো অদল বদল হ'ল না। শিয়ালদহ ষ্টেশনটা কি ভীষণ কালো! কুলীদের গায়ের উর্দ্দি কালো, এঞ্জিন, ষ্টেশন—সব কালো। ষ্টেশনের বাইরে আলোতে এসে দ্রুত ধাবমান মোটর, লরি, ট্রাম, গাড়ী প্রভৃতি দেখে তাক্ লেগে গেল। শিয়ালদহ থেকে বেলেঘাটা এলাম বাবার পেছনে পেছনে। সেখানে ট্রেণে চেপে ক্যানিং যেতে হ'বে। গাড়ীর দেরী ছিল। আমার এদিকে লেগেছে বিষম জলপিপাসা। বাবাকে বল্‌লাম, 'বাবা জল খা'ব।'

বাবা বল্‌লেন, 'জল খাবি? আচ্ছা দাঁড়া। এনে দিচ্ছি।'

...ঠিক মনে পড়ে না, ষ্টেশনের বাইরে সেডের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। বাবা জল আনতে গেলেন দেখ্‌লাম। তার পর ভিড়ের মধ্যে তিনি যে কোথায় মিশে গেলেন, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সাম্‌নে সব অচেনা মানুষ। কুলীদের ভিড়। গাড়ীর শব্দ। বাবার আস্‌তে দেরী দেখে আমার যেন কেমন ধাঁধা লেগে গেল। মনে হ'ল, বাবা যদি ফিরে না আসেন তা হ'লে কি হ'বে? কি যে হ'বে, কিছুই ঠিক পেলাম না। চোখের সাম্‌নে যা'কে অন্ধকার দেখা বলে—এ ঠিক তাই। কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। একটি কুলী আমার দিকে তাকিয়েছিল। সে কেন জানি না আমার দিকে আগিয়ে এসে বল্‌ল, 'খোকা, কাঁদ্‌ছ কেন?'

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লাম, 'বাবা হারিয়ে গেছে।'

...ঠিক এমনি সময়ে বাবা এক গ্লাস জল নিয়ে আস্‌ছেন দেখ্‌তে পেলাম।

চোখের জল মুছে ফেলেছিলাম ; বাবা বুঝ্‌তে পার্‌লেন বোধ হয়, কিন্তু কিছুই বল্‌লেন না।

*

তার পর ট্রেণে গিয়ে ক্যানিংএ নেমে প্রকাণ্ড এক নদী পেরিয়ে যে দেশে এসে পৌঁছলাম সে এক রূপ-কথার দেশ আমার তখনকার চোখে। নদী—সে যে কত বিশাল, কত বড় নদী!—আমি ত' গঙ্গা দেখেছি তখন, কিন্তু বিদ্যাধরী আমার সেই গঙ্গাকে হার মানালো। তা'র কি বড় বড় ঢেউ! আর আমাদের নৌকো যেন একখানি ছোট্ট খোলার মত তা'র উপরে ভাস্‌ছে। ভেসেই চলেছি—কতক্ষণে গিয়ে যে ওপারে পৌঁছোব, তা'র ঠিক নেই। শুন্‌লাম, কুমীর থাকে শুয়ে তা'র চরে, রোদ পোহায়। আর দেখ্‌লাম, নদীর ধারে ধারে অদ্ভুত সব গাছপালা। খুব ছোট ছোট নারকেল গাছের মত এক রকম গাছ, নাম তাঁ'র হেঁতাল। আরও সব অদ্ভুত ধরণের নোনা দেশের গাছ। সব নামও জানি নে। 'সারাণি' ভাটায় নদীর পলিমাটির উপর অসংখ্য কাঁকড়া দাড়া বা'র ক'রে প'ড়ে আছে। তা'দের দাড়াগুলোই শুধু দেখা যায়। আমাকে একজন মাঝি কোলে ক'রে পলিমাটির উপর দিয়ে 'ভেড়ি'র বাঁধের উপর নিয়ে গেল। ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠ। শুন্‌লাম আগে সব জঙ্গল ছিল। তা'তে বাঘ থাক্‌ত। এখনও বাঘ আছে, তবে অনেক দূরে। সেখানেও রইলাম কিছুদিন।

বাবার কাছে কড়া শাসনে থাক্‌তে হ'ত। খুব ভোরে উঠ্‌তে হ'ত। পড়াশুনা ত' ছিলই। তা' ছাড়া সেখানে সব কাজই নিয়মমত কর্‌তে হ'ত। কোন্ সময়ে যে সেখানে গিয়েছিলাম, ঠিক মনে পড়ে না। সম্ভবতঃ পূজোর আগে। বর্ষা শেষ হ'য়ে গিয়েছে, শরৎ এসে পড়েছে—এমনি সময়ে। খুব ভোরে উঠে মুখটুখ ধুয়ে ছাদে এসে বস্‌তাম। মন আর চোখ মুক্তি পেত। বিশাল নদী আর বিশাল মাঠ—দিগন্তরেখায় কোনো গ্রামের চিহ্ন পাওয়া যেত না। শুধু শ্যামল ধানের ক্ষেত বাতাসে আন্দোলিত। পাখীর মধ্যে দেখ্‌তাম অসংখ্য কাক। গাছের পাতা দেখা যায় না, এত কাক! তা'দের সেই কর্কশ ডাক, অতি সতর্ক নিঃশব্দ কর্ম্মরত কাছারী-বাড়ী—জনবিরল পল্লী ; মনে হ'ত আমার গ্রামের চেয়ে

এ গ্রাম যেন স্নেহহীন, কঠোর এবং এখানকার মানুষের হাতে পরাজিত প্রকৃতি যেন প্রতি মুহূর্ত্তে কোনো অতর্কিত বিপদের আশঙ্কায় স্তম্ভিত হ'য়ে আছে।

কাছারী-বাড়ীর উত্তর দিকের একটি পুকুর আর তা'রই ধারের দু'টি বকফুলের গাছ আমার আজও মনে আছে। একটু অবসর পেলেই সেইখানটিতে গিয়ে বস্‌তাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই বকফুলের গাছ আর সেই পুকুর আমার শিশু-কল্পনার সঙ্গী ছিল। তা'র পাশেই ছিল রান্না-ঘর। সেখানে ঠিক নিয়মিত সময়ে ঠাকুর রান্না কর্‌ত। দু'বেলাই আমি সকলের আগে খেয়ে নিতাম। একদিন ঠাকুর মাছের ঝোল রান্না কর্‌ছে। আমি গিয়ে তা'র পাশে বসেছি। সে বল্‌ল, 'কি খোকা, কি দেখ্‌ছ তুমি?'

বল্‌লাম, 'ঝোল কি ক'রে রাঁধ্‌ছ দেখ্‌ছি।'

…টগ্‌বগ্ ক'রে ঝোল ফুট্‌ছে। কেমন যেন একটু সাদা সাদা রঙ্। বল্‌লাম, 'ঠাকুর, ঝোল সাদা কেন?'

সে একটু হেসে বল্‌ল, 'দেখ্‌বে কি ক'রে ঝোল কালো হ'য়ে যায়?' বল্‌লাম, 'দেখ্‌ব।'

তার পরে সে একটা ছোট কাঠি দু'খানা ক'রে ভেঙে ফুটন্ত ঝোলের মধ্যে ফেলে দিল। খানিক পরেই দেখি, ঝোল কালো হ'য়ে গেছে।…কাঠির গুণেই অথবা আপনা থেকেই উনুনের আঁচে ঝোল কালো হ'য়ে গেল কি না জানি না। তবে, তখন অবিশ্বাস কর্‌বার প্রবৃত্তি হয় নি। তখন ভেবেছিলাম ফুটন্ত ঝোলে কাঠি ভেঙে ফেলে দিলেই বুঝি ঝোল কালো হ'য়ে যায়।

…দেশে আমাদের বাড়ীতে তখন পাথুরে কয়লা জ্বালানির জন্যে ব্যবহার করা হ'ত না। এখানে এসে সন্ধ্যার দিকে কয়লার উনুনে যে আঁচ দেওয়া হ'ত, তা'রই ধোঁয়ার একটি মিষ্ট মিষ্ট গন্ধ আস্‌ত। সেটি বড় উপভোগ্য হ'ত। সেখানেও আমার দূর সম্পর্কের এক দাদা ছিলেন, সন্ধ্যার দিকে তাঁ'র সঙ্গে ব'সে নানা বিষয়ের আলোচনা হ'ত। এখানে এসে পেয়ে গেলাম নানান্‌তরো বই। অনেক সচিত্র মাসিকপত্র, উপন্যাস, জীবনী প্রভৃতি পেয়ে গেলাম এঁদের কাছে। তা'র মধ্যে মনে আছে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা। আর বসুমতী

সাহিত্য-মন্দিরের প্রকাশিত দীনেন্দ্রকুমারের 'নেপোলিয়ান' জীবনী। প্রকাণ্ড আকারের নেপোলিয়ান আমার অবসরের নিত্য সঙ্গী হ'য়ে উঠ্‌ল। সেই প্রকাণ্ড বইখানা খুলে ব'সে থাক্‌তাম। তা'তে আছে অসংখ্য যুদ্ধের ছবি—সেইগুলো দেখ্‌তাম ব'সে ব'সে। 'কর্শিকা দ্বীপ প্রকৃতি মাতার সুরম্য লীলানিকেতন'...এই তা'র প্রথম বাক্য। প্রথম থেকে খানিকটা পড়্‌তাম চেঁচিয়ে। কর্শিকার বর্ণনা বেশ লাগ্‌ত। মাঝে মাঝে ছবিগুলোর অর্থ বুঝ্‌বার জন্য চেষ্টা করতাম। তা'তে একটু যা' পড়া হ'ত। আমার সেই দাদা আস্‌তেন মাঝে মাঝে। বল্‌তেন, 'ইংরেজী কি রকম পড়্‌লে বলো। কথা বল্‌তে পারো ইংরেজীতে?'

বল্‌লাম, 'না।'

'তা হ'লে তুমি ইস্কুলে কি ক'রে পড়্‌বে? কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইস্কুল! নবদ্বীপের ইস্কুলে পড়্‌বে যে, পড়াশুনো, খেলা—বেশ থাক্‌বে সেখানে।'

বল্‌লাম, 'তাই না কি?'

'হ্যাঁ রে, খুব চমৎকার জায়গা নবদ্বীপ। আর মাষ্টাররা ইংরেজী ছাড়া কথাই বলে না।'

মনে খুবই ভয় হ'য়েছিল। ইংরেজী ছাড়া যা'রা কথা কয় না, না জানি তা'রা কেমন! অজানা ইস্কুল! কি যে হ'বে সেখানে এই ভেবে ভালো ক'রে ঘুমোতে পারতাম না। মাঝে মাঝে সাহিত্যের ছবি দেখ্‌তাম। সে সময়ে কবি অক্ষয়কুমারের কবিতা ভালো লাগ্‌ত।

"সুপ্ত গ্রাম, দ্বিপ্রহরা অমা নিশীথিনী।
গাঢ় আলিঙ্গনে তা'র মূর্চ্ছিতা মেদিনী॥"

এই চরণ দু'টি পড়্‌লে এখনো আমার মনে বিদ্যাধরীর ওপারের দৃশ্য-পট জেগে ওঠে। গভীর রাত্রে সেখানকার একটা ভীষণ স্তব্ধতা—নির্জ্জন প্রকৃতির স্বপ্নরোমাঞ্চময় আবেশ এখনো যেন ঐ দু' চরণ কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

সেখানে খুব প্রকাণ্ড মোটা মোটা আখ হ'ত। তা'র আস্বাদ নোন্‌তা। বোধ হয় লোনা দেশ ব'লে। কাছারী-বাড়ীর সম্মুখটায় একটা ফুলের বাগান ছিল। সেখানে ফুলগাছের চেয়ে কলাগাছ হ'ত বেশী। কলার ঢাল ঢাল পাতাগুলি

নুয়ে পড়েছে এসে...তা'রি পাশে অসংখ্য মোটা মোটা আখের গাছ। তা'র সম্মুখে একটা শিব-মন্দির। আর একটু দূরে চাইলে বিদ্যাধরীর হিন্তাল-কুঞ্জ চোখে পড়ত। এই অদ্ভুত কাঁকড়া আর কইমাছের দেশে এসে কাছারী-বাড়ীর সম্মুখের রোয়াকে দু'একটা বেল ফুল গাছ আর খ'সে খ'সে পড়্‌ছে বকফুল যেখানে, সেখানে ব'সে ব'সে কলকণ্ঠস্বরে অক্ষয়কুমারের অতুলনীয় কবিতা 'সাহিত্য' থেকে পড়্‌তাম :

সতী, মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি—
তুমি যাহে দেছ পদ
সে যে ফুল্ল কোকনদ,
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ মূরতি ;
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি।

সেই বোধ হয় আমার শক্ত কবিতা প্রথম পড়া। বোধ হয় কাব্য-জগতের প্রবেশ-তোরণের পথে অক্ষয়কুমারের কাব্যের বাণীরূপ আমার কাছে প্রথম পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল।

পানুদা'র উপাখ্যান

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ

আজ-কালকার লোকগুলোর যে রকম ল্যাজ্ মোটা, তা'রা হয়ত স্বীকারই করবে না যে আমার ডায়েরি থেকে কিছু শিখ্‌বার আছে; তবু কিছু বলা যায় না ব'লে খানিকটা তুলে দিলাম।

প্রথম যখন গণ্‌শার সঙ্গে আলাপ হো'ল সে তখন সদ্য সদ্য নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস্ থেকে নেমেছে। চেহারাটা বেশ একটু ক্যাব্‌লা প্যাটার্ণের, হল্‌দে বুট পরেছে—তা'র ফিতেয় [illegible] বলে, দু' জায়গায় গিঁট দেওয়া ; খাকী হাফ্ প্যাণ্ট, আর গলাবন্ধ কালো কোট—তার একটাও [illegible] পারলে [illegible]নার বেশী

মেই, গোটা তিনেক বড় বড় মর্চে ধরা সেফ্‌টিপিন আঁটা। তার উপর মাথায় দিয়েছে সামনে বারাণ্ডাওয়ালা হলদে কালো ডোরা কাটা টুপি। দেখে আর হেসে বাঁচি নে।

ছোট কাকা সঙ্গে ছিলো, গণ্‌শার দাদাকে ডেকে বল্‌ল, "ও হে হরিচরণ, এটি আমার ভাইপো। তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মিল্‌বে ভালো।" তাই শুনে গণ্‌শা রেগে কাঁই, "অত ছোট ভাই ছোট ভাই করবেন না মশাই। আর ঐ কুচো চিংড়িটার সঙ্গে মিল্‌বো ভালো শুন্‌লেও হাসি পায়।"

ছোট কাকার মুখের রংটা কি রকম পাট্‌কিলে মতন হ'য়ে গেলো।

ঢোঁক গিলে বল্‌লে—"বটে!" সে বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" অথচ শেষ অবধি ঐ গণ্‌শাকেই আমি বিষম ভক্তি করলুম। সে এক মস্ত উপাখ্যান।

ছুটির দিন দুপুর বেলায় নিরিবিলি ছাদের ঘরের মেঝেতে বেশ আরাম ক'রে উপুড় হ'য়ে শুয়ে, পা দুটোকে উঁচুবাগে তুলে একটা চেয়ারের পায়াতে লট্‌কে, দিব্যি করে নিজের মনে দাদার টিকিটের য়্যাল্‌বামে নতুন নতুন পাঁচ পয়সার টিকিট সারি সারি মারছি, কারু কোন অসুবিধা কচ্ছি না, কিচ্ছু না, এমন সময়ে "ওরে গবা, গবা রে!" ব'লে বাপ্‌রে সে কি চিল্লানো! আর এরা আমায় কি না বলে যে গোলমাল করি! সেই বিকট গোলযোগ শুনে তাড়াতাড়ি টিকিট য়্যাল্‌বাম্‌টা লুকিয়ে ফেলে নীচে যেতে যাব্বো, ভুলেই গেছি যে পা দুটো চেয়ারে লট্‌কানো, তাড়াতাড়ি পা টেনে নামাতে গিয়ে চেয়ার উল্টে গেলো, তার উপর দিদিটা হাঁদার মতন দুটো কাচের ফুলদানি রেখেছিল, সে তো গেল ভেঙ্গে। সব চেয়ে খারাপ হোলো আমার আধ্‌-খাওয়া পেয়ারাটা ছিট্‌কে গিয়ে ঘরের কোণে পিসিমার গঙ্গাজলের হাঁড়ির মধ্যে পড়ে গেল।

এই সমস্ত ঘটনাতে আমার যে একেবারে কোন দোষ ছিল না এ কথা যে শুন্‌বে সেই বল্‌বে; অথচ এই একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে দাদা, দিদি, পিসিমা এমন হৈ-চৈ লাগালে! যেন তাদের ঘরে চোরে সিঁদ্‌ কেটেছে! বাবা পর্য্যন্ত আমার দিক্‌টা বুঝ্‌লেন না, বল্লেন—"দোষ ক'রে আবার কথা!"

এর পর যখন ছোট কাকা গোলমাল শুনে দাড়ি কামাতে কামাতে এসে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌ল—"অনেক দিন থেকেই বল্‌ছি ও ঝুরি ভাজা ছেলেকে বিদেয় কর, বিদেয় কর। তা তো কেউ শুন্‌লে না! এখন জেল্‌খানাতেও ওকে নিতে রাজী হবে না। সময় থাক্‌তে নারাণ বাবুর ইস্কুলে দিয়ে দাও, নইলে নাকের জলে চোখের জলে এক হ'বে।" মনে মনে বুঝ্‌লাম, ছোট কাকার তন সাদা জুতোয় সেই যে কলম ঝাড়বার সময়ে সামান্য তিন চার ফোঁটা কালি পড়েছিল, কাকা এখনও সে কথা ভোলে নি। দিক্‌ গে বোর্ডিংএ, এদের চেয়ে খারাপ বোর্ডিং কেন ৭ কেউ হ'তে পারে না। তাই রেগে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে বল্‌তে লাগ্‌লাম—

"তাই দাও না, তাই দাও না, তাই দাও না। এদিকে নিজে যখন বায়োস্কোপ দেখে দেরী ক'রে বাড়ী ফিরে বাবার কাছে তাড়া খাও, তখন—"

বাবা বল্‌লেন—"চোপ্‌!"

এরই ফলে ছুটির পর যখন ইস্কুল খুল্‌ল আমি গেলুম নারাণ বাবুদের বোর্ডিংএ। বেশ জায়গা, বাড়ীর থেকে ঢের ভালো। প্রথমটা সকাল বেলা হালুয়া খেতে বিশ্রী লাগত। তার পর দেখলাম ওতে খুব ভালো ঘুড়ী যুড়বার আঠা হয়। এ ছাড়া বোর্ডিংএর আর সব ভালো। গণ্‌শাও দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে সে আমাদের ঘরে থাকে না।

প্রথম দিন শুতে গিয়ে দেখি আমাদের ঘরে ছ'জন ছেলে, পাঁচ জন ছোট্ট আর একজন বড়। আমাদের ঘরের বড় ছেলেটি ঠিক বড় নয়, বরং মাঝারি সাইজের বল্‌লে চলে। কিন্তু তার তেজ কি! তার নাম পানুদা', তার কাজ নাকি আমাদের সাম্‌লানো, আর তাই ক'রে ক'রে নাকি তার ঠাণ্ডা মেজাজ খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করার ফলে দিন দিন বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে।

খোঁজ্‌ নিয়ে জান্‌লাম পানুদা' সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। নিয়ম ক'রে ক্লাশের লাষ্ট বয়ের ঠিক উপরে হয়। কিন্তু তার মন খুব ভালো, লাষ্ট বয়কে খুব সাহায্য করে। আমাদের ঘরের নীলু বল্‌ল সেই সাহায্যের ফলেই নাকি লাষ্ট বয় বেচারা চিরটা কাল লাষ্টই হচ্ছে! যাই হোক্‌, আমি এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করি নি, কারণ আমাদের ঘরে দেখতাম তা'র খুব বুদ্ধি খোলে। নিজে লুকিয়ে ডিটেক্‌টিভ বই পড়তে আর আমরা কোন অন্যায় করলে ধ'রে ফেল্‌তে তার মতন ওস্তাদ্‌ আর দুটি হয় না।

এই পানুদা'ই যেদিন বিষম বিপদে পড়লো, আমরা ত' সবাই থ'! সে এক অদ্ভুত আশ্চর্য্যি ব্যাপার! "পানুদা" আর তার গুটি পাঁচেক ক্লাশ-ফ্রেণ্ড নিত্যি ভোজ মারে। সবাই মিলে টাকা জমিয়ে পানুদা'র কাছে দেয় আর এক শনিবার বাদে এক শনিবার চপ্‌, কাট্‌লেট্‌, ডিমের ডেভিল—আরও কত কীর যে ব্যবস্থা হয়! আমায় একবার একটা ঠোঙা ফেল্‌তে দিয়েছিল, আমি সেটা একটু শুঁকে আর একবার চেটে সারারাত—"কী পেলুম না, কী পেলুম না" ক'রে আর ঘুমুতে পারি নি! পানুদা'র কাছে তো পিঁপ্‌ড়েটি আদায় করা দায়, তাই আমরা ছোট ছেলেরা একবার পয়সা জমাতে নিজেরা চেষ্টা করেছিলাম। সে আর এক কেলেঙ্কারি! জগা আজ চার আনা দিলো, আবার কাল বলে, "দে বল্‌ছি আমার চার আনা, আমি পেন্সিল কিন্‌বো।" যত বলি "পেন্সিল কিন্‌বি কি রে, ও দিয়ে যে আমরা চপ্‌ কাট্‌লেট খাব রে!" জগা বলে, "ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাস্‌ নি! দে বল্‌ছি, নইলে এইসা এক রদ্দা কষিয়ে দেবো!" পারলে বোধ হয় চার আনার জায়গায় ছ' আনা নেয়! এম্‌নি করে আমাদের সাড়ে তিন আনার বেশী

জম্‌লই না। তাও জম্‌তো না, নেহাৎ মণ্টু জ্বর-টর হ'য়ে বাড়ী চলে গেল, আর পয়সাগুলো চেয়ে নিতে ভুলে গেলো।

যাই হোক্‌, পানুদা'রা এদিকে সাড়ে তিন টাকা জমিয়েছিল। রাত্রে শুন্‌লাম পাশের খাট থেকে পানুদা' বল্‌ছে—"আট আনার বরফি, আট আনার চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট, চার আনার ছাঁচি পান—" শুনে শুনে আমার গা জ্বল্‌তে লাগলো। জিভের জল গিলে গিলে পেটটা ঢাক হ'য়ে উঠ্‌লো।

পর দিনই কিন্তু পানুদা' বিষম বিপদে পড়লো। লাইব্রেরিতে পানুদা' আর সমীরদা' আর কে যেন একটা ছেলে পেল্লায় আড্ডা দিচ্ছে; পানুদা' চাল মেরে কি একটা কুস্তির প্যাঁচ দেখাতে গেছে আর স্লিপ্‌ কেটে কাচের আল্‌মারির দরজা-টরজা ভেঙ্গে চুরমার! পানুদা' উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছে, এমন সময়ে হেড্‌ মাষ্টার মশাই এসে এম্‌নি বকুনি লাগালেন যে পানুদা' চম্‌কে গিয়ে নিজের আল্‌জিভ-টিভ গিলে বিষম-টিষম খেয়ে যায় আর কি! হেড্‌মাষ্টার মশাই এম্‌নি রেগে গেছিলেন যে এ সব কিচ্ছু না দেখে বল্‌লেন—"বাঁদুরে ব্যবসা ছেড়ে এখন মানুষের মতন ব্যবহার শেখো। তোমাকে বেশী জরিমানা কোত্থেকে আর করি, কিন্তু তোমার বাক্সে যা টাকাকড়ি আছে সমস্ত দিয়ে যতগুলি কাচ হয় কিনে দেবে, তাই বলে যে অর্দ্ধেকের বেশী হ'বে তা তো মনে হয় না।"

সেদিন পানুদা'র মেজাজ দেখে কে! রাত্রে আমরা ঘরে বসে শুন্‌লাম সিঁড়ি দিয়ে পানুদা'র চটির শব্দ—অন্যান্য দিনের মতন চট্‌ চট্‌ চটাং চট্‌ চট্‌ চটাং না হয়ে একেবারে চটাং চটাং চটাং। বুঝলাম পানুদা' রেগেছে।

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দেখলাম আসলে আরও ঢের বেশী রেগেছে। ঘরে ঢুকেই পানুদা' আমার আর কেষ্টর মাথা একসঙ্গে ঠুকে দিয়ে বল্‌লে—"অত হাসি হাসি মুখ কেন রে বেয়াড়া ছোঁড়ারা!" আমরা তক্ষুণি গম্ভীর হয়ে গেলাম। তার পর পানুদা' হীরুর দিকে চেয়ে বল্‌ল, "ফের ফোঁস্‌ ফোঁস কচ্ছিস্‌ রাস্কেল্‌?" বলে তা'র কাণে দিলো এক প্যাঁচ। হীরু বল্‌ল, "ওর সর্দ্দি হয়েছে কি না—" পানুদা' তার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বল্‌ল—"চুপ কর্‌ বেয়াদব, কে তোর মতামত চেয়েছে?" তার পর সময় কাটাবার জন্য শিবুর কাণের কাছের খোঁচা খোঁচা চুলগুলো নখ দিয়ে কুট্‌ কুট্‌ ক'রে টান্‌তে টান্‌তে দাঁতে দাঁতে ঘষে বল্‌ল—"আজ তোদের কাছ থেকে যদি টুঁ শব্দটি শুনি সব ক'টাকে কচুকাটা ক'রে ফেল্‌বো ব'লে রাখলাম।"

ঘরের মধ্যে একদম চুপ। পানুদা' খাটে বসে পা দোলাতে লাগলো আর বোধ হয় হেডমাষ্টার মশাইয়ের কথা ভাবতে লাগলো। এমন সময়ে সেই গণ্‌শাটা এসে হাজির। এসেই পানুদা'র পিঠ থাব্‌ড়ে এক গাল হেসে বল্‌ল—"কি রে পেনো, ফিষ্টিটা ভেস্তে গেছে

ব'লে বুঝি মুখখানা হাঁড়ি আর কচি ছেলের উপর উৎপাত? রোজ বলি ওরে পেনো, একা একা অত খাস্‌ নি!"

পানুদা' গুম হ'য়ে রইল। গণ্‌শা বল্‌ল—"তাই বলে টাকাগুলো কি সত্যি দিবি নাকি?" পানুদা' বল্‌ল, "দেবো না তো কি তুমি আমার হয়ে দিয়ে দেবে?"

গণ্‌শা হেসে বল্‌লে, "আরে রামঃ! এমন এক উপায় বাৎলাতে এলুম, তোকেও দিতে হবে না আমাকেও দিতে হবে না। আজ রাত্রে দরজা খুলে শুবি, দেখবি একটা ডাকাত্‌ এসে সব টাকা নিয়ে যাবে। পরে হয়তো ফিরে পাবি, কিন্তু ডাকাতটাকেও খাওয়াতে হবে বলে রাখলুম।" পানুদা' হাঁ ক'রে খানিক তাকিয়ে বল্‌ল—"সে দেখা যাবে এখন। এ সময়ে তুমি এ ঘরে যে বড় এসেছো, জানো না রুল্‌ থ্রি?" গণ্‌শা বল্‌লে—"সাধে শাস্ত্রে বলে কদাচ কাহারও উপকার করিও না?"

মুখে পানুদা' যতই তেজ দেখাক্‌ না কেন, শোবার সময়ে দেখলুম দরজাটা ঠিক খুলে শুলো। অন্য দিন তো পারলে জান্‌লাও বন্ধ ক'রে আমাকে দিয়ে খাটের নীচে খোঁজায়; রাত্রে উঠবার দরকার হ'লে জগাকে আগে একবার পাঠায়, আর সেদিন দেখি বেজায় সাহস! বালিশে মুখ গুঁজে একটু হেসে নিলুম।

উৎসাহের চোটে আমার অনেকক্ষণ ঘুম হয় নি, অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে দেখি কে যেন টর্চ্চের আলো ফেল্‌ছে। পানুদা' শুন্‌লাম ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে আর বাকীরা কেউ যদি জেগেও থাকে ভয়ের চোটে চোখ বুঁজে পড়ে আছে। আমি দেখলুম কে একটা লোক পা টিপে টিপে এসে পানুদা'র বালিশের তলা থেকে চাবি বের করলো, পানুদা'র বাক্স খুল্‌ল, কী যেন নিলো, আবার বাক্স বন্ধ ক'রে চাবি বালিশের নীচে রেখে আস্তে আস্তে চলে গেলো।

পরদিন সকালে ইস্কুলময় হৈ-চৈ, পানুদা'র টাকা চুরী গেছে! হেডমাষ্টার মশাই সবাইকে ডেকে যাচ্ছে-তাই ক'রে বক্‌লেন, সকলের বাক্স খোঁজা হ'ল। কোথাও কিচ্ছু নেই। গণ্‌শার বাক্সে তো এত কম জিনিষ, এবং তাও এত নোংরা যে তাই নিয়ে গণ্‌শা বেজায় বকুনি খেলো।

সেদিন রাত্রে পানুদা'র হাসি হাসি মুখ। আজ কাউকে কিচ্ছু তো বল্‌লই না, এমন কি যে পানুদা' সার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেলে আমাদের সার্ট থেকে বোতাম কেটে নিজের সার্টে লাগাতো সে নিজের থেকে জগাকে দুটো আস্ত খড়ি দিয়ে ফেল্‌ল! এমন সময়ে গণ্‌শা আবার ঘরে ঢুক্‌লো।

"কি রে পেনো! শেষটা সত্যি ডাকাত পোলো তোদের ঘরে?"

পানুদা' খুব হেসে বল্‌ল—"দিস্‌ ভাই, তোরও নেমন্তন্ন রইলো।"

গণ্‌শা যেন আকাশ থেকে পড়লো—"কি দেব রে পেনো? বল্‌ছিস্‌ কি?"

"কেন, টাকা!"

"কিসের টাকা? টাকা আবার কোথায় পাব রে? দান-ছত্তর খুলেছি নাকি? আর তা খুলিও, তোকে টাকা দেবো কেন রে এত যোগ্য লোক থাকতে?" পাহুদা' ভয়ঙ্কর চটে বল্‌ল—"দেখ্‌, গণ্‌শা, ইয়ার্কি ভালো লাগে না। দে বল্‌ছি!"

গণ্‌শা বল্‌লে—"ইয়ার্কি কি আমারই ভালো লাগে নাকি রে?" তার পর গুণ্‌গুণ্‌ করে গাইতে লাগলো—

"নিশুত্‌ রাতে চোরের সাথে টাকা চুরীর খেলা,
ঐ চোর বেটা নিলে সেটা পেনো বুঝ্‌লো ঠেলা!"

সেই অবধি গণ্‌শাকে আমি ভক্তি করি।

আকাশের রং

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

সকাল সাঁঝে আকাশে যে রংএর খেলা হয় আর যে নীল রং সারাদিন আকাশটাকে ঢেকে রাখে তারই সম্বন্ধে আজ তোমাদের কিছু বল্‌ব।

সাদা সূর্য্যের আলো যা আমরা দেখি তা' হচ্ছে সাত রংএর সমষ্টি। সে আলো যদি কাচের কলম (Prism এর ভিতর দিয়ে পাঠান হয়, তবে দেখা যায় সেটা সাতটা রংএ ভেঙ্গে গেছে। রংগুলি হচ্ছে বেগুনি (Violet), ঘন নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red)। এদের ইংরেজী প্রথম অক্ষরগুলো নিলে হয় 'ভিবজিওর' (Vibgyor)। সংক্ষেপে ঐ সাত রংকে ঐ নামই দেওয়া হয়েছে। যে বস্তু এদের একটী আলোও গ্রহণ করে না অর্থাৎ যার ওপর পড়লে এর প্রত্যেকটী আলো প্রতিফলিত হয় তাকেই আমরা বলি সাদা। যে বস্তু নীল আলো বাদে আর সমস্ত আলো গ্রহণ করে আর নীল আলো প্রতিফলিত করে তাকেই বলি নীল।

আবার প্রত্যেক আলো আসলে হচ্ছে কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আমাদের আশেপাশে আকাশে যে সব ফাঁকা জায়গা আছে—যাকে আমরা

শূন্য বলি—সেটা আসলে ইথার নামে একটা জিনিষে ভর্ত্তি রয়েছে। আলোর তরঙ্গ এই ইথারেরই ঢেউ। সমুদ্রের ঢেউ যেমন নদীর ঢেউএর চেয়ে বড়, আবার নদীর ঢেউ পুকুরের ঢেউএর চেয়ে বড়, তেমনি লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ইংরেজীতে যাকে বলে Wave length) কমলা রংএর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় ও কমলা রংএর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলদে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়। এই রকম ক'রে দেখা যায় বেগুনি আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব চেয়ে ছোট।

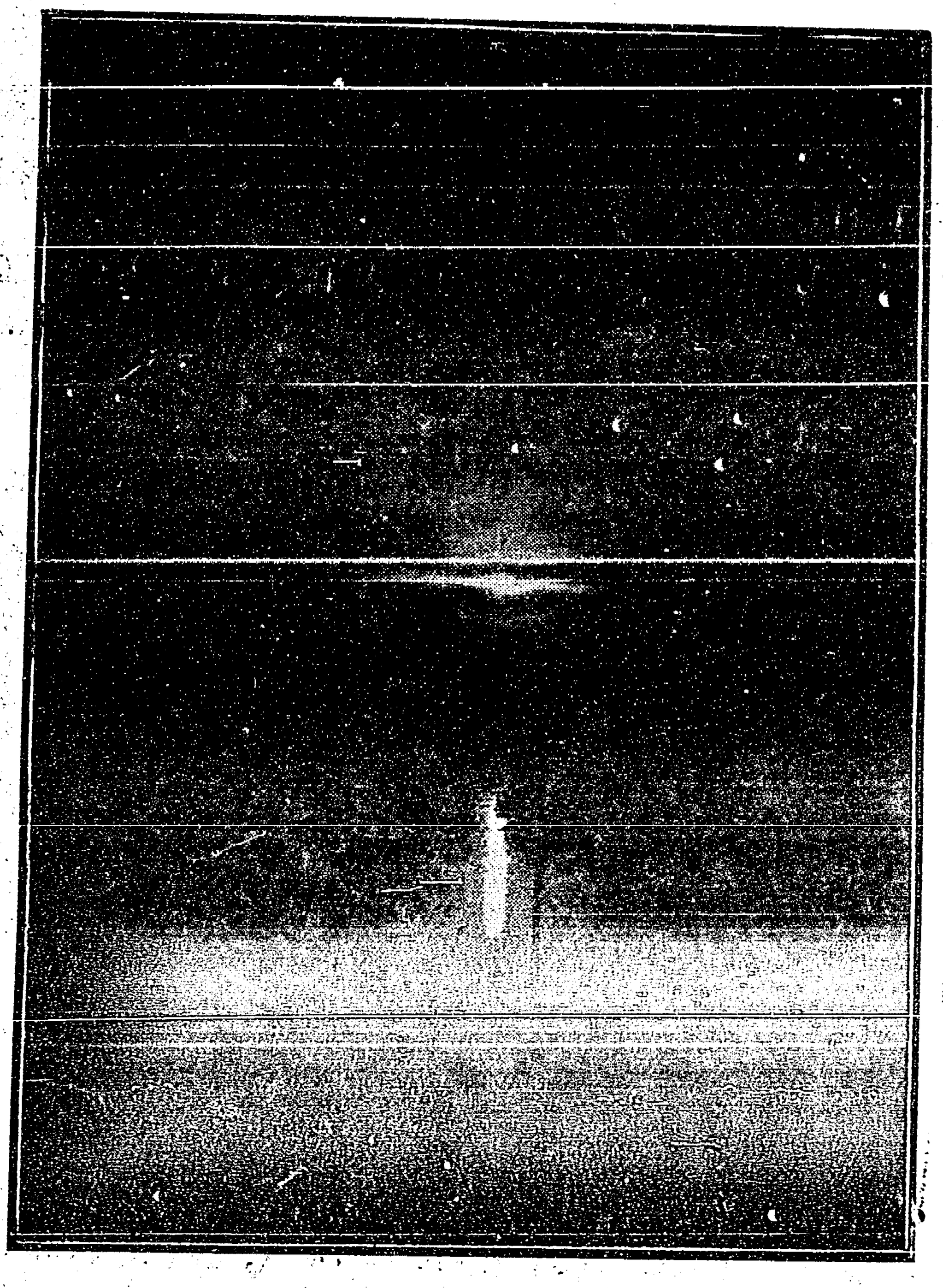

সূর্য্যাস্তের সময়—আকাশে লালের আভাস

সূর্য্যের আলো যেন সাগরের ঢেউ। ছোট বড় নানা রকমের অসংখ্য ঢেউ এক সঙ্গে মিশে কূলের দিকে আসছে। কূলের কাছে যদি কতকগুলো নৌকো থাকে তা হ'লে দেখা যায় বড় ঢেউগুলোর কোন অসুবিধা হয় না, তারা নৌকোর চারপাশ দিয়ে ঘুরে এসে আবার পরস্পর যোড়া লেগে কূলের দিকে আসতে থাকে, যেন পথে কোন বাধাই পড়ে নি। কিন্তু ছোট ঢেউগুলির হয় মুস্কিল। তারা নৌকোর গায়ে ঠেকে ভেঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগে যেমন পর পর সারি বেঁধে আসছিল, তা আর ঠিক থাকে না—নানা দিক্‌ থেকে এলোমেলো ভাবে ছোট ঢেউগুলি কূলে এসে পৌছায়।

সূর্য্যের আলোর ঢেউ বাতাসের মধ্য দিয়ে আসবার সময় এই রকম অসংখ্য

বাধা পায়। এতে বড় ঢেউগুলোর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু নীল ও বেগুনি রংএর ছোটগুলো ঠিক সোজা পথে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতে পারে না। একটুখানি আসতে না আসতেই হয়ত একটি ধূলিকণার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এক দিকে ঠিকরে পড়ল, তার পর মুহূর্ত্তে আবার অন্য কিছুর সঙ্গে ধাক্কায় অন্যদিকে ছিটকে গেল। এ রকম অসংখ্য ধাক্কা খেতে খেতে যখন নীল আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, তার তখনকার গতিপথের সঙ্গে প্রথম যে পথে রওনা হয়েছিল তার কোন সম্পর্ক নেই। তার পথ হয়ে গেছে **হিজিবিজি—বিদ্যুৎ-চমকের**

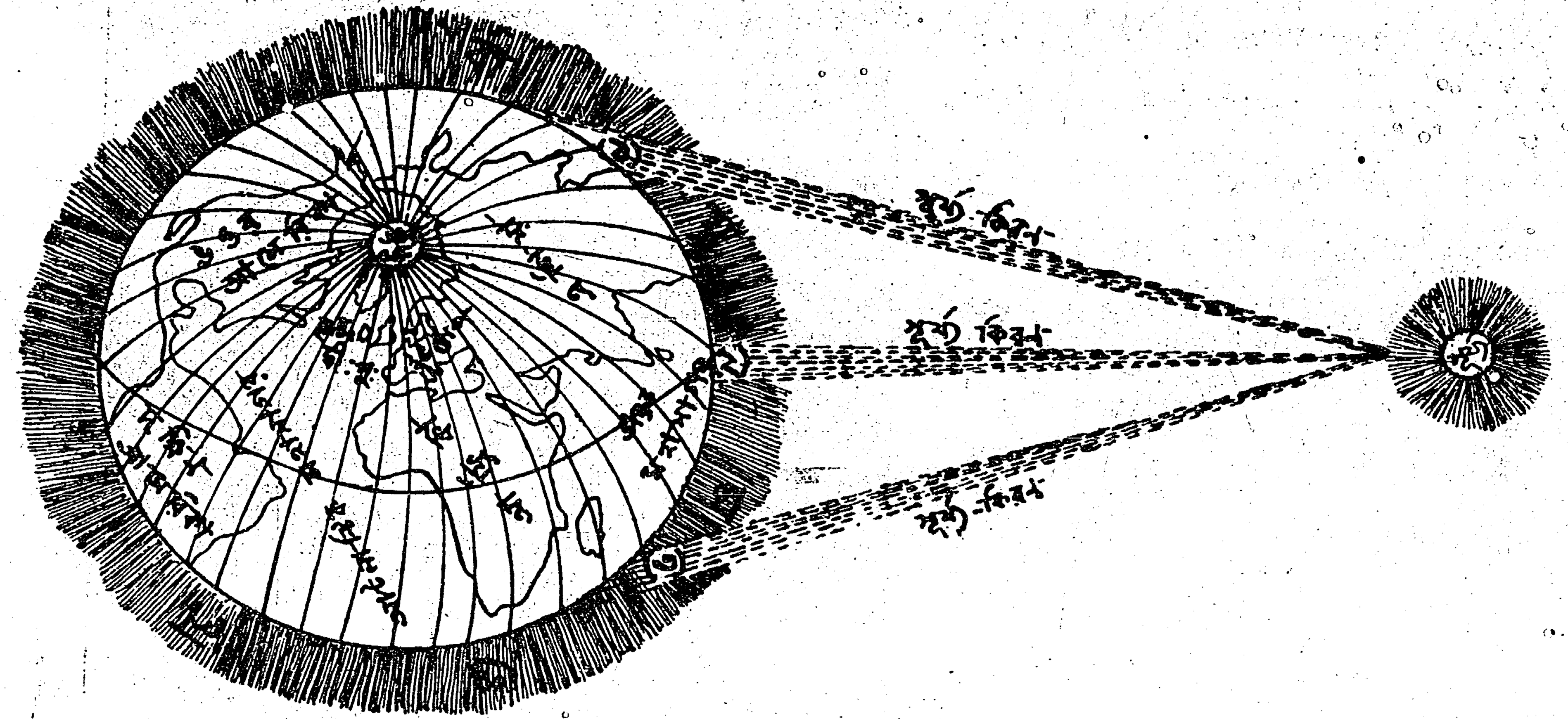

সূর্য্যের আলো কি ভাবে বায়ুস্তর ভেদ ক'রে পৃথিবীতে আসে
(১) সকালের দিকে, (২) দুপুরে, (৩) বেলা পড়ে এলে।

মত। তখন মনে হয় আকাশের সব দিক্ থেকেই বুঝি নীল রং আসছে। আকাশকে এইজন্য নীল দেখায়, কিন্তু আকাশের নিজের কোন রং নেই।

লাল, হলদে রংএর বড় বড় ঢেউগুলো বাতাসের এই সমস্ত ছোটখাট বাধাকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সোজা আমাদের কাছে এসে হাজির হয়। সূর্য্যকে আমরা এই লাল, হলদে আলোর সাহায্যে দেখি। সূর্য্যের যে রূপ আমাদের চোখে পড়ে সেটা ওর সত্যিকারের রূপের চাইতে ঢের বেশী লাল। যদি ওর রংএর সঙ্গে আকাশের নীল যোগ করে দেওয়া যায় তা হ'লে যা হবে তাই ওর ঠিক রং।

পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাইরে যদি কোন দিন তোমরা যেতে পার তা হ'লে দেখবে সূর্য্যকে আমরা যেমন দেখি তার চাইতে আসলে ও অনেক সাদা।

সূর্য্যের আলো আমাদের কাছে পৌঁছাবার আগে যত বেশী বাধা পাবে ততই বেশী নীল রং বাদ গিয়ে লাল বাকী থাকবে। কুয়াসা বা মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য্যকে এই জন্য বেশী লাল মনে হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় সূর্য্যের আলোকে বাঁকা ভাবে অনেকখানি বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে আসতে হয় বলে তখন সূর্য্যের আলো আরো বেশী লাল দেখায়। যেদিন সন্ধ্যায় আকাশে বেশী ধূলো থাকে সেদিনকার সূর্য্যাস্ত কেন বেশী সুন্দর হয় তাও এখন তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে।

কাজলী

শ্রীতরলিকা দেবী

এক রত্তি মেয়ে আমার নাম রেখেছি কাজলী,
আধ আধ মিষ্টি-মধুর সদাই কল-কাকলী।
শান্ত অতি—শিষ্ট অতি, নয়কো মোটেই দুরন্ত,
ঘুটুর ঘুটুর ঘুরছে—যেন প্রজাপতি উড়ন্ত!
সদাই হাসি, সদাই খুসী—মুখর সারা বাড়ী রে,
ঘুমের সাথেই কেবল তাহার একটুকু যা আড়ি রে!
ঘুমের রাণী, তাই তো তোমায় ডাক দিয়েছি আজকে ভাই,
কাজলী-মায়ের নিমন্ত্রণ, জল্‌দি আসা চাই তো তাই।
ঘুমের রাণী, ঘুম পাড়ানি, খাটের পরে এস গো,
স্বপন-পুরীর রঙ্গিন কথার আসর নিয়ে বস গো।
সোনার কাঠি সঙ্গে এন—ছুঁইয়ে দিও ভালেতে,
আর একটা দিও ছোট্ট চুমা কাজলী-মায়ের গালেতে।

বিচিত্র ভারত

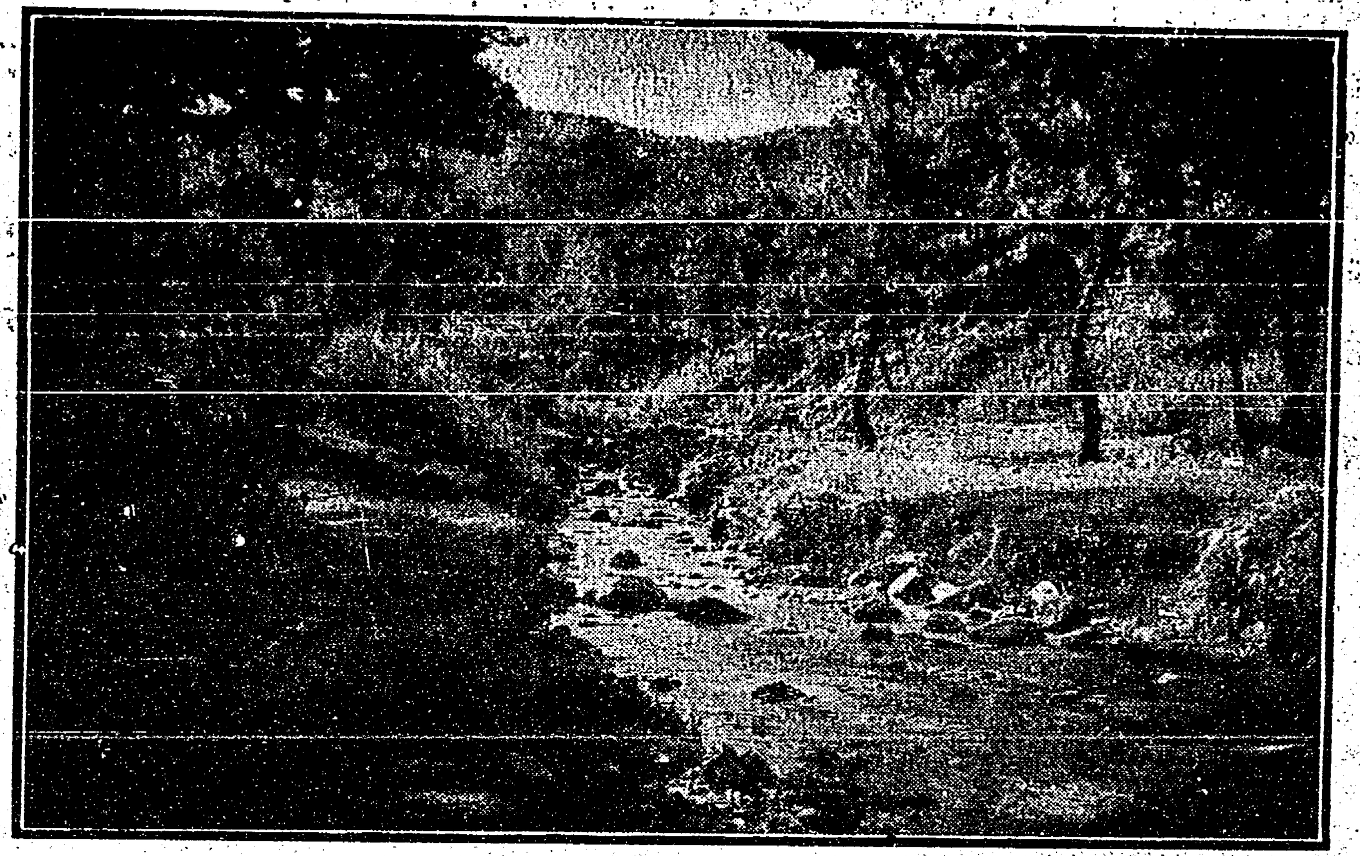

পাহাড়ী ঝরণা, শিলংএর পথে (আসাম)

পাহাড়ের গুহা, পাঁচমুড়ি (মধ্যপ্রদেশ)

শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
গৃহীত আলোকচিত্র

মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

[ধারাবাহিক উপন্যাস

এগারো

ঘরের মাঝে সকলের মুখেই ফুটে উঠ্‌ল একটা ভয়ার্ত্ত ঔৎসুক্য।

অজয় বল্‌তে লাগ্‌ল রণুরই ভাষায়—

"ওর বালিশের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল। কি সর্ব্বনাশ! ওর বালিশ, বিছানা পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে ঐ ফাঙ্গাসে! বালিশের গায়ে চাদরের কোণে কয় জায়গায় ঐ কুৎসিৎ ফাঙ্গাস্ গজিয়ে উঠেছে!

"বল্‌লাম ইরাকে—'আর নয় এ জাহাজে। চল্‌, এক্ষুণি জাহাজ থেকে নেমে তীরের চতুর্দ্দিক্ খুঁজে দেখি যে একটু নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে পারি এমন কোনও জায়গা পাওয়া যায় কি না।'

"সঙ্গে নেওয়ার জন্য আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিষ একত্র করলাম; কিন্তু তার মধ্যেও দেখি ফাঙ্গাস্ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইরাকে না দেখ্‌তে দিয়েই যেগুলিতে ফাঙ্গাস্ জন্মেছিল সেগুলি ফেলে দিলাম ছুঁড়ে জলের মাঝে।

"আমাদের নৌকাখানি তখনও জাহাজের ধারেই ছিল। আমি ইরাকে নিয়ে অতি কষ্টে নেমে এলাম সেই নৌকাটার মাঝে।

"তীরের দিকে নৌকা চালালাম। কিন্তু তীরে পৌঁছে আমাদের সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল। সমস্ত তীর ঐ ফাঙ্গাসে ভর্ত্তি—যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ঐ শয়তানের রাজত্ব।" যে ফাঙ্গাসের ভয়ে এলাম জাহাজ থেকে পালিয়ে এখানে এসেও সেই ফাঙ্গাস্! জাহাজে তবু তারা ছিল আকৃতিতে ছোট, কিন্তু এখানে তারা বেড়ে উঠেছে কি প্রবল ভাবে! এত বড় হয়ে তারা বেড়ে উঠেছে যে যখন বাতাসের স্পর্শে তারা নড়ে উঠ্‌ছে তখন মনে হচ্ছে যেন ওরা কোনও জীবন্ত প্রাণী। কি বীভৎস তাদের চেহারা! কোথাও লম্বা, উঁচু হয়ে উঠেছে—কোথাও বা

ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত জমি যুড়ে ঘাসের চাবড়ার মত।...সমস্ত জায়গাটা, মনে হয়, যেন ঐ ফাঙ্গাসের কবলে আত্মসমর্পণ করে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। ওখানকার গাছগুলো পর্য্যন্ত বাড়তে পায় নি—ফাঙ্গাসে তা'দের সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে ধরেছে।

"মনে হ'ল প্রথমটায়, এই সমুদ্রতীরে বোধ হয় এমন এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা নেই যেখানে ফাঙ্গাস তার করাল গ্রাস বিস্তার করে নি। কিন্তু, শেষ কালে দেখলাম, আমাদের সে ধারণা ভুল। কারণ, আর একটু অগ্রসর হ'তেই চোখে পড়ল সমুদ্রের তীরে একটা সাদা জায়গা ফাঙ্গাস্-মুক্ত। কাছে গিয়ে দেখলাম, জায়গাটা বালিতে ভর্ত্তি। আমরা ঐ জায়গাতেই নৌকা বেঁধে নেমে পড়লাম। আশ্চর্য্য, যখন নামলাম সেই জায়গাটায় তখন দেখলাম যেগুলিকে বালি মনে করেছিলাম সেগুলি বালি নয়; কিন্তু সেগুলি যে কি তা বুঝ্‌তে পারলাম না। যাক্, তখন আমাদের মনের অবস্থা যা তা'তে গবেষণা কর্‌বার সময় নয়। জায়গাটা ফাঙ্গাসের আক্রমণের বাইরে এইটুকুই তখন আমাদের জীবনে সব চেয়ে আনন্দের কথা। ফাঙ্গাসে ঘেরা কুৎসিৎ বিস্তৃত বনভূমি—ধূসর রংএ ছেয়ে গেছে চতুর্দ্দিক্; কেবল তারই মাঝে মাঝে খানিকটা সরু ফালি জমি চলে গেছে এদিকে-ওদিকে যেখানে ফাঙ্গাস্ পারে নি তার অধিকার বিস্তার কর্‌তে; সেই জায়গাগুলি ঐ বালির মত পদার্থে ভর্ত্তি।

"যাই হোক্, সেই জায়গাটুকু পেয়ে তখন যে আমাদের কি আনন্দ হ'ল তা ব'লে মানুষকে বোঝান যায় না। আমাদের জিনিষপত্র সব আমরা সেখানেই নামালাম। তার পর আবার গেলাম জাহাজে ফিরে, আরও কতকগুলি দরকারী জিনিষ নিয়ে এলাম জাহাজ থেকে। আর, হ্যাঁ, জাহাজ থেকে আস্‌বার সময় জাহাজের একটা পালও নিয়ে এলাম। সেই পাল দিয়ে কোনও রকমে চলনসই দুটো তাঁবু তৈরী ক'রে ফেললাম আমরা দু'জনে। এর মধ্যেই আমাদের জিনিষ-পত্র রেখে আমরা বসবাস কর্‌তে লাগ্‌লাম—অবশ্য দৃষ্টি পড়ে রইল সমানে আমাদের দূরে, সমুদ্রের বুকের মাঝে—যদি কোনও জাহাজের দেখা মেলে। এমনি করে কাটল চার সপ্তাহ ঐ নির্জ্জন দ্বীপের মাঝে। অন্যের কাছে হয়ত মনে হবে কি দুঃখ আর হতাশার মধ্যে দিয়েই কাটছিল আমাদের সময়! না অজয়, সময়—অন্ততঃ পক্ষে তখন ক'টা দিন আমাদের খুব খারাপ ভাবে কাটে নি। কি জানি কেন, তখন আমাদের দু'জনের মনের মাঝে কোথা থেকে এক আশা এসে বাসা বেঁধেছিল যে নিশ্চয় শীঘ্রই কোন যাত্রী-জাহাজের বা মালবাহী জাহাজের দেখা আমাদের মিল্‌বে—পরিত্রাণ আমরা নিশ্চয়ই পাব এই কুৎসিৎ ফাঙ্গাসের রাজত্ব থেকে। তাই কাটল ক'দিন দুই ভাইবোনে হাসি-তামাসা গল্প-গুজব করে—"

রণজিৎ একটু থেমে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল। গলার স্বরে তা'র ব্যথার আমেজ;—বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমাদের সব হাসি জন্মের মত শেষ হয়ে গেল সেদিন সকালে।

"ইরা আস্তে আস্তে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—'ছোড়দা, দেখ্‌ছ?'—বলে তা'র ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তুলে দেখাল আমাকে।

"তার বুড়ো আঙুলের মাথায় ছোট্ট একটা আঁচিলের মত আকার নিয়ে জন্মেছে ফাঙ্গাস্।

"আমার মনে হ'ল মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেল। আকুল ভাবে তাকালাম ইরার মুখের দিকে। সে মুখে ভীতির লেশ মাত্র নেই—চিন্তার কোনও রেখা পর্য্যন্ত ফোটে নি তার মুখের কোনওখানে। অদৃষ্টের হাতে সে যেন আত্ম-সমর্পণ করে নির্ব্বিকারত্ব লাভ করেছে।

"যাই হোক্, দু'জনে মিলে জল আর কার্ব্বলিক্ য়্যাসিডের সাহায্যে পরিষ্কার করে ফেল্‌লাম ওর আঙুলের সে জায়গাটা। পর দিন সকালে দেখি আবার ঠিক সেই জায়গায় সেটা বার হয়েছে।

"কারো মুখে কোনও কথা বার হ'ল না। নীরবে শুধু দু'জনের মুখের দিকে দু'জনে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। একটু পরে আবার নীরবে সুরু কর্‌লাম সেটাকে পরিষ্কার কর্‌তে।

"হঠাৎ ইরা চীৎকার করে উঠ্‌ল—'ছোড়দা, তোমার মুখের পাশে ওটা কি?' ওর গলার স্বর এবার কিন্তু মহা উৎকণ্ঠায় ভরা।

"আমি হাত দিয়ে দেখবার চেষ্টা কর্‌লাম।

"ইরা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—'ঐ যে তোমার কাণের পাশে—ঠিক চুলের নীচে। আর একটু, আর একটু সরে—হ্যাঁ হ্যাঁ—'

"আমার আঙুল ঠেকল এবার ঠিক জায়গায়। বুঝলাম আমাকেও ধরেছে।

"আমি বল্‌লাম—'আচ্ছা, আগে তোর আঙুলটা পরিষ্কার করে নেই। ও রাজি হ'ল। যতক্ষণ ওর আঙুল পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ আমাকে ছুঁতে বোধ হয় ও ভয় পাচ্ছিল। আমি ওর আঙুল পরিষ্কার করে দেওয়ার পর ও আমার মুখের যে জায়গাটায় ঐ কুৎসিৎ ফাঙ্গাস্ বার হয়েছিল সেখানটা পরিষ্কার করে দিল।

"তার পর বসে বসে অনেক আলোচনা করলাম দু'জনে। দু'জনের মনেই তখন বেশ দৃঢ় ধারণা জন্মেছে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘট্‌তে চলেছে আমাদের জীবনে।

"আমি বল্‌লাম—'ইরা, চল্, কিছু খাবার আর জল সঙ্গে নিয়ে আমরা ঐ নৌকাটায় ক'রে সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ি—পালাই চল্।'

"ইরা একটু ম্লান হেসে বল্‌ল—'ছোড়দা, আত্মহত্যা করা হবে সেটা। আত্মহত্যাই যদি করতে চাও, এখানেই করতে পারবে নানা উপায়ে। আর এখান থেকে পালিয়েই কি নিষ্কৃতি পাবে ঐ ফাঙ্গাস্-রূপী শয়তানের হাত থেকে? ওর বীজ ত' ও এর মধ্যেই আমাদের শরীরের

যাকে সংক্রামিত করেছে।' হতাশভাবে বল্লাম—'তবে এখানেই থাকা যাক্। দেখা যাক্ অদৃষ্টে কি আছে।'

"এক মাস গেল,—দু'মাস গেল, তিন মাসও গেল। যেখানে বার হয়েছিল ফাঙ্গাস্ সেখানে ত' বার হ'লই—আরও দু' এক জায়গায় বার হ'ল আমাদের শরীরে। তবুও বেশী বার হ'তে পারল না, তার কারণ আমরা প্রাণপণে লড়তে লাগ্‌লাম যাতে সেগুলি আর বেশী বাড়তে না পারে।

"সাহসে ভর করে জাহাজে গিয়ে আমাদের দরকারী জিনিষ-পত্র নিয়ে আস্‌তাম মাঝে মাঝে। সেখানে, জাহাজের মাঝে দেখ্‌তাম যে ফাঙ্গাসের তাণ্ডবলীলা চলেছে। আমরা প্রথমে যা দেখেছিলাম তার শতগুণ বেড়ে গেছে সেগুলো।

"আমরা ঐ দ্বীপ ত্যাগের আশা চিরতরে নির্ব্বাসন দিলাম মনের মাঝ থেকে। কারণ এটা বেশ বুঝতে পারলাম, সুস্থ মানব-সমাজের মধ্যে আর আমাদের যাওয়া চল্‌তে পারে না কারণ তা হ'লে তাদের মাঝে এই বিষ সংক্রামিত হবে—যে বিষে আমরা হয়েছি আক্রান্ত।

"তখন আমাদের শুধু এই চিন্তা হ'ল যে খাবার সম্বন্ধে খুব বুঝে সুঝে চল্‌তে হ'বে আমাদের। কারণ তখন আমাদের এই ধারণাই হয়েছিল—বহু বহু দিন বাঁচতে হ'বে আমাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে, এই একই অবস্থায়—মনের স্থবিরতা নিয়ে।"

বলেই রণু বল্‌লে—"অজয়, তোমাদের আমি প্রথমে বলেছিলাম না যে আমি একজন বৃদ্ধ? সেটা আমার বয়সের হিসাবে নয়, সেটা, সেটা—" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।......

একটু পরে সাম্‌লে নিয়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল রণু—"আমরা ভাব্‌ছিলাম বটে খাবার সম্বন্ধে বুঝে সুঝে চল্‌তে হ'বে আমাদের, কিন্তু আমরা তখন জানতাম না যে খাদ্য আমাদের নিঃশেষ হয়ে এসেছে। একদিন জাহাজে রুটী আন্‌তে গিয়ে দেখি যে বাক্সগুলিতে রুটী ভর্ত্তি আছে ভেবেছিলাম সেগুলি সব খালি। সামান্য কিছু মাংস আর কিছু ফল ছাড়া জাহাজে আর কিছুই নেই খাবার।

"তখন নিরুপায় হয়ে ঐ 'ল্যাগুন'এর মধ্যেই মাছ ধরবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটা মাছও মিল্‌ল না অদৃষ্টে একদিনও। শেষকালে খোলা সমুদ্রের মাঝে এসে চেষ্টা করলাম; মিল্‌ল বটে কয়েক রকমের কি সব মাছ—তবে সেও বেশী নয়। তা'তে লাভ হ'ল না কিছু, ক্ষিধে আমাদের মিটল না তা'তে। ভাবলাম, জাহাজের ঐ খাবার জিনিষ ক'টা ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরও শেষ হবে।

"এমনি করে চতুর্থ মাসও কেটে গেল। হঠাৎ একদিন এক করুণ অথচ ভয়াবহ দৃশ্য

আমার চোখে পড়ল। জাহাজ থেকে কি একটা জিনিষ নিয়ে ফিরছি, দেখি যে ইরা তার তাঁবুর সামনে বসে কি একটা যেন খাচ্ছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কি খাচ্ছিস রে ইরা?'

"আমার কথা শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে আমাকে দেখে সে হঠাৎ কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার পর যেটা খাচ্ছিল সেটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিল ছুঁড়ে। আমার মনে কি রকম একটা সন্দেহ হ'ল। আমি গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। খানিকটা ধূসর ফাঙ্গাস্ সেটা।

"আমি সেটা হাতে করে এগুতেই ওর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। ভয়ে আমারও মুখ তখন পাংশু হয়ে গেছে।

"বল্লাম—'ইরা, ইরা বোন্‌টী—' আর কোনও কথা আমার মুখ দিয়ে বার হ'ল না।

"আমার ঐটুকু কথাতেই ও একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌ল, মাটীতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। ইরাকে কোনও দিন আমি জীবনে এ রকম কাঁদ্‌তে দেখি নি। ওর ঐ রকম কান্না দেখে আমার বুকটার মধ্যেও গুমরে গুমরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; কি করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।......

"অল্পক্ষণের মধ্যে ও নিজেই প্রকৃতিস্থ হ'ল। প্রকৃতিস্থ হ'লে ওর কাছ থেকে শুনলাম আগের দিন ওর মনে হঠাৎ একটা কি দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জেগে ওঠে ঐ ফাঙ্গাস্‌গুলো খেয়ে দেখ্‌বার জন্য। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে দমন করতে পারে না নিজেকে। মাটী থেকে এক মুঠো ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিতেই ওর অদ্ভুত রকমের ভালো লাগ্‌ল ওর আস্বাদ। অথচ আশ্চর্য্য, ঐ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা মনে জাগবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐগুলির প্রতি তীব্র ঘৃণাই জেগে ছিল ওর মনের মাঝে।

"আমি ইরার মাথাটা টেনে নিয়ে আদর করে বল্লাম—'বোন্‌টী আমার! তোর এ অসংযত ব্যবহারের জন্য অত উতলা হওয়ার কিছু নেই। তবে প্রতিজ্ঞা কর্, আর কোনও দিন ছুঁবি না ওগুলোকে?'

"ও প্রতিজ্ঞা করল—দৃঢ় ভাবেই প্রতিজ্ঞা করল যে ও আর কিছুতেই ওগুলি মুখের কাছে আন্‌বে না কোনওদিন।

"খানিক পরে কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল—বিশেষতঃ ইরার এই ফাঙ্গাস্ খাওয়ার ব্যাপারটাতে মনটা বড় বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আমি ধীরে ধীরে উঠে বনের মাঝে চল্‌তে লাগ্‌লাম সেই খালির মত পদার্থের আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দু' এক দিন এ পথে এসেছি, কিন্তু বেশী দূর এগুতে সাহস হয় নি। আজ অন্যমনস্কভাবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলে গেলাম বহু দূর—বনের মাঝে।

চল্‌ছি আপন মনে নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে—হঠাৎ একটা অদ্ভুত খস্‌খসে স্বর যেন

কাণে এল ঠিক আমার পাশ থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার পাশে একটা ফাঙ্গাসের স্তূপ নড়ছে, একেবারে আমার হাতের কনুইএর কাছে। ভয়ে ভয়ে সেইদিকে তাকাতেই হঠাৎ আমার মনে হ'ল, ওটা ত' ঠিক সাধারণ স্তূপের মত মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে, একটা বিকৃত মনুষ্য-দেহের সঙ্গে ওর যেন অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে!

"হঠাৎ দেখি সেই স্তূপের মধ্যে থেকে গাছের ডালের মত কি একটা অংশ পৃথক হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই লম্বা অংশটার মাথাটা গোলাকৃতি। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ সেই বিকৃত মনুষ্য-দেহের মত ফাঙ্গাস্-স্তূপ তার সেই শাখা-সদৃশ বাহুটার গোলাকৃতি মাথাটা আমার মুখে বুলিয়ে দিল অতি আস্তে। আমি চীৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। তার পর পালিয়ে এলাম ভয়ে সেখান থেকে মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব না ক'রে।

"সেই স্তূপটা আমার ঠোঁটের যে জায়গাটায় ছুঁয়েছিল সেখানটা কি রকম যেন মিষ্টি মিষ্টি লাগ্‌তে লাগ্‌ল। আমি একবারটী ঠোঁটটা চেটে দেখ্‌লাম। আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে কি দুর্দ্দমনীয় বাসনা জেগে উঠ্‌ল মনে ঐ ফাঙ্গাস্ খাওয়ার জন্য। আমি মাটী থেকে এক মুঠো ছিঁড়ে মুখে পূরে দিলাম—তার পর আরও, আরও—। উঃ, তৃপ্তি আর হয় না। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে যখন পাগলের মত চিবোচ্ছি ঐ ফাঙ্গাস্‌গুলো তখন হঠাৎ মনে হ'ল, ইরাকে না প্রতিজ্ঞা করিয়েছি যে সে মরে গেলেও আর মুখের কাছে আনবে না ও জিনিষ! আর আমি, আমি নিজে—! আমার হাতে যে ফাঙ্গাস্‌টুকু ছিল তা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাটীতে। তার পর ধীরে ধীরে ফিরলাম তাঁবুর দিকে। ভয়ে, দুঃখে, অনুশোচনায় তখন বুকের ভিতরটা মুষড়ে মুষড়ে উঠ্‌ছে।

"আমার মুখের ভাব দেখেই ইরা ধরেছে যে সাংঘাতিক রকমের একটা কিছু ঘটেছে। ইরা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'কি হয়েছে, ছোড়দা'?'

"উত্তরে আমি শুধু বল্‌লাম—'তোকে যে কাজ কর্‌তে এত করে বারণ্ করলাম্ সেই অন্যায় কাজ নিজেই করেছি এক্ষুণি; উঃ কি দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা—!'

"সবই বল্‌লাম—বল্‌লাম না শুধু কি দেখেছি বনের মাঝে—কি সে করুণ অথচ ভয়াবহ দৃশ্য! ওর জীবনে আরও দুঃখ টেনে আনি কেন?

"ওকে বল্‌লাম না। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে কিন্তু দিনরাত ঐ ভীষণ চিন্তা ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল; পাগল করে তুল্‌ল আমাকে। কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে ঐ জাহাজে করে যা'রা একদিন এইখানে এসেছিল তা'দেরই একজনের চরম পরিণতি সেদিন নিজের চোখে দেখে এসেছি। আর ওকে দেখে এও বেশ বুঝলাম, আমাদেরও চরম পরিণতি ঐ।

"ঐ ফাঙ্গাস্ আহারের দুর্দ্দান্ত ইচ্ছা তখন আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তবুও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে সে ইচ্ছাকে সংযত করে রাখ্‌তে লাগলাম। কিন্তু, রাখলে কি হ'বে?

যা খেয়েছি তার ফলই সুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ ফাঙ্গাস্‌গুলো, ঐ রাক্ষসগুলো, আমাদের দেহ নির্ম্মম ভাবে ছেয়ে ফেল্‌তে সুরু কর্‌ল। এবার আর পারলাম না, কোনও রকমে পারলাম না তাদের বাধা দিতে। কাজেই, কাজেই আমরা—একদিন যা'রা মানুষ ছিলাম,—সেই আমরা আজ হ'য়ে গেলাম—যাক্—

"তবুও, তবুও আমরা এখনও ঐ ফাঙ্গাস্ খাই নি কিছুতেই। যদিও খাওয়ার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার সঙ্গে সংগ্রাম করা যে কি কষ্টকর—!

"জাহাজের খাবার সব্ ফুরিয়ে গেছে আজ ক'দিন হ'ল। তার পর মাত্র তিনটী মাছ ধরেছিলাম ছোট ছোট। ইরা ক্ষুধাতে মৃতপ্রায়; আজ রাতে তাই আবার মাছ ধরতে বার হয়েছিলাম। দেখা পেলাম হঠাৎ তোমাদের জাহাজের। ডাক্‌লাম তোমাদের···তার পর ত' সবই জান।"

রণু থাম্‌ল একটু। তার পর বল্‌লে অপেক্ষাকৃত আস্তেই—"সেই দেখা পেলাম, যদি কয়েক মাস আগে দেখা পেতাম তোমাদের, তা হ'লে আমাদের অত আদরের ইরাকে আজ··· তবুও ত' অজয়, আজ তোমারই দেওয়া খাবার ইরার মুখে তুলে দিতে পারলাম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আজ ত' সে বাঁচল ক্ষিধের যন্ত্রণা থেকে।"

দাঁড়ের শব্দ শুনলাম হঠাৎ একটা, তার পর আর একটা, তার পর আরও অনেকগুলো। রণু চলে গেল।

দূর থেকে সে চীৎকার করে বল্‌লে—"অজয়, চল্‌লাম ভাই, বিদায়।" সে স্বর যেন কোন অশরীরীর—যেন কান্নায়-ভরা।

আমার বুক ফেটে কান্না বার হয়ে এল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উত্তর দিলাম—"বিদায়, বন্ধু!"—কণ্ঠ আমার রোধ হয়ে এল।

তাকিয়ে দেখি আকাশের দিকে—তখন ভোর হচ্ছে। সূর্য্যের অস্পষ্ট আলো সমুদ্রের বুকে পড়ে কুয়াসাটাকে পাতলা করে দিয়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় চোখে পড়ল দূরে একটা নৌকা যাচ্ছে। একটু পরে আর নৌকাটা দেখা গেল না। শুধু দাঁড়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। খানিক পরে সে শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল অসীম সমুদ্রের বুকের মাঝে।

অজয় থামল। চোখ দুটীতে তখন তার অশ্রু টল্ টল্ করছে। সমস্ত ঘরটার আবহাওয়া তখন এক করুণ কান্নার সুরে ভরা।

—সমাপ্ত—

জলযুদ্ধে সাব্‌মেরিন্

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌.এস্‌-সি

কয়েক মাস আগে তোমাদের এ যুগের আকাশ-যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে জলযুদ্ধও যে নেহাৎ তুচ্ছ করবার জিনিষ নয় তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। যারা নিয়ম মত খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই দেখেছ এই জলযোদ্ধাদের উপদ্রবে পৃথিবীর সমুদ্র-পথ আজ কি ভয়াবহ, বিপদ্‌সঙ্কুল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! শুধু যুদ্ধ-জাহাজ নয়, নিরীহ বাণিজ্য-জাহাজ বা যাত্রী-জাহাজগুলোকেও আজকাল কত সাবধানে, সামনে পেছনে রক্ষী-জাহাজ ভাসিয়ে, প্রচলিত পথ ছেড়ে ঘোরা পথে যাতায়াত করতে হচ্ছে! তা'তেও সব সময় নিস্তার কই?

জলযুদ্ধের সম্বন্ধে সব কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। আধুনিক ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার, ক্যাপিটাল ব্যাট্‌লশিপ্ বা অতিকায় যুদ্ধজাহাজ, পকেট্ ব্যাট্‌ল্‌-শিপ্ বা ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজ, সাব্‌মেরিন্ বা ডুবো-জাহাজ ইত্যাদি কত রকম যন্ত্র-দানবের কথাই না প্রত্যহ কাগজ খুললে চোখে পড়ে! তা ছাড়া, এদের আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র—টর্পেডো, ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ্, আর কবি নজরুলের ভাষায় "ভীম ভাসমান মাইন"—এরাও রয়েছে। এদের সকলের সম্বন্ধেই তোমাদের একটা ভাসা ভাসা ধারণা হয়তো আছে, কিন্তু সাধু ভাষায় যাকে বলে "বিশদ বিবরণ" তা তোমরা বোধ হয় কেউই জান না।

এদের সকলের সম্বন্ধে বলা আজ আর সম্ভব হবে না আজ শুধু ডুবো-জাহাজ বা সাব্‌মেরিন্ সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প তোমাদের বল্‌ব; কিন্তু তাকে যেন "বিশদ বিবরণ" বলে ভুল ক'র না, কারণ তা যোগাবার মত বিদ্যে আমার মত 'অসামরিক' লেখকের নেই। তা জানতে হ'লে তোমাদের যেতে হবে এমন লোকের কাছে যিনি সত্যি সত্যি সমুদ্রে ডুবো-জাহাজ বা ঐ রকম অন্য যুদ্ধ-জাহাজে বসে যুদ্ধ করেছেন। আর বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে রয়েছেন যুদ্ধ-গল্পবিশারদ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র ধর মশাই; তাঁর কাছে চাইলে তিনি হয়তো আমার চাইতে বেশী কিছু খবর তোমাদের দিতে পারবেন।

বাস্তবিক সাব্‌মেরিন্ জিনিষটার কল্পনা করতেই যেন কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত লাগে। প্রকাণ্ড একটা জাহাজ মাছের মত জলের তলায় ডুবে ডুবে ঘুরে বেড়ায়; দরকার হ'ল হুস্ করে মাথা তুল্‌ল, আবার ডুবল! তা ছাড়া দৌরাত্ম্যের তো কথাই নেই। সমুদ্র-পথে যত রকম বিভীষিকা আছে, গুণের পাল্লায় এরাই বোধ হয় যায় সকলের ওপরে! গত ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধে এই ডুবো-জাহাজ কিছু দিনের জন্য যে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল তা শুনলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

ডুবো-জাহাজের আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশী দিন হয় নি। তোমরা বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুল ভার্ণের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর লেখা একখানা বিখ্যাত বই—যার ইংরেজী নাম "Twenty thousand leagues under the sea" অনেকে হয়তো পড়েছ; অন্ততঃ তার বাংলা অনুবাদ—সুলেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসের লেখা "সাগরিকা" পড়েছ। তার মধ্যে "নটিলাস্" নামে এক অদ্ভুত কাল্পনিক ডুবো-জাহাজের কথা আছে। জুল ভার্ণ্ যখন ও বই লেখেন তখন কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে শী গ্ গি র ই একদিন তাঁর সেই অ সম্ভ ব কল্পনা কাজে পরিণত হবে।

সাব্‌মেরিন্ সমুদ্র-পথে চলেছে। শুধু 'কনিং টাওয়ার', আর 'পেরিস্কোপ্' জলের ওপর দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ডুবো-জাহাজ তৈরীর চেষ্টা কিন্তু জুলে ভার্ণের আগেই হয়েছিল। কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ ড্রেবেল নামে একজন ওলন্দাজ নাকি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌এর সময়ে টেম্‌স্ নদীতে এই রকম একটা ছোট্ট ডুবো-নৌকো কয়েক ঘণ্টা জলের নীচে দিয়ে চালাতে পেরেছিলেন। তার পর ১৭৭৬ সনে ডেভিড বুশ্‌নেল নামে একজন আমেরিকান্ ছোট্ট একটা কাঠের সাব্‌মেরিন্ তৈরী করেন। ইংরেজদের যুদ্ধ-জাহাজ 'ঈগল'কে ঘায়েল করার জন্য এই সাব্‌মেরিন্ ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সাব্‌মেরিনে চড়ে জলের তলায় লুকিয়ে এসে চুপি চুপি 'ঈগলের'

গায়ে বারুদ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো ঠিক মত লাগান হয় নি; বিস্ফোরণ একটা হয়েছিল, কিন্তু 'ঈগলের' তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। ক্ষতি হোক্ না হোক্, পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে—কারণ যুদ্ধের জন্য ডুবো-জাহাজ তৈরী করে তাকে এই ভাবে কাজে লাগান যেতে পারে, এই রকম একটা সম্ভাবনা নাকি এর থেকেই যুদ্ধবিশারদদের মাথায় আসে।

তার প্রায় শ'খানেক বছর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে 'হাউস্যাটনিক্' নামে একখানা যুদ্ধ-জাহাজ সাব্‌মেরিন্ থেকে ছোঁড়া টর্পেডোর ঘায়ে ডুবে যায়। অবশ্য সাব্‌মেরিন্‌খানাও রেহাই পায় নি। কিন্তু এর পর সাব্‌মেরিনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আর কারো সন্দেহ রইল না।

এর পর থেকেই নানা দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এ নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করলেন এবং ফলে কিছু দিনের মধ্যেই আবিষ্কার হ'ল ডুবো-জাহাজের। দেখতে দেখতে তাদের পরাক্রমে সমুদ্র-পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

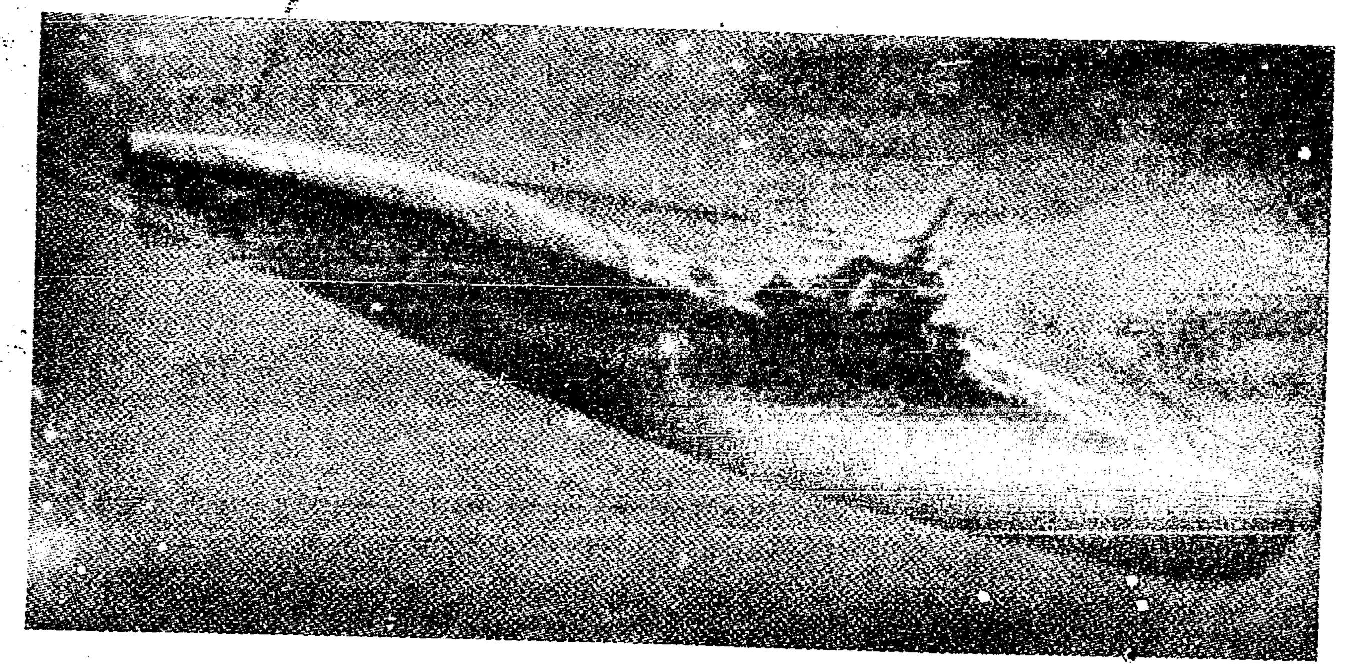
ডুবো-জাহাজ জলের তলায় ডুব দিয়েছে,—এখন দশ দিকেই জল।

সত্যিকার সাব্‌মেরিন্ তোমরা কেউই বোধ হয় দেখ নি, তবে তার ছবি দেখেছ। সাব্‌মেরিন্ দেখতে অনেকটা বর্ম্মা চুরুটের মত, তবে ওপরটা তার চ্যাটাল। এটাকেই সাব্‌মেরিনের ডেক্ বলা যেতে পারে। লম্বায় এক-একটা সাধারণতঃ তু'-তিন শ', এমন কি চারশ' ফুটের ওপরও হয়। আবার খুব ক্ষুদে ডুবো-জাহাজও তৈরী করেছে জাপানীরা। ডুবো-জাহাজের ছাদ বা পাটাতনের ঠিক মাঝখানে একটা আলোকস্তম্ভের মত জিনিষ দেখতে পাবে; একে বলে 'কনিং টাওয়ার'। এখান দিয়েই নাবিকেরা জাহাজের ভিতরে ওঠা-নামা

করে। ডুবো-জাহাজ কিন্তু কয়লায় চলে না—এর এঞ্জিন চালান' হয় গ্যাসোলিন দিয়ে। কারণ তা'তে ঝঞ্ঝাট অনেক কম। আবার ডুবো-জাহাজ যখন জলে ডুবে থাকে তখন এই গ্যাসোলিনও ব্যবহার করা হয় না, তখন তাকে চালান' হয় বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সাহায্যে। জলের তলায় কিন্তু ডুবো-জাহাজকে বেশীক্ষণ চালান' হয় না, কারণ তা'তে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি সহজে বিগড়ে যাবার ভয় আছে। সাধারণ অবস্থায় ডুবো-জাহাজ জলের ওপর ভেসেই চলে, বেগতিক দেখলে জলে ডুব দেয়। জলের ওপর ডুবো-জাহাজের গতিবেগ জলের তলাকার চাইতে অনেক বেশী। জলের ওপর এগুলি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ১৫।১৬ নট্ (সামুদ্রিক মাইল) বেগে যায়, জলের তলায় ঘণ্টায় ৮।১০ নটের বেশী যায় না। এক নট্ হচ্ছে—আমাদের ডাঙ্গার হিসাবে ৬০৮০ ফুট্।

ডুবো-জাহাজ সম্বন্ধে কথা উঠলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন জাগে—জাহাজগুলি জলের তলায় ওঠা-নামা করে কি ক'রে? প্রত্যেক ডুবো-জাহাজেই কতকগুলি করে ট্যাঙ্ক বা জলাধার থাকে। এগুলির সঙ্গে থাকে ভাল্‌ভ আর ঘন চাপের বাতাস ঢোকাবার নল। ভাল্‌ভ খুলে বা বন্ধ ক'রে ট্যাঙ্কগুলিকে ইচ্ছামত জলে ভর্ত্তি করা যায়, আবার জল বার করে দেওয়া যায়। ট্যাঙ্কে জল ঢুকলেই ডুবো-জাহাজের ওজন বাড়তে থাকে, এবং ঠিক পরিমাণ মত জল ঢুকলেই নিজের দেহের ভারে ডুবো-জাহাজ জলের তলায় চলে যায়। ট্যাঙ্ক অর্দ্ধেক ভর্ত্তি থাকলে ডুবো-জাহাজেরও আধখানা ডুবে থাকে। যুদ্ধের সময় ডুবো-জাহাজের ট্যাঙ্কগুলি সর্ব্বদা এমন ভাবে জলপূর্ণ করা হয় যে দরকার হ'লেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সেগুলি জলের তলায় গা-ঢাকা দিতে পারে। জলের তলায় গিয়ে কোন কারণে (যেমন ধর তেল, অস্ত্রশস্ত্র বা খাবার-দাবার কমে যাবার ফলে) যদি ডুবো-জাহাজের ওজন কমে যায় তবে আবার ঠিক ওজন মত জল ঢোকাবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত ট্যাঙ্কেরও ব্যবস্থা থাকে। জল থেকে উঠে আসতে হ'লে ট্যাঙ্কের মধ্যে ঘন চাপের বাতাস ঢুকিয়ে জল বার করে দেওয়া হয়। ফলে ওজন কমে যাওয়ায় ডুবো-জাহাজ ওপরে ভেসে ওঠে।

সময় সময় ডুবো-জাহাজকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের নীচে লুকিয়ে থাকতে হয়।

জলের তলায় অতক্ষণ থাকতে হ'লে নিঃশ্বাস নেবার মত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন চাই। প্রত্যেক ডুবো-জাহাজে সে ব্যবস্থা রাখতে হয়। এ জন্য ঘন চাপের বাতাস-ভরা বড় বড় 'সিলিণ্ডার' সর্ব্বদাই তৈরী থাকে, তাই থেকে নাবিকদের প্রয়োজন মত অল্প অল্প বাতাস ছাড়া হয়। ক্রমাগত নিঃশ্বাস নিয়ে নিয়ে বাতাস দূষিত হ'ল কিনা পরীক্ষা করবার জন্য আগে সাদা ইঁদুর ব্যবহার করা হ'ত, ইঁদুর নিঃশ্বাস নিতে না পারলে বোঝা যেত বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে। আজকাল অবশ্য আর ইঁদুরের ওপর অত্যাচার করা হয় না—ম্যানোমিটার যন্ত্রেই সমস্ত খবর পাওয়া যায়। দূষিত বাতাস নল দিয়ে বার করে দিয়ে তার জায়গায় আনা হয় ঘন চাপের বিশুদ্ধ বাতাস।

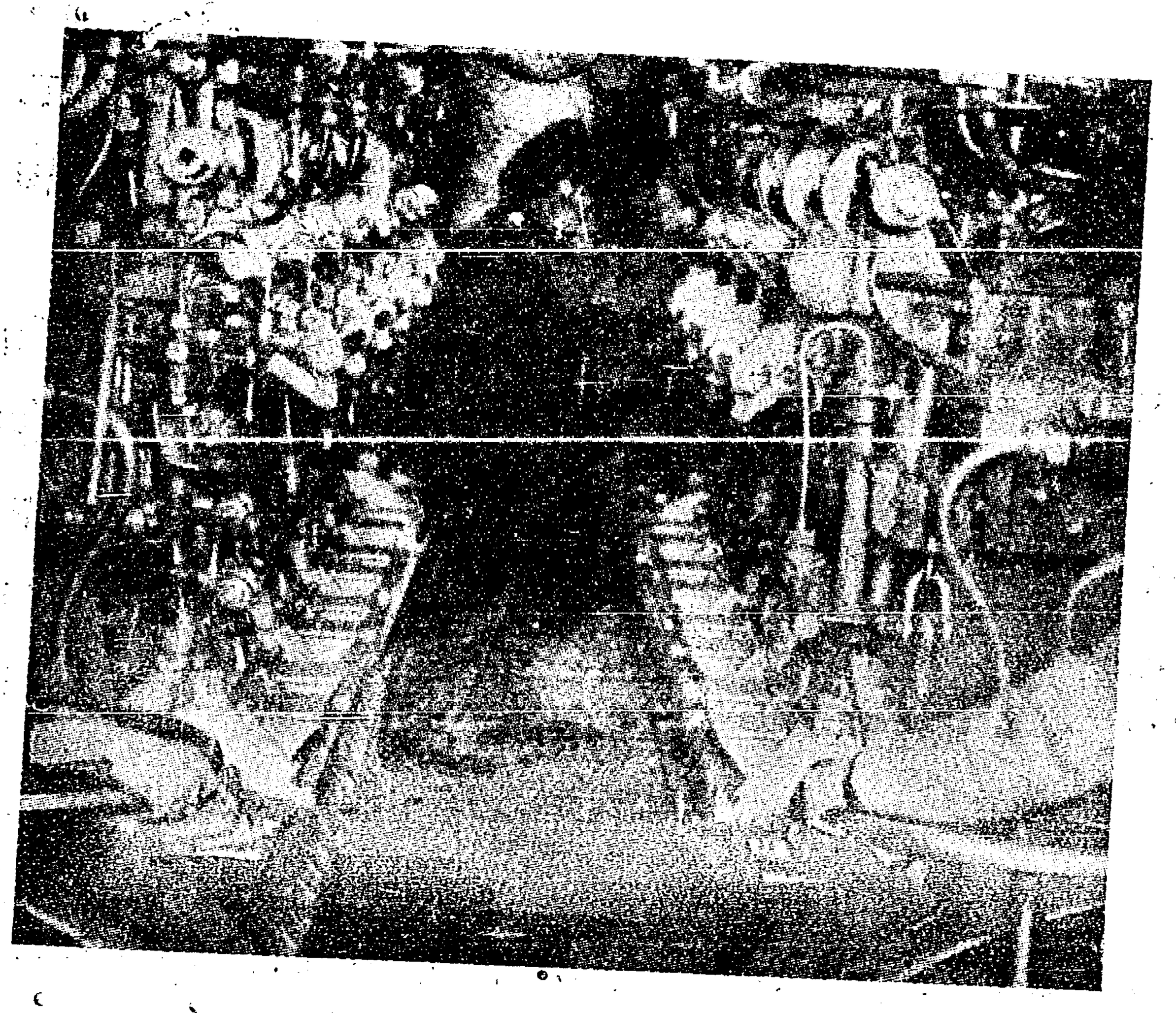
ডুবো-জাহাজের ভিতরকার এঞ্জিন-ঘর ;—নানা রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে আগাগোড়া ভর্ত্তি।

শুধু বাতাস নয়, নাবিকদের (এক একটা ডুবো-জাহাজে সাধারণতঃ ১৫ থেকে ৩০ জন নাবিক থাকে), খাবার-দাবার, বিজলী আলো, কথা বলার জন্য মাইক্রোফোন, খবর দেবার জন্য বেতার ইত্যাদির পরিপাটী ব্যবস্থাও রাখতে হয়।

ডুবো-জাহাজ যখন জলের তলায় থাকে তখন কি সে বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ থাকে? জলের তলা থেকে ওপরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোন শত্রু-জাহাজ আক্রমণ করতে আসছে কিনা এ সব খবর সে পায় কি ক'রে? সাব্‌মেরিনের প্রথম যুগে এ একটা সমস্যার কথাই ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। ডুবো-জাহাজের কনিং টাওয়ারের ওপর এক বা একাধিক লম্বা নলের মত চোঙ্গা

তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? এগুলোকেই ডুবো-জাহাজের চোখ বলা যেতে পারে। এর নাম পেরিস্কোপ্। কথাটা এসেছে গ্রীক্ 'পেরিস্কোপিন' শব্দ থেকে—তার মানে চার দিক্ দেখা। ডুবো-জাহাজ জলে ডুবে থাকলেও এই পেরিস্কোপের ডগা থাকে জলের ওপর ভেসে, সেই ডগায় থাকে একটা লেন্স ; এই লেন্সের ওপর জলের ওপরকার সমস্ত ছবি পড়ে, আর পেরিস্কোপের নলে প্রতিফলিত হয়ে সেই ছবি নীচে অধ্যক্ষের সামনে 'আইপিসের' ওপর ভেসে ওঠে। অধ্যক্ষ বা কমাণ্ডার আইপিসে চোখ রেখেই বুঝতে পারেন ওপরে কোথায় কি হচ্ছে। তবে এই পেরিস্কোপ্ অনেক সময় ডুবো-জাহাজকে বিপদে ফেলতেও পারে। কারণ জলের ওপর ভেসে থাকায় সেটা শত্রুপক্ষের নজরে আসা কিছু বিচিত্র নয়। তবে দরকার হ'লে পেরিস্কোপ্ শুদ্ধু ভিতরে ঢুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে।

এইবার ডুবো-জাহাজ কি ভাবে যুদ্ধ করে তাই বলি।

ডুবো-জাহাজের আসল কাজ হচ্ছে শত্রুপক্ষের জাহাজকে আক্রমণ করা, আর এর জন্য তার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে টর্পেডো। অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য আজকালকার অনেক ডুবো-জাহাজের ডেকে কামানও বসান থাকে ; সমুদ্রে মাইন পাতার কাজেও অনেক ডুবো-জাহাজকে লাগান হয়। কিন্তু টর্পেডো ছোঁড়াই তার আসল কাজ। ডুবো-জাহাজের সম্মুখ দিকে থাকে টর্পেডো ভরবার চোঙা। চোঙার দু'টো দরজা। প্রথমে ভিতরেরটা খুলে চোঙায় টর্পেডো ভরা হয়, তার পর সেটা বন্ধ ক'রে বাইরেরটা খুলে টর্পেডো ছাড়া হয়। শত্রু-জাহাজের সাড়া পেলে ডুবো-জাহাজের হাইড্রোফোন যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। সাধারণতঃ বিপক্ষ জাহাজের সম্মুখ দিকে ৫।৬শ' গজ দূর থেকে টর্পেডো ছোঁড়া হয়, পেছন থেকে আক্রমণ ততটা কার্য্যকরী হয় না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বিপক্ষ জাহাজের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে টর্পেডো ছুড়তে পারলে তার নাকি আর রক্ষা নেই।

টর্পেডোর মত ভয়ানক জিনিষ জলযুদ্ধে কমই আছে। এগুলিকে এক-একটা ছোটখাট সাব্‌মেরিন্ বলা যেতে পারে। টর্পেডোর মধ্যেও থাকে এঞ্জিন, হাল, আরও কত কি! তবে সে এঞ্জিনের কোন চালক থাকে না—নিজে নিজেই তা চলে। টর্পেডোকে ঠেলে নিয়ে চলে বাতাসের চাপ। টর্পেডোর মুখের কাছে

থাকে বিস্ফোরকের কামরা। তার মধ্যে ভরা থাকে শ' পাঁচেক পাউণ্ড ওজনের প্রচণ্ড বিস্ফোরক। তার পর থাকে ঘন চাপের বাতাস ভরা কামরা, আর তার পেছনে এঞ্জিন। টর্পেডোর ভিতরকার এঞ্জিন-ঘর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ঐটুকু জায়গার মধ্যে এত কৌশলে এত খুঁটিনাটি অথচ এত শক্তিশালী যন্ত্রপাতি কি ক'রে বসান থাকে ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। ঘণ্টায় প্রায় ৫০ নট্ (অর্থাৎ ডাঙ্গার সাড়ে সাতান্ন মাইল) বেগে এই প্রচণ্ড যন্ত্র-দানব জল কেটে শত্রু-জাহাজের দিকে ছুটতে থাকে। জলের চাপে যাতে না আগেই বিস্ফোরণ হয়ে যায় তারও ব্যবস্থা করা থাকে। প্রচণ্ড বেগে টর্পেডো গিয়ে শত্রু-জাহাজের গায়ে ধাক্কা মারে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরকার সেই ৫০০ পাউণ্ড ওজনের বিস্ফোরক মুহূর্ত্তের মধ্যে ফেটে সে জাহাজকে চূরমার করে দেয়।

এমন যে ভীষণ চীজ্ টর্পেডো এবং তার ধুরন্ধর বাহন সাব্‌মেরিন্—এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে এদের জব্দ করবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা যে নানা মতলব বার করবেন তার আর আশ্চর্য্য কি? ডুবো-জাহাজকে জব্দ করবার জন্যও অনেক ফন্দী মানুষ বার করেছে। তার ২।১টির কথা বলি।

প্রথমেই বলতে হয় 'ডেপ্‌থ্ চার্জ্জের' কথা। এগুলোকে এক কথায় জলের বোমা বলা যেতে পারে। দেখতে এগুলো অনেকটা ইস্পাতে তৈরী পিপের মত। তার মধ্যে ভরা থাকে প্রায় শ' তিনেক পাউণ্ড ওজনের প্রচণ্ড বিস্ফোরক (যেমন ধর, টি-এন্-টি)। ডেপ্‌থ্ চার্জ্জের ভিতর একটা ভাল্‌ভ্ স্প্রিং দিয়ে এমন ভাবে আটকান থাকে যে তার ওপর একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট চাপ পড়লেই স্প্রিংএর টান এড়িয়ে ভাল্‌ভ্ খুলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বোমাও যাবে ফেটে। সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় সমুদ্র-জলের চাপ নানা রকম হয় তা তোমরা জান। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, পেরিস্কোপ্ দেখা না গেলেও, অনেক সময় ডুবো-জাহাজ জলের কোন্ জায়গায় আছে যুদ্ধ-জাহাজগুলো তা আন্দাজ করতে পারে। কাজেই ঠিক সেই গভীরতায় গিয়ে যাতে ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ ফাটতে পারে স্প্রিংএর টান সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া তাদের পক্ষে বেশী কষ্টকর হয় না। ডেপ্‌থ্ চার্জ্জগুলো দু' রকম ভাবে

ছোঁড়া হয়। এক—যুদ্ধ-জাহাজের পেছন দিক্ দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়, আবার হাউইট্‌জার কামানের মধ্যে পুরে কামানে গোলা দাগবার মত করে জাহাজ থেকে ৪০।৫০ গজ দূরে ছিটকে দেওয়া হয়। জলের মধ্যে গিয়ে এই নিদারুণ জল-বোমা যখন ফেটে যায় তখন তার আশ-পাশে জলের মধ্যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে, ফলে সমুদ্র-জলে দেখা দেয় প্রচণ্ড আলোড়ন। এরোপ্লেন থেকে সহরের ওপর বোমা ফেললে যে অবস্থা হয় ডেপ্‌থ্ চার্জ্জের ফলে জলের মধ্যেও বিভ্রাট তার চেয়ে কম হয় না। সে বোমা কোন ডুবো-জাহাজের কাছে—এমন কি পঞ্চাশ গজ দূরে ফাটলেও ডুবো-জাহাজের পক্ষে সেটা হয় মারাত্মক। কাছে হ'লে তো চূরমার হয়ে যায়ই, দূরে ফাটলেও তার চাপে ডুবো-জাহাজের যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে, তুবড়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। তখন কোন রকমে ভেসে উপরে উঠলেও রক্ষা নেই, শত্রু পক্ষের যুদ্ধ-জাহাজ তাদের বড় বড় কামান নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে।

ডেপ্‌থ্-চার্জ্জ্ ছাড়াও ডুবো-জাহাজ ঘাল করবার অন্যান্য ফন্দী-ফিকিরের মধ্যে মাইন—বিশেষতঃ য়্যাণ্টেনা মাইনের নাম করা যেতে পারে। গভীর সমুদ্রে এই মাইন পাতা হয় আর তা' থেকে অসংখ্য তার মাকড়সার জালের মত সমুদ্রে ছড়িয়ে থাকে। কোন ডুবো-জাহাজ এসে অতর্কিতে সেই তারে লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে মাইন বিদীর্ণ হয়ে তার দফা শেষ করে। কিন্তু মাইনের কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, তা আজ থাক্।

আসছে মাস থেকে "সাগরিকা", "ভূগর্ভে ভ্রমণ", "চম্পাদ্বীপ", "অজ্ঞাত দেশ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুসাহিত্যিক **শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসের** নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস **"নিরুদ্দিষ্টের দল"** রামধনুতে বার হবে। সেই সঙ্গে থাকবে বাংলার সুবিখ্যাত লেখক ও কবি **শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের** লেখা ধারাবাহিক সত্য ঘটনামূলক রোমাঞ্চকর উপন্যাস **"হরে মাঝি"** (জলদস্যু)।

এ ছাড়া বাংলার **আরও একজন জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিকের লেখা আরও একখানি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাসের** ব্যবস্থা করা হবে।

কার্ত্তিকের পিতা

শ্রীমানসী বসু, এম্. এ

পূজার ছুটীর আগে কার্ত্তিক এসে আমাদের কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। মফঃস্বলের কোন স্কুল থেকে সে পাশ করেছে, তার হাব-ভাবে তখনও গ্রাম্যসুলভ সরলতা পরিস্ফুট। রোগা মত মাথা মোটা 'পুকুরে কই'এর মত চেহারার জন্য সকলে তাকে ক্ষেপাত কিন্তু তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, মেধা, বিজ্ঞানে তার গভীর জ্ঞান এবং যুক্তি অবতারণা করবার ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেইজন্য সারা হষ্টেলের মধ্যে আমিই ছিলাম তার বন্ধু। কিন্তু তার প্রতিভায় আমি যতটা মুগ্ধ ছিলাম তার চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম তার পিতৃভক্তি দেখে। বাপের কথা বলতে গেলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ওর স্বর গদ্‌গদ হয়ে উঠ্‌ত, পার্থিব কিছুর উপর লোকের সেরূপ ভাব হয় না। অথচ কার্ত্তিককে কখনও ওর বাবার পত্র পেতে দেখি নি এবং ও সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে ও একই জবাব দিত, "বাবা একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত আছেন।" এমন কি কার্ত্তিকের সেবার খুব অসুখ করল, যত্ন ও শুশ্রূষার ক্রটী হ'ল না বটে কিন্তু বাড়ী থেকে কেউই এল না, শুধু এল ওদের ম্যানেজারের চিঠি ও টাকা। কার্ত্তিকের বাবাকে দেখবার ইচ্ছা আমার খুবই ছিল। কত ছুটীতে তাকে আমি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছি, কত দিন ছাদে বেড়াতে বেড়াতে ওর বাবার কথা শুনেছি এবং তাঁকে একবার দেখবার ইচ্ছাও জানিয়েছি। কিন্তু কার্ত্তিক কোন দিনও ওদের বাড়ী যাবার নিমন্ত্রণ করে নি। অথচ আমি জানতাম ওরা খুব বড়লোক,—আসামে ওদের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি আছে।

তার পর অনেক দিন কেটে গেছে। আমি এন্‌জিনীয়ারিং পাশ করে মোটা মাইনের সরকারী চাকরী নিয়ে আসামে বদলী হয়ে এসেছি। কার্ত্তিকের দেখা অনেক দিন পাই নি, তবে শুনেছি সে এম্.এস্-সি পাশ করে দেশে গিয়ে কি সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছে।

একদিন সহকর্ম্মীর রিপোর্ট থেকে জানলাম যেখানে আমি আস্তানা নিয়েছি তার কিছু দূরেই কয়েকখানা পুরোনো বাড়ী এমন ভগ্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সেটা একদম ভেঙ্গে না ফেললে সাধারণের পক্ষে তা রীতিমত বিপজ্জনক। বাড়ীর অবস্থা ও আমাদের নিয়ম জানিয়ে বাড়ীর মালিকের কাছে "অফিসিয়াল লেটার" পাঠান হ'ল।

পরদিনই দেখি কার্ত্তিক এসে আমাদের অফিসে হাজির। ওটা নাকি ওরই বাড়ী। এবং

ওখানেই নাকি ও থাকে, এবং ওরই মধ্যে নাকি ও এমন একটা সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে যে তার ফলে, ও মনে করে, সারা বিশ্ব বিস্ময়ে চমকে উঠবে। কার্ত্তিকের কথাবার্ত্তা শুনে ওর প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার কেমন একটু সন্দেহ হ'ল। ওর বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর আমার বরাবরই একটু শ্রদ্ধা ছিল, কাজেই বড় হতাশ হ'লাম।

কার্ত্তিক আমাকে বোঝাতে ক্রটী করলে না যে বাড়ীটার সঙ্গে তাদের বংশের ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আর আমার সহকর্ম্মী যে রিপোর্টই দিক প্রাচীরগুলো ওর খুবই মজবুত—এমন কি আরও একশ' বছরেও তা নষ্ট হবার নয়। তার বক্তৃতা করবার শক্তি ও যুক্তি অবতারণা করবার ক্ষমতা আমার জানা ছিল কাজেই আমি ওধার দিয়ে না গিয়ে বললাম, "আচ্ছা, কাল নিজে আমি একবার বাড়ীটা দেখ্‌ব, এবং যদি কোনও রকমে প্রাচীর রাখা সম্ভব হয় তা করব।" কার্ত্তিক খুসি হয়েই গেল মনে হ'ল, কারণ তার বাড়ী গিয়ে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণও করে গেল। রিপোর্ট অনুসারে তার বাড়ী কিছুতেই রাখা যায় না, তবুও কেবলমাত্র তার সেই বিখ্যাত "পিতৃদেব"কে একবার চাক্ষুষ দেখবার কৌতূহলেই আমি নিজে যাবার কথা পাড়লাম।

পরদিন বেলা থাকতেই কার্ত্তিকের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। পনেরো বিঘে জায়গা যুড়ে কার্ত্তিকের বাড়ী, বিরাট ব্যাপার। রাস্তার দু' কোণায় দু'খানা বাড়ী। এক পলক চেয়েই বুঝলাম যে রিপোর্টে কিছু ভুল নেই। প্রাচীর ঝুলে এসেছে, মাঝে মাঝে বিশ্রী ফাটল ধরেছে। কত যুগের বাড়ী যে এটা তা বলা যায় না! কিন্তু ভিতরে ঢুকে আমার যেন চোখ ঝলসে গেল। হাঁ, যত্ন করে রাখবার মত জিনিষ বটে। কার্ত্তিককে দোষ দেওয়া যায় না।

টেবিলের দু'ধারে দু'জনে বসলাম। কার্ত্তিক নিজেই আমাকে চা ঢেলে দিলে। খাবারের আয়োজন খুব বেশী পরিমাণ হয়েছিল, রেফ্রিজারেটার থেকে কার্ত্তিক আইস্-ক্রীম পর্য্যন্ত বের করে খাওয়ালে। খাবার টেবিলে তার বাবাকে না দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। কার্ত্তিক সংক্ষেপে জানালে, তিনি গবেষণায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন সেইজন্য চায়ের টেবিলে উপস্থিত হতে পারলেন না। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তিনি উপস্থিত কোথায় থাকেন এখন?" জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কার্ত্তিক উত্তর দিলে—"চারিপাশে বাগান দিয়ে যে বাড়ীটা ঘেরা আছে ঐখানে।"

চা খাওয়ার পর বাড়ী দেখলাম, যত্ন করেই দেখলাম—যদি কিছুও বাঁচান যায়। কিন্তু অসম্ভব। প্রাচীর ৪।৫ ইঞ্চি ঝুলে গেছে, মাঝে মাঝে বিপজ্জনক ফাটল ধরেছে। কার্ত্তিককে জানালাম, রাখবার উপায় নেই, সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সমস্তই নতুন করে গাঁথতে হবে। কার্ত্তিক কিছু বিমর্ষ হয়ে পড়ল ও আস্তে আস্তে বললে, "আচ্ছা মহীতোষ, আগাগোড়া যদি বাইরের দিক্ থেকে 'কংক্রিটের' সব ঢালাই করে উঁচু প্রাচীর তুলে নিই তবে ত' সাধারণের কোন ভয় নেই?" আমি হেসে উঠে বললাম, 'পাগল আর কি, সে কি সম্ভব?"

কার্ত্তিকের বাড়ী দেখা শেষ করে যে বাড়ীটায় তার বাবা আছেন সেটাও দেখতে চাইলাম। কার্ত্তিক প্রথমটায় একটু চমকে উঠল, তার পর কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে, "আমার টাকার জোর আছে, এই জোরে তোমায় আমি বিপর্য্যস্ত করতে পারি জান?"

কার্ত্তিককে চিনতাম, তাই তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, "আমাকে বিপর্য্যস্ত কি বিপদ্‌গ্রস্ত করে লাভ হবে না কারণ গভর্ণমেণ্ট থাকবেই, আর তার কর্ম্মচারীদের চোখে তোমার বাড়ী পড়বেই।" কার্ত্তিক এক মুহূর্ত্ত গম্ভীর হয়ে থেকে বললে, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস।"

নীরবে কার্ত্তিককে অনুসরণ করলাম। কার্ত্তিক সারা পথ একটা কথাও কইলে না। বাড়ীর সম্মুখে এসে সে একবার দাঁড়াল। নীরবেই পকেট থেকে একটা রিং বার করলে; তাতে বড় বড় দু'টো চাবি ঝুলছে, তারই একটা চাবি দিয়ে ভারী মেহগিনী কাঠের কারুকার্য্য-করা দরজা খুলে ফেললে। আমি শঙ্কিত হৃদয়ে তার সঙ্গে ভিতরে ঢুকলাম। সব সময়ে আমার মনে হচ্ছিল কি একটা অদ্ভুত লুকান রহস্য যেন এখনি ধরা পড়ে যাবে! কার্ত্তিক মেহগিনী কাঠের দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিলে। পাশ্ববর্ত্তী সুইচ্ টিপে দিতে দিনের মত ঘর আলো হয়ে উঠল এবং তাতেই দেখলাম চৌকোণা ঘর, জানালা বলে কোথাও কিছু নেই, এক দিকে দেয়ালে দু'টো চাকা লাগান আছে। কার্ত্তিক এগিয়ে এসে একটা চাকা ঘুরিয়ে দিলে; ভোজবাজীর মত মেঝে ফুঁড়ে একটা দেয়াল উঠে এসে সামনের দরজাকে ঢেকে দিলে এবং দ্বিতীয় চাকা ঘুরিয়ে দিতেই সামনের দেয়াল ধীরে ধীরে মেঝের নীচে নেমে যেতে লাগল। শেষ অবধি দেয়াল নেমে যেতে দেখলাম একটা দরজা সামনে রয়েছে। আমি এতই মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলাম যে কোন কথা কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করবার শক্তিও আমার ছিল না। তাই কার্ত্তিক যখন আর একটা চাবি দিয়ে সামনের দরজা খুলে ফেলে আমায় বল্‌লে, "এস হে মহীতোষ", তখন নীরবে তার অনুসরণ করা ছাড়া একটা কথাও আমার মুখে ফুটল না।

বিস্তীর্ণ হল্, বৈদ্যুতিক ঝাড়ে অলোকাকীর্ণ। একটি জানালা নেই। কেবল আলমারীর পর আলমারীতে বই সাজান রয়েছে। সেই আলোর ঝাড়ের নীচে একটা কৌচের উপর একটি অল্প-বয়স্ক ভদ্রলোক এক মনে বই পড়ছিলেন। আমাদের পায়ের শব্দে তিনি মুখ ফিরিয়ে বসলেন।

কিন্তু বিস্ময় আমার চরমে পৌছুল যখন কার্ত্তিক সেই ভদ্রলোকটিকেই সম্বোধন করে ডাকলে, "বাবা!" ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে কার্ত্তিক?" কার্ত্তিক বললে, "ইনি সরকার পক্ষ থেকে বাড়ীর তদন্তে এসেছেন।"

এইবার বুঝতে পারলাম, আমি নিঃসন্দেহ একদল পাগলদের ভিতর স্বেচ্ছায় এসে পড়েছি। একজন বাড়ীর আগাগোড়া থাম ও প্রাচীর দিয়ে গেঁথে দিতে চায়, আর একজন অপরের চেয়ে অন্ততঃ পক্ষে ১০।১৫ বছরের ছোট হয়েও তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতে চায়! পালাবারও পথ

নেই—রহস্যময় প্রাচীর দিয়ে বাড়ীর আগাগোড়া তৈরী। মনে হচ্ছিল বুঝি আরব্যোপন্যাসের যুগে ফিরে গেছি।

কার্ত্তিক আমার পরিচয় করিয়ে দিলে, "বাবা, আপনার মহীতোষ রায়কে মনে আছে? যার সঙ্গে আমি কলেজে পড়তাম?" তিনি একটু হেসে বললেন, "হাঁ হাঁ, আমার মনে আছে। একবার উনি তোমায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁদের বাড়ীতে। তোমারও ইচ্ছা ছিল এখানে একবার নিমন্ত্রণ করার, কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ আমি মারা যাওয়াতে সুবিধা হয় নি।"

সাহসী বলে চিরদিন আমার খ্যাতি ছিল কিন্তু কাপুরুষের মতই আমি ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে বসে পড়লাম। আর্ত্তনাদের মত আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, "আমাকে যেতে দাও, তোমার সম্পত্তিতে হাত দেব না আমি।"

কার্ত্তিক ও তার পিতা আমাকে ধরাধরি করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। কার্ত্তিক আমার পিঠ চাপড়ে বললে, "মহী, এত ভয় পাচ্ছ কেন হে? এ তোমাকে শোভা পায় না।" আমার তখন প্রায় দাঁতে দাঁত লেগে যাবার মত অবস্থা, কিন্তু তবুও লজ্জিতমুখে স্থির হয়ে বসলাম। কার্ত্তিক আমার সুমুখে একটা চেয়ার টেনে এনে বসল ও ধীরে ধীরে বলতে সুরু করল, "শোন মহী, তুমি এখনি বলছিলে না যে এখান থেকে ছাড়া পেলে আর আমার বিষয়ে হস্তার্পণ করবে না? কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে তা সত্য নয়। যদিও উপস্থিত তুমি এই চিন্তা করছ না তবে এটা নিশ্চিত যে তুমি ছাড়া পেলে আগেই ডাক্তারের কাছে ছুটবে ও তার সাহচর্য্যে আমাদের পাগলা-গারদে পোরবার ব্যবস্থা করবে। আমার বাবাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু ইনি জীবিত নন, অনেক দিন হয় মারা গেছেন। আমার মা এখানে নেই কারণ তিনি আগেই মারা গিয়েছিলেন।"

আমি চুপ করেই শুনতে লাগলাম। কার্ত্তিকের বাবা বোধ হয় মৃদু হাস্য করছিলেন। কার্ত্তিক একটু থেমে আবার বলতে সুরু করলে, "সব ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে চারিদিকের দেওয়াল দেখছ এ খুবই মজবুত এবং এই ঘর সব জিনিষের থেকে আলাদা। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় তোমরা "বস্তু" বল, সত্যিই এটা সেই "বস্তু"র যে কোনটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক কথায় সব কিছু থেকেই এই ঘরকে আলাদা করে রাখা হয়েছে—এমন কি সময়ের সঙ্গ থেকেও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ ঘরের ভিতর সময়ের চাকা ঘোরে না; এখানে শুধু স্থিতিকাল আছে, কিন্তু সময় নেই। মহীতোষ, বুঝতে পারছ কি? এখানে সময় নেই। ব্যাপারটাকে একটু ভাল করে বুঝতে চেষ্টা কর।"

কিসের যেন প্রেরণা আমার ভিতর ঠেলে উঠল। কয়েকটা কথা বলতে আমি সমর্থ

হ'লাম, "সময়কে তুমি আলাদা করতে পার না কার্ত্তিক। বহির্জ্জগৎ থেকে আলাদা থাকা যায় না। তোমাকে পৃথিবীর গতির সঙ্গে ঘুরতে হবেই, আলোর গতিকে তুমি না মেনে পার না কার্ত্তিক! তুমি যা বলছ তা অসম্ভব। কারণ—" জড়িয়ে জড়িয়ে আমি নরেন্দ্র প্রভৃতি কয়েক জন বড় বড় পণ্ডিতের নজির দেবার চেষ্টা করলাম।

কার্ত্তিক মন দিয়েই আমার কথা শুনলে ও পরে ধীরে ধীরে সুরু করলে, "সাধারণতঃ লোকে যা ভুল করে তুমিও সেই ভুলই করছ। আজ যেটা লোকে সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করে কাল তাই-ই বৈজ্ঞানিকের হাতে সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মহী! অসম্ভব বলে সত্যি কিছু নেই। নেপোলিয়নের সেই কথাই আমি তোমাকে আবার বলতে চাই। এই ঘর দেশ ও কালের সর্ব্বপ্রকার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার বাবা তাঁর যুবাবস্থায় এই ঘর তৈরী করেছিলেন—তাঁর সারা জীবনব্যাপী গবেষণার ফল এই ঘর। সমস্ত জগৎকে যখন তিনি এই অপূর্ব্ব সাধনার সাফল্য জানাতে প্রস্তুত হলেন সেই সময়েই এক অঘটন ঘটে—ছুটীর একটা দিনে আমার মা ও বাবা মোটরে চড়ে বেড়াতে যান; আমি বাড়ীতে ছিলাম। দুর্ঘটনার পর আমার মা ও বাবাকে যখন সকলে বাড়ীতে নিয়ে এল তখন তাঁদের আমি নার্স ও ভৃত্যদের সাহায্যে এই ঘরে আনাই। ডাক্তার প্রথমে দেখে বলেন, তাঁর হাতের বাইরে; কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে আমার পিতার দেহে জীবনের সঞ্চার হয়েছে। তা ছাড়া দেহে কোন রকম গ্যাস কি জীবাণুর সঞ্চার হয় নি। অস্ত্রোপচার করার পর বাবা বেঁচে উঠেন। বাবার কাছে সেই ১৩১০ সাল আজও রয়েছে, এবং যাকে সকলে মৃত্যু বল এই ঘরের বাইরে পা দিলেই সেই মৃত্যু এঁর হবে এবং তা হ'লে এর পর আর এ ঘরে ইনি ফিরতে পারবেন না। যদি তুমি আমাদের বাড়ীর প্রাচীর নষ্ট করতে চাও তবে এই বিচ্ছেদ-প্রাচীরও নষ্ট হবে।" তার পর একটু থেমে বললে, "কিন্তু আমার মা? আমার মা আগেই মারা গেছলেন। বুঝেছ?"

আমি অনেক চেষ্টায় বললাম, "হাঁ বুঝেছি। কিন্তু এইবার আমায় যেতে দাও।" কার্ত্তিক আমার কথার উত্তর দিলে না কিন্তু পিতার সঙ্গে চোখে চোখে কি উত্তর-প্রত্যুত্তর করলে, তা'তে আমার অস্বস্তি আরও যেন বেড়ে গেল। এবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে রুদ্ধস্বরে আমি বলে উঠলাম, 'আমায় যেতে দাও কার্ত্তিক!' কার্ত্তিক অত্যন্ত শান্তস্বরে বললে, 'মহীতোষ, বাইরে যাবার তোমার উপায় নেই, কারণ তা হ'লেই তুমি মারা যাবে। খেতে খেতে আইস্-ক্রীমের তুমি অতিশয় সুখ্যাতি করছিলে 'বড় ভাল হয়েছে'। হবেই, কারণ আমি ওতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। এই ঘরের বাইরে সময়ের চাকা ঠিক ঘুরে যাচ্ছে, এখানে তার আধিপত্য না থাকলে কি হয়! আমার গণনানুসারে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে তুমি মারা গেছ। বাইরে পা দিলেই তোমার মৃত্যু হবে।"

আমি শুধু অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠে বললাম, "সে দায়িত্ব আমি নিলাম, এখন আমায় ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু আমি নিতে খারি না। শুনে বরে আমার ফাঁসি দেওয়া হবে। তার চেয়ে তুমি তোমার সহকর্ম্মীকে একটা চিঠি দিয়ে দাও যাতে সে এই বাড়ী নিয়ে মাথা না ঘামায়।" আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে লিখলাম—'বাড়ীর অবস্থা যদিও ভগ্ন ও প্রাচীর প্রায় ৫ ইঞ্চি ঝুলে গেছে তবুও সে জন্য ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নাই।' নীচে আমার নাম সই করে দিলাম।

আমার বিশ্বাস ছিল এ চিঠি পেলে আমার সহকর্ম্মীরা সন্দেহ করে পুলিশে খবর দেবে এবং আমিও উদ্ধার পাব।

কার্ত্তিকের কথানুসারে তিন সপ্তাহ আগে এ ব্যাপার ঘটে গেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমি আর পালাবার জন্য উৎসুক নই। আরও আশ্চর্য্য, আমার ঘড়ি ঠিক টিক্ টিক্ করে কিন্তু কাঁটা ঘোরে না। দাড়ী কামাবার সাজ-সরঞ্জাম আমি পেয়েছি বটে কিন্তু কামাবার প্রয়োজন হয় না। এঁরা বলেন, তার কারণ হচ্ছে সময়ের কোন প্রভাব এখানে নেই, যা আছে তা স্থিতিকাল। এই স্থিতিকাল হয় পড়াশুনা করে নয় কার্ত্তিকের বাবার সঙ্গে গল্প করে যাপন করি। কার্ত্তিক বোধ হয় সে পত্র অফিসে পাঠায় নি কারণ তা হ'লে তারা তদন্তে আসত। যাই হোক্, এদের মতে যখন আমি মরে গেছি তখন কি ঘটছে না ঘটছে সে জন্য আমি কোনই ভাবনা করি না।

* * *

প্রায় মাস দুই পূর্ব্বে সরকারী এঞ্জিনীয়ারের পদে বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছি। সেদিন কোন প্রয়োজনে সরকারী রিপোর্ট দেখিতে দেখিতে এই পাণ্ডুলিপি পাই। মহীতোষ রায় প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এইখানে প্রধান এঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিয়াছিলেন এবং হঠাৎ তাঁর অন্তর্ধান হয়। পাণ্ডুলিপির নীচে তাঁর সহকর্ম্মীর এই রকম একটা নোট্ দেখিতে পাই: "কার্ত্তিক বাবুর বাড়ী যখন ভেঙ্গে ফেলা হয় তখন এই পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। লেখা যে মহীতোষ রায়ের নিজের হাতের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গোলা-বাড়ীতে তিনটী কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু কার্ত্তিক বাবুকে পাওয়া যায় নি।" —আর. ব্যানার্জ্জি।*

* বিদেশী গল্পের সামান্য ছায়া অবলম্বনে

ইউরোপের বড়দিনের স্মৃতি

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

এক রাশিয়া বাদে সমস্ত ইউরোপে কিশোর-কিশোরীদের সব চাইতে আনন্দের সময় বড়দিনের ছুটি। আমি একটি বড়দিন জার্ম্মানীতে ও তিনটি বড়দিন ইংলণ্ডে কাটিয়েছি। আমার ধারণা এ উপলক্ষে জার্ম্মান্‌রাই ইংরাজদের চেয়ে বেশী উৎসবের আয়োজন করে। তবে একই দিনে দুই দেশে উৎসব হয় না। ইউরোপের প্রায় সব দেশেই বড়দিনের সময় বাপমায়েরা ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু উপহার দেয়। এই উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের ফূর্ত্তিটা বেশ জমে। আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় যেমন হয় সেই রকম আর কি।

জার্ম্মানীতে দেখেছি একটা ঘরে গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে সেটা গাছের মত করে দাঁড় করায় ও বহু রংএর বাতি দিয়ে সেটা সাজায়। তার পর প্রতি ডালে ফল, লজেন্স অথবা চকোলেট বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। যেদিন প্রধান উৎসব সেদিনকে বলে **Weinachten**। এই দিন ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সন্ধ্যায় মা-বাবা ঐ ঘরে প্রথমে যাবেন, ও তাঁদের পেছনে যাবে ছেলেমেয়েরা। এর পর হবে উপাসনা। শেষে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে করমর্দ্দন করে তার উপহার হাতে দেবে ও সমস্ত বছর যাতে আনন্দে কাটে সেই কামনা করবে। ইংলণ্ডেও এখন ঐ রকম গাছ ঘরে রাখার প্রথা সুরু হয়েছে। এই গাছকে বলে 'ক্রিস্‌মাস্‌'গাছ' (**Christmas tree**)। ১৮৪০ সালে প্রিন্স কন্‌সর্ট্‌ নাকি এই প্রথা জার্ম্মানী থেকে প্রথম ইংলণ্ডে আনেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পূর্ব্বে জানানো হয় না তাদের কি উপহার দেওয়া হবে। কিন্তু বহুদিন ধরে তারা ঐ উপহারের আশায় দিন গুণে। তাই উৎসবের দিন সকাল থেকে এরা কত বার যে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে তার ঠিক নেই। কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠরা দিনভর সতর্কভাবে ঘরটি আগলে থাকেন যাতে কেউ তাঁদের উপহার সামগ্রী আগে থেকে না দেখে।

এই তো গেল বাড়ীর ভিতরকার খবর। বাইরে দোকানগুলিও খুব সাজানো

হয়। সেদিন জিনিষপত্র বেশী বিক্রী হয় না, দিন কয়েক আগে থেকেই লোকে সব জিনিষপত্র কিনে রাখে। শুনেছি সারা বছরে যা বিক্রী হয়, বড়দিনের আগে ছয় সপ্তাহে তার দ্বিগুণ জিনিষ বিক্রী হয়। আর সকলেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বড়দিনের কার্ড্‌ পাঠিয়ে অভিনন্দন জানায়। এতে পোষ্ট অফিসে ভয়ানক কাজ বেড়ে যায়। প্রতি ঘণ্টায় গাড়ী গাড়ী জিনিষ যাচ্ছে ষ্টেশনের দিকে। পার্শেলও কি যায় কম? চকোলেট, খেলনা, রুমাল ও অন্য অন্য উপহার প্রতি বাড়ী থেকেই যায়। তা ছাড়া টেলিগ্রামে শুভেচ্ছা জানানো তো আজকাল সাধারণ প্রথা হয়ে উঠেছে। কারণ খুব সস্তাতেই এ উৎসব সংক্রান্ত টেলিগ্রাম করা যায়। ১৯৩৭ সালে বড়দিনের দিনে নাকি ৩৫০,০০০ এই রকম টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল।

ইউরোপে মুরগীর দাম খুব বেশী, কিন্তু এদিনে গরীব লোকেও বাড়ীতে মুরগী রাঁধে। ইংলণ্ড প্রচুর মুরগীর অর্ডার দেয় হাঙ্গেরী ও মধ্য-ইউরোপে। আর তা ছাড়া মুরগীর মাংস বরফের ভিতরে চালান আসে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। বড়দিনের বন্ধে যার অবস্থা কিছু ভাল বা মোটামুটি ভাল সেও আত্মীয়স্বজনকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। আর প্রত্যেক অফিস ও কারখানা অন্ততঃ দশ দিনের জন্য ছুটি দেওয়া হয়; তাই খাওয়াদাওয়া সোরগোলে বেশ জমে, ছুটিটা একঘেয়ে ঠেকে না।

বড়দিনে কার্ড্‌ পাঠানো সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথা হ'লেও এ পাঠানোর ভেতর অনেক সময়ে বেশ একটা গুরুত্ব থাকে। কেননা দেখা যায় অনেকে স্বল্পপরিচিত লোকের কাছে কার্ড্‌ পাঠাচ্ছে। তার মানে বুঝতে হবে সে নিজে যেচে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতে চায়। এই ভাবে যে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সৃষ্টি হয় অনেক সময়েই সে বন্ধুত্ব ও প্রীতি স্থায়ী হয়। নিজের দোষে কারুর সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হয়েছে, যেচে দোষ স্বীকার করাতেও লজ্জাবোধ হচ্ছে, এ অবস্থায় কার্ড্‌ পাঠিয়ে দিলে আত্মসম্মানও ক্ষুণ্ণ হয় না, পুরানো ভালবাসাও আবার ফিরে পাওয়া যায়।

লিয়ঁন্‌স্‌, ফ্রান্স, ১৯৩৯

নতুন খেলা

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

যাদুকর আজ ফিরছে।

সাত সমুদ্র, তের নদী, তেপান্তরের পথ পেরিয়ে রূপকথার রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছিল বুড়ো যাদুকর। আজ ফিরবার দিনে তার বার বার মনে পড়ে তাই, কেমন করে কেটেছে রাত—দৈত্যপুরীর অন্ধকারে, রাজকন্যার কাছে জেনে নিতে যাদুর খেলা।

যাবার পথে গাঁয়ের রাজা জানিয়েছিলেন—"যাচ্ছ ত' যাদু শিখতে, ফিরে এসে দেখাতে হবে কেমন শিখেছ নতুন খেলা।"

রাজকন্যা তাকে শিখিয়েছে সব রকম খেলা—কিন্তু আসার সময় বলেছে তাকে, "একটা খেলা শুধু বাকী রইল।" কি সে খেলা আজও জবাব মেলে নি তার।

কাল রাজার বাড়ী তাকে খেলা দেখাতে হবে, তারই কথা ভাবছে যাদু-বুড়ো। বার বার তবু মনে হয়—রাজাকে সব খেলা দেখাতে পারবে না সে—আজও একটা খেলা শিখতে বাকী যে তার! কে তাকে ডাকে বাইরে থেকে। বুড়ো জিজ্ঞেস করে, "এত রাত্রে কে তুমি?"

"আজ্ঞে এই গাঁয়েরই এক চাষা"—আস্তে কে বলে।

"কি চাও?"

"আজ্ঞে," রুদ্ধ কণ্ঠের জবাব আসে···"আমার ছেলের বড় অসুখ, কেউ নেই আর আমার, একটি বার তাকে খেলা দেখাতে হবে আপনার, অসুখের সময় শুধু আপনার নামই করে আর বলে খেলা দেখাও।"

"কিন্তু কেমন করে যাই বল? রাজার বাড়ী থেকে ডাক এসেছে। এখুনি ত' আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে—অনেকটা পথ এখান থেকে।"

"ওঃ!" আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায় চাষা। অন্ধকারে সে কাঁদে কি না যাদুকরের বোঝার সময় কই? রাজার বাড়ী থেকে ডাক এসেছে তার, বেরিয়ে পড়তে হবে এখনই।

সারাদিন খেলা দেখাল বুড়ো রাজসভায়। সন্ধ্যা বেলায় সভা ভাঙ্গে। রাজা বলেন, "চমৎকার খেলা তোমার—"

"কিন্তু"—বুড়ো বলে রাজাকে, "একটা খেলা আজও বাকী আমায় শিখতে···কি খেলা সেটা তা আমিও জানি না, শিখতে পারলে দেখিয়ে যাব আপনাকে, আজ আমায় ছুটি দিন।"

ফিরে আসে বুড়ো। পথে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় সে কার কান্না শুনে। এ কি! সেই চাষার কান্না যে!

ফিরে দাঁড়ায়, একবার আকাশের তারাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়। কি যেন ভাবে। তার পর ঝাঁপি ঠেলে ঢোকে ঘরে।

অল্প আলোয় দেখে একটা ছেলে মরে পড়ে আছে—সেই চাষার ছেলে।

ঘরে আর কেউ নেই। চাষা বোধ হয় লোক ডাকতে গেল।

বুড়ো কি ভাবে, তার পর আলোটা বাড়িয়ে দেয় একটু।

যাদু-বুড়োর হাতে বেজে ওঠে ডুগডুগি—চোখ মেলে তাকায় চাষার ছেলে।

আনন্দের হাসি বুড়োর ঠোঁটে, মরা ছেলেকে সে জাগিয়েছে! যে খেলা তার বাকী ছিল শেখা হয়ে গেছে তা।

আস্তে আস্তে সব খেলা দেখায় বুড়ো তাকে। খেলা তার শেষ হয়, আবার ঘুমিয়ে পড়ে চাষার ছেলে।

বাইরে কার পায়ের আওয়াজ শুনে বুড়ো বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। ঘরের সামনে চাষার সঙ্গে দেখা হয় তার। চাষা তাকায় বুড়োর মুখের দিকে। একটুখানি নুয়ে পড়ে চাষার কাঁধ ধরে নাড়া দেয় বুড়ো; তার পর চাষার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে আস্তে: "তোমাদের রাজাকে ব'ল, যে খেলা শিখতে বাকী ছিল আমার, শেখা হয়ে গেছে তা। তাঁকে আমার দেখাবার কথা ছিল এই খেলা। ব'ল তাঁকে, যেদিন তাঁর ছুটি মিলবে, লোকে জানবে তাদের রাজা গেছে মরে, মাটির তলায় শুইয়ে রেখে আসবে তাঁকে—সেদিন তাঁকে সেই ঘুম থেকে জাগিয়ে আমার খেলা দেখাব। আজ নয়।"

চাষা অবাক্ হয়ে বড় বড় চোখ তুলে তাকায় যাদুকরের মুখের দিকে।

আস্তে আস্তে যাদুকর বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে— হাসি। সে হাসিতে দৈত্যপুরীর অন্ধকারে রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গে কি?

পাঁচটি কথা

"(১) সকালে উঠে একটু ঠাকুরের নাম জপ করবে, যে ঠাকুরকে ভাল লাগে। প্রার্থনা করবে, হে ভগবান্, আমাকে ভাল ছেলে (কি মেয়ে) ক'রে দাও। (২) সত্য কথা বল্‌বে। (৩) বাপ-মায়ের কথা শুনবে। (৪) মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। (৫) তার পরে দুষ্টুমি করতে পার।" —শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

খোকার মিনতি

কুমারী সতী চট্টোপাধ্যায়

একবারটি দে না খুলে, পায় পড়ি মা তোর,
বন্ধ-করা জানলা হু'টি চোখের কাছে মোর।
কত দিন যে দেখি নি ক' নীল আকাশের মায়া,
তেঁতুল গাছের পাতার ফাঁকে রোদের আলো-ছায়া ;
কত দিন যে দেখি নি ক' মিষ্টি চাঁদের আলো,
ঘরের ভিতর চেয়ে চেয়ে সব যে লাগে কালো।
আমাদের ঐ পদ্মদীঘি পদ্মফুলে ঢাকা—
কালো জলে পড়েছে তার অশথ গাছের শাখা.
ও পাশেতে ছড়িয়ে আছে সবুজ ধানের জমি—
শেষ হয়েছে সেই সুদূরে নীল আকাশে চুমি' ;
ধানের ক্ষেতের ধার দিয়ে যায় চিত্রলেখা নদী;
ঝাঁপিয়ে তাহার ঠাণ্ডা জলে বারেক পড়ি যদি
সেরে যেত সকল অসুখ—স্নিগ্ধ হ'ত মন,
ওষুধ দিয়ে মন সারাবে ?—মিথ্যা প্রলোভন।

শোন মাগো, বলছি তোমায় কি যে আমি চাই,
ঠাণ্ডা, খোলা, মিষ্টি হাওয়ার স্পর্শ যদি পাই ;
এক নিমেষে সকল অসুখ উধাও হবে মোর,
পায় ধরি মা, দে খুলে দে জানলা হু'টি তোর।

জান কি ?

কুমারী বাণী বসু

পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র সব চেয়ে গভীর প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন দ্বীপ আর জাপানের মাঝখানে। গভীরতা ৩৪,২১০ ফুট (অন্য মতে ৩৫৪৩৩ ফুট)।

পৃথিবীর মধ্যে ৫৭,৫১০,০০০ বর্গ মাইল জায়গা ডাঙ্গা, আর ১৩৯,৪৪০,০০০ বর্গ মাইল জল। তার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর ৬৮,৬৩৪,০০০ বর্গ মাইল।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় দু'শ' কোটি। তার মধ্যে ৯৫ কোটি এশিয়ায়, ৫৫ কোটি ইয়োরোপে। (সংগ্রহ)

হাস্যকৌতুক

শ্রীকনককান্তি মজুমদার

শিক্ষক—আচ্ছা, বল তো. ঘড়িতে ১৩টা বাজলে কত সময় হয়েছে বোঝায় ?
১ম ছাত্র—বেলা ১টা বোঝায়।
২য় ছাত্র—আজ্ঞে, না স্যর্, ঘড়ি মেরামতের সময় হয়েছে বোঝায় !

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

শ্রীগৌরী দেবী

কো-ভাডিস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এম্.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ||০

কো-ভাডিস বিশ্বসাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। তারই আখ্যান-ভাগ নিয়ে ছেলেদের উপযোগী ক'রে লেখক বাংলা ভাষায় পরিবেশন করেছেন। লেখকের ভাষা বেশ ঝরঝরে, গল্প বলার ভঙ্গীটিও জানা আছে। তোমাদের বইখানা ভাল লাগবে।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। ইষ্টার্ণ ল হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।—দাম ।৵০

হাসির গল্পের বই। সর্ব্বত্র না জমলেও হাসির গল্পের যা প্রাণ—ভাষার কারিকুরি, বর্ণনাভঙ্গী এবং পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশল—সে সম্বন্ধে লেখক বেশ অবহিত। গোড়ায় হাসির গল্পের ভূমিকাটি খুবই ভাল লাগল। শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা ছবিগুলি বইটির আর একটি আকর্ষণ। ছাপা, কাগজ, ছবি ইত্যাদির তুলনায় দাম অত্যধিক সস্তা।

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয় গুলির যে কোনও একটি নিয়ে একটা ছোট রচনা লিখতে হবে (এক্সারসাইজ্ বুকের ৩ পৃষ্ঠার মধ্যে):—

(১) কোন্ বই তোমার ভাল লাগে (২) কি হ'তে তোমার ভাল লাগে (৩) তোমার জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

লেখা ২০শে পৌষের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখে দিতে হবে।

আমাদের মতে যার লেখা সব চেয়ে ভাল হবে তাকে এক বছর বিনা মূল্যে রামধনু পাঠান হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

এই সংখ্যায় 'রামধনু'র ১৩শ বর্ষ শেষ হ'ল। আসছে মাসে সে ১৪ বছরে পড়বে। এখন থেকে রামধনু তোমাদের কাছে সমবয়সীর বন্ধুত্ব দাবী করতে পারে, নয় কি?

এ বছরটা নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে রামধনুকে যেতে হয়েছে। যুদ্ধের জন্য কাগজ, ছবির ব্লক এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিষ ক্রমেই দুর্মূল্য হচ্ছে—সব সময় মূল্য দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও রামধনুকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সম্ভব হয় নি। আশা করি আসছে বছর এ সব ত্রুটী শোধরানো যাবে।

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর মজার লেখা তোমাদের কয়েক মাস দিতে পারি নি। এ মাসে তিনি যে ভাবেই হোক্ গল্প দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেরী ক'রে ফেলেছেন। তাঁর লেখা অবশ্য পেয়েছি, আসছে বারে সেটা তোমাদের উপহার দেব। তোমাদের পরলোকগত সম্পাদক মশাইএর [illegible]শিত রচনাও এত দিন বেশী দিতে পারি[illegible]। সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি পুরোনো লেখা পাওয়া [illegible]ছে—শীগ্‌গিরই সেগুলো তোমাদের দেবার ব্যবস্থা করব।

[illegible] বছরের ধারাবাহিক উপন্যাস সব ক'খানাই শেষ হ'ল। আসছে বারে তোমাদের আরও তিনখানা নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস দেবার ব্যবস্থা করছি—তিনখানাই তোমাদের তিন জন খুব প্রিয় লেখকের—তোমাদের খুবই ভাল লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নতুন বছরে রামধনুর আর কি কি উন্নতি করা যায় পরামর্শ দিও না! আমরাও অবশ্য ভাবছি। আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'র।

শ্রীমাধুরী দেবী ও শ্রীশশাঙ্ক রায় জলযুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছেন। এবারে কিছু দেওয়া হ'ল। শ্রীসোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন তাঁদের পাড়ায় তাঁরা একটা "রামধনু-চক্র" নামে সাহিত্য সমিতি করেছেন। সমিতির সভ্যেরা সবাই রামধনুর গ্রাহক, তাই নাকি এই নাম। শ্রীব্যোমকেশ গুহ, শ্রীমন্দিরা দেবী ও শ্রীসনৎ ঘোষ যে হাতে লেখা পত্রিকা "কোরক" পাঠিয়েছেন তা দেখে আমরা খুব খুসী হ'লাম। তোমরা যারা একটু-আধটু লিখতে পার তারা হাতে-লেখা কাগজই আগে বার করবে। অনেকে প্রথমেই ছাপাতে যাও, তার পরে ২।১ সংখ্যা বার করেই বন্ধ কর,—ফলে হয় বদ্‌নাম। এ রকম কাগজ যে আমাদের কাছে কত আসে তার ঠিক নেই। —রাঃ সঃ

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে চাঁদা তুলবার জন্ত কল্‌কাতায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল্ খেলা হবে এ সংবাদ গেল্ বারে তোমরা পেয়েছিলে। সম্প্রতি উক্ত প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। প্রথম রাউণ্ডে খেলা পড়েছিল মুস্‌লিম্ দলের সঙ্গে ইয়োরোপীয় দলের। তা'তে মুস্‌লিম দল জয়লাভ ক'রে ফাইনালে যায়। অপর দিকে হিন্দু দলের সঙ্গে খেলা হয় য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ দলের। এই খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধরে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয় নি। চতুর্থ দিনে হিন্দু দল য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ দলকে পরাজিত করে। ফাইনাল হয় মুস্‌লিম দলের সঙ্গে হিন্দু দলের। এই খেলাটিও খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল, এবং খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ কাউকে হারাতে পারে নি। তার পর অতিরিক্ত সময় খেলা হ'ল; এই সময়ে মুস্‌লিম দল একখানি গোল দেয়। ফলে ভারতের প্রথম কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার সম্মান তারাই পেয়েছে।

* * *

কল্‌কাতার দুর্দ্ধর্ষ ফুটবল্ টিম মহামেডান্ স্পোর্টিং সম্প্রতি আর একটি মস্ত সম্মান লাভ করেছে। এ বছরে দিল্লীতে 'ডুরাণ্ড কাপ্' প্রতিযোগিতায় তারা বিজয়ী হয়েছে। এ পর্য্যন্ত কোনও সৈনিক দল ছাড়া আর কারও ভাগ্যে এ সম্মান জোটে নি। ইতিপূর্ব্বে ই. আই. আর এবং এন্. ডব্লিউ. আর দল ফাইনাল পর্য্যন্ত গিয়েছিল, মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স দলও কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল কিন্তু কাপ্ জয় করল প্রথম মহামেডান্ স্পোর্টিং দলই। এর ফলে ভারতের কোন প্রথম শ্রেণীর 'ট্রফি'ই তাদের পেতে বাকী রইল না। কল্‌কাতার লীগ্ কাপ্, আই. এফ্. এ শীল্ড, বোম্বাইএর রোভার্স্ কাপ্—সবই তারা ইতিপূর্ব্বে পেয়েছে; ডুরাণ্ড কাপ্ বাকী ছিল, এবার তাও হ'ল। তাদের এই অসামান্ত কৃতিত্বে প্রত্যেক ভারতীয়ই আনন্দ লাভ করবে। এবারে মহামেডান্ স্পোর্টিং দল সেমি-ফাইনালে ওয়েল্‌চ্ রেজিমেণ্ট্‌কে ৩—১ গোলে এবং ফাইনালে ওয়ার-উইক্‌শায়ারকে ২—১ গোলে হারিয়েছে।

* * *

ক্রিকেটে রণ্‌জি প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। পূর্ব্বাঞ্চলে প্রথম রাউণ্ডে বাংলা দল বিহার দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম ইনিংস্‌এ তারা বিহার দলের চেয়ে ৪০ রান্ বেশী করে। তিন দিনের খেলা, ২য় ইনিংস আর শেষ হয় নি। প্রথম ইনিংস্‌এর জোরেই বাংলা বিজয়ী [illegible]

তার পর কল্‌কাতায় দ্বিতীয় রাউণ্ডে বাংলার সঙ্গে পড়ে যুক্তপ্রদেশের;—প্রথম ইনিংস্‌এ যুক্তপ্রদেশ দল করে ১৯১ রান্, বাংলা দল করে ১৪৭ রান্। দ্বিতীয় ইনিংস্‌এ যুক্তপ্রদেশ আরও ২২৬ করে, কিন্তু বাংলা মাত্র ১২৬ রানেই সব

আউট্ হয়ে যায়। ফলে যুক্তপ্রদেশ দলই ১৪৪ রানে বিজয়ী হয়। যুক্তপ্রদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত পালিয়া, তিনি খুবই ভাল খেলেছেন। বাংলা দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক বসু। এই দলের শ্রীযুক্ত কমল ভট্টাচার্য্যের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

* * *

ইয়োরোপে গ্রীস্ ও ইটালির মধ্যে লড়াই সমানে চলেছে, এবং ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, প্রায় সর্ব্বত্র গ্রীকরাই জয়লাভ করছে। তারা ইতিমধ্যে আলবেনিয়ায় অনেক সহর দখল করেছে, ইটালিয়ান্ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে গোলা-বারুদ, কামান ও অন্যান্য রসদপত্র কেড়ে নিচ্ছে, বহু বিপক্ষ-সৈন্ত বন্দী করছে। ইটালিয়ানরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে স্থান ত্যাগ অর্থাৎ যুদ্ধের ভাষায় "রিট্রিট্" করছে,—যাবার সময় যতটা পারছে নিজেদের রসদ-পত্র নষ্ট ক'রে বা সহরে আগুন লাগিয়ে রেখে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েক বার তাদের সেনাপতি রদবদলও করতে হয়েছে। গ্রীসের প্রতাপ দেখে সমস্ত জগৎ বিস্মিত হয়েছে।

ওদিকে ইন্দোচীন সীমান্তে ক্ষুদ্র শ্যাম বা থেইল্যাণ্ড্ও মাঝে মাঝে বিক্রম দেখাচ্ছে। ইন্দোচীনের সঙ্গে তাদের কয়েকটা সংঘর্ষও হয়ে গেছে।

সম্প্রতি আফ্রিকায় ইংরেজদের হাতে ইটালিয়ান্‌দের একটা বড় রকম পরাজয় ঘটেছে।

* * *

কিছুদিন হ'ল আমেরিকার নিউইয়র্কে একটি বিশ্বপ্রদর্শনী খোলা হয়। ঐ প্রদর্শনীতে একটা যশের প্রাচীর ('ওয়াল্ অব ফেম্ অব্ দি আমেরিকান্ কমন্') তৈরী করা হয়। তা'তে যে সব বিদেশী আমেরিকান্ নাগরিক নানা দিক্ দিয়ে স্বাধীন আমেরিকাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম ক্ষোদিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যাঁদের নাম এই প্রাচীরে উঠেছে আমেরিকান্‌দের কাছে তাঁদের গৌরব বড় কম নয়। তোমরা শুনে সুখী হবে, এই প্রাচীরে চার জন ভারতীয়ের নাম দেওয়া হয়েছে—তাঁদের মধ্যে দু'জন বাঙ্গালী। একজন ৺ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আর একজন ডক্টর তারকনাথ দাস। এঁরা দু'জনেই বিশিষ্ট লেখক ব'লে সম্মানিত হয়েছেন। অপর দু'জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী (ইনি ঠিক ভারতীয় নন, সিংহলী)—চারুশিল্পে বিশেষজ্ঞ, আর একজন ডক্টর কোকটনর—রাসায়নিক।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) পা+হাড়=পাহাড়। (২) চি যোগ করলে;—চি+বুক=চিবুক। (৩) গণ্ড;—গণ্ড+গোল=গণ্ডগোল। (৪) হাত;—হাত+া=হাতা, হাত+ী=হাতী, হাত+ল=হাতল, হাতু+কড়া=হাতকড়া। (৫) হাই;—বে+হাই=বেহাই।

উত্তরদাতাদের নাম

প্রসূন, বীরেন, মঞ্জু, মলয়, ঝর্ণা, ঘটু (গুপ্তপাড়া—রংপুর) ; সন্তোষ ভট্টাচার্য (ভবানীপুর) ; লীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (ভবানীপুর) ; রণজিৎ, অমূল্য, কৃষ্ণবরণ, অরুণ, পঙ্কজ (বাণীমন্দির—মুক্তাগাছা) ; অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, পুতুল ও মিহু (কালীঘাট) ; রিণা রায় (টালিগঞ্জ) ; অঞ্জলি, মিঠু, টুকু, বাচ্চু, শ্যামল, আশীষ, উমা ও মিত্রা (কলিকাতা) ; বাবু, রজবউন্নিসা (পার্ক-সার্কাস—কলিকাতা) ; কালিদাস পাল (বালুভরা) ; বাণী, বেলা (ডাল্টনগঞ্জ) ; কফিল, নিমল, রশীদ, হেলালউদ্দিন, বোথারী, এন্তাজ, কুদ্দুস, আতাউর (লাখপুর শিমুলিয়া) ; সুজাতা, সুব্রতা, সুপ্রিয়া, শিউলি, ফোটা, ফ্লোরা, মিহির, বড়দি, মেজদি, চিনুদি, ছোড়দি, নন্দকো (করিমগঞ্জ) ; নাড়া, খোকা, মামু, সমীর, অশোক, অনিল, গঙ্গা (রাইপুর) ; সাধনকুমার, উমাপদ, হারাণচন্দ্র, নীলিমা, বেলারাণী, নীলরতন চাটার্জ্জি (চক্রধরপুর) ; অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী) ; রুণা সিংহ (কটক) ; প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা) ; কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ মানের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা) ; চিত্রিতা সেন (নিউদিল্লী) ; শশাঙ্ক বসু (এলাহাবাদ)।

নূতন ধাঁধা

হারু ঘোষের ৫০টি গরু। গরুগুলোকে আটকে রাখবার জন্য সে কতকগুলি টিনের পাত কিনে তাই দিয়ে বেড়া দিয়েছে। এক এক খানা টিন ৫ হাত লম্বা, তিন হাত চওড়া। গরুগুলোকে ভাল করে আঁটাতে হারুকে ৬০ খানা টিন কিনতে হয়েছে। ঐ ৬০ খানা টিন সে চার কোণা খোঁয়াড়ের আকারে কায়দা ক'রে বসিয়েছে।

হারুর প্রতিবেশী দয়ালেরও ৫০টি গরু ছিল, কিন্তু সেগুলি ভাল ক'রে রাখবার জায়গা ছিল না। হারুকে খোঁয়াড় করতে দেখে দয়াল এসে বল্‌লে, "ওহে, খোঁয়াড় যখন করলেই তখন আর একটু বড় করেই কর না, আমার ৫০টি গরুও যাতে ঐ সঙ্গে ধরে।" হারু বল্‌লে, "বাবা, ৫০এর জায়গায় ১০০ গরু থাকবে, তা হ'লে তো আরও ৬০ খানা টিন লাগবে বল ?" দয়াল হেসে বল্‌লে, "দূর্, এই দেখ, আর মাত্র ২খানা টিন আন্‌লেই দু'জনের সমস্ত গরু স্বচ্ছন্দে এঁটে যাবে।" বলে দয়াল হারুকে একটা নক্সা এঁকে দেখাল। হারু তো অবাক্।

তোমরা বলতে পার হারু প্রথমে কি ভাবে টিন সাজিয়েছিল ? আর দয়ালই বা কি ক'রে সাজাতে বল্‌ল ?